পুতপবিত্র আহলে বায়াতই ঈমানের ভিত্তি

এ.এন.এম.এ মোমিন

সম্পাদনা : মুহীব্বীন-এ-আহলে বয়েত ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

দ্বিতীয় প্রকাশ : ২০শে আগস্ট ২০১৯, পবিত্র ঈদ-এ-গদীর দীবমা, এ.এন.এম.এ মোমিন।

উৎসর্গ : মহান রাব্বুল আলামীনের অসীম কৃপা আমাদের প্রতি, ভিলায়ত এবং ঈমামতের ঘোষণার মাধ্যমে এই আনন্দের লগনে আমাদের প্রাণের উচ্ছাস মহছিন-এ-ইহলাম ভিলায়তের সম্রাট আমীরুল মোমেনীনের আলী (আ:) এর পিতা ছাইয়্যেদেনা আবু তালীব আলাইহিচ্ছালামের কদম পাকে নিবেদন করলাম, মুহীব্বিন এ আহলে বায়ত ফাউন্ডেশনের পক্ষে–

মা, আবেদা খাতুনের নিবেদিত পুত্র (হাজী মুহাম্মদ আবুল হোসেন মিয়া) হিসাবে মায়ের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা স্বরূপ এই বই প্রকাশনার কাজে সংযুক্ত হই। এই আয়োজন মমতামীয় মাকে উৎসর্গ করলাম।

প্রাপ্তিস্থান : হাজী মুহাম্মদ আবুল হোসেন মিয়া
০১৯২১১১৩১৬৩, ০১৪৯২৬৮৭৬১৬০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষে– মুহাম্মদ আলে মুহাম্মদের প্রতি ছালাওয়াত একই সাথে গউছুল আলামীন ও ছৈয়দ জিয়াউল হক শাহেন শাহ জিয়াউল হক (ক:) এর সুযোগ্য স্থলাভিষিক্ত সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান (ম:)।

কম্পোজ, প্রিন্টিং ও বাইন্ডিং: মোঃ আমির হোসেন কালু, রাসেল বুক বাইন্ডিং এন্ড ফটোকপি, ২৫০/সি, বাকুশাহ্ মার্কেট (৪র্থ গলি), নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল: ০১৮২২-৭১৮০৭৯, ০১৭১০-৮২৫০০৩

প্রকাশনায় : মুহিব্বিন-এ-আহ্লে বায়ত ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা নং

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম ও সমাজ

ধর্ম ও সমাজ — ২০
ঐশি নির্দেশের আলোকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণই ধর্ম — ২১
আত্মনিয়ন্ত্রণ — ২১
সৎ স্বভাবই ধর্ম — ২২
নফ্স ও প্রবৃত্তি — ২৫
নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এর তাৎপর্য — ২৭
ধর্মের ব্যবহারিক দিক — ২৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমান

ঈমান — ৩১
প্রেমই ঈমানের ভিত্তি — ৩২
প্রেমের শক্তি — ৩২
ঈমানের পরীক্ষা — ৩৫
ঐশি প্রেমের পদ্ধতি — ৩৬
আহলে বায়াত — ৩৮

তৃতীয় অধ্যায়

কলেমা

কলেমা তাইয়্যেবা — ৪৬
লা-ইলাহার অর্থ — ৪৭
কলেমা তাইয়্যেবার পর্যালোচনা — ৪৯
ইলাহা শব্দের ব্যাখ্যা — ৪৯
ইলাহ ও রবের সম্পর্ক — ৫৭
দ্বীন শব্দের ব্যাখ্যা — ৬২

চতুর্থ অধ্যায়

রেসালত

রেসালত –নবুয়ত — ৬৭
নবি ও রসুলের পার্থক্য — ৭০
নবি রসুল নিয়োগ — ৭৪
নবিদের শপথ — ৭৫
রসুলের দায়িত্ব — ৭৫
রসুলের প্রতি আনুগত্য — ৭৭

রসুলের প্রতি অলিপিবদ্ধ বা বিশেষ ধরনের ওহি ৭৮
নবি জীবন ও ব্যক্তি জীবন পর্যালোচনা ৭৯
নবিদের মাধ্যমে পাপ মোচন ৮০
নবিদের মোজেজা ৮১

পঞ্চম অধ্যায়

নবুয়তের উত্তরাধিকার

নবুওয়তের উত্তরাধিকার ৮৪
আম্বিয়াদের স্থলাভিষিক্ত খলিফাগণ ৮৭
নবুওয়ত ও বেলায়াত ৮৮
গদিরে-এ-খুম ৯০
রসুল (দ.) কর্তৃক আলী (আ.) কে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ৯২
হজরত রসুল (দ.) কর্তৃক আলীর (আ.) পক্ষে বায়াত গ্রহণ/উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ৯৫
ওসামা বিন জায়েদের অভিযান ৯৬
রসুল (দ.) এর ওফাত ৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

খেলাফতে রাশেদা

রসুল (দ.) এর ওফাতের পর খলিফা নির্বাচন ৯৮
হজরত আবু বকরের (রা.) নিয়োগ ও শাসনকাল ১১০
হজরত আবু বকর (রা.) এর ভাষণ ১১৪
রসুল (দ.) এর সার্বিক প্রতিনিধিত্ব ১১৬
মানবিয় বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা ১১৯
হজরত আবু বকরের (রা.) ইমামতি ১২১
রসুল (দ.) এর সফর সঙ্গী হিসেবে সওর গিরি গুহায় হজরত আবু বকর (রা.) ১২৫
হজরত আবু বকর (রা.) এর নিয়োগ ১২৬
কোরআনে বর্ণিত অর্থনৈতিক বিধি বিধানের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা ১২৯
ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি ১৪০
ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত সার ১৪৯
ইসলামি অর্থনীতি ও আধুনিক অর্থনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ ১৫০
রসুল (দ.) এর অর্থ বণ্টন পদ্ধতি ১৫৫
অধিক সম্পদ লাভের পরিণতি ১৫৯

সপ্তম অধ্যায়

রসুল (দ.) এর ওফাত পরবর্তী অবস্থা

রাষ্ট্র কর্তৃক বৃত্তি প্রদানে অসংগতি ১৬২
রসুল (দ.) এর মানবত্ব ও নবুয়ত্ব বিষয়ক জটিলতা ১৬৪
ধর্মীয় বনাম রাষ্ট্রীয় অনুশাসন ১৬৬

অষ্টম অধ্যায়

হজরত আলী (আ.) এর খেলাফতকাল

হজরত আলী (আ.) কর্তৃক গভর্নর বরখাস্ত ও নিয়োগ	১৯১
উষ্ট্রের যুদ্ধ	১৯৭
হজরত আলী (আ.) এর খেলাফতকালে মাবিয়ার কার্যকলাপ রুমি	১৯৭
সিফ্ফিনের যুদ্ধ	২০৪
শালিসকারকদের ভূমিকা	২০৮
খারেজি বিদ্রোহ	২১১
খারেজি মতবাদ	২১৩
খেলাফত সম্পর্কে খারেজিদের বিশ্বাস	২১৫
হজরত আলী (আ.) এর শাহাদত	২২০
হজরত হাসান (আ.) এর খেলাফত লাভ	২২০

নবম অধ্যায়

মাবিয়ার রাজত্বকাল

মাবিয়ার আমলে আদর্শগত বিভ্রান্তি	২২৪
ধর্মের বিকৃত উপস্থাপন	২২৭
আহলে বায়াতদের গালি দেওয়ার বিধান চালু	২২৯
এলমে জাহের ও এলমে বাতেন সম্পর্কিত অপপ্রচার	২৩১
জীবন্ত কোরআন ও পুস্তক কোরআন	২৩২
কোরআনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে রসুল (দ.) এর অবমূল্যায়ন	২৩৩
জাল হাদিস প্রণয়ন	২৩৫
মাবিয়ার সাহাবিয়াত	২৩৭
খাতা এ ইজতে হাদি	২৩৯
কাতেবি ওহি	২৩৯
সব মাফ মতবাদ	২৪০
অদৃষ্টবাদ	২৪২
মাবিয়া কর্তৃক এজিদকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ	২৪৪

দশম অধ্যায়

এজিদের শাসনকাল

এজিদের আমলে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা বিভ্রান্তি	২৪৬
মক্কায় হযরত হোসেন (আ:) কে হত্যার প্রচেষ্টা	২৫৫
কারবালার ঘটনা	২৫৭
কারবালা যুদ্ধের ফলাফল	২৭১

একাদশ অধ্যায়

কারবালার পর মুসলিম বাদশাহদের বিচ্যুতি

রসুল (দ.) এর রওজা শরিফ জিয়ারত নিষিদ্ধ ঘোষণা ২৭৬
মক্কার পরিবর্তে সাখরায় হজ পালনের নির্দেশ ২৭৬
মসজিদে নব্বির অবৈধ সম্প্রসারণ ও ডিজাইন পরিবর্তন ২৭৭
উমাইয়াদের ক্ষমতা গ্রহণের আইনগত ভিত্তি ২৭৯
উমাইয়াদের ধর্মমত ২৮০
উমাইয়া আমলে বিচার ব্যবস্থা ২৮২
খলিফাদের আখেরাতের শাস্তি থেকে মুক্ত হওয়ার ফতোয়া ২৮৩
উমাইয়া শাসন ও সমাজ ২৮৩
উমাইয়াদের অনারব নির্যাতন নীতি ২৮৫
উমাইয়াদের পতন ২৮৫

দ্বাদশ অধ্যায়

আব্বাসীয় শাসনকাল

আব্বাসীয়দের ক্ষমতা লাভ ২৮৭
আব্বাসীয়দের বিচার ব্যবস্থা ২৮৮
আব্বাসীয় খলিফাদের জীবন যাত্রা ২৮৯
আব্বাসীয় ধর্মমত ২৯০
অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে ব্যাপক ধর্মীয় বিকৃতি ২৯২
ধর্মের পুনরুজ্জীবনকারী মহিউদ্দিন শেখ আবদুল কাদের জিলানি ২৯৩
আব্বাসীয় শাসনের শেষ পর্যায় ৩০৯
রাজনৈতিক খেলাফতের শেষ অধ্যায় ৩০৯
রাজনৈতিক খেলাফতের পর্যালোচনা ৩১০

ত্রয়দশ অধ্যায়

ধর্ম ও আধুনিকতা

ধর্ম ও আধুনিকতা ৩১৫
বিশ্ব জগতের সূচনা ৩১৭
আধুনিক চিন্তাবিদদের মতবাদ ও তার অসংগতি ৩১৮
বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের আইনের ঐতিহাসিক পটভূমি ৩২২
উপসংহার ৩২৯

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

ভূমিকা :

বিশ্বপালক আল্লাহতা'লার প্রশংসা করি। তিনি আদি-অন্তে ও গোপনে-প্রকাশ্যে চির বিরাজমান। আল্লাহতা'লা বিশ্ব জগতকে সৃষ্টি করে ভারসাম্য দান করেছেন তার পরিমাপ ও পরিমাণ স্থির করে তাঁর অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় পথের সন্ধান দিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহতা'লার সুনিবির্বাচিত প্রেরিত নবি মুহাম্মদ (দ.) এর প্রতি দরুদ ও সালাম জানাই। যার উপস্থাাপিত ও প্রদর্শিত পথের অনুসারীগণ সত্যিকারের পথের সন্ধান পায় ও যাঁর অনুসরণ হতে বিচ্যুত হলে তাকে পথভ্রষ্ট ও ধ্বংস হতে হয়। যিনি সত্যবাদী, সত্যভাজন, সাংসারিক বিলাস ব্যসনের ঊর্ধ্বে থেকে পরম বন্ধু আল্লাহতা'লাকেই প্রত্যাশা ও কামনা করেছেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি চেয়েছেন। সেই মহান রসুল, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে আল্লাহতা'লা কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন। যাঁর আগমনে জগতে সত্যের প্রকাশ ঘটেছে ও মিথ্যার অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ দরুদ। পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও গভীর শুভেচ্ছা জানাই। এই নবির মহান আহলে বায়াত, বংশধর, সাহাবা ও অনুগামী তাবেঈন বা অনুবর্তীদের প্রতিও অভিবাদন জানাই। যাঁরা নিজেদের প্রভু আল্লাহতা'লার প্রতি কায়মন বাক্যে সততা ও দৃঢ়তার সাথে তাঁরই নির্দেশিত পথ ও পন্থা অনুসরণ করেছেন।

মহা প্রেমময় আল্লাহতা'লা মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তাঁর আদরের সৃষ্টি মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণের জন্য তিনি অসংখ্য, অগণিত বস্তু ও দ্রব্য সম্ভার তার চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন। চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজি, দিবা-রাত্রি, আলো-বাতাস, আকাশের মেঘমালা ও বারিবর্ষণ, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, পাছপালা এবং নানা ধরনের আহার্য-দ্রব্য, তিনি মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে মানব জীবনের সকল উপায় উপকরণ সহজ লভ্য করেছেন।

মহান আল্লাহতা'লা এই বিশ্বকে এক গভীর রহস্যময়, জটিল ও অতিসূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই প্রচ্ছন্ন পদ্ধতি একারণেই অবলম্বন করা হয়েছে যেন আল্লাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আল্লাহ প্রদত্ত প্রখর বুদ্ধি ও জ্ঞানবলে তাঁর প্রিয় স্রষ্টাকে আবিষ্কার করে। মহান স্রষ্টার মর্যাদা বুঝতে পারলেই সে পৃথিবীতে তাঁর ভূমিকা, মানমর্যাদা, দায়িত্ব, কর্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে। কৌশলী বিশ্ব প্রতিপালক মানুষকে বৃহত্তর রহস্যের অংশ হিসেবে আল্লাহতা'লাকে একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, প্রভু ও শাসক মনে করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। আবার তিনি তাকে বিপরীত কর্ম পন্থা গ্রহণ করারও পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন। এই দুটি পথের যে কোন একটি পথ অবলম্বন করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহতা'লা প্রত্যেক জাতি ও কওমের কাছে নবি রসুল পাঠিয়ে মানুষকে আল্লাহতা'লার সঠিক পরিচয়, ক্ষমতা, সৃষ্টি রহস্য ও পার্থিব জীবন যাপন করার উপায়-পন্থা, বিধি নিষেধ শিক্ষা দিয়েছেন। সঠিক পথে চলার যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার সাথে সংগতি রেখে মহান আল্লাহতা'লা এই পথে চলার বিভিন্ন উপকারিতা ও মঙ্গলময় দিক বর্ণনা করে তাকে এই পথে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। অপর দিকে ভ্রান্ত পথে চলার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করে সে পথে চলা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন। কোন ক্ষেত্রেই বল প্রয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

মানব ইতিহাসের সকল যুগের মানুষকে খোদার পথে আহ্বান জানানোর জন্য কোন নবি বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত অবশ্যই কেহ বিদ্যমান থেকেছেন। এই পরম্পরা ও খোদার পথে মানুষকে আহ্বানের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা এক অপরিহার্য ব্যাপার। যার প্রয়োজন অতীতে ছিল, বর্তমানে রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আল্লাহতা'লা মানুষকে যে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার সকলে করে না এবং করতেও জানেনা ফলে তার ভয়াবহ পরিণাম মানুষকে ভোগ করতে হয়। তাছাড়া মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে নানান ধরনের মানবিয় দুর্বলতা আছে। এ কারণেই মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-ভাবনা করে সব সময় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনা। ওপরন্তু তার জ্ঞান ও চিন্তার জগত ক্ষুদ্র ও সীমিত। চিন্তার এক পর্যায়ে তার গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মানব জাতির অনেক চিন্তানায়ক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নবি রসুলের মূল শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী ও মানবিয় চারিত্রিক দুর্বলতা

নিয়ে যে সব ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে নতুন নতুন দর্শন ও মতবাদ আবিষ্কার করেছেন তা মানুষের জীবনে অকল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি।

মানবিয় চিন্তা-চেতনা যেসব অতিপ্রাকৃতিক মতবাদ বা জীবন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে মানুষ ও বিশ্বজগত সম্পর্কে চারটি অতি প্রাকৃত মতবাদ নির্ধারণ করা যেতে পারে। পৃথিবীতে যতগুলো জীবন দর্শনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটিই এই চারটির মধ্য থেকে যে কোন একটিকে অবশ্যই গ্রহণ করেছে।

১। নাস্তিক্যবাদ (A.HEISM) বা কুফর : এই মতবাদের অনুসারীরা ঈশ্বর বা আল্লাহতা'লার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না। নাস্তিক্যবাদ অনুসারে জড় জগৎ হচ্ছে একমাত্র জগৎ। আর এই জগতের আড়ালে কোন ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিক শক্তির অস্তিত্ব নাই। দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই নাস্তিকেরা সাধারণত: দুটি যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

প্রথমমত **:** তারা বলেন মানুষ প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং ঈশ্বর নেই (নাউজিবিল্লাহ) ঈশ্বরকে অতীন্দ্রিয় সত্তা বলা হয়। মানবিয় জ্ঞান ইন্দ্রিয় জগতেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বরকে জানা যায় না। আর যা জানা যায় তার অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না। (নাউজিবিল্লাহ)

দ্বিতীয়ত : নাস্তিকদের মতে জগত হচ্ছে জড় ও জড়শক্তির খেলা (INTERACTION OF ENERGY) বিশ্বের কর্মকান্ড যান্ত্রিকভাবেই প্রাকৃতিক পদ্ধতি অনুযায়ী চলে। সুতরাং বিশ্ব প্রক্রিয়ায় কোন উদ্দেশ্য-কারণের বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। (নাউজিবিল্লাহ)

নাস্তিকদের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে একথা স্বার্থান্ধ পুরোহিত ধর্মবেত্তা সম্প্রদায়ের প্রচারণা। এরূপ প্রচারণার মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষকে তাদের শিকারে পরিণত করেন। সুতরাং ঈশ্বর কোন জাগতিক পূর্ণ সত্তা নন। তিনি হচ্ছেন ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্য সৃষ্টির মাধ্যম বা যন্ত্র বিশেষ। তিনি হচ্ছেন আধ্যাত্মবাদী ও ভন্ড পুরোহিতদের কল্পনা বিলাস মাত্র (নাউজিবিল্লাহ) নাস্তিক্যবাদের বিভিন্ন রকম ফের–রয়েছে গোড়া নাস্তিক্যবাদ (DOGMATIC ATHEISM), সন্দেহবাদী নাস্তিক্যবাদ (SCEPTICAL ATHEISM), সমালোচনামূলক নাস্তিক্যবাদ (CRITICAL ATHEISM), ব্যবহারিক নাস্তিক্যবাদ (PRACTICAL ATHEISM)

গোঁড়া নাস্তিক্যবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরুপে অস্বীকার করে। সন্দেহবাদী নাস্তিক্যবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। কিন্তু মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে জানার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে। সমালোচনামূলক নাস্তিক্যবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বা মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে জানার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে না। এ মতবাদ কেবল বলে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের বৈধ যুক্তির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ব্যবহারিক নাস্তিক্যবাদ অনুসারে ঈশ্বর আছেন কিনা তার প্রয়োজন আমাদের বাস্তব জীবনে নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিশ্বাস ছাড়াও এ জগতে জীবন যাপন করতে কোন অসুবিধা হয় না। এই মতবাদের প্রবক্তারা বিশ্বের সমাজে যে জীবন দর্শন উপস্থাপন করেন তাহলো–

এই নিখিল বিশ্বের ব্যবস্থাবলী একটি আকস্মিক ঘটনার বাস্তব বিকাশ মাত্র। এর পেছনে কোন প্রজ্ঞা, সদিচ্ছা ও মহা উদ্দেশ্য কার্যকরী নাই। মানুষ এক ধরনের পশু। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় সম্ভবত ঘটনাক্রমে এখানে তার উদ্ভব হয়েছে। তাকে কে সৃষ্টি করলো এবং কেন সৃষ্টি করলো। এ প্রশ্ন নিতান্তই অপাসঙ্গিক। আমরা শুধু এতটুকু জানি যে, এ পৃথিবীতে তার বাস, তার কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। ঐগুলো পূরণ করার জন্য তার প্রকৃতি ভেতর থেকে চাপ দেয়। মানুষের নিজস্ব শক্তি ও প্রাপ্ত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সে তাঁর সকল প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম। কাজেই নিজের জৈব প্রকৃতির দাবি পূরণ করা ছাড়া মানুষের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ছাড়া এমন কোন জ্ঞানের উৎস নেই। তাই ন্যায়, অন্যায়, সত্য অসত্যের বা বিধি-বিধানের অন্য উৎস নাই। কাজেই নিজের চারপাশের পরিবেশ, পরিস্থিতি, নিদর্শনাবলী এবং ইতিহাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার নিজেকেই একটি জীবন বিধান রচনা করা উচিত।

যেহেতু বাহ্যত এমন কোন সরকার দৃষ্টিগোচর হয় না যার সম্মুখে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। তাই মানুষ স্বভাবতই একটি অদায়িত্বশীল প্রাণী। আর যদি কোন ক্রমে কাউকে তাকে জবাবদিহি করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে তার নিজের সম্মুখে অথবা সেই কর্তৃত্বের সম্মুখে যা মানুষের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়ে মানুষের ওপর নিয়োজিত (রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহ)।

মানবিয় কার্যাবলীর ফলাফল এই পার্থিব জীবনের গীতেই সীমাবদ্ধ। এছাড়া দ্বিতীয় কোন জীবন নেই। কাজেই দুনিয়ায় প্রকাশিত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতেই ভুল ও নির্ভুল, ক্ষতিকর ও লাভজনক এবং গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য মীমাংসা করা হবে। অর্থাৎ বৈষয়িক উপকার করে না এমন যে কোন ধরনের কর্মপন্থাই অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর।

মানুষ যখন নির্ভেজাল নাস্তিক্যবাদের পর্যায়ে অবস্থান করে অর্থাৎ যখন নিজের অনুভূতি-গ্রাহ্যের বাইরে কোন সত্য পর্যন্ত সে পৌঁছে না অথবা ইন্দ্রিয়ের দাসত্বের কারণে পৌঁছতে চায় না, তখন তার মনোজগত পূর্ণরূপ এ মতবাদের আওতাধীনে আসে। পার্থিব স্বার্থের মোহে অন্ধ মানুষে সকল যুগে এ মতবাদ গ্রহণ করেছে। মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া সকল রাজা-বাদশাহ, আমির-ওমরাহ শাসক সমাজ, বিত্তশালী ও বিত্তের পেছনে জীবন উৎসর্গকারীরা সাধারণভাবে এই মতবাদকে অগ্রাধিকার দান করেছে। আর ইতিহাসে যে সব জাতির উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির বন্ধনাগীত গাওয়া হয়, তাদের প্রায় সবারই সভ্যতা সংস্কৃতির মূলে এই মতবাদ কার্যকরী ছিল।

এই মতবাদের প্রকৃতিই হলো যে, এর ভিত্তিতে একটি নির্ভেজাল বস্তুবাদী নৈতিক ব্যবস্থা জন্মলাভ করে। তারপর ঐ মানসিকতা থেকে জ্ঞান, শিল্প, চিন্তা ও পরিকল্পনার ধারা উৎসারিত হয় এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের সূক্ষ্মতর শক্তি অনুপ্রবেশ করে। অতঃপর এই ভিত্তিতে ব্যক্তি চরিত্র গড়ে ওঠে। এবং এই মডেল অনুযায়ী মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচার-ব্যবহার ও লেনদেনের যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করে। আইন ও সংবিধানের বিকাশ ও অগ্রগতি এরই ভিত্তিতে হয়।

যেহেতু এই মানসিকতার অধিকারীরা বাস্তবিক পক্ষে সকল প্রকারের হিসেব নিকেশের দায়-দায়িত্ব মুক্ত থাকে। তাই সব চাইতে বড় প্রতারক, আত্মসাৎকারী, মিথ্যুক, ধোকাবাজ, নিষ্ঠুর ও কলুষিত হৃদয় সম্পন্ন লোকেরা এই মতবাদের অনুসারী হয়ে থাকে। এবং তারাই এ ধরনের সমাজের নেতা বা কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

২। বহু ঈশ্বরবাদ (POLY:HEISM) বা শিরক : দ্বিতীয় অতি প্রাকৃত মতবাদের সারকথা হলো, যে এই বিশ্ব জগতের ব্যবস্থাপনা কোন ঘটনাক্রমিক প্রকাশ নয় এবং খোদাহীন অস্তিত্বের অধিকারী নয়, কিন্তু এর একটি খোদা নয় বরং একাধিক খোদা আছেন। প্রাচীন গ্রিস,মিশর, ব্যাবিলন ও ভারত বর্ষে এই মতবাদের ভিত্তিতেই সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল। প্রথমে গহন প্রকৃতি, গভীর সমুদ্র প্রভৃতি বহু বস্তু ও শক্তির আরাধনা শুরু হয়। পুরাকালে পূর্ব পুরুষদের আত্মার প্রতি উপাসনা থেকেই এ বহু ঈশ্বরবাদের সৃষ্টি হয়। তখন লোকেরা বিশ্বাস করত যে মৃত্যুর পর আত্মাগুলো বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র, নদী, পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদিতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে বাস করে। এ বিশ্বাস থেকে এ ধারণাও প্রচলিত হয় যে আত্মাগুলি প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের ওপর কর্তৃত্ব করে। ফলে আত্মাগুলোকে ঈশ্বর বা দেবতা জ্ঞানে পূজা করা শুরু হয়।

৩। একেশ্বরবাদ (MONO:HEISM) বা তৌহিদ : এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক হচ্ছেন আল্লাহতা'লা। তিনিই এর একমাত্র শাসক ও পরিচালক। ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, ইহুদি ধর্ম দুনিয়ায় একেশ্বরবাদ প্রচার করেছে। হিন্দু ধর্ম ও 'এক মেবা দ্বিতীয়াম' এই মতবাদ স্বীকার করে। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন ও জগতের সম্পর্কের প্রশ্নে মতো বিরোধ থেকেই একেশ্বরবাদের মধ্যে চারটি বিভিন্ন গ্রুপের উৎপত্তি হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (DEISM), সর্বেশ্বরবাদ (PANTHEISM), ঈশ্বরবাদ (THEISM) এবং সর্বধরেশ্বরবাদ (PANENTHEISM)।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (DEISM) : এই মতবাদ অনুসারে অনন্তকাল ধরে ঈশ্বর একাই ছিলেন। পরে তিনি মনে মনে একটি জগতের পরিকল্পনা করেন। তাঁর পরিকল্পনার বাস্তব রূপ এ জগৎকে তিনি এক বিশেষ মুহূর্তে নিছক শূন্য থেকে (Out of nothing) সৃষ্টি করেন। কেউ কেউ মনে করেন জড় পদার্থ পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল। ঈশ্বর ঐ জড় পদার্থকে গঠন করে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ফলে জগৎ এক বিরাট বিস্ময়কর যন্ত্ররূপে কাজ

করতে লাগলো। চলতে চলতে এ যন্ত্র যখন বিকল হয়ে পড়ে তখন ঈশ্বর এতে হস্তক্ষেপ করেন। এই মতো অনুসারে ঈশ্বর ও জগৎ দুই স্বতন্ত্র সত্তা, উভয়ের মধ্যে কোন আন্তর (Inter) সম্পর্ক এই মতবাদে স্বীকার করা হয় না, তাছাড়া বিশেষ সময়ে জগতের সৃষ্টি, ঈশ্বরের দুইরূপ, মূখ্য কারণ ও গৌণ কারণ (স্রষ্টা ও সৃষ্টি), প্রয়োজনবোধে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ও ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জগত বহির্ভূত প্রভৃতি জটিল পূর্বশর্ত এতে অন্তর্ভুক্ত আছে।

সর্বেশ্বরবাদ (PAN:HEISM) : এই মতো অনুসারে ঈশ্বর হলেন এক অন্তব্যাপী সত্তা। আর ঈশ্বরের সাথে জগতের সম্পর্ক হলো অন্তব্যাপী সম্পর্ক। প্রকৃতপক্ষে এ মতবাদের মূল কথা হলো ঈশ্বর সব এবং সবই ঈশ্বর । ঈশ্বর ও জগত এক । ঈশ্বর নিরপেক্ষ জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। তাই ঈশ্বর বহির্ভূত কোন সত্তার অস্তিত্বই এই মতবাদে স্বীকার করা হয় না।

সর্বধরেশ্বরবাদ (PANEN:HEISM) : এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর জীব ও জগতের ভেতরেও অবস্থিত এবং বাইরেও অবস্থিত। সর্বধরেশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত। ঈশ্বর সসীম ও জীব জগতের মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেন। এ প্রকাশের মধ্য দিয়েই তিনি নিজকে উপলদ্ধি করেছেন। তিনি সব কিছু ধারণ করে আছেন।

বিচ্ছিন্নভাবে একেশ্বরবাদ, নাস্তিক্যবাদের পর বহুশ্বরবাদের স্থান। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এর প্রভাব চলছে। প্রকৃতপক্ষে এই তিন ধরনের মতবাদ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সমাজ জীবনে সব সময় হাত ধরাধরি করে চলেছে। এই সহযোগিতার কারণগুলি নিম্নরূপঃ

প্রথমত: বহুঈশ্বরবাদী চিন্তাধারায় মানুষের সঙ্গে তার উপাস্যগণের সম্পর্ক হলো এই যে, সে তাদেরকে নিছক ক্ষমতাশালী এবং পার্থিব লাভক্ষতির মালিক মনে করে এবং বিভিন্ন উপাসনা-আরাধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে এই উপাস্যগণের করুনা ও সাহায্য লাভ করার চেষ্টা করে। উল্লেখ্য বহু ঈশ্বর মতবাদে মানবিয় চরিত্র সংশোধনের, ঈশ্বর প্রাপ্তির বা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বিধি-বিধান নাই। তাই বহুশ্বরবাদীরা মানবিয় বুদ্ধি অনুযায়ী নিজেরাই একটি শরিয়ত বা জীবন দর্শন প্রণয়ন করে। এই প্রক্রিয়ায় সমাজে কার্যত নাস্তিক্যবাদই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিন ধরনের মতবাদের মধ্যে রীতি-নীতি ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কোন পার্থক্য থাকতে দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষা, শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির জন্য বহুশ্বরবাদ বা নবি রসুল বিচ্ছিন্ন একেশ্বরবাদ কোন পৃথক মূলনীতি সরবরাহ করে না। এক্ষেত্রেও একজন ঐশি বিধি বিধানের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী একেশ্বরবাদী বহুশ্বরবাদ বা নাস্তিক্যবাদ পথে পা বাড়ায়। এবং নাস্তিক্যবাদের সামাজিক আদর্শের পথেই বহুবাদী সমাজের মানসিক ও চিন্তাগত বিকাশ ঘটে।

তৃতীয়ত: নাস্তিক্যবাদী সমাজে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, বহুশ্বরবাদী বা একেশ্বরবাদী সমাজও সেগুলো গ্রহণ করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে। যদিও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ঈশ্বরবাদ, বহুশ্বরবাদ ও নাস্তিক্যবাদের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছুটা বিভিন্নতা থাকে। বহুশ্বরবাদের এক পর্যায়ে রাজা-বাদশাহকে খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। (গড-কিং, রাজা দেবতার সন্তান, দেবতার আর্শিবাদেই রাজা হয় ইত্যাদি)। একই সাথে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়। রাজা বা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব যৌথভাবে জনগণকে শোষণ করে। পক্ষান্তরে নাস্তিক্যবাদের রাজত্বে জাতি পূজা, জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ, একনায়কত্ব প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ব্যবহারিক ও পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও প্রাণশক্তি ও মৌলিক প্রেরণার দিক থেকে সকল ধরনের রাষ্ট্র নীতিতে সাধারণ মানুষের ওপর নিপীড়ন, ও ধনী বা ক্ষমতাশালী লোকদের তোষণ প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে কোন গুণগত প্রভেদ নেই।

ওহিবিহীন একেশ্বরবাদ বা কোন ঐশি গ্রন্থ বা নবি রসুলের সার্বিক নির্দেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অস্বীকৃতির মাধ্যমে যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো, অর্থনৈতিক বিধি-বিধান, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে তাও নাস্তিক্যবাদ ও বহুশ্বরবাদের অনুরূপ হয়ে থাকে। এ কারণেই প্রাচীন ও পৌত্তলিক রোমের নৈতিক প্রকৃতি ও চরিত্রের সঙ্গে আজকের একেশ্বরবাদী ইউরোপে ও আমেরিকার এবং নাস্তিক্যবাদী রাশিয়ায় ও চীনের নৈতিক প্রকৃতি ও চরিত্রের কোন অমিল নেই।

ইসলাম

চতুর্থত: অতিপ্রাকৃত মতবাদ হচ্ছে ইসলাম। পৃথিবীর সকল ধর্মের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ব। খোদার এ একত্ব সঠিক, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক। এ দৃষ্টিতে আল্লাহতা'লা শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন। তিনি একমাত্র পালনকর্তা, মালিক, রেজেকদাতা, রক্ষাকর্তা, আইন ও বিধান দাতাও। অতএব মানুষ ভয় করবে কেবল আল্লাহকে, ইবাদত-পূজা উপাসনা, দাসত্ব ও বন্দেগি করবে একমাত্র আল্লাহতা'লার । তিনি ছাড়া আর কেউ মানুষের আরাধনা উপাস্য ও আনুগত্য পাবার অধিকারী নয়। এ কারণেই মানুষের জন্য আইন-বিধান তিনিই রচনা করবেন। মানুষ তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবল তাঁরই দেওয়া বিধি-বিধান বা আইন পালন করবে। আল্লাহতা'লা প্রদত্ত বিধি বিধানের বিপরীত কোন কাজ কিছুতেই করবে না। কেননা মানুষের ওপর হুকুম করার অধিকার আল্লাহতা'লা ছাড়া আর কারো নেই এবং তা থাকার প্রশ্নই থাকতে পারে না। কিন্তু মানব সমাজে এই তৌহিদ প্রয়োগ হতে পারে মানুষের দ্বারাই। তা করার পন্থা স্বয়ং সার্বভৌম আল্লাহতা'লাই নিরূপণ করে দিয়েছেন এভাবে যে, তিনি নিজেই মানুষকে দুনিয়ায় তার খলিফারূপে নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহর খেলাফত-প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব সর্বিকভাবে মানবজাতির হলেও তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচার, প্রসার, প্রয়োগ, পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য তিনি একজন দিশারী নিয়োগ করে থাকেন। এঁরাই হচ্ছেন নবি ও রসুল। এই মহান ব্যক্তিগণই আল্লাহতা'লা প্রদত্ত কিতাব (যা লিখিত আকারে স্রষ্টার তরফ থেকে প্রেরণ করা হয়) এর আলোকে নিজের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহতা'লা প্রদত্ত 'বিশেষ জ্ঞানে' মানবিয় সমস্যার পার্থিব সমাধান প্রদান করে থাকেন। যাতে করে মানব জাতি এই দুনিয়ায় শান্তি পায় ও ফলশ্রুতিতে পারলৌকিক জীবনেও কল্যাণ লাভ করে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন আল্লাহ কর্তৃক মানবরূপী প্রথম খলিফা আদম (আ.)কে সেজদার মাধ্যমে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য না করার জন্য শয়তানকে কাফির হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই শুধুমাত্র একেশ্বরবাদী হওয়ার মধ্যে মুসলমানদের ঈমানের সীমারেখাকে সীমিত করা হয়নি। বরং আল্লাহর খেলাফত তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবিয় কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বকে স্বীকার করাই ঈমানের দাবি। কিন্তু শয়তানের অনুসারীরাই সকল যুগেই কোন ব্যক্তি বিশেষকে আল্লাহর নবি হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং নবির পরে নবির স্থলাভিষিক্ত 'উলিল আমর' এর কনসেপ্ট অস্বীকার করে ধর্মে নানা ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। অথচ আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর আনুগত্য করো রসুল এর তোমাদের মধ্যে উলিল আমরদেরকে।" অর্থাৎ নবিদের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকেন "উলিল আমরগণ"। বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করে বলা যায় যে, নবুওতি কাজের ধারা এঁদের মাধ্যমেই দুনিয়ায় চালু রাখার এটাই খোদায়ি ব্যবস্থাপনা। এই প্রক্ষাপটেই হজরত মুহাম্মদ (দ.) এর বাণী "আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ও আমার আহলে বায়াত রেখে যাচ্ছি যারা কেয়ামত পর্যন্ত একে অন্য থেকে আলাদা হবে না, আল্লাহ বলেছেন "এই কিতাব আমি নাজিল করেছি এবং আমি তা সংরক্ষণকারী। অর্থাৎ আহলে বায়াতের মাধ্যমেই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহতা'লাই গ্রহণ করেছেন।

এই প্রেক্ষিতে পরম দয়ালু আল্লাহতা'লা যিনি মানুষ সৃষ্টি করে তাকে নবি রসুলগণের (আ.) মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে সঠিক পথে চলার মতো, পথ ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের নাজেলকৃত প্রথম আয়াতেই আল্লাহ 'রাবুল আলামিন' পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পড়া, চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণা করাকে হেদায়েতের মূলমন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এই গবেষণার পূর্ণ ফসল-স্বচ্ছ জ্ঞান ও গভীর চিন্তাশক্তির ওপর নির্ভরশীল এবং এই জ্ঞান-অনুভূতি মানুষকে অন্যসব সৃষ্টি থেকে শ্রেষ্ঠতম করেছে। তাই সত্য প্রত্যাশী, অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারীদের জন্যই রয়েছে আল্লাহর অগণিত নিদর্শন। যারা আপন চিন্তাশক্তি, যাচাই ও গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে অন্যায় ও অসত্যের বেড়াগুলি থেকে সত্যকে চিনে পৃথকীকরণ করতে পারে, যারা সব বক্তব্যই ন্যায়ের মানদন্ডে মেপে অধিক যৌক্তিকতাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত, যারা ইসলামের ইতিহাসের মহাসমুদ্র ঘেটে কোনটা জোরালো, কোনটা হালকা, কোনটা যৌক্তিক, কোনটা অযৌক্তিক, কোনটা দলিল ভিত্তিক আর কোনটা গতানুগতিক আবেগ– তা পৃথক ও বিন্যস্ত করতে পারে তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ এরশাদ করেছেন "যারা সব কথা শুনে ভালোগুলোর অনুসরণ করে সে সব লোক তারাই যাদের আল্লাহ হেদায়েত দিয়েছেন এবং তারাই প্রকৃত জ্ঞানী" (৩৯ : ১৮)।

সেই সব মহান ব্যক্তিদের খেদমতের জন্যই প্রকৃতপক্ষে এই বই উপস্থাপনের প্রয়াশ। আশা করি আল্লাহ যেন বিভ্রান্তির আগেই আমাদের চোখ খুলে দেন, হেদায়েত দান করেন, অন্তরকে হেদায়েতের নুরের আলোকে উদ্ভাসিত করেন। সত্যকে আমাদের কাছে এমনভাবে সুস্পষ্ট করে দেন যাতে অসত্যের-অন্যায়ের মিথ্যার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে। আমরা যেন অসত্য থেকে বাঁচতে পারি এবং আল্লাহ যেন আমাদেরকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করেন। অবশ্যই তিনি শ্রবণশীল ও প্রার্থনা কবুলকারী।

আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন, "কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিয়ুনী ইহবিব কুমুল্লাহ অইয়াগ ফিরলাকুম জুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহিম"। (সুরা আল-ইমরান, আয়াত - ৩১)

অর্থাৎ হে আমার হাবিব (দ.) আপনি সমস্ত মানব মন্ডলীকে বলে দিন। যদি তারা আমার ভালোবাসা পেতে চায় তবে আমার হাবিব (দ.) কে যেন অনুসরণ করে তবেই তাদের সমস্ত পাপ মোচন করা হবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে রসুল প্রেমই ঈমানের ভিত্তি। অন্য কোন উপায়ে আল্লাহতা'লা সরাসরি ইবাদত গ্রহণ করেন না বা রসুল (দ.) এর মাধ্যম ছাড়া কোন গুণাহ মাফ হওয়ারও সুযোগ নেই। এই প্রেক্ষিতেই ঘোষণা করা হয়েছে তিনি মোমেনদের জন্য 'রাউফুর রাহিম' অর্থাৎ যারা রসুল-প্রেম অর্জন করতে পারবেন শুধু তারাই ঈমানদার হিসেবে বিবেচিত হবেন। রসুল (দ.) এর অনুসরণ করাও আল্লাহতা'লা অবশ্য পালনীয় ফরজ ঘোষণা করেছেন, এরশাদ করা হয়েছে, 'কুল আতিউল্লাহা অর রাসুলা ফা ইন তায়াল্লাও ফাইন্নাল্লাহা লা– ইউহিব্বুল কাফিরীন" অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (দ.) আপনি বলিয়া দিন আমাকে (আল্লাহকে) আনুগত্য করতে হলে আমার রসুলকে যেন আনুগত্য করে অন্যথায় আল্লাহ কাফেরদের ভালোবাসেন না। (আল ইমরান, ৬ ঃ ৩২)

এই আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, যারা মুহাম্মদ (দ.) এর আনুগত্য ব্যতীত সরাসরি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চায় তারা কাফের। এই কারণেই সকল প্রকার মতবাদ ও চিন্তাধারা ভ্রান্ত ঘোষণা করে চূড়ান্তভাবে রসুল (দ.) এর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন "মায়তেরির রাসুলা ফাকাদ আতায়াল্লাহ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি রসুল (দ.) কে অনুসরণ

করিবে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহকে অনুসরণ করিল।"

অতএব পৃথকভাবে আল্লাহর আনুগত্য গ্রহযোগ্য নয়। রসুল (দ.) এর আনুগত্য ব্যতীত যারা আল্লাহর সাথে সরাসরি যোগাযোগের ব্যর্থ চেষ্টা করে তারা কাফেরেরই নামান্তর। এক কথায় রসুল (দ.) এর আনুগত্যই হলো আল্লাহর আনুগত্য, রসুলের নির্দেশাবলী পালন করাই হলো আল্লাহর আদেশাবলী অনুসরণ করা। রসুল (দ.) যেহেতু ওহি ব্যতীত কোন কথা বলতেন না, যেহেতু তার আদেশাবলীই হলো আল্লাহর আদেশাবলী, এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে হুজুর আকরাম (দ.)কে অনুসরণ কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আশেকে রসুল (দ.) হয়। রসুলের সান্নিধ্য বা দিদার ব্যতীত আল্লাহর দিদার পাওয়া যাবে না। রসুলের দিদার পেতে হলে তাকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসতে হবে। সে জন্যই হুজুর (দ.) ফরমাইয়াছেন–

লা-ইউমেনুনা আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা এলাইহি মিন অলিদিহী আন্নিনাছে আজমায়ীন। (বোখারি)।

অর্থ : তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে তোমাদের ছেলে সন্তান তথা বস্তু জগতের যাবতীয় কিছু এমন কি তোমাদের জীবন থেকে অধিক ভালোবাসিবে।

রসুলের (দ.) মর্যাদা সম্পর্কে মহানবি (দ.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, "মান আহাব্বানি ফকাদ আহাব্বাল্লাহ মান আতায়ানি ফা-কাদ আতায়াল্লাহ, মান রা আনি ফাকাদ রা অলেদিহি হক। (বোখারি)

অর্থ : যে আমাকে ভালোবাসল, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহকেই ভালোবাসল। যে আমাকে আনুগত্য করল নিঃসন্দেহে সে আল্লাহরেই আনুগত্য করল। যে আমাকে দেখেছে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহকেই দেখেছে।" এই হাদিসের আলোকে যাদের রসুল প্রেম অর্জন হয়েছে তারাই পরিত্রাণ পাবে। মনে রাখতে হবে যারা তাঁকে শুধু মানব বা মহামানব বলে থাকে তাদের রসুল প্রেম অর্জন হতে পারে না। কেননা একজন মানুষের প্রতি একজন মানুষের শ্রদ্ধা কতটুকুই বা হতে পারে কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত রসুল (দ.) কে মানবের উর্ধ্বে মর্যাদা না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রতি অবিচ্ছিন্ন প্রগাঢ় সৌহার্দ অর্জন হতে পারে না। এই অপার্থিব প্রেমের কেন্দ্র বিন্দু রসুল (দ.) আরো বলেছেন, "আমি তোমাদের আকৃতির মতোও নই, এবং তোমাদের প্রকৃতির মতোও নই।"

হজরত মুহাম্মদ (দ.) ছিলেন একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ এবং একই সাথে একজন পার্থিব কর্মকান্ডের শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান। এ জন্য প্রথম থেকে ইসলাম একই সাথে ধর্মীয় অনুশাসন ও আর্থ-সামাজিক আন্দোলন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এটা মূলত: ধর্মীয় এ জন্য যে মুহাম্মদ (দ.) ছিলেন মানবজাতির প্রতি আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেবার জন্য আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত। আবার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি ছিলেন রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের নীতি নির্ধারক, বিধান দাতা, আইনের ব্যাখ্যাকারী ও আইন প্রয়োগ তথা বাস্তবায়নকারী। এ কারণেই মুহাম্মদ (দ.)কে সমাজের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ডে কেন্দ্রীভূত বা কোন কাজ থেকে বাদ বা বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয় বা উচিতও নয়। অর্থাৎ আধুনিক পরিভাষার ন্যায় ধর্ম ও রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সমাজনীতি কোনক্রমেই আলাদা নয়। বরং ইসলাম ধর্মের অর্থই হচ্ছে পার্থিব সকল কর্মকান্ড ঐশি নির্দেশের অধীন। এ ব্যাপারে কারো যেন কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব না থাকে সে কারণেই পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

আল্লাহ ও তাঁর রসুল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর কোন মুমিন নারী/পুরুষের নিজেদের ব্যাপারে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আর থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের নাফরমানি করবে সে প্রকাশ্য গোমরাহিতে লিপ্ত হয়ে যাবে। (আল আহজাব-৩৬)।

এই আয়াতে আল্লাহ ও রসুলের নির্দেশ বা সিদ্ধান্তের বিষয় কেবল ধর্মীয় বলে নির্দিষ্ট করা হয়নি বরং তার মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সব ধরনের বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত। আর এখানে আল্লাহ ও রসুল কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদানের পর মুমিন নারী-পুরুষের আর কোন অধিকারই থাকে না যে তারা নিজেরা কোন ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ সিদ্ধান্ত কেউ এককভাবে গ্রহণ করুক অথবা সম্মিলিতভাবে নেয়া হোক। তারপর বলা হয়েছে যে ব্যক্তি এর বিরুদ্ধাচারণ করবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহ যা বলেছেন এবং তাঁর রসুল যা করেছেন বা করতে বলেছেন তা উপেক্ষা করে যদি মানুষ আপন ইচ্ছা ও বুদ্ধি অনুযায়ী কোন পন্থা অবলম্বন করে তাহলে সে গভীর বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে।

নবুওত ও রেসালতের সুকঠিন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই আল্লাহর হেদায়েত নিহিত। তাই এই ধারা কেয়ামত পর্যন্ত চালু রাখার প্রয়োজনে প্রত্যেক যুগেই নবি রসুলগণ মানুষের পথ প্রদর্শন করার জন্য তাদের ওপর প্রদত্ত খোদার বিশেষ অনুগ্রহ তাঁদের পরিবারের মধ্যে চির বহমান রাখতে এবং বংশধরদের মধ্যে প্রবাহিত করে দেয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। নবিদের বংশধরদের জন্য তাঁদের দোয়ার কথা, আল্লাহ যেন নবির পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে নবুয়তি ক্ষমতা অব্যাহত রাখেন, কোরআনের বিভিন্ন স্থানে তা বারবার উল্লেখিত হয়েছে। এ সমস্ত দোয়ার জবাবে কোরআনে তাঁদের বংশধরদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ অনুমোদনের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এই অনুগ্রহগুলো হচ্ছে যে, যেন তাঁরা তাঁদের পিতা-পূর্ব পুরুষদের আদর্শ সমুন্নত রাখতে পারেন, পিতাদের ধর্ম নিষ্ঠার যথাযথ প্রতিরূপ (Model, Represent, Replace, Act in the same manner) হতে পারে এবং সমস্ত নবির প্রদর্শিত সত্য পথ আঁকড়ে থাকতে পারে। নবিদের বংশধরদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কথা প্রকাশের জন্য পবিত্র কোরআনে চারটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে ? জুররিয়া, আল, আহল ও কুরবা।

‘জুররিয়া’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে সন্তান-সন্ততি, উত্তর পুরুষ বা প্রত্যক্ষ বংশধর যা কোরআনের বত্রিশটি আয়াতে উল্লেখিত আছে। এটা ব্যবহৃত হয় নবিদের আপন উদ্বেগ সম্পর্কে যে তাঁদের সন্তানরা যেন তাঁদের পথে অবিচল থাকে কিংবা পথ প্রদর্শনের কাজ যেন সরাসরি তাঁদের বংশধরদের মাধ্যমেই চলতে থাকে। মাঝে মাঝে যে সব আয়াতে নবিরা দাবি করেছেন যে তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত সঠিক পথের নিদর্শন হয়েছেন, নবিদের সরাসরি বংশধর হবার কারণে, সেখানেও এ জুররিয়া শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। আপন বংশধরদের প্রতি নবিদের এ উদ্বেগ প্রতিফলিত হয় এই আয়াতে (২ : ১২৪)। সেখানে আল্লাহ ইব্রাহিমকে বলেছিলেন “আমি আপনাকে ইমাম নিযুক্ত করব”। আর সাথে সাথে ইব্রাহিম (আ.) আবেদন জানালেন– “আর আমার বংশধরদের (জুররিয়ার) কি হবে ? আল্লাহ জবাব দিলেন, আমার প্রতিশ্রুতি অন্যায়কারীদের প্রতি প্রযোজ্য হবে না।” অনুরূপভাবে সুরা হুদের ৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ? .... হে আমার পরওয়ারদিগার! আমার পুত্র তো আমার

পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত। আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য, ... । আল্লাহ বলেন– “হে নুহ সে (আপনার পুত্র) পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না যার

খবর আপনি জানেন না .....। পক্ষান্তরে রসুল (দ.) এর সাথে জন্মগতভাবে কোন সম্পর্ক না থাকা সত্তেও হজরত সালমান ফারসি (রা.)কে তিনি আহলে বায়াত হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং আয়াতে মোবাহেলার সময় তাঁকে তাঁবু বাঁধার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

অপর একটি আয়াতে (১৪ : ৩৭) ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন,– "হে আমার প্রভু আমি আমার কয়েকটি সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের পাশে একটা উষর উপত্যকায় বসবাস করতে পাঠিয়েছি। হে আমার প্রতিপালক! এজন্য যে তারা যেন নিয়মিত নামাজ কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও, এবং ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করো, যাতে ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"

এই মুনাজাতের ইতিবাচক জবাব দিয়েছেন আল্লাহ এই বলে (১৯ : ৫৮) নবিদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে, "আদমের বংশধর ও যাদেরকে আমি নুহের সাথে নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম, তাদের বংশভূত ও যাদেরকে আমি পথ-নির্দেশ করেছি ও মনোনীত করেছি।"

নবিদের বংশধর বা যারা খোদার বিশেষ অনুগ্রহও হেদায়েত লাভে নবিদের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন সে সম্পর্কিত আয়াতে একই পিতার বংশধর একজন ব্যক্তির পরিবার বা রক্ত দ্বারা সম্পর্কিত হিসেবে নিকটের বা নিকটতম আত্মীয় অর্থে 'আল' শব্দটি কোরআনে ছাব্বিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) এর পরিবার সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে– "নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নুহ, ইব্রাহিমের পরিবার ও ইমরানের পরিবারকে সমস্ত মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"

তফসির কারকেরা প্রত্যেকে এখানে ইব্রাহিমের পরিবার বলে মুহাম্মদ (দ.) যে ইব্রাহিমের পরিবারভুক্ত তাই ইংগিত করা হয়েছে বলে সর্বসম্মত ব্যাখ্যা করেছেন।

আবার অন্য একটি আয়াতে (৪: ৫৪) আমরা পাই– "তারা কি লোকদের আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে যা দিয়েছেন সেজন্য হিংসা করে ? কিন্তু কার্যত আমরা ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধরকে (আলে ইব্রাহিম) মহাগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা প্রদান করেছি আর আমরা তাঁদেরকে এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী করেছি।

'আহল' শব্দটি, যা কোরআনে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে, তা প্রায় 'আল' শব্দটিরই সমার্থবোধক, যদিও এটি একটা শহর বা জনপদ, একটা দল বা অনুসারী ইত্যাদি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন এটি 'বায়াত' শব্দটির সাথে সংযোজক অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় : আহল আল-বায়াত এর অর্থ দাঁড়ায় একই পরিবারের নিকটতম বংশধর অথবা একই ব্যক্তির পরিবার, বা বায়াত। আহল আল-বায়াত এই সংযোজিত শব্দটি কোরআনে বিশেষভাবে মুহাম্মদ (দ.) এর সরাসরি পরিবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনের (৩৩ : ৩৩) আয়াতে উল্লেখ আছে, "আর আল্লাহ চান যে মুহাম্মদ (দ.) এর পরিবারের সদস্যবৃন্দ (আহলাল বায়াত) তোমাদের থেকে সমস্ত অপবিত্রতা দূর করে দিতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরুপে পরিশুদ্ধ করতে।"

কোরআনের তফসিরকারকদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী এই আয়াতে আহল আল বায়াত বলতে মুহাম্মদ (দ.) এর কন্যা ফাতিমা, তাঁর চাচাত ভাই ও জামাতা আলী (আ.) এবং তার দুই পুত্র হাসান (আ.) ও হোসাইন (আ.) ও তৎপরবর্তী বংশধরকে বুঝানো হয়েছে।

চতুর্থ পরিভাষা কুরবা (মূল শব্দ কারুবা যার অর্থ নৈকট্য, অর্থাৎ নিকট বা রক্তের দ্বারা সম্পর্কিত আত্মীয় বা জ্ঞাতি। আহল আল-বায়াত এর মতো "কুরবা" শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষভাবে মুহাম্মদ (দ.) এর নিকটতম আত্মীয় প্রসঙ্গে। এ সম্পর্কে কোরআন (৪২: ২৩) বলছে "এ সুসংবাদই আল্লাহ দেন ত্াঁর বান্দাদেরকে যারা বিশ্বাস করে সৎকর্ম করে। বল হে রসুল (দ.) আমি এর (নবুওতের দাওয়াতের) জন্য তোমাদের নিকট হতে (আমার) নিকট আত্মীদের প্রতি অবিচ্ছিন্ন প্রগাঢ় সৌহার্দ– 'প্রাণাধিক ভালোবাসা' ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতেও তফসিরকারকেরা আবারো একমত যে 'কুরবা' শব্দটি মুহাম্মদ (দ.) এর নিকটতম আত্মীয় -ফাতিমা, আলী, হাসান ও হোসাইন (আ.) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদিস শরিফে রেওয়াত আছে যে, রসুল (দ.) ফরমালেন যখন আল্লাহপাক আদম (আ.) কে পয়দা করলেন, তাঁর ওজুদে রুহ প্রবেশ করালেন তখন তিনি চোখ খুলেই পাঁচটি মুখমন্ডল দর্শন করলেন। তখন আদম (আ.) আশ্চার্যান্বিত হয়ে নিবেদন করলেন ইঁহারা কে যাদের মুখায়ব আমারই মতো দেখছি। আল্লাহতা'লা ফরমালেন এই পানজেতন পাক

তোমারই খানদান হতে আগমন করবেন কিন্তু তাঁরা তোমার ন্যায় মাটি থেকে উদ্ভুত হবেন না বরং সৃষ্টি হবেন আল্লাহর নুর হতে। কুল কায়েনাতকে রূপ দিয়েছি এঁদেরই কারণে তাদের নামকরণ করেছি আমারই নাম হতে। আমি আমার ইজ্জতের কসম করে বলছি যদি কেহ এঁদের প্রতি সামান্যতম অসম্মান, হিংসা, ঘৃণা নিয়ে আসে তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে দোজখে নিক্ষেপ করব। এঁরা আমার মনোনীত, পছন্দকৃত, নেয়ামত প্রাপ্ত এবং এঁদের জন্যই আমি ক্ষমা করব, আশিস বর্ষণ করব অগণিত জনকে, যদি তুমি বা তোমার বংশের কেহ দুঃখে, কষ্টে, মুসিবতে পড়ে তবে আমাকে সন্ধান করো এঁদের উছিলায়। (আলে রসুল, আলে মুহাম্মদ, আহলে বায়াত, পাঁচ পির) উল্লেখ্য হজরত আদম (আ.) তিনশত বৎসর কান্নার পর এঁদের উছিলায় আল্লাহতা'লার ক্ষমা লাভ করেন।

নবিদের পরিবারের জন্য বিশেষ অনুগ্রহের আবেদন ও তা মনঞ্জুর হওয়া উল্লেখিত হয়েছে, কোরআনে এমন আয়াতের সর্বমোট সংখ্যা একশতকেও ছাড়িয়ে যায়। এ থেকে আমরা দুটো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এক : এটা তর্কাতীত যে নবি পরিবারের পবিত্রতা কিয়ামত পর্যন্ত একটি স্বীকৃত ব্যাপার। তাই এই পরিবারের সদস্যগণই প্রকৃতপক্ষে অন্যদেরকে পরিশুদ্ধতা দান করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব। দুই : গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, আহলে বায়াত সম্পর্কে কোরআনে ক্রমাগত পুনারাবৃত্তির মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে আবশ্যিকভাবে ও সঠিকভাবেই এই ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যে রসুল (দ.) এর ওফাতের পর তারাই ইসলাম ধর্মের প্রকৃত সংরক্ষণকারী। এবং তাঁদের মাধ্যমেই হেদায়েতের কার্যক্রম কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

পবিত্র কোরআনে উক্ত আয়াত সমূহের সাথে পূর্ণ সংগতি রেখেই হজরত মুহাম্মদ (দ.) ঘোষণা করেছেন : "ইয়া আয়ু হান্নাছু ইনি তারাকতু ফিকম মা-ইনআখাজতুম লান তাদিল্ল বায়াদি আউয়ালু হা কিতাবাল্লাহি-অ-এ তরাতি আহলি বায়াতি"। (বিদায় হজের ভাষণ, ১৮ জিলহজ)

অর্থ "হে মানবমন্ডলী আমি তোমাদের নিকট যাহা রাখিয়া যাইতেছি তাহা যদি আঁকড়িয়ে থাক, তবে পথভ্রষ্ট হইবে না। –প্রথমটি আল্লাহর কিতাব দ্বিতীয়টি আমার আহলে বায়াত। সুতরাং আহলে বায়াতই হলো বিশ্বের মানবের পরিত্রাণের কেন্দ্রবিন্দু। তারাই কোরআন ও হাদিসের প্রকৃত অনুসরণকারী। রসুল (দ.) তাঁর নবুয়তের অনন্ত জ্ঞানে জানতেন যে, তাঁর ওফাতের পর স্বার্থন্বেষী মহল পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা করবে, রসুল (দ.) এর নামে অগণিত ভুল ও ভূয়া হাদিস প্রচার করবে। তাছাড়া ধর্মের 'জীবন্ত প্রতিচ্ছবি' না থাকলে শুধুমাত্র কাগুজে বই-পুস্তকের মাধ্যমে কোন আদর্শ বিশেষ করে কোন ধর্ম টিকে থাকতে পারে না। তাই পবিত্র কোরআনের সাথে সাথে 'জীবন্ত দ্বীন' বা কোরআন তথা "কোরআনে নাতেক" অপরিহার্য। এ কারণেই আহলে বায়াত হতে প্রাপ্ত পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা ও এঁদের বর্ণনাকৃত হাদিসই সঠিক ও নির্ভুল। রসুল (দ.) আরো এরশাদ করেছেন: "ইল্লা ইন্না মিছলু আহলি বায়াতি ফিকুম মিছলু কাছ ছাফিনাতিনি নুহু ফামান রাকেবাহা ফা-নাজ্জা অ-মান তাখাল লাফাআনহা হালাকা ওয়া গারাকা।"

অর্থ : তোমাদের মধ্যে আমার আহলে বায়াত নুহ (আ.) এর কিস্তি স্বরূপ। যে ব্যক্তি উক্ত কিস্তিতে আরোহন করবে সেই মুক্তি পাবে। যে ইহার বরখেলাপ করবে সেই ধ্বংস ও নিমজ্জিত হবে।

ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যা মানবজাতির গোটা জীবনকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করে। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বস্তুগত, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, চিন্তা ও মতাদর্শগত যাবতীয় সমস্যা ও বিষয় ইসলামের আওতায় এসে যায় এবং তা মানুষের গোটা কর্মময় জীবনকে বেষ্টন করে নেয়। কিন্তু আজ ইসলাম বিকৃত হয়ে কতিপয় বিক্ষিপ্ত আকীদা-বিশ্বাসের নাম 'ইসলাম' হয়ে গেছে যার সাথে বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। বরং মনে করা হচ্ছে যে, এ ধরনের অনুভূতি ও বিশ্বাস থাকাই যথেষ্ট। ইসলাম বিরোধী পরিবেশে জীবন যাপন করেও তারা এই পরিবেশকে অপছন্দ করছে না, ফলে তা পরিবর্তন করার চেষ্টাও করছে না, বরং যদি তলিয়ে দেখা যায়, তবে ইসলামের সাথে একজন আধুনিক মুসলমানের জীবনের সমগ্র কর্মকান্ডের কোন সংগতি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার শিষ্টাচার ও রীতিনীতি অইসলামি, তার চিন্তা চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম বিরোধী, ওপরন্তু তার দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলীর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। মুসলমানদের ব্যক্তিগত ব্যাপারই হোক অথবা সমষ্টিগত সম্পর্ক বা রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক অথবা সরকারের সাথে কর্মচারীর সম্পর্ক সবই ইসলাম বিরোধী।

মুসলমানদের মনে এরূপ ধারণা কিভাবে জন্ম নিলো, যে তারা প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং ধর্ম প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য উপেক্ষা করে জিনিসপত্রে ভেজাল মেশাতে পারে, মিথ্যা

বলতে পারে, বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে, মানুষকে ধোকা দিতে পারে ও আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব থেকে বেপরোয়া হয়েও মুসলমান থাকতে পারে বলে মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

জুলুম, নির্যাতন, খোদাদ্রোহিতা ও গোনাহের ওপর প্রতিষ্ঠিত কার্যত ধর্মহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমে সহযোগিতা করার পরও, তারা শুধু মাত্র দুই একটি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আদায় করে এই ধারণা করতে থাকে যে, আল্লাহতা'লা তাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা থেকে তারা মুক্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে পূর্ণ ঈমানদার মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করবেন।

একইভাবে মুসলিম মহিলারা কি করে এরূপ ধারণা করতে পারে যে তারা নিজেদের "রবের" প্রত্যক্ষ নির্দেশ লঙ্ঘন করে এবং তার পক্ষ থেকে সোপর্দ করা আমানতের খেয়ানত করে, অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় নেমে প্রতিটি কামুক চোখ ও পাশবিক প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করতে প্ররোচিত করে। আর তারা ধারণা করতে থাকে, ইসলামি জীবন-যাত্রা নির্বাহ করার কোন দায়িত্বই তাদের নেই। এই দায়িত্ব তার নিজের ব্যক্তিগত কর্মধারাকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে হোক, বা নিজের সন্তানদের ইসলামি শিক্ষা দেওয়ার সাথে জড়িত হোক। সে তার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যে সমাজ-ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, যা প্রত্যক্ষভাবে খোদাদ্রোহিতা, জুলুম ও গুণাহর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এর পরেও সে ধারণা করতে পারে যে, তার অন্তরের কোন গভীর কোণে নিহিত তার সৎ উদ্দেশ্যের কারণে আল্লাহর কাছে নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত সাব্যস্ত হবে এবং তাকে প্রকৃত মুসলমানদের মধ্যে সামিল করে নেয়া হবে।

মুসলমানদের মনে এই অদ্ভুত চিন্তাধারা কোথা থেকে এলো যা দাবি করে যে, সামাজিক সংগঠন ও অর্থনীতির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই ? ব্যক্তির এবং সমাজের মধ্যকার অথবা ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মের কি যোগসূত্র ? বরং মানুষের বাস্তব জীবনের কর্মধারার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। পোশাক-পরিচ্ছেদের সাথে বিশেষ করে মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছেদের সাথে ধর্মের কোন যোগসূত্র নেই। অনুরূপভাবে শিল্পকলা, সাংবাদিকতা এবং রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশনের সাথেও ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ দুনিয়ার এ সকল পার্থিব কর্মকান্ডের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। ধর্ম ও জীবন যাত্রা দুটি ভিন্ন জিনিস। অথচ প্রায় সকল মুসলমানই বলে আমরা কলেমায় বিশ্বাসী। আমাদের আল্লাহ এক, রসুল (দ.) আমাদের নবি, কোরআন আমাদের জীবন-বিধান, আমরা ইসলামের হুকুম আহকামে বিশ্বাস করি। নামাজ পড়ি, রোজা করি, হজ করি, ধনীদের কেহ কেহ জাকাতও দেয়। এদের সকলে নিজেদের সত্যপন্থী বলে দাবি করেন। যদিও সকলে সম্মিলিতভাবে ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত। কিন্তু সবাই স্ব-স্ব মতের ওপর শ্রদ্ধাশীল নিজেদের মতো ও পথকেই একমাত্র সঠিক দাবি করে অন্য সবাইকে বিভ্রান্ত, পথহারা পথভ্রষ্ট, মুনাফেক, বা কাফের বলে আখ্যায়িত করছে। তাই কে সঠিক কে বেঠিক সত্য মতো ও পথের ওপর অধিষ্ঠিত আছে তা একটি গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে আল্লাহ নবির বংশকে মুসলমানদের কাছে আমানত রেখেছেন। শুধু আমানত নয়, তাঁদের ভালোবাসতে হুকুম জারি করেছেন। নবির বংশ ও আল কোরআন একে– অপরকে ছাড়বে না। অপর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না। অতএব, তাঁরা ব্যতীত আর কেউ কারো অনুসরণীয় নয়। এঁদেরই মুখাপেক্ষী থাকতে হবে, এঁদের প্রতি সালাতের চূড়ান্ত অংশে দরুদ শরিফ প্রেরণ নামাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য যে, আরব মরুতে হজরত মুহাম্মদ (দ.) মানবজাতির উদ্ধারের লক্ষ্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে যে মহান বিপ্লব সাধন করেন, তাঁর ওফাতের পর পরই কৌশলী প্রতি বিপ্লবীরা এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে, ধীরগতি কূট-কৌশলের সাহায্যে গোত্রীয় আক্রোশ ভরে আহলে বায়াতকে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড তথা ধর্মীয় নেতৃত্বের খোদা প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। অথচ এই সব কার্যকলাপের হোতাদের কর্মকান্ডের সামান্যতম সমালোচনাও করতে দেওয়া হয় না। তাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকেরা শুধু ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। কোন চরিত্রেরই বিচার বিশ্লেষণ প্রকৃত ধর্মমত অনুযায়ী করতে অগ্রসর হননি। এর সত্যাসত্য, বিচারকারী প্রায় সকলকেই সত্য বলার অপরাধে দন্ডিত বা নিন্দিত হতে হয়েছে। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রা.), হজরত ইমাম জাফর সাদেক (রা.), ইমাম আলী রেজা (রা.), হজরত ইমাম আবু হানিফা (রা.), ইমাম হাম্বল (রা.), ইমাম শাফেয়ী (রা.), ইমাম মালেক (রা.) সত্য ইসলাম প্রকাশের জন্য চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধান ও প্রকৃত ইসলাম কি তার গবেষণার ফসল হচ্ছে, এই গ্রন্থ **'আহলে বায়াতই ঈমানের ভিত্তি'**। এটি একটি গবেষণা কর্ম। যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো প্রকৃত ধর্মের সংজ্ঞা ও সামাজিক গুরুত্ব, ঈমান, কলেমা তাইয়েবার তাৎপর্য, রেসালাত, নবুওয়াতের উত্তরাধিকার, উমাইয়া আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের ব্যাপক বিচ্যুতির অনুসন্ধান। আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে, রসুল (দ.) তাঁর পবিত্র জবানিতে 'আহলে বায়াত'কে যে মানব সমাজের সকল কর্মকান্ডের নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ মানবিয় বুদ্ধিজনিত দুর্বলতার কারণে সেই ঐশি নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করে মুসলিম সমাজে এক নতুন ধরনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। এই প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে মুসলিম সমাজে নেতৃত্বের উত্তরাধিকারের সংকট, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক ভারসাম্যহীনতা, দুর্নীতি, নৈতিক অবক্ষয়, দারিদ্র, রক্তপাত, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, হানাহানি ক্রমাগত ও অব্যাহতভাবে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর আকার ধারণ করে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তাই এ সমস্যা উত্তরনের একমাত্র ঐশি পদ্ধতি হলো আহলে বায়াত এর সেই নেতৃত্বকে সমাজে পূর্ণগৌরবে পুন প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমেই রয়েছে সকল মানবিয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান, এটাই যুগের দাবি, ধর্মের দাবি তথা মানবতার দাবি। আহলে বায়াতকে আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই রয়েছে বিশ্ব শান্তির চাবি কাঠি বা সকল সামাজিক বৈষম্যের, অনাচারের সঠিক সমাধান।

মনে রাখা প্রয়োজন, এই পুস্তকে যে সমস্ত তত্ত্ব, তথ্য, মতবাদ, যুক্তি পর্যালোচনা করা হয়েছে, তা কোন অভিনব মতো বা তথ্য নয়। বরং যে কোন প্রামাণ্য পুস্তকে এ সকল তথ্যাদি বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। আলোচ্য বইতে এ ধরনের তথ্য প্রমাণাদি সংকলিত করে সেগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে কোরআন, হাদিস, ইতিহাস, ধর্ম, ন্যায় ও যুক্তির আলোকে বিন্যস্ত, বিশ্লেষণ ও একত্রীভূত করে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা নির্দেশ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। যাতে করে এটা বিশ্ব মানবতার জন্য হেদায়াত ও আমার নাজাতের উছিলা হয়।

এই পুস্তকে লিখিত কোন বক্তব্যে পাঠক যদি একমত না হতে পারেন দয়া করে গভীর আন্তরিকতার সাথে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ.) এর নিকট সাহায্য চাইলে অবশ্যই তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্যপথে চলার তৌফিক দান করুন। 'আমিন' সুম্মা আমিন।

এই বই 'লিখার ব্যাপারে আমি অগণিত লোকের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে ঋণী। আল্লাহতালা তাদেরকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করুন।

তবে যাদের নাম উল্লেখ না করলে তাঁদের ওপর ও নিজের ওপর অবিচার করা হবে তারা হলেন–

সর্বজনাব মঞ্জুর আলম কাদেরি
ডা. এম, আর, খান
এ, কে, এম আহসান উল্লাহ চৌধুরী
খোন্দকার আমজাদ আলী
আহমেদ আবুল কাশেম
আলহাজ কামাল উদ্দিন চৌধুরী
এ, এম, সানোয়ার হোসেন
কে, এম, মোয়াজ্জেম হোসেন
আজিজুল হক ভূঞা
সৈয়দ ফরহাদ উদ্দিন আহমেদ
গোলাম মর্তুজা
সাইফুদ্দিন খালেদ খান
আমানত উল্লাহ
নুরুল আমিন
সালমা বেগম
মো. আবুল কালাম
জনাব মান্নান শিকদার
মো. আলেক জান্ডার
চৌধুরী মুহাম্মদ শাহবুদ্দিন বাবর
সৈয়দ লিয়াকত আলী
মুহাম্মদ ছলিম উল্যা

হজরত আলী (আ.)-এর উদ্দেশ্যে প্রিয় নবি (দ.)-এর অসিয়ত

মূল : আল্লামা আবুল ফজল আবদুর রহমান সুয়ূতী (র.)

অনুবাদ : মুহাম্মদ রিজাউল করিম ইসলামাবাদী

খলিফা ইব্‌নে জাফর মুহাম্মদ (র.) আলী ইবন আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হজরত আলী (আ.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন,

১। হে আলী, মুসা (আ.)-এর কাছে হারুন (আ.)-এর মর্যাদা যেরূপ আমার কাছেও তোমার মর্যাদা সেরূপ। তবে আমার পর আর কোন নবি নেই। আমি তোমাকে কিছু অসিয়ত করি। যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে তুমি বেঁচে থাকবে সুখি ও সৌভাগ্যবান হয়ে। আর তোমার মৃত্যু হবে শহিদ অবস্থায়। কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক তোমাকে তুলবেন ফকিহ্ ও আলেম রূপে।

২। আলী, মুমিনের আলামত তিনটি : ১. সালাত, ২. ইবাদতে রাত জাগা ও ৩. সাদাকা করা।

৩। আলী, মুনাফিকের আলামত তিনটি : ১. সে মানুষের সামনে সালাত আদায় করে মনোযোগী হয়ে, ২. একা সালাত আদায় করলে তখন সে অমনোযোগী হয়ে তড়িঘড়ি সালাত আদায় করে, ৩. মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ করে কিন্তু নির্জনে তার প্রতিপালককে সে ভুলে যায়।

৪। আলী, জালেমের আলামত তিনটি : ১. শক্তি দিয়ে দুর্বলের ওপর কর্তৃত্ব করে, ২. লোকের ধন-সম্পদ জুলুম করে ছিনিয়ে নেয় ও ৩, খাদ্য বস্তুতে হালাল-হারামের পার্থক্য করে না।

৫। আলী, হিংসুকের আলামত তিনটি : ১. সামনে চাটুকারী করে, ২. পিছে গীবত করে ও ৩. দুঃখের সময় আনন্দিত হয়।

৬। আলী, মুনাফিকের আলামত তিনটি : ১. সে মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা ভঙ্গ করে ও ৩. আমানতের খেয়ানত করে। আর উপদেশে তার কোন উপকার হয় না।

৭। আলী, অলসের কয়েকটি আলামত রয়েছে : ১. সে আল্লাহর ইবাদতে অলসতা করে, ২, সালাত এত বিলম্বে আদায় করে যে, তার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, ৩. অপচয় ও ক্রুটি করে।

৮। আলী, তাওবাকারীর আলামত তিনটি : ১. হারাম থেকে পরহেয় করা, ২. জ্ঞানানুসন্ধানে ধৈর্য ও ৩. সে কখনো পাপের দিকে ফিরে যায় না। যেমন– দোহা দুধ পুন বাটে প্রবেশ করে না।

৯। আলী, জ্ঞানী লোকের আলামত তিনটি : ১. দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করা, ২. সহিষ্ণু হওয়া ও ৩. বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ।

১০। আলী ধৈর্যশীলগণের আলামত তিনটি ? ১. যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে, ২. যে তাকে বঞ্চিত করে তাকে সে দান করে ও ৩. যে তার প্রতি জুলুম সে তাকে অভিশাপ দেয় না।

১১। আলী, আহমকের আলামত তিনটিঃ ১. আল্লাহর ফরজ ইবাদতে অবহেলা করা, ২. আল্লাহর জিকির ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বলা ও ৩, আল্লাহর বান্দাদের ক্রুটি বের করা।

১২। আলী, সৌভাগ্যবান ব্যক্তির আলামত তিনটিঃ ১. হালাল খাওয়া, ২. জ্ঞানীদের সঙ্গে বসা ও ৩. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ইমামের সঙ্গে আদায় করা।

১৩। আলী, হতভাগ্য লোকের আলামত তিনটি : ১. হারাম খাওয়া, ২. ইলম থেকে দূরে থাকা ও ৩. একা একা সালাত আদায় করা।

১৪। আলী, নিষ্ঠাবান ব্যক্তির আলামত তিনটি : ১. সে আল্লাহর ইবাদতে অগ্রগামী হয়, ২. আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ ও বস্তু থেকে বিরত থাকে ও ৩. যে তার সাথে দুর্ব্যবহার করে সে তার সাথে সদ্ব্যবহার করে।

১৫। আলী, মন্দ লোকের আলামত তিনটি ? ১. সে আল্লাহর আনুগত্য ভুলে যায়, ২. আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দেয় ও ৩. যে তার উপকার করে সে তার অপকার করে।

১৬। আলী, সৎ লোকের আলামত তিনটি : ১. সৎকালের মাধ্যমে যে তার ও লোকের মধ্যকার সম্পর্ক ভাল করে, ২. পরহেজগারী মাধ্যমে পাপ থেকে বেঁচে থাকে ও ৩. নিজের জন্য যা বা পছন্দ করে, অন্যের জন্য তা পছন্দ করে।

১৭। আলী, মুত্তাকির আলামত তিনটি : ১. সে অসৎ সঙ্গ বর্জন করে, ২. মিথ্যা বলে না ও ৩. হারাম থেকে বাঁচার জন্য অনেক হালালকেও ত্যাগ করে।

১৮। আলী, ফাসিক ব্যক্তির আলামত তিনটি : ১. দুর্বলের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা, ২. অল্পতে তুষ্ট না হওয়া ও ৩. উপদেশ থেকে উপকৃত না হওয়া।

১৯। আলী, সিদ্দিক বা সত্যবাদী ব্যক্তির আলামত তিনটি: ১. ইবাদত প্রকাশ না করা, ২. গোপনে সাদাকা করা ও ৩. মুসিবত কারো কাছে প্রকাশ না করা।

২০। আলী, ফাসিক লোকের আলামত তিনটি : ১, ফাসাদ পছন্দ করা, ২. আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দেওয়া ও ৩. সৎ কাজ ও সত্যপথ থেকে দূরে থাকা।

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম ও সমাজ

ধর্ম বলতে বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা ও পাপ-পূণ্যাদি বিষয়ক বিশ্বাস এবং ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে অনুসৃত আচার-আচরণ, উপাসনা পদ্ধতি এবং সাংসারিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কিত কার্যাবলীকে বুঝায়।

কোন ব্যক্তি বা জাতির ধর্মমত সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সে বা সেই জাতির তথা মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে কোন ধারণা পোষণ করা সম্ভব নয়।

সৃষ্টিলগ্ন থেকে বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় কর্মকান্ড পর্যালোচনা করে বিচিত্র অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। কখনও দেখা যায় যে, তারা শিশুর মতো সরল, কখনও অসাধারণ মহৎ, কখনও অমার্জিত, কখনও নিষ্ঠুর, কখনও শান্তিপ্রিয় ও প্রেমপুত, কখনও চরম বস্তুবাদী, কখনও বৈরাগী, কখনও আত্মকেন্দ্রিক আবার বিশ্বজনীন, কখনও নির্বোধ আবার কখনও তত্ত্বজ্ঞানী।

বিভিন্ন ধরনের গবেষকগণ ধর্মকে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন বলে ধর্ম সম্পর্কে এত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

নৃতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানসমূহ পর্যালোচনা করে থাকেন। তাঁরা বলেন, ধর্ম মানবগোষ্ঠীকে এমন একটি বন্ধনে আবদ্ধ করে, যার ফলে তারা তাদের সমস্যা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা বা মতবাদ পোষণ করে। তাই ঐ জনগোষ্ঠী একই পদ্ধতিতে জীবন সংগ্রাম মোকাবিলা করে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানীগণ ধর্মীয় কর্মকান্ডের যে সব সামাজিক দিক আছে সে দিকেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। ধর্ম তার অনুসারীদের বিশ্ব সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করে, যার মাধ্যমে সে ব্যক্তিজীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে।

বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকদের নিকট ধর্মীয় তত্ত্ব ও তথ্যের সত্যাসত্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। বরং তারা ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাকে নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন। ধর্মের এ ধরনের বিশ্লেষণ এক ধরনের প্রবঞ্চনা। কারণ এরা মনে করে থাকেন যে, কোন ধার্মিক ব্যক্তি ধর্ম নিয়ে গবেষণা করতে অক্ষম। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একজন ধার্মিক ব্যক্তি নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসে স্থির থেকে ধর্মের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে পারেন। কিন্তু ধর্মের বিজ্ঞান সম্মত গবেষণায় ঐশি তাৎপর্যের কোন গুরুত্ব না দিয়ে ধর্মের ব্যবহারিক বা বাহ্যিক কার্যকলাপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়। ফলে ধর্মের অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য ও ঈশ্বরের প্রতি একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির আন্তরিক অনুভূতির প্রতি কোন রকম শ্রদ্ধাই দেখানো হয় না।

ঐতিহাসিকগণ ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে মানব সমাজে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয় তা বিশ্লেষণ করেন।

ধর্ম সম্পর্কে যেসব দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানে প্রচলিত আছে তা' পারস্পরিকভাবে সম্পূরক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং এক একটি মতবাদ ধর্মের খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি পেতে সাহায্য করে। অনেক সমাজতত্ত্ববিদ ধর্মকে শুধুমাত্র একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কার্ল মার্মাস ধর্মকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। সিগমন্ড ফ্রয়েড ধর্মকে যৌনতার আলোকে পর্যালোচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, তাদের চিন্তাধারা ধর্মের যে ব্যাখ্যা প্রদান করে, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চিন্তাবিদদের মধ্যে তা অজ্ঞাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐশি নির্দেশ অনুযায়ী মানবিয় কর্মকান্ডের রীতি, পদ্ধতি ও বিধি নিষেধ পর্যালোচনার নামই ধর্ম। যে ধর্ম মতে এই সামাজিক কর্মকান্ডের রীতি পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে, সেই ধর্মই অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সাধারণভাবে মানুষ যখন পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলা হয়। কিন্তু সমাজের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে সমাজের

সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মতো পোষণ করেছেন। সমাজ বিজ্ঞানীদের প্রদত্ত নিম্নবর্ণিত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে সমাজ ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়–

ম্যাকাইভার ও পেইজ (Maciver & Page) তাঁদের 'সোসাইটি' গ্রন্থে বলেছেন, "সমাজ হচ্ছে মানুষের আচার এবং কার্যপ্রণালী, কর্তৃত্ব, পারস্পরিক সাহায্য, বিভিন্ন সংঘ এবং বিভাগ, মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা– এসব কিছুর সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থা। এরূপ সদা পরিবর্তনশীল জটিল ব্যবস্থাকে আমরা সমাজ বলে থাকি। এটি নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কের প্রবহমান ধারা।"

সমাজ বিজ্ঞানী গিডিংস (Giddings) এর মতে, সমাজ হচ্ছে সাধারণ স্বার্থ প্রণোদিত এমন একটি জনসমষ্টি, যার সদস্যরা অভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

ঐশি নির্দেশের আলোকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণই ধর্ম :

মানুষ সামাজিক জীব। সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় নয়, প্রয়োজনের তাগিদেও তাকে সামাজিক পরিবেশে বসবাস করতে হয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ধারা ও রীতিনীতি রয়েছে যার অনুসরণে মানুষের আচার আচরণ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। যথেচ্ছা আচরণ কোন সমাজ ব্যবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত নয়। মানুষ যখন সামাজিক বিধি বহির্ভূত আচরণে লিপ্ত হয়, তখনই সমাজ জীবনে বিকৃংখলা দেখা দেয় এবং স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয়। সমাজে কৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিকৃংখলা, অনিয়ম, অনাচার, অস্বাভাবিক অবস্থা ও পরিস্থিতি দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত উপায় ও পন্থাই হচ্ছে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেইজ বলেছেন, যে উপায়ে সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সমাজকে সংরক্ষিত করে এবং পরিবর্তনশীল ভারসাম্য বজায় রেখে সামগ্রিকভাবে কাজ করতে পারে, তাকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে।

জোসেফ এস রাফক এর সংজ্ঞানুযায়ী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এমন কতগুলো সামাজিক মূল্যবোধ, আচার অনুষ্ঠান যা সামাজিক সংহতিকে দৃঢ় এবং মানুষের আচার আচরণকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে।

ব্রিয়াঅলি (Brearl) বলেন যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে কতগুলো পদ্ধতি ও সংস্থা, যার মাধ্যমে মানুষ শিক্ষিত হয় এবং যেগুলো অনুকরণে সে ব্রতী হয়।

সমাজ বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে মানব জীবনের বিশেষ অনুসরণ নীতি, যে অনুসরণ নীতি দ্বারা সমাজের মানুষের আচার-আচরণ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে সামাজিক সংহতি বজায় থাকে।

এই বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে সহজাত নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পিত বা উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, শাসনধর্মী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, আবেদনধর্মী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐশি নির্দেশের আলোকে সকল প্রকার সামাজিক নিয়ন্ত্রনের সম্মিলিত রূপই হচ্ছে ধর্ম।

আত্মনিয়ন্ত্রণ :

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কখনই কার্যকর হতে পারে না, যদি না ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন সমাজের নাগরিকগণ তাদের স্ব স্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন করে, তার মধ্যে ইতিবাচক গুণাবলী উন্নত করে এবং নেতিবাচক গুণাবলী পরিহার করতে যত্নবান হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি যতখানি স্বনিয়ন্ত্রিত হবে বা সুকৃঙ্খল বা সচ্চরিত্রবান হবে সেই সমাজই তত উন্নত আদর্শ সমাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সফলতা বা ব্যর্থতা যে কোন সামাজিক উন্নতির চাবিকাঠি। এসব অনুসন্ধান করতে হলে মানুষের সার্বিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

মানুষের সমগ্র সত্তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য একই সাথে বিরাজমান। একটি হচ্ছে তার পাশবিক সত্তা, অপরটি উজ্জ্বল ও মানবিয় সত্তা। পাশবিক সত্তার ওপর ঠিক

সেইসব নিয়ম ও আইন কার্যকর আছে, যা সমগ্র প্রাণীজগতের ওপর বর্তমান ও যা অন্যান্য জড় পদার্থ ও জান্তব সত্তার কার্যকারিতা ও কর্মক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের মূল চালিকাশক্তি তার নৈতিক শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, বৈষয়িক বা বস্তুবাদী শক্তির ওপর নয়। মানুষ যতদিন কার্যকারণ পরম্পরা জগতে বসবাস করবে, এই শর্ত কোনরূপেই উপেক্ষা করা যাবে না। মানুষের পার্থিব সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ধারণের ব্যাপারে সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে তা একমাত্র নৈতিক তথা মানবিয় দিক ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষকে তার দেহ সত্ত্বার বা পাশবিক বা জান্তব দিকটার জন্য মানুষ বলে অভিহিত করা হয় না বরং মানুষকে মানুষ বলা হয় তার নৈতিকতার কারণে। তার নৈতিক স্বাধীনতা ও দায়িত্ব রয়েছে। এ কারণেই মানুষকে সমগ্র জীব, জন্তু ও বস্তুর ওপর বিশেষ মর্যাদা দান করে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর খলিফা হওয়ার মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে।

এই মানবিয় চরিত্র তথা সৎ স্বভাব অর্জনের প্রচেষ্টা যদি সমাজে অব্যাহত না থাকে তাহলে সমাজের অন্যান্য সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হতে বাধ্য। এ কারণেই সকল ধর্মে সৎ স্বভাব অর্জনের প্রতি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় আইনে আত্মনিয়ন্ত্রণকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দও শুধুমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের কথাই বলে থাকেন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোন গুরুত্ব দেন না, তাই সমাজ জীবনে এত বিকৃঙ্খলতা।

সৎ স্বভাবই ধর্ম :

আল্লাহ হজরত মুহম্মদ (দ.) কে উৎকৃষ্ট স্বভাবের অধিকারী বলে প্রশংসা করে বলেছেন: "হে মুহম্মদ (দ.) আপনি অত্যন্ত উন্নত ও সৎ স্বভাবের অধিকারী।" রসুল (দ.) বলেছেন, "সৎ স্বভাবে উন্নত আদর্শ পূর্ণ করবার নিমিত্তে আল্লাহতা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন।" অন্যত্র তিনি বলেছেন, "কেবল সৎ স্বভাবকে দাড়ির এক পাল্লায় স্থাপন করে অন্যান্য সমুদয় বস্তু অপর পাল্লায় স্থাপন করলে সৎ স্বভাব অধিক ভারি হবে।"

এক ব্যক্তি রসুল (দ.) এর নিকট আরজ করল, "হে আল্লাহর রসুল (দ.) ধর্ম কি বস্তু ? তিনি বললেন, সৎ স্বভাব।"

সৎ স্বভাব বা সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে হজরত হাসান বসরি বলেন, সচ্চরিত্রতা হচ্ছে মনখোলা থাকা, অর্থ সম্পদ ব্যয় করা এবং কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। ওয়াসেতী বলেন : দারিদ্রে ও ধনাঢ্যতায় সমান সন্তুষ্ট থাকা। শাহ কিরিমানী বলেন : কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা এবং কষ্ট সহ্য করা। আবু ওসমান বলেন: উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি। সহলতস্তরি বলেন : সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং প্রতিশোধ না নেয়া বরং যে অত্যাচার করে তার প্রতি দয়া ও অনুকম্পা করা এবং তাঁর জন্য মাগফেরাত কামনা করা। তার অন্য উক্তি : রিজিকের ব্যাপারে আল্লাহ তালার প্রতি কু-ধারণা না করা, তার ওপর ভরসা করা এবং যে বিষয়ের প্রতি তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন তা পূর্ণ হয়ে গেলে চুপ থাকা, তাঁর হক ও বান্দার হকে তাঁর নাফরমানি না করা, বরং আনুগত্য করা। হজরত আলী (আ.) বলেন : সচ্চরিত্রতা তিনটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত। হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা, হালাল রুজি অন্বেষণ করা এবং প্রয়োজনের অধিক ব্যয় না করা। আবু সায়ীদ খেরাম বলেন : আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর প্রত্যাশী না হওয়ার নাম সচ্চরিত্রতা ।

চরিত্র শব্দের সংজ্ঞা এই যে খুলুক নফসের মধ্যে বদ্ধমূল একটি প্রকৃতির নাম, যা দ্বারা ক্রিয়াকর্ম অনায়াসে ও চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়।

মানব দ্বারা প্রকাশিত ক্রিয়াকর্ম যদি বিবেক ও শরিয়তের দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট হয় তবে চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সচ্চরিত্র হিসেবে বিবেচিত। পক্ষান্তরে, তা যদি মন্দ ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পায়, তবে তা অসচ্চরিত্র বলে অভিহিত। এখানে "নফসের মধ্যে বদ্ধমূল" বলার কারণ এই যে যদি কোন ব্যক্তি ঘটনাচক্রে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অগাধ ধনরাশি ব্যয় করে তবে একে দানশীলতারূপী বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হবে না, যতক্ষণ না এটা তার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবজাত অভ্যাসে পরিণত না হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভোট গ্রহণের পূর্বে অনেক প্রার্থীর মধ্যে এ ধরনের দানশীলতার গুণ সৃষ্টি হয় বলে মনে হতে পারে। অনেকে আবার কোন ক্ষমতাশীল লোক অন্যায়ভাবে গালিগালাজ করলেও বৈষয়িক ক্ষতি এড়ানোর জন্য ক্রোধ দমন করে তাহলেও তাকে সহনশীলতার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না।

মোট কথা সচ্চরিত্র গঠনের মধ্যে চারটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি: (১) ভাল অথবা মন্দ ক্রিয়াকর্ম, (২) উক্ত কাজ করার ক্ষমতা, (৩) তাকে চেনা বা সনাক্ত করা, (৪) নফসের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকা যার দ্বারা ভাল অথবা মন্দের মধ্য থেকে যে কোন একটি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যায়। সুতরাং শুধুমাত্র ক্রিয়াকর্মকে চরিত্র বলা যাবে না। কেননা অনেক লোকের মধ্যে দানশীলতার চরিত্র থাকতে পারে কিন্তু তা সে দারিদ্রতা বা অন্য কোন কারণে দান করতে সক্ষম হয় না। অথবা অনেক লোকের মধ্যে কৃপণতার চরিত্র আছে কিন্তু লোক দেখানো বা অধিক লাভের জন্য দান করে তাকেও দানশীল বলা যায় না। কারণ সক্ষমতার সম্বন্ধ দানশীলতা ও কৃপণতার সাথে সমান অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে দানশীলতার ও কৃপণতার ক্ষমতা রাখে। শুধুমাত্র চেনা বা জানা বা অনুধাবন করার নামই চরিত্র নয়। কেননা চেনা ও সক্ষমতার মতো ভালো ও মন্দ উভয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ জেনে বুঝেই কোন ব্যক্তি যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। যে প্রকৃতি বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা নফস ভাল ও মন্দের ক্রিয়াকর্মের জন্য তৎপর (Inclined/Attracted) হয়, তার নামই চরিত্র। কারো মধ্যে যখন চারটি বিষয় সমতার পর্যায়ে সমন্বিত থাকবে তখন তাকে সচ্চরিত্রবান বলা যাবে। এই চারটি হচ্ছে– জ্ঞানশক্তি, ক্রোধশক্তি, কামশক্তি ও সমতাশক্তি।

জ্ঞানশক্তির মাধ্যমে মানুষ কথাবার্তায় সত্য-মিথ্যা, বিশ্বাসে ন্যায়-অন্যায় এবং কাজকর্মে ভাল ও মন্দ জেনে নিতে পারে। জ্ঞানশক্তি এরূপ হয়ে গেলে তার ফলস্বরূপ প্রজ্ঞা অর্জিত হয়, যা সকল সচ্চরিত্রতার মূল এবং যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন –
“ওমাইউতাল হিকমাতা ফাকাদ উতিয়া খায়রান কাছিরা”

“যে প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়” আর ক্রোধ ও কামশক্তির উপকারিতা এই যে, উভয়েই প্রজ্ঞা অনুযায়ী এবং এরই নির্দেশে পরিচালিত হবে। অর্থাৎ জ্ঞান ও শরিয়তের তথা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আদেশ অনুযায়ী আমল করবে। সমতা শক্তির ভূমিকাও এটা।

যে ব্যক্তির মধ্যে উল্লেখিত চারিটি বিষয় সমতার পর্যায়ে বিদ্যমান থাকে তাকে সর্বাবস্থায় চরিত্রবান বলা যায়। যার মধ্যে কেবল একটি বিষয় অথবা দুটি বিষয় থাকবে, তাকে সেক্ষেত্রে পূর্ণ চরিত্রবান বলা যাবে না। ক্রোধ শক্তির সমতার পর্যায়কে বলা হয় বীরত্ব এবং কাম শক্তির সমতার পর্যায়কে বলা হয় সাধুতা।

জ্ঞানশক্তির সমতা দ্বারা সুপরিচালন ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ মেধা, বিশুদ্ধ ধারণা/অভিমত, সূক্ষ্ম আমল ও নফ্স বা প্রবৃত্তির গোপন বিপদাপদ সম্পর্কিত জ্ঞানের সৃষ্টি হয়; আবার এই জ্ঞানশক্তির বাহুল্যে ধোঁকা, প্রতারণা ও বিদ্বেষ বা হিংসার সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে এর স্বল্পতা দ্বারা অনভিজ্ঞতা, অচেতনতা ও নির্বুদ্ধিতার সৃষ্টি হয়। ক্রোধশক্তির সমতা অর্থাৎ বীরত্ব থেকে যে যে গুণের সৃষ্টি হয়, সেগুলো হচ্ছে দয়া, সাহসিকতা, ঔদার্য, বিনয়, সহনশীলতা, ক্রোধ দমন, গাম্ভীর্য ইত্যাদি। এর বাহুল্য থেকে অহংকার, আস্ফালন, রাগে অগ্নিশর্মা হওয়া ইত্যাদি স্বভাব জন্ম লাভ করে এবং এর স্বল্পতা থেকে ভীরুতা, ভয়, সবার করুণার পাত্র হিসেবে নিজকে পরিচিত করা ছাড়াও কাপুরুষতা, দৃঢ়তার অভাব প্রভৃতি দোষ প্রকাশ পায়। কামশক্তির সমতা থেকে সাধুতা, সাধুতা থেকে সৃষ্ট গুণাবলী– দানশীলতা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য্য, অল্পে তুষ্ট, পরহেজগারি, নির্লোভ হওয়া ইত্যাদি। এর স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে সৃষ্ট স্বভাব সমূহ হলো: অশ্লীলতা, লালসা, নিলজ্জতা, অপব্যয়, অপরের দুঃখে পরিহাস করা, অনর্থক খোশামোদ করা, হিংসা করা, গরিব বা নির্ধনকে হেয় মনে করা। মোট কথা প্রজ্ঞা, বীরত্ব, সাধুতা ও মিতাচার– এই চারটি বিষয় মানব চরিত্র মাধুর্যের মূল ভিত্তি। অন্যান্যগুলো হলো এ সবের শাখা/প্রশাখা। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি রসুল (দ.) এর এসকল চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে যতবেশি গুণান্বিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি আল্লাহর তত নিকটবর্তী।

কোরআনে মুমেনদের গুণাবলীতে উপরোক্ত চরিত্রসমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে: ‘ইনিমাল মুমেনুনাল্লাজিনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসুলুহি সুম্মা লাম ইয়ার তাবুউ ওয়া যাহাদু বি আমওয়ালিহিম; ওয়ানফুসিহিম ফি সাবিলিল্লাহি লাইকাভমুস সাদেকুন।”

“মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এরপর সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ও প্রাণের বিনিময়ে জেহাদ করেছে, তারাই প্রকৃত সত্যপন্থী।”

আল্লাহ ও রসুল (দ.) এর প্রতি সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা; জ্ঞানশক্তির মাধ্যমে হয়, যা বুদ্ধির ফলশ্রুতি ও প্রজ্ঞার চরম পরিণতি। ধন-সম্পদের বিনিময়ে জেহাদ করা দানশীলতা, যা কামশক্তিকে বাধা

দেওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং প্রাণের বিনিময়ে জেহাচ্ছ-বীরত্ব, যা ক্রোধশক্তিকে সমতার পর্যায়ে ব্যবহার করে অর্জিত হয়।

সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আশিদ্দাউ আলাল কুফ রুহামাউ বাইনাহুম" অর্থাৎ তারা কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর এবং পরস্পরের প্রতি দয়াশীল।" এতে কঠোরতা ও দয়া পাত্র ভেদে বর্ষিত হওয়ার ইংগিত পাওয়া যায়। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে কঠোরতা বা সর্বক্ষেত্রে দয়া কোন বাঞ্ছিত গুণাবলী নয়।

রসুল (দ.) বলেছেন, "খারাপ কাজ দেখে যদি কারো মনে আন্তরিক ঘৃণারও সৃষ্টি না হয় তবে তার ঈমান নাই বলে বিবেচনা করতে হবে।

সচ্চরিত্রতা তিন উপায়ে অর্জিত হয়ে থাকে। প্রথমত: জন্মগতভাবে মানুষ পূর্ণজ্ঞানী ও চরিত্রবান হতে পারে। যেমন ঈসা (আ.), হজরত ইয়াহিয়া (আ.), পয়গম্বরকুল শিরোমনি হজরত মুহম্মদ (দ.) ও অলীকুল শিরোমণি হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানি (রা.)। দ্বিতীয় উপায় অধ্যাবসায় ও সাধনার মাধ্যমে চরিত্র অর্জন করা অর্থাৎ নফসকে এমন কাজে নিয়োজিত করা, যা দ্বারা চরিত্রের কাঙ্ক্ষিত পর্যায় হাসিল হয়ে যায়। তৃতীয় উপায় হচ্ছে আল্লাহর কামেল অলি তথা নায়েবে রসুলের মাধ্যমে চরিত্র সংশোধন তথা পরিশুদ্ধকরণ।

সুরা আল ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "প্রকৃত পক্ষে ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহর বিরাট মেহেরবানি যে, তিনি তাদের জন্য স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে এমন এক রসুলের উত্থান ঘটিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, কিতাব এবং হিকমাত শিক্ষা দেন। অন্যথায় তারা তো সুস্পষ্ট গুমরাহির মধ্যে ছিল।"

আয়াতটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, রসুল (দ.) এমন এক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি পথভ্রষ্ট তথা যারা পবিত্র চরিত্রের অধিকারী নয় তাদেরকে শুদ্ধ করে চরিত্রবান ব্যক্তিতে পরিণত করতেন। অর্থাৎ রেসালতের এটি একটি এমন দায়িত্ব যা সকল নবিদেরকেই দেয়া হয়েছিল। এ কারণেই নবির সান্নিধ্যে বহু পথহারা লোক তাদের চরিত্রের খারাপ দিক সংশোধন করে পূত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন।

রসুল (দ.) ঘোষণা করেছেন যে, "আলেমগণই হলেন নবিদের উত্তরাধিকারী বা নায়েবে নবি।" –তিরমিজি। নায়েবে নবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালী রচিত মিনহাজুল আবেদীন বইতে উল্লেখ আছে যে –

- আল্লাহপাক তাঁর সকল বিষয় ও বস্তুর তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বহস্তে তুলে নেন।
- আল্লাহ সেই বান্দার রুজি রিজিকের জিম্মাদার নিজেই হয়ে যান এবং সে যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্বাবস্থায় অনায়াসে ও বিনা ক্লেশে রুজি রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন।
- আল্লাহতা'আলা তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হয়ে যান। ফলে তাঁকে কোনরূপ অবনতি, পতন, পরিবর্তন, বিবর্তনের চিন্তায় বিচলিত হতে হয় না।
- সেই ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত ও সবল হয়। দুনিয়ার কোন ব্যক্তি বা পার্থিব কোন কিছুই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এমনকি কোন বড় রাজা-বাদশার কাছেও সে কোনভাবে মস্তক অবনত করে না।
- সেই ব্যক্তির মনে দুর্জয় সাহস ও দৃঢ়তার সৃষ্টি হয়। সে কখনও পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ব্যক্তির আহবানে সাড়া দেয় না।
- সেই বান্দার মন জ্ঞানালোকে আলোকিত ও উজ্জ্বল হয়ে যায়। ফলে তার সামনে সব গুপ্ত রহস্য, তত্ত্ব ও তথ্যাবলী স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে।
- সেই বান্দার ভেতরে ভূ-পৃষ্ঠে, জলে-স্থলে-শূন্যে ও বাতাসে; এমনকি যে কোন স্থানে ঐশি বিকাশ ঘটতে থাকে। এমন কি পানিতে পদচারণা, শূন্যে উড্ডয়ন; বায়ুতে ভ্রমন এবং দূর-দূরান্ত গমনাগমন তার পক্ষে অতি সাধারণ কাজরূপে গণ্য হয়ে যায়।
- সেই বান্দার জন্য আল্লাহর অফুরন্ত সম্পদের দ্বার খুলে দেওয়া হয়, ভূ-পৃষ্ঠের যেখানে সে হাত বাড়ায় চাহিদানুসারে সব কিছু তার হাতে আসে। পানির জন্য শুষ্ক মরুর বুকে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ পানির ঝর্না ধারা উৎসারিত হয়। জনশূন্য গভীর অরণ্যে কিংবা নির্জন প্রান্তরে উপাদেয় খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা মাত্র চোখের পলকে তা' সম্মুখে চলে আসে। আল্লাহপাকের ইচ্ছায় তার ক্ষমতা এই স্তরে পৌঁছে যায় যে, সে যদি স্থির পাহাড়কে বলে 'চলে আস' তাহলে সে পাহাড় অমনি তার কথামত চলতে শুরু করে।

আল্লাহর এই ধরনের মহান অলি তথা নায়েবে রসুল (দ.) "একটি মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর (মুরিদ) মনে জমাকৃত দুনিয়া প্রেম, লোভ, লালসা, ঘৃণা, অহংকার সব এমনভাবে বিদূরিত করবে যার কণামাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। তারপর তাকে বায়াত করে আল্লাহর সাক্ষাৎকারী হিসেবে মনোনীত করবে। যদি পীরের মাঝে এরকম ক্ষমতা থাকে তাহলে অবশ্যই বুঝবে যে পির ও মুরিদ উভয়েই পথভ্রষ্ট।" বলেছেন হজরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.), ফাওয়ায়েদুস সালেকীন, লেখক হজরত খাজা শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর (র.)।

সচ্চরিত্রতা অর্জনে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে নায়েবে রসুল হিসেবে এ ধরনের কামেল অলির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অস্বীকৃতি। মনে রাখতে হবে, এ ধরনের অবিশ্বাসের কারণে লোক আল্লাহতা'লার গজবের শিকার হয়ে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

অন্য একটি কারণ হলো, মানবিয় চরিত্র সংশোধন করা সম্ভব নয় অথবা উচিতও নয় - এ ধরনের ধারণা পোষণ করা। এর প্রবক্তারা মনে করেন যে, মানবিয় চরিত্র অপরিবর্তনীয়। তাই এ ব্যাপারে চেষ্টা সাধনা করা অবান্তর।

নফ্‌স বা প্রবৃত্তি :

নফ্‌স বা প্রবৃত্তি সব সময় মানুষকে স্বেচ্ছাচারিতা ও পাপ পথে প্ররোচিত করে। মানুষের নফ্‌স এমন একটি বস্তু যা ক্রোধ ও কামশক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। নফ্‌সের মধ্যেই মানুষের নিন্দনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহ একত্রিত আছে। এ কারণেই সুফিগণ নফ্‌সের বিরুদ্ধে সাধনা করার পরামর্শ দেন। হাদিসে এই সম্পর্কেই বলা হয়েছে– তোমার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হলো নফ্‌স।

নফ্‌স যদি কামনা বাসনার প্রতিরোধ না করে বরং কাম প্রবৃত্তি ও শয়তানের দাস হয়ে যায় তবে তাকে বলা হয় নফ্‌সে আম্মারা অর্থাৎ কুকর্মের জন্য প্ররোচিতকারী ও আদেশকারী নফ্‌স। মানুষের নফ্‌সের দুই অবস্থা আছে। এর মধ্যে কোন তৃতীয় অবস্থা নাই। এই অবস্থাগুলি সম্পদ ও বিপদের অবস্থা। নফ্‌স যখন বিপদের অবস্থায় থাকে, তখন সে অধৈর্য হয়ে যায় এবং মহামহিম আল্লাহতা'লার প্রতি অভিযোগ; অসন্তোষ, প্রতিবাদ এবং দোষারোপ করতে থাকে। তখন আল্লাহতা'লার প্রতি তাঁর কোন ধৈর্য, সন্তুষ্টি বা সমর্থন থাকে না বরং সে আল্লাহতা'লার শরিক স্বরূপ অপরাপর বস্তু অথবা শক্তির সহায়তা কামনা করে।

আর যখন নফ্‌স সম্পদের অবস্থায় থাকে, তখন সে অহংকার, গরিমা ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকে এবং কামনা বাসনার তাবেদারী করতে থাকে। যখনই তার এক বাসনা পূর্ণ হয়, অমনি সে দ্বিতীয় বাসনার অন্বেষণ করে। তখন সে তাকে প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের ত্রুটি অনুসন্ধান ও তুচ্ছ জ্ঞান করতে থাকে এবং তা হতে অধিকতর উৎকৃষ্ট ও উন্নত ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টা করে, যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত নেই। আর যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত আছে তা সে উপেক্ষা করে। ফলে নফ্‌স মানুষকে দীর্ঘমেয়াদী বিপদে নিক্ষেপ করে এবং সে কিছুতেই তার জন্য নির্ধারিত প্রাপ্ত জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তখন সে এমন প্রাণান্তকর পরিশ্রমে ব্রতী হয় এবং এমন ধ্বংসকারী প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, যার কোন সীমা নেই অথবা যা আদৌ পাওয়া সম্ভব নয় এবং তার কোন পরকালীন ভবিষ্যতও নেই। এজন্য বলা হয় যে, যা ভাগ্যে নেই তার পিছনে প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালানোও এক ধরনের কঠিন শাস্তি।

সাধারণ মানুষের নফ্‌সের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে : "আফারাইতা মানিত্তখাজা ইলাহাহু হাওয়াহু ওয়া আদাল্লাহুআলা ইলমী"। অর্থাৎ তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছে যে তার খেয়ালখুশিকে 'ইলাহা' করে নিয়েছে। তুমি কি মনে করো এদের অধিকাংশ লোকই জানতে ও বুঝতে পারে? আসলে এরা তো জন্তু জানোয়ারের মতো বরং তাদের চাইতেও অধিকতর নিকৃষ্ট। পবিত্র কোরআনে আরো উল্লেখ আছে "ওয়াত্তাবা হাওহুফামাসালুহু কামাসালিল কালবি ইন তাহমিল আলাইহি ইয়াল হাস আও তাতা রুকুহু ইয়াল হাস"। এবং সে তার খেয়াল খুশির (প্রবৃত্তি) অনুসরণ করেছে। অতএব, তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মতো। তার ওপর বোঝা চাপালে সে হাঁপায় এবং বোঝা না চাপিয়ে ছেড়ে দিলেও হাঁপায়। (সুরা আরাফ - ১৭৭)।

"ওয়ানাহান নাফসা আনেলহাওয়া ফান্নালজান্নাতা হিয়াল মাওয়া।" যে ব্যক্তি স্বীয় নফ্‌কে যাবতীয় খাহেশাত হইতে নির্লিপ্ত করিয়াছে সে তাহার স্থান বেহেস্ত করিয়া লইয়াছে।

নফ্‌সের খেয়াল খুশিকে ইলাহ বানানোর অর্থ তারই দাসত্ব বা ইবাদত করা। প্রকৃতপক্ষে এটাও তেমনি শির্‌ক, যেমন মূর্তির বা তাগুতের আরাধনা করা। রসুল (দ.) বলেছেন, "আসমানের নিচে যত মাবুদের পূজা করা হইবে তন্মধ্যে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম মাবুদ হইতেছে নফ্‌সের খাহেশ যাহার অনুসরণ করা হইবে।" (তিবরানি)

সমাজ জীবনে ইন্দ্রিয় ও নফ্‌স (প্রবৃত্তি) চালিত হয়ে মানুষ অন্যের সম্পদ কাড়ে, অন্যের জমি জবর দখল করে, চুরি করে, কামুক হয়ে কামিনী লোলুপ হয়, ঈর্ষা বশে অন্যের উন্নতি ঠেকায়, ঘৃণায় ঘা গন্ধযুক্ত পিতার সেবায় বিরত থাকে, পারিবারিক সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির আশায়, মা-বাবা নকল করিয়ে বা তথ্বির করে সন্তানকে পাশ করাতে চায়; সে সন্তান কি সৎ ও মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার পরিবেশ পেতে পারে? অনুরূপভাবে যে মা-বাবা মিথ্যাকথনে, সত্য গোপনে, লিপ্সা প্রকাশে, ঘুষ গ্রহণে নিঃসংকোচ, সে ঘরের সন্তান কি সত্যবাদী ও সংযমী হতে পারে? যে ঘরে জীবনে মহৎ ও বৃহৎ কোন মানবিক, চারিত্রিক, নৈতিক আদর্শ-উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের কথা কখনো স্বপ্ন-সাধ-সাধ্যরূপে কম্পিত ও আলোচিত হয় না, সে ঘরের সন্তান মাত্রই চোখে দেখা ও মনে জাগা আপাত সুখের, আপাত আনন্দের সন্ধান করবে এর ব্যতিক্রম যে অস্বাভাবিক তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে শিক্ষকরা উদাসীন ছাত্রদের পড়ায়, মনোযোগী হবার ব্যবস্থা নেন না, শাসনে সোহাগে বছরান্তে অনুত্তীর্ণও রাখেন না। ফলে ছাত্ররা পাশের আশায় নকলবাজ হয়। চোরাকারবারী, পাচারকারী ব্যবসায়ীর সন্তান হঠাৎ করে অসততা, কালোবাজারি অপছন্দ করবে কি কারণে? শিক্ষিত ধনী ঘরের সন্তান আদর্শিক কারণে বস্তির লোকের সেবী ও বন্ধু হতে পারে কিন্তু লম্পট না হলে বস্তির মেয়েকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করবে কোন সুখে? ধন হলেই যে লোক মান ও প্রভুত্ব অর্জন করার জন্য নানা প্রতিষ্ঠানের সদস্য- নেতা হবার আশায় অর্থ ব্যয় করে তাদের চেলা হিসেবেই নকলবাজ ছাত্ররা গুন্ডা ও মস্তান হয়।

তোয়াজ তোষামোদ করে, সুনাম পাবার লক্ষ্যে ও জনপ্রিয় হবার আশায় এবং ভোট জোগাড় করার লক্ষ্যে লোক বুঝে, স্থান চিনে, লাভ জেনে দান দয়া কৃপা করে সে কি সহৃদয় সৎ মানুষ হতে পারে?

যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আড়তদার মাত্রই মজুদদার, উৎপাদনকারী মাত্রই ভেজালদার, মজুর মাত্রই ফাঁকিবাজ, ঠিকাদার মাত্রই ঠকবাজ, চিকিৎসক চিকিৎসা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উদাসীন, শিক্ষক বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে অনীহা, ঔষধ তৈরিতে ভেজাল নিত্য চলে, পয়সা দিয়ে খুশি এবং উর্ধ্ব চাপ দিয়ে কাবু না করলে অফিসে, দফতরে কাজ আদায় হয় না।

নফ্‌সের দাসত্ব কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণি বা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর যে কোন সমাজ ব্যবস্থাতেই এ ধরনের চালচিত্র কমবেশি দেখা যাবে। অন্যান্য দেশে যে সবক্ষেত্রে অবস্থা উন্নত বা ভালো বলে মনে হয়, তার প্রধান কারণ ঐ সব অঞ্চলের লোকের চারিত্রিক সততা বা দৃঢ়তা বা ইন্দ্রিয়কে তারা জয় করতে পেরেছেন তা নয়। বরং রাষ্ট্রীয় আইন কৃঙ্খলাজনিত কঠোরতা, সার্বিক জীবনযাত্রায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য এবং অধিকাংশ নীতিহীন খারাপ কাজকে স্বাভাবিক মানবিয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামাজিক, তাত্ত্বিক ও আইনগত স্বীকৃতি দিয়ে তা লালন ও প্রচার করা। আধুনিক সভ্যতা শুধু সম্পদের প্রাচুর্য এবং ধ্বংসাত্বক অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সেই সাথে আছে সংবাদ, তথ্য, তত্ত্ব, মতবাদ, সাহিত্য, জ্ঞান বিদ্যা প্রচারের, রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন এসব প্রচার মাধ্যম একত্রিত হয়ে মানুষের মন ও মগজকে প্রবৃত্তি পূজার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে সত্য তথা ন্যায় বা সঠিক কাজের অস্তিত্ব পাওয়া দুষ্কর হয়ে গেছে।

সাধারণত: প্রায় সকল মানুষই ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি তথা নফ্‌স দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রকাশ্য ক্ষতির মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে। যদিও এই জীবন-যাত্রা তার কাছে অত্যন্ত আনন্দের, আকর্ষণীয় ও যথার্থ বলে মনে হয় তবে প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানের জন্য ঐশি জ্ঞানের আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা অপরিহার্য।

"যখন আল্লাহতা'লা কোন বান্দার কল্যাণ করতে চান; তখন তার জন্য একটি উপদেশদাতা অন্তর নির্দিষ্ট করে দেন" (হাদিস)

এইরূপ অন্তরের মাধ্যমেই সে নফ্‌সের দোষসমূহ আছে বলে মনে করে এবং তা সংশোধনের উপায় ও পন্থা অনুসন্ধান করে। এ ধরনের প্রচেষ্টায় যারা নিয়োজিত থাকে তাদের জন্য কোরআনে এরশাদ হচ্ছে :

"যারা আমাকে পাওয়ার জন্য অধ্যাবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করব।" রসুল (দ.) বলেন, "যে ব্যক্তি আমল করে, আল্লাহ তাকে অজানা বিষয়ের এলেম দান করেন।" সুরা ফজরের ১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

'হে পরিশুদ্ধ আত্মা, খোদার দিকে ধাবিত হও, তোমার প্রতিপালক তোমার ওপর সন্তুষ্ট এবং তোমরা খোদার প্রিয় পাত্র, অতএব আমার সৎ বান্দাগনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেহেস্তে প্রবেশ কর।"

"নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি সাফল্য অর্জন করেছে যে তার আত্মার পবিত্রতা লাভ করতে পেরেছে আর সে তার প্রতিপালকের নাম সদা স্মরণ করছে বাস্তবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত নামাজ কায়েম করেছে।" (সুরা আলা : ১৪-১৫)

"যে ব্যক্তি তার 'নফ্স'-কে বিশুদ্ধ রেখেছে সেই তার জীবনকে সার্থক করে তুলেছে, আর যে ব্যক্তি তার আত্মাকে কলুষিত করেছে সে তার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে।" (সুরা শামস ৯)

সুতরাং উপরোল্লিখিত কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফ্সের সুনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করাই দীন ইসলামের ভিত্তি।

নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এর তাৎপর্য :

প্রকৃতপক্ষে ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এর তাৎপর্য হলো নফ্সের পবিত্রতা অর্জন। অন্য কথায় নফ্সের পবিত্রতা হলো মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তা অর্জনের উপায়-পন্থা হলো– নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ।

নামাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ "ইন্না ছালাতা তানহা আনিল ফাহসায়ে ওয়াল মুনকার" অর্থাৎ "নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে।"

"রসুল (দ.) বলেছেন, হুজুরি ক্বলব ব্যতীত নামাজ সিদ্ধ হবে না। এ ধরনের বলব ব্যতীত জাহেরি নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মূর্তি পূজারি। আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে এই সমস্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের আমলের ওপর গর্ব করিয়া থাকে কিন্তু তারা যে প্রকৃতপক্ষে মূর্তি পূজা করিতেছে তা তারা নিজেরা বুঝিতে পারিতেছে না, আরও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে যে, সাধারণ ব্যক্তিগণ এই সমস্ত রিয়াকার ব্যক্তিগণকে প্রকৃত নামাজি বলিয়া সম্মান করিতেছে।" (হজরত মকতুবাতে খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী (রা.)

রোজা সম্পর্কে পবিত্র কোরাআন বলা হয়েছেঃ "তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন নাকি তোমাদের পূর্ব পুরুষদের জন্য ইহা ফরজ করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা পবিত্রতা অর্জন করবে।"

রসুল (দ.) এরশাদ ফরমানঃ সাধারণ মানুষ যে রোজা রাখে– যাহাতে শুধুমাত্র পানাহার ও জেনাহ হইতে পরহেজ করা হয় - তাহা হকিকি রোজা নহে। বরং মেজাজি রোজা। এই রূপ রোজার দ্বারা আছরারে এলাহি হাসিল হয় না। এই রূপ রোজা শুধু জাহেরি সুরত লইয়াই সীমাবদ্ধ এবং হকিকত সম্বন্ধে এই রোজা সম্পূর্ণ অন্ধকারেই রহিয়া যায়। এইরূপ রোজা দ্বারা গায়রুল্লাহর তরক সম্ভব হয় না বরং ইহাতে সর্বপ্রকার নফছানি ও ইনছানি কলুষতা রহিয়া যায়। এইরূপ রোজাদারের যাবতীয় বাক্য ও কার্যাবলী গায়রুল্লাতে পরিপূর্ণ। এইরূপ জাহেরি রোজা দ্বারা শুধু এই মাত্র ফায়দা হয় যে এইরূপ রোজাব্রত প্রতিপালন দ্বারা পানাহারের কষ্ট উপভোগ করিয়া গরিব ও দুঃখী মিসকিনদের দুঃখ ও ব্যথা সম্যকরূপে উপলদ্ধি করতে পারে। মেজাজী রোজাতে ইহা ব্যতীত আর কোন ফায়দা আছে বলিয়া মনে হয় না।" রোজা হাকিকির অর্থ হচ্ছে মানব স্বীয় দিল হতে সর্বপ্রকার দ্বীন দুনিয়ার আশা আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত করবে। কারণ খায়েশাতে দ্বীন; যেমন বেহেস্ত ও হুরের আকাঙ্ক্ষা আবেদ ও মাবুদের মধ্যে পর্দা আনয়ন করে। আর খাহেশাতে দুনিয়া যেমন ধনদৌলত শান-শওকত ও নফ্সের খাহেশাত এ সমস্তগুলো একরোরে শিরক। (প্রাগুক্ত)

জাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা। এ ব্যাপারে রসুল (দ.) এরশাদ করেছেন, "শরিয়ত মোতাবেক দুইশত দিনারের মধ্যে মাত্র পাঁচ দিনার জাকাত দান করা ফরজ।" আহলে তরিকতগণের নিকট দুইশত দিনারের মধ্যে পাঁচ দিনার নিজের জন্য রেখে বাকি সমস্তই দান করা ফরজ। স্মরণ রাখিও জাকাত আজাদ ব্যক্তির ওপর ফরজ। গোলাম বা ক্রীতদাসের ওপর ফরজ নহে। মানব যতক্ষণ পর্যন্ত নফ্সের তাবেদারী হইতে মুক্ত

না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আজাদ হতে পারে না। অতএব, বান্দার পক্ষে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সে নফ্‌সের তাবেদারী হতে আজাদি হাসেল করিয়া জাকাতে হকিকি জাকাত আদায় করার যোগ্যতা অর্জন করা।

হজের হকিকত সম্পর্কে রসুল (দ.) বলেছেন, দৃঢ় বিশ্বাস রাখিও ইন্‌সানের দিল খানায়ে কাবাহ এবং মোমিনের দিল আল্লাহর আরশ। এই কাবায়ে দিলের হজ করা প্রয়োজন। হজরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, কাবায়ে দিলের হজ কিভাবে সম্পন্ন করতে হয়? রসুল (দ.) উত্তর দিলেন, মানুষের অজুদ চারিটি দরজা বিশিষ্ট (মাটি, পানি, আগুণ ও বাতাস)। এই চারিটি দরজা হতে যাবতীয় সন্দেহ, গোমরাহি এবং পর্দায়ে গায়রুল্লাহকে দূরীভূত করিয়া দিলে দিল রূপ আয়নায় খোদাতা'য়ালার জাতের জালোয়া (চেহারা) প্রত্যক্ষ করিবে। খানায়ে কাবার মকসেদ ইহাই। এই ধরনের হজের আর একটি উদ্দেশ্য হলো মানব নিজ খুদি (অহংকার) ও অস্তিত্বকে এমনভাবে মিটাইয়া ফেলিবে যে তার কোন অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকবে না। এমন কি তার ভিতর ও বাহির একেবারে পবিত্র হয়ে যাবে এবং অন্তর আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হবে। –হজরত মকতুবাতে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (র.)।

সুতরাং নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজের অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য যে নফসের সাধনা তা' বোঝা গেল। এই তাৎপর্য বুঝার বিষয়টিকেই এলমে তাসাউফ বলে।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে এই এলমে তাসাউফ অন্বেষণ করা ফরজে আইন। স্মরণ রাখতে হবে বাহ্যিকভাবে ইসলামি আইন চালু থাকা সত্ত্বেও যদি এই বিষয়ে সমাজের লোকজনের কোন আগ্রহ বা উৎসাহ না থাকে, তাহলে আপাত দৃষ্টিতে কোন দেশে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকলেও কার্যত তা জাহেলিয়াত সমাজে পর্যবসিত হয়। হজরত আলী (আ.) এর পর হতে ইসলামি সমাজ জীবন থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই জ্ঞানচর্চা করা রহিত করা হয় এবং বাহ্যিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি জোর দেওয়া হয়। এ কারণেই মাবিয়া, ইয়াজিদ, মারোয়ান, মালিক, হাদী, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রভৃতি মুসলমান জাতির কলংক স্বরূপ শাসনকর্তার আবির্ভাব ঘটে।

তাসাউফ জ্ঞান সমাজে চালু না থাকা, সমাজের পক্ষে কতটুকু ক্ষতিকারক তা' আব্বাসীয় আমলের ইসলামের তথাকথিত স্বর্ণযুগে হারুন উর-রশীদ যখন মুসলমানদের খলিফা ছিলেন তাঁর আমলে ইসলামি সমাজের প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা যায়। হারুন উর-রশীদের প্রতি হজরত সুফিয়ান সওরীর লিখিত পত্রটি নিম্নরূপঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বান্দা মুনীর সুফিয়ান ইবনে সায়ীদ সওরীর পক্ষ থেকে সেই বান্দার প্রতি যে আশার ছলনায় বিভ্রান্ত এবং ঈমানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত অর্থাৎ হারুন উর রশীদের প্রতি

সালাম, হামদ ও নাতের পর সমাচার এই যে, এ পত্র তোমাকে একথা জানানোর জন্যই লিখছি, আমি তোমার মহব্বতের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছি। এখন আমি তোমার দুশমন হয়ে গেছি। কেননা তুমি নিজে স্বীকার করছ যে, তুমি রাজকোষ উন্মুক্ত করে আমার মহব্বতে ব্যয় করে ফেলেছ। তুমি আমাকে এ বিষয়ে সাক্ষী করেছ যে, তুমি মুসলমানদের ধন-সম্পদ অযথা ব্যয় করেছ। তুমি আপন কাজ করেই সন্তুষ্ট রয়েছ বরং আমি দূরে থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে পত্র লিখছ, যাতে তোমার বিরুদ্ধে আমি এবং আমার সহচররা, যারা এ পত্র পাঠ করেছে, সাক্ষী হয়ে যায়।

স্মরণ রেখ, আমরা কাল কিয়ামতে আল্লাহতা'লার সম্মুখে তোমার অন্যায় কর্মকান্ডের সাক্ষ্য দিব। হে হারুন, তুমি মুসলমানদের রাজকোষ অযথা উজাড় করে দিয়েছ। অথচ এতে কোরাআন মজিদের নির্দেশ অনুযায়ী সাত (প্রকৃত পক্ষে আট) দল মানুষের হক আছে। তোমার এ কাজে কোন দল সন্তুষ্ট হয়নি, না জাকাতের কর্মচারীরা না আল্লাহর পক্ষে জেহাদকারী, না মুসাফিররা, না কোরআন বাহক আলেম অথবা বিধবা মহিলা অথবা অনাথ শিশুরা। সুতরাং এখন জিজ্ঞাসাবাদের জবাব দেওয়ার জন্য তৎপর হও এবং নিজের বিপদ দূর করার চিন্তা কর। জেনে রেখ, তুমি অচিরেই ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তার সম্মুখে দন্ডায়মান হবে এবং তোমাকে নিজের সম্পর্কে পাকড়াও করা হবে। কেননা তুমি এই সংসারের জন্য জালেমদের নেতা হওয়াকে পছন্দ করে নিয়েছে। হে হারুন, তুমি সিংহাসনে উপবেশন করেছ, রেশমি বস্ত্র পরিধান করেছ, দরজায় পর্দা ঝুলিয়েছ। এসব পর্দার দ্বারা তুমি বিশ্ব পালকের সাথে সাদৃশ্য করেছ। এরপর তোমার জালেম সিপাহিদেরকে দরজা ও পর্দার কাছে বসিয়ে দিয়েছ, তারা মানুষের ওপর জুলুম করে, ইনসাফ করে না। নিজেরা যিনা করে এবং অন্য

যিনাকারীদের ওপর হুদ (যিনার শাস্তি) জারি করে। এমনিভাবে নিজেরা চুরি করে এবং অন্য চোরদের হস্ত কর্তন করে। শরিয়তের বিধান যেন তোমার সাঙ্গ-পাঙ্গদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

হে হারুন, কাল কি হবে যখন একজন ঘোষক আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে ঘোষণা করবে- একত্রিত করো জালেমদের এবং তাদের সঙ্গীদেরকে। তোমাকে ঘাড়ের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় আল্লাহতা'লার সামনে পেশ করা হবে। তোমার ন্যায়পরায়নতা ছাড়া অন্য কোন কিছু এই বন্ধনকে খুলবে না। অন্য জালেমরা তোমার চারপাশে থাকবে। তুমি সরদার ও নেতা হয়ে সকলকে দোজখে নিয়ে যাবে। হে হারুন, আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে কিয়ামতের দিন ঘাড় ধরে পেশ করার জায়গায় হাজির করা হয়েছে, আর তুমি তোমার পূণ্য সমূহ অপরের পাল্লায় দেখতে পাচ্ছি এবং নিজের গোনাহ ছাড়া অন্যদের গোনাহও তোমার পাল্লায় দেখে যাচ্ছ। বিপদের পর বিপদ, অন্ধকারের পর অন্ধকার, অতএব, হে হারুন, আমার অসিয়ত মনে রেখ, তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছি তা পালন করে যাও। মনে রেখ আমি তোমার শুভেচ্ছায় ও হিতোপদেশে কোন ত্রুটি রাখিনি। অতএব, তুমি তোমার প্রজাকুলের ব্যাপারে আল্লাহতা'লাকে ভয় কর। উম্মতে মুহাম্মদীর ব্যাপারে রসুলে করিম (দ.) এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তাদের ওপর খেলাফত উত্তমরূপে পরিচালনা কর। জেনে রাখ, যদি খেলাফত খলিফাদের কাছে স্থায়ি হত, তবে তোমার কাছে পৌঁছাতো না। খেলাফত তোমার কাছ থেকেও চলে যাবে। এমনিভাবে দুনিয়া সকল মানুষকে একজন একজন করে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ভান্ডার সংগ্রহ করে নেয় যা তার জন্য উপকারী এবং কেউ কেউ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্থ। খবরদার, এরপর আমার কাছে কোন পত্র লিখবে না। আমিও কোন জওয়াব লিখব না। ওয়াস সালাম"। (এহইয়উল উলুমুদ্দীন–ইমাম গাযযালী (র.), তৃতীয় খন্ড - পৃ-১৫১)।

এই চিঠির মর্ম বিশ্লেষণ করলে আব্বাসীয়, মুঘল ও ওসমানি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কাঠামোর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর আইনানুগ অবস্থান ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। কারণ এ সকল সাম্রাজ্যগুলো মোটামুটি একই ধরনের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ধর্মের ব্যবহারিক দিক :

মানুষের জীবন যাপনের জন্য একটি জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। মানুষের জীবনের, এমন কি শরীরের একটি বিরাট অংশ প্রাকৃতিক আইনের অধীন হলেও তার জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগ রয়েছে; সেখানে সে কোন সুনির্দিষ্ট পথ দেখতে পায় না। যদিও সাধারণ জ্ঞান, প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে কোন সমস্যার একাধিক সমাধান তার সামনে উপস্থিত হয় কিন্তু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ও পদ্ধতিতে তার কোন সঠিক সমাধান সে খুঁজে পায় না। এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য তার চিন্তার একটি পথ আবশ্যক। প্রকৃতি তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার মনে কতগুলো বিক্ষিপ্ত ধারণা পৌঁছে দেয় বটে কিন্তু তাকে সুকৃংখলভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দেয় না। এইসব ধ্যান ধারণা সাজিয়ে গুছিয়ে কৃংখলাবদ্ধ করার জন্য তার একটি সঠিক জ্ঞানের উৎসের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত আচার অনুষ্ঠানের জন্য তার কিছু রীতি পদ্ধতির প্রয়োজন। যার মাধ্যমে সে তার এসব দাবি পূরণ করতে পারে। প্রকৃতি বিভিন্ন চাহিদা পূরণের দাবি করে বটে, কিন্তু তা পূরণ করার জন্য কোন সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয় না। তার দাম্পত্য জীবনের জন্য, পারিবারিক সম্বন্ধের, অর্থনৈতিক লেনদেন ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড, আন্তর্জাতিক যোগাযোগের এবং জীবনের অন্যান্য বিস্তৃত কর্মকান্ডের জন্য একটি বিধান তার অবশ্যই প্রয়োজন। সেই বিধান মতে নিছক ব্যক্তি হিসেবে নয় বরং দল, গোষ্ঠী ও জাতি হিসেবে জীবন-যাপন করে সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। প্রকৃতি বা সাধারণ জ্ঞান কিন্তু সে লক্ষ্যকে তার সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন এবং সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কোন পন্থাও নির্ধারণ করে না।

মানুষের সমস্যাদি কোন স্থায়ি, পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্বনির্ভর বিভাগ নয়। এজন্য এসব বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বিচ্ছিন্নভাবে করা সম্ভব নয়। কেউ যদি মানুষ ও তার জীবন সমস্যা উপলব্ধি করার জন্য বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে একটুখানি চেষ্টা করে, তাহলেই সে নিন্ডিতভাবে বুঝতে পারবে যে, জীবন সামগ্রিকভাবে একটি গোটা সমষ্টি (complete whole) যার প্রতিটি অংশ অপর অংশের সাথে, প্রতিটি বিভাগ অন্য বিভাগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে মানুষের যা প্রয়োজন, তা জীবনের অনেকগুলো লক্ষ্য নয় বরং একটি মাত্র প্রধান লক্ষ্য। যার অধীনে সকল ছোট-বড় লক্ষ্য সামঞ্জস্যশীল ও সঙ্গতিপূর্ণ থাকবে। ফলে প্রধান লক্ষ্যটি অর্জিত হলে অন্য সব কয়টি অর্জিত হবে। তার অনেকগুলো পথের প্রয়োজন নাই বরং প্রয়োজন একটিমাত্র রাজপথের যার ওপর সে তার জীবনের সব কয়টি দিক ও বিভাগসহ পূর্ণ

সুসংহতভাবে নিজ লক্ষ্যের দিকে চলতে পারে। দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা, ধর্ম, নৈতিকতা, সামাজিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও আইন-আদালত প্রভৃতির জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা নয় বরং একটি সার্বিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। যার মধ্যে এসবগুলো পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে অবস্থান করতে পারে, এবং যার মধ্যে এসবের জন্য একই মেজাজ প্রকৃতির যথোপযুক্ত মূলনীতি থাকবে। তার অনুসরণে ও নিরিখে সমগ্র ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবন তথা গোটা মানবতা সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম একটি বিশেষ মনোভঙ্গী (Attitude of mind) এবং সমগ্র জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ, যার মাধ্যমে একটি বিশেষ কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হয়। এ মনোভাব ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে যে কাঠামো তৈরি হয় সেটাই ধর্মীয় চিন্তাধারা। এক্ষেত্রে ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোন আলাদা আলাদা জিনিস নয় বরং সব মিলে একটি একক সমষ্টি। ঐ মনোভঙ্গী ও জীবন দর্শন জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করে। মানুষের ওপর আল্লাহর কি অধিকার তার আপন সত্তার কি অধিকার, মা-বাপ, স্ত্রী-সন্তানাদি, আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি, লেনদেন, সম্পর্কিত লোকজন, স্বধর্মী-বিধর্মী, শত্রু-মিত্র, এক কথায় সমগ্র মানব জাতির এবং বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু ও শক্তির কি কি অধিকার রয়েছে– সে সব অধিকার এ জীবন দর্শন নির্ণয় করে এবং তার মধ্যে পূর্ণ ভারসাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে। সে এসব অধিকার পূর্ণ ন্যায়পরায়নতার সাথে পালন করবে। এই জীবন-দর্শন মানব জীবনের একটি সুমহান নৈতিক লক্ষ্য ও একটি পুত পবিত্র আধ্যাত্মিক গন্তব্যস্থল নির্ধারণ করে দেয়। জীবনের সকল চেষ্টা সাধনাকে তা যে কোন ক্ষেত্রেরই হোক না কেন; এমন পথে পরিচালিত করবে যা সকল দিক থেকে ঐ একই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর সকল স্বয়ং সম্পূর্ণ ধর্মই তার অনুসারীদের সকল কর্মকান্ডে অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত, সাংস্কৃতিক, বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ তথা বিধি-নিষেধ আরোপ করে। এ কারণেই একজন ব্যক্তির ধার্মিক হওয়ায় এই নিভয়তা দেয় যে, সে এসব অধিকার সম্পূর্ণ ন্যায় পরায়ণতার সাথে পালন করবে এবং অন্যায় করে বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা স্বার্থে একটি অধিকার অন্যটির জন্য বিনষ্ট করবে না। আপাত: দৃষ্টিতে ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্রতম ও নগণ্যতম ব্যাপার থেকে শুরু করে সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের বড় বড় ব্যাপারেও এ মানদন্ড সমানভাবে কার্যকর। এই মানদন্ডই ঠিক করে দেয় যে একজন মানুষকে খাদ্য, পানীয় গ্রহণে, পোশাক পরিধানে, নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কে, লেনদেনে, কথাবার্তায়, এক কথায় জীবনের ব্যাপারে কোন্ কোন্ সীমারেখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কি কি বিধি নিষেধ (হারাম-হালাল, পুণ্য-পাপ, জায়েজ নাজায়েজ,মুবাহ,মাকরুহ) মেনে চলতে হবে। এই একই মানদন্ডটি আরো নির্দেশ করে যে, ধর্মহীন বা বিধর্মী তথা অন্য ধর্মাবলম্বীর সাথে মৈত্রীস্থাপনে ও শত্রুতা অবলম্বনে, যুদ্ধ ও সন্ধিতে-শান্তিতে, বিজয়কালে এবং বিজিত অবস্থায়, জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিদ্যা অর্জনে, সভ্যতা ও কৃষ্টির আদান-প্রদানে প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তিকে কোন মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে যাতে করে সে যেন তার নির্ধারিত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়।

ধর্ম অর্থে যারা কেবল মাত্র উপাসনা, আরাধনা ও মুনাজাত বলে মনে করে তাদের জন্য এটি একটি বিপ্লবাত্মক মতবাদ। কারণ ধর্ম সম্পর্কে যে ভুল ধারণা হাজার হাজার বছর ধরে বংশানুক্রমে চলে আসছে তার প্রভাব এখনো পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে আছে। আধুনিক মানুষ চাদে গেলেও যুক্তি ভিত্তিক সমালোচনা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের উচ্চাংগ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ধর্মকে বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছে না।

আরবি ভাষায় 'ইসলাম' শব্দের অর্থ অস্ত্র সমর্পণ করা, নত হওয়া, আনুগত্য স্বীকার করা। 'আল ইসলাম' এই বিশেষ পরিভাষাকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো: আল্লাহর সামনে নত হওয়া, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর সামনে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়া এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হলো: আল্লাহ, রসুলদের মাধ্যমে চিন্তা ও কর্মের যে পথ ও পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন, তাই মেনে নেয়া এবং নিজের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা তথা স্বেচ্ছাচার বিসর্জন দিয়ে ঐ পথ ও পদ্ধতির অনুসরণ করা।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম কোন নতুন যুগ ধর্ম নয়। হজরত মুহম্মদ (দ.) আরব দেশে এর ভিত্তি স্থাপন করেননি বরং যেদিন প্রথম এ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেদিনই আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর জন্য কেবলমাত্র এ 'আল ইসলামই' সঠিক ও বিশুদ্ধ জীবন ব্যবস্থা। এরপর দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের যত পথপ্রদর্শক এসেছেন, তাঁদের সকলেই নিরবচ্ছিন্নভাবে এই 'দ্বীনের' দিকেই মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। কোথাও এর অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমান

প্রকৃতপক্ষে ঈমান-ই হচ্ছে ধর্মের মূল ভিত্তি। ঈমান বা বিশ্বাস সমগ্র মানব চিত্তের এমন একটি অবস্থা যা একটি অবিচলতার ভাব সৃষ্টি করে যাতে মন ধ্রুব (CONSTANT) হয়ে অবস্থান করে। নিজেকে কোন অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না। এই বিশ্বাস জিনিসটি পৃথিবীর মতোই দৃঢ়। ইহা একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মহাশক্তি নিহিত।

ঈমান শব্দটি আরবি 'আমন' ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। 'আমন' এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি ও নির্ভীকতা লাভ। এর থেকে গঠিত আমানত। এটি খেয়ানতের বিপরীত শব্দ। অর্থাৎ যাতে খেয়ানতের ভয় নাই, তাই হচ্ছে আমানত। 'আমিন' কে এই জন্যই আমিন বলা হয়েছে যার সম্পর্কে অন্তর এই মর্মে নিঃশঙ্ক হয়েছে যে সে অসদাচরণ করবে না। এ' মূল শব্দ থেকেই আরেকটি ধাতুরূপ 'ঈমান' এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মনের ভেতর কোন কথা বা মতবাদ গভীর প্রত্যয় ও সত্যতার সাথে এমনভাবে গ্রোথিত বা দৃঢ় মূল করা, যার প্রতিকূল কোন জিনিস প্রবিষ্ট হবার কোন শঙ্কাই থাকবে না।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের শক্তি নাই অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতির অভাব আছে সে ব্যক্তি যা কিছুকে হাতে পায়, তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে, কোথাও সে পায়ের কাছে মাটি পায় না। কথায় কথায় কেবলই তার মনে হয় সর্বনাশ হয়ে গেল। বাধা-বিঘ্ন কেবলই তার মনে নৈরাশ্য ঘনীভূত করে তোলে। সেই সমস্ত বিঘ্নকে পেরিয়ে সে কোথাও চরম সফলতার নিঃসংশয় মূর্তি দেখতে পায় না।

পক্ষান্তরে দৃঢ় বিশ্বাসীর কাজ-কর্মে শক্তি আছে। কিন্তু উদ্বেগ নেই। সে মনের মধ্যে এই ধারণা অনুভব করে, যে তার একটি দাঁড়াবার জায়গা আছে। পৌঁছিবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখতে পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না। তার ভেতর থেকেও একটি স্বার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড় জায়গায় তার চিত্তের দৃঢ় নির্ভরতা বিরাজমান। এই জায়গাটিকে সে ধ্রুব সত্য বলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে। এই হচ্ছে সেই বিশ্বাস বা ঈমান যার ওপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে রয়েছে একটি উপলব্ধি, তা হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)।" পৃথিবীতে একমাত্র অবিকৃত ঐশি প্রত্যাদেশ সম্বলিত গ্রন্থের ধারক ও বাহক। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি যিনি রসুল হিসেবে দুনিয়াতে জাহির হয়ে রিসালতের সিলসিলাকে ধন্য করেছেন। যাঁর গুণাবলী প্রকাশ করা ও মহিমা বর্ণনা করা মানুষের সাধ্য নাই বিধায় ফেরেস্তাগণ তাঁর ওপর সালাম পাঠ করে ধন্য হয়। সেই মহানবির (স.) উম্মতের এই মহা দূর্দশার কারণ অনুসন্ধান করা সকল মুসলমানদের জন্য আজ অবশ্য কর্তব্য।

এটি গবেষণার বিষয় যে, এক সময়ে মাত্র কয়েক হাজার মুসলমানদের একটি দল তৎকালীন বিশ্বের 'সুপার পাওয়ার' রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের শক্তি ও ক্ষমতাকে পর্যুদস্ত করে দেয়ার পরও নিজেদের ক্ষমতা ও দক্ষতার কোনরূপ অবসন্নতা এবং দুর্বলতা অনুভব করতো না এবং এই মুসলিম জাতিটি সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র সভ্য জগতের ওপর নিজেদের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা সমুন্নত রেখেছিল। কিন্তু আজ সেই ইসলামের নাম উচ্চারণকারী এবং কোরআন অনুসরণকারীদের দাবিদারগণ সংখ্যায় কোটি-কোটি ও বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার সামনে তারা কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারছে। বরং তথাকথিত আধুনিকতার প্রভাব তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে আর ইসলামি বিধান বা আইন কানুন, রূপকথা ও কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। এর কারণ কি? এটা কি একারণে যে সত্যের মূল প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে? অথবা আল্লাহর বিধান পাল্টে গেছে? এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণ কি এটাই যে, খোদায়ি প্রকৃতি প্রথমত: ইসলামের বিজয়ের প্রয়াসী ছিল আর এখন অন্যায়, অবিচার, অনাচার, অশ্লীলতা ও মিথ্যাচার বিশ্বে বিজয়ের প্রত্যাশী হয়েছে? এর জবাব যদি না সূচক হয় এবং আল্লাহর বিধান যদি অপরিবর্তিত হয় এবং সত্য যদি তার সঠিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বিবর্তন মূলতঃ ইসলামের মধ্যে আসেনি বরং বিবর্তন এসেছে স্বয়ং মুসলমান নামে পরিচিতদের মধ্যে। তাই, এর কারণ অনুসন্ধান করে সঠিক

কার্যপন্থা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রসুল (দ.) এর মুহাব্বতের দাবি এই যে, মুহাম্মদ (দ.) এর ধর্মমতের অনুসারীদের জন্য এলম অন্বেষণ করা ফরজে আইন।

প্রেমই ঈমানের ভিত্তি :

সারা বিশ্বে প্রেম শব্দটি যত বেশি আলোচিত হয়, মানুষের মুখ হতে নিঃসৃত আর কোন শব্দ এত বেশি আলোচিত হয়নি। ধর্মগ্রন্থে, সাহিত্যে, ইতিহাসে এমনকি বিজ্ঞানেও এ শব্দটির যথেষ্ট আলোচনা দেখা যায়। মানব হৃদয় এই মহৎ আবেগ ও দুর্বলতাকে বিভিন্ন শ্রেণির লোক বিভিন্নভাবে দেখেছেন। প্রেমের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া বাস্তবিকই একটি কঠিন ব্যাপার।

তাহলে প্রেম জিনিসটা কি? বর্তমানে এটাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যেমন– প্রেম, স্নেহ ও ভক্তি একই জিনিস। এর অর্থ হলো একজনের জন্য অপরের একটি গভীর ও স্থায়ি আবেগপূর্ণ সম্পর্ক যেমন সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার করুণা। স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির সশ্রদ্ধ ভক্তি, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক, বন্ধুর সাথে বন্ধুর সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি পুরুষের ও পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ। এটা কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নিজকে উৎসর্গ করাকেও বুঝায়। বাইবেলের মতেঃ He that loveth not knoweth not God, for God is love. অর্থ– যে জন প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না– কারণ ঈশ্বরই প্রেম। 'জন-৪:৮' মানব হৃদয়ে আল্লাহ যে প্রেম দিয়েছেন তা তাঁর অসংখ্য দানের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ দান। আল্লাহতা'লা কোরআন পাকে বলেন: "তার নিদর্শনের মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা– তাদের কাছে শান্তি পাও আর তোমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রেম ও স্নেহ সৃষ্টি করেছেন। সুধি সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে" –সুরা রুম আয়াত ২১, ঐশি প্রেমের উৎস সম্পর্কে আল্লাহতালা সুরা হিজর এর ২৯ নং আয়াতে বলেন - "আমি যখন তার আকৃতি সুঠাম করিব এবং তাতে আমার রুহ সঞ্চার করিব তখন তার প্রতি সিজদা করিও।" আল্লাহ মানুষের দেহে তাঁর নিজের রুহু ফুঁক দিয়ে সঞ্চার করেছেন, সুতরাং এতে প্রেমের অবস্থান রয়েছে। শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার (জন্ম ১১৩৫ খ্রি.) এর মতে প্রেমের সংজ্ঞাটি এরূপ – "প্রেম হল নিজ অস্তিত্ব হতে মুক্ত হওয়া এবং চির সত্যের সঙ্গে নিজকে সংযুক্ত করা। তিনি আরোও বলেন : "প্রেমিকের হৃদয়ে যখন প্রেম আগুণ ধরিয়ে দেয়, তখন উহা তার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রেমাস্পদ ছাড়া আর যত কিছু আছে সব কিছুকে পুড়িয়ে ফেলে। প্রেমের ক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ ও তিতিক্ষা কাজ করতে থাকে। এজন্য ফরিদুদ্দীন আত্তার বলেন– বুদ্ধি বলতে থাকে নিজকে বাড়াও কিন্তু প্রেম বলতে থাকে তুমি নিজের স্বার্থ ত্যাগ কর। যেখানে ত্যাগ নাই, সেখানে প্রেম নাই। যারা আত্মত্যাগ করেন তারা অমর। সুরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে করিমে আল্লাহ বলেন : আর যারা– আল্লাহর পথে শহিদ হয়েছে, তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না। অর্থাৎ তারা আল্লাহর প্রেমে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে চিরঞ্জীব হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেমের এ প্রেক্ষাপটেই সকল ধর্মের ভিত্তি রচিত হয়েছে।

প্রেমের শক্তি :

মোওয়াদ্দাত, প্রেম-মুহব্বত সম্পর্কে আমেরিকার একজন অতীন্দ্রিয় গবেষক (সাইকিক রিসার্চার) ব্রাড স্টিগার প্রমাণ করেছেন যে, প্রেম অবিনশ্বর, মৃত্যু প্রেমকে ধ্বংস করতে পারে না। মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে প্রেম-প্রীতি-মমতা ভালোবাসা। মৃত্যুকে অতিক্রম করার শক্তি শুধুমাত্র প্রেমের মধ্যেই নিহিত। স্টিগার প্রেমকে আখ্যায়িত করেছেন রহস্যময় আকর্ষণীয় শক্তি হিসেবে। THE LOVE FORCE (প্রেমের শক্তি) নামে এই গবেষণামূলক বইয়ে বলেছেন, "মৃত্যুর ওপার থেকে মৃত ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে দর্শন দিয়েছেন, বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, পার্শ্বে দাঁড়িয়েছেন– এমন অনেক প্রমাণ সমৃদ্ধ ঘটনা আমি জানতে পেরেছি, যা আমাকে বিয়ে বিমূঢ় করেছে। মৃত্যুর শীতল কাঠি প্রেমের গভীর আকর্ষণী শক্তির কাছে পরাজিত এমন প্রমাণ আমি বহু পেয়েছি।"

মোওয়াদ্দাত-প্রেম-ইশক-মুহব্বতের সংজ্ঞা মি. ব্রাড এভাবে দিয়েছেন :

"প্রেম শুধু অনুভব, চিন্তা বা দৈহিক স্পর্শের অভিজ্ঞতা নয়। এরও গভীরে-অতি গভীরে প্রেম (মোওয়াদ্দাত) হচ্ছে এক বিস্ময়কর মহাশক্তি।"

ব্রাড তাঁর গ্রন্থে যেসব সত্য ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, এগুলোর কোন কোনটি ভয়ের শিহরণ জাগায়; তেমনি কোনটি আবার অশ্রুসজল করে তোলে পাঠকের হৃদয়। এই বই হতে দুটি মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের ঘটনা সংক্ষেপে এইরকম :

** ল্যারি জাজ। ৬৯ বছরের বৃদ্ধ। তার প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু সহ্য করা ছিলো তার পক্ষে অসম্ভব। আমার সব কিছু শেষ। এ জীবন রেখে আর কি লাভ? ভাবলেন ল্যারি। তারপর পিস্তলটা বের করলেন, নিজের জীবন শেষ করার প্রস্তুতি নিলেন। মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপতে যাচ্ছেন ল্যারি। তখন বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন তার সামনে দাঁড়ানো এলিসা-তাঁর স্ত্রী (মৃত)। কোমল কণ্ঠে এলিসা বললেন : লক্ষ্মী, পিস্তলটি ফেলে দাও প্লিজ। ল্যারি পিস্তল নামাতেই এলিসা হাসলেন। সেই স্নিগ্ধ হাসিটি যা' ল্যারির মনে সব সময় প্রশান্তি এনে দিতো। এলিসা বললেন "এসো আমার সঙ্গে। এলিসার পেছনে পেছনে পাশের ঘরে গেলেন ল্যারি। সেখানে সেলাই মেশিন আর লোহার আলমারিটি রয়েছে। আলমারির সামনে

গিয়ে এলিসা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আলমারি খুললেন ল্যারি। তার মধ্যে রয়েছে একটি ছোট্ট টিনের বাক্স। সাগ্রহে বাক্সটির ঢাকনা তুললেন। ভেতরে অনেক প্রেমপত্র। ল্যারিরই লেখা। অনেক বছর আগে তিনি এলিসাকে লিখেছিলেন, এলিসা সেগুলো সযত্নে রেখে দিয়েছেন।

ব্রাড স্টিগারকে (লেখককে) ল্যারি বলেছেন, চিঠিগুলো দেখে আমার মনে হলো এলিসা যেন আমাকে বলছে, আমি মৃত নই। আমাদের ভালোবাসা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে।

** উইলিয়াম মন্ডেল ও ইভ শিল্ডস স্কুল থেকে ছিলেন সহপাঠী। নয় বছর পর একদিন উভয়ে আবিষ্কার করলেন তারা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছেন। তারা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বিয়ের এক মাস আগে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেল উইলিয়াম। উইলিয়ামের মৃত্যুতে গভীরভাবে দুঃখিত হলেন ইভ। পরবর্তীতে তার পরিচয় হলো ওয়েন ল্যাভায়িটির সঙ্গে। ইভকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য ওয়েন ধৈর্যের সঙ্গে দুবছর অপেক্ষা করলেন মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হলেন ইভ।

বিয়ের কয়েক দিন আগের ঘটনা। ইভ বিছানায় শুয়ে কাঁদছিলেন উইলির স্মৃতি নিয়ে। কারণ বিয়ের সিদ্ধান্তটি তার মনে অস্বস্তি ভাবের উদ্রেক হচ্ছিল। তিনিও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। তিনি ভাবলেন এখন যদি উইলি থাকতো, তাহলে ওর সুচিন্তিত মতামত পাওয়া যেত। নিজের ফোঁপানো কান্নার শব্দের মধ্যে হঠাৎ ইভ শুনতে পেলেন উইলির শান্ত-ভারী কণ্ঠস্বর। চোখ তুলে তাকিয়ে তিনি দেখলেন সামনে দাঁড়ানো উইলি (মৃত)। জীবিত অবস্থায় যেভাবে দাঁড়াতো, ঠিক সেভাবেই দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে ইভকে বললেন উইলি, ওয়েনকে বিয়ে করা ভুল হবে। ওকে যেমন মনে হয় আসলে ও তেমন নয়। ওকে তুমি বিয়ে করবে না।

দুসপ্তাহ পর পুলিশ গ্রেফতার করলো ওয়েনকে। অভিযোগ মাদক দ্রব্য ব্যবসায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ওয়েন। আরও জানা গেল ওয়েন বিবাহিত। স্ত্রীকেও মাদকে আসক্ত করেছে সে। তার স্ত্রী রয়েছেন পাগলা গারদে।

দু'বছর পর ইভ পরিচিত হলেন টম শিল্ডস এর সঙ্গে। এক বছর পর টমও বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। ইভের মনে হলো উইলি আবার দেখা দেবেন। টমকে বিয়ে করার সিন্তান্ত সঠিক কিনা জানাবেন। ইভের ধারণা সত্যি হলো। উইলি দেখা দিলেন। ওর ঠোঁটে সম্মতি ও আনন্দের হাসি। কিছু বলার আগেই উইলি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (রহস্য পত্রিকা, আহমেদ নুরে আলম, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২)।

আলোচ্য সত্য ঘটনা সমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এটা সম্পূর্ণ মানবিয় প্রেমের সম্পর্ক এবং এসব ব্যক্তিবর্গ কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তিগণকে জীবিত ব্যক্তিরা অত্যন্ত ভালোবাসতেন তাই এই ভালোসারার দাবিই তাদেরকে মৃত্যুর পরপার থেকে টেনে আনতে বাধ্য করেছে। আর প্রিয়জনরা যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সে কারণে তারা জীবিত প্রিয়জনদের নিকট স্বশরীরে আত্মপ্রকাশ করে সঠিক পরামর্শ দিয়ে তাদেরকে পার্থিব কষ্ট তথা সমস্যা হতে মুক্ত রেখেছেন।

যদি কোন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে (ঘুমের মধ্যে নয়) শুধুমাত্র পার্থিব প্রেমের গভীরতার কাছে মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য সহযোগিতা পেতে পারে, সেক্ষেত্রে আল্লাহর রসুল বা আলে রসুল তথা আহলে বাইতের মতো মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশে এই অপার্থিব ও নিঃস্বার্থ মোয়াদ্দাত তথা ঐশি প্রেমের শক্তি কত কোটিগুণ বেশি তা সহজেই আন্দাজ করা যায়।

কলেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজে তথা সকল প্রকার ইবাদতের মূল ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিকতা ও নিয়তের বিশুদ্ধতা। শুধুমাত্র প্রেমের গভীরতায় এই দুইটি মহান গুণ অর্জন করা যেতে পারে। ফলে ইবাদতের পূর্ণতা আদায় করা সম্ভব হয়। বিষয়টির সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে আল্লাহ-রসুল (দ.)– আহলে বাইতের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা– প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মের ভিত্তি।

এ কারণেই প্রেমের মাহাত্ম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে: "আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, তখন তার মধ্যে 'রহমানের' প্রতি প্রেম সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐশি প্রেমই এলমের পূর্বশর্ত। ঐশি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে হজরত ঈশা (আ.) যখন আল্লাহর নামে ফুঁক দিতেন আল্লাহর নামের গুণে মৃতের জীবন আসতো।

অথচ সাধারণ মানুষ আল্লাহর পবিত্র নাম জপ করে। কিন্তু ইহা ফলবতী হয় না কারণ এতে পবিত্র প্রেম নেই। ড. ইকবাল বলেছেন : আজান দেয়ার প্রথা রয়েছে কিন্তু তাতে বেলালের মতো প্রাণশক্তি (প্রেম) নেই। দর্শন শাস্ত্র আছে কিন্তু ইমাম গাজ্জালীর শিক্ষা নেই।

মাওলানা রুমী (রা.) বলেন "যুক্তি শয়তানের প্রেম আদমের"। তিনি আরও বলেন, সাবধান! বাইরের অস্থায়ি সৌন্দর্য্যের আকর্ষণজনিত প্রেম পরিহার কর। তিনি বলেন, দুনিয়া কি? দুনিয়া হলো আল্লাহকে ভুলে যাওয়া। সংসার সামগ্রী, টাকা-পয়সা, সন্তান-সন্ততি দুনিয়া নহে। মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে কেবল স্ত্রী-পুত্র-ঘর সংসার ও টাকা-পয়সার প্রেমের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তখন দুনিয়া তাকে গ্রাস করে। তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয়ে যায় শারীরিক ব্যবসার মতো। পিতা-মাতার সাথে সন্তানদের সম্পর্ক হয়ে যায় ভক্তিহীন বোঝার ন্যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহকে স্মরণ রেখে এইসব সম্পর্ক বজায় রাখলে তা হয় স্বগীয় ও স্বর্গ পাওয়ার উপায়। তাঁর মতে, মানুষকে ভালোবাসলে আল্লাহকে ভালোবাসা হয়। এই প্রেমই সৃষ্টির মূল। আল্লাহর আদি অস্তিত্বে আল্লাহর প্রেমের দরুন নিজকে নিজে প্রকাশিত করেন। এই পবিত্র প্রেমই মুহাম্মদের (দ.) সঙ্গে এক হয়েছিল। প্রেমের জন্যই আল্লাহ তাকে বলেছিলেন, "তোমাকে সৃষ্টি না করলে আমি আকাশ সমূহ, বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করতাম না।"

ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা এবং মানব প্রেমের জয়গান মাওলানা রুমী (র.) নিম্নবর্ণিতভাবে বর্ণনা করেছেন–

"প্রেমে বন্দীশালা ফুল বাগানে পরিণত হয়। যেখানে প্রেম নাই সেই ফুল বাগান অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়। প্রেমে আগুণ আলোতে পরিণত হয়। প্রেমে আলো আগুণে পরিণত হয়। প্রেমে পাষাণ তৈলে পরিণত হয়। প্রেমহীন মোম লোহায় পরিণত হয়। প্রেমে রোগ স্বাস্থ্যে পরিণত হয়। প্রেমে ক্রোধ রহমতে পরিণত হয়। প্রেমে মৃত জীবিতে পরিণত হয়।"

"প্রেমের গুণে মাটির শরীর আকাশে উত্তোলিত হয়। পাহাড়, পর্বত চলমান হয়। ওহে প্রেমিক, প্রেমই তুর পর্বতে প্রাণ সঞ্চার করেছিল। প্রেমের কারণে তুর প্রেম মত্ত হয় এবং মুসা (আ.) মূর্ছা যান।" এখানে কোরআনে বর্ণিত মেরাজ ও তুর পর্বতে মুসা (আ.) কর্তৃক আল্লাহর নুর দর্শনের কথা বলা হয়েছে। মাওলানা লিখেছেন, পয়গম্বর (দ.) বলেন: "আল্লাহ বলেছেন, আমি ওপর বা নিচে কোনখানে বিধৃত হই না, হে প্রিয়, পৃথিবী বা আকাশও আমাকে বিস্তৃত করতে পারে না। তুমি আশ্চর্যান্বিত হলেও জানিও আমি মোমেনের ক্বলবে বিধৃত হই। আমার সাথে যদি ভালোবাসা করতে চাও, তা হলে ঐখানে (ক্বলবে) অনুসন্ধান করো।"

হজরত ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ:) বলেন :– অন্যান্য ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন বেহেস্ত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু যারা আরেফ বা যারা খোদার পরিচয়ে জ্ঞানী, তাদেরকে সব কিছুই এই পৃথিবীতে দেয়া হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমাকে প্রেমাগ্নিতে দগ্ধ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বিপদ হতে মুক্তি পাবে না। হজরত আবু আসার সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী আবদুহু আল হোসাইনি তাঁর বিখ্যাত "নাহজুল হেদায়া" গ্রন্থে লিখেছেনঃ ইশক/প্রেম হলো সাহচর্য ও সান্নিধ্যের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, যাহা সর্বকালে স্থিতিশীল। ইশকই ঈমান-একিন। ইশকই দৃশ্য ও অদৃশ্যমান বিষয়। ইশকই ঐশি গ্রন্থ বা খোদার কিতাব। ইশকই রসুল-রিসালত-নবুয়াত। ইশকই হেদায়েতকারী, হেদায়তপ্রাপ্ত মাহদী ও মুর্শিদ। সময়ের নির্দেশবাহী হলো ইশক। জীবনের উৎস মূলে রয়েছে ইশক। সৃষ্টির আদিতে ছিল ইশকের স্পন্দন। অনন্তে আছে এর প্রতিধ্বনি। মা হাজেরার অসহায়ত্বে ছিল ইশকের ছায়া। ইসমাইলের (আ.) ব্যাকুলতা ইশকে পরিব্যস্ত। ইব্রাহিমের (আ.) তাসলিম ও রিজার তীক্ষ্ণ তরবারি হলো ইশক। হোসাইনের (আ.) আত্মোৎসর্গে রয়েছে ইশক। জগতের প্রতিটি বিন্দু ইশকের আমানত বহন করে। সমস্ত জগতের অবয়বে ও অভ্যন্তরে চেয়ে দেখ, ইশক ব্যতীত কি আর রয়েছে!

আকাশ স্তম্ভে ইশক। আল্লাহর আরশকে বহন করছে ইশক। ইশকই পবিত্র আত্মার কেবলা-কাবা। জ্বিন, ইনসান, তারকারাজির ভারসাম্য আসমান ও জমিনের নিয়ন্ত্রক হলো ইশক। এ বিরাট বিশ্বের যাবতীয় বস্তু বৈচিত্র্যময়, আল্লাহর সুন্দর প্রাণবন্ত সব কিছু আকাশ, বাতাস, রবি, শশী, জল, তারকার আলো ইশকের আবরণ মাত্র। আল্লাহর সমস্ত নাম জুড়েই ইশকের অবস্থান। আল্লাহতা'লা ব্যতীত তাঁর নাম সমূহ সম্যকরূপে কেউ জানে না বা তাঁকে উপলদ্ধি করতে পারে না। ফানা-বাকা তথা আত্ম বিলুপ্তির ও স্থায়িত্বের নাম হলো ইশক।

হজরত আবদুল কাদের জিলানি (রা.) বলেন, "আল্লাহর সাথে সম্পর্ক (প্রেমের) স্থাপন কর। তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী উপকৃত হয়। যে আল্লাহকে ভলোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। যে আল্লাহকে চায়, আল্লাহ তাকে চান। যে আল্লাহকে চিনতে সাধনা করে, আল্লাহ তাকে তার মারেফত দান করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐশি প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত অন্তর দিয়ে কলেমা তাইয়্যেবা বা ধর্মের বিধি বিধানের ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য উপলদ্ধি করে তা ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই ঈমানের দাবি।

ঈমানের পরীক্ষা :

মৌখিক ঈমান কখনই ইহকালীন উন্নতি বা শান্তি বা সাফল্যের মানদন্ড হতে পারে না। অনুরূপভাবে মৌখিক মুহব্বতের দাবিদার কিছুতেই পরকালীন আজাব থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবেনা। বরং মানুষকে ঈমানের বা এই মহব্বতের পরীক্ষা জীবনের সকল কর্মকান্ডে দিতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

"মানুষ কি সেই ধোঁকায় আছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই কি ওদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করা হয়েছিল। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।" (সুরা আনকাবুত–১৪) চলার পথে মানুষের জীবনে এই পরীক্ষার ধরন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে ।

"মানুষ এমন যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে সম্মান ও প্রতিপত্তি দিয়ে পরীক্ষা করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন আর যখন জীবনের উপকরণ কমিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে ছোট করে দিয়েছেন।" (সুরা ফজর ১৫-১৮)

"নিশ্চয় আমি তোমাদের কাউকে ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর কাউকে ধনে-প্রাণে বা ফসলের ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব, আর যারা ধৈর্য ধরে তুমি তাদের সুসংবাদ দাও।" (বাকারা– ১৫৫)।

আর জেনে রাখ, "তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তো এক পরীক্ষা, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে বড় পুরস্কার"। (আনফাল–১৮)

"আর মানুষের মধ্যে এ সংকটময় দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি অদল-বদল করে থাকি, যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের চিনতে পারেন ও তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে সাক্ষী করতে পারেন, আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর যাতে বিশ্বাসীদের শোধরাতে পারেন ও অবিশ্বাসীদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।" (আল ইমরান – ১৩৯-১৪২)

প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন-মৃত্যুর রহস্যই পরীক্ষার বিষয়বস্তু এ প্রসঙ্গে সুরা মুলক ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

"মহিমান্বিত তিনি সার্বভৌম ক্ষমতা যাঁর হাতে। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, যিনি মৃত্যু ও জীবনের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিকে ভাল।" "তোমরা কি মনে করো তোমরা বিনা পরীক্ষায় বেহেস্তে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের পূর্বে যাঁরা চলে গেছে, তাদের অবস্থা তোমাদের মতো হয়নি। অর্থ সংকট ও দুঃখ দারিদ্রে তাঁদের স্পর্শ করেছিল আর তাঁরা ভীত কম্পিত হয়ে পড়েছিল। এমনকি রসুল ও তাঁর ওপর বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ বলে ওঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে।" (বাকারা- ২১৪)

কোরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মানুষকে প্রধানত: দুই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে– প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট। প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক কারণে আপতিত বিপদাপদ যেমন শারীরিক

অসুস্থতা, ঝড়-বন্যা, ভূমিকম্প, অতিরিক্ত বরফপাত, জলোচ্ছ্বাস, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কীট-পতঙ্গের আক্রমনজনিত শস্য হানি ও অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি বিপদ সম্পর্কে পূর্বে জানা থাকলে কিছু কিছু সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হলেও এর ফলে সৃষ্ট ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো কখনও সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে মানব সৃষ্ট বিপদাপদের মধ্যে রয়েছে– যুদ্ধ, মানুষের অন্যায় আচরণ, হত্যা, অবিচার, চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, রাহাজানি, হাইজাকিং, মিথ্যাচার, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার এবং সকল ধরনের মানবিয় অন্যায় ও অমানবিক আচরণ এর অন্তর্ভুক্ত।

স্মরণ রাখতে হবে, সকল প্রকার বিপদাপদ আল্লাহর তরফ থেকেই আসে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মানব সৃষ্ট সমস্যাবলীর ব্যাপারে আল্লাহর কোন ভূমিকা আছে বলে বোঝা যায়

বা বিশ্বাস করা হয় না। কিন্তু কার্যত: সকল প্রকার বিপদাপদ আল্লাহর নির্দেশে ও অনুমোদনেই হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরীক্ষা করে সংশোধন করানো ও আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার মতো চরিত্র সৃষ্টি করতে সহায়তা করা। এই প্রেক্ষাপটেই কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

"পৃথিবীতে আমি তাঁদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি। তাঁদের কেউ কেউ সৎকর্ম পরায়ণ ও কেউ কেউ অন্য রকম। মঙ্গল-অমঙ্গল দিয়ে তাঁদের পরীক্ষা করি, যাতে তাঁরা ফিরে আসে"। (সুরা আরাফ–১৬৮)।

"হে মানুষ, আমি তোমাদের মধ্যে এক কে দিয়ে অপরকে পরীক্ষা করি। তোমরা কি ধৈর্য ধরবে। তোমার প্রতিপালক সবই দেখেন।" (ফুরকান–২০)

"আমি অবিশ্বাসীদের কাউকে কাউকে তাদের পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার দিকে তুমি কখনও লক্ষ্য করোনা। তোমার প্রতিপালকের দেওয়া জীবনের উপকরন বেশি ভাল আর বেশি স্থায়ি।" (ত্বাহা-৩১)

পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র আল্লাহ-রসুল, আহলে বাইত, আখেরাতের প্রতি মুহব্বত পোষণ করে ঈমান এনেছি একথা উচ্চারণ করলেই মানুষের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং মানুষের জীবনের সার্বিক কর্মকান্ডে আল্লাহ-রসুলের (দ.) নির্দেশের কতটুকু প্রতিফলন ঘটে তা' এবং আল্লাহর পরীক্ষা স্বরূপ প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট বিপদাপদ ও ঘটনাবলীতে মানুষের প্রতিক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে বিশ্লেষণ করে যদি শরিয়তে মুহাম্মদীর বিচারে সঠিক পাওয়া যায়, তবেই তাকে আল্লাহ রসুল-আহলে বাইতের প্রকৃত মুহম্বতকারী বলে বিবেচনা করা হবে।

ঐশি প্রেমের পদ্ধতি :

মহান আল্লাহকে মুহব্বত করা বা ভালোবাসার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "হে নবি, আপনি বলুন - তোমরা যদি আল্লাহকে মুহব্বত করো, তবে আমার (আল্লাহর) রসুল মুহম্মদ (দ.) কে (মুহব্বতের বহিপ্রকাশ হিসেবে) পূর্ণ অনুসরণ কর, তাহলেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।" (আল এমরান–৪৪)

উল্লেখিত আয়াত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আল্লাহকে ভালোবাসা আল্লাহরই নির্দেশ। আবার আল্লাহতা'লা বলেছেন, রসুল (দ.) কে মুহব্বত করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে ভালোবাসা। এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের প্রাণপ্রিয় নবি আলাইহিস সালাম এরশাদ ফরমান, "তোমাদের মধ্যে কেউ মুসলমান বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হই।" (সহিহ বোখারি ও মুসলিম)।

প্রকৃতপক্ষে রসুল (দ.) এর মুহব্বতই যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত পবিত্র কোরআন-হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায়। নিজের জীবন থেকে রসুল (দ.) কে যারা বেশি মহব্বত করতেন, তাঁরাই ইসলামের ইতিহাসে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব হিসাবে খ্যাত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, হজরত আলী (আ.), হজরত মুহম্মদ (দ.) কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন এবং তার প্রমাণ হিসেবে হজরত রসুল (দ.) যে রাতে মক্কা ত্যাগ করে চলে যান, সে রাতে হজরত আলী (আ.) নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও রসুলে খোদা (দ.) এর বিছানায় শুয়ে থেকে রসুল (দ.) প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

হজরত আবুবকর (রা.) নিজের জীবন বিপন্ন করে রসুল (দ.) এর সাথে মক্কা ত্যাগ করে তার সফর সংঙ্গী হন। আশারে মুবাশশরের (বেহেশতে যাওয়ার সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন) সাহাবিগণও নিজেদের জীবন বিপন্ন করে রসুল (দ.) প্রেমের চরম পরকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

হজরত ওয়ায়েস ক্বরনী (রা.) ওহুদের যুদ্ধে নবি করিম (দ.) এর দাঁত মোবারক শহিদ হওয়ার খবর শুনে নিজের সমস্ত দাঁত ভেঙে রসুল (দ.) প্রেমের অতুলনীয় নিদর্শন পৃথিবীর বুকে পেশ করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে রসুল (দ.) এর প্রতি যে যতবেশি মুহব্বত দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি আল্লাহর নিকট ততো মর্যাদাবান হিসেবে গণ্য।

একজন প্রকৃত ঈমানদারের রসুল প্রেমের কি নিদর্শন হওয়া উচিত তা খুবাইব ইবনে আদী (রা.) এর শাহাদতের ঘটনা থেকে বুঝা যায় । হজরত সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, "আমি মুশরিক অবস্থায় খুবাইব ইবনে আদীকে শুলীতে চড়ানোর দৃশ্য দেখেছিলাম। আমি আরও দেখেছিলাম, কুরাইশরা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক এক করে কেটে ফেলছে। সে সময় কুরাইশরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার স্থানে মুহম্মদ (দ.) কে আনা হোক, তা কি তুমি পছন্দ কর? উত্তরে হজরত খুবাইব (রা.) বলেছিলেন, আল্লাহর কসম, আমি, আমার পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততির মাঝে নিরাপদে ফিরে যাই, আর এর বিনিময়ে মুহম্মদের (দ.) গায়ে কাঁটার একটি আচড়ও লাগুক তাও আমার মনঃপুত নয়।" (সহিহ বোখারি)

প্রকৃত রসুল প্রেমিকের এই ঘটনা দর্শনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাও আমরা হজরত সাঈদ (রা.) এর বর্ণনায় পাই। তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম, যখনই আমার সে দিনটির স্মৃতি মনে পড়ে এবং কেন আমি সেদিন তাঁকে (হজরত আদীকে) সাহায্য করিনি এ অনুভূতি আমার মধ্যে জেগে ওঠে তখন আমি চেতনা হারিয়ে ফেলি। আমার মনে হয়, আল্লাহ আমার এ অপরাধ ক্ষমা করবেন না।" (সহিহ বোখারি)

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ হতে রসুল (দ.) কে বাদ দিলে ইসলামে দাঁড়াবার মতো ভিত্তি নেই। তাই পবিত্র কোরআনে রসুল (দ.) ও আল্লাহ এর মধ্যে পার্থক্যকারী সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"আল্লাহ ও তাঁর রসুলের মধ্যে যাহারা পার্থক্য করিতে ইচ্ছা করে এবং বলে যে, আমরা কিছুকে বিশ্বাস করি এবং কিছুকে অবিশ্বাস করি এবং তাহারা ইহার মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে, উহারা প্রকৃতপক্ষে (পুরোপুরি) কাফের।" (সুরা নেসা: ১৫০-১৫১)

এ কারণেই মুহম্মদ (দ.) এর রিসালতের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ড. ইকবাল (রা.) বলেন, যদি হজরত মুহাম্মদ (দ.) এর ওফাদারি কর, তাহলে আমি খোদা তোমারই। এই পৃথিবীতো তুচ্ছ। আল্লাহর লৌহ কলম পর্যন্ত তোমারই হাতে। (জওয়াবে শেকওয়া)

প্রকৃতপক্ষে রিসালতই এই বিশ্বদেহে প্রাণ ঠুকে দিয়েছে। ইহাই বিশ্ব দেহের রূহ। কেননা ইহার দ্বারা স্থিরকৃত হয়েছে মানব জীবনের লক্ষ্য। মানুষের জীবনে এনেছে নীতি, নিয়ম-কৃংখলা, আইন-কানুন ও ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি। সমুদয় মানব জাতিকে একই সূত্রে আবদ্ধ রাখবার প্রধান সূত্র। রিসালত দ্বারাই মানুষ একটি মাত্র লক্ষ্যে উপনীত হয়ে সকলে একই মানবতার সাগরে মিশে যেতে পারে।

কাজেই দ্বীন ইসলামের ভিত্তি প্রস্তর হজরত "রেছালাতে মা আব (দ.)"। তিনটি বিশেষ কারণে মুসলিম জীবন হজরত রসুলে করিমের (দ.) সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোরআন ও হাদিসের আলোকে আল্লামা ইকবাল এই কারণ তিনটি ইসলামের প্রধানতম ভিত্তি রূপে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে–

১। "হে মানব; তোমাদের নিকট আসিয়াছে আল্লাহর রসুল। তোমরা ঈমান আন, তাঁহার ওপর এবং বিশ্বাস করো তাঁহাকে। কেননা উহা তোমাদেরই মঙ্গলের কারণ।" সুরা নেছা- ১৭০)

২। "আল্লাহতা'লা আমাদের মূর্তি সৃষ্টি করে রেছালতকে সেই মূর্তি দেহে প্রাণ স্বরূপ ঢালিয়া দিয়াছেন।" (রমুজ)

৩। "রেসালত দ্বারাই এই বিশ্বে আমাদের অস্তিত্ব এবং রেসালত হইতেই আমাদের দ্বীন-ধর্ম ও আইন কানুন সবকিছু।" (রমুজ)।

রসুল কি? তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি। যেমন মাওলানা রুমী বলেন, "ছায়ায় অন্ধকারে সূর্য যেরূপ, আল্লাহর রসুল (দ.) আমাদের মধ্যে সেরূপ এক নুরি-জ্যোতি সিদ্ধ পুরুষ। তিনি দুনিয়ার বুকে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং তাঁহার হাত খোদার হাত। তাঁহার আদেশ আল্লাহরই আদেশ এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথই আল্লাহর নির্দেশিত পথ। সমুদয় মানবকুলের তিনি অগ্রদূত। সুতরাং আমাদের উচিত তাহাকেই জীবনের পথ প্রদর্শকরূপে বরণ করিয়া লওয়া, আমাদের পছন্দ অপছন্দ তাঁহারই মর্জি ও আদেশের অধীন করিয়া দেওয়া। যেমন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে : "মন-আতায়ার রসুলা ফাকাদ আতা আল্লাহ"– যে ব্যক্তি রসুলের আদেশ পালন করিয়াছে, সে ব্যক্তি আল্লাহরই আদেশ পালন করিয়াছে। তাই আঁ হজরতের (দ.) এর প্রতি অকৃত্রিম মহতই আমাদের জন্য সিরাতুল মুস্তাকিম। যেখানে এই ভিত্তি যত দুর্বল, সেখানে ঈমান তত দুর্বল। (আল্লামা ইকবালের মারফতে খোদা-মোহাম্মদ ইব্রাহিম, পৃঃ ১৫১-১৫৫)

সূফি কবি কাজি নজরুল ইসলাম আল্লাহ ও রসুলের (দ.) সম্পর্কে নিম্নোক্তভাষায় বর্ণনা করেছেন ।

"তৌহিদের মুর্শীদ আমার মুহাম্মদের নাম
ঐ নাম জপলেই বুঝতে পারি খোদায়ি কালাম।
ঐ নামের রশি ধরে যাই আল্লাহর পথে
ঐ নামের ভেলা ধরে ভাসি নুরের স্রোতে।
ঐ নামের বাতি জ্বেলে দেখি আরশ মোকাম।
ঐ নামের দামন ধরে আছি আমার কিসের ভয়
ঐ নামের গুণে পাবো আমি খোদার পরিচয়।
তাঁর কদম মোবারক আমার বেহেশতী তাঞ্জাম।"

এ কারণেই মুসলিম জীবন চরিতে কাহারো দেখা– না দেখা, খাওয়া- না খাওয়া, আহার-বিহার নিদ্রা-জাগরণ সমস্ত কিছুই আল্লাহ ও রসুলের (দ.) আদেশাধীন। ইহার ফলে মুসলিমের মর্জির মধ্যে আল্লাহর মর্জি হারিয়ে যায়। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে হজরত মাওলানা রুমী (রা.) বলেছেন -

"মগজে কোরান রুহে ঈমান জানো দিল
হস্তে হুব্বে রহমতুল্লিল আলামিন।"

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের মস্তিস্ক (জীবন্ত কোরান, কোরান-এ-নাতেক) তথা ঈমানের মূল প্রাণ শক্তি বা আত্মাই হচ্ছে রসুল (দ.) এর মুহব্বত।

আহলে বায়াত :

এই মহান রসুল (দ.) কে ভালোবাসার দাবি কি, তা সকল উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য জানা অবশ্য কর্তব্য। রসুল (দ.) আমাদের কাছ থেকে কি দাবি করেন, তা পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : "হে নবি, বলিয়া দিন যে, এই ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য আমি (নবি) তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহিনা, আমার নিকটতম জনের মুওয়াদ্দত (প্রাণাধিক ভালোবাসা) ব্যতীত।" (শুরা-২৩) ।

ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল, বারানী, কাজি নাসির উদ্দিন যাঅজ্জীসহ প্রসিদ্ধ তাফসিরকারকগণ তাঁদের স্ব স্ব তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই আয়াতটি নাজিল হলে রসুল (দ.) কে সাহাবিগণ কর্তৃক প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোরআনে বর্ণিত আপনার নিকটতম আত্মীয় কারা? যাঁদের 'মুওয়াদ্দত' উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য ফরজ করা হয়েছে। রসুল (দ.) এরশাদ করেন, তাঁরা হলেন হজরত আলী (আ.), হজরত ফাতেমা (আ.), আমিরুল মুমেনিন হাসান (আ.), হজরত ইমাম হোসাইন (আ.)। আলোচ্য আয়াতে মুহব্বত শব্দের পরিবর্তে মুওয়াদ্দত শব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যদিও আপাত: দৃষ্টিতে মহব্বত ও মুওয়াত শব্দটির অর্থ ভালোবাসা। কিন্তু মুওয়াদ্দত শব্দটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো এমন এক স্থায়ি অবিচল ও অবিচ্ছন্ন প্রগাঢ় সম্পর্ক তথা মুহব্বত বা ইশ্‌ক বা প্রেম যা কোন ব্যক্তির অন্তর থেকে চলে গেলে তার বাহ্যিক আচার-আচরণ যাই হোক না কেন সে কার্যত ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে অমুসলিমে পরিণত হয় (নাউজুবিল্লাহ)।

রসুল (দ.) আহলে বাইত সম্বন্ধে এরশাদ ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহ তোমাদিগকে যে নেয়ামত দান করিয়াছেন, তার জন্য আল্লাহকে ভালোবাস এবং আল্লাহর জন্য আমাকে ভালোবাস এবং আমাকে ভালোবাসার জন্য আমার আহলে বাইতকে ভালোবাস।" (মেশকাত শরিফ)

আল্লাহ আমাদিগকে যে সকল রিজিক ও নেয়ামত ও হেদায়েত দান করেছেন, তা স্মরণ করে আল্লাহকে ভালোবাসা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে মুহম্মদ (দ.) কে ভালোবাসতে হবে। মুহম্মদ (দ.) কে ভালো না বাসলে আল্লাহকে ভালোবাসা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে মুহম্মদ (দ.) কে ভালোবাসতে হলে তাঁর আহলে বাইতকে অবশ্যই ভালোবাসতে হবে। আহলে বাইতকে ভাল না বাসলে মুহম্মদ (দ.) কে ভালোবাসা পূর্ণ হবে না। মূল কথা, আহলে বাইতকে ভালোবাসাই মুহম্মদ (দ.) কে ভালোবাসা এবং মুহম্মদ (দ.) কে ভালোবাসাই আল্লাহকে ভালোবাসা। অর্থাৎ আল্লাহকে ভালোবাসার নিম্নতম সিঁড়ি রসুলে (দ.) এর আহলে বাইত।

আহলে বাইত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে শত শত আয়াত আছে বলে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

"–তবে আপনি (মুহম্মদ দঃ) বলিয়া দিন,–এসো আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণকে এবং আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং আমাদের জীবন-নফ্স সমূহকে আহ্বান করি এবং প্রার্থনা করি যে অসত্যবাদীগণের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হোক।" (সুরা আল ইমরান - ৬১)

ইসলামের ইতিহাসে এই আয়াত পাক আয়াতে মোবাহিলা নামে প্রসিদ্ধ। নজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধিগণ রসুল (দ.) এর সাথে যুক্তিতর্কে পরাস্ত হয়েও যখন তাঁর নবুয়ত ও ইসলামের সত্যতা স্বীকার করলো না, তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে মোকাবিলার আহ্বান করলেন। দ্বীন ইসলামের ভিত্তি যেখানে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, সেখানে রসুল (দ.) নিজে এবং তাঁর নফ্স স্বরূপ আলী (আ.), রসুল (দ.) এর কন্যা বিশ্ব জননী ফাতেমা (আলবতুল) রসুল সন্তান হিসেবে হজরত হাসান (আ.) ও হজরত হোসাইন (আ.) দ্বীন ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, এই মহান জনদের পবিত্র চেহারা মুবারক দর্শন করেই খ্রিস্টান পাদরি আন্তরিকভাবে বুঝতে পারে যে, ইহারাই দ্বীন ইসলামের ভিত্তি। তাই এদের সাথে মোকাবিলা করা হলে খ্রিস্টান জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই তারা এই মোকাবিলার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান জাতিকে রক্ষা করলো। এখানে প্রণিধানযোগ্য, ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলার জন্য আল্লাহতা'লা এই পাঁচজনকেই দ্বীন ইসলামের শারীরিক প্রতিচ্ছবি (Physical Representation) হিসেবে বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ ধর্ম ইসলামকে বুঝতে হলে এই পাঁচ মহানজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে, চিন্তা ও গবেষণা করতে হবে এবং সর্বোপরি ভালোবাসতে হবে।

সুরা আল ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে। "তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ়রূপে ধারণ করো ও বিভক্ত হইও না। এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের অন্তকরণে প্রীতি স্থাপন করেন। অতঃপর তোমরা তাঁহার অনগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইলে।"

হজরত ইমাম জাফর সাদেক (রা.) এই আয়াতে 'আল্লাহর রজ্জু' বলতে আহলে বাইত তথা আলে রসুল, আলে মুহাম্মদ (দ.) কে বুঝানো হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে যে, "নিশ্চয় আল্লাহ চাহিতেছেন, তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করিবার জন্য, তোমরাই সকল অপবিত্রকে পবিত্রতা দানকারী।" (সুরায়ে আহজাব)

অর্থাৎ এই মহান আহলে বাইত পাক হইলেন –মহা পবিত্র । স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করেছেন যে, তারাই পবিত্রকারী। সুতরাং পবিত্র হতে চাইলে এদেরই নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। অপরকে পবিত্র করার সহি সনদ একমাত্র তারাই পেয়েছেন। উল্লেখ্য, রসুল (দ.) এর নবুয়াতি দায়িত্বের একটি বিশেষ দায়িত্ব ছিল। অনুসারীদের পবিত্রকরণ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে যে,

"আল্লাহ মুমেনদের ওপর যথার্থ অনুগ্রহ করেছেন, যখন তাদের ভেতর থেকেই একজন রসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে তার আয়াত পড়ে শোনান। তাদের পরিশুদ্ধ, পবিত্র করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত

শিক্ষা দেন।" (আল ইমরান-১৬৪) অনুরূপভাবে নবুয়তের উত্তরাধিকারী হিসেবে আহলে বাইত (দ.) গণও উম্মতে মুহাম্মদীর পরিশুদ্ধকারী হিসেবে কাজ করে থাকেন। কারণ যাঁরা পবিত্র, তারাই কেবল অন্যকে পবিত্র করতে পারেন। হজরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, বিদায় হজের ভাষণে হজরত (দ.) ঘোষণা করেছিলেন : "হে মানব মন্ডলী, আমি তোমাদের নিকট যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাহা যদি আঁকড়ে থাকে। তবে পথভ্রষ্ট হবে না-"প্রথমটি আল্লাহর কিতাব, দ্বিতীয়টি আমার আহলে বাইত।" এ শব্দটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। আর এই আহলে বাইতগণ হাউজে কাউসারে না পৌঁছানো পর্যন্ত একে (কিতাব) অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। অর্থাৎ আলে রসুল তথা আহলে বাইত পাকরাই হলো 'বাংগময় কোরআন' তথা 'কোরআনে নাতেক'। অর্থাৎ কোরানের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি -একারণেই তারা হেদায়াতের মুরশিদ।

হজরত মুহাম্মদ (দ.) ও আহলে বাইত এর মর্যাদা :

হাদিস শরিফে রেওয়াত আছে যে, হুজুর আকরাম সাঃ আঃ ফরমাইয়াছেন, "যখন আল্লাহ পাক আদম (আ.) কে পয়দা করিলেন, তাঁর ওজুদে রূহ প্রবেশ করালেন, আদম (আ.) চোখ মেলিয়া চাইলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া দর্শন করলেন-পাঁচটি পবিত্র মূখমন্ডল যারা সিজদাবনত মাবুদের দরগাহে। আদম (আ.) নিবেদন করলেন, প্রভু ইঁহারা কে, যাহাদের মুখায়ব আমারই মতো দর্শন করছি। আল্লাহ পাক ফরমাইলেন-এই পানজেতনপাক তোমারই খানদান হইতে আগমন করিবেন। কিন্তু তোমার ন্যায় মাটি হইতে উদ্ভূত হইবে না বরং আল্লাহর নুর হইতে। কুল কায়েনাতকে রূপ দিয়েছি এঁদেরই কারণে, তাঁদের নামকরণ করা হইয়াছে আমারই নাম হতে।

আমি মাহমুদ (PRAISEWORTHY)	- মুহাম্মদ।
আমি আলা (SUPREME)	- তিনি আলী।
আমি ফাতির (CREATOR)	- তিনি ফাতেমা।
আমি এহসান (BENIFICIENT)	- তিনি হাসান।
আমি মুহসিন (GENEROUS)	- তিনি হুসেন ।

আমি আমার ইজ্জতের কসম করিয়া বলিতেছি, যদি কেহ ইহাদের জন্য সামান্যতম অসম্মান, ঘৃনা লইয়া আসে তবে নিশ্চয়ই আমি তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিব।

জেনে রাখ ওহে আদম, এই আহলে বাইত, আমার মনোনীত, পছন্দকৃত, নেয়ামত প্রাপ্ত এবং তাদেরই জন্য আমি ক্ষমা করিব, আশীষ দিব অগণিত জনকে। যদি তুমি বা তোমার বংশে কেহ দুঃখ কষ্টে মুসিবতে পড়ে আমাকে সন্ধান করো এ পাক মহানজনের উছিলায়।"

হুজুরে পাক (দ.) আরও ফরমাইয়াছেন, "যে কেহ নিরাপত্তা চায়, বন্ধুত্ব স্থাপন করুক আমাদের এই পাঁচজনের সাথে এককভাবে এবং দোয়া কামনা করুক আমাদের পাক পানজাতনের নামে।" (আসাদুল্লাহ লেখক নজির আহমদ সিমাব, প্রকাশক শেখ বরকত মহসীন আলী, লাহোর, পৃঃ ৪৫) আলে রসুল ও মাবিয়া-মঞ্জুর আলম কাদেরি।

আবু মুওয়াফিক বি-আহমদ খাওয়ারযেমী প্রমাণাদিসহ আবু সুলাইমান (রা.) আঁ হজরত (দ.) হইতে রেওয়াত করিয়াছেন, যে আমি আঁ হজরত (দ.) কে ফরমাইতে শুনিয়াছি, "যে রাতে আমাকে আসমানের দিকে লইয়া যাওয়া হয় আল্লাহ পাক আমাকে ইরশাদ ফরমাইলেন : আমানার রাসুলা বিমা উনজিলা ইলাইহি মিররাববিহিম। আমি আরজ করিলামঃ ওয়াল মুমেনুনা, ফরমাইলেন : হে মুহাম্মদ (দ.) আমি আসমানের দিকে আমার দৃষ্টিকে ধাবিত করিলাম -তাহাদের মধ্যে তোমাকে বাছিয়া লইলাম। তোমার নাম আমার নামের সঙ্গে সংযুক্ত করিলাম। যেখানেই আমার জিকির হয় সেই সঙ্গে তোমারও জিকির হয়। আমি মাহমুদ-তুমি মুহাম্মদ। দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করিলামঃ তখন লোকদের মধ্য হইতে আলীকে বাছিয়া লইলাম। হে মুহাম্মদ (দ.), তাঁহার নাম আমার নামের সাথে নামকরণ করিলাম। আমি তোমাকে, আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন এবং আইম্মা-যাহারা হুসাইনাইনের ফরজন্দ, তাঁহাদের সকলকে আমার নুর হইতে পয়দা করিয়াছি। আমি আমার বেলায়েতকে আসমান ও জমিনবাসীদের সামনে পেশ করিয়াছি। যাহারা বেলায়েতকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা আমার নিকট কাফের হিসেবে পরিগণিত। হে মুহাম্মদ (দ.), আমার বান্দাগনের মধ্যে কেহ

ইবাদত এতদূর করে যে শুকাইয়া কাঠির ন্যায় পরিণত হয়। এতদসত্ত্বেও সে যদি তোমার বেলায়েতকে অস্বীকারকারীরূপে আমার নিকট হাজির হয়, তাহাকে আমি বখশাইশ করিব না।" (আলে রসুল ও মাবিয়া –মঞ্জুর আলম কাদেরি)

হজরত মুহম্মদ (দ.)

হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ বলেন : "আমি যদি মুহাম্মদ (দ.) কে সৃষ্টি না করিতাম, তবে কিছুই সৃষ্টি করিতাম না।"

অতএব, কোরআন হাদিসের মর্মানুসারে ইহা বলা যায় যে, " যখন কিছুই ছিল না, তখনও তিনি ছিলেন, যখন কিছুই থাকবে না, তখনও তিনি থাকবেন। অতএব এখনও অবশ্যই তিনি বর্তমান আছেন।"

বোখারি শরিফের হাদিসে উল্লেখ আছে হজরত (দ.) এরশাদ করেছেন "আদম সৃষ্টির ৫০ হাজার বৎসর পূর্বেই আমি উর্ধ্বগগন ও নিম্নগগনের যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করেছি।" অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে, "আমি আল্লাহর নুর হতে এবং স্রষ্টার সমস্ত সৃষ্টি আমার নুর হতে।" পবিত্র কোরআনও ঘোষণা করে যে, "নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ হতে নুর এবং প্রকাশ্য কিতাব।" এখানে নুর অর্থ হলো: হজরত মহম্মদ (দ.) আর কেতাব অর্থ পবিত্র কোরআন। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, একই মহান সত্তার পক্ষ থেকে দুটি জিনিস পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। পবিত্র নুরের সাথে সম্পর্ক অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে নুরে মুহাম্মদী তথা আহলে বাইতই কোরআনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

হাদিস-এ-নূর : এই হাদীছের বর্ণনাকারী ছাহাবীয়ে রাছুল যাঁকে রাছুল রাছুলাল্লাহ (ছা:) সালমানো (রা:) মিন্নাক আহলুল বায়ত বলেছেন। এই রেওয়ায়ত আব্দুল রাজ্জাক (রা:) তাঁহার প্রসিদ্ধ সংকলণ "মুছান্নেফ-এ-রাজ্জাক-এ লিপিবদ্ধ করে যান। যাহা পরবর্তীতে আহমদ ইবনে হাম্বাল "ফাজায়েল এ ছাহাবা" কিতাবে নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করে যান। হযরত সালমান ফারসী (রা:) বর্ণনা করেন, আল্লাহর হাবীব মুহাম্মদ (সা:) বলেন আমি ও আলী একই নূর হইতে সৃষ্টি হয়েছি। হযরত আদম (আ:) সৃষ্টি হওয়ার চৌদ্দশত বছর পূর্বে। যখন মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ:) কে সৃষ্টি করেন এবং উক্ত নূর মোবারক হযরত আদম (আ:) এর সুলবে রেখে দেন। সেখানে এই নূর মুবারক অবিভক্ত অবস্থায় ছিলো। এরপর এই নূর হযরত আদম (আ:) হতে হযরত নূহ (আ:) নূহ থেকে শীষ (আ:) থেকে তাঁর পরবর্তী নবী এভাবে এই নূর সুলবে আব্দুল মুত্তালীব (আ:) পর্যন্ত অখন্ড তাকে এরপর এই নূর দুইভাবে ভাগ হয়ে এক অংশ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালীব (আ:) এবং অপর অংশ হযরত আবু তালীব (আ:) এর মধ্যে আসে যাহা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মুত্তালীব (আ:) এর কাছে ছিলো তাহা হতে ছাইয়্যাদুল মুরছালীন, ছাইয়্যাদুল আম্বীয়া, খাতেমুন্নাবীয়িন মুহাম্মদ (ছা:) প্রকাশ লাভ করেন এবং আবু তালীব ইবেন আবুল মুত্তালীব (আ:) এর মাঝে যাহা ছিলো তাঁহা ভিলায়ত, ইমামত, সত্যের একমাত্র উৎস। ন্যায় পরায়নতার অগ্নী সাক্ষী এবং তৌহিদের অস্তিত্ব এবং এর প্রকাশকারি সত্ত্বা স্বরূপ আমীরুল মোমেনিন, ঈমামুল মুত্তাকীয়ান ছাইয়্যেদেনা মওলা আলী (আ:) প্রকাশ লাভ করেন। তাহলে খুব সুন্দুরভাবেই মহা সত্যের মালীক হযরত আবু তালীব (আ:) এর অস্তিত্বের পরিচয় নিজেই প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন এই হাদীছ-এ-নূরের মাধ্যমে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ (ছা:) সেই প্রশংসীত সত্ত্বা যাহার লালন পালন করার নিজ দায়িত্ব যে ব্যক্তিত্বের হস্তে অর্পন করেন সেই সত্ত্বা অবশ্যই নূরী সেহেতু নবুওত, রেছালত, বেলায়ত ও ইমামত সত্ত্বার নূর হযরত ছাইয়্যেদেনা আবদুল্লাহ (আ:) এবং হযরত ছাইয়্যেদেনা আবু তালীব (আ:) মুহছিনে ইসলামের পবিত্র হস্তে অর্পন করেন। শুধু তাহাই নয়, ভিলায়ত-ইমামত ও হযরত ছাইয়্যেদেনা আবু তালীব (আ:) এরই লালন পালনেই অগ্রগামী হয়েছেন। আল্লাহর পবিত্র তৌহিদের আদর্শের ঘোষনা দেওয়ার সমস্ত আয়োজন যিনি এবং যাঁহার ঘরে হয়েছে, শুধু তাহাই নয় আমাদের প্রিয় নবী (ছা:) এর বিবাহের আকদের খুৎবা এই মহান ব্যক্তিকে দিয়েই মহান রাব্বুল আলামীন পাঠ করিয়েছেন। হুজুর (ছা:) এর বিবাহের মোহরানাও ছাইয়্যেদেনা আবু তালীব (আ:)ই প্রদান করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহা হলো, মাহমুদ অর্থাৎ সেই প্রশংসনীয় গোপন সত্ত্বা যে সত্ত্বাকে প্রশংসীত অর্থাৎ "মুহাম্মদ" বলে আখ্যায়িত করেছেন তাহা এই ভূমন্ডলে হযরত আবু তালীব (আ:) কে দিয়েই মহান আল্লাহ করিয়েছেন। তাই ছাইয়্যেদেনা আবু তালেব (আ:) আল্লাহর প্রিয় হাবীব (ছা:) এর

নামকরন করেন এবং পরবর্তীতে উনিই সর্বপ্রথম আল্লাহর হাবীবের (ছাঃ) এর প্রশংসা বর্ণনা করে নাত রচনা করেন–” দিওয়ানে আবু তালীব (আঃ)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর বিধান হিসাবে ঘোষিত দ্বীন-এ-হানাফীয়া যাহা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মেনে চলেছেন ছাইয়্যেদেনা আবু তালীব (আঃ) সেই আদর্শের অনুসারী ছিলেন–

মাওলা মুশকিল কুশা হজরত আলী (আ.) :

শেরে খোদা হজরত আলী মুরতজা (আ.) প্রথম মুসলমান, নবি গৃহেই তিনি লালিত-পালিত। ছোটবেলা হতেই নবিয়ে দোজাহান তাঁকে সত্যজ্ঞানের আলোকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী করে গড়ে তোলেন। সে জন্যই রসুল (আ.) বলেন : “আমি ইলমের শহর, আলী তার দরজা।” অর্থাৎ রসুল (দ.) এর জ্ঞানরূপ নগরীর সিংহ দরজা বলেই আলী (আ.) কে অনুসরণ না করে অন্য কাউকে অনুসরণ করা হলে দ্বীন ইসলামের পূর্ণ জ্ঞান কোনক্রমেই অর্জন করা সম্ভব নয়। রসুল (দ.) আরও বলেন, “আলী আমার কাছে এমন, হারুন (আ.) যেমন মুসা (আ.) এর কাছে; কিন্তু আমিই শেষ নবি।”

ইমরান বিন হোসাইন হতে বর্ণিত যে রসুল (দ.) বলেছেন “আমি আলী হতে, আলী আমার হতে এবং আলী (আ.) সকল মোমেনের মওলা।”

বিদায় হজ সমাবেশে লক্ষাধিক সাহাবির সম্মুখে হজরত মুহাম্মদ (দ.) ঘোষণা করেন: “আমি যাহার মাওলা আলীও তাহার মাওলা।” ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি ঘোষণা করেনঃ “আমি যার মওলা, আলীও তাঁর মওলা।” “হে আল্লাহ আমি আলীকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলাম, তুমিও আলীকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো।” তারপর লোকদিগকে লক্ষ্য করে বলেন : মোনাফেক মাত্রই আলীকে ঘৃণা করবে, আর মোমেন মাত্রই আলীকে ভালোবাসবে। “হে আল্লাহ, যে আলীকে ভালোবাসবে তাকে তুমিও ভালোবেসো।”

ইহাতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কেহই ঈমানদার বা মোমেন হতে পারবে না, আলী (আ.) এর ভালোবাসা ব্যতীত। অনুরূপ কেহই কামেল হতে পারবে না, হজরত আলী (আ.) এর আদর্শের যথাযথ অনুসরণ না করলে - “আলীই (রা.) হলেন অলির অলী।”

হজরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ইয়া উম্মুল মুমেনিন হজরত (দ.) এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে? উত্তরে আয়েশা (রা.) বলেনঃ হজরত আলী মুরতজা (রা.)। (আলে রসুল ও মাবিয়া –মজুর আলম কাদেরি)

হজরত ফাতিমা তাহেরা (রা.)ঃ

জনৈক সাহাবি হজরত রসুল (দ.) এর নিকট মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কে জানার জন্য আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলে আয়েশা (রা.) বলেন : “বিশ্ব জননী, খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমা।” এ কারণেই মা আয়েশা বিবি ফাতেমা (আ.) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “হে ফাতিমা আমি যদি তোমার মাথার চুল হয়ে জন্ম গ্রহণ করিতে পারিতাম, তবে আমাকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতাম।” তাহেরা শব্দের অর্থ হলোঃ পবিত্রকারী। পবিত্র কোরআনে ও হাদিসে একাধিকবার তাঁকে “তাহেরা” বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। একারণেই আত্মার পবিত্রতা ও কলবের রুহাফন শক্তি অর্জন করতে হলে তার নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় আত্মার মুক্তি সম্ভব নয়। আত্মার পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহ ও রসুলের (দ.) সান্নিধ্য লাভ করা যাবে না। (নুর দর্শন –মো. নজরুল ইসলাম, খানকায়ে চিশতিয়া নিজামীর সৌজনে প্রকাশিত, পৃ-৩০)

একদা হজরত রসুল (দ.) তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন। এমন সময় বিবি ফাতেমা তাহেরা (রা.) কে দেখে হুজুর (দ.) সকলকেই লক্ষ্য করে বললেন: “আমার মা খাতুনে জান্নাত জগৎ জননী ফাতেমা (আ.) আসছেন, তোমরা সকলে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান কর।”

হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, “আমি হজরত ফাতেমা (আ.) অপেক্ষা আর কোন সত্যবাদী মহিলা দেখিনি এবং আল্লাহর নবির নিকট ফাতেমাই সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং তিনি আরও বলেন যে, রসুল (দ.) ফাতেমা (আ.) এর সাথে বাতেনি এলেম সম্পর্কে গোপন আলাপ-আলোচনা করতেন এবং রসুলের গোপন ভেদ তার নিকট প্রকাশ করতেন।

বোখারি শরিফে বর্ণিত আছে যে, হজরত (দ.) বলেছেন : "ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, যে ফাতেমার প্রতি রাগ করবে, সে আমার প্রতি রাগ করবে।" অন্য এক রেওয়াতে বলা হয়েছে: "যে ফাতেমাকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়।" তাঁর দুই মহান পুত্রের শাহাদতের উছিলায় তিনি আখেরাতে উম্মতে মুহাম্মদীর শাফায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন মর্মেও হাদিসে উল্লেখ আছে। সুফি কবি কাজি নজরুল ইসলাম মা ফাতিমার ফজিলত নিম্নবর্ণিতভাবে বর্ণনা করেছেন –

"বিশ্ব দুলালী নবি নন্দিনী,
খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী,
মদিনাবাসীনি উম্মত তারিনী আনন্দিনী
সাহারার বুকে মাগো তুমি মেঘ মায়া
তপ্ত মরুর প্রাণে স্নেহতরু ছায়া
মুক্তি লভিল মাগো তব শুভ পরশে
বিশ্বে যত নারী বন্দিনী
হাসান হুসেন-তব উম্মত তরে মাগো কারবালা প্রান্তরে দিল বলি দান।
বদলাতে তার রোজ হাশরের দিনে চাহিবে মা মোর মত পাপীদের ত্রাণ।"

বিশ্ব জননী খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতিমা তাহেরা (রা.) রসুল (দ.) এর ওফাতের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ওফাতপ্রাপ্ত হন।

আমিরুল মোমেনিন হজরত হাসান (আ.) :

হিজরি সনের তৃতীয় বৎসর রমজান মাসে অর্থাৎ ইংরেজি ৬২৫ খ্রি. হজরত হাসান (আ.) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতৃগর্ভে মাত্র ছয়মাস অবস্থান করে ভূমিষ্ঠ হন। এটি একটি মোজেজা বিশেষ। কারণ ছয় মাসে সর্বাঙ্গীন সুন্দর শিশু বেঁচে থাকে না।

ইমাম আবু হানিফার মুর্শেদ হজরত ইমাম জাফর সাদেক (রা.), ইমাম মুহম্মদ বাকের (রা.) হতে রেওয়াত করেন যে, আমিরুল মোমেনিন হাসান (আ.) পনেরো বার পায়ে হেঁটে হজ্ব করেছিলেন অথচ তাঁর ঘোড়াগুলো তাঁর আগে আগে রঞ্জু ধরে চালনা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি দুইবার তাঁর সমস্ত মাল এবং তিনবার অর্ধেক মাল আল্লাহর ওয়াস্তে খয়রাত করে দেন, এমনকি একটি জুতা ও একটি মোজাও খয়রাত করেন।

হজরত আমিরুল মোমেনীনের শাহাদতের বিষয়টি রহসাবৃত। তবে অধিকাংশ বর্ণনাকারী বলেন যে, মাবিয়ার প্ররোচনায় ও ইংগিতে তাঁকে হত্যা করা হয়। বর্ণিত আছে যে, বিষক্রিয়ায় তাঁর যকৃত ও অন্ত্র খন্ড খন্ড হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ইনতেকালের সময় ইমাম হোসাইন (আ.) তার হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান সম্পর্কে জানতে চাইলে রসুল (দ.) এর উপযুক্ত দৌহিত্র এবং হজরত আলী (আ.) ও মা ফাতেমা (আ.) এর যোগ্য পুত্রের ন্যায় বললেন, "আমার যে বন্ধুটির ব্যাপারে আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তবে আল্লাহই সবচেয়ে কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। পক্ষান্তরে আমার সন্দেহ ও অনুমান অনুযায়ী সেই ব্যক্তি যদি দোষী না হয় তবে আমি চাই না যে আমার জন্য একজন নির্দোষ ব্যক্তি নিহত হয়।

হাদিসে বর্ণিত আছে, হজরত আমিরুল মোমেনিন হাসান (আ.) এর দেহাকৃতি এবং সৌন্দর্য অবিকল রসুল (দ.) এর অনুরূপ ছিল। হজরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা রসুল (দ.) তাঁর প্রিয় দৌহিত্র হাসানকে (রা.) পৃষ্ঠে সওয়ার করিয়ে মসজিদে নবির এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর মহান দৌহিত্র শিশু হাসান (আ.) তাঁর পবিত্র কেশ দুই হাতে শক্ত করে ধরেছিলেন। এটি দেখে ওমর (রা.) মন্তব্য করেন: বেশতো হাসান (আ.) উত্তম বাহন পেয়েছে, রসুল (দ.) বললেন, "ওমর, বাহন যেমন উত্তম আরোহীও তেমনি অত্যুত্তম।"

বোখারি শরিফের একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, একদা হুযুর (দ.) মসজিদের মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় শিশু হাসান (আ.) এসে তাঁর কোলে বসলেন। রসুল (দ.) উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, "আমার কোলের শিশুটি একজন মহান নেতা, তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহতা'লা দুটি

বিবাদমান দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন।” এই হাদিসের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তীতে আমিরুল মোমেনিন হাসান (আ.) রসুল (দ.) নির্দেশের আলোকেই মাবিয়ার সাথে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন।” তিনি ৬৬৯ ইং সনে শাহাদত প্রাপ্ত হন।

হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) :

হিজরি সনের চতুর্থ বৎসর অর্থাৎ ইংরেজি ৬২৬ সনে হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) ভূমিষ্ঠ হন। ইসলামের ইমামতি ধারারি তৃতীয় ব্যক্তিত্ব মহানবি (স.) এর দৌহিত্র হজরত আলী (আ.) ও হজরত ফাতিমা (রা.) এর সুযোগ্য পুত্র, ইসলামের নীতি, আদর্শ ও চেতনা বিরোধী বাহিনীর মোকাবেলায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী এবং যুগে যুগে ইসলামি পুর্ণজাগরণে জেহাদের অনুপ্রেরণার উৎস, কারবালার অমর শহিদ হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) সম্পর্কে খোদ মহানবি (দ.) যে সকল মন্তব্য করেছেন, তা অবগত হলে হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) এর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। হজরত রসুল (দ.) বলেছেন–

১। “হাসান ও হুসাইন হবে জান্নাতে যুবকদের সর্দার।”

২। “হোসাইন (আ.) আমা থেকে, আমি হোসাইন (আ.) থেকে। যারা হোসাইন এর বন্ধু হবেন আল্লাহতা’লা তাদের বন্ধু হবেন এবং যারা হোসাইনের প্রতি বৈরিতা পোষণ করবে, আল্লাহ তাদের প্রতি বৈরী হবেন।”

৩। “যারা এমন কোন ব্যক্তিকে দেখতে চায়, যে পৃথিবীতে বসবাস করে কিন্তু তার মর্যাদা জান্নাতবাসীর মত, তাহলে তারা যেন আমার পুত্র হোসাইনকে দেখে।”

৪। “হে আমার পুত্র! তোমার শরীরের গোশত আমারই গোশত এবং তোমার রক্ত আমারই রক্ত। তুমি নিজে একজন নেতা, একজন নেতার পুত্র এবং একজন নেতার ভাই। তুমি নিজে একজন আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশকের পুত্র এবং একজন আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশকের ভাই, তুমি নিজে একজন ইমাম, একজন ইমামের পুত্র ও একজন ইমামের ভাই। তুমি নয়জন ইমামের পূর্ব পুরুষ।

৫। ‘জাহান্নামে হোসাইনের খুনীর শাস্তি হবে পৃথিবীর সমস্ত পাপির ওপর আপতিত শাস্তির অর্ধেক।”

৬। “একদিন মহানবি (দ.) তাঁর সাহাবিদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেয়ার জন্য যখন মঞ্চে আরোহন করেন, তখন মহান ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর সামনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভাষণ শেষে তিনি তার বাম হাত ইমাম হোসাইন (আ.) এর ওপর রাখলেন এবং মাথা আকাশের দিকে উঁচিয়ে বললেন, “হে আমার প্রভু! আমি মুহাম্মদ তোমার দোস্ত ও তোমার নবি! আর এরা দুজন হলো আমার পরিবারের বিশিষ্ট ও ধর্মনিষ্ঠ সদস্য আহলে বাইত। যাঁরা আমার পর আমার আদর্শকে সমুন্নত করবে। হে আমার প্রভু! জিবরাইল আমাকে জানিয়েছেন যে, আমার পুত্র হোসাইন নিহত হবে। হে আমার প্রভু! হোসাইনের শাহাদতের প্রতিদানে আমার আদর্শকে কামিয়াব করো, তুমি তাকে শহিদদের নেতা বানাও। তুমি তাঁর সাহায্যকারী ও অভিভাবক হও এবং তার হত্যাকারীর প্রতি আশীষ বর্ষণ করো না (অভিসম্পাত)।”

ড. আল্লামা ইকবাল (রা.) বলেন, “ইমাম হোসাইন (আ.) কেয়ামত পর্যন্ত চিরতরে স্বৈরতন্ত্রের মুলোৎপাটন করে গেছেন। তিনি তাঁর রক্তের তরঙ্গ প্রবাহ দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া বাগানে পানি সিঞ্চন করে গেছেন এবং ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। যদি ইমাম হোসাইন (আ.) পার্থিব রাজ্যের সম্রাট হতে চাইতেন, তাহলে তাঁকে এ কঠিন সফরে যেতে হতো না। তিনি হকের জন্য নিজের রক্তকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) এর শাহাদত বরণের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের ভিত্তি প্রস্তর হিসেবে নিজেকে স্থাপন করে গেছেন, আর তা হলো “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।”

হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রা.) বলেন “ইমাম হোসাইন (আ.) শির দিয়েছেন কিন্তু ইয়াজিদের হাতে নিজের হাত রাখেননি। সত্যিকার অর্থে হোসাইন (আ.) ছিলেন কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর ভিত্তি। হোসাইন (আ.) ছিলেন নেতা এবং নেতাদের নেতা। হোসাইন (আ.) নিজেই ছিলেন ইসলাম এবং ইসলামের ঢাল। তিনি ইসলামের জন্য মস্তক দিয়েছেন কিন্তু ইয়াজিদের আনুগত্য স্বীকার করেননি। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন “আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ‘খোদা নয়’ এই মহান ঘোষণার প্রতিষ্ঠাতা।” উল্লেখ্য এই বক্তব্যের মূল ফারসি বাণী হজরত খাজা মঈনুদ্দীন (রা.) চিশতী (রা.) এর মাজার শরিফে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

আল্লামা তাবা তাঈ বলেন, “সাইয়েদুশ শুহাদা বা শহিদদের সর্দার ইমাম হোসাইন (আ.) ইমামতি লাভ করেন খোদায়ি আদেশ ও তার ভাইয়ের অসিয়ত মোতাবেক।” এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি ইমামত তথা নেতৃত্বের ভিত্তি আল্লাহর আদেশ ও আল্লাহ কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্য এক ইমামের অসিয়ত তথা ঘোষণার মাধ্যমে, অন্য কোন প্রক্রিয়ায় নয়। এবং আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন নাই।

৬৮০ সালের ১০ অক্টোবর পবিত্র আশুরার দিনে কারবালায় হজরত ইমাম হোসইন (রা.) শাহাদত বরণ করেন। এই মহান শাহাদতের তাৎপর্য সম্পর্কে রেওয়াত আছে যে, রোজ হাশরের ময়দানে হজরত মুহাম্মদ (দ.), শেরে খোদা হজরত আলী (আ.) ও খাতুনে জান্নাত আল্লাহর নিকট এই শাহাদতের উজরত বা বিনিময় চাইবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী বেহেস্তে প্রবেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের দাবি ছাড়বেন না। সুতরাং এই মহা পবিত্র শাহাদত শুধু সাধারণ শাহাদতই নয় বরং সমস্ত উম্মতের নাজাতের সনদ। আর সেই জন্যই রসুল (দ.) বলেছেন, “তাহাদের শাহাদাত আমার শাহাদাত।” তিনি আরও বলেন, “যে আহলে বাইতকে ভাল না বাসিবে সে আমার উম্মত নয়।” এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আহলে বাইত থেকে অন্য কাউকে প্রিয় মনে করলে, সে কখনও প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। মোওয়াদ্দাতই ঈমান ও নাজাতের পূর্ব শর্ত।

–০–

তৃতীয় অধ্যায়

কলেমা

কালেমা তাইয়্যেব :

আল্লাহর সৃষ্টিতে মানব জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে এবং মানব জাতিকে আল্লাহর খলিফার আসনে অধিষ্ঠিত করে, তাদের হেদায়েতের চাবিকাঠি হিসেবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ–বাক্যটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। হজরত আদম (আ.) কে এই বাক্যের মর্যাদার উছিলায় মাফ করে দেয়া হয়েছে। তাই এই মহান বাক্যের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা ও তা বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের মাধ্যমেই মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। কালেমা তাইয়্যেবা অর্থাৎ পবিত্র বাক্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, "তুমি কি লক্ষ্য করো নাই আল্লাহ কিভাবে উপমা হিসেবে বুঝাইয়াছেন। এই 'পবিত্র বাক্য'টি– একটি স্বচ্ছ, বলিষ্ঠ, তাজা, উত্তম বৃক্ষ স্বরূপ। তার মূল মাটির গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তার শাখা প্রশাখা মহাশূন্যে বিস্তৃত। তা সব সময় খোদার মালিকের অনুমতিক্রমে ফল ধারণ করে।" (সুরা ইব্রাহিম, আয়াত-২৪)

কলেমা তাইয়্যেবা ইসলাম ধর্মের ভিত্তি। এই বাক্য বা কথার সঠিক অর্থ, তাৎপর্য ও ঘোষণা সম্পর্কে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন বা ঈমান আনয়নের মাধ্যমে তা কার্যে পরিণত করাই ইসলাম ধর্মের দাবি।

প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বাস মূলত: এই মহান ঐশি সত্তার তথা সৃষ্টিকর্তার সাথে বান্দার প্রেমের উপলদ্ধি। এ কারণেই আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মদ (দ.) তাঁর প্রেরিত পুরুষ শুধুমাত্র এইটুকু উচ্চারণ করাকে ঈমান বলা যায় না। হুজুরে পাক (দ.) ফরমাইয়াছেন,– তাহারা মোমিন নয়, যাহারা মসজিদে একত্রিত হইয়া শুধুমাত্র মৌখিকভাবে কলেমা "লা-ইলাহা" পাঠ করে। এইরূপ মৌখিক কলেমা পাঠকারী, কলেমার প্রকৃত অর্থ উপলদ্ধি করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম এবং তারা মোনাফেক। কারণ মৌখিকভাবে তারা কলেমা লা-ইলাহা স্বীকার করে ও পাঠ করে কিন্তু কলেমার প্রকৃত তত্ত্ব তারা অবগত নয়। কলেমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এ সম্পর্কে এদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। অর্থাৎ তারা মুখে লা-ইলাহা উচ্চারণ করছে কিন্তু লা-ইলাহা দ্বারা 'কাকে নাই করা হচ্ছে' সে সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এইরূপ অজ্ঞতা ও সন্দেহের ভিতরে কলেমা পাঠ করা শেরেকি এবং শেরেকি কুফরির তুল্য। কারণ তাহাদের কোন জ্ঞান নেই যে কলেমা দ্বারা কাহাকে নফি (নাই) করা হয় এবং কাহাকে সাবেত (নিশ্চিত) করা হয়। নিশ্চিত জানিও, যে পর্যন্ত ছালেক (ধর্মের পথের পথিক) গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর) খেয়াল নিজ অন্তর হতে দূরীভূত না করবে, সে পর্যন্ত তরিকতের রাস্তায় এক কদমও অগ্রসর হতে পারবে না – এবং সে আরেফে কামেল হতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তালেব (অন্বেষণকারী) হকিকত তত্ত্ব–প্রকৃত রহস্য উপলদ্ধি করতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত তৌহিদ ভক্ত হওয়ার দাবি করলে সে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রতিপন্ন হবে। (মাকতুবাতে খাজা, লেখক: হজরত মঈন উদ্দিন চিশতী (রা.)।

আল্লামা ইকবাল (রা.) বলেছেন, "তুমি কি লা-ইলাহা জপিতেছ? তাহা হইলে উহা অন্তঃস্থল হইতে বল যেন উহার মধ্যে তোমার প্রাণের গন্ধ পাওয়া যায়। এই লা-ইলাহার দাহ ও জ্বালা হইতেই রবি, শশীর দাহ, উত্তাপ ও আলোক, পাহাড়ে-প্রান্তরে-বিশ্বের সর্বত্র দাহ। লা-ইলাহা এই দুইটি শব্দ শুধু কথার কথা নহে। ইহা ক্ষুরধার তরবারি। এই দাহের সহিত যে জীবন বিজড়িত, সেই জীবন বিশ্বজয়ী। নামাজ, রোজা হইতে আজ রূহ-প্রাণশক্তি চলিয়া গিয়াছে। রুহ না থাকিলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে বিশৃংখলা উপস্থিত হইয়া থাকে। সুফি মতবাদ অনুসারে খোদা পরিচিতি জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে সব কিছুতে নফি (Negation) বর্জন করিতে হইবে। নফি (Negation) ব্যতীত এজবাত (Affirmation - স্বীকার) সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে নফির তরবারি দ্বারা সমুদয় সম্ভাব্য অজুদের (অস্তিত্ব) মূল কর্তন করার পর পরই অজুদে সত্তার নুর অন্তরে প্রকাশিত হবে। যেখানে নফী ও এজবাত নেই, সেখানে নফি নিরর্থক এবং সেখানে সাধকের সাধনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এইরূপ এজবাত ব্যতীত কেউ ঈমানী শক্তি লাভ করিতে পারে না। তাওহিদের এই মঞ্জিলে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক সাধনার সমাপ্তি নেই। সাধক যখন এই মঞ্জিলে উপনীত হন, তখন তাহার চক্ষে এক খোদার অজুদ ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না। এই মঞ্জিলে সাধক, স্রষ্টা ও খোদার অজুদ দৃশ্য এবং ইহার পরবর্তী মঞ্জিলে সৃষ্টির নিজের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। তখন শুধু 'জাতে কাদিমের' (যার

ধ্বংস নাই) অজুদ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। যার বক্ষে লা-ইলাহার দাহ বিদ্যমান, তাঁর ভয়ে সকলে ভীত, তার ভয় কেয়ামতের ভয় হতে অধিকতর। এই তাওহিদ ব্যতীত মানুষ প্রাণহীন ছবি তুল্য।" (আল্লামা ইকবালের মারফতে খোদা লেখক : মোহাম্মদ ইব্রাহিম)

লা-ইলাহার অর্থ :

লা-ইলাহার প্রকৃত তাৎপর্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে,আরবে যখন কোরআন নাজিল হয় তখন প্রত্যেকেই 'ইলাহ' অর্থ কি তা জানতো। কারণ তাদের সামাজিক কথা বার্তায় শব্দটি পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। তাই এর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এর মূল অর্থ পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ধর্মের এক একটি শব্দ নিজস্ব অর্থের ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত এবং অস্পষ্ট অর্থের মধ্যে নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে কোরআনের মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করাই লোকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোরআন বলছে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইলাহ বলবে না। মুসলিম সমাজ এই মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ কছে যে, আমরা মূর্তি ও দেবতাকে ধ্বংস করে কোরআনের দাবি আদায় করেছি। অথচ আমরা 'ইলাহ' এর ব্যাপক অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকেও ইলাহ' বানিয়ে রেখেছি। কোরআন বলছে আল্লাহ ছাড়া কাউকে 'রব' স্বীকার করো না, লোকে বলছে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আমরা পরওয়ারদেগার স্বীকার না করে তাওহিদ এর দাবি পূরণ করেছি। অথচ 'রব' শব্দটির তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে অধিকাংশ ব্যক্তিই আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য ব্যক্তি/বস্তু/প্রতিষ্ঠানকে 'রব' স্বীকার করে নিয়েছেন। ইসলাম বলে 'তাগুত' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বা কারো ইবাদত করো না, আমরা বলছি মূর্তির সাথে আমাদের কোন রকম সম্পর্ক নেই। তাছাড়া শয়তানের ওপর অভিশাপ বর্ষণ আমাদের সংস্কৃতির অংঙ্গ হয়ে গেছে। অথচ পাথরের মূর্তি ছাড়া অন্যান্য সকল অশুভ এবং অবৈধ শক্তিকে আমরা আঁকড়ে ধরে আছি। আল্লাহর জন্য 'দ্বীন'কে বিশুদ্ধ করার অর্থ মনে করা হয় যে, মানুষ 'ইসলাম ধর্ম' কবুল করবে, হিন্দু বা খ্রিস্টান থাকবে না। এই ভিত্তিতে মুসলমান নামে পরিচিত সবাই মনে করেন যে, ধর্মকে তারা আল্লাহর খালেছ (নির্দিষ্ট) করে রেখেছে। অথচ ধর্মের ব্যাপকতর অর্থের দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তির সংখ্যাই বেশি যাদের 'দ্বীন' অবশ্যই আল্লাহর জন্য খালেছ নয়।

বাস্তবিক পক্ষে 'ইলাহ' শব্দটির তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণে কোরআনের মূল শিক্ষা এবং তার প্রাণশক্তি দৃষ্টি হতে প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে এবং মুসলমান নামধারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং তাদের কাজ-কর্মে যে ব্যাপক ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এটা তার অন্যতম প্রধান কারণ।

কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে আরবে আল্লাহ শব্দটি নামবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হতো অর্থাৎ 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা খোদার কোন বিশেষ গুণ প্রকাশের ধারণা নয় বরং খোদার যাবতীয় গুণাবলী সেই শব্দের সাথে জুড়ে দিতো। কোরআনেও এই শব্দটি নামবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করা হয়েছে এবং খোদার যাবতীয় গুণাবলীতে এ নামের সাথে জড়িত করা হয়েছে।

"যেহেতু সেই আল্লাহর গুণবাচক অনেক সুন্দর-সুন্দর নাম আছে সুতরাং তাকে সেই সব নামে ডাক।" (সুরা হাশর)

কোরআনে এই শব্দটিকে এই জন্যই নির্বাচিত করা হয়েছে যে, প্রশংসা ও গুণাবলীর সাথে এই নামটির এক সুগভীর সম্বন্ধ আছে এবং সম্ভবত: এর চেয়েও কোন অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই চির সুন্দর শব্দটির মধ্যে লুকায়িত আছে।

মানব জাতির ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার যে প্রাচীন চিত্র ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, তাতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজা অর্চনা ধরা পড়ে। এই পূজাই ধীরে ধীরে মূর্তি পূজায় রূপান্তরিত হয়। মূর্তি পূজার অনিবার্য ফল স্বরূপ দেখা দিল অগণিত দেব-দেবী। বিভিন্ন ভাষাভাষীরা নিজ নিজ দেবতাদের স্ব স্ব ভাষায় বিভিন্ন নাম দিল। যতই পূজা অর্চনার ধারণা প্রসার লাভ করলো, ততই নাম সৃষ্টি হলো। কিন্তু সকল সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের মনে এই ধারণা দৃঢ় ছিল যে, সকল শক্তির উপরে এমন এক সর্বশক্তিমান বিরাজ করছেন যিনি সকল দেবতার চেয়ে বড়, ক্ষমতাশালী এবং শ্রেষ্ঠ। সুতরাং অন্যান্য সব দেবতা ও প্রাকৃতিক শক্তির অর্চনার সাথে সাথে তারা কমবেশি সেই সর্বশক্তিমানের কল্পনাও অব্যাহত রেখেছিল। এই কারণেই যেখানে এরূপ হাজার

নামের দেব-দেবীর পূজার প্রচলন ছিল, সেখানেও অবশ্যই এমন কোন না কোন নাম খুঁজে পাওয়া যায়, যাকে তারা সেই অদৃশ্য শ্রেষ্ঠতম মহান সত্তার দিকেই ইংগিত করতো।

সামি, ইব্রানি, সুরিয়ানি, আরামি, কালদানি, হামিরি ও আরবি ভাষায় আলিফ, লাম, হা তিনটি বর্ণের বুৎপত্তি সঠিক রেখে এর রূপান্তর একটি প্রচলিত পদ্ধতি। যার মাধ্যমে উপাস্যকে বুঝানো হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াই কালদানি ও সুরিয়ানি ভাষায় 'ইলায়ো' ইব্রানি ভাষায় 'উলুহ' ও আরবি ভাষায় 'ইলাহ' রূপ ধারণ করেছে। আরবি ভাষায় প্রচলিত এই 'ইলাহ' শব্দের সাথে নির্দিষ্ট বাচক 'আল'যোগ করার মাধ্যমে কোরআনে 'আল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই 'আল' সংযোগই 'ইলাহ' শব্দটিকে নিখিল বিশ্বের মহান স্রষ্টার জন্য চিরতরে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

'ইলাহ' শব্দের অর্থ ব্যাকুলতা ও বিমূঢ়তা। সৃষ্টিকর্তার জন্য এই শব্দটি এইজন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, স্রষ্টার ব্যাপারে মানুষ যা কিছু জানে ও জানা সম্ভব, তাতে তাদের মনের ব্যাকুলতা তথা তাকে পাওয়ার জন্য, তাকে দেখার জন্য আকুলতা বৃদ্ধি পায়। মানুষ যতই সেই মহান অস্তিত্ব সম্পর্কে গবেষণা চালায়, তার জ্ঞান শক্তি ততই ব্যাকুল ও বিমূঢ় হয়ে যায়। একারণেই 'ইলাহ' এর প্রতি মানুষের এই আকর্ষণ বা 'ইশক' তথা প্রেম। যেমন নাকি পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে (১) রহমান ঈমানদারদের জন্য প্রেম সৃষ্টি করেন। (মরিয়ম-৯৬)। (২) ঈমানদাররা আল্লাহকে ভালোবাসেন সবচেয়ে বেশি (বাকারা-১৬৫)। (৩) সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, এবং নিশ্চয় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কেয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সমস্ত নবি-রসুলগনের ওপর এবং ঐশি গ্রন্থ সমূহের ওপর এবং সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহরই মুহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির এবং সাহায্য প্রার্থীদের জন্য এবং মুক্তিকামী ব্যক্তিবর্গের জন্য। আর যারা (মুহব্বতজনিত কারণেই) নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত আদায় করে এবং কৃত প্রতিজ্ঞা পালনকারী এবং বিপদাপদ ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী। (সুরা বাকারা- ১৭৭) ।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, "এই সেই কিতাব যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যাহা মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক।" এই মুত্তাকিদের সংজ্ঞা উপরোক্ত আয়াতের আলোকে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ঈমানদার তথা মুত্তাকিনদের সকল প্রকার কর্মকান্ডের মূল ভিত্তিই হলো ঐশি প্রেম।

সুরা মুজাদেলার সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালোবাসে আল্লাহ ও রসুলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের, হোক না তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা আপনজন। এরা হচ্ছে তারাই, যাদের অন্তরে সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে রুহ দ্বারা সাহায্য করা হয় – তিনি তাদেরকে নিয়ে যাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেথায় স্থায়িভাবে থাকবে। এরাই আল্লাহওয়ালা । জেনে রাখ আল্লাহওয়ালারাই সফলকাম।"

এই পবিত্র আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ও রসুলের ভালোবাসার স্বার্থে যে কোন ধরনের মানবিক তথা সামাজিক আত্মীয়তা বা সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করার নামই ঈমান এবং ফলশ্রুতিতে আল্লাহর নিকট প্রকৃত সফলকাম বা কল্যাণপ্রাপ্ত হওয়ার ভিত্তি।

সুরা তওবার ২৩ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে, "হে নবি, তুমি বলে দাও- হে লোক সকল, তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান, ভাই-স্বগোষ্ঠী, অর্জিত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা (তোমরা) কর এবং তোমাদের পছন্দনীয় বাসস্থান -এসবের কোন একটি যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রসুল (দ.) এবং তার সাথে চলার প্রচেষ্টা চালানোর চেয়ে অধিক প্রিয়, তাহলে আল্লাহর শাস্তি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ অবাধ্যদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।"

আলোচ্য আয়াত থেকে ইহা সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের চেয়ে প্রিয় কোন মানবিয় সম্পর্ক বা বস্তুর প্রতি আকর্ষণ জনিত দুর্বলতা আল্লাহর নিকট অবাধ্য হিসেবে গণ্য বিধায় তা হেদায়েত লাভের অযোগ্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিশেষ।

কলেমা তাইয়্যেবার পর্যালোচনা :

হজরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রা.) বলেন আল্লাহতা'লা বান্দার প্রতি প্রথম ফরজ করেছেন তার মারেফাতকে। কোরআন শরিফে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, "ওয়ামা খালাতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লে আ'বুদুন।" অর্থাৎ আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। এখানে কথা হচ্ছে, যার বন্দেগি করবো তাঁর পরিচয় বা মারেফাত লাভ করাই প্রথম কর্তব্য বা ফরজ। তা না হলে বন্দেগি আল্লাহ না হয়ে গায়রুল্লাহতে যাবে, যার ফল হলো অনন্তকাল দোজখ ভোগ। এ কারণেই আল্লাহতা'লা তাঁর বান্দা নর-নারীর জন্য ইলম হাসিল করাকে ফরজ করেছেন। যে ইলম দ্বারা নিজের নফ্স এবং আল্লাহতা'লার পূর্ণ পরিচয় মিলে তা অর্জন করাই ফরজ। জাগতিক ও আত্মিক নিদর্শন ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে মেনে নেয়ার একমাত্র পন্থা হলো জ্ঞান। মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যে সকল সম্মানিত নবিগণের আগমন হয়েছে তাঁরা সকলেই হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ জ্ঞানের আলো নিয়ে এসেছিলেন। মানব জীবনের ভিত্তি ইলমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানের আলো ব্যতীত কেউ আল্লাহকে জানতে ও চিনতে পারে না, আল্লাহ পাকের জালালি ও মনোহর রূপ দেখতে পায় না।

বিদ্যমান সকল বস্তুর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রাজ্যের উৎস মূল হচ্ছে জ্ঞান। ঈমান ও পরিচয় লাভের চাবি হলো জ্ঞান। আত্মার অন্ধকার বিদূরিত করার সূর্য হলো জ্ঞান। খোদা প্রেমের আদি প্রতিজ্ঞার চাবি জ্ঞান। অজ্ঞ আত্মার পথ প্রদর্শক ও শিক্ষক হলো জ্ঞান। বান্দাকে প্রভুর সাথে যুক্ত করার জন্য জ্ঞানই হলো করণীয় সেতু বন্ধন। আসমান ও জমিনের আলো জ্ঞান । আর কলেমা-ই তাইয়্যেবা: "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ"। আল্লাহর যাবতীয় ওহি ও নবিদের কিতাবি জ্ঞান সমূহের নির্যাস।

এই কলেমার দুটি অংশ। প্রথম অংশ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (দ.)। প্রথম অংশের অর্থ : নাই (কোন) মাবুদ আল্লাহ ছাড়া অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ বা প্রভু বা উপাস্য নাই। আল্লাহতা'লাই একমাত্র উপাস্য প্রভু। ভয় করা ও মানিয়া চলার যোগ্য। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা, আমরা তাঁর সৃষ্টি, তিনি সব কিছুর মালিক। আর দ্বিতীয় অংশের অর্থ : মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর রসুল অর্থাৎ আল্লাহতা'লা মুহাম্মদ (দ.) কে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ ও সৃষ্টিতত্ত্বের প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা রূপে বিশ্ব বরেণ্য রসুল ও হেদায়েতকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন।

কলেমার প্রথম অংশের ব্যাখ্যা :

এই কলেমার প্রথম অংশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হচ্ছে নেতিবাচক অর্থাৎ কোন মাবুদ, প্রভু বা ক্ষমতার অধিকারী নয়। কলেমা পাঠকারী কাউকেও ভয় করে না, কারো নিকট নতি স্বীকার বা আত্মসমর্পণ করে না, কাউকে আইন বা বিধানদাতা বা হুকুম দানের অধিকারী হিসেবে মানে না। কারো দান, দয়া, অনুগ্রহ বা সাহায্য চায় না, কাউকেও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে মানে না। সুতরাং এসব দিক থেকে যে কেহ কলেমা পাঠকারীর ওপর কর্তৃত্ব বা প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করবে তাকে অস্বীকার করাই এই কলেমার মূল দাবি। অর্থাৎ আল্লাহতা'লার নিদের্শিত কোন প্রকার শক্তি ব্যতীত সকল প্রকার শক্তির প্রতি কলেমা পাঠকারী বিদ্রোহি চির উন্নত শির। আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে ইতিবাচক। অর্থাৎ এসব দিক থেকে কলেমা পাঠকারী একমাত্র আল্লাহকেই স্বীকার করে ও মান্য করে।

কোন ব্যক্তি যখন কলেমা পাঠ করে তখন এই কলেমার মাধ্যমে যেসব জিনিস, তত্ত্ব, তথ্য ও মতবাদের স্বীকৃতি দেয় তা পবিত্র কোরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আছে। তবে কোরআন বিশ্বাসের পূর্ব শর্ত হলো–আল্লাহকে বিধানদাতা হিসেবে মান্য করা এবং মুহাম্মদ (দ.) এর মাধ্যমে তা প্রকাশ হয়েছে বলে বিশ্বাস করা। এই ধারণা সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস না থাকলে সে কোরআন সম্পর্কে কোন শ্রদ্ধা পোষণ করবে না এবং কোরআনও তার জন্য হেদায়েতকারী গ্রন্থ হিসেবে দেখা দিবে না।

যাহোক, পবিত্র কোরআনে ইলাহ কি কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখা যাক।

ইলাহ শব্দের ব্যাখ্যা

স্রষ্টা হিসেবে ইলাহ :

"যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি কেন তার ইবাদত করবো না, যার দিকে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে ? তাঁকে ত্যাগ করে আমি কি ওদেরকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছু) ইলাহ বানাব, যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে রহমান যদি আমার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন তখন তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না। তারা পারবে না আমাকে মুক্ত করতে। –ইয়াসিন : ২২-২৩।

"..কে তোমাদের জন্য আকাশরাজি এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন? অতঃপর আকাশ থেকে তোমাদের জন্য ভারি বর্ষণ করেছেন, আর সৃজন করেছেন সুদৃশ্য বাগান আর গুল্মলতা যা সৃষ্টি করা তোমাদের আয়ত্বাধীন ছিল না।" "... তিনি ব্যতীত অপর কোন ইলাহ নেই।" এ সকল কাজে আল্লাহর সাথে আর কি কোন শরিক আছে? এরা সত্য মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কে এ জমিনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন, আর তার জন্য পাহাড় করেছেন নোঙর, আর দুটি সমুদ্রের মধ্যভাগে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। এ সকল কাজে আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহ কি শরিক আছে? কিন্তু অধিকাংশ মুশরেকদেরই কোন জ্ঞান বুদ্ধি নেই। এমন কে আছেন যিনি অস্থিরতার সময় মানুষের দোয়া শুনেন, তার কষ্ট দূর করেন? কে তিনি, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার খলিফা করেন অর্থাৎ ভোগ ব্যবহারের অধিকার দান করেন ?

ইলাহার একক সত্তা :

"আসমান জমিনে যদি আল্লাহ ছাড়া আরও ইলাহ থাকতো, তবে বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ওলট পালট হয়ে যেতো।" সুতরাং আল্লাহ, যিনি আরশ (অর্থাৎ বিশ্বের শাসন ক্ষমতা) এর মালিক তাঁর সম্পর্কে ওরা যা কিছু বলছে তা থেকে তিনি মুক্ত পবিত্র । তিনি তার কোন কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। অন্য সকলেই তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

"আল্লাহ কোন পুত্রও গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ নেই। যদি এমন হতো, তাহলে সকল ইলাহ তার নিজের সৃষ্ট বস্তু নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো আর একে অন্যের ওপর চড়াও হতো।" (আল মুমেনুন - ৯১)

"বল, আল্লাহর সাথে যদি অন্য ইলাহ থাকতো , যেমন লোকেরা বলছে- তাহলে তারা আরশ অধিপতির রাজত্ব দখল করার জন্য অবশ্য কৌশল করতো। তিনি পাক; ওরা যা বলছে, তা হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।" (বনি ইসরাইল ৪২-৪৩)

বুদ্ধি, জ্ঞান, শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় দাতা হিসেবে ইলাহ :

"বল, তোমরা কি চিন্তা করে দেখছ যে আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণ এবং দর্শন শক্তি রহিত করেন আর অন্তরের ওপর ছাপ মেরে দেন (অর্থাৎ জ্ঞান বুদ্ধি ছিনিয়ে নেন) তবে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ আছে যে তোমাদেরকে এসব কিছু এনে দেবে ?"–আল আনয়াম -৪৬।

বিপদে আশ্রয় দাতা হিসেবে ইলাহ :

"তারা আল্লাহ ছাড়া আরও ইলাহ বানিয়ে রেখেছে, যেন তা তাদের জন্য শক্তির কারণ হতে পারে (বা তার আশ্রয়ে এসে তারা নিরাপদ হতে পারে।)" (মরিয়ম-৮১)।

"তারা আল্লাহ ছাড়াও অন্য ইলাহ বানিয়ে রেখেছে, এ আশায় যে তাদের সাহায্য করা হবে।" –ইয়াসিন।

ইলাহ সম্পর্কিত কোরআনের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকৃত ইলাহ হলো জীবনদাতা ও মৃত্যুর মালিক। তিনি সমস্ত জীবের লালন পালন করেন ও রিজিক দান করেন। তিনিই সন্তান দাতা, শান্তি কৃঙ্খলাকারী, নষ্ট ও লয়প্রাপ্ত জিনিসকে তিনিই আবার নতুন করে গড়তে পারেন। প্রাকৃতিক জগতে একমাত্র তাঁরই হুকুম ও আইন কার্যকরী। তিনিই সকল কাজের কর্তা। তাঁর ওপর একান্তরূপে ভরসা করতে হয়। তিনি নিরাশার আশা, বিপদে-আপদে সব সময় কেবল তারই রহমতের আশা করা যায়। মানুষের লাভ-লোকসান, ক্ষতি-উপকার কেবল তাঁরই নির্দেশে হয়ে থাকে। দৃশ্য, অদৃশ্য, জানা-অজানা সব কিছুই তিনি ভাল করে

জানেন। তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী। তিনি সকলের ওপর জয়ী। তিনি সব রকম শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের মালিক। তিনি সর্বপ্রকার দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে, কোন ভুল-ভ্রান্তি, পাপ-অপরাধ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তিনি সারা জাহানের একচ্ছত্র মালিক, সমস্ত রাজ্য সাম্রাজ্যের তিনিই প্রকৃত সম্রাট, শাহানশাহ, দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ ও সম্পত্তির প্রকৃত নিরঙ্কুশ মালিক তিনিই। তিনি সমগ্র বিশ্বলোককে সৃষ্টি করে তার নিজের চালু করা নিয়ম বিধানের ভিত্তিতে তা' নিজেই পরিচালনা করছেন। তিনি সব সময় বর্তমান ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। তাঁর মর্জির বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে এমন কেহ নেই। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সমগ্র বিশ্বের সব কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী।

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ইলাহ :

"তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অপর কোন ইলাহ নেই, দুনিয়া এবং আখেরাতে প্রশংসা কেবলমাত্র তাঁরই জন্য। তিনি একাই নির্দেশ দান করেন এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।"– (আল কলম ৭০ -৭২)

"এই আল্লাহ তোমাদের রব, শাসন ক্ষমতা তারই জন্য। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তাহলে তোমরা কোনদিকে ধাবিত হচ্ছো।" – আল জুমার ৫-৬

"যিনি আসমান জমিনের রাজত্বের অধিকারী তিনি কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন নাই, শাসন ক্ষমতায় তার কোন শরিক নেই।" (আল ফোরকান- ২৩)

"আজাব নাজিল হওয়ার সময় এই জালিমরা যে সত্যটি উপলদ্ধি করবে, তা যদি তারা আজই উপলদ্ধি করতো যে সর্বময় ক্ষমতা সব রকম শক্তি আল্লাহরই হাতে নিহিত।" (আল বাকারা-১৬৫)

"বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক। যাকে খুশি রাজ্য দান করেন, যার কাছ থেকে খুশি রাজ্য ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান করেন, যাকে খুশি অপদস্ত করেন।" (আল ইমরান-২৬)

"সুতরাং প্রকৃত বাদশা আল্লাহ অতি মহান। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। যিনি মহান আরশের অধিকারী।" –(আল মুমেনুনঃ–১১৬)

"মানুষের রব, মানুষের বাদশা, মানুষের ইলাহ এর নিকট আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি।" –সুরা আন্ নাস। আর তিনি হচ্ছেন এমন এক সত্তা যিনি আসমান ও ইলাহ, আর জমিনেও ইলাহ, এবং তিনি হাকিম ও আলিম - অতি কৌশলী, মহাজ্ঞানী (অর্থাৎ আসমান-জমিনে রাজত্ব করার জন্য যে জ্ঞান এবং কৌশল দরকার, তা সবই তাঁর আছে)। –জুখরুফ-৮৪।

রসুল (দ.) বলেছেন: "আসমান জমিনকে মুষ্টিবদ্ধ করে আল্লাহতা'লা ডাক দিয়ে বলবেন আমি বাদশা, আমি পরাক্রমশালী, আমি প্রবল প্রতিপত্তির অধিকারী, জমিনে যারা বাদশা সেজে বসেছিল তারা কোথায়? কোথায় প্রভাব-প্রতাপশালী দাম্ভিক নরপতিরা? বর্ণনাকারী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন যে, যখন মহানবি (দ.) এ শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন, তখন তার দেহে এমন কম্পন সৃষ্টি হচ্ছিল, আমরা আশঙ্কা করছিলাম তিনি যেন মিম্বর থেকে পড়ে না যান। ক্ষমতার এ ধরনের কনসেপ্টের ভিত্তিতেই গায়রুল্লাকে অস্বীকার এবং কেবলমাত্র আল্লাহর উলুহিয়াত (সার্বভৌমত্ব) প্রতিষ্ঠাই কোরআনের প্রধান উপজীব্য। কোরআনের যুক্তি এই যে, আসমান-জমিনে একক সত্তাই সকল ধরনের ক্ষমতার অধিকারী। সৃষ্টি করা, তথা সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার পক্ষ থেকে বাসস্থান, খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য জীবন ধারণের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করণের অধিকারী যিনি, তিনিই যাবতীয় আদেশ-নির্দেশ দেয়ার বৈধ অধিকারী। সব কিছু ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তার আনুগত্য করছে। তিনি ব্যতীত কারো কোন ক্ষমতা নেই। সৃজন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার রহস্য সম্পর্কেও কেউ অবগত নয়, তাই তাঁর শাসন ক্ষমতায় কেউ সামান্যতম অংশীদারও নয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্যতীত অপর কোন ইলাহ নেই। যেহেতু তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই; তাই অন্যদেরকে ইলাহ মনে করে মানব জাতি যে সকল কাজ করছে, তা মূলত ভুল, অন্যায় তথা জুলুম বা তাকে অস্বীকৃতির নামান্তর। সে কাজ যেমন ভুল ব্যক্তির নিকট কোন কিছু প্রার্থনা বা তাকে ক্ষমতাশালী মনে করা বা অবৈধ কোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন অথবা আনুগত্য করা বা তাকে পার্থিব লাভ ক্ষতির মালিক মনে করে যে কোন ধরনের কর্ম পন্থাই হোক না কেন। আরবি 'ইলাহ' বলতে যে ধরনের ব্যাপক, সীমাহীন সর্বময় কর্তৃত্ব ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে বোঝায়, তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র গঠনে সার্বভৌমত্ব নামক যে মৌলিক উপাদান প্রয়োজন তার সাথেই এই প্রকার ক্ষমতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ইলাহ

বলতে সার্বভৌমত্ব ক্ষমতাকেই বুঝিয়ে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার ক্রমবিকাশের ধারা ও প্রকৃতি বর্ণনা করব। সার্বভৌমত্ব : পার্থিব অর্থে যে ধরনের ব্যাপক, সীমাহীন ও সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র গঠনে সার্বভৌমত্ব নামক যে মৌলিক উপাদান প্রয়োজন, তার সাথে এই প্রকার ক্ষমতার মিল, খুঁজে পাওয়া যায়।

সার্বভৌমত্ব বা ইংরেজি SOVEREIGNTY ল্যাটিন SUPARANUS শব্দ হতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ চরম ক্ষমতা। সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে ড. মজুমদার বলেন, "সার্বভৌমত্বকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের মতো আকাওহিন অথচ সর্বব্যাপী এবং পরিপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারি।" (কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর ক্ষমতাও অনুরূপ)।

আন্তর্জাতিক আইনের আদি গুরু হুগো গ্রোসিয়াস এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, "ইহা তাঁহার হস্তে ন্যাস্ত চরম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, যাহার কোন কার্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না এবং যাহার ইচ্ছা কারো মতের অপেক্ষা রাখেনা।" (THE SUPREME POLITICAL POWER VESTED IN HIM, WHOSE ACTS ARE NOT SUBJECT TO ANY OTHER AND WHOSE WILL CANNOT BE OVER RIDDEN"

উইলোবির (WILLOUGHBY) মতে, "রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই সার্বভৌমত্ব।" "Sovereignty is the supreme will of the State"

আমেরিকার আর একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক বার্জেস (BURGESS) বলেন, সার্বভৌমত্ব হইতেছে প্রত্যেক প্রজার ও প্রজাদের সকল প্রকার সংঘের ওপর মৌলিক, চরম, অসীম ও সর্বাত্মক ক্ষমতা।" "It is the original absolute, unlimited, universal power over the individual subjects and all association of subjects".

বিখ্যাত ফরাসি লেখক ডুগে (DUGUIT) সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের আদেশ দেওয়ার এবং নির্দিষ্ট ভূখন্ডের প্রত্যেক নরনারীকে শর্তহীন নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।" (That charactaristic of the state - the right to give unconditional order to all individuals in the territory of the State)

জেলিনেক (Gellineck) বলেন, "সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সেই বৈশিষ্ট্য যাহার জন্য ইহার নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছার দ্বারা আইনত ইহাকে বাধা যায় না এবং নিজের শক্তি ব্যতীত অন্যকোন শক্তির দ্বারা সীমিত করা যায় না।" (That charactaristics of the state by virtue of which, it cannot be legally bound by its own will or limited by any other power than itself .)

ব্লাকস্টোন ইহাকে "চরম, অপ্রতিরোধ্য, শর্তহীন, সীমাহীন কর্তৃত্ব বলিয়া আখ্যায়িত করেন।" (That supreme, irresistible, absolute, uncontrolled authority)

রাষ্ট্র বিজ্ঞানী পোলক (POLLOCK) বলেন, "সার্বভৌমত্ব সেই ক্ষমতা যাহা সাময়িক নহে, যাহা অন্য কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতা নহে, যাহা এমন কোন নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, যা' রাষ্ট্র বদলাইতে পারে না।" (Sovereignty is that power, which is neither temporary nor delegated nor subject to particular rules which it cannot alter.)

সুতরাং সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা বলতে রাষ্ট্রের সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়, যার বলে ইহা অপ্রতিরোধ্য, অন্তহীন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অসীম প্রতিপত্তির অধিকারী। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহার ক্ষমতা (power) বলেই রাষ্ট্র চরম এবং চূড়ান্তভাবে ব্যক্তির ওপর প্রভুত্ব করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাধীন ও একক সম্পর্ক বজায় রাখে। সার্বভৌমত্বের আইনগত যে সংজ্ঞা নির্দেশিত আছে, তা থেকে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেয়া হলো–

১। স্থায়িত্ব (permanence) : সার্বভৌম ক্ষমতার প্রথম বৈশিষ্ট্য ইহার স্থায়িত্ব। যতদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকে, ততদিন ইহার সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। রাষ্ট্রের পূর্ণবিন্যাস ঘটতে পারে, সরকার পরিবর্তিত

হতে পারে অথবা রাষ্ট্রের অভিপ্রায়ে সার্বভৌম ক্ষমতা যে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে তার অবসানও ঘটতে পারে কিন্তু সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটেনা - ইহা চিরন্তন, অনাদি এবং চিরস্থায়ি।

২। সর্বব্যাপকতা (Universality) : সার্বভৌমত্বের অন্য বৈশিষ্ট্য ইহার সর্বব্যাপকতা। রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেক নর-নারীর এবং তাদের সংগঠিত প্রত্যেক সমাজ, সম্প্রদায় বা সংঘ এই সার্বভৌম শক্তির অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য। সুতরাং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা বাধা বন্ধনহীন, নিরঙ্কুশ এবং অবাধ। শুধুমাত্র স্থলেই নয়, রাষ্ট্রীয় সীমার পানিতে, আকাশে, বাতাসে এর ক্ষমতার ব্যাপকতা বিস্তৃত।

৩। অবিভাজ্যতা এবং একত্ব (Indivisibility & unity): সার্বভৌম ক্ষমতা এক এবং অবিভাজ্য। রাষ্ট্রের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রেই ন্যাস্ত হয়। যদি দুই বা ততোধিক ক্ষেত্রে ইহা ন্যাস্ত হয়, সেক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটা অসম্ভব নহে। এ অবস্থায় চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জটিলতা হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণেই সার্বভৌম শক্তিকে সম্পূর্ণ বলা হয়। ইহার বিভাজন অর্থ ইহার মৃত্যু তথা ধ্বংস (To divide Sovereignty is to destroy it.) অধ্যাপক সেটেল (SETTEL) এর মতে, সার্বভৌম ক্ষমতা বণ্টন সম্ভবপর হয় সরকারের বিভিন্ন কেন্দ্রে কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্র এবং ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা একক; সেই হেতু তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যাস্ত হতে পারে না। পন্ডিত ক্যালহোনর (CALHOUN) মতে, "সার্বভৌমত্ব পূর্ণ একটি জিনিস। ইহাকে ধ্বংস না করিয়া বিভক্ত করা যায় না। যেমন আমরা অর্ধ চতুর্ভুজ বা অর্ধ ত্রিভুজ বলিতে পারি না।"

৪। মৌলিকতা, চরম ও সীমাহীনতা (Original, absolute & unlimited) : সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ হতে প্রতীয়মান হয় যে, উহা মৌলিক, চরম ও সীমাহীন। রাষ্ট্রের মধ্যে ইহার সমকক্ষ বা ইহার ঊর্ধ্বে কোন ক্ষমতা থাকিতে পারে না। যদি ইহার মূল অন্য কোথাও থাকে; তবে তাহাকে চূড়ান্ত ক্ষমতার আধার বলিতে হয়। সার্বভৌমত্ব যদি অন্য কোন শক্তির দ্বারা সীমিত হয়, সে শক্তিই চরম চূড়ান্ত এবং সার্বভৌম বলিয়া পরিগণিত হবে। আইনগতভাবে অসীম এই ক্ষমতার ব্যবহার সর্বত্র হতে পারে। আইন ইহা হতেই উৎসারিত।

আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানে প্রচলিত সার্বভৌম কথাটি নতুন কিন্তু ইহার ধারণা বহু পুরাতন। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল "রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা" (Supreme power of the State) কথা উল্লেখ করেছেন। প্লেটোও আইনের কথা বলতে গিয়ে আইনকে সর্বোচ্চ নিয়ম বলে আখ্যায়িত করেন। রোমান আইনজ্ঞগণ যখন রাষ্ট্র সম্বন্ধে পূর্ণ ক্ষমতার (Fullness power) কথা উল্লেখ করেছেন, তখন প্রকারান্তরে তারা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কথাই নির্দেশ করেছেন।

ইলাহ বনাম আধুনিক সার্বভৌমত্বের ঐতিহাসিক পটভূমি :

প্রাচীন গ্রিসে প্লেটো এবং অ্যারিষ্টোটল সার্বভৌমত্ব শব্দটি ব্যবহার করেননি। তাঁরা শুধুমাত্র একজনের, কিছু সংখ্যক ব্যক্তির এবং বহু ব্যক্তির সর্বোচ্চ ক্ষমতার কথা বলেছেন। Jimmen এর মতে গ্রিকরা তাদের প্রভু Divine আইনের কথা উল্লেখ করেছেন। দেবতাদের সর্বময় কর্তৃত্বের কথা বলা হতো। প্রকৃতপক্ষে এই "ডিভাইন সর্বময় ক্ষমতা" যখন রাষ্ট্র যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় মর্মে বলা হলো তখন থেকেই ক্ষমতার অবৈধ প্রয়োগ শুরু হয়।

রোমে জনগণকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হতো। ম্যাজিস্ট্রেটগণ ইম্পেরিয়াম (রাজ ক্ষমতা) ডোমিনিয়াম (Dominion Populus Romanus) – এর প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। সম্রাটকে দেবত্ব (God hood) আরোপ করার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় চূড়ান্ত শাসন ক্ষমতাসীন রাজার ওপর বর্তায়। মধ্যযুগে অভিজাততন্ত্রে সম্রাট সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তারপরে অবস্থান ছিলো প্রভু টেনান্ট ইন চীফ এবং Villain un Varlet বা জমিদারের। ক্ষমতার এই ক্রমধারা সম্রাট বা Overlord সর্বোচ্চ প্রভূকে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং তার নিম্ন পর্যায়ের কর্তৃত্বের অধিকারীগণকে Vassal বলা হতো। এভাবে সার্বভৌমত্ব সর্বোচ্চ প্রভু বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল এবং Sovereignty এই অর্থেই ব্যবহার করা হতো, যিনি অন্য কোন প্রভু কে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করতেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সম্রাট নামে মাত্রই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কারণ জনগণ, সৈন্যবাহিনী, অর্থ বা বিত্ত এবং ভূমির মালিকানা জমিদারদের হস্তগত ছিল। পক্ষান্তরে জমিদাররা এইসব সহায় সম্পদের জন্য তাদের নিম্নপদস্থ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করতেন। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি সামাজিক শক্তি হিসেবে এত সুসংগঠিত ছিল যে, চূড়ান্ত ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে সার্বভৌম শব্দটি একটি ফাঁকা বুলি ছিল।

পোপ ও সম্রাটের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব :

ক্রিস্টান সাম্রাজ্যে সম্রাট ও পোপের মধ্যে কে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এই নিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পোপ বিজয়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং পোপই সকল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের রাজাগণ পোপের অধীনতা স্বীকার করেন। এমনকি ইংল্যান্ডের রাজার বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষমতা ও পোপের অনুমতির অধীন হয়ে পড়ে। তবুও পোপ সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের অধিকারী ছিলেন না। এ সম্পর্কে Justinian তার 'Sixth Novella' এ লিখেছেন There are two main gifts bestowed by God upon men - the priesthood and the imperial authority. Of this the former is concerned with things divine, the latter with human affairs. Proceeding from the same source, both adorned human life. Nothing is of greater important to the emperor than to support dignity of the priesthood so that the priest in their turn pray to God for them.

অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে দুটি জিনিস দান করেছেন। যাজকতন্ত্র এবং রাজকীয় কর্তৃত্ব – এ দুটোর মধ্যে প্রথমটি ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অপরটি পার্থিব কর্মকান্ডের সঙ্গে। একই উৎস হতে উৎসারিত উভয় দানই মানুষের জীবনকে মহিমান্বিত করে। সম্রাটের কাছে যাজকতন্ত্রের সম্মানের চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না। পক্ষান্তরে যাজকগণ ঈশ্বরের নিকট সম্রাটের জন্য প্রার্থনা করতেন। দেশের সকল সম্পদ ও ক্ষমতা এই দুই শ্রেণির লোকেরাই ভোগ করত এবং করসহ সকল দুর্ভোগ জনগণকেই পোহাতে হতো। যা পরবর্তীতে ফরাসি বিপ্লবসহ ইউরোপে যাজকতন্ত্রের পতন ঘটায় এবং ধর্ম মানবজীবনের একটি অত্যন্ত নগণ্য বা ক্ষতিকর বিষয় হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সার্বভৌম ক্ষমতা তখনও কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে নিহিত ছিল না।

জাতীয় রাজা এবং আধুনিক সার্বভৌমত্বের ধারণার বিকাশ :

ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ দি ফেয়ার, ব্যাভেরিয়ার রাজা লুইস এবং ইংল্যান্ডের রাজা তাদের নিজস্ব ভূ-খন্ডে পোপ ও সম্রাটের কর্তৃত্বকে অস্বীকৃতি জানান এবং তারা নিজ ভূমিতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করেন। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী নিজেকে ধর্মরক্ষাকারী (Defender of faith) হিসেবে ঘোষণা করেন এবং এই উপাধি আজ পর্যন্ত ইংল্যান্ডর রাজা/রাণীরা ব্যবহার করে আসছেন এবং ব্রিটিশ মুদ্রায় এই উপাধি (D. F.) অদ্যাবধি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই প্রক্রিয়ায় স্বর্গীয় ও মানবিয় ক্ষমতা একই কর্তৃত্বের অধীন হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই আধুনিক সার্বভৌম ক্ষমতার ধারণার সৃষ্টি হয়। যদিও সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল তবুও নৃপতিগণ নানাভাবে জমিদারতন্ত্র ও বিভিন্নভাবে পার্লামেন্টের আইন পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত পূর্ণ রাজ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন না।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের ধারণা যে, গ্রিস, রোম তথা ইউরোপই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে নবজাগরণ তথা রেনেসাঁ থেকেই শুরু হয়। তাই এই সার্বভৌমত্বের ধারণা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিভিন্নভাবে চালু ছিল তা বলার অপেক্ষাই রাখেনা। উদাহরণস্বরূপ চীনে সম্রাট সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। ভারতেও রাজা বা সম্রাটগণ নিজ নিজ এলাকায় রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের কর্ণধার ছিলেন। মুসলিম নরপতিগণ সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর হিসেবে বিশ্বাস করতেন। তবে, মাবিয়ার আমল থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ধর্মের প্রভাব ক্রমাগত কমতে থাকে। তবে একথা সত্য যে, পৃথিবীর সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা আল্লাহ/ঈশ্বর/ভগবান বা অন্য যে কোন স্বর্গীয় শক্তির নামে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন এবং এই ক্ষমতার বলেই তারা তাদের প্রজা সাধারণকে তাদের নির্দেশ মানতে বাধ্য করতেন।

আইনগত সার্বভৌম বলতে সেই সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বোঝায়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত আদেশ বা নির্দেশ আইনের আকারে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত আইন দেশের বিভিন্ন বিচারালয়ে স্বীকৃত হয়ে কার্যকরী হয়। আইন অনুসারে সেই কর্তৃপক্ষ ঐশ্বরিক আইন, নীতি শাস্ত্রের বিধান এবং জনমতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংল্যান্ডের রাণীসহ পার্লামেন্ট ইচ্ছা করলে যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারেন। কারণ ইংল্যান্ডের আইনগত সার্বভৌমত্ব ন্যাস্ত হয়েছে রাণীসহ পার্লামেন্টের উপরে, পার্লামেন্টের ক্ষমতার প্রাচুর্যের কথা স্মরণে রেখে তাই জনৈক রসিক ব্যক্তি বলেছেন, "পার্লামেন্ট শুধু পুরুষকে নারী এবং নারীকে পুরুষ করতে পারে না। এ ছাড়া পার্লামেন্ট সব করতে পারে।"

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ঠিক তা নয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহে এই আইনগত সার্বভৌমত্বের পিছনে অত্যন্ত অস্পষ্ট হলেও আর এক সার্বভৌম শক্তির উপস্থিতি অনুভূত হয়, যা আইনগত সার্বভৌমকে প্রভাবিত করে তা রাজনৈতিক সার্বভৌম বলে পরিচিত।

এই সার্বভৌমত্বকে সুস্পষ্ট সংজ্ঞায় তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। এটি অত্যন্ত অনির্দিষ্ট কিন্তু বিধি ও কর্মকার্যের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এর প্রকাশ ঘটে যেমন ভোট দানের মাধ্যমে, বিভিন্ন সংবাদপত্রের অভিমতে, বক্তৃতা মঞ্চে, বিভিন্ন জনের অভিমতে, বিদ্বান ব্যক্তিগণের কথাবার্তায় এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে। কিন্তু তা অনির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত অসংবদ্ধ হলেও কাজের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমেরিকার পন্ডিত উড্রো উইলসন বলেছেন, আইনের চোখে সার্বভৌমত্বের যে আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে, তা আসলে অবাস্তব। কারণ সার্বভৌমত্ব যতই প্রবল এবং পরাক্রমশালী হোক না কেন নীতি, ধর্ম এবং জনমতকে উপেক্ষা করে আইন প্রণয়ন করতে কেহই সাহসী হবে না। তাই বলা হয়, প্রভুর উপরে মহাপ্রভু, সাক্ষাৎ জনসমষ্টি, যাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিকতাকে বাদ দিয়ে কোন প্রভুই দাঁড়াতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি অসীম নয়। ইহা অনেক বিধি বিধানের দ্বারা সীমাবদ্ধ - ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সার্বভৌম ক্ষমতার তিনটি সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন: প্রথমত ইহা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি দ্বারা; দ্বিতীয়ত প্রজাদের সাথে চুক্তির শর্ত দ্বারা, তৃতীয়ত মৌলিক বিধানের দ্বারা।

ব্লুন্টসিল (Bluntnchill) বলেন, রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান নহে। ইহার অধিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা স্বীকৃত এবং নিজের প্রকৃতি ও প্রজাদের দ্বারা সীমিত। অনেকের মতে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইন এবং আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইহা অবাধ, অসীম ও অলঙ্ঘনীয় তা' সঠিক নয়।

সার্বভৌমত্বের অবস্থান নির্ণয় :

সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের ঠিক কোথায় অবস্থান করে, তা নির্ণয় করা অসম্ভব। আপাত: দৃষ্টিতে রাজতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রে সার্বভৌমত্বের অবস্থান নির্ণয় করা তুলনামূলকভাবে সহজ হলেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থায় কোথায় সেই চূড়ান্ত ক্ষমতা, তা বলা অত্যন্ত শক্ত। এ কারণেই অস্টিন কখনও বলেছেন, পার্লামেন্টে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত, আবার অন্য এক সময়ে বলেছেন, নির্বাচক মন্ডলীর ওপর তাহা ন্যস্ত। বলা হয়ে থাকে পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থায় পার্লামেন্টেই সার্বভৌম। কিন্তু যেখানে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন পদ্ধতি প্রচলিত সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা কোথায় থাকে?

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যদিও প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের প্রধান বিধায়ক; তবুও গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতে হলে তাকে কংগ্রেসের সমর্থন ও অনুমোদন লাভ করতে হয়। তাছাড়া, সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট আছে। যা প্রধান নির্বাহীর সকল কাজ বিনা দ্বিধায় আইনসঙ্গত বলে মেনে নিতে রাজি নয়। কারণ সুপ্রিম কোর্ট শাসনতন্ত্রের অভিভাবক। পক্ষান্তরে আইন প্রণয়নের বিষয়াদিও কেন্দ্র ও অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভক্ত। সুপ্রীম কোর্টও কি সর্বশক্তিমান, তা নয়, কারণ সুপ্রিম কোর্টকে সংবিধান মেনে চলতে হয়। আবার অনেকের মত সংবিধানই সর্বশক্তিমান হাতিয়ার স্বরূপ। Supreme law of the land এবং সার্বভৌম শক্তির আধার। কিন্তু মূলত: উহা একটি দলিল এবং প্রয়োজনবোধে পরিবর্তনযোগ্য। কিন্তু যাহার পরিবর্তন হয় তাহা সুনির্দিষ্ট নয়। তবে কি যারা এর পরিবর্তন করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত তারাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তা তো কোন সুনির্দিষ্ট শক্তি বা সমষ্টি দ্বারা সংঘটিত হয় না। সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাব করে কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রগুলির আইনসভা সমুহ তা' অনুমোদন করে। সুতরাং কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা এই সার্বভৌম শক্তি ব্যবহৃত হয় না। তাই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু কোথায় তা নির্ণয় করা সম্ভব কি ?

এসব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উড্রো উইলসন বলেছেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করবার ক্ষমতা যে কর্তৃপক্ষের হাতে আছে, সেই সার্বভৌম। এর অর্থ দাঁড়ায় আমেরিকার ক্ষমতার আধার হলো প্রথমত: প্রেসিডেন্ট ও যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যের আইন সভা, দ্বিতীয়ত: বিচারালয় কারণ ইহাও আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া আইন প্রণয়ন করে, তৃতীয়ত: শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণ, চতুর্থত: সংবিধান পরিবর্তন করবার জন্য সভা এবং পঞ্চমত: গণ উদ্যোগ ও গণভোট। কিন্তু এতগুলো সংস্থা ও ব্যক্তির মত এক হওয়া অসম্ভব এবং সুনির্দিষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে আইন বিশেষজ্ঞ উইলোবি বলেছেন, "শাসক কর্তৃক যেখানেই ব্যবহৃত হোক না কেন, শাসন সংক্রান্ত হোক বা আইন সংক্রান্ত হোক অথবা বিচার সংক্রান্ত হোক উহার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয়।

সার্বভৌমত্বের অবিভাজ্যতা, মৌলিকতা এবং একত্ব, চরম ও সীমাহীনতা, হস্তান্তরের অযোগ্যতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনায় সার্বভৌম ক্ষমতার বাস্তব অধিকারী কে তা পর্যালোচনা করে আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে আইন যে সার্বভৌম ক্ষমতার নির্দেশ করে তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুল। এই প্রেক্ষাপটেই সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদ মতবাদের প্রবক্তরা বলেন, সার্বভৌমত্বের ধারণা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ রাষ্ট্র যদি স্বতন্ত্র হয় এবং বিশ্বজনীন সমাজ ব্যবস্থা যদি তার একত্বের ফলে ব্যাহত হয়, তা হলে মানবের জন্য তা অভিশাপ স্বরূপ দেখা দিবে। সুতরাং তাদের মতে সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব অপ্রয়োজনীয়, অবাস্তব, ভ্রান্ত এবং ভয়ংকর। তারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে একটি সম্মানীয় কুসংস্কার (venerable superstition) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, তাঁরা আরও বলেন, "এই কুসংস্কার সামাজিক জীবন থেকে যত শীঘ্র দূর হয়, ততই মঙ্গল। প্রখ্যাত রাষ্ট্র বিজ্ঞানী বার্কার বলেন, "সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতবাদ যতটা শুষ্ক ও অনর্থক এমন অন্য কোন রাজনৈতিক ধারণা নহে।" (No political theory has become more arid and unfruitful than the doctrime of sovereignty of State.)

হ্যারোল্ড ল্যাস্কি বলেন, "সার্বভৌমত্বের সমগ্র ধারণাটিকে যদি পরিত্যাগ করা যায়, তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্থায়ি উপকার হবে। "(It will be of lasting benefit to political science if the whole concept of Sovereignty was surrendered.)

অধ্যাপক লিভস বলেন, "বাস্তব ঘটনা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম কাঠামোর তত্ত্ব ভাঙিয়া পড়িয়াছে। "If we look at the facts, it is clear that the theory of sovereign state has broken down".

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন যে রাষ্ট্র বা সার্বভৌম ক্ষমতা একটি আকার, অবয়বহীন তত্ত্বগত ধারণা। ইহাকে কল্পনা করা যায় না। ইহার সুনির্দিষ্ট অবস্থান বোঝা সম্ভব নয়। ইহার মূর্তি বা আকৃতি চোখে দেখা যায় না। সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ ও বিকাশ স্থল হলো সরকার। সরকার রাষ্ট্রের বা সার্বভৌম শক্তির মুখপাত্র। ইহার মাধ্যমে সার্বভৌম ক্ষমতার ইচ্ছা অনিচ্ছা, আদেশ, নিষেধ প্রকাশিত হয়। সরকার শব্দটি সীমিত অর্থে রাষ্ট্রপতিসহ মন্ত্রীমন্ডলীকে বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে ইহা শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্গত সকলকে বোঝায় যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। অন্য কথায় যারা আইন প্রণয়ন কাজে আইন রক্ষায় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে আইন কৃংখলা ও রাষ্ট্রের বিধি বিধান প্রয়োগ করার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাহাদিগকে সমবেতভাবে সরকার নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই অর্থে গ্রাম্য চৌকিদার পোস্টমাস্টার থেকে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত সকলেই সমভাবে সরকারের অন্তর্ভুক্ত।

তাত্বিকভাবে যদিও সার্বভৌম ক্ষমতা ও সরকারের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোন দেশের ক্ষমতাসীন সরকার প্রধানেরই এই ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে দেখা যায় এবং বিশ্বের ইতিহাসে সর্বকালেই ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রনায়কেরা এই ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী বলে জনসমক্ষে ঘোষণা করেছেন এবং জনগণকে তাদের আদেশ নির্দেশ অবশ্য পালনীয় হিসেবে দাবি করেছেন। এ কারণেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে "দন্ড ও মুন্ডের কর্তা" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই নিজেকে "আই এ্যাম দ্য স্টেট" বলে দাবি করেছেন। অর্থাৎ খোদায়ি সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইলাহ্ ও রবের সম্পর্ক :

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে যে সব ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেদেরকে কোন না কোন ভাবে শক্তিধর বলে মনে করে তাদের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পবিত্র কোরআনে 'রব' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে। অর্থাৎ ইলাহ অর্থ সার্বভৌমত্ব এবং এর বিকাশ বা প্রকাশস্থল হিসেবে সরকার তথা 'রব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

রব : 'রব' শব্দের প্রাথমিক এবং মৌলিক অর্থ প্রতিপালন, অতঃপর তা থেকে ভোগ ব্যবহার, তত্ত্বাবধান, অবস্থার পরিবর্তন সাধন, সম প্রকরণ এবং পরিপূর্ণতা বিধানের অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। এরই ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে প্রাধান্য, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, আধিপত্য এবং প্রভুত্বের অর্থ। এই শব্দটির পূর্ণ ব্যাপকতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থ সমূহ প্রকাশ করে–

১) প্রতিপালক, প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহকারী।
২) প্রশিক্ষণ ও ক্রমবিকাশ দাতা।
৩) জিম্মাদার, তত্ত্বাবধায়ক, দেখাশুনা, এবং অবস্থার সংশোধন-পরিবর্তনের জন্য দায়িত্বশীল।
৪) যিনি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন, যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোক সমবেত হয়।
৫) নেতা, সর্দার, যার আনুগত্য করা হয়।
৬) মালিক-মনিব, ক্ষমতাশালী কর্তা ব্যক্তি, যার নির্দেশ চলে, যার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়, হস্তক্ষেপ এবং বল প্রয়োগের অধিকার আছে যার। আধুনিক অর্থে ইহা সরকার রাষ্ট্রপ্রধান বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝিয়ে থাকে।

কোরআনে 'রব' শব্দের ব্যবহার কোথাও করা হয়েছে এসবের কোন এক দুই অর্থে, কোথাও দুইয়ের অধিক অর্থে, আবার কোথাও ৬টি অর্থই একসাথে বোঝানো হয়েছে। কোরআনের আয়াত থেকে বিভিন্ন উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে ইনশা আল্লাহ।

প্রথম অর্থে; (প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহকারী): "সে বললো ঃ খোদার আশ্রয়। যিনি আমাকে ভালভাবে রেখেছেন, তিনিই তো আমার রব" (ইউসুফ-২৩)

দ্বিতীয় অর্থে; (জিম্মাদার ও তত্ত্বাবধায়ক) : 'বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের রব, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে পথ প্রদর্শন করেন, পানাহার করান, আমি পীড়িত হলে আরোগ্য দান করেন, তিনি ব্যতীত তোমাদের সকল রব তো আমার দুশমন"। "তোমরা যে নিয়ামত সম্ভোগই লাভ করেছে, তা লাভ করেছ আল্লাহর তরফ থেকে। অতঃপর তোমাদের ওপর কোন বিপদ আপতিত হলে হতচকিত হয়ে তোমরা তাঁর সমীপেই প্রত্যাবর্তন করো। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক যারা (নিয়ামত দান এবং দুর্যোগ মুক্তির পর) আপন রবের সাথে অন্যদেরকে শরিক করতে শুরু করে। (নাহল-৫৪)

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি কঠিন কোন রোগে আক্রান্ত হলে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। পরে যখন তার রোগ মুক্তি ঘটে তখন মনে করে তার অর্থবিত্তের কারণে সে সম্ভাব্য সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার জন্য রোগ মুক্তি লাভ করেছে এবং চিকিৎসকের পেশাগত দক্ষতা ও হাসপাতালের সযোগ-সুবিধাকে তার রোগ মুক্তির কারণ বলে মনে করে। এ ধরনের মনোভাব বা ভাবধারা পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত আয়াতের মর্মানুযায়ী শিরক বা অংশীদারী এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

"বল, আল্লাহ ছাড়া তুমি কি অপর কোন রব তালাশ করবে? অথচ তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর রব।" (আল আনয়াম-১৬৪)।

তৃতীয় ও চতুর্থ অর্থে; (কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন যিনি, নেতা সর্দার যার আনুগত্য করা হয়) : "তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের পাদ্রি, পুরোহিতদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে।" (তওবা-৩১) "আর তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে নিজের রব না বানায়।"

যে সব ব্যক্তি, জাতি এবং জাতির বিভিন্ন দল, যাদেরকে সাধারণভাবে পথ প্রদর্শক বা নেতা স্বীকার করা হয়। কোন ঐশি অনুমোদন ব্যতীত যাদের আদেশ, আইন-বিধান এবং হারাম-হালাল, পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় তথা অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় অর্থাৎ সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাদেরকে যে কোন ভাবে আদেশ নিষেধের অধিকারী গণ্য করা হয়।

পয়গম্বর তথা তাঁর অনুসারীদের 'রব' ও ঈমান সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির 'রব' বিষয়ক ধারণা/সংজ্ঞা ভিন্নতর তা' নিম্নোক্তআয়াতে সুপ্রমাণিত।

"বার্তাবাহক ইউসুফের কাছে হাজির হলে ইউসুফ তাঁকে বললো, তোমার রব এর কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করো, যেসব মহিলারা নিজেরাই হাত কেটেছিল, তাদের কি অবস্থা ..আমার রব তো তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেনই।" (ইউসুফ-৫০)

আলোচ্য আয়াতে হজরত ইউসুফ (আ.) মিশরিয়দের সাথে কথাবার্তায় মিশরের শাসনকর্তাকে তাদের রব বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ তারা তখন মিশরের রাজাকে তাদের কেন্দ্রিয় কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌম ক্ষমতার আধার হিসেবে স্বীকার করতো এবং তাঁকই আদেশ নিষেধের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য করতো। সে কারণেই সেই শাসনকর্তাকে তাদের 'রব' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হজরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহকে তাঁর রব বলেছেন। কারণ তিনি মিশরের শাসন কর্তাকে নয় বরং কেবলমাত্র আল্লাহকেই প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং আদেশ নিষেধের মালিক তথা বিধানদাতা হিসেবে মনে করতেন।

কোরআনে ব্যবহৃত 'রব' শব্দটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সকল নবিদের শিক্ষার মূলনীতি এটাই ছিল যে, যিনি রাব্বুল আলামিন, তাঁকে সবাই মৌখিকভাবে স্বীকার করে, যেহেতু তিনি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের স্রষ্টা একারণেই তিনি সকলের সব ধরনের প্রয়োজন পূরণকারী। তিনি ছাড়া অন্য কেহই মানুষের অভাব/অভিযোগ পূরণ করতে, সংকট সমস্যা দূর করতে এবং সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে, এমন কোন সত্তা নেই। সুতরাং তিনি কেবল নিখিল বিশ্বের সরকার প্রধান হিসেবে আনুগত্য লাভের একমাত্র উপযুক্ত ও বৈধ মহান সত্তা। এই প্রেক্ষাপটেই নবি রসুলগণ ঘোষণা করেছেন : "হে আমার জাতির লোকরা, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে প্রেরিত রসুল। নিজ 'রব' এর মুখপাত্র হিসেবে তাঁর বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাই।" (আল আরাফ : ৫৯-৬২)

বর্তমান সময়ের মত অতীতকালেও লোকেরা জিদ ধরেছিল যে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা আছেন বটে, কিন্তু সমাজ পরিচালনায়, নৈতিক চরিত্র, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আইন বিধান রচনাকারী, অর্থনীতি এবং জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগে আনুগত্যের দাবিদার তারাই হবে, যারা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদান্ত গ্রহণের অধিকারী এবং তাদের নেতাই পার্থিব রবুবিয়াতের অধিকারী। পক্ষান্তরে পয়গম্বরের দাবি হলো- রবুবিয়াত অবিভাজ্য, তাকে বিভক্ত বা খন্ডিত করা যায় না। সকল ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র আল্লাহকেই 'রব' হিসেবে স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য এবং 'রবে'র প্রতিনিধি হিসেবে রসুলগণ যেসব বিধি বিধান পৌছে দেন তা সবাইকে মেনে চলতে হবে। তাই হজরত নুহ (আ.) এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো:

"আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর বিশ্বস্ত রসুল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।" অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ নিরাকার এবং সাধারণ লোক তার সাথে যোগাযোগ করতে সমর্থ নয় তাই নবির আনুগত্য সবার জন্য অবশ্য পালনীয়।

সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধির সাথে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির তাত্ত্বিক বিরোধ সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ :

"তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছ; যে ইব্রাহিমের সাথে তার 'রব' এর ব্যাপারে বিতর্ক করেছে? তা করেছিল এজন্য যে আল্লাহ তাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছিলেন। ইব্রাহিম যখন বললেন, জীবন মৃত্যু যাঁর হাতে তিনিই আমার 'রব'। তখন সে বললো জীবন মৃত্যু আমার নিয়ন্ত্রানাধীন। ইব্রাহিম বললো সত্য কথা এই যে আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত করেন। এবার দেখি তুমি তা' (সূর্য) পশ্চিম দিক থেকে উদিত করাও তো। একথা শুনে সে কাফের হতভম্ব হয়ে পড়লো। (বাকারা-২৫৮)

আলোচ্য আয়াতে হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও তৎকালীন সম্রাটের (নমরুদ) কথোপকথনের মাধ্যমে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নমরুদের কথিত 'আমি রব' দাবি সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা ভুল। অর্থাৎ নমরুদ চন্দ্র সূর্যের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে নিজেকে 'রব' দাবি করেনি; বাস্তবিক পক্ষে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক কোন দিনই এ ধারণা পোষণ/প্রচার করতে পারে না। বরং তার রবুবিয়াতের দাবির মূল বিষয়বস্তু ছিল যে সে এই রাজ্যের মালিক; তাই রাজ্যের সকল অধিবাসী তার অধীন। একারণেই তার আদেশ নিষেধ বিধি বিধান সকলের জন্য অবশ্যই পালনীয়। তার শাসন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রয়োগে কারো অংশীদারিত্ব বা ভূমিকা থাকতে পারেনা বা

থাকা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে নমরুদের এ ধরনের দাবির ভিত্তি ছিল শাসকের গর্ব। (এ জন্য যে আল্লাহ তাকে রাজ ক্ষমতা দান করেছেন।) যখন নমরুদ জানতে পারল যে, তার রাজত্বের একজন নাগরিক তার শাসন কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে অদৃশ্য আল্লাহকে বিশ্বাস করে তখন সে ইব্রাহিমকে জিজ্ঞেস করলো তোমার রব কে? তখন ইব্রাহিম (আ.) বললেন, জীবন ও মৃত্যুর যিনি মালিক তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রভু বা একমাত্র বৈধ শাসক। পক্ষান্তরে নমরুদ রাজা হিসেবে যে কোন প্রজার জীবন নাশ করা তার এখতিয়ারাধীন ছিল বিধায় সে নিজেকে এই ক্ষমতার মালিক বলে দাবি করতো। ইব্রাহিম (আ.) বললেন, প্রকৃতপক্ষে 'রব' তিনিই যাঁর নির্দেশে সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। অর্থাৎ পার্থিব অর্থে জীবন নেওয়া তথা মৃত্যু দান তথা হত্যা করার বৈধ অধিকারী তিনিই হতে পারেন, যিনি সূর্যকে পূর্ব দিকে উদিত করতে পারেন বা তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি। যিনি প্রাকৃতিক সকল বস্তু নিচয় ও বিধি বিধান নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই সকল ধরনের কর্মকান্ডের একমাত্র বৈধ নিয়ন্ত্রক বা শাসক হওয়ার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বর্তমানেও রাজা, সম্রাট, রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট স্ব স্ব দেশের প্রজাদের জীবন ও মৃত্যুর মালিক হিসেবে কাজ করে থাকেন। এ ধরনের ক্ষমতা বলেই রাষ্ট্র প্রধানের প্রতিনিধি হিসেবে বিচারক আসামিকে মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত করেন। পক্ষান্তরে আসামি রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট বিচারকের রায় পুন বিবেচনা করার জন্য আপীল পেশ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে প্রদত্ত রায় মাফ করে আসামিকে 'জীবন দান' করতে পারেন।

এ কারণেই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ যদি আল্লাহ বা তার রসুলের নির্দেশ তথা বিধি-বিধানের কোন তোয়াক্কা না করে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিচারপতি, প্রশাসক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ, ব্যাংকের কর্মকর্তা নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজেকে বা তার সরকারের বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকেই সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করে পেশাগত কর্মকান্ড সম্পন্ন করেন, তাহলে তাঁর আচরণও নমরুদি আচরণ হিসেবে আল্লাহর নিকট অভিহিত হবে। প্রসঙ্গত ও বলা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ স্বীয় ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা হিসেবে গণ্য করে থাকেন। অর্থাৎ প্রাপ্ত অস্ত্রের বা শারীরিক শক্তির ভিত্তিতে ক্ষমতাধর মনে করে সে অস্ত্রের অথবা বলের সাহায্যে সে যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে সক্ষম। এ কারণেই সে দুর্বল বা নিরস্ত্র ব্যক্তিকে "মারিয়া করিব খুন" বলে ভয় দেখায়। জমিদার বা মোড়ল শ্রেণির ব্যক্তিগণ নিজস্ব লোকজন তথা পাইক বরকন্দাজের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তার এলাকাধীন ব্যক্তিকে স্বীয় ইচ্ছায় পরিচালিত করার জন্য বাধ্য করে বা ভিটে-মাটি উচ্ছেদ করার ভয় দেখায়। অফিসের বড়কর্তা ক্ষমতার অহংকারে গর্বিত হয়ে অধীনস্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে চাকুরিচ্যুত বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার ভয় বা প্রতাপ দেখায়। ব্যাংকের ম্যানেজার খাতকের লোন অনুমোদনের ব্যাপারে তার ভূমিকার ক্ষমতা বিবেচনা করে খাতকের কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা আদায় করে।

এমনকি রাস্তায় সবচেয়ে বড় যানবাহনের চালক হিসেবে ট্রাক চালক ক্ষমতার গর্বে মদমত্ত হয়ে অন্যান্য ছোট-খাট যানবাহন বা পথচারীকে পিষে মারার ব্যাপারে ক্ষমতাধর বলে মনে করে দূর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকল ক্ষমতার উৎস মনে করে আত্মতৃপ্তি ও অহংকার করা এবং এ ধরনের চিন্তা ধারার অধিকারী হিসেবেই কোরআনে নমরুদকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাকে খোদা অস্বীকারকারী বা মূখ হিসেবে অখ্যায়িত করা হয়েছে।

মানব জীবনের সকল ধরনের ব্যবহারিক কর্মকান্ডে যে আল্লাহ বা তার রসুলের (দ.) নির্দেশাবলী অবশ্য পালনীয়। ক্ষমতাসীন লোকদের তা' পালনের অস্বীকৃতির প্রমাণ কোরআনের অনেক আয়াতে আছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হলো–

"হে আমার জাতির লোকেরা! মাপে-ওজনে ইনসাফ কায়েম করো, ঠিক ঠিক ভাবে ওজন করো। লোকদেরকে জিনিসপত্র কম দেবে না। জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না। আল্লাহর অনুগ্রহে কাজ কারবারে যা অবশিষ্ট থাকে (ন্যায়নীতি ভিত্তিক) তাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা মুমিন হও, আমি তোমাদের ওপর পাহারাদার বা রক্ষক নই। তারা জবাব দিল, শোয়াইব! আমাদের মর্জি মত ধন সম্পদ ভোগ, ব্যবহার করবো। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তারা নবির নির্দেশের কোন রকম তোয়াক্কা করবেনা। এটাই অধর্ম।"

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল কর্মকান্ডে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগে ঐশি নির্দেশ পালনই ধর্মের দাবি। এই প্রেক্ষাপটে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে : "যারা নিজেদের

দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়ায় আল্লাহর বিধানের গুরুত্ব না দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা কাফের।" (মায়েদা) এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের সপ্তদশ সুরা বনি ইসরাইলে উল্লেখিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূলনীতিসমূহ নিম্নে ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হলো–

১। "প্রভুর নির্দেশ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না।" (আয়াত-২৩) অর্থাৎ আনুগত্য, দাসত্ব, পূজা অর্চনা একমাত্র আল্লাহতা'লার প্রাপ্য। তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে অন্য কারো কণামাত্র কোন অধিকার স্বীকার করা চলবে না। আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তিকে মানা বা ভয় করা যাবে না। কোন শক্তির কাছে পুরস্কারের প্রত্যাশাও করা যাবে না, কারো প্রতি ভরসা নির্ভরতা থাকবে না। কারো প্রতি খেয়ালী সার্বভৌমত্ব আরোপিত হবে না। কাউকে উপকারী ও অপকারী মানা যাবে না।

২। পিতামাতাকে সম্মান ও তাদের আনুগত্য করতে হবে (আয়াত-২৩)। অর্থাৎ সামাজিক বিষয়ে পারিবারিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে। সন্তান পিতামাতার সেবক হবে। তাদের বৃদ্ধাবস্থায় অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও সহানুভূতির সাথে যত্ন করবে। তাদের প্রতি ঠিক তেমনি আচরণ প্রদর্শিত হবে যেমনি হয়েছিল সন্তানের শিশু অবস্থায় পিতা-মাতা কর্তৃক। মূলত: এই মূলনীতির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি। পরিবার রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম ইউনিট। পরিবারের শান্তির ওপর নির্ভর করছে গোটা জাতির শান্তি।

৩। আত্মীয় স্বজন, মিসকিন ও প্রবাসীদের হক আদায় করতে হবে (আয়াত-২৬)। অর্থাৎ সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য সমাজে যারা বিত্তহীন, অসমর্থ, বাস্তুহারা, সাহায্যের মুখাপেক্ষী এমন লোকদের অবহেলা করা চলবে না। এ মূলনীতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সামাজিক সু বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়।

৪। অপচয় করো না, যারা অপচয় ও অনর্থক ব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই (আয়াত- ২৬)। অর্থাৎ অর্থের নিরঙ্কুশ মালিকানা আল্লাহর, মানুষের নয়। অতএব তা কেবল আল্লাহর নির্ধারিত খাতেই ব্যয় হতে পারে। আল্লাহর মর্জির পরিপন্থী কোন কাজেই অর্থ ব্যয় করা যাবেনা। পার্থিব ভোগ সম্ভোগ ও বিনোদন মূলক শয়তানী কাজে এক কপর্দকও ব্যয় করা চলবে না। চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপ চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে। এভাবে সমাজকে নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

৫। হস্তদ্বয়কে না একেবারে ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে দেবে, আর না একেবারে খুলে দিবে। – আয়াত-২৯। অর্থাৎ মানুষকে কৃপণতার পরিবর্তে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে হবে, কি ব্যক্তিগত কি রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়েই আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। কারণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন অর্থ ব্যবস্থা শুধুমাত্র মানুষের বাক্তিগত জীবনই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকেও পঙ্গু করে তুলে।

৬। রিজিক বণ্টনের ব্যাপারে আল্লাহ কাউকে কিছু বেশি ও কিছু কম দিয়েছেন যার কল্যাণকারিতা একমাত্র তিনিই জানেন। (আয়াত-৩০) অথাৎ রিজিক বণ্টনের যে ব্যবস্থা আল্লাহ নির্দেশ করেছেন, মানুষকে তাই গ্রহণ করতে হবে। এ পার্থক্য সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণের জন্যই। কারণ আল্লাহতা'লা তার ব্যবস্থাপনার পরিণামদর্শীতা সম্পর্কে অধিকতর পরিজ্ঞাত।

৭। দারিদ্র ও অনটনের ভয়ে সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তাদের ও তোমাদের উভয়ের রিজিক দাতা (আয়াত-৩০)। অর্থাৎ সাংসারিক অসচ্ছলতার আশঙ্কায় ভবিষ্যৎ বংশধরদের খতম করা যাবে না। কারণ তাদের রিজিকের ব্যবস্থা সে আল্লাহই করবেন যিনি তাদের পাঠাবেন। বংশ বৃদ্ধি খাদ্যাভাব ঘটায় –এ ধারণা যেন তোমাদের আল্লাহর ওপর আস্থাহীন করে। কারণ এই ধারণা শিক্ষা দেয় যে কোন পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই আল্লাহ মানব সন্তান সৃষ্টি করেন। উপার্জনে প্রবৃত্ত হও–রিজিকের সন্ধান করলে আল্লাহ সমুদ্রবক্ষ বা পাহাড়ের ভেতর থেকেও খাদ্য ভান্ডার খুলে দিতে পারেন।

৮। ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, কেননা তা অতি অশ্লীল ও জঘণ্য কাজ (আয়াত-৩২)। অর্থাৎ অবৈধ পন্থায় কাম রিপু চরিতার্থে ব্যাভিচার অতীব গর্হিত কাজ। কোন সমাজে এর উপস্থিতি গোটা সমাজকে ধ্বংস করে। সুতরাং তা অনুষ্ঠানের সকল পথ, উপায়-উপাদান যেমন: নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল ছায়াছবি-ভিডিও এবং বেপর্দা, সহশিক্ষা, অশ্লীল ছবি, নাচ-গান ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে।

৯। "অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করবে না।" (আয়াত-৩৩) অর্থাৎ অল্লাহর নির্দেশিত বিধান ব্যতীত অন্য কোন কারণে রক্তপাত করা যাবে না। যে সমাজে মানুষের জীবন প্রাণ নিরাপত্তাহীন তা কখনো সমৃদ্ধ হতে পারে না। শান্তি ও নিরাপত্তাহীন ভাবে কোন সমাজই উন্নতি করতে পারে না। এজন্য সর্বপ্রথম সমাজস্থিত লোকদের নিরাপত্তা বিধান করা অত্যাবশ্যক।

১০। "এতিমের মাল স্পর্শ করো না। (আয়াত-৩৪) অর্থাৎ এতিমের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে না পারবে ততদিন তাদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তাকে জোর পূর্বক ভিটা থেকে উচ্ছেদ তো দূরের কথা, তার সম্পত্তির এক কপর্দকও নিজে ভোগ করা যাবে না।

১১। "ওয়াদা পূরণ করবে, কারণ ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (আয়াত-৩৪) অর্থাৎ ওয়াদা বা চুক্তি তা যে পর্যায়েরই হোক তা মেনে চলতে হবে। কখনোই মুনাফেকির নীতি অবলম্বন করা যাবে না। শুধু পারিপার্শ্বিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাই নয় ওপরন্ত ঈমান আনার সময় মুমিন আল্লাহর সাথে যে যে বিষয়ে গোলামির ওয়াদা করেছে তাও রক্ষা করতে হবে।

১২। "যখন মাপ দিবে তখন পুরোপুরি দেবে, ত্রুটিহীন পাল্লা দ্বারা ওজন করে মাপবে।" (আয়াত-৩৫) অর্থাৎ লেনদেনের ব্যাপারে সততা ও ন্যায় পরায়ণতা বজায় রাখবে, কারণ যেখানে লোকেরা পরস্পরের প্রতি আস্থাবান না থাকবে এবং সাধারণভবে লোকেরা পরের হক মেরে খাবার প্রচেষ্টায় থাকবে সেখানে কোন সুস্থ সমাজিক পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না।

১৩। "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে অমুলক ধারণার বশবর্তী হয়ো না। চক্ষু, কর্ণ, অন্তর সব ব্যাপারেই তোমার জবাবদিহি করতে হবে।" (আয়াত-৩৬) অর্থাৎ অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করোনা কারণ তাতে সামাজিক কৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে। শুধুমাত্র অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে তা অকল্যাণই বয়ে আনবে। তাই শ্রবণশক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও চিন্তা শক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

১৪। "জমিনের ওপর অহংকারের সাথে চলাফেরা করো না।" (আয়াত-৩৭) অর্থাৎ অহংকারী মনোভাব ও আত্মম্ভরিতার সাথে পদচারণা করোনা। কারণ তোমার অহংকার পৃথিবীকে না বিদীর্ণ করতে পারবে আর না তুমি আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর হতে পারবে। নিজের চাল চলন, পোষাক-পরিচ্ছেদ, যানবাহনে চলাচল, আচার-আচরণ সর্বস্তরেই বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করবে। শক্তির দাপট বা প্রতাপ দেখিয়ে জনমনে ভীতির সঞ্চার করার চেষ্টা করো না। নমরুদের ন্যায় ফেরাউনও রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল বলে কোরআনে উল্লেখ আছে। কোরআনে বর্ণিত ফেরাউনের এই বাক্যগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"অমাত্যবর্গ। আমি নিজেকে ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোন ইলাহ সম্পর্কে অবহিত নই।" আল কাসাস-৩৮।

"মুসা! আমি ব্যতীত অন্য কাউকে তুমি যদি ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো, তবে আমি তোমাকে কয়েদীদের মধ্যে শামিল করবো।" (আশ শোয়ারা-২৯)

"আমি কি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ 'রব' নই।"

এ বাক্যগুলোর অর্থ এ নয় যে, ফেরাউন নিজেকে ছাড়া অন্যসব ইলাহকে অস্বীকার করতো। বরং তার আসল উদ্দেশ্য ছিল হজরত মুসা (আ.) এর বক্তব্য অস্বীকার করা। যেহেতু তিনি এমন এক ইলাহার দাওয়াত দিচ্ছিলেন, যিনি শুধু অতি প্রাকৃতিক (Supernatural) অর্থেই মাবুদ নয় বরং তিনি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অর্থেও আদেশ নিষেধের মালিক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তাই সে (ফেরাউন) দেশবাসীকে বলেছিল আমি ছাড়া তো তোমাদের কোন ইলাহ নেই। প্রকৃতপক্ষে অতি প্রাকৃতিক খোদায়ি দাবি ফেরাউনের আসল দাবি ছিল না। এ কারণেই সে বলতো আমি মিসর ভূমি, তার অধিবাসীদের সবচেয়ে বড় রব। এ দেশের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের অধিকার কেবল আমারই, আমার ব্যক্তি সত্তাই এদেশের সমাজ সংগঠন এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা বিধি বিধানের ভিত্তিমূল। তাই আমি ছাড়া অন্য কারো (সে যেই হোক না কেন) আদেশ নির্দেশ এখানে অচল।

কোরআনের ভাষার মর্মানুযায়ী তার দাবির ভিত্তি ছিল:

"আর ফেরাউন তার কওমের মধ্যে ডাক দিয়ে বললো: হে আমার জাতির জনগণ। আমি কি মিশর দেশের মালিক নই? মিশরের রাজত্ব কি আমার নয়?"

প্রকৃতপক্ষে সকল দেশে সকল সময়ে এই সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রজা সাধারণকে তাদের দ্বারা প্রণীত বিধান অবশ্য পালনীয় হিসেবে চালু করার জন্যই এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন। এ কারণেই জুরিসপ্রুডেন্সের অনেক লেখকই রাষ্ট্রীয় আইনকে (civil law) শ্রেণিবিভাগ করে বলেছেন যে ইহা রাষ্ট্রের আইন (law of the land) এবং অপরিহার্যরূপে অবশ্য পালনীয়। তারা বলেন যে, নাগরিকগণের প্রতি রাষ্ট্রের সাধারণ আদেশ বা (general commands) নির্দেশ এবং যাহা প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রীয় শক্তি বলে কার্যকরী হয়ে থাকে, উহাই রাষ্ট্রীয় আইন বা রাষ্ট্রের আইন।

দ্বীন :

পবিত্র কোরআনে আইনের সমার্থক শব্দ হিসেবে 'দ্বীন' কে ব্যবহার করা হয়েছে। 'দ্বীন' শব্দটি যে বিধানের প্রতিনিধিত্ব করে তা' ৪টি মূল উপাদান নিয়ে গঠিত :

এক : সার্বভৌমত্ব, সর্বোচ্চ ও সার্বিক ক্ষমতা।

দুই : সার্বভৌমত্বের মোকাবিলায় আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য।

তিন : এ সার্বভৌমত্বের আলোকে সৃষ্ট চিন্তা ও কর্মধারা।

চার : এই সার্বভৌমত্বের অধীন মতবাদের অনুসরণের জন্য পুরস্কার অথবা বিদ্রোহ / বিরোধিতার জন্য শাস্তি স্বরূপ ক্ষমতাধর সত্তার তরফ থেকে প্রদত্ত প্রতিদান / প্রতিফল ।

কোরআনে উল্লেখিত ৪টি অর্থে 'দ্বীন' শব্দের ব্যবহার পরিষ্কারভাবে বুঝবার জন্য নিম্নে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো–

সার্বভৌমত্ব : সর্বোচ্চ ও সার্বিক ক্ষমতা অর্থে –"তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বাসস্থান করেছেন; আর আসমান করেছেন ছাদ, তোমাদের আকৃতি দান করেছেন এবং তাকে কতইনা সুন্দর করেছেন। যিনি পবিত্র বস্তু থেকে তোমাদের রিজিক সরবরাহ করেছেন। সে আল্লাহ তোমাদের রব। রাব্বুল আলামিন। মহান মর্যাদার অধিকারী বরকতের মালিক। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। সুতরাং দ্বীনকে একান্তভাবে তার জন্য নিবেদিত করো। তাকেই ডাকো, সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য।" (আল-মুমিন ৬৪-৬৫)।

"আসমান-জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর। দ্বীন একান্তভাবে তাঁর জন্য নিবেদিত। তবুও কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তোমরা ভয় করবে– তাকওয়া করবে অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত এমন কেউ আছে কি যার নির্দেশের বাধ্যতা থেকে তোমরা বিরত থাকবে এবং যার অসন্তুষ্টিকে তোমরা ভয় করবে।" (নহল-৫২)

"তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বীন তালাশ করছে? অথচ আসমান জমিনের সমুদয় বস্তু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহরই নির্দেশানুবর্তী। আর তাঁর কাছেই তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (আল ইমরান-৮৩)

এ কয়টি আয়াতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্বীকার করে তার আনুগত্য মান্য করার অর্থে দ্বীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বীনকে একনিষ্ঠ করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কারো সার্বভৌমত্ব-শাসন কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য স্বীকার করবে না। নিজ আনুগত্য এমনভাবে আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করবে যাতে অন্য কারো আনুগত্য করার প্রশ্ন উত্থাপিত না হয়।

'শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়। তারই নির্দেশে তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগি (নির্দেশ পালন করা) করো না। ইহাই সঠিক দ্বীন। (ইউসুফ)

"ব্যভিচার-ব্যভিচারিনী উভয়কে একশত চাবুক মারো। আল্লাহর দ্বীনের (আইনের) ব্যাপারে তোমরা যেন তাদের ওপর দয়া করোনা।" (নুর-২)

"যখন থেকে আল্লাহ আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে তার বিধানে মাসের সংখ্যা চলে আসছে ১২টি। এর মধ্যে চারিটি মাস হারাম-পবিত্র। ইহাই সত্য সঠিক দ্বীন (স্থায়ি বিধান)।"

"তারা কি এমন কিছু শরিক বানিয়ে নিয়েছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের অনুরূপ, এমন আইন বিধান রচনা করে আল্লাহ যার অনুমতি দেননি।"- (শুরা-২১) "তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।" (কাফেরুন)।

এ সকল আয়াতে দ্বীনের অর্থ আইন-কানুন বিধি বিধান, নিয়ম ঐতিহ্য-শরিয়ত-পথ পন্থা ও কর্মপদ্ধতি। যে সব চিন্তা-চেতনা ও কর্মধারা অনুযায়ী মানুষ জীবন যাপন করে তাই দ্বীন। এসব চিন্তাধারার ভিত্তি যদি আল্লাহ ও রসুল ভিত্তিক হয়ে থাকে তাহলে খোদার দ্বীনে বহাল থাকা বুঝায়। পক্ষান্তরে চিন্তাধারার বা কর্ম পন্থর উৎস যদি পার্লামেন্ট-প্রেসিডেন্ট বা অন্য কোন সংস্থা বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হয়ে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর 'দ্বীন' আছে বলে গণ্য করতে হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি/গোষ্ঠী/ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ/আদেশ অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে, সেই কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি তার দ্বীনে আছেন বলে মনে করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যিনি কাল মার্কসের চিন্তাধারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন তার প্রদর্শিত পথেই জনগণের মুক্তি আসবে বলে মনে করেন, তিনি কাল মার্কসের দ্বীনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন হিসেবে গণ্য হবেন।

অনুরূপভাবে যিনি সিগমন্ড ফ্রয়েডের মতবাদে বিশ্বাসী তিনি ফ্রয়েডীয় দ্বীনে বিশ্বাসী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন। আবার আমেরিকার রাজনৈতিক মডেলের ওপর আস্থাশীল কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আমেরিকার 'দ্বীনে' বিশ্বাসী হিসেবে আখ্যায়িত করতে হবে।

আল কোরআনে দ্বীন শব্দটিকে ব্যাপক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছে। কোরআনে দ্বীন এমন এক জীবন যাপনের পদ্ধতি বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে বুঝানো হয়েছে যাতে মানুষ কারো সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্বীকার করে তার আনুগত্য-আধিপত্য-অধীনতা স্বীকার করে এবং তার বিধি-বিধান এবং আইনের নিয়ন্ত্রণে জীবন-যাপন করে। তার নির্দেশ পালন করার জন্য মর্যাদা, উন্নতি এবং পুরস্কারের আশা বা সেই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারীর অবাধ্যতার জন্য অপমান ও ক্ষতির তথা শাস্তির ভয় করে।

দ্বীন ইল্লাহ বলতে আল্লাহতা'লার নির্দেশিত আইন বা বিধি-বিধান বুঝায়। পক্ষান্তরে দ্বীন-ই-মূলক বলতে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন বুঝানো হয়। উল্লেখ্য, বিবেচিত সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক ক্ষেত্র ও ব্যক্তি বিশেষে আল্লাহ অথবা গায়রুল্লাহ হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দ্বীন এর বিকল্প শব্দ অনুসন্ধান করা খুবই কষ্টসাধ্য। তবে আধুনিক কালের আইন (Law) বা রাষ্ট্রীয় আইনের ব্যাপকতা এর অনেকটা কাছাকাছি। সাধারণভাবে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াদি যেমন হাত মুখ ধৌত করা বা খাওয়ার পদ্ধতি, সন্তানাদির নামকরণ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় আইনের বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু দ্বীন শব্দের ব্যাপকতা মানব জীবনের সকল কর্মকান্ডেই পরিব্যপ্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের চিন্তার ও কর্মের অসংগতি কোন রাষ্ট্রীয় আইনের আওতাধীন নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর 'দ্বীন' অনুসারে এ ধরনের ব্যক্তিকে মুনাফিক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং মুনাফিকদের কাফেরের চেয়ে নিকৃষ্ট গণ্য করার সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

"ফেরাউন বললো : ছেড়ে দাও আমাকে, আমি মুসাকে হত্যা করে ছাড়বো। এখন সে তার 'রব' কে ডাকুক। আমার আশঙ্কা সে তোমাদের দ্বীন (তোমাদের প্রবর্তিত গায়রুল্লাহর দ্বীন) বদলিয়ে না ফেলে এবং দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি না করে বসে।" (আল মুমিন-২৬)।

পবিত্র কোরআনে মুসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনার পর্যালোচনা করে একথা অতি সহজেই বলা যায় যে, এখানে দ্বীন নিছক ধর্মের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং তা ব্যবহৃত হয়েছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন বা সামাজিক বিপ্লব অর্থে। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল মুসা (আ.) তাঁর মিশনে বিজয়ী হলে ক্ষমতা বদলের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বিধান রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির সার্বিক পরিবর্তন ঘটবে। এবং এতে তার মতে সারাদেশে আইন কৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটবে ও বিকৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। "মূলত: আল্লাহর কাছে ইসলামই হচ্ছে দ্বীন"। (আল-ইমরান ৮৫)।

"তিনি আল্লাহ, যিনি তার রসুলকে সঠিক পথ নির্দেশ এবং দ্বীনে হক সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি তাকে সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকদের কাছে তা অসহ্য"। (তওবা-৩৩)

"যখন আল্লাহর সাহায্য উপস্থিত হয়, বিজয় লাভ হয়, আর তুমি দেখতে পাও, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে। তখন তোমার প্রশংসা স্তুতি করো এবং তার কাছে ক্ষমার আবেদন করো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল"। (আন-নসর)

এ সকল আয়াতে দ্বীনের অর্থ পরিপূর্ণ জীবন বিধান। চিন্তা, বিশ্বাস, নীতি ও কর্মের ভিত্তিতে জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এর অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্যে আয়াতগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রথম দুটি আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট মানুষের জন্য সঠিক গ্রহযোগ্য জীবন-ব্যবস্থা একমাত্র তাই যা কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্য এবং রসুলের নির্দেশের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া অন্য কোন মতবাদ যা অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা বা অন্য কোন ক্ষমতার উৎসের আনুগত্যর ওপর যা প্রতিষ্ঠিত তা– বিশ্ব জাহানের প্রভুর নিকট আদৌ গ্রহযোগ্য নয়। কারণ মানুষ তার সৃষ্টি ও মানুষের জীবন যাপনের যাবতীয় উপায় উপকরণাদি তাঁরই দান ও দয়ার সমষ্টি মাত্র। তাই সেই মহান সত্তার নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন অননুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মত জীবন-যাপন করার অধিকার ও ক্ষমতা মানুষের নেই।

এই প্রেক্ষাপটে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত 'দ্বীন' ও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন বা LAW এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

আইনের সংজ্ঞা :

ইংরেজি LAW শব্দটি টিউটনিক শব্দ LAD হতে উদ্ভূত। LAD এর অর্থ যাহা কিছু স্থির, অপরিবর্তনীয় এবং সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং এই অর্থে আইন বলতে ঐ সকল নিয়ম-কানুনকে বুঝায় যা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী। আবার অনেক সময় কার্য ও কারণের মধ্যে যে সম্বন্ধ (sequence between cause and effect) তাহাকেও আইন বলা হয়। এই অর্থে আমরা মধ্যাকর্ষণ শক্তি বা বিভিন্ন রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক চিরস্থায়ি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াকে আইন বলে থাকি যেমন সূর্য পূর্ব দিকে উদিত এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। আবার মাঝে মাঝে মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার ও আচরণের নির্দেশ মূলক বিভিন্ন বিধি ও আচরণকে আইন বলা হয়।

কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের বিশেষ অর্থ আছে। মানুষের বাহ্যিক ব্যাপারে আচরণের যে নিয়মগুলি যা সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত– ইহাকে আইন বলে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে আইনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হবস আইনের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন: "প্রজাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় নেতাদের আদেশই রাষ্ট্রীয় আইন।" (The civil law is the command of him, who is endowed with supreme power in the state concerning the future actions of his subject.)

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গগণ হয় জনসাধারণের সম্মতিতে নতুবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা শক্তি প্রয়োগে উহার প্রতি আনুগত্য আদায় করিয়া থাকেন। এই জাতীয় আদেশ বা নির্দেশ (Commands) যা রাষ্ট্র কর্তৃক উহার নাগরিকদের প্রতি জারী করা হয়, উহাকে আইন বলে। অস্টিনের মতে, একটা আইন হচ্ছে আদেশ বা নির্দেশ যা' এক ব্যক্তি (রাজা) বা ব্যক্তিসমষ্টি (সরকার) যে কোন একটি পদ্ধতিতে গঠিত আচরণ বিধি নির্দেশ করে। তাই এই মতবাদ অনুসারে আইনের উৎস সব সময় জন সম্মতির মধ্যে নিহিত নেই বরং উহা সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের ইচ্ছা বা ক্ষমতার মধ্যে নিহিত যাদের ওপর প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত। অন্য কথায় যে কোন রাষ্ট্রে উহার জনবল এবং অস্ত্রবল আইন-কৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং সকল নাগরিকদের অবশ্যই আইন (অন্যায় হলেও) পালন বা মান্য করা উচিৎ। উহা কারো নিকট ভালো লাগুক বা না লাগুক। অস্টিন আইন সম্বন্ধে একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "সার্বভৌমের আদেশই আইন এবং সার্বভৌম যাহা অনুমোদন করেন, তাহাও আদেশ করেন বলিয়া ধরিয়া নিতে হবে।" (The law is the command of the soverign)। হল্যান্ডের মতে, " বাহ্যিক ব্যাপারে মানুষের কর্মের যে সাধারণ নিয়মগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা বলবৎ করা হয়েছে তাই আইন।" (A general rule of external human action enforced by a soverign political authority.) উড্রো উইলসনের মতে, "সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণা ও অভ্যাসের যে অংশ সর্বজনীন নিয়মের আকারে সুস্পষ্টরূপে ও সরকারিভাবে স্বীকৃত হইয়াছে এবং যাহা সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দ্বারা বলবৎ করা হয়, তাহাই আইন।" (Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the government.)

আইনের শ্রেণিবিভাগ :

অধ্যাপক হল্যান্ড আইনকে দুইভাগে ভাগ করেছেন; ব্যক্তিগত আইন এবং সরকারি আইন। তার মতে, ব্যক্তিগত আইনে উভয়পক্ষই সাধারণ ব্যক্তি কিন্তু সরকারি আইনে অন্ততপক্ষে একপক্ষ সরকার এবং অন্যপক্ষ সাধারণ ব্যক্তি।

সরকারি আইনকেও কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমত শাসনতান্ত্রিক আইন বা সাংবিধানিক আইন (constitutional law), দ্বিতীয়ত শাসন বিভাগীয় আইন (Administrative law), তৃতীয়ত ফৌজদারি আইন (Criminal law), চতুর্থতঃ ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত বিধি (Criminal procedure), পঞ্চমত রাষ্ট্র সংক্রান্ত আইন, যাহা রাষ্ট্রকে আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচার করে Law of the state in its quasi private personality. আবার উৎপত্তির কেন্দ্রস্থল হতে বিচার করলে আইনকে নিম্নোক্ত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ শাসনতান্ত্রিক আইন, দ্বিতীয়তঃ ইহা আইন সভা কর্তৃক সাধারণভাবে প্রণীত আইন (STATUTE), তৃতীয়তঃ প্রথা ভিত্তিক সাধারণ আইন (Common law), চতুর্থতঃ বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত আইন (ordinance), পঞ্চমতঃ শাসন বিভাগীয় আইন (Administrative law) এবং ষষ্ঠতঃ আন্তর্জাতিক আইন (International law)।

১। **শাসনতান্ত্রিক আইন :** ইহাকে মৌলিক আইন বলা হয়। কারণ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কিভাবে কোথায় অবস্থিত থাকে। দেশের শাসন পদ্ধতি কিভাবে চলবে তা' শাসনতান্ত্রিক আইন নিরূপণ করে। আইন পরিষদ শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন কিভাবে নিরূপিত হবে তা এই শাসনতান্ত্রিক আইনই সুনির্দিষ্টরূপে প্রকাশ করে। সরকারের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের সীমা কতদূর, সাধারণ আইন কিভাবে প্রণীত হয় তাহা নির্ধারণ করে এই শাসনতান্ত্রিক আইন। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অত্যন্ত সাবধানতার সাথে জটিল প্রণালীতে সাধন করা হয়।

২। **সাধারণভাবে প্রণীত আইন :** ইহা আইন পরিষদ কর্তৃক সাধারণভাবে প্রণীত আইন। সাধারণভাবে দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আইন পরিষদ এইসব আইন প্রণয়ন করে থাকে।

৩। **সাধারণ আইন :** ইহা প্রথা ভিত্তিক সাধারণ নিয়মাবলী। ইহা বিভিন্ন বিচারালয়ে স্বীকৃত ও অনুমোদিত ন্যায়ানুগ মনোভাব এবং উপযোগিতা ভিত্তিক, এই সাধারণ নিয়মাবলী সামাজিক জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান। ইংল্যান্ডে সাধারণ আইন সমূহ (Common law) বিচারালয়ে সিদ্ধান্ত হতে গৃহীত হয়েছে।

৪। **শাসন বিভাগীয় আইন :** সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য খুঁটিনাটি নিয়মকানুন সমূহ শাসন বিভাগীয় আইন। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব নিয়মকানুনের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইন পরিষদের এমন কোন সময় বা সামর্থ্য নাই যে তারা এইসব বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দিতে পারে। ফলে আইন পরিষদ নির্ধারিত কাঠামোকে ঠিক রেখে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এই ধরনের বিধি বিধান রচনা করেন যাকে 'ডেলিগেটেড লেজিসলেটিভ' পাওয়ার বলে।

৫। **আন্তর্জাতিক আইন :** বিশ্বের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা, সম্পর্ক নির্ণয় ও একের প্রতি অপরের প্রচলিত আচরণের নিয়ম বা বিধিকেই আন্তর্জাতিক আইন বলে। অনেকে মনে করেন– আন্তর্জাতিক আইন কোন আইন নয়। কারণ কোন রাষ্ট্র চুক্তি-সম্মতি থেকে উদ্ভূত কোন শর্ত বা আইন লঙ্ঘন করলে করণীয় কিছু থাকে না। (রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা– ড. এমাজ উদ্দিন থেকে সংকলিত ও সংক্ষেপিত)

স্মরণ রাখতে হবে আরবি দ্বীন শব্দ বলতে ক্ষেত্র বিশেষে সকল ধরনের আইনকে বুঝিয়ে থাকে।

আইন শাস্ত্রে ন্যায় বিচারের ভিত্তি :

ন্যায় বিচার বা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের তথা সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের অনুমোদিত ও প্রয়োগকৃত বিধি-বিধানকে আইন বলা হয়েছে। অন্য কথায় ন্যায় বিচারের ধ্যান-ধারণা এবং উহার উদ্দেশ্যেই আইনের বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। আইনের ব্যাখ্যা বা বর্ণনায় ন্যায় বিচারের এই মূল তত্ত্বে সঠিকভাবেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আইন ও ন্যায় বিচার সমার্থক শব্দ। একারণে আমরা আইনের আদালতকে ন্যায় বিচারের আদালত (Court of law বা Court of justice) বলে অভিহিত করি এবং আইনের শাসন বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকেও আইন বলবত বা কার্যকরী করা বুঝায়।

তাই বাস্তবিক পক্ষে নির্দিষ্ট কোন বিধি-বিধান ব্যতীত আদালতের পক্ষে উহার কাজ পরিচালনা বা সম্পদন করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ন্যায় বিচারের ধারণায় নির্দিষ্ট কয়েকটি বিধি-বিধানকে পূর্ব শর্ত হিসেবে ধরে নেয়া থাকে, আইনের বিধি-বিধান অনুযায়ী বিচারপতিগণ নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত আইনবিদ জেরেমি টেলর বলেন যে, (Reason) কথাটি কোথাও মানিয়া চলা হয় না। প্রকৃতির আইন (Law of Nature) অর্থাৎ ন্যায় বিচারের মূলনীতি সম্পর্কে যদি আমরা অনুসন্ধান চালাই তাহলে আমরা আমাদের অসংলগ্ন কথোপকথনের ন্যায় একটি অনিশ্চয়তা বা বিকৃংখল কাল্পনিক পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হবে। উল্লেখ্য যে, জজ, ম্যাজিস্ট্রেটগণ যাদের ওপর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আইনের ঐসকল বিধি-বিধান তাদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং তারা ঐসকল বিধি-বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য। তথাপি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের নিজস্ব বিবেক বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তা প্রসূত সিদ্ধান্ত ব্যতীত শুধুমাত্র আইনের কঠোর প্রয়োগ বা ব্যবহারে অনেক সময় অনেক অন্যায় বা অপরাধ তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে তাদের এ ব্যাপারে কিছু করণীয় থাকে না। এ কারণেই এই বাগধারার সৃষ্টি হয়েছে, "ঘটনা সত্য তবে প্রমাণের অভাব"। মি. হুকারের মতে, বাচনিক অর্থে আইন, সঠিক যুক্তি মুখপত্র, বাচনিক বা কাল্পনিক অর্থে তারা ন্যায় বিচারের বাণীকে, রাষ্ট্রের মুখ তথা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগকারী অথবা অন্য কোন আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রকাশ বা ঘোষণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু হামেশাই আইন সম্পর্কে এই ধারণার ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং ইহা সঠিকভাবেই মনে করা হয়ে থাকে যে যদিও নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত বিধি-বিধানের অস্তিত্ব আইন মোতাবেক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্ব শর্ত তবুও যে কোন পদ্ধতিতে বিচারকের মনোভাব সম্বলিত স্বেচ্ছামূলক আচরণের (Judicial discretion) বা কাজ করার অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা অসম্ভব বা সম্ভব নয়। তাছাড়া আইনের ব্যাখ্যার নেতিবাচক বা ইতিবাচক দিক আছে এবং বিচারককে অবশ্যই কিয়ত পরিমাণ স্বেচ্ছামূলক আচরণের অধিকার যে কোন ধরনের বিচার ব্যবস্থাই দিতে বাধ্য যার আওতা বা সীমার মধ্যে বিচারক তার কর্তব্য সম্পাদন করবেন। প্রধান সমস্যা হচ্ছে যে বিচারকের কি পরিমাণ স্বেচ্ছামূলক আচরণের অধিকার দেওয়া উচিত, সে সম্পর্কে কোন ধরাবাঁধা বা নির্দিষ্ট বিধি-বিধান প্রণয়ন করা আদৌ সম্ভব নয়। অর্থাৎ যদি সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট ইচ্ছাকৃতভাবে আইন পরিষদের গৃহীত কোন আইনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে তাহলে সে সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উত্থাপন করা যাবে না। কারণ উহার বিপরীত কোন ব্যাখ্যা প্রদান করার অধিকারী বা ক্ষমতাসম্পন্ন অপর কোন বিচারালয় বা আদালতের অস্তিত্ব নেই। যদিও সর্বোচ্চ আদালতের ক্ষেত্রে এ কথা বলা হলেও সকল আদালত তথা সিদ্ধান্ত গ্রহীতা সম্পর্কে একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে তা উক্ত কর্তৃপক্ষ বা তদূর্ধ কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ/রায় নাকচ বা বাতিল করানোর প্রচলিত পদ্ধতি এতই জটিল, ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য যে সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রায় অসম্ভব বলাই শ্রেয়। তাই প্রকৃত ন্যায় বিচার মূলত দুইটি বিরল জিনিসের ওপর নির্ভরশীল :

১। সঠিক ও স্বব্যাখ্যাত আইন,

২। আইন ব্যাখ্যা করার জন্য সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মহান ব্যক্তিত্ব। এই কারণেই মানব জাতির জন্য সঠিক ও স্বব্যাখ্যাত আইন বলতে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রণীত ঐশি আইনকেই বুঝায় এবং তা ব্যাখ্যা করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ তাঁর রসুল বা নবি। এই নিরিখেই কলেমা তাইয়্যেবার দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মদুর রাসুল্লাহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

রিসালাত-নবুয়ত

বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের মালিক, স্রষ্টা ও শাসনকর্তা যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে জানার, চিন্তা করার বুঝবার শক্তি দিয়েছেন, ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যাচাই-বাছাই, নির্বাচন করার ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। মোট কথা মানুষকে এক ধরনের স্বায়ত্ব শাসন (অথরিটি) দান করে তাকে পৃথিবীতে নিজের খলিফা বা প্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। এ পদে অধিষ্ঠিত করার সময় একথা মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছে যে, তাকে এই পৃথিবীতে কিছু সময়ের জন্য যে সীমিত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে তাকে পরীক্ষা করার জন্যই। এই সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর সবাইকে আল্লাহতা'লার কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তাদের পার্থিব কর্মকান্ডের জন্য বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। সেই মহান প্রভু বৃহত্তর রহস্যের অংশ হিসেবে মানুষের জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তিনি নিজে প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছেন এবং তাঁর সাম্রাজ্যের নির্দেশ দান ও পরিচালনার যাবতীয় ব্যবস্থাকেও প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। এ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এভাবে চলছে যে, বাহ্যত এর কোন শাসক দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন কর্মকর্তাও দেখা যায়। শুধু মানবকুল বিরাট কর্মকান্ড ও তার নিজের অস্তিত্ব উপলদ্ধি করছে, সে যে কারো অধীন বা কাউকে তাঁকে হিসেব দিতে হবে, তার বাহ্যেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোথাও এটা অনুভূত হয় না। পারিপার্শ্বিক বস্তু সামগ্রীর মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে তেমন কোন সুস্পষ্ট নির্দশনও নাই, যার ভিত্তিতে বিশ্ব জাহানের শাসনকর্তার কর্তৃত্ব এবং নিজের অধীনতা ও দায়িত্বশীলতার অবস্থা সকল প্রকার সন্দেহমুক্ত হয়ে তার কাছে প্রকাশিত হতে পারে। বিভিন্ন সময়ে নবিদের আগমন হয় কিন্তু তাঁদের ওপর যে ওহি নাজিল হয় তা কেউ চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করতে পারে না অথবা এমন কোন সুস্পষ্ট নিদর্শনও তাদের সঙ্গে প্রেরণ করা হয় না, যা প্রত্যক্ষ করার পর তাদের নবুয়ত মেনে নেওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। একটি সীমারেখার মধ্যে মানুষ নিজেকে পূর্ণ স্বাধীন দেখতে পায়। বিদ্রোহ করার ক্ষমতা ও যাবতীয় উপকরণাদি প্রাপ্তির দীর্ঘকালীন সযোগ দেওয়া হয়। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে দুষ্কৃতির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে সে কোন বাধা পায় না। বিদ্রোহ ও আনুগত্যের উভয় অবস্থাতেই পার্থিব উপকরণ সরবরাহে তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। বিশ্ব জাহানে শুধুমাত্র মানুষের ব্যাপারে এরকম পদ্ধতি এ কারণে গৃহীত হয়েছে যে, স্রষ্টা মানুষকে বিবেক, বুদ্ধি, যুক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীন ইচ্ছায়। পরিচালিত হবার ক্ষমতা দিয়েছেন। তার মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করতে চান, এই পরীক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য তিনি সত্যকে অদৃশ্য করে রেখেছেন (জীবন যাপনের সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ এবং কর্মের সযোগ দান না করা হলে তার পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না)। হেদায়াতের পদ্ধতি হিসেবে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে: "মহিমান্বিত তিনি, সার্বভৌম ক্ষমতা যার হাতে; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, যিনি মৃত্যু ও জীবনের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে ভাল? তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল" (মুলক-১-২)

"মানুষ কি মনে করে যে, আমরা বিশ্বাস করি– একথা বললেই ওদের পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করা হয়েছিল। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী, যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে তারা আমার আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে? কি মন্দ তাদের বিচারবুদ্ধি"। (আনকাবুত: ১৪)

আল্লাহতা'লা জোর করে কাউকে হেদায়াত করেন না, কারণ তা' প্রদত্ত স্বাধীনতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। এ কারণেই পবিত্র কোআনে বলা হয়েছে যে, "তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই বিশ্বাস করতো। তবে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে? আল্লাহর অনুমতি ছাড়া বিশ্বাস করা কারো সাধ্য নেই। আর যারা বুঝেনা তাদের ওপর তিনি অজ্ঞতা কলুষতা চাপিয়ে দেন।" (ইউনুস: ৯৯-১০০)।

এই পরিস্থিতিতে অজ্ঞ, লোভী, স্বার্থপর মানুষ খোদা প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে পারে না। ইতিহাসের আবর্তন, বিবর্তনকালে মানবসত্তা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট মৌলিক বিষয়গুলোকে বুঝতে গিয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিভ্রান্তির ও প্রতারণার শিকার হয়েছে। কোন সত্যকে অতিরঞ্জিত করে উপলদ্ধি করেছে। আবার কোনটাকে বুঝতে ভুল করেছে। যার ফলে বিভিন্ন সময়ে ভুল জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

পরবর্তীকালে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মানুষ নিজের বুদ্ধি ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার অসারতা উপলব্ধি করে অন্য ধরনের ভুল জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। মহামূল্যবান মানব জীবনকে নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সম্পূর্ণ ভুল করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, মানব জাতির জন্য প্রত্যেক যুগেই একটি আলাদা ধরনের জীবন ব্যবস্থা প্রয়োজন। যে জীবন ব্যবস্থা তৈরি হবে কেবলমাত্র সে যুগেরই অবস্থা, সমস্যা ও পারিপার্শ্বিকতার আলোকে এবং সেসব সমস্যার তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করতে হবে যা অপরিহার্য বা তাৎক্ষণিক।

এই ধরনের প্রেক্ষিতে একমাত্র এ সিদ্ধান্ত গ্রহণই যৌক্তিক ও যথার্থ হতে পারে যে, এরূপ যুগ ও কাল ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থাকে বারবার পরীক্ষা করা এবং প্রত্যেকটির ব্যর্থতার পর তার স্থলাভিষিক্ত অন্য একটিকে পরীক্ষা করায় মানব জাতির মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোন ফলোদয় হয় না, এতে করে তার অগ্রগতি ব্যহত হয় এবং উন্নতি ও বিকাশ ইঙ্গিত চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে বিরাট বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

জীবন ব্যবস্থা রচনার জন্য মানুষের হাতে চারটি উপায়-উপকরণ রয়েছে। এর প্রথমটি হলো ইচ্ছাশক্তি, দ্বিতীয়টি বুদ্ধিবৃত্তি, তৃতীয়টি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ (বিজ্ঞান) এবং চতুর্থটি অতীত অভিজ্ঞতার ঐতিহাসিক প্রামাণ্য চিত্র।

ইচ্ছাশক্তি: যদিও এটা মানুষের প্রেরণাদায়ক ও কর্মোদ্দীপক শক্তি কিন্তু এর স্বভাব প্রকৃতিতে যেসব দুর্বলতা বর্তমান, তাতে মানুষকে জীবনের নির্ভুল পথের সন্ধান দেয়ার ক্ষমতা কখনোই থাকতে পারে না। এটি স্বভাবতই মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞানকে বিপথে চালিত করে। শেষ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে শতকরা নিরানব্বই ভাগ এটা নির্ঘাত ভুল সিদ্ধান্ত নেবে। কারণ তার মধ্যে যেসব চাহিদা দেখা যায়, তা তাকে কাম্যবস্তু দ্রুত ও সহজলভ্য হয় এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে এটা মানবিয় ইচ্ছাশক্তির স্বভাবগত দুর্বলতা, সুতরাং ইচ্ছা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যাই হোক না কেন, তা কখনো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা রচনায় সহায়ক হতে পারে না।

বুদ্ধিবৃত্তি : এটা শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতা ও ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মানবিয় শক্তি। মানুষের জীবনে তার গুরুত্ব ও প্রভাব যে অসাধারণ এবং মানুষের জন্য তা যে একটি বিরাট প্রেরণাদায়ক শক্তি, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু মানব জাতির জন্য কোন জীবন বিধান রচনার বিষয় বিবেচনা করতে গেলেই প্রশ্ন জাগে, এ দায়িত্ব কার বুদ্ধির ওপর দেয়া যেতে পারে? কোন ব্যক্তি বিশেষের না সকল মানুষের? অথবা কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী বা শ্রেণির?

আমরা সবাই জানি যে বুদ্ধিভিত্তিক সকল সিদ্ধান্তই পঞ্চ ইন্দ্রিয় তথা অনুভূতি শক্তির সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। সংগৃহীত তথ্য ভুল হলে বুদ্ধিবৃত্তির সিদ্ধান্তও ভুল হতে বাধ্য। অন্যদিকে তা অসম্পূর্ণ হলে সিদ্ধান্তও হবে অসম্পূর্ণ। আর যে ব্যাপারে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আদৌ কোন তথ্য সরবরাহ করবে না, সে ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তি যদি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকে তবে সে কোন সিদ্ধান্তই নেবে না। আর যদি দাম্ভিক হয় তবে অন্ধকারে নিস্ফল তীর নিক্ষেপ করতে থাকবে। এর ক্ষমতার সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করলে মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রচনার দায়িত্ব বুদ্ধিবৃত্তির ওপর ন্যাস্ত করার কোন যৌক্তিকতা নাই।

বিজ্ঞান : এটি হলো অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ লব্ধ জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাকে ব্যাপকতা দান করা এবং যা তার মধ্যে নেই তা আরোপ করা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক কাজ। মানবিয় সকল রহস্যের উদ্ঘাটন করার প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ বিজ্ঞানের হাতে নেই একথা গড়পড়তা সকল বুদ্ধিমান লোকই জানে। এহেন পরিস্থিতিতে নৈতিক মূল্যবোধ নির্ণয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূলনীতিসমূহ প্রণয়ন বিপথগামিতা রোধকারী সীমারেখা চিহ্নিত করার কাজ বিজ্ঞানের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় কি? এটা করতে হলে যেসব শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে তা হলো- যেসব জ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের অধীন, তা সম্পূর্ণভাবে জানা থাকা চাই, মানব সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য তার পরিপূর্ণভাবে জানা থাকা চাই। মানব-জীবন ও প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে জানা সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য একত্র করে তারপর কোন এক পূর্ণ পরিপক্ক, প্রাজ্ঞ ও গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সেগুলোকে নিপুণভাবে বিন্যস্ত করে সেগুলো থেকে নির্ভুল যুক্তি প্রমাণ আহরণ করে নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূলনীতিসমূহ ও পথভ্রষ্টতা রোধকারী

সীমারেখা নির্ণয় করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, এসব শর্ত সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পূরণ হয়নি এবং আসামিতেও এমনটি হবে আশা করা যায় না।

ইতিহাস : মানব সভ্যতায় ইতিহাসের অবদান অনস্বীকার্য হলেও মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এর ভিত্তিতে রচনা করা সম্ভব নয়। একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, ঐতিহাসিক প্রামাণ্য চিত্র অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের কাছে সঠিক ও সার্বিকভাবে পৌঁছে নাই। তাছাড়া জীবন-বিধান রচনার দায়িত্ব হেগেল, মার্কস, আর্নল্ড টয়েনবি বা বার্ট্রান্ড রাসেলের মধ্যে কার ওপর ন্যস্ত করতে হবে তাও বিচার্য বিষয়। ওপরন্তু অতীত-বর্তমান–ভবিষ্যতের ঠিক কোন সুনির্দিষ্ট সময়ের নির্ভুল ইতিহাস জীবন বিধান রচনার জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ করতে সক্ষম হবে এবং ঐ সময়ের পরে যারা জন্মগ্রহণ করবে তাদের জীবন ব্যবস্থাই বা কি হবে এ বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

অতএব, আমরা যদি ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ভিত্তিতে আমাদের জীবন গঠন বা পরিচালনা করতে যাই, তাহলে আমাদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পক্ষান্তরে কোরআন আমাদের সামনে এ চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার এক চিত্র উপস্থাপন করছে। কোরআন ঘোষণা করে যে, আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তা নন বরং তিনি পথ প্রদর্শক। তিনি বিশ্বচরাচরে বিরাজমান প্রতিটি জিনিসকে তার স্বভাব প্রকৃতির বিবেচনায় রেখে সকল প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি জিনিসকে তার দৈহিক কাঠামো দিয়েছেন অতঃপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন।

এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের সামনে এহেন পরিস্থিতিতে সঠিক জীবন-বিধান প্রাপ্ত মহান আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিবর্গ বলেন, তোমাদের সব অভিমত রেখে দাও, আমার কাছে জ্ঞানের এমন একটি মাধ্যম থেকে আমি মানব জীবনের উদ্দেশ্য, জীবন-বিধানের নমুনা, পরিণাম, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর পূর্বাপর কারণ, বিশ্ব সৃষ্টির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করি যা আল্লাহর তরফ থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে। স্রষ্টার কর্মচারীদের (ফেরেশতা) আমার সাথে যোগাযোগ আছে, আমাকে যে কোন ধরনের সমস্যার সার্বিক সমাধান বলে দেয়া হয়।

এক ব্যক্তি নিজের সমগ্র শক্তি দিয়ে এ দাবি পেশ করেন। লোকেরা তাঁর দাবি মিথ্যা বলতে থাকে। সবাই একজোট হয়ে তার বিরোধিতা করে, এমনকি তাঁকে পাগলও আখ্যা দেয়। তারা তাকে কষ্ট দিতে থাকে মারধর করে, ঘর থেকে বের করে দেয়। কিন্তু তিনি এতসব শারীরিক ও মানসিক বিপদ সত্ত্বেও নিজের দাবির ওপর অটল থাকেন। কোন প্রকার ভীতি বা লোভের বশবর্তী হয়ে নিজের দাবিতে একচুল পরিমাণ সংশোধন/পরিবর্তন করেন না। তাঁর প্রত্যেকটি কথা থেকে প্রমাণ হতে থাকে যে, তার দাবির সত্যতার ওপর তার পূর্ণ আস্থা আছে।

এরপর আর এক ব্যক্তি আসেন। তিনিও ঐ একই কথা একই প্রকার দাবি সহকারে পেশ করতে থাকেন। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ব্যক্তি আসেন। তারাও পূর্ববর্তীদের ন্যায় একই কথা একই ভাবে বলতে থাকেন। এ আগমনকারীদের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা চলতে থাকে। এমনকি তাদের সংখ্যা হাজারের অংক পেরিয়ে লাখের অংকে পৌঁছে যায়। তারা সবাই ঐ একই কথা একই দাবি সহকারে পেশ করতে থাকেন। স্থান-কাল অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের কথা ও দাবির মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায়নি। নিজেদের দাবি প্রত্যাহারের জন্য তাদেরকে সর্বপ্রকারে বাধা দেয়া হয়। কিন্তু দুনিয়ার কোন শক্তি তাদেরকে তাঁদের দাবি থেকে এক চুল পরিমাণ হটাতে পারেনি। এই দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে তাঁদের আরও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাঁরা কেউ মিথ্যাবাদী, চোর, আত্মসাৎকারী, দুষ্কৃতিকারী, জালেম, হারামখোর ছিলেন না বলে তাদের চরম বিরোধী শত্রুরাও স্বীকার করে। তাঁরা সবাই পবিত্র, নিষ্কলুষ ও অসাধারণ সচ্চরিত্রের অধিকারী। মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণের ক্ষেত্রে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে তাঁরা এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের মধ্যে পাগলামীর কোন লক্ষণও দেখা যায় না বরং তারা উন্নত নৈতিক চরিত্র, আত্মিক পরিশুদ্ধি, পার্থিব বিষয়াবলীর সংস্কারের ক্ষেত্রে এমন সব শিক্ষা, বিধান ও আইন কানুন প্রণয়ন করেন, যার নজির উপস্থাপন করা তো দূরের কথা, বিশ্বের বড় বড় জ্ঞানী, পন্ডিত, তাত্ত্বিক ও বিশেষজ্ঞগণও তার গূঢ় রহস্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করার জন্য নিজেদের সারা জীবন ব্যয় করে তা উদঘাটন করতে ব্যর্থ হন।

এইসব মহান ব্যক্তিরাই হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য সুসংবাদ বাহক বা নবি। 'নবুয়ত' হিব্রু ভাষা 'নবা' শব্দ থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ–সংবাদ দান, নবিউন কর্তৃবাচক ইছম, ইহার অর্থ সংবাদ বাহক।

নবি দুই প্রকার : (১) মুরসাল–যাঁর প্রতি কেতাব অবতীর্ণ হয়। (২) গায়েবর মুরছাল–যার প্রতি কেতাব নাজিল হয়নি এবং তিনি পূর্ববর্তী মুরসল নবির অনুবর্তী। হজরত হারুন (আ.) এঁর কথা উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য মুরসল নবিগণকে শরিয়তের ভাষায় রসুল বলা হয়। নবুয়ত দুই প্রকার ও নবুয়তে আম্মা অর্থাৎ যা সার্বজনীন বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরিত, (২) নবুয়তে খাচ্ছা যা কোন বিশেষ জাতি বা স্থানের জন্য নির্দিষ্ট। আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মোস্তফা (দ.) নবুয়তে আম্মা শ্রেণির মুরসাল নবি বা পয়গম্বর। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে : "হে মুহম্মদ (দ.) বলে দিন, হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসুল। যে আল্লাহ আসমান ও জমিনের বাদশাহির মালিক, যিনি ব্যতীত আর ইলাহ নাই, যিনি জীবন ও মৃত্যুর মালিক। অতএব, ঈমান আন আল্লাহর ওপর এবং তার সেই উম্মি রসুলের (দ.) ওপর যে খোদা ও তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর বিশ্বাস রাখে। তোমরা তার আনুগত্য কর, যাতে করে সঠিক পথ পেতে পার।" (আল আরাফ-১৫৮)

নবি ও রসুল-এর মধ্যে পার্থক্য :

'নবি' একজন মানুষ। আল্লাহ তাঁর প্রতি শরিয়াত নাজিল করেছেন ওহির মাধ্যমে। আর রসুলও একজন মানুষ। আল্লাহ তাঁর নিকট শরিয়াতের বিধান ওহির মাধ্যমে নাজিল করেছেন। সেই সাথে তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার দায়িত্বও তার ওপর অর্পিত।

'রসুল' শব্দের অর্থ 'প্রেরিত'। এই অর্থের দৃষ্টিতে আরবি ভাষায় দূত, বাণী বাহক, সংবাদদাতা বা সংবাদ-বাহক ইত্যাদি অর্থ বোঝাবার জন্য এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যারা আল্লাহর নিকট থেকে বিশেষ কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়ে থাকেন, অথবা এই নামে অভিহিত করা হয় সে সব ব্যক্তিকে, যাদেরকে আল্লাহতা'লা বিশ্ব-মানবের নিকট তাঁর পয়গাম পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন।

'নবি' শব্দের অর্থ সম্পর্কে আভিধানিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ একে নাবাউন শব্দ থেকে নির্গত মনে করে। এর অর্থ সংবাদ-বাহক। আবার কারো কারো মতে এর মূল 'নবুউন' অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদাবান ও উন্নত মান-সম্মান সম্পন্ন। আজহারী কাসায়ির সূত্রে একটি তৃতীয় কথাও বর্ণনা করেছেন। তা হলো, আসলে এই শব্দটি হচ্ছে 'নবি-ই'। এর অর্থ পথ ও পন্থা বা রাস্তা। আর নবি-রসুলগণকে নবি বলা হয় এইজন্য যে, তারাই হচ্ছেন আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ-প্রদর্শক। কোরআন মজিদে এই দুটি শব্দ কারো কারো জন্য একসাথে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন হজরত মুসা (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে : "সে ছিল এক নিষ্ঠাপূর্ণ ও মনোনীত ব্যক্তি। আর নবি-রসুলও ছিলেন তিনি।"

এক ব্যক্তিকে 'নবি-রসুল' বলার অর্থ, হয় হবে উচ্চ মর্যাদাবান সংবাদ-বাহক, কিংবা আল্লাহর নিকট থেকে সংবাদদাতা কিংবা পয়গম্বর, যিনি আল্লাহর পথের সন্ধানদাতা।

কোরআন মজিদে এ দুটি শব্দ প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। একই ব্যক্তিকে কোথাও শুধু 'নবি' আবার কোথাও শুধু 'রসুল' বলা হয়েছে। আবার কোথাও এই শব্দ দুটি এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এ দুটির মধ্যে মর্যাদা বা দায়িত্ব ও কাজের স্বরূপের দিক দিয়ে কোন পারিভাষিক পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

'আমরা তোমার পূর্বে কোন রাসুল পাঠাই নি, না কোন নবি। তবে..."

এভাবে বলার কারণে স্পষ্ট মনে হয়, নবি ও রসুল দুটি ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা এবং এ দুটির মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। এ কারণে তাফসিরকারকদের মধ্যে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন ওঠেছে, এই শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্যের রূপটি কি-কি রকমের পার্থক্য? কিন্তু এ পর্যায়ে যতটি মত-পার্থক্য ও বিতর্ক হোক-না কেন অকাট্য দলিল ও যুক্তির ভিত্তিতে নবি ও রসুল এ দুটি শব্দের আলাদা-আলাদা পদমর্যাদা নির্ধারণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। খুব বেশি বললে এটুকুই বলা যায়, 'রসুল' শব্দটি 'নবি' অপেক্ষা একটি বিশেষ গুণের ইঙ্গিতবহ। অন্য কথায়, সব রসুল নবিও; কিন্তু সব নবি রসুল নয়। আরও বলা যায়, নবিগণের মধ্যে রসুল শুধু সেই সব মহান মর্যাদাবান ব্যক্তিগণ, যাদেরকে সাধারণ নবিগণের অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। একটি হাদিস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদিসটি ইমাম আহমাদ (র) হজরত আবু ইমামা (র) থেকে এবং হাকেম হজরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদিসের কথাটি হচ্ছে। নবি করিম (দ.)–এর নিকট রসুলগণের মোট সংখ্যা কত, তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ৩১৩ কিংবা

৩১৫ জন। আর নবিগণের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন ঃ ১ লক্ষ ২৪ হাজার। হাদিসটির সনদ দুর্বল হলেও একই কথার বর্ণনা কয়েকটি হাদিসে পাওয়ার দরুণ দুর্বলতা অনেকটা দূর হয়ে যায়। (তাফহিমূল কোরআন (বাংলা) ৮ম খন্ড,২৭-২৮পৃ:)

অতএব, "রিসালাত' নব্যুাতের তুলনায় অধিক উঁচু মর্যাদার জিনিস। কেননা প্রত্যেক রসুল মূলত: নবি। কিন্তু প্রত্যেক নবি-ই রসুল নন। নবিগণের মোট সংখ্যা কত? ..... এ বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়, বিভিন্ন বর্ণনাও উদ্ধৃত করা হয়। একটি বর্ণনায় তাঁদের সংখ্যা বলা হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা.) তাঁর সংকলিত বিরাট হাদিস গ্রন্থে হজরত আবু জর গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত যে হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে: আমি বললাম, হে রসুল! সর্বপ্রথম নবি কে ? বললেন: আদম। আল্লাহর সাথে বাক্যলাপকারী নবি। বললাম, হে রসুল! আল্লাহর রসুল কত জন ? বললেন : তিনশত ও প্রায় দশ-এক বিরাট সংখ্যক। হজরত আবু হুমামার বর্ণনায় বলা হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার। তাঁদের মধ্য থেকে রসুল হচ্ছেন তিনশ পনের জন - একটি বিরাট সংখ্যক।

তবে কোরআন মজিদে মাত্র পঁচিশ জনের নামোল্লেখ করা হয়েছে। তারা সকলেই রসুল ছিলেন। এঁদের সকলেরই প্রতি ঈমান আনা ফরজ।

কোরআনে যাদের নামোল্লেখ করা হয়নি, তাদেরকেও আল্লাহর নবি হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ কোরআনে সকল নবির নাম উল্লেখ করা হয়নি। যাঁদের যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা তো নিঃসন্দেহেই আল্লাহর নবি। নাম উল্লেখ করা হয়নি এমন নবিও অনেক রয়েছেন। তাঁরাও আল্লাহর নবি। কেননা আল্লাহ নিজেই বলেছেন−

"বহু সংখ্যক রসুলের বর্ণনা তোমার নিকট পূর্বে দিয়েছি, এ ছাড়াও রসুল রয়েছে, যাদের সম্পর্কে তোমাকে কোন বর্ণনা দেইনি।"

রসুলগণ আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশিত। এই দিক দিয়ে তাঁরা নবিগণ থেকে ভিন্নতর − অধিক ও অতিরিক্ত দায়িত্বের কারণে তারা অধিক ও অতিরিক্ত মর্যাদার অধিকারী। এ পর্যায়ে এ আয়াতটি লক্ষণীয় :

"যে সব নবি আল্লাহর রিসালাতকে পুরামাত্রায় পৌঁছিয়ে ও যথাযথ প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং আল্লাহকেই বুঝে-শুনে ভয় করে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না (তারাই রসুল)। আর হিসেব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

বস্তুত: রসুলকেই আল্লাহর নাজিল করা বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। যেমন হজরত মুহাম্মদ (দ.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছেন : "হে রসুল! তোমার রব-এর নিকট থেকে যা তোমার নিকট নাজিল হয়েছে তা তুমি পূর্ণমাত্রায় পৌঁছয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দাও। আর তুমি যদি তা না-ই করলে, তা হলে তুমি তার রিসালাতকে পৌঁছিয়ে দিলে না। (মায়েদা- ৬৭)

অর্থাৎ নবি যখন রিসালাত লাভ করেন, তখনই তিনি রসুল হন। কিন্তু সব নবিই রিসালাত পান না বলে সব নবি-ই রসুল নন। আর নবি ছাড়া নবি না হয়ে কেউ-ই রসুল হতে পারেন না। এ কারণে রসুল মাত্রই নবি।

নবিগণের মর্যাদা ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে বুঝবার জন্য এ আয়াতটি পাঠ করতে হবে : "এবং এই নবিগণকে আমরা ইমাম-জননেতা বানিয়েছি; তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী হেদায়েত প্রদান করে। আর তাদের প্রতি আমরা বিপুল কল্যাণময় কার্যাবলী সম্পাদন, সালাত কায়েম করার ও জাকাত আদায়-বণ্টনের নির্দেশ ওহির মাধ্যমে পাঠিয়েছি। বস্তুত: তারা সকলেই আমার প্রকৃত বান্দাহ ছিল। অর্থাৎ :

- নবিগণ আল্লাহ নিযুক্ত জননেতা;
- নবিগণ আল্লাহর নির্দেশ ও বিধান অনুযায়ী লোকদেরকে হেদায়েত করেন;
- আল্লাহ তাদেরকে ওহির মাধ্যমে যাবতীয় কল্যাণময় কাজের নির্দেশ ও বিধান দিয়েছেন;
- সালাত কায়েম ও জাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা সম্পাদন করা নবিগণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ;
- নবিগণ একান্তভাবে আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাহ।

অতএব নবিগণ সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে রসুলগণ আল্লাহতা'লার অত্যন্ত প্রিয় ও মহা সম্মানিত বান্দাহ। সমগ্র মানব জাতির মধ্যে বাছাই করা, শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের অধিকারী ও বিশ্ব-মানবের জন্য আল্লাহর নিয়োজিত নেতা। মানুষকে সত্য-সঠিক ও নির্ভুল পথের দিশা তাঁরাই দেন, দিতে পারেন। কেননা তারা প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহর বিধানের অধীন ও ঐকান্তিকভাবে অনুসারী।

বস্তুত: কোরআন উপস্থাপিত পূর্ণাঙ্গ আদর্শের বাস্তব প্রতিমূর্তি হচ্ছেন আল্লাহর নবি ও রসুলগণ।

নবি-রসুলগণের মধ্যে পারস্পরিক শ্রেণি ও মর্যাদার পার্থক্য :

আল্লাহতা'লার নবি ও রসুলগণ অভিন্ন শ্রেণি ও মর্যাদার অধিকারী নন। তাঁদের কতক উপর কতকের তুলনায় অতীব উচ্চ ও উত্তম মর্যাদায় অভিসিক্ত এবং এমনিভাবে কতক অপর কতকের তুলনায় কম মর্যাদার অধিকারী। এই শ্রেণি ও মর্যাদা পার্থক্যের কথা স্বয়ং আল্লাহতা'লাই বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

"এই রসুলগণ, এদের কতককে অপর কতকের ওপর আমরা অধিক মর্যাদা দিয়েছি।"

"এবং নবিগণের কতককে উপর কতকের ওপর অধিক মর্যাদা দিয়েছি এবং দায়ূদকে জাবুর (কিতাব) দিয়েছি।"

নবি-রসুলগণের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে এইরূপ পার্থক্য করা সম্পর্কে অবশ্য একটা প্রশ্ন ওঠেছে। তা হচ্ছে আল্লাহ নিজে যদিও তাদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে পার্থক্য করার কথা বলেছেন, কিন্তু আমাদের জন্য তা করা এবং কতককে অপর কতকের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান বিশ্বাস করা কি জায়েজ হতে পারে? আল্লাহ নিজেই নবিগণের প্রতি ঈমান আনার শিক্ষা দিয়ে মুমিনগণের আকীদা হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

"আমরা নবি-রসুলগণের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না।"

কিন্তু এই প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। কেননা এ আয়াতে যে পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঈমান আনার ক্ষেত্রে পার্থক্য করা, কতক নবি-রসুলকে আল্লাহর প্রকৃত নবি-রসুলরূপে বিশ্বাস করা এবং অপর সংখ্যক নবি-রসুলকে সে রূপে বিশ্বাস না করার দিক দিয়ে পার্থক্য করা। এইরূপ পার্থক্য করার কোন অধিকার কোন ঈমানদার ব্যক্তিরই থাকতে পারে না। আহলি কিতাব-ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানরা তা-ই করেছে। তারা কোন নবি-রসুলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং অপর কতিপয় নবি-রসুলকে আল্লাহ প্রেরিত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। আর এভাবেই তারা ঈমান আনার ব্যাপারে নবি-রসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করেছে। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহতা'লা ইরশাদ করেছেন।

"যারা আল্লাহ ও তাঁর নবি-রসুলগণকে অবিশ্বাস ও অমান্য করে এবং আল্লাহ ও তার নবি-রসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায়, বলেঃ আমরা কতকের প্রতি ঈমান রাখি ও অপর কতককে (আল্লাহর নবি-রসুলরূপে) মানি না, আর সেই সাথে কুফর ও ঈমানের মাঝে একটি (সমন্বয়কারী) পথ বের করার জন্য সচেষ্ট হয়, তারা পক্কা কাফির। এই কাফিরদের জন্য আমরা অপমানকর আজাব প্রস্তুত করে রেখেছি।"

কারো কারো প্রতি ঈমান আনা ও অপর কারো প্রতি কুফর করা–আল্লাহর নবি বা রসুলরূপে মেনে নিতে অস্বীকার করার যে পার্থক্য তা এবং নবি-রসুলগণের মধ্যে শ্রেণি ও মর্যাদাগত পার্থক্য মেনে নেয়া কোনক্রমেই এক কথা হতে পারে না। আর এই পার্থক্যও মানুষের নিজেদের করার অধিকার নেই। তবে যে আল্লাহ নবি-রসুলগণকে তাঁর পক্ষ থেকে । দ্বীনের বাহক হিসেবে পাঠিয়েছেন, তিনি নিজেই যদি তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করে থাকেন, তবে সে পার্থক্যকে মেনে নেয়াও ঈমানের অনিবার্য দাবি। কোরআন মজিদে শ্রেণিগত ও মর্যাদাগত-ভাবে নবি-রসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করার কথা আল্লাহতা'লা নিজেই। ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ করেছেন :

"এই রসুলগণ – তাদের কাউকে কাউকে আমরা উপর কারো কারো অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে কারো সঙ্গে তো আল্লাহ নিজেই কথা বলেছেন। আবার তাদের কতককে অন্যান্য দিক দিয়ে উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন এবং মরিয়ম–পুত্র ঈসাকে আমরা অকাট্য প্রমাণ-নিদর্শনাদি দিয়েছি ও 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তার সাহায্যও করেছি। (আল-কুরআনে নবুয়্যাত ও রিসালাত - মাওলানা আব্দুর রহিম)

নবিদের বৈশিষ্ট : পবিত্র কোরআনে নবিদের সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মহান রাব্দুল আলামিন হঠাৎ করে একজন ব্যক্তিকে তার কিতাব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন না। অথবা কাউকে খন্ডকালিন কর্মকর্তা হিসেবে নবুয়াতের জন্য নিয়োগ করেননা এবং নবুয়াতের দায়িত্ব পালন করা হলে নবির দায়িত্ব থেকে

অব্যাহতিও দেন না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, আল্লাহ যখনই কোন জাতির কাছে নবি পাঠাতে চেয়েছেন তখন নবুয়তের পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে পারে এমন একজন লোককে বিশেষভাবেই সৃষ্টি/উন্নয়ন করে থাকেন। যিনি সর্বোত্তম মানবিয় গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠতম মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী, যা এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন। নবুয়ত দানের পূর্বে তাঁকে সব রকমের চারিত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি, গোমরাহি ও অসং কাজ কর্ম থেকে দূরে রাখা হয় এবং তাঁকে এমন পরিবেশেই লালন করা।

নবিরা যে জন্মের আগে থেকেই নবুয়াতের জন্য নির্বাচিত এবং তাদেরকে বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়। তা বেশ কয়েকজন নবির বর্ণনা থেকে জানা যায়। যেমন ঃ হজরত ইসহাক (আ.) এর জন্মের আগেই ইব্রাহিম (আ.) কে তার জন্ম ও নবুয়ত লাভের সুসংবাদ এভাবে দেয়া হয়েছিল। "আমি ইব্রাহিমকে একজন পূণ্যবান নবি হিসাবে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম এবং তারও ইসহাকের ওপর বরকত নাজিল করেছিলাম।"

হজরত জাকারিয়া (আ.) পুত্রের জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তাকে এভাবে সুসংবাদ দান করেন। "আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়া নামক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরমানের সত্যায়নকারী হিসেবে আগমন করবেন। তিনি নেতৃত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী হবেন। তিনি নবি ও পুণ্যবানদের মধ্যে গণ্য হবেন।" (আল ইমরান)

হজরত ঈসা (আ.) যখন মায়ের কোলে তখন তাঁকে দিয়ে ঘোষণা করানো হয়: "তিনি আমাকে বরকতের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন–যেখানেই আমি থাকি না কেন আর আজীবন নামাজ ও জাকাত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাকে তিনি আমার মায়ের হক আদায়কারী করে পয়দা করেছেন। আমাকে বল প্রয়োগকারী ও অসৎ বানাননি।" (মরিয়ম)।

এগুলো হলো নবিদের জন্মগত ও স্বভাবগত গুণ বৈশিষ্ট্য যা নিয়ে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন। তারপর আল্লাহ অবশেষে তাদেরকে সেই মহান বস্তু দান করেন যাকে পবিত্র কোরআনের ভাষায় ইলম, হুকুম, হেদায়েত ও বেলায়েত প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। হজরত নুহ (আ.) তাঁর জাতিকে বলেন: "আমি আল্লাহর কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ করেছি, যা তোমরা লাভ করনি।" -আরাফ।

হজরত ইব্রাহিম (আ.) কে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর ওপর আল্লাহর সুকৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করানো হয় (সুরা আনআম)। সে পর্যবেক্ষণ শেষে তিনি যখন নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে ফিরলেন তখন পিতাকে বললেন : "হে আমার পিতা! আমি এমন জ্ঞান লাভ করেছি যা আপনি লাভ করেননি। সুতরাং আপনি আমাকে অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সোজা পথ দেখাবো। (মরিয়ম-৪৩)।

হজরত ইয়াকুব (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে "নিশ্চিতভাবেই তিনি আমার দেয়া জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তবে অধিকাংশ লোক সে রহস্য জানে না।" (সুরা ইউসুফ-৬৮)

হজরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে : "তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন আমি তাকে জ্ঞান ও বিচার ফয়সালার ক্ষমতা প্রদান করি।" (ইউসুফ-২২)।

সুরা কাসাসের ১৪শ আয়াতে হজরত মুসা (আ.) সম্পর্কেও একথা বলা হয়েছে: হজরত লুত (আ.) কে এই জ্ঞান ও বিচার ফয়সালার ক্ষমতা দেয়া হয়। (আম্বিয়া-৭৪)।

স্বয়ং আমাদের প্রিয় নবি রসুল (দ.) কেও এই অসাধারণ জ্ঞান দান করা হয়। "আল্লাহ তোমার প্রতি নাজিল করেছেন কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান এবং তোমাকে সেই জ্ঞান দান করেছেন যা তুমি আগে জানতে না।" (নিসা-১১৩)।

"তুমি বলে দাও যে আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল পথে আছি।" (আনয়াম-৫৭)।

"বল এই হলো আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে ডাকি। আমি নিজে এবং আমার অনুসারীরা দিব্যজ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন।" (ইউসুফ- ১০৮)।

এই জ্ঞান ও বিচার ফয়সালার ক্ষমতার দরুন নবি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এতখানি পার্থক্য সৃষ্টি হয় যতখানি পার্থক্য থাকে একজন চক্ষুস্মান ও অন্ধের মধ্যে আমার কাছে যে ওহি আসে তার অনুসরণ কর। হে মুহম্মদ! বলুন অন্ধ ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন মানুষ কি সমান হতে পারে? (আনয়াম-৫০)

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে, তা কিতাবী জ্ঞান নয়- বরং তা হচ্ছে নবিদের অন্তরের রূপ এক জ্যোতি (প্রকৃত তথ্য আল্লাহই ভাল জানেন)। এজন্য তা কিতাব থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ জিনিসটিকে নবিদের গুণ বৈশিষ্ট্য রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা এর সাহায্যে তথ্যানুসন্ধান করেন এবং তাঁদের সামনে যে সমস্যা প্রতিনিয়ত হাজির করা হয় তারও সমাধান পান। মনীষীগণ একে গোপন ওহি বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ এটা একটা অন্তর্নিহিত পথ নির্দেশক আত্মোপলব্ধি যা প্রতি মুহূর্তে তাদের কাছে বর্তমান থাকে এবং যে কোন ব্যাপারে তারা তার সাহায্য নিয়ে থাকেন। অন্যান্য লোক দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পরও যেসব বিষয়ে দৃঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না এবং ভুল নির্ভুল নির্ণয় করতে পারেনা, সেসব বিষয়ে নবির দৃষ্টি আল্লাহ প্রদত্ত জ্যোতি ও দিব্য জ্ঞানের দ্বারা মুহূর্তেই নিগূঢ়তম রহস্য উদঘাটনে সক্ষম।

নবি রসুল নিয়োগ :

হজরত রসুলুল্লাহ (দ.) মানুষের নির্বাচিত বা মনোনীত কোন নেতা ছিলেন না। তিনি নিজে নিজেও তা হননি। স্বঘোষিত কোন রকম নেতৃত্বও তিনি দাবি করেননি, তিনি ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক ও নেতা। নেতা হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা ছিল, তা রসুল হিসেবে তাঁর ভূমিকা থেকে ভিন্নতর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহর রসুল হিসেবেই মানুষের পথ প্রদর্শক। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে তিনি নেতা বা আমির ছিলেন না বরং আল্লাহরই আজ্ঞাবহ ছিলেন। অনুসারীদের সাথে আলোচনা করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি বাধ্য ছিলেন না। যদিও নিজের অনুসারীদের সাথে পরামর্শ করার অবকাশ তাঁকে দেয়া হয়েছিল। সর্বোত্তম আলোচনার পদ্ধতি তিনিই বিশ্ববাসীকে শিখিয়েছেন।

আল্লাহতা'লা নিজেই তার রসুলকে (দ.) নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর জীবনকে অনুকরণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, রসুলের আনুগত্য না করলে তার কাছ থেকে কোন কল্যাণ প্রত্যাশা করো না। এ আনুগত্য ব্যতীত আমার ভালোবাসা পেতে পারনা। এ আনুগত্য থেকে বিরত থাকাই কুফরি।

মহান আল্লাহ বলেন : "হে পয়গম্বর তুমি লোকদের নিকট সেই সময়ের কথা বর্ণনা কর, যখন তোমার পরওয়ারদিগার ফেরেস্তাদের বলেন যে, আমি দুনিয়াতে একজন খলিফা করব।" (বাকারা-৩০)।

"ওহে দাউদ আমিই তোমাকে পৃথিবীতে আমার খলিফা নিযুক্ত করেছি যেন তুমি ন্যায়ের সহিত লোকের প্রতি আদেশ কর।" (শায়ারা-২৬)।

সুরা কাসাসের ৬৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে : "ওহে পয়গম্বর, তোমার সৃষ্টিকর্তা যেরূপ ইচ্ছা- সেরূপ লোক সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের মধ্যে হইতে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত বা নির্বাচিত করেন, এ মনোনয়ন বা নির্বাচন মানুষের এখতিয়ারভুক্ত নয়।"

পয়গম্বর বা তার খলিফা নির্বাচন বা মনোনয়ন করার অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নাই স্বয়ং রসুল (দ.) এর বর্ণনায় উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমর বিন তোফায়েল একজন মূর্তিপূজক ও দুর্দান্ত প্রতাপশালী লোক ছিল। সে হজরতের খেদমতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে কি কি বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে সে সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। রসুল (দ.) জানান, সাধারণ মুসলমানদের অধিক কোন সুযোগ তাকে দেওয়া যাবেনা। তখন তোফায়েল প্রস্তাব করে যদি তাকে খলিফা নিযুক্ত করা হয় তাহলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। এ প্রেক্ষিতে রসুল (দ.) বললেন যে, ইহা অসম্ভব কারণ খলিফা নিযুক্তিতে আমার কোন অধিকার নাই, বরং ইহা একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত, তিনি যাহাকে ইচ্ছা খলিফা নিযুক্ত করেন।

নবিদের শপথ :

স্মরণ করো, আল্লাহ্‌ যখন পয়গম্বরদের থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আজ আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি। কাল যদি অন্য কোন রসুল তোমাদের নিকট পূর্ব থেকে রক্ষিত সেই শিক্ষার/কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করে তোমাদের কাছে আসেন তাহলে তার ওপর তোমাদের ঈমান আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে। একথা বলে আল্লাহ্‌ জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কি এর অঙ্গীকার করে এবং এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে অঙ্গীকারের গুরু দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত আছ? তারা জবাবে বললেন হ্যাঁ আমরা অঙ্গীকার করছি। এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক পয়গম্বরকে এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা হয়েছে। আপনাদেরকে যে দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারই প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যখন আল্লাহর তরফ থেকে কোন নবি পাঠানো হয় তার সাথে আপনাদের সহযোগিতা করতে হবে। তার প্রতি কোন প্রকার হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না। নিজেদেরকে দ্বীনের একমাত্র পরিবেশক হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। সত্যের বিরোধিতা করা যাবেনা বরং যেখানে যে ব্যক্তিকে আমার পক্ষ থেকে সত্যের পতাকা উত্তোলন করার জন্য পাঠানো হবে তার পতাকা তলে তাদেরকে সমবেত হতে হবে। উল্লেখ্য যে, মুহম্মদ (দ.) এর পূর্বে প্রত্যেক নবিকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা হয়েছিল। এজন্য প্রত্যেক নবি তার উম্মতকে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবির খবর দেন এবং তার সাথে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়ে যান।

'আর হে নবি, মনে রেখো, সেই অঙ্গীকারের কথা–যা আমি সকল পয়গম্বরের কাছ থেকেই নিয়েছি, তোমার কাছ থেকেও। নুহ, ইব্রাহিম, মুসা ও মরিয়ম পুত্র ঈসার কাছ থেকে, সবার কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছি। (আহজাব-৭)। এই অঙ্গীকারের আওতায় নবি নিজে আল্লাহর প্রত্যেকটি হুকুমের অনুগত হবেন এবং অন্যদেরকেও অনুগত করবেন। আল্লাহর নির্দেশাবলী হুবহু লোকদের কাছে পৌছাবেন এবং সেগুলি প্রবর্তন করার ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটি করবেন না।

"আর স্মরণ করো যখন আল্লাহ্‌ তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যাদের ওপর তাঁর কিতাব নাজিল করা হয়েছিল এই মর্মে যে, তোমরা এর শিক্ষা বর্ণনা করবে এবং একে গোপন করবে না।" (আল ইমরান-১৮৭)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপ্রধান বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী যেমন নিজ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে শপথনামা পাঠ করে থাকেন, যে পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে দায়িত্ব পালনে তিনি কোনরূপ রাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান, বিরাগের ঊর্ধ্বে থেকে ন্যায়-নীতি ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিজ দায়িত্ব পালন করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন সেই রূপ আল্লাহর মহান নবি রসুলগণকে তাদের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে শপথ করতে হয়। এবং এ ব্যাপারে কোন রূপ অবহেলা বিশেষ করে যদি আল্লাহর নামে কোন মনগড়া কথা বলা হয় তাহলে প্রদেয় শাস্তি সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে "আমার নামে যদি কোন মিথ্যা বাক্য রচনা করা হয় তাহলে আমি তার হাত ধরে ফেলতাম এবং তার হৃদয় তন্ত্রী কেটে দিতাম (সুরা-হাককা)।" একারণে নবিদের কার্যকলাপে তাঁরা স্বেচ্ছাচারী বা জবাবদিহি করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত এরকম মনে করার কোন অবকাশ নেই।

রসুলের দায়িত্ব :

পবিত্র কোরআনের চার জায়গায় নবি (আ.) গণের দায়িত্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে–

"এবং স্মরণ কর, যখন ইব্রাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) এ ঘরের (কাবা) ভিত্তি স্থাপন করছিলেন (তখন তাঁরা দোয়া করেন) হে আমাদের রব! এ লোকদের জন্য তাঁদের মধ্য থেকে এমন একজন রসুল পাঠাও, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াত পড়ে শোনাবেন। তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন।" (বাকারা-১২৯)

"যেমন আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ভিতর থেকেই একজন রসুল পাঠিয়েছি যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনান। তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন। তোমাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং আরো অনেক কিছু শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।" (বাকারা-১৫১)

"আল্লাহ মুমেনদের ওপর যথার্থ অনুগ্রহ করেছেন যখন তাদের জন্য তাদের ভেতর থেকেই একজন রসুল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত পড়ে শোনান। তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। (আল ইমরান-১৬৪)

"তিনি সেই আল্লাহ যিনি তাদের ভেতর থেকেই একজন রসুল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।" (জুময়া-২।)

এ আয়াতগুলোতে বারবার যে কথা বলা হয়েছে তা এই যে আল্লাহ তার রসুলকে শুধু কোরআনের আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিবার জন্য পাঠাননি, বরং তাকে পাঠানোর আরও কারণ আছে।

প্রথমত: তিনি মানুষকে কিতাব শিক্ষা দেবেন, দ্বিতীয়ত: উক্ত কিতাব সঠিকভাবে শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তৃতীয়ত: হিকমত বা প্রজ্ঞাজ্ঞান শিক্ষা দেবেন। চতুর্থত: তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে কিতাবের আয়াত তেলাওয়াত করে শোনাবার পর কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয়াও তাঁদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নতুবা তা আলাদাভাবে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন হতো না। অনুরূপভাবে ব্যক্তি ও সমাজের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তিনি যে সব কর্মপন্থা গ্রহণ করতেন তাও কিতাব শোনানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তা না হলে এটা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হতো না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে কিতাব, হিকমত, 'পবিত্রকরণ' শব্দগুলোর প্রদত্ত অর্থ ছাড়াও ব্যাপক ব্যাখ্যা ও অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, যা আল্লাহ বা তার রসুল দয়া করে কাউকে জানালে কিছুতেই জানা সম্ভব নয়।

আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা দানকারী হিসেবে রসুলের ভূমিকা সম্পর্কে সুরা নহলে আল্লাহ বলেন যে : "হে নবি! আমি এ গ্রন্থ তোমার কাছে নাজিল করেছি এ উদ্দেশ্যে যে তুমি মানুষের জন্য নাজিল করা এ কিতাবের এ শিক্ষা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবে" : "সুতরাং যখন আমি পড়ি তখন সে পড়ার অনুসরণ কর, তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।" এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সকল যুগে নিয়ামত লাভের প্রধান দুইটি উৎস আছে। এক আল্লাহর কালাম, দুই নবিগণের মহান ব্যক্তিত্ব। নবিগণকে আল্লাহতা'লা শুধু তার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার এবং তা শিক্ষা ও উপলব্ধি করার মাধ্যম হিসেবেই পাঠাননি। বরং সেই সাথে তাদেরকে বাস্তব নেতৃত্ব দান ও বাস্তব কার্যপদ্ধতি প্রদর্শনের নির্দেশও দিয়েছেন যাতে করে তারা আল্লাহর বাণীর সঠিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষ ও সমাজের সংস্কার ও সংশোধন করতে পারেন এবং বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার সংশোধন করে একটি সৎ ও সুস্থ সমাজ পূর্ণগঠিত করতে পারেন।

ওপরন্তু পবিত্র কোরআনে আল্লাহ যে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন তার সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাও নবির দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকও অন্ততপক্ষে এ কথাটা বুঝতে পারে যে, কোন বই পড়ে শুনিয়ে দেয়াতেই তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়ে যায় না বরং ব্যাখ্যাকারীকে বইয়ে লিখিত কথার চেয়ে বেশি কিছু বলতে হয় যাতে শ্রোত বইয়ের অন্তর্নিহিত বক্তব্য ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। যদি বইয়ের কোন কথা ব্যবহারিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে ব্যাখ্যাকারী বাস্তব কর্ম সম্পাদন বা পদ্ধতি প্রণয়নের (প্রাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন) এর মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণেতা এভাবেই কাজ করা পছন্দ করেন। তা না হলে কেউ যদি কিতাবের বিষয়বস্তুর অর্থ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জিজ্ঞাসা করে এবং তাকে কিতাবেরই শব্দগুলো শুনিয়ে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে কেউ তা ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করবেনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এ কারণেই পৃথিবীর সকল দেশেই আইন প্রণেতার পক্ষ থেকে আইন ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আছে যার ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত ও অবশ্য পালনীয় হিসেবে বিবেচিত।

বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসুল এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করলে মানুষ না দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে আর না পেরেছে সে হেদায়েত লাভ করতে। আল্লাহর কিতাবকে নবি থেকে আলাদা করলে তা কান্ডারী বিহীন তরী হয়ে পড়বে। একজন পথভ্রান্ত পথিক তা নিয়ে জীবন সমুদ্রে যতই ঘুরা ফেরা করুক না কেন কিছুতেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারবে না। আবার নবিকে আল্লাহর কিতাব থেকে আলাদা করলে মানুষ জীবন্ত ধর্মের অনুপস্থিতির কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

রসুলের প্রতি আনুগত্য :

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: "আল্লাহর এ নিয়ম নয় যে, তিনি তোমাদেরকে সরাসরি অদৃশ্য (গায়েব) সংক্রান্ত জ্ঞান দান করবেন বরং এ কাজের জন্য তিনি তার রসুলদের মধ্যে থেকে যাকে খুশি নির্বাচন করেন। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তার রসুলের ওপর ঈমান আন।" - (আল ইমরান-১৭৯)।

"আমি যে রসুলই পাঠিয়েছি তা এজন্য যে আল্লাহর নির্দেশেই তার আনুগত্য করতে হবে। (নেসা-৬৪)।

"(হে নবি), তোমার প্রতিপালকের শপথ। না, তারা কিছুতেই মুমিন নয়– যতক্ষণ তারা তাদের দ্বন্দ্ব কলহে তোমাকে শালিসকারক মেনে নেবে। অতঃপর তোমার বিচার ফয়সালায় কোন রকম সংকোচবোধ না করে নত মস্তকে পুরোপুরি মেনে নেবে।" (সুরা নেসা-৬৫)।

"যে ব্যক্তি রসুলের আনুগত্য করলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।" (সুরা-নেসা)।

"অস্তমিত নক্ষত্রের শপথ। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্তও নন। বিপথগামীও নন। তিনি মনগড়া কিছু বলেন না। তিনি যা বলেন, যা তাঁর উপরে অবতীর্ণ ওহি ছাড়া আর কিছু নয়।"

"আমার কাছে যে ওহি আসে আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।" (আনয়াম-৫০)

"আল্লাহর রসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।" "(হে মুহম্মদ), তুমি বলে দাও তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার কথামত চল। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।" (সুরা-আল ইমরান-৩১)।

ঈমানদানদের কর্তব্য এই যে, তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তার রসুলের দিকে ডাকা হয়, যাতে করে তিনি (রসুল) তাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করতে পারেন। তখন তারা শুধু বলবে, শুনলাম এবং মেনে নিলাম এ রকম লোকেরাই কৃতকার্য এবং তোমরা রসুলের আনুগত্য করলেই সুপথ পাবে। (সুরা–নুর ৫১-৫৪)। আল্লাহ ও তাঁর রসুল কোন একটি বিষয়ে একবার ফয়সালা করে দিলে কোন মুমিন পুরুষ অথবা নারীর এ অধিকার থাকবেনা যে নিজেদের ব্যাপারে স্বয়ং কোন ফয়সালা করার এখতিয়ার তাদের থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসুলের নাফরমানি করলো সে প্রকাশ্য গোমরাহির মধ্যে পতিত হলো। (আহজাব-৩৬)

এ সমস্ত আয়াতে নবি ও সাধারণ মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক বর্ণনা করে কি কারণে নবির ওপর ঈমান আনতে হবে তা বলা হয়েছে। আল্লাহর বিধান হলো, তিনি এই অলৌকিক বা গায়েবের জ্ঞান প্রত্যেক মানুষকে দান করেন না বরং কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দান করেন। এজন্যই সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির ওপর ঈমান আনা সাধারণ মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া নবির ওপর ঈমান আনার অর্থ তাকে শুধু মুখে রসুল বলে স্বীকার করে নেয়া নয় বরং সেই সাথে তার নির্দেশাবলী মেনে চলাও অপরিহার্য। শুধু এ সকল আয়াতে নয় বরং পবিত্র কোরআনের যেখানে রসুলের প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে নির্দেশটি হলো নিঃশর্ত। কোন একটি জায়গায় এমন কথা বলা হয়নি যে রসুলের আনুগত্য অমুক অমুক ক্ষেত্রে করতে হবে এবং ঐ সকল বিষয় ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে আনুগত্যের প্রয়োজন নেই। সুতরাং একথা স্থির নিশ্চিত যে কোরআনের মতে নবি বা রসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত এমন একজন প্রশাসক যাঁর কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ এবং যার নির্দেশ সর্বক্ষেত্রে সকল অবস্থায় পরিপূর্ণভাবে মান্য করা প্রতিটি ব্যক্তির জন্যই অপরিহার্য বা অবশ্য পালনীয়। অবশ্য রসুল নিজে যদি তাঁর শাসন ক্ষমতাকে কোন বিশেষ সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চান বা কোন সুনির্দিষ্ট কাজে অর্পণ করতে চান সেটা তাঁর ইচ্ছাধীন। স্বয়ং মুমিনদেরকেও রসুলের কর্তৃত্বের সীমা নির্ধারণ করার কোন ক্ষমতা বা অধিকার দেয়া হয়নি। তারা চূড়ান্তভাবে ও সর্বোতভাবে নবির কর্তৃত্বাধীন ও তার নির্দেশের অনুগত।

নবুয়াত ও কিতাবের সম্পর্ক

নবুওয়াত বা রিসালাত ও কিতাব উভয়েই এক মহান খোদার পক্ষ থেকে আগত। উভয়ে একই খোদায়ি বিধানের অপরিহার্য অংশ। একই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই মিশনে একে অপরের পরিপূরক। সেই খোদার জ্ঞান এবং তাঁর হিকমত যেমন নবির মধ্যে রয়েছে তেমনি রয়েছে কিতাবের পৃষ্ঠায়। যে শিক্ষার শাব্দিক বর্ণনাকে বলা হয় কিতাব। তার বাস্তব নমুনা বা রূপায়ণ হচ্ছে রসুল (দ.) এর জীবন। একারণে হজরত আয়েশা (রা.) রসুল মকবুল (দ.) কে জীবন্ত কোরআন বলে অভিহিত করেছেন। অনুরূপভাবে হজরত আলী (রা.) নিজেকে জীবন্ত বা বাঙ্গময় কোরআন বলে বর্ণনা করেছেন।

রসুলের প্রতি অলিপিবদ্ধ বা বিশেষ ধরনের ওহি :

পবিত্র কোরআন থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে নবিদের ওপর শুধু কিতাবই নাজেল করা হতো না রং তাদের স্ব স্ব হেদায়াতের জন্য আল্লাহ অহরহ তাদের ওপর ওহি নাজিল করতেন। এই ধরনের ওহির আলোকে তারা নির্ভুল পথে চলতেন, দৈনন্দিন সমস্যাবলীর সঠিক রায় দিতেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হজরত নুহ (আ.) তুফান প্রতিরক্ষার জন্য আল্লাহর তত্ত্বাবধান ও তাঁর ওহি অনুযায়ী নৌকা বানিয়েছিলেন। "(হে নুহ), তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহি মোতাবেক নৌকা বানাও।" হজরত ইব্রাহিম (আ.) কে আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করানো হয় এবং মৃতকে জীবিত করার প্রক্রিয়া দেখানো হয়। হজরত ইউসুফ (আ.) কে স্বপ্নের অর্থ শিক্ষা দেয়া হয়।

হজরত মুসা (আ.) এর সাথে তুর পর্বতে কথা বলা হয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার হাতে ওটা কি ? তিনি বলেন এ আমার লাঠি, এদিয়ে আমি ছাগল চড়াই। নির্দেশ দেয়া হলো লাঠি ফেলে দাও। লাঠি যখন সাপের আকার ধারণ করলো তখন মুসা (আ.) ভয় পেয়ে ছুটে পালাবার উপক্রম করলেন। তখন ওহি এল, "হে মুসা। ভয় করো না, সামনে এগিয়ে যাও, তুমি নিরাপদ। আবার বলা হলো "ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহি হয়েছে। তিনি সাহায্যকারী হিসেবে হজরত হারুন (আ.) কে চাইলেন, তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হলো। দুই ভাই ফেরাউনের কাছে যাবার সময় ভয় পাচ্ছেন। আল্লাহ অভয় দিয়ে বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব কিছু দেখছি ও শুনছি। তারপর যাদুকরদের বানানো সাপ দেখে হজরত মুসা ভয় পেয়ে যান। তখন ওহি আসে ভয় করো না, তুমিই জয়ী হবে।" ফেরাউনকে সুপথগামী করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মুসাকে হুকুম দেয়া হলো "আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়, তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।" নদীর কিনারে পৌঁছুলে নির্দেশ এলো, "নদীর ওপর লাঠি দিয়ে আঘাত করো।"

উল্লেখিত প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নবিদের প্রতি আল্লাহ সব সময় লক্ষ্য রাখেন এবং মানব সুলভ চিন্তা ও মতামতে ভুল করার সম্ভাবনা দেখা দিলেই এই বিশেষ ধরনের ওহির মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা হয়। সাধারণ মানুষের হেদায়াতের জন্য যে ওহি নবিদের মাধ্যমে পাঠানো হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি হেদায়েতনামা ও কার্যোপযোগী হিসেবে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়। এ ওহি তা থেকে ভিন্ন ধরনের।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, হজরত রসুল (দ.) প্রথমে বায়তুল মোকাদ্দেসকে কেবলা নির্বাচন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কোন উল্লেখ বা নির্দেশ নেই। কিন্তু যখন সেই কেবলাকে রহিত করে কাবাকে কেবলা করার নির্দেশ দেয়া হলো তখন বলা হলো: "আগে তোমার যে- কেবলা ছিল তাকে আমি শুধু এজন্য নির্ধারিত করেছিলাম যেন রসুলকে মান্যকারী ও অমান্যকারীর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।" (বাকারা-১৪৩) এই আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, প্রথমে বায়তুল মোকাদ্দেসকে ওহির ভিত্তিতেই কেবলা নির্বাচন করা হয়েছিল। যদিও তা কোরআনে উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে ওহোদের যুদ্ধের সময় হজরত রসুল (দ.) মুসলমানদের বলেছিলেন যে আল্লাহতা'লা তাদের সাহায্যে ফেরেশতা পাঠাবেন। পরে আল্লাহতা'লা হজরতের উক্তিকে এভাবে উল্লেখ করেন, "আল্লাহ ঐ প্রতিশ্রুতিকে তোমাদের জন্য সুসংবাদে পরিণত করেছিলেন। "সুতরাং এ প্রতিশ্রুতি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকেই দেয়া হয়েছিল। ওহোদ যুদ্ধের পর রসুল (দ.) মুসলমানদেরকে দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়তে আদেশ করেন অথচ এ আদেশের উল্লেখ কোরআনের কোথাও নেই। কিন্তু পরে আল্লাহ নবির আদেশ সত্যায়িত করে বলেন যে, এ আদেশ ছিল তাঁর পক্ষ থেকেই। "যুদ্ধে আঘাত পাওয়ার পরও যারা পুনরায় আল্লাহ ও রসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছে।" (আল ইমরান)। বদরের যুদ্ধের জন্য হজরতের (দ.) মদিনা থেকে বের হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে – "যেভাবে আল্লাহ তোমাকে তোমার ঘর থেকে বের করেছেন।" (আনফাল-৫) ঘর থেকে বের হওয়ার কোন নির্দেশ কোরআনে বর্ণিত হয়নি। কিন্তু পরে আল্লাহ এর সত্যতা ঘোষণা করে বললেন যে, নবি তাঁর নির্দেশেই বেরিয়েছিলেন, স্বেচ্ছায় নয়।" আল্লাহ যখন তাদেরকে স্বল্প সংখ্যক করে তোমাকে দেখান।" (আনফল-৪৩)

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করলে মোনাফেকরা তা অপছন্দ করে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ জানিয়ে দেন যে, এ বণ্টন স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে। "আল্লাহ ও তাঁর রসুল তাদেরকে যা দিয়েছিলেন তাতেই যদি তারা রাজি হয়ে যেতো (তাহলে ভাল হতো)" (তওবাহ-৫৯)

হোদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী অনেক সাহাবির কাছে অগ্রহযোগ্য মনে হচ্ছিল। কিন্তু রসুল (দ.) তা মেনে নেন। পরে আল্লাহ তা সত্যায়িত করে বলেন যে, সে সন্ধি আল্লাহর পক্ষ থেকেই ছিল। "আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"(আল ফাতাহ-১)

উপরোক্ত বাণীসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, নবিদের সাথে আল্লাহর কেবল সাময়িক ও স্বল্পকালীন সম্পর্ক নয় যে, যখনই তিনি মানুষের কাছে কোন বাণী পৌঁছাতে চাইবেন শুধু তখনই নবির সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এবং কিছুক্ষণ পরেই তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো তিনি যাকে নবি হিসেবে নির্বাচন বা নিয়োগ করেন তার প্রতি সব সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং সবসময়ই তাকে ওহি দ্বারা পথ প্রদর্শন ও নির্দেশ প্রদান অব্যাহত রাখেন। এভাবে নবিগণ যাতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নির্ভুলভাবে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং তাঁদের দ্বারা আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ করা বা বলা হয় সে বিষয়ে নিভয়তা বিধান করেন।

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি আল্লাহর বর্ণিত সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর অটল থাকেন। তাঁর পূত পবিত্র চরিত্র নৈতিকতা ও পবিত্রতার এমন এক নমুনা যার মধ্যে দোষত্রুটির লেশমাত্র নেই। আল্লাহতা'লা বিশেষ করে এ পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত নমুনা এজন্য বানিয়েছেন যে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেউ তাঁর প্রিয় হতে চাইলে যেন নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারে এবং তাকে অনুসরণ এর মধ্যেই রয়েছে পরম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভ।

নবি জীবন ও ব্যক্তি জীবন পর্যালোচনা :

পবিত্র কোরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে, নবি জীবন সামগ্রিকভাবেই একটি আদর্শ। যার প্রতিটি দিক আমাদের জন্য সত্য ও ন্যায়ের আলোকবর্তিকা, তার কোন কাজ বা কথা প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও সকল প্রকার বিভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলংক। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে: "তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের জীবনে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে।" (আহজাব-১৪) "হে নবি! আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য সাক্ষী, সুসংবাদ দানকারী, সতর্ককারী, আল্লাহর ইচ্ছানুসারে তার দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ করে পাঠিয়েছি। (আহজাব ৪৫.৪৬) "তোমাদের সংঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়নি, বিপথগামীও হয়নি। সে প্রবৃত্তির খেয়াল বশে কিছু বলে না, সে যাই বলে তা তার কাছে পাঠানো ওহি ছাড়া আর কিছু নয়। (নজম-২-৪)
উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে নবির নবি জীবন ও ব্যক্তি জীবনে পার্থক্য করার কোন অধিকার শরিয়ত অনুসারে আমাদের নেই, আর বাস্তবিক পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমরা নবি জীবনের এ দুই ভাগের সীমারেখা নিজেরা নির্ধারণ করতে পারি না। এটাও নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় যে অমুক অমুক বিষয় নবি জীবনের আওতাধীন আর এই বিষয় ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্ভুক্ত এবং একারণে একটিকে মেনে নেয়া জরুরি ও অপরটিকে মেনে নেয়া ঐচ্ছিক হিসেবে বিবেচনা করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বা ক্ষমতা আমাদের নেই।

আইন প্রণেতা হিসেবে রসুল (দ.) :

সুরা আরাফে বলা হয়েছে "তিনি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেন, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন, তাদের জন্য পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করেন, অপবিত্র জিনিসগুলো হারাম করেন এবং তাদের ওপর আগে যেসব বিধি-নিষেধ চাপানো ছিল তা থেকে তাদের মুক্ত করেন।" এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, হজরত রসুলুল্লাহ (দ.) কে আল্লাহতা'লা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। কোরআনে যে সব হালাল হারাম এবং ভালো ও মন্দ কাজের বর্ণনা আছে আল্লাহর বিধি নিষেধের তালিকা তাতেই সমাপ্ত নয়; বরং নবি যা যা করতে বলেছেন বা নিষেধ করেছেন; তাও আল্লাহর আইনের অংশ। কেননা খোদা প্রদত্ত আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগ করেই নবি এসব বিধি নিষেধ প্রণয়ন করেছেন। এ প্রেক্ষিতেই সুরা হাশরে উল্লেখ করা হয়েছে :

"রসুল তোমাদের যা দেন, গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।" (সুরা হাশর-৭)

বিচারক হিসেবে রসুল (দ.) :

সুরা আন নিসায় উল্লেখ করা হয়েছে, "হে নবি আমি সত্য সহকারে কিতাব নাজিল করেছি তোমার কাছে যেন তুমি আল্লাহর দেখানো যুক্তির আলোকে মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করতে পার।" (সুরা-নিসা-১০৫)।

"(হে নবি), বল আমি আল্লাহর নাজিল করা কিতাবের ওপর ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

"মুমেনদেরকে যখন আল্লাহ ও তার রসুলের দিকে ডাকা হয় যাতে করে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন তারা বলে আমরা শুনেছি ও মেনেছি।" (সুরা -আন নুর-৫১)

"যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহর নাজিল করা কিতাব ও রসুলের দিকে এস তখন দেখবে যে মুনাফিকরা তোমার থেকে সরে পড়েছে।" (সুরা-আন-নিসা-৬১)

"অতএব, হে নবি, তোমার রবের কসম, তারা কখনোই মুমেন হতে পারবেনা যতক্ষণ না তারা তাদের ঝগড়া বিবাদে তোমাকে সালিশ মানবে এবং তোমার সিদ্ধান্তের প্রতি মনে কোন প্রকার দ্বিধা সংকোচ না রাখবে বরং সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবে।" (আন নিসা-৬৫)

এই সব আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, রসুল (দ.) ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক এবং বিচারক হিসেবে তাঁর এ দায়িত্ব রিসালতের দায়িত্ব থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনি রসুল হিসেবে বিচারকও ছিলেন। তাই একজন মুমেন যতক্ষণ রসুলকে বিচারক হিসেবেও তার আনুগত্য মেনে না নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত রিসালতের প্রতি তার ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না। কোরআন ও রসুল-এ উভয়কে আলাদাভাবে উল্লেখ করায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দুটি শাশ্বত উৎস রয়েছে, একটি হলো আইনের দিক দিয়ে পবিত্র কোরআন ও অপরটি বিচারক হিসেবে রসুল (দ.)। এ দুইয়ের যে কোন একটিকে অমান্য করা মুনাফিকের কাজ এবং যে ব্যক্তি রসুলকে বিচারক হিসেবে মানে সে মুমেন নয়। এমন কি রসুলের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে ইতস্তত বা সংকোচবোধ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

নবির মাধ্যমে পাপ মোচন :

"যারা আমার নির্দশনে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তাদের তুমি বলো, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হউক, তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশতঃ যদি খারাপ কাজ করে তারপর তওবা করে ও শুধরায় তবে তা আল্লাহ ক্ষমা করেন, দয়া করেন। এইভাবে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা কর যাতে অপরাধীদের পথ দেখান যায়।" (সুরা আনয়াম: ৫৪-৫৫)।

"যারা অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করে তারা পরে তওবা করলে ও নিজেদের সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমশীল, পরম দয়ালু।" (সুরা নাহল : ১১৯)।

"আর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে (নবির কাছে), ওরা এক ভাল কাজের সাথে আর এক খারাপ কাজ মিশিয়ে ফেলে আল্লাহ হয়ত ওদের ক্ষমা করবেন। ওদের সম্পদ থেকে সদকা (দান) গ্রহণ করবে। এ দিয়ে তুমি ওদের পবিত্র ও পরিশোধিত করবে, নিশ্চয় তোমার আর্শীবাদ ওদের মনের জন্য স্বস্তিকর। আল্লাহ তো সব শোনেন সব জানেন।" (সুরা তওবাঃ ১০২-১০৩)।

পবিত্র কোরআন শরিফের এইসব আয়াত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আল্লাহর ক্ষমা রসুলগণের মাধ্যমে কার্যকরী হয়ে থাকে। এবং অনেক ক্ষেত্রে সদকা প্রদান (নবি কর্তৃক নির্দেশিত) বা অন্য কোন পন্থায় এই ক্ষমা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং ক্ষমা পাওয়ার অন্যতম শর্ত হলো আল্লাহ ও তার রসুলের ওপর অগাধ বিশ্বাস ও

অনুশোচনা ও ভাল/সৎ জীবন যাপনের জন্য রসুলের কাছে গমন এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ। এ সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, "আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ ও মানুষের (নবির কাছে) নিকট আত্মসমর্পণ ব্যতীত তারা যেখানেই গিয়েছে আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়েছে এবং দারিদ্রে আক্রান্ত হয়েছে।" (আল ইমরান : ১১২)।

নবিদের মোজেজা :

নবিগণ যখনই নিজেদেরকে মহান বিশ্ব প্রভুর প্রেরিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে পেশ করেছেন তখন লোকেরা তাঁদের কাছে দাবি করেছে, তোমরা যদি সত্যি সত্যিই বিশ্ব প্রভূর প্রতিনিধি হয়ে থাক তাহলে প্রকৃতির নিয়মের প্রচলিত ধারার ঊর্ধ্বে ওঠে এমন কিছু অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনা ঘটান যা দেখে স্পষ্টত প্রতিভাত হবে যে বিশ্ব প্রতিপালক নবিদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ঘটনাটি নিদর্শন হিসেবে সংঘটিত করেছেন। এ দাবির জবাবে নবিগণ কতগুলো নির্দশন দেখিয়েছেন। কোরআনের পরিভাষায় তাকে আয়াত বা নিদর্শন এবং আকীদা বিশারদগণের পরিভাষায় একে মোজেজা বলা হয়।

হজরত আইয়ুব (আ:) এর রোগ নিরাময়ের বর্ণনা :

"আমার বান্দা আইয়ুবের কথা স্মরণ কর। সে তার প্রভুকে সরম্বাধন করে বললো, শয়তান আমাকে যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট ও আযাবে ফেলে দিয়েছে। (আমি তাকে নির্দেশ দিলাম) মাটিতে পা দিয়ে আঘাত করো। এ হচ্ছে ঠান্ডা পানি, গোসল ও পান করার জন্য।"

আল্লাহর হুকুমে মাটিতে পদাঘাত করতেই একটি ঝর্না বেরিয়ে এলো। সেই ঝর্নার পানি পান ও তা দিয়ে গোসল করাই ছিল হজরত আইয়ুব (আ.) এর রোগের চিকিৎসা। তিনি মারাত্মক চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে প্রকাশ। বাইবেলেও বলা হয়েছে যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার শরীর কেঁড়ায় জর্জরিত ছিল।

বার্ধক্যে হজরত ইব্রাহিম (আ:) এর সন্তান লাভ :

"অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। সে বললো হায়! আমার বদ নসিব আমার সন্তান হবে নাকি? আমি তো থুথুরে বুড়ি হয়ে গেছি, আর আমার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছেন। এত বড়ো আজব কথা। ফেরেশতারা বললেন, আল্লাহর সিদ্ধান্তে আপনি অবাক হচ্ছেন! হে ইব্রাহিমের পরিবারবর্গ আপনাদের ওপর আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে।" (হুদ ঃ ৭১-৭৩)

আগুণ থেকে হজরত ইব্রাহিম (আ:) এর নিষ্কৃতি :

"তারা পরস্পর বললো তার জন্য একটি অগ্নিকুন্ড তৈয়ার কর এবং জ্বলন্ত আগুণের কুন্ডলীতে তাকে ফেলে দাও। তারা তাঁর বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত এটেছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে হেয় করে দিয়েছি।"

হজরত সুলায়মান (আ:) এর পাখির ভাষা জ্ঞান :

"এবং তিনি বললেন হে জনগণ আমাকে পাখির ভাষা শিখানো হয়েছে।"

ঈসা (আ:) এর মুজেজা :

"হে মরিয়ম পুত্র ঈসা স্মরণ করুন আপনি ও আপনার জননীর ওপর আমার অনুগ্রহ আমি পবিত্র আত্মা জিব্রাইলকে দিয়ে আপনাকে শক্তিশালী করেছিলাম, আর আপনি দোলনায় থেকে পরিণত বয়সের লোকের সাথে কথা বলতে আপনাকে জ্ঞান হিকমত ও এলম শিক্ষা দিয়েছিলাম। আপনি কাদা দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখির মত আকৃতি গঠন করে তাতে ফুঁ দিতে আর আমার অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে যেতো, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগ গ্রস্তকে আপনি আমার অনুমতিক্রমে ভালো করতেন এবং আমার অনুমতিক্রমে আপনি মৃতকে জীবিত করতেন।" (মায়েদা: ১১০)।

হজরত রসুল (দ.) এর মোজজা :

আমাদের প্রিয়নবি (দ.) এর নবুয়তি জীবনে অন্যান্য সকল নবির চেয়ে বেশি মোজেজার অধিকারী ছিলেন বলে দেখা যায়। তার অগণিত মোজেজার মধ্যে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো। হুজুর (দ.) এরশাদ ফরমান, আমার পৌত্র হাসান (আ.) নেতা হইবে। বোখারি শরিফে উল্লেখিত আছে যে, নবি করিম (দ.) হজরত আমিরুল মোমেনিন হাসান (আ.) দিকে ইশারা করে এরশাদ করলেন, "আমার এই পৌত্র নেতা হবে। আল্লাহ তাঁর দ্বারা মুসলমানদের দু'টি বিবাদমান দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন।" পেয়ারা নবি (দ.) এর ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ হলো। হজরত আলী (আ.) এর ওফাতের পর হজরত ইমাম হাসান (আ.) খলিফা নিযুক্ত হন। ঐ সময় মাবিয়া হাসান (আ.) এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে মুসলমানদের শক্তি পরীক্ষা ও রক্তপাত রোধকল্পে মাবিয়া হাসান (আ.) এর সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল মাবিয়ার মৃত্যুর পর হজরত হুসাইন (রা.) খলিফা হবেন। অথচ সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করা কবিরা গোনাহ জানা সত্ত্বেও মাবিয়া তার ছেলে এজিদকে ঘুষ, বল প্রয়োগ ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে মুসলমানদের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন।

বর্ণিত হাদিসটি পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে হজরত হাসান (আ.) রসুল (দ.) এর উক্তি অনুযায়ীই উক্ত সন্ধি করেছিলেন, কোন দুর্বলতা বা রাজনৈতিক কৌশলজনিত কারণে নয়।

জঙ্গে জামাল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী :

আবু নাইম হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসুল (দ.) তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের মধ্য হতে একজন লাল উটওয়ালি হবেন। হাওব এর কুকুরগুলো তার ওপর চিৎকার করবে। তার চারিপার্শ্বে বহু লোক হতাহত হবে। আর তিনি নিজেও মরতে মরতে বেঁচে যাবেন।

হজরত আয়েশা (রা.) ও হজরত আলী (আ.) মধ্যে জঙ্গে জামাল নামে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এতে উক্ত ভবিষ্যৎ বাণীটি প্রতিফলিত হয়। হজরত আয়েশা (রা.) যে উটের ওপর সওয়ার ছিলেন তার বর্ণ ছিল লাল। যেখানে বস্তির কুকুরগুলো চিৎকার করল এবং হাওবের নিকট দুই দলের সংঘর্ষে ব্যাপক প্রাণহানী ঘটলো। হাওব ইরাকের একটি বিরাট জলাশয়ের নাম। ঘটনাক্রমে হজরত আয়েশা (রা.) এই জলাশয়ের নাম জিজ্ঞাসা করলে লোকেরা জানাল, উহার নাম হাওব। এই নাম শুনা মাত্র রসুল (দ.) এর উক্ত ভবিষ্যৎ বাণীটি হজরত আয়েশা (রা.) স্মরণে আসলে অবিলম্বে উক্ত স্থান ত্যাগ করার জন্য তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন। কিন্তু মিথ্যাচারী মারওয়ান মিথ্যা বিবিধ প্রমাণাদি দ্বারা তাকে বুঝাতে সমর্থ হলো উহা হাওব নয়।

উল্লেখ্য যে, এই মারওয়ানের কুচক্রী ষড়যন্ত্রের কারণেই শেষ পর্যন্ত হজরত ওসমান (রা.) বিদ্রোহিদের হাতে শাহাদত বরণ করেন।

হজরত আম্মারের শাহাদতের ভবিষ্যত বাণী :

হজরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় নবি করিম (দ.) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, হে সামিয়ার পুত্র, বিদ্রোহিদের (ধর্মোদ্রোহী) একটি দল তোমাকে হত্যা করবে। পরবর্তীতে সিফ্ফিনের যুদ্ধের সময় মাবিয়ার সৈন্যদের হাতে হজরত আম্মার (রা.) শাহাদত বরণ করেন। মাবিয়া যে প্রকৃতপক্ষে অন্যায় যুদ্ধে হজরত আলী (আ.)কে বিব্রত করেছিলেন তা হজরত আম্মার (রা.) এর শাহাদতের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত।

রসুলে পাকের (দ.) দোয়ায় হজরত আবু হোরায়রা (রা.) খেজুরের থলিতে বরকত :

ইমাম তিরমিজি, হজরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, "একদা আমি কয়েকটি খেজুর নিয়ে নবি করিম (দ.) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, হুজুর, আমার এই খেজুরগুলোতে বরকতের জন্য দোয়া করুন। তিনি খেজুরগুলোকে একত্রিত করে দোয়া করবার পর বললেন, এইগুলো তোমার থলিতে রেখে দাও। প্রয়োজন মতো বাহির করে আহার করবে। কিন্তু কখনো শূন্য করে খেজুর বাহির করো না। হজরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, ঐ খেজুরের বরকতের কথা কি বলব। কতকাল ধরে অনবরত ঐ থলে হতে

খেজুর বাহির করে আহার করেছি, অপরকে খেতে দিয়েছি, আল্লাহর ওয়াস্তে মণকে মণ খেজুর দান করেছি। রসুল (দ.) এর দোয়ার বরকতে ত্রিশ বছর পর্যন্ত আবু হোরায়রা উক্ত খেজুর হতে খেজুর খেয়েছেন। হজরত ওসমান (রা.) এর শাহাদতের দিন এই থলেটি তার কাছ হতে হাত ছাড়া হয়ে যায়।

প্রিয় নবি (দ.) এর বিরহে একটি শুস্ক খুঁটির ক্রন্দন :

সহিহ বোখারি ও মুসলিম শরিফে হজরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবি করিম (দ.) খেজুর গাছের একটি শুষ্ক খুঁটিতে হেলান দিয়ে জুময়ার খোতবা দিতেন। মিম্বর প্রস্তুত হবার পর তিনি ঐ খুঁটি হতে সরে এসে মিম্বরের ওপর খোতবা দিতে শুরু করলেন। এমন সময় ঐ শুষ্ক খুঁটিটি চিৎকার করে এমনভাবে কান্না করতে লাগল যে উহা ফেটে যাবে।

রসুল (দ.) মিম্বর হতে নেমে এসে উহাকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। তখনো ইহা এমনভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল যেমন কেহ ক্রন্দনরত কোন শিশুকে আদর করে চুপ করাতে চাইলে সে ফুপাতে থাকে। রসুল (দ.) ইহার কান্না থামলে এরশাদ করেন যে, ইহা সর্বদা আমার আওয়াজ শুনত আজ আমার বিরহ বেদনা সহ্য করতে না পেরে কাঁদছিল। এই হাদিসটি বর্ণনা করার সময় হজরত হাসান বসরি (রা.) কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে, হে লোক সকল খেজুর বৃক্ষের একটি শুষ্ক খুঁটি যদি পেয়ারা নবির মোহব্বতে এভাবে কাঁদতে পারে; তবে সেই তুলনায় তাঁর (দ.) মোহব্বতে তোমাদের তো আরও অধিক পাগলপারা হওয়া উচিত।

পঞ্চম অধ্যায়

নবুয়তের উত্তরাধিকার

প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মই শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে না বা নিজের বৈশিষ্ট্য বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না অথবা পরিবর্তনশীল মানব জীবনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধ্যে এমন সব ব্যক্তিরা বর্তমান থাকেন, যারা নিজেদের অসাধারণ বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ এবং উন্নত মানের মেধা ও আত্মিক যোগ্যতা দ্বারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে নবতর জীবনের সৃষ্টি করবেন, তার অনুসারীদের মাঝে নতুন আস্থা ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করবেন। নতুন বস্তুবাদের বৃক্ষ বসন্তের সবুজ সমারোহে পল্লবিত। প্রবৃত্তি পূজার আন্দোলন ও প্রবৃত্তি পূজা ভিত্তিক 'ধর্মের' জন্য বস্তুতপক্ষে রেনেসাঁর প্রয়োজন নেই। কেননা সব সময়ে সকল সামাজিক অবস্থাতেই এর প্রেরণা ও উৎসাহ দাতা বস্তুসমূহে পদে পদে বিদ্যমান। কবির ভাষায়,

'যদিও ঈমানদার বৃদ্ধ, 'লাত' ও 'মানাত' চির নবিন যুবক"। তাই সামাজিক সমস্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মে যদি নতুন প্রাণ সঞ্চার করা হয় অথবা ধর্ম যদি নতুন সামাজিক শক্তির সাথে মোকাবেলা করতে অপারগ হয় তাহলে জীবন্ত বস্তুবাদের মোকাবেলায় সেই ধর্মের মূল শিক্ষা অবিকৃত থাকতে পারে না।

তাছাড়া মানুষের প্রকৃতিই এমন যে নিছক পুথিগত শিক্ষা থেকে সে কোন বিশেষ সুবিধা লাভ করতে পারে না। তার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে একজন মানবিয় শিক্ষক এবং দিশারীরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যিনি নিজস্ব শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানকে লোকদের হৃদয়ে দৃঢ়মূল করে দেবেন এবং প্রতিমূর্তি হয়ে আপন কর্মের দ্বারা লোকদের মধ্যে এ শিক্ষারই অভিপ্রেত প্রাণ চেতনার সঞ্চার করবেন। মানবিয় শিক্ষকের পথ নির্দেশ ও শিক্ষাদীক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র কোন গ্রন্থ সাধারণভাবে দুনিয়ার কোন ব্যক্তি তথা জাতির মানসিকতা, দৃষ্টি ভঙ্গী পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে গোটা মানবেতিহাসে এমন একটি দৃষ্টান্ত ও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। যে সকল দিশারী বিভিন্ন জাতির চিন্তাধারা ও কর্মকান্ডে প্রচন্ড বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন তারা যদি স্বকীয় শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বাস্তব নমুনা হয়ে আত্মপ্রকাশ না করতেন এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শবাদ শুধু গ্রন্থাগারেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে পৃথিবীতে মহান কোন বিপ্লবই সংঘটিত হতো না।

অন্যদিকে মানব প্রকৃতির এও একটি বৈশিষ্ট্য যে, সে মানবিয় দিশারীর সাথে সাথে তার প্রচারিত শিক্ষার একটি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা তা কাগজে লিপিবদ্ধ হোক কি অন্তরে সুরক্ষিত থাকুক–পেতে চায়। যে সকল নীতির ভিত্তিতে কোন দিশারী জাতির চিন্তাধারা, কর্মকান্ড, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেন, তা যদি মূল আকারে সুরক্ষিত না থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে তার শিক্ষার ছাপ নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। তার সে ছাপ মুছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন ধারা এবং সামাজিক ব্যবস্থা ও আইন কানুনের ভিডিও ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে।

এ কারণেই আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রচলন করার লক্ষ্যে আল্লাহতা'লা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর নবি ও রসুলকে প্রেরণ করেছেন যাঁরা সকলেই আল্লাহ কর্তৃক নিয়োগকৃত ও দীক্ষিত। কেহই স্বঘোষিত বা ইজমায় (জনগণের মনোনয়নে), নির্বাচনী কমিটির নির্বাচনে বা অন্য কারো দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়ে পয়গম্বর হিসেবে পদস্থিত হননি।

যেহেতু ইহা আল্লাহর দ্বীন, তিনিই ইহার প্রচারক, তত্ত্বাবধায়ক, তাই তাঁর প্রতিনিধি তিনি নিজেই নিযুক্ত করেন এবং এ ব্যাপারে তিনিই একমাত্র ক্ষমতাবান। এতে অন্যের কোনরূপ হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই কারণ এ ধরনের ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে উলুহিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এ ক্ষমতায় কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা সংখ্যাগরিষ্ঠের বুদ্ধিমত্তা (ইজমা) বা প্রদর্শিত বা উপস্থাপিত যুক্তি অবতারনা করার কোন অবকাশ নেই।

অনুরূপভাবে রসুল বা নবিদের প্রতিনিধি খলিফা তথা জনগণের প্রকৃত ইমাম নিযুক্তিতে আল্লাহর একই নিয়ম প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ তারাও আল্লাহতা'লার দ্বারাই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ইহার প্রমাণ কোরআন থেকেই পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হচ্ছে –

"অর্থাৎ আল্লাহর একই নিয়ম তাহাদের জন্যই ছিল যাহারা তোমাদের পূর্বেও ছিলেন এবং আল্লাহর নিয়মে কোন প্রকার রদবদল বা ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইবে না ।"

"এবং ওহে পয়গম্বর তুমি লোকদের নিকট সেই সময়ের বর্ণনা কর, যখন তোমার পরওয়ারদিগার ফেরেশতাদেরকে বলেন যে আমি দুনিয়াতে একজন খলিফা নিযুক্ত করিব ।" (বাকারা-৩০) ।

উক্ত আয়াত হজরত আদম (আ.) হতে সর্বপ্রথম খলিফা নিযুক্ত করা সম্বন্ধে বর্ণিত এবং ইহাতে লক্ষ্যণীয় যে আল্লাহপাক এতে বলেন নাই যে ওহে ফেরেশতাগণ তোমরা যেহেতু পাপমুক্ত, সর্বদা আমার বন্দেগিতেই মগ্ন থাক, তোমরা নিজেরাই ইজমা বা পঞ্চায়েত করে তোমাদের মনোনয়নে কাউকে খলিফা নির্বাচন করিয়া লও । এও বলেন নাই যে, আমি দুনিয়াবাসীদের মনোনয়নে খলিফা নির্বাচনের অধিকার দিব, আবার এও বলেন নাই যে, লোকে যাকে তাদের খলিফা নির্বাচিত করবে আমি উহাই সমর্থন করিয়া লইব বরঞ্চ আল্লাহতা'লা ঐ পদ্ধতিগুলো ত্যাগ করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, আমি স্বয়ং দুনিয়াতে খলিফা নিযুক্ত করিব এবং ইহা অবিভাজ্য (হস্তান্তর যোগ্য নয় এমন ক্ষমতা) ।

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণ উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়ন না করার জন্য নানা যুক্তি প্রদর্শন করা সত্ত্বেও আল্লাহতা'লা নিজের রবুবিয়াত এর ক্ষমতা বলে আদম (আ.) কে খলিফা নিয়োগ করেন । উহা এমন ধরনের ক্ষমতা যে উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপের কোনই অধিকার নেই ।

এই আয়াতে 'ইন্নি জায়েলুন' শব্দগুলো এর তাৎপর্য হলো আমিই নিযুক্ত করিব । ইন্নি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত নিয়োগ পদ্ধতি কেয়ামত পর্যন্ত সকল যুগে এটা তারই প্রত্যক্ষ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে । সুরা নুরে ৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে–

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়া থাকে । তাহাদের নিকট আল্লাহতা'লা ওয়াদা করিতেছেন যে, তাহাদেরকে তাহার জমিনে প্রতিনিধি বা নায়েব নিযুক্ত করিবেন যেরূপে তাহাদের পূর্ববর্তীদের খলিফা নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং দ্বীনকে তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন এবং উহার ওপর কর্তৃত্ব করার তাহাদের পূর্ণ অধিকার থাকবে যেন তাহারা আমার ইবাদত করে এবং অন্য কাউকে যেন আমার শরিক না করে এবং যাহারা ইহার পরেও কুফর করিবে, তবে তাহারাই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বদকার বটে ।

পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত আয়াতগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

১ । আমাদের রসুল (দ.) এর পূর্বেও ইসলামের খলিফা নিযুক্ত করার বিধান ছিল ।

২ । এই সমস্ত খলিফা/প্রতিনিধিগণ স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত হতেন ।

৩ । তাই আল্লাহ প্রচলিত বিধান অনুযায়ী আমাদের নবি (দ.) এর প্রতিনিধি আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন । অর্থাৎ এ ব্যাপারে কোন ব্যক্তি বা কোন দলের মনোনয়নের কোন অবকাশ নেই ।

৪ । মোমিনদের মধ্যে যাহারা নেক আমল (আমেলুস সালেহাত) করেন কেবল তাদের মধ্যে হতেই খলিফা নিযুক্ত করার ওয়াদা করা হয়েছে । তাই এখানে শুধুমাত্র বিশ্বাসের সঠিকতা নয় বরং সৎকার্যের যথার্থতার কথা উল্লেখ করায় সাধারণ মুসলমান নামে পরিচিত বা মোমিন হওয়াই এর জন্য যথেষ্ট নয় । মনে রাখতে হবে অনেক মোমিন আছেন যাঁরা শুধুমাত্র আল্লাহর রহমতে তাঁদের স্ব স্ব জীবনের কোন বিশেষ কর্মকান্ডের জন্য বেহেশতে যাবেন বা যেতে পারেন যেমন নাকি বোখারি শরিফে উল্লেখ আছে । কোন একজন ভ্রষ্টা মহিলা বিড়ালকে পানি পান করানোর জন্য বেহেশতে যাবেন । "জীবে দয়া করে যেইজন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" তত্ত্বের সঠিকতা এই হাদিসের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত । এই মহিলার নিরীহ প্রাণীর প্রতি দয়া দেখানোর জন্য আল্লাহ দয়া করে তাঁকে বেহেশত দান করেছেন । এর অর্থ এই নয় যে, তার পূর্বের কার্যকলাপ সঠিক ছিল বা তিনি একজন আদর্শ স্থানীয় মহিলা । তাই আলোচ্য হাদিসটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বেহেশতে যাওয়ার নিশ্চয়তাই কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনের সকল কর্মকান্ড সঠিক হওয়ার মাপকাঠি নয় । তাই তার সকল কর্মকান্ড ধর্ম বা ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে গ্রহযোগ্য ও অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় হতে পারেনা । তাই খুবই সঙ্গত কারণে কোন সাধারণ মোমেনকে ইসলামের বা মোমেনদের নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী করা হয় না আর

এ বিষয়টি সাধারণ লোকের বোধগম্য নয় বিধায় রসুলের প্রতিনিধি বা মানুষের নেতা নির্বাচনের ক্ষমতা থেকে মানব জাতিকে এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী করা হয়নি। এবং আল্লাহর অনন্ত জ্ঞানে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হিসেবে বিবেচিত তাদের ক্ষেত্রেই আল্লাহর উক্ত ওয়াদা প্রযোজ্য। তা না হলে সাধারণভাবে বিচার করলে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান নামে পরিচিত লোকেরাই খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। অথচ বাহ্যিক বা আধ্যাত্মিক (আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য অধিকার প্রাপ্ত) কোন অর্থেই হোক না কেন বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়; তা বলাই বাহুল্য।

কোরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করলে প্রকাশ পায় যে, খলিফা নিয়োগ কেবল আল্লাহর দ্বারাই হতে পারে এবং উহা একমাত্র তাঁরই দান বলে প্রমাণিত। ঐ পদে তিনি যাকে নিয়োগ করেন তাকে পূর্ব হতেই সর্বগুণে গুণান্বিত করে উক্ত পদমর্যাদা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আল্লাহর খলিফা পদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আল্লাহতা'লা সর্বগুণ সম্পন্ন, দোষমুক্ত পয়গম্বর ও রসুলদের হস্তেও এই পদের মনোনয়ন বা নিযুক্ত করার দায়িত্ব ন্যস্ত করেননি। যদি অতি পবিত্র সর্বগুণ সম্পন্ন খোদার নিয়োগকৃত পয়গম্বরদের এই খলিফা নিযুক্ত করার অধিকার বা ক্ষমতা না থাকে তবে অল্প জ্ঞান সম্পন্ন, গোনাহগার বান্দাদিগের ইচ্ছায় বা সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন জনসমাজের যারা দোষমুক্ত নন, এমন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে কেমন করে এই অধিকার প্রদান করা সম্ভব হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে পয়গম্বর যেমন আল্লাহতা'লা দ্বারাই নিযুক্ত হন; জনসাধারণের দ্বারা নয় একই খোদায়ি স্থায়ি বিধান অনুযায়ী নবি রসুলদের খলিফা নির্বাচন করাও একমাত্র আল্লাহর সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতার এখতিয়ারভুক্ত।

কোরআন পাকে হজরত দাউদ (আ.) সম্বন্ধে বলা হয় যে, "ওহে দাউদ আমিই তোমাকে পৃথিবীতে আমার খলিফা নিযুক্ত করিয়াছি যেন তুমি ন্যায়ের সহিত লোকের প্রতি আদেশ কর।"

আমরা জানি ন্যায় বিচার করার জন্য 'ফোরকান জ্ঞান' 'হিকমত' ও "ইলমে লাদুন্নির" অধিকারী হওয়া অপরিহার্য। এ সকল জ্ঞান আদৌ চেষ্টার্জিত কোন জ্ঞান নয় বরং তা আল্লাহর বিশেষ দানের অন্তর্ভুক্ত।

হজরত হারুন (আ.) সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং আমিই তাহার ভাই হারুনকে তাহার খলিফা নিযুক্ত করিয়াছি।" (ফোরকান- ৩৫)

সুরা বাকারার ১২৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'অর্থাৎ (ওহে রসুল বনি ইসরাইলদের সেই সময়ের কথা স্মরণ করাও) যখন ইব্রাহিম (আ.) কে তাঁহার পরওয়ারদিগার কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেন এবং উহা পূরণ করা হলে আল্লাহপাক ফরমাইলেন যে, আমি তোমাকে লোকের ইমাম নিয়োগ করিলাম। হজরত ইব্রাহিম (আ.) বলেন আমার সন্তানদিগের জন্য এই সুযোগ বর্তাইবে কিনা উত্তরে বলা হয় (হ্যাঁ কিন্তু) আমার এই পদে কোন জালিম' –কে নিয়োগ করা হবে না।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াত পর্যালোচনা করলে আল্লাহর একটি স্থায়ি বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তাহলো বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে আল্লাহর খলিফাগণ শুধু মাত্র ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সংরক্ষিত এবং এই খেলাফত শুধুমাত্র এই বংশের অতি পবিত্র ও মহান ব্যক্তিবর্গই এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়ার বৈধ অধিকারী। এখানে 'জালিম' 'অত্যাচারী' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ যিনি, খোদার প্রতি, খোদার সৃষ্ট কোন প্রাণী/বস্তু, উদ্ভিদের প্রতি বা নিজের নফসের অপবিত্রতা তথা জুলুম থেকে আল্লাহর নিকট মুক্ত হিসেবে বিবেচিত। তিনিই কেবল এ ধরনের পদে মহান স্রষ্টা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। কোরআনের পবিত্র আয়াত সমূহের মর্মানুযায়ী হজরত মুহম্মদ (দ.) এর আহলে বাইতগণই হজরত ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধর। তাই রসুল (দ.) ওফাতের পর আলে রসুল তথা আলে মুহাম্মদ বা আহলে বাইতগণই নায়েবে রসুল বা রসুলের বৈধ প্রতিনিধি তাই অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের এ ব্যাপারে যোগ্যতার কোন প্রশ্নই আসে না। উল্লেখ্য নামাজের মধ্যে আমরা যে আত্তাহিয়াতুর পর দরুদ শরিফ পাঠ করি তাহলো : হে আল্লাহ, মুহাম্মদ (দ.) এর ওপর ও তাঁহার বংশধরের ওপর দরুদ কবুল করুন। যেরূপ আশীবাদ ইব্রাহিম (আ.) ও তাঁহার বংশধরদের ওপর পাঠিয়ে ছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও জ্ঞানী। হে আল্লাহ, মুহাম্মদ (দ.) ও তাঁহার বংশধরদের ওপর বরকত পাঠান যেরূপ বরকত ইব্রাহিম (আ.) ও তাঁহার বংশধরদের ওপর পাঠায়েছিলেন, নিশ্চয়ই আপনি

প্রশংসনীয় ও অভিজ্ঞ। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ এটাই নির্দেশ করে যে, ইব্রাহিম ও মুহাম্মদ (দ.) এর পরিবারবর্গই জনগণের বৈধ নেতৃত্বের অধিকারী।

সুরা সেজদার ২৪ নং আয়াতে বলা যাচ্ছে যে, "এবং আমি তন্মোধ্যে হতে কতেক লোককে ইমাম নিযুক্ত করিয়াছি যাহারা আমার নির্দেশ মতে লোকদের পরিচালনা করে এবং ইমামতি তাহাদেরকে তখন দেওয়া হয়। যখন তাহারা আল্লাহর শত্রুদের অত্যাচার সহ্য করিতে থাকেন এবং আমার আয়াতগুলোর ওপর অটল বিশ্বাস রাখেন।"

আম্বিয়াদের স্থলাভিষিক্ত খলিফাগণ :

"সালমান (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসুল (দ.) এর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় হাজির হয়ে নিবেদন করলাম। ইয়া রসুলুল্লাহ (দ.) আপনি কি কাউকে আপন ওসি নিয়োগ করিয়াছেন। ফরমাইলেন, ওহে সালমান, তুমি কি ওসিগণ সম্বন্ধে কিছু অবগত আছো? আমি (সালমান) নিবেদন করলাম আল্লাহ ও তার রসুল (দ.) বেশি জানেন। এ প্রেক্ষিতে রসুল (দ.) ফরমাইলেন : আদম (আ.) এর ওসি ছিলেন শীশ (আ.)। যিনি (শীশ) আদম (আ.) এর পর উপস্থিত সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। নুহ (আ.) ওসি শীশ (আ.) যিনি তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ, যাহাকে নুহ (আ.) তাহার পরে রাখিয়া যান। হজরত মুসা (আ.) এর ওসি ইউসা (আ.) যিনি মুসা (আ.) পর তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। হজরত সোলায়মান (আ.) এর ওসি আসিক বিন বরখিয়া যিনি জীবিতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। হজরত ঈসা (আ.) এর ওসি সামাউন বরখিয়া যিনি উপস্থিত সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর আমি (মুহাম্মদ (দ.) আলী বিন আবি তালেবকে স্বীয় ওসি নিযুক্ত করিয়াছি। আমার পর যাহাদের ছেড়ে যাচ্ছি তাদের মধ্যে তিনি (আলীই রা.) সর্বাপেক্ষা উত্তম ও আফজল। –কিতাব আল মোয়াদ্দাত ফিল কোরবা, পরকালের পাথেয়-মূল সৈয়দ আলী বিন সাহাব উদ্দীন উলুবী হামদানী, বাংলা অনুবাদ মঞ্জুর আলম কাদেরি, পৃ-৭১।

উপরোক্ত বর্ণনা হতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বোক্ত আম্বিয়ায়ে কেরামগণ যখন নিজ জীবদ্দশাতেই খোদার নির্দেশে নিজেদের খলিফা নিযুক্তি ঘোষণা করে গেছেন, সেই রূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবি (স.) যিনি খোদার আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করতেন না বা কথাও বলতেন না। তোদর উপরোক্ত বিধানুযায়ী নিজের খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত/নিযুক্ত করতে নিশ্চয়ই কোনও ব্যতিক্রম করেন নাই এবং আল্লাহর আইনে কোন পরিবর্তন নাই।

নবি রসুলগণ যেমন তাঁদের অনুসারীদের দ্বারা নির্বাচিত হন নাই বরঞ্চ লোকের দ্বীন, দুনিয়ার হেদায়েতের জন্য ও স্বয়ং আল্লাহরই দ্বারা নির্বাচিত হয়ে প্রেরিত হন। একই বিধান অনুযায়ী তাদের খলিফা বা নায়েব, ইমামগণ তথা আল্লাহর অলিগণ তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের কার্যাদি পরিচালনা ও লোকদের দ্বীন দুনিয়ার প্রয়োজন মিটাতে, গোমরাহি হতে বাঁচিয়ে যাবতীয় বিপর্যয় ও ভ্রান্তি হতে মুক্ত করে অন্ধকার হতে আলোকের পথে অর্থাৎ খোদার পথে পরিচালিত করতে 'হাদী' রূপে খোদার দ্বারাই নির্বাচিত হন। দুনিয়ার বাদশাহ ও উজির বা জাতীয় নেতা মানবিয় পদ্ধতিতে নিযুক্ত হয়ে জনগণের বস্তুগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন কিন্তু যেহেতু ধর্ম বলতে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতকেই বোঝায় তাই এ ধরনের তথাকথিত ধর্মীয় ও পার্থিব বিভাজন ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এ কারণেই সকল নবিকেই জনগণের পার্থিব সমস্যার ধর্মীয় সমাধান ও পারলৌকিক কল্যাণের পথ নির্দেশ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

"যে ব্যক্তি রসুলের (দ.) আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে; বাস্তবে সে আল্লাহরই আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। কাজেই নবি রসুল বা নায়েবে রসুল বা আল্লাহর প্রকৃত অলিকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করতে হলে জীবনের সকল ধরনের কর্মকান্ডে তারই নির্দেশ অবশ্য পালনীয় হিসেবে বিবেচিত হতে হবে। অন্যথায় রিসালত বা বেলায়তের হক আদায় করা হবে না।

প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কোরআনের বাইয়াত গ্রহণ সম্পর্কে যে সকল আয়াত আছে তা পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

"ওহে মুহম্মদ (দ.) যারা আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছে। তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর হাত তাদের ওপরই রয়েছে। তারপরও যে ব্যক্তি তার বাইয়াত ভঙ্গ করছে। বাস্তবে সে তার নিজেরই ক্ষতি সাধন করছে। অনন্তর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে দেয়া ওয়াদা রক্ষা বা পূর্ণ করে চলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে অতি সত্বর পুরস্কৃত করবেন।"

"হে নবি! ঈমানদার মহিলারা যখন তোমার নিকট এই কথার ওপর বাইয়াত করার জন্য আসে যে তাহারা আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকেই শরিক করিবে না। চুরি করিবে না, জ্বেনা ব্যভিচার করিবেনা, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, নিজেদের সামনে কোন মিথ্যা দোষারূপ রচনা করিয়া আনিবে না এবং স্পষ্ট পরিচিত ব্যাপারে তোমার অবাধ্যতা করিবে না। তবে তুমি তাহাদের বাইয়াত গ্রহণ কর এবং তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত দোয়া কর। নিশ্চয়ই আল্লাহতা'লা অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (- মুমতাহেনা-১২)।

তাই রসুল বা নায়েবে রসুল বা অলিদের বাইয়াতের তাৎপর্য ও পার্থিব নেতৃত্বের আনুগত্যের পার্থক্য বোঝা গেল। নবুয়ত ও বেলায়তের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে :

নবুয়ত ও বেলায়েত :

বেলায়েত আরবি 'অলা' শব্দ হতে উৎপন্ন। 'অলা' অর্থ নৈকট্য লাভ, প্রেম, মুহব্বত, অভিভাবকত্ব। খোদাতালার সাথে প্রেমের সম্পর্ককে বেলায়াত বলে। স্বয়ং আল্লাহপাকের যে সব বাণী সমূহ জিব্রাইল নামক ফেরেশতা মারফত নবিদের নিকট অবতীর্ণ হতো তাই ওহি নামে অভিহিত। ওহি নাজিলের প্রকৃতি অনুযায়ী নবিগণ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন নবিয়ে মুসাল ও নবিয়ে গায়েব মুসাল। নবিয়ে মুসাল হলেন, যাদের ওপর আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। যথা –যাবুর, তাওরাত, ইনজিল ও কোরআন। আর নবিয়ে গায়েব মুসাল হলেন, যাদের ওপর আসমানি কিতাব নাজিল হয়নি বটে কিন্তু তারা পূর্ববর্তী নবিয়ে মুর্সালদের ওপর নাজিলকৃত আসমানি কিতাবের অনুগত ও অনুবর্তী ছিলেন। তাঁরা নবিয়ে মুর্সালদের ওপরই ধর্মের ব্যবহারিক বিধি বিধানের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং এর আলোকেই লোকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সমস্যাদির সমাধান করতেন। তাছাড়াও যুগের বিবর্তন, পরিবর্তন অথবা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক সহিফা বা ঐশিবাণী ও বিজ্ঞপ্তি লাভ করতেন এবং নাজিলকৃত মূল কিতাবের সঠিক ও বৈধ ব্যাখ্যাকারী হিসেবে কাজ করতেন।

অনুরূপভাবে অলিগণ বেলায়েতপ্রাপ্ত এবং নবি রসুলদের উম্মতভূক্ত। অলিগণ নবি রসুলদের প্রত্যাশী, মুখাপেক্ষী এবং তাঁদেরই চরিত্রের পদানুসারী। রসুল (দ.) বলেছেন–

"আলেমগণ নবিদের উত্তরাধিকারী।" পবিত্র কোরআনেও বর্ণনা করা হয়েছে : "ওলা কিন্না রাসেখুনা ফিল ইলমে মিনহুম।" অর্থাৎ বেলায়েত প্রাপ্ত আলেমগণই নবিদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এঁদের সম্পর্কে রসুল (দ.) এরশাদ করেছেন– আল্লাহর এমন বান্দা আছেন যাঁরা এমনভাবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যে হাত দিয়ে কাজ করেন তা আল্লাহর হাত হয়ে যায়, যে চোখ দিয়ে দেখেন তা আল্লাহর চোখ হয়ে যায়। যে পা দিয়ে চলাফেরা করেন, তা আল্লাহর পা হয়ে যায়, যে কান দিয়ে শোনেন তা' আল্লাহর কান হয়ে যায় (বোখারি)। এই ধরনের লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে রসুলের (দ.) পর তাঁর যোগ্য উত্তরসুরী এবং জনগণের অলি বা অভিভাবক বা মুর্শেদ বা পথপ্রদর্শক, মওলা এবং আউলা। এঁদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "লা খাউফুন আলাইহি ওলাহুম ইয়াহ জানুন" অর্থাৎ আল্লাহর অলিদের জন্য কোন ভয় নাই, না ইহকাল না পরকালে। পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে : "আল্লাহু অলিউল্লা আমানু ইউখরেজু হুম মিনাজ জুলমাতে ইলান নুর" অর্থাৎ যারা ঈমানদার আল্লাহ তাদের অলি (অভিভাবক) তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোতে নিয়ে যান।

সুরা কাহাফের ১৭ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে, "জালেকা মিন আয়াতিল্লাহ মাই য়াহদিল্লাহু ফা হুয়াল মুহতাদ, ওমাই ইয়ুজলিল ফালান তাজেদা লাহু অলিয়াম মুরশেদা।" বস্তুতপক্ষে ইহা আল্লাহতা'লার নিদর্শন সমূহের অন্যতম যে আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন সেই হেদায়েত পেতে পারে। আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন সে কোন অলি মুর্শেদ পাইবেনা। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতের চাবিকাঠিই হলো অলি বা

মুরশিদ এবং পথভ্রষ্টরাই অলি বা মুরশিদের ব্যাপারে আস্থাশীল না হয়ে মহান আল্লাহর রহমত স্বরূপ হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়।

সুরা বাকারার ২৮৫ নং আয়াতে এরশাদ হচ্ছে : "আফু আন্না ওয়াগ ফিরলানা, ওয়ারহামনা, আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কওমুল কাফেরিন" অর্থাৎ (হে আল্লাহ) আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর আমাদের প্রতি রহমত নাজিল কর, তুমিই আমাদের মওলা-আশ্রয়দাতা কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদের সাহায্য কর।

আয়াতটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আল্লাহ যার আশ্রয়দাতা তিনিই শুধু (সকল ধরনের কুফরের মধ্যে নফস্ও অন্তর্ভুক্ত) কাফেরদের সাথে সংঘর্ষে বিজয়ী হতে পারেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, রসুল আকরাম (দ.) গাদীরে খুমের দিনে হজরত আলী (আ.) এর দুই হাত উঁচু করে তুলে ধরে বললেন, আমি যার মওলা আলীও তাঁর মওলা, যে আলীর প্রতি মহব্বত করে তুমিও তাকে মহব্বত কর আর যে তার দুশমনি করে তুমিও তার সাথে দুশমনি কর।

এই হাদিসে ইহা সুপ্রমাণিত হয় হজরত রসুল (দ.) আমাদের মওলা। মওলা একটি গূঢ় (একাধিক) অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থ (১) খোদাওন্দ আক্কা (২) মুক্তিদানকারী (৩) সদা সঙ্গী (৪) বন্ধু ও সাহায্যকারী (৫) প্রতিপালক (৬) নেয়ামত দানকারী।

আক্কা শব্দের অর্থ মালিক প্রভু, আর প্রভু কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যথা বিপদে আপদে রক্ষা করা, সমস্ত ধরনের বন্ধন তথা বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেওয়া, নিয়মিত দয়া করা ও প্রতিপালনের যোগ্যতা থাকা। উল্লেখ্য যে, 'মওলা' শব্দের ব্যাপকতা যা বিদায় হজ্বে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে এ সম্পর্কে উমাতদের গবেষণা করার ইংগিত বহন করে।

মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী (রা.) মওলা শব্দের অর্থ আক্কার গুরুত্ব অপওিসিম বর্ণনা করে কাজি হাসান এবং জুন জুহির বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন :

১। তা-না গরদি হাম আজাদ তু
তে সুঙ্গ আয় জান যে গম দিল
২। যে ই সবর পয়গম্বর বা এজতেহাদ
নামে খুদ আপে আলী মওলা নেহাদ।
৩। গুফতে হরকোক বা মুনাম মওলা ও দোস্ত
ইবনে আম মান আলী মওলায়ে উস্ত।
৪। কিস্তে মওলা ? আঁকে আজাদ কুনাদদ
বন্দ রসকায়াত পায়াত বর কুনাদ।

অর্থাৎ (১) যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের কামনা রিপু সৃষ্টির প্রতি অনুরাগ এবং শোক দুঃখ, রাগ ও রোষানল হতে নিজেকে মুক্ত করে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে বিলীন করে দিতে না পার, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরাজিত এবং নিজের নফ্সের দাস হয়ে আছ। এই প্রকার কামনা রিপুর প্রবৃত্তি হতে যিনি মুক্তি দিতে পারেন তিনিই মওলা। একথার অর্থ গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য, মানুষ যখনই মুক্তির স্বাদ পায় তখনই তার অন্তকরণকামনা শূন্য হয়।

পবিত্র কোরআনে ঈমানদারদের সাথে নবির সম্পর্কের কথা সুরা আহজাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

"আন্নাবিয় আওলা বিল মোমিনিনা মিন আন ফুছিহিম ওয়াআজওয়াজুহু উম্মাহাতুদুন" অর্থাৎ প্রিয় নবি (দ.) ঈমানদারের প্রাণ হতে অধিক প্রিয় এবং নবি করিম (দ.) এর বিবিগণ ঈমানদারদের মা।

মেশকাত হাদীস শরিফে গাদিরে খুমের হাদিসটি এইরূপে বর্ণিত আছে। রাবায়া ইবনে আজেব এবং জায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণনা করেন: যখন রসুল (দ.) গাদিরে খুমে আসিয়া অবতরণ করিলেন, আলী (আ.) এর হাত ধরিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি জান না যে আমি মোমেনদিগের নিজ প্রাণ হতে আওলা ? লোকরা বলিল হ্যাঁ, তিনি বলিলেন তোমরা কি জাননা যে আমি প্রত্যেক মোমেনের নিজের প্রাণ হতে অধিক আওলা।

লোকেরা বলিল হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ, আমি যার মওলা আলীও তার মওলা। হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি তাকে বন্ধু বানায়, তুমিও তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর এবং যে তাঁকে শত্রু করে তুমিও তার সঙ্গে শত্রুতা কর। রসুল (দ.) ভাষণ দেবার পর ওমর (রা.) তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন : হে আবু তালেব সন্তান, প্রত্যেক মোমিন নর নারীর মাওলা হিসেবে অভিনন্দিত হয়ে আপনি সকাল ও সন্ধ্যা অতিবাহিত করবেন (আহম্মদ)।

এই কারণেই রসুল (দ.) এর উত্তরাধিকারী ঈমানদারদের জন্য অবশ্যই আওলা হিসেবেই বিবেচিত এবং এ কারণেই কামেল মুর্শেদের পবিত্র স্ত্রীকেও তাঁর অনুসারীরা "মা" হিসেবে অভিহিত করেন, এই প্রথা অদ্যাবধি সমাজে চালু আছে।

উল্লেখিত হাদিস পর্যালোচনা করে বোঝা যায় যে, যেহেতু রসুল উম্মতদের মওলা ছিলেন, তাই রসুল (দ.) এর উত্তরাধিকারী হিসেবে হজরত আলী (আ.) মুসলিম উম্মাহর ওপর একই ধরনের ক্ষমতা/অধিকার প্রয়োগের বৈধ অধিকারী ছিলেন। আলোচ্য ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করলেই 'উলিল আমর' শব্দটি পাওয়া যায় যার সাধারণ অর্থ "তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত।" পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে :

"হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রসুলের এবং তাঁদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাদের আনুগত্য কর।"

আলোচ্য আয়াতে 'উল্লিল আমরের' মর্যাদা নবির পর সমধিক। অর্থাৎ একজন লোক যেভাবে নবিকে মানে বা অনুকরণ অনুসরণ করে একইভাবে তাকে 'উলিল আমরকে' অনুসরণ করতে হয়।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহর বেলায়েত প্রাপ্ত অলিগণ সকল দিক থেকে নবুওয়াতের বৈধ উত্তরাধিকারী এবং তাদের অনুসরণ অনুকরণ ও নির্দেশ প্রতিপালন করা ফরজ তথা অবশ্য পালনীয়।

প্রকাশ থাকে যে, একজন আল্লাহর অলি সমাজের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনায় কর্তৃত্বশীল হিসেবে কাজ করছেন। তিনি আল্লাহ বেলায়েতের বহিঃপ্রকাশ। যেহেতু অলি হচ্ছেন আল্লাহর রসুলের উত্তরাধিকারী এবং ঐশি কর্তৃত্ব ও ইনছাফের বহিঃপ্রকাশ তাই তিনি মানুষের উপকারার্থে মানুষের প্রকৃতিতে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় সম্ভাবনা ক্রমউদ্বোধন তথা ক্রমোউদঘাটন ঘটানোর মাধ্যমে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন করেন। তিনি সমাজে শক্ত হাতে ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন যে কোন রকম অন্যায় অত্যাচারের (শরিয়ত মোতাবেক) তিনি অবসান ঘটাবেন। তিনি সকলকে খোদার বন্দেগির দিকে পরিচালিত করবেন। তিনি মানুষের জ্ঞান ও সঠিক দর্শনের পরিপক্বতা সাধন করে তাকে কর্মতৎপর ও উদ্যোগী হিসেবে গড়ে তুলবেন। এটাই তাঁর দায়িত্ব–

গদীর-এ- ধূম :

(পারা ২ সুরা মায়দা, রুকু- ১০)

"ইয়া রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা আলা আলাইকা ও আলেহি ও সাল্লাম) পৌছাইয়া দিন তাহা যাহা আপনার রবের তরফ হইতে আপনার ওপর নাজিল করা হইয়াছে।"

আরবি ভাষায় ঝরণা, পুস্করনী বা ডোবাকে 'গদীর' বলা হয়। মক্কা মুসাজ্জমা ও মদিনা মুনাওয়ারার রাস্তায় হুযাফা হতে তিন মাইল দূরে গদীর-এ-খুম অবস্থিত। বিদায়ি হজের পর ১৮ জিলহজ ১০ হিজরিতে আঁ হজরত (দ.) এই মনজিলে পৌছিলে সেখানের কাটা বন পরিষ্কার করা হলে, দুটি গাছের মধ্যেখানে জমিন ঝাড় দিয়ে সাফ করার পর আঁ জনাব ওখানে কিছুক্ষণ আরাম ফরমান। যোহরের সময় আগত-- জমাআতের ঘোষণা দেওয়া হলো। এক লক্ষ বিশ হাজার হাজ্বীর কিছু সংখ্যক মদিনার পথে আগুয়ান ছিলেন। কতক পিছনে পড়ে ছিলেন। সকলেই একত্রিত হয়ে জমআতে যোগদান করলেন। নামাজ আদায়ের পর কোরআন এ কারিমের সব শেষের আগের আয়াত পাক এই পবিত্র এলাকায় নাজিল হয়। আকা- এ-নামদার (দ.) এর আদেশে তথায় মিম্বর শরিফের ব্যবস্থা করা হলো। আয়াত পাকে মাবুদ জাল্লাজালালুহু আদেশ করলেন–

আপনার রব হতে যা নাজিল করা হয়েছে পৌঁছিয়ে দিন । আর যদি তা না করেন তবে আল্লাহ পাকের রিসালত পৌঁছানো হলো না । আল্লাহপাক আপনাকে মানবকুল হতে নিয়ে আসছেন । নিশ্চয়ই আল্লাহপাক জাল্লাজালালুহ কাফেরগণকে হেদায়েত করেন না (৫:৭০)

জোহর নামাজ বাদ আঁ জনাব (দ.) ইরশাদ ফরমালেন ও দুনিয়া হতে আমি অতি শীঘ্র বিদায় নিব । তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি যার একটি অন্য হতে ইয্যত ও মরতবায় বড় ।

"একটি কিতাবুল্লাহ - কোরআন শরিফ ও দ্বিতীয়টি আমার আওলাদ আহল-এ বাইত এ-আতহার ।" দেখবো তোমরা আমার পর তাদের সাথে কেমন ব্যবহার কর । এটি কখনো একে অন্য হতে আলাদা হবে না । একত্রে মিলিত থাকবে আর কিয়ামতের দিন হঅজু- এ- কওসরে আমার সাথে মিলিত হবে । যদি তোমরা তাদের– আঁকড়িয়ে ধরে থাক তাহলে আমার পর গুমরাহ হবে না (হাদিসে সাকলাইন) ।

রাবি হজরত জায়দ বিন আরকম রা. আ. সাবলীল ভাষায় হাদিস-এ-কুদসটি বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন আঁ জনাব ফরমাইলেন : "খুদাওন্দ তা'লা আমার মাওলা আর আমি দীনদারের মাওলা ।" এরপর জনাব আলী মুশকিল কুশার দু'হাত ধরে উঁচুতে তুললেন মেষ শাবকের মত । এবং ঘোষণা করলেন তোমরা কি জান না, প্রত্যেক মোমেন আপন আপন জান হতে আমাকে বেশি ভালবাসে ? সকলে সায় দিল জ্বী হ্যাঁ, তাই আঁ জনাব ইরশাদ ফরমালেন –খুদাওন্দ তা'লা আমার মাওলা আর আমি যাদের মাওলা, আলী (আ.) এর হাত ধরে ইরশাদ ফরমালেন –আমি যার মাওলা আলী ও তার মাওলা ।

খুদাওন্দ তালা তুমি ও তার মাওলা হয়ে যাও আলী যার মাওলা । যে তার সাথে দুশমনী করে তুমি ও তার সাথে দুশমন হয়ে যাও । ঘোষণাটি নাতিদীর্ঘ কিন্তু এর ফলাফল আলম-এ-জিনদেগী, আলম-এ-বঅজুখ ও আলম-এ-আরওয়ার এ সুদূর প্রসারী ।

মিশকাত শরিফে বর্ণিত : "বরা ইবনে আযেব ও জায়েদ ইবনে আরকম বর্ণনা করেছেন যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহী ও সাল্লাম গদিরে খুমে আসিয়া অবতরণ করিলেন, আলী (আ.) এর হাত ধরিলেন এবং বলিলেন :

তোমরা কি জান না যে, আমি মুমেনদিগের নিজ দিগ হতে অধিক আওলা (প্রিয়)? লোকেরা বলিল, হ্যাঁ, তিনি বলিলেন তোমরা কি জাননা যে, আমি প্রত্যেক মোমিনের নিজের প্রাণ হইতে অধিক আওলা ? লোকেরা বলিল হা । তখন তিনি বলিলেন হে আল্লাহ, আমি যাহার মাওলা আলীও তাহার মাওলা । হে আল্লাহ যে ব্যক্তি তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তুমিও তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও । এবং যে তাহার সঙ্গে শত্রুতা করে তুমিও তাহার সঙ্গে শত্রুতা কর । অতএব ইহার পর (অর্থাৎ রসুল (দ.) এর ভাষণ শেষ হওয়ার পর) ওমর (রা.) তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহার অভিনন্দন তাহাকে বলিলেন, হে আবু তালেব সন্তান, প্রত্যেক মোমিন নর-নারীর মাওলা হিসেবে অভিনন্দিত হইয়া তুমি সকাল করিবে ও সন্ধ্যা করিবে । (আল হাদিস মিশকাত ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫৪৮ ফজলুল করিম ।) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রা. আ. ঘটনাটি বর্ণনা করছেন ঃ

যখন আঁ (দ.) গদির-এ-খুম পৌঁছুলেন, জনাব আমির আলাইহিস সালাম এর হাত ধরে ফরমালেন : ওহে মানবগন, তোমরা কি জান না, মুসলমানদের নিজ নিজ প্রাণ হতেও আমার সঙ্গে বেশি ভালোবাসা রাখা ফরজ, সকলে নিবেদন করলেন- জী হ্যাঁ । তাই-ই । তখন আঁ জনাব ইরশাদ ফরমালেন ঃ

খুদাওন্দ আমি যে জনের মাওলা আলী ও তারই মাওলা যে আলীর সাথে দুস্তি রাখে তুমিও ও দুস্ত হয়ে যাও । আর যে আলীর সঙ্গে দুশমনি করে তুমি ও তার দুশমন হয়ে যাও ।

হজরত ওমর ফারুক (রা. আ.) জনাব আমির আ. সা. কে মুবারকবাদ জানালেন আর কহিলেন–

আয় আবু তালেবের শাহজাদা আপনাকে মুবারক আপনি তামাম মুসলমানের মাওলা হয়ে গেলেন । –মিশকাত ।

হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর ফারুক রা. আ. কহিতে থাকিলেন –আয় ইবনে আবি তালেব আপনি প্রত্যেক মুমেন পুরুষ ও নারীর মাওলা হয়ে গেলেন । (দার-এ-কুতনি, ইমাম আহমদ- মুনাকেবে, ইবনে মাজা, সুনানে আবু নইম ও বায়হাকি ইহা সমর্থন করিয়াছেন) ।

এই বিষয়টি সমগ্র উম্মতলের জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যার জন্য হজ সমাপনের পরও আক্কা -এ নামদার আঁ জনাব (দ.) এহরাম খুলে ফেলেন নাই। অর্থাৎ বিদায়ি হজের সহিত মিল্লাতের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন আরকান বাকি ছিল। মদিনা মুনাওয়ারা পৌঁছুতে খুব বেশি বাকি ছিল না তবুও চলার পথে যাত্রা স্থগিত করে প্রায় সোয়া লক্ষ হাজিকে এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে পড়া সকলকে একত্রিত করা হোল।

মরুভূমিতে ঝর্না পুস্করনী বা ডোবা হতে পাক পবিত্র পরিচ্ছন্ন হওয়া পিপাসা নিবৃত্তি করা হয়। এমন একটি স্থানকে বেছে নেওয়া হল সেখানের কাঁটাবনকে সাফ করে আব-এ-কওসরের প্রেমের শরাব পান করার জন্য।

ঘোষণাটি পূর্বে শ্রোতৃবৃন্দকে প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া গেল। ফরজ নামাজ সমবেত ভাবে আদায় করার পর আর একটি ফরজের দিকে মনোনিবেশ করলেন। যার কল্যাণে এই আদেশ সেই আসাদুল লাহিল গালেব কে মেষ শাবকের ন্যায় দুই হাত উঁচুতে উর্ধে উত্তোলন করে সকলকে প্রদর্শন করা হলো। উত্তোলনকারী ও উত্তোলিত উভয়ের মরতবা প্রনিধান যোগ্য। ভাষণটি স্বয়ং পরওয়ারদেগার-এ-আলম এতদূর গুরুত্ব দান করেন যে, এইটির মুল্যায়ন এতখানি করা হয় যেন রিসালত হজরত সাল্লাল্লাহু আলা আলাইহি ও সাল্লাম এর সারা জীবনে রিসালতের পূণ্য কর্মগুলি তুলাদন্ডের এক পাল্লা ও বিদায়ি হজের এই ঘোষণাটি যেন অন্য পাল্লায় রাখা হয়েছে এবং কোরআনের ভাষায় এই ঘোষণা না দেওয়া হলে "রিসালতের দায়িত্বই পালন করা হলো না মর্মে বিবেচিত হবে।" (আল এ, রসুল ও মাবিয়া -ফযল এ-মাওলা মঞ্জুর আলম কাদেরি, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৭)

হজরত রসুল (দ.) কর্তৃক আলী (আ.) কে তার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন :

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, রসুল (দ.) কাউকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। কিন্তু ইহা একটি ভ্রমাত্মক ধারণা। প্রকৃতপক্ষে রসুল (দ.) একাধিকবার হজরত আলী (আ.) কে তাঁর রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে গেছেন মর্মে দালিলিক প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হলো :

১। হজরত মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর নির্দেশে যখন তাঁর আত্মীয় স্বজনদের দ্বীনের দাওয়াত দিলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন : আল্লাহ আমাকে তোমাদেরকে ডেকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নির্দেশ করেছেন। এই কর্মকান্ডে কে আমার ভাই (সহযোগী) ও প্রতিনিধি হতে সম্মত আছ ? উপস্থিত সকলের মধ্যে একমাত্র আলী (আ.) ঘোষণা করলেন যে, তিনি হজরত মুহাম্মদ (দ.) এর সাহায্যকারী হবেন এবং যে তার বিরোধিতা করবে তিনি (হজরত আলী আ.) তার বিরোধিতা করবেন। এ প্রেক্ষিতে রসুল (দ.) হজরত আলী (আ.) কে সস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন এবং উপস্থিত সকলকে তাঁর (আলী আ.) কে রসুল (দ.) এর প্রতিনিধি মেনে নেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। এই ঘটনার পর থেকে আবু জেহেল প্রমুখ কোরায়েশ সর্দারগণ হজরত আবু তালেব (রা.) কে তার কিশোর পুত্রের নির্দেশে চলেন বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করতো। অতএব ইসলামের প্রাথমিক যুগেই হজরত আলী (আ.) কে রসুল (দ.) তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছেন। (তফসিরে তাবারি, মসনদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, তাবারবির ইতিহাস, কামিলের ইতিহাস)।

২। খায়বার বিজয়ের পর হজরত মুহাম্মদ (দ.) অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় হজরত আলী (আ.) কে তার উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হজরত মুহাম্মদ (দ.) বললেন : "হে আলী (আ.) তুমি আমা হতে, আর আমি তোমা হতে, তুমি আমার উত্তরাধিকারী হবে যেমন নাকি হজরত হারুন (আ.) হজরত মুসা (আ.) এর উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি ছিলেন। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই হজরত হারুন (আ.) এর দুই পুত্রের নামের অনুরূপ নাম সাব্বার ও সাব্বির রসুল (দ.), হাসান (আ.) ও হোসাইন (আ.) রেখেছিলেন। শেষ বিচারের দিনে হাউজে কাউসারে তুমি আমার সবচেয়ে নিকটতম থাকবে। যে তোমার সাথে শত্রুতা করে সে আমার সাথে শত্রুতা করে, তোমার সাথে যুদ্ধ করার অর্থ আমার সাথে যুদ্ধ করা। আল্লাহর ওপরে তোমার বিশ্বাস, আমার প্রতি আল্লাহর বিশ্বাসের অনুরূপ। তুমিই আমার কাছে পৌঁছানোর দ্বার স্বরূপ।

৩। তাবুক যুদ্ধের কঠিন সময়ে হজরত মুহাম্মদ (দ.) রোমানদের বিরুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে মদিনা ত্যাগ করেন। রসুল (দ.) এর অনুপস্থিতিতে মদিনায় রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য এমন একজন দক্ষ শাসকের

প্রয়োজন ছিল যিনি রসুল (দ.) প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম। এই প্রেক্ষাপটে রসুল (দ.) আলী (আ.) কে ডেকে বলেন, "হে আলী (আ.)। ইসলামি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য আমার পরেই তোমার স্থান।" (ইশতিয়াব-আল্লামা ইবনে আব্দুল বার, ইজালাহুল খিফা-শাহওয়ালি উল্লা) মদিনার মুনাফিকগণ এই বন্দোবস্তে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রচার করতে লাগিল যে রসুল (দ.) আলী (আ.) পিছনে ফেলে রেখে গেছেন। তাই হজরত আলী (আ.) অনতিবিলম্বে রসুল (দ.) কে অনুসরণ করলেন এবং জর্ফি নামক স্থানে রসুল (দ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। রসুল (দ.) বললেন, "আমি তোমাকে আমার খলিফা নিযুক্ত করেছি। তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে আমার কাছে তোমার মর্যাদা এরূপ-যেরূপ মর্যাদা ছিল মুসা (আ.) এর নিকট ছিল হারুন (আ.) এর। (সহিহ বোখারি)। উল্লেখ্য হজরত মুসা (আ.) এর অনুপস্থিতিতে হজরত হারুন, হজরত মুসা (আ.) এর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতেন।

৪। বিদায় হজের পর মদিনায় ফিরে আসার পথে গদিরে খুম নামক স্থানে রসুল (দ.) ঘোষণা করলেন যে এই মাত্র তার কাছে ওহি নাজিল করা হয়েছে যা অবিলম্বে সকলকে শোনানোর জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন। তিনি এরশাদ করেন "হে রসুল (দ.) আপনি যে বিষয়টি ঘোষণা করার জন্য আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে নির্দেশিত হয়েছেন তা-ঘোষণা (বিনা দ্বিধায়) করে দিন। তা না করা হলে আপনি নবুয়তের কোন দায়িত্ব পালন করেন নাই হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহই আপনাকে (আপনার মিশনকে) মন্দ লোক থেকে রক্ষা করবেন । আল্লাহতা'লা অবিশ্বাসীদেরকে হেদায়েত করেন না।" (মায়েদা-৬৭)

কোরআনের উল্লেখিত আয়াত বর্ণনার পর তিনি উপস্থিত সকলের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং ফরমাইলেন, আল্লাহ আমার প্রভু (মওলা) এবং আমি সকল মুসলমানদের প্রভু, (মালিক/প্রশাসক) এবং তাদের জীবনের ওপর তাদের চেয়ে আমার কর্তৃত্ব বেশি।" এই বক্তব্য উপস্থিত সকলে দৃঢ়তার সাথে (৩ বার) গ্রহণ করার পর তিনি ঘোষণা করলেন - "শোন এবং স্মরণ রেখ আমি যার মওলা আলী (আ.) ও তার মওলা/মলিক/প্রভু।" আলী (আ.) এর মর্যাদা আমার নিকট এরূপ যেরূপ মর্যাদা ছিল হজরত মুসা (আ.) এর নিকট হারুন (আ.) এর। আল্লাহ তাঁর (আলী আ.) এর বন্ধুর বন্ধু হবেন এবং তার শত্রুর শত্রু হবেন। তাদের সাহায্যকারী হবে যে তার সাহায্যকারী হবে। তাকে যারা অবজ্ঞা করবে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এ কথা বলার পর হজরত মুহাম্মদ (দ.) উপস্থিত সকলকে হজরত আলী (আ.) কে চিনে নেওয়ার জন্য বললেন এবং তাঁকে উপস্থিত জনতার কাছে রসুল (দ.) এর পর তাদের প্রভু ও মওলাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এই মহান ঘোষণার পর যে আয়াত নাযেল হয় তাহলো : আজ (১৮ জিলহজ ৬৩২ সাল) তোমাদের ধর্মকে পূর্ণতা দান করলাম এবং তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে সকল নিয়ামত দান করলাম, ইসলাম তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম। "হজরত আলী (আ.) এই নিযুক্তিতে সর্বপ্রথম যিনি তাঁকে অভিনন্দন জানান, তিনি হলেন হজরত ওমর (রা.)। তিনি আলী (আ.) কে সম্বোধন করে বললেন– আপনাকে অভিনন্দন, হে আবু তালেবের পুত্র। আজ থেকে আপনি মুসলিম নর-নারীর প্রভু হয়ে গেলেন। মুসনাদ-ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (ভলিউম-৫, পৃ-২৮১, ইমাম গাজ্জালী-সির-উল-আলামিন)। এই ঘটনাটি ইসলামের প্রসিদ্ধ ১৫৩টি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

হিজরি ১০ সালে ইয়েমেনের সকল অভিযান পরিচালনা করায় কিছু সংখ্যক লোক ঈর্ষাবশত রসুল (দ.) এর কাছে হজরত আলী (আ.) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে রসুল (দ.) বলেন, "তোমরা আলী (আ.) এর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করছে। আমি, আলী (আ.) হতে ও আলী (আ.) আমা হতে। সে আমার পরে তোমাদের অলি (প্রশাসক, নিয়ন্ত্রক, নেতা) যে আলীকে বিরক্ত করে প্রকৃত পক্ষে সে আমাকেই বিরক্ত করে।" (ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল, মসনদ ভলিউম-৫, পৃ-৩৫৬, ইমাম নিসাই খাসায়েস, আল্লামা ইবনে হাজর-ই-মক্কী, সাওয়ায়েক-ই-মোহরায়াকা)।

সুরা 'বারাত' (তওবা) নাজিল হলে রসুল (দ.) প্রথমে হজরত আবুবকর (রা.) কে এই সুরা মক্কাবাসীদের নিকট পৌছানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে হজরত আবুবকর (রা.) এর পরিবর্তে হজরত আলী (আ.) কে এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। হজরত রসুল (দ.) কে এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে রসুল (দ.) বলেন-আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশে একাজ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহর

সুনির্দিষ্ট নির্দেশ হচ্ছে যে, আমাকে (রসুল দঃ) অথবা আমার মত কাউকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।" (মুছতাদরিক ইমাম হাকিম-ভলিউম-৩, পৃ-৩২, রিয়াজ-উল-নাজারা, ভলিউম-২, পৃ-২০৩, মসনদ-ই-ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-ভলিউম-১, পৃ-৩৩৯)।

৫। হজরত আনাস (রা.) আনহু হইতে বর্ণিত আছে জনাব রসুল-এ-খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন:

আমার ভাই, আমার উজীর আহল-এ বাইত এর মধ্যে আমার খলিফা, আমার পরে যাহাদের আমি ত্যাগ করিয়া যাইব তাঁহাদের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আমার ঋণ পরিশোধকারী, আমার ওয়াদাগুলিকে কার্যে পরিণতকারী আলী-বিন-আবি তালেব আলাইহিস সালাম।

৬। হজরত আবু হামযা সামালি রা. আ. হইতে বর্ণিত আছে, ইমাম আবু জাফর আ. মুহাম্মদ বাকের আ. তিনি তাহার পিতৃ পুরুষ আলাইহিমাস সালামগণের বাচনিক আমাকে ফরমাইয়াছেন যে, যখন জনাব রসুল-এ-খোদা সা. আ. ওয়া সাল্লাম রেসাল-এ-হকের ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন তখন হজরত সাল্লালাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মহান পবিত্র মস্তক মোবারক আলী আলাইহি সালাম এর ক্রোড়ে ছিল, সমস্ত হুরা শরিফটি মোহাজের এবং আনছারগণের সমাগমে ভরপুর ছিল। তখন আঁ হজরত সা. আ. ওয়া সাল্লাম হজরত আব্বাস রা. আনহুকে ফরমাইলেন : চাচা, আপনি কি আমার অসিয়ত কবুল করিবেন ? আমার ওয়াদাগুলিকে পূরণ করিবেন ? আব্বাস রা. আনহু নিবেদন করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (সা.) আমি তো একজন বুড়ো লোক আর আমার সন্তান-সন্ততিও অনেক। আঁ হজরত সা. আ. ওয়াসাল্লাম তিনবার তাহার পবিত্র কালামে দোহরাইলেন আর হজরত আব্বাস রা. আনহুর প্রতিবার ঐ একই জবাব দিতেছিলেন যে, আমি বুড়ো আর আমার পরিবার-পরিজন অনেক। অতঃপর আঁ হজরত সা. আ. ওয়াসাল্লাম জনাব আলী আ. কে ফরমাইলেন, ওহে আলী তুমি কি আমার অসিয়ত কবুল করিবে আর অঙ্গীকারগুলিকে পালন করিবে ? আঁ হজরত সা. আ. ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র কালাম পাক শুনিয়া জনাব আমির আলাইহিস সালাম এর কণ্ঠ এতদূর রুদ্ধ হইয়া গেল যে কোন জবাব দিতে অক্ষম হইলেন। আঁ হজরত সা. আ. ওয়াসাল্লাম ঐ পবিত্র কালাম আবৃত্তি করিলেন। জনাব আলী আ. সালাম নিবেদন করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (সা.) আমার মা-বাপ আপনার ওপর কুরবান - হ্যাঁ, আমি ইহা কবুল করিলাম। তখন হজরত সা. আ. ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন :

ওহে আলী, তুমি আমার ভাই, আমার অসি, আমার উজির এবং আমারই জাঁনশীন। অতঃপর বেলাল রা. আনহুকে আদেশ করিলেন ওহে বেলাল, আমার তলওয়ার জুলফেকার আনয়ন কর। বেলাল, তলওয়ার আনিয়া হজরত সা. আ. এর সামনে রাখিয়া দিলেন। তখন পুনঃ আঁ হজরত আদেশ করিলেন, আমার মগফর (শিরোস্তান) নাজ দাউন আনয়ন কর। তিনি তাহা আনিয়া সামনে নিবেদন করিলেন। পুনরায় আঁ হজরত সা. আ. ফরমাইলেন, বেলাল আমার (জরাহ বর্ম) জাউল ফবুল লইয়া আইস। তিনি জেরাহ হাজির করিলেন। পুনরায় আঁ হজরত জনাব ফরমাইলেন বেলাল আমার ঘোড়া মুরতাজি লইয়া আইস। তিনি ঘোড়া আনিয়া সেই স্থানে বাঁধিয়া দিলেন। পুনরায় আদেশ করিলেন বেলাল, আমার নাকা (উট) আজবা লইয়া আইস। তিনি উটটিকে আনিয়া তাঁহার হাঁটুদেশ বাঁধিয়া দিলেন। পুনরায় আদেশ করিলেন বেলাল আমার সেহাব নামীয় ইয়েমেনি চাদর লইয়া আইস। তিনি তাহা আনিয়া নিবেদন করিলেন। পুনরায় আদেশ করিলেন বেলাল আমার সমশুক নামীয় তাজিয়ানা চাবুক লইয়া আইস, তিনি তাজিয়ানা লইয়া আসিয়া তথায় নিবেদন করিলেন। এইরূপে হজরত সা. আ. সা. এক এক করিয়া এক একটি জিনিসের নাম লইয়া আদেশ দিতেছিলেন। এমনকি ঐ কোমরবন্ধটিও আনিতে আদেশ করিলেন যাহা আঁ হজরত সা. আ. সা. যুদ্ধের সময় নিজ পবিত্র শিকম (কোমর) মুবারকের ওপর বাঁধিতেন। তৎপর স্বীয় আঙুরী আঙুলী মুবারক হইতে খুলিয়া আলী (আ.) কে দান করিলেন আর এরশাদ ফরমাইলেন, তুমি এই সমস্ত কিছু লইয়া যাও আর মুহাজেরিন এবং আনসারগণের সম্মুখে নিজ গৃহে রাখিয়া আইস। কোন ব্যক্তির এখতেয়ার নাই যে এই সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে আমার পরে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে। অতঃপর আমিরুল মোমেনিন প্রস্থান করিলেন এবং ঐ সমস্ত কিছু নিজ গৃহে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিতাব আল মোয়াদ্দাত ফিল কুরবা, পরকালের পাথেয় –আপনজনের মুহাব্বত-মূল সৈয়দ আলী বিন শাহাব উদ্দিন উলুবী হামদানী, বাংলায় অনুবাদ –মঞ্জুর আলম কাদেরি, পৃ -৭৩-৭৪)।

রসুল (দ.) এর হজরত আলী (আ.) যে রসুল (দ.) কর্তৃক ব্যবহৃত উক্ত দ্রব্য সামগ্রী ও ঘোড়া উট ব্যবহার করতেন এটা সর্বজন বিদিত। বিশেষ করে রসুল (দ.) প্রদত্ত উক্ত তলোয়ারটি 'জুলফিকার' নামে বিশ্ব বিখ্যাত। রসুল (দ.) এর ব্যবহৃত মালামালের উত্তরাধিকারী আলী (আ.) ই ছিলেন বিধায় এটা মনে করার সংগত কারণ আছে যে তিনিই ছিলেন রসুল (দ.) এর প্রকৃত ওসি। খলিফা বা নায়েবে রসুল বা 'উলিল আমর'।

রসুল (দ.) কর্তৃক আলী (আ.) এর পক্ষে বায়াত গ্রহণ :

রসুল (দ.) এর খাদেম হজরত হামরাআ (রা.) বর্ণনা করেন, রসুল (দ.) হজরত আয়েশা (রা.) এর নিকটে আগমন করলেন এবং তাকে আদেশ দিলেন, আরবের সর্দারকে আমার কাছে ডাকিয়া দাও। তিনি লোক পাঠাইয়া আবুবকর (রা.) কে ডাকিয়া পাঠালেন, তাঁকে, দেখে মনে হলো যে রসুল (দ.) অন্য কাউকে খোঁজ করছেন। অতঃপর রসুল (দ.) হজরত হাফসা (রা.) ঘরে উপস্থিত হয়ে আদেশ করলেন আরবের সর্দারকে আমার কাছে ডেকে দাও। হজরত হাফসা (রা.) ওমর (রা.) কে ডাকিয়া পাঠালেন। ওমর (রা.) কে দেখে মনে হলো রসুল (দ.) অন্য কারো সাথে দেখা করার জন্য আগ্রহী। পরে রসুল (দ.) হজরত উম্মে সালমাহ এর ঘরে তশরিফ আনলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন সর্দার এ আরবকে আমার কাছে ডেকে দাও। হজরত উম্মে সালামাহ (রা.) হজরত আলী (আ.) কে ডাকিয়া পাঠালেন। যখন তিনি আসলেন তখন রসুল (দ.) আমাকে (হামরা আ) কে নির্দেশ দিলেন। একশত জন কুরাইশ বংশীয়, আশিজন আরব, ষাট জন গোলাম, আর চল্লিশ জন হাবশীকে ডেকে আন। সকলে উপস্থিত হলে রসুল (দ.) চামড়ার সহিফা আনার জন্য বললেন। তখন হামরা (রা.) সহিফাটি রসুল (দ.) এর খেদমতে নিবেদন করলেন। তখন হজরত রসুল (দ.) উপস্থিত জনতাকে নামাজ এর ন্যায় শ্রেণিবদ্ধ ভাবে দন্ডায়মান করে ফরমাইলেন, হে লোকেরা, আল্লাহতা'লা কি আমার নফসের ওপর বেশি এখতেয়ার রাখেন না ? আর তিনিই আমাকে হা এবং না এর আদেশ দান করেন, আর খোদাতালার আদেশ নির্দেশের ওপর আমার কোন ক্ষমতা নেই। উপস্থিত জনতা এক বাক্যে এই কথার সত্যতা প্রত্যায়ন করিল। অতঃপর রসুল (দ.) ফরমাইলেন, যার মালিক ও মনিব বা মওলা আমি সেই ব্যক্তির মালিক, মনিব বা মওলা। অনুরূপভাবে আলী (আ.) ও তার মালিক, মনিব ও মওলা। ইনি (আলী আ.) তোমাদিগকে আদেশ ও নিষেধ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিন্তু তোমাদের তার ওপর আদেশ ও নিষেধ করার কোন অধিকার নাই। হে খোদা, যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে, তুমিও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখ। আর যে কেহ তার সাথে দুশমনি রাখে, তুমিও তার সঙ্গে দুশমনি রাখ। আর যে কেহ তাকে সাহায্য করে, তুমিও তাকে সাহায্য করো। হে আল্লাহ এই কথার ওপর সাক্ষ্য থাক যে, তোমার আদেশ আমি পৌঁছে দিয়েছি। এবং তাহাদিগকে নসিহতও করেছি (গদিরে খুমের নির্দেশের প্রতি ইংগিত)। অতঃপর রসুল (দ.) এর আদেশে ঐ সহিফাখানি তিনবার পাঠ করে আমাদের সকলকে শোনানো হলো। পুনরায় তিনবার এরশাদ ফরমাইলেন : এই আদেশ কে ভঙ্গ করতে চায় ? আমরা নিবেদন করলাম এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা ইহাকে অস্বীকার বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হতে খোদা ও তার রসুল (দ.) এর আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। আরো তিনবার ইহা দোহরান হইলো। অতঃপর রসুল (দ.) সহিফাখানি গুটাইয়া লইলেন, আর ঐ সমস্ত লোকের দস্তখত তাহাতে লাগান হলো। ইহার পর রসুল (দ.) ফরমাইলেনঃ হে আলী, এই সহিফাখানি নিজের কাছে রেখে দাও। যে কেহ এই বায়াত ভঙ্গ করে, তার সাথে এই সহিফার আদেশ অনুযায়ী যুদ্ধ কর। আমি তার শত্রু হবো, আর তার সঙ্গে ঝগড়া করবো । অতঃপর আয়াত পাক : "ওয়ালাতান কুজুল আই মানা বাদা তৌকিদীহা ওয়াক্কাদ জা-আল-তুমুল্লাহ আলাইকুম কফিলা ফাতাকুনু"। (নাহল : ৯১) অর্থাৎ হে লোক সকল! নিজ কসমগুলিকে পাকাপাকি করার পর ভঙ্গ করিও না। বরং তোমরা আল্লাহতা'লাকে যথেষ্ট জিম্মাদার স্বীকার করিয়াছ। (যদি তোমরা এরূপ কর বনি ইসরাইলগণ যেমন নিজেদের নফ্সের ওপর জুলুম করেছিল, তোমরাও সেরূপ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে) অতঃপর রসুল (দ.) এই আয়াত পাক: "ফামান নাকাছা ফাইন্নামা ইয়ান কুদু আলা নাফছিহিল আইয়াতি" পাঠ করলেন। অর্থাৎ যে কেহ বাইয়াত ভঙ্গ করে, সে নিজ নফ্সের ওপর বিপদ ও বোঝার ভার গ্রহণ করিবে। (কিতাব আল মোয়াদ্দাত ফিল কুরবা, পরকালের পাথেয়, আপনজনের মুহাব্বত-সৈয়দ আলী বিন শাহাবুদ্দিন উলুবী হামদানী শাফেই সুননী আল মাজহাব (রা.) বাংলা রূপদান মঞ্জুর আলম কাদেরি-পৃ- ৫৫)।

হজরত আলী (আ.) এর অতুলনীয় মর্যাদা ও অলৌকিক ক্ষমতা :

হজরত আলী (আ.) বর্ণনা করেন মক্কা বিজয়ের পর রসুল (দ.) আমাকে কাবা ঘরের মূর্তি ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। আমি কাবা শরিফের পাশে বসে পড়লাম। রসুল (দ.) আমার কাঁধের ওপর আরোহন করিলেন-আর বললেন আমাকে মূর্তিগুলোর দিকে উঠাও। অতঃপর আমি রসুল (দ.) কে উত্তোলন করলাম। আলী (আ.) কে রসুল (দ.) তার কাঁধের ওপর উঠিয়ে কাবা শরিফের মূর্তি ভাঙ্গতে নির্দেশ দিলেন। আলী (আ.) নির্দেশ অনুযায়ী মূর্তিগুলি ভাংগতে শুরু করলেন। রসুল (দ.) আলী (আ.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তুমি কিরূপ অনুভব করতেছ ? আলী (আ.) বললেন আমি যেন আল্লাহর আরশে আরোহন করেছি। পৃথিবীর সব রহস্য আমার আয়ত্বে এসে গেছে।" "রসুল (দ.) বলিলেন, হে আলী" তুমি কত ভাগ্যবান যে তুমি আল্লাহর কাজে নিয়োজিত আর আমিও কত ভাগ্যবান যে তোমাকে কাঁধে উঠাইয়াছি। (মুসনাদে-ই-ইমাম বিন হাম্বল-ভলিউম-১ পৃ-১৫)

মনে রাখতে হবে, এ ধরনের সৌভাগ্য ও মর্যাদা অন্য কারো হয়েছে মর্মে ইতিহাসে কোন প্রমাণ নেই। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মক্কা বিজয়ের সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন হজরত আলী (আ.)। এই প্রকাশ্য মর্যাদার আরও একটি রূপক দিক আছে তাহলো-মানুষের দিল রূপ কাবার মধ্যে অগণিত দুনিয়ারূপ মূর্তি নিধন করতে হলে অবশ্যই আলী (আ.) এর বেলায়েতি জ্ঞান ও সাহায্য অপরিহার্য। এই বাস্তবতার নিরিখেই এই ঘটনাটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

রসুল (দ.) অসিয়ত করেছিলেন। তাঁর ওফাতের পর আলী (আ.) ছাড়া অন্য কেহ যেন তার পবিত্র গোসল মোবারক না দেয় বা খোলা চোখে তার পবিত্র দেহ মোবারক দর্শন করে, এই নির্দেশ অমান্য করা হলে সে অন্ধ হয়ে যাবে। এই নির্দেশের আলোকে হজরত আলী (আ.) রসুল (দ.) জানাজার গোসল সম্পন্ন করেন এবং ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) ওসামা (রা.) চোখে কাপড় বেঁধে হজরত আলী (আ.) কে সহায়তা করেন। হজরত আলী (আ.)-ই রসুল (দ.) এর মাজার শরিফে অবতরণ করেন এবং তার পবিত্র দেহ মোবারক কবরে শায়িত করেন।

উসামা বিন জায়েদ (রা.) **এর অভিযান :**

মুসলমান ও রোমানগণ উভয় পক্ষই জানতো দু-দলের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। হজরত মুহাম্মদ (দ.) ওফাতের কয়েকদিন পূর্বে হজরত জায়েদ বিন হারিসের পুত্র উসামা (রা.) এর নেতৃত্বে একদল সেনাকে সিরিয়ার পথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হজরত রসুল (দ.) স্বয়ং আবুবকর (রা.) ও ওমর (রা.) কে উসামা (রা.) এর নেতৃত্বকে মেনে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। (৬ ঃ ওসমান গণির মহানবি (স.) পৃ-৩৬৩)। (অথচ পরবর্তীতে এ কারণে ওসামা বিন জায়েদ (রা.) কে খলিফার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার কোন দাবি উত্থাপিত হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না)।

রসুল (দ.) এর ওফাত :

দার-এ-কুতনি হজরত উম্মুল মুমেনিন আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন: যখন রসুল (দ.) এর ওফাতের সময় উপস্থিত হলো। তিনি ফরমাইলেন - আমার মাহবুবকে আমার কাছে ডেকে দাও। হজরত আয়েশা (রা.) ফরমাইতেছেন– আমি হজরত আবুবকর (রা.) কে হজরত (দ.) এর কাছে ডাকিয়া দিলাম। রসুল (দ.) স্বীয় পবিত্র মাথা মোবারক উঠিয়ে তাঁকে দেখলেন ও পুনঃ বালিশে মাথা মোবারক রাখলেন এবং পুনরায় নির্দেশ দিলেন আমার প্রিয়কে আমার কাছে ডেকে দাও। হজরত ওমর (রা.) কে ডেকে দিলাম। হজরত ওমর (রা.) আসতেই রসুল (দ.) আবার আদেশ করলেন আমার মাহবুবকে আমার কাছে ডেকে দাও। তখন আমি বলিলাম "লোকেরা তোমরা একি করছে, তার কাছে হজরত আলী (আ.) কে ডেকে আন। রসুল (দ.) আলী (আ.) ব্যতীত আর কাউকেও চাচ্ছেন না। যখন আলী (আ.) কে হুযুর (দ.) দর্শন করলেন তিনি স্বীয় বসন মোবারক যা দ্বারা নিজকে আবৃত করে রেখেছিলেন তা উঠিয়ে উহার মধ্যে হজরত আলী (আ.) কে ডাকিয়া লইলেন এবং নিজ পবিত্র বক্ষদেশের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ রাখলেন যতক্ষণ না রুহ মোকাদ্দাস মহাপ্রস্থান করলেন।

হজরত ইমাম নেছাই (রা.) হজরত উম্মুল মুমেনিন সালমা (রা.) হতে বর্ণনা করেন "ঐ পাক জাতের কসম করে সালমা (রা.) বলেন: নিঃসন্দেহে রসুল (দ.) এর বেসাল-হকের সময় সবচেয়ে নিকটে ছিলেন হজরত আলী (আ.)। উম্মুল মুমেনিন ফরমাইতেছেন হুজুর (দ.) এর মহাপ্রস্থানের প্রাতে হুজুর পাক পুন পুন ফরমাইতেছিলেন আলী আসুক" তিনবার ইহা আদেশ ফরমাইলেন। আমার মনে হয় হজরত (দ.) স্বয়ং কোন কাজে তাঁকে (আলী আ.) বাইরে পাঠিয়ে ছিলেন সূর্য উদয়ের পূর্বে হজরত আলী (আ.) উপস্থিত হলেন। আমি বুঝিলাম এই মহাসময়ে রসুল (দ.) ইহার সাথে জরুরি কথা বলবেন। এই জন্য আমি ঘর হতে বের হয়ে গেলাম।

আর সেদিন আমি আয়েশা (রা.) এর ঘরে হুজুর (দ.) এর খিদমতে রত ছিলাম। সবার শেষে আমিই ঘর হতে বের হয়ে দরজার নিকটে বসে রইলাম, দেখলাম, হজরত মুহাম্মদ (দ.), হজরত আলী (আ.) এর মুখে মুখ লাগাইয়া উভয়ে সিনা-সিনা চুপি চুপি কিছু গোপন কথা ফরমাইতেছেন"। (খাসায়েস পৃ.২৮-২৯ মিশরে ছাপা)

এই দুটি মহিমান্বিত হাদিস শরিফ হতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল (দ.) তাঁর ওফাতের পূর্ব মুহূর্তে আসমানি আদেশে 'রুহানী ও বাতেনি' (উত্তরাধিকার) মওলা মুশকিল কুশা-এ-খোদা ফাতেহে বাব এ বেলায়েত হজরত আলী (আ.) এর নিকট গচ্ছিত রেখে যান এবং তারই মাধ্যমে এই মহিমান্বিত মহা রত্ন কিয়ামত পর্যন্ত লোক পরস্পরা এক হতে অন্য দ্বারা জারি থাকবে। মাওলানা জামি (কু. মি.) তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ শওয়াহিদুন নবুওয়াত নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত ঘটনা বিষয়টিকে বোধগম্য করতে সাহায্য করবে।

হজরত ইমাম আলী রেজা (আ.) এর বিশিষ্ট খাদেম ফরমাইতেছেন, "ইমাম রেজা (আ.) আমায় ফরমাইলেন দেখ, মামুনের (খলিফা) কাছে যাইতেছি। যখন তাহার কাছ হইতে বাহির হইয়া আসি আমায় লক্ষ্য করিবে, যদি আমার মাথা আবৃত থাকে, আমার সাথে কোন কথা বলিবে না। তৎপর তিনি মামুনের কাছে তশরিফ লইয়া গেলেন। আর আমি (দরজার কাছে) অপেক্ষমাণ রহিলাম। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি মামুনের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, দেখিলাম তাঁহার পূণ্য মস্তক মোবারক আবৃত রহিয়াছে। আমি তাঁহার সাথে কোন কথা কহিলাম না যতক্ষণ না তিনি নিজ খানকা শরিফে প্রবেশ করিয়া ফরমাইলেন, "দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দাও।" আদেশ পালন করিতেই দেখি এক সুন্দর যুবক বন্ধ ঘরে তাঁহার কাছে যাইতেছেন। আমি তাঁহাকে কহিলাম, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ? আগন্তুক কহিলেন, মদিনা হইতে। আমি বলিলাম– দরজা ভিতর হইতে বন্ধ রাখিয়াছি, কেমন করিয়া প্রবেশ করিলেন ?" তিনি কহিলেন, "যিনি এক মুহূর্তে আমাকে মদিনা হইতে এই স্থানে পৌছাইয়া দিয়াছেন তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। আমি প্রশ্ন করিলাম, আপনি কে ? তিনি উত্তর দিলেন, "হে আবাল সালাত ! আমি মুহাম্মদ বিন আলী রিজা। খোদার তরফ হইতে সৃষ্টির জন্য একটি হুজজত (চ্যালেঞ্জ)। তারপর তিনি তাঁহার মহিমাময় আব্বাজান কেবলা সমীপে হাজির হইলেন ও আমাকে সাথে যাইবার অনুমতি দিলেন।

হজরত ইমাম রেজা (আ.) স্বীয় অভীষ্ঠ শাহজাদাকে দর্শন করিয়া দন্ডায়মান হইলেন। পবিত্র বক্ষদেশে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া গেলেন। আর কিছু গোপন কথা কহিতে থাকিলেন। ইমাম মুহাম্মদ তকি (আ.) আমায় ফরমাইলেন, হে আবাল সালাত, কোন নবি, কোন অলি রেহলত (ওফাত) করেন না। কিন্তু রেহলতের আগে যদিও তিনি পূর্বে থাকেন আর তাঁহার ওসি (উত্তরাধিকারী) পশ্চিমে –যতক্ষণ না আল্লাহতা'লা ঐ দুইজনের দেহ আত্মা একত্রিত করিয়া না দেন।"

৬৩ বছর বয়সে মহানবি আল্লাহ পাকের দিদার লাভের জন্য ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৮ জুন ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার (ইন্তেকাল) পরলোক গমন করলেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন"। "নিশ্চয় সমস্ত কিছুই আল্লাহর জন্য এবং সমস্ত কিছুই তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

খেলাফতে রাশেদা

রসুল (দ.) এর ওফাতের পর খলিফা নির্বাচন :

মসজিদ উন-নবিতে বসে হজরত আবু ওবায়দা ও অন্যান্য সাহাবাগণ রসুল (দ.) এর দাফন কাফনের ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় একজন আনছার ছুঁটে এসে বললেন: সকিফায়ে বনি সায়েদায় আনসারগণ মিলিত হয়ে খলিফা নির্বাচন করছে। তারা সাদ বিন আবু ওবায়দা-কে খলিফা নির্বাচন করছে। তারা সাদ বিন আবু ওবায়দাকে খলিফা করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প। মোহাজেরগণ যদি এতে সম্মত না হয়, তবে তারা নিজেদের আমির নিজেরাই ঠিক করবে।

হজরত আবুবকর (রা.) ও হজরত ওমর (রা.) যখন উক্ত সভায় উপস্থিত হলেন, তখনও আনসারগণ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নাই। তখনও তর্ক-বিতর্ক চলছিল। হজরত ওমর (রা.) দেখলেন, সভার মাঝখানে এক ব্যক্তি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন উনি কে ? জবাব আসল উনি সাদ বিন ওবায়দা। অসুস্থতার জন্য শুয়ে আছেন। তিনিই তাদের উপযুক্ত নেতা। তিনি তাঁর বক্তব্য ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন এবং তাঁর পুত্র সেই কথাগুলো উচ্চকণ্ঠে সকলকে শুনিয়ে দিলেন। তাঁর বক্তৃতার সারমর্ম ছিল এইরূপ :

“প্রিয় আনসারগণ, আল্লাহর রসুলকে সাহায্য করবার জন্য এবং ইসলামকে জয়যুক্ত করবার জন্য তোমরা যে মর্যাদার অধিকারী, আরবের অন্য কোন গোত্রেরই সে মর্যাদা নাই। রসুলুল্লাহ (দ.) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নবুয়ত লাভের পর দীর্ঘ তের বৎসর ধরে পৌত্তলিক কোরেশদিগের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কেহই তার কথায় কর্ণপাত করে নাই। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারাও শক্তিতে ছিল নিতান্ত দুর্বল। আল্লাহর রসুল (দ.)-কে সাহায্য করা তো দূরে থাকুক, আত্মরক্ষার সামর্থও তাদের ছিল না। কোরেশদের অত্যাচারের সম্মুখে রসুলুল্লাহ (দ.) এবং তাঁর ভক্তবৃন্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছিলেন। ঠিক এই সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহপাক তোমাদিগের ওপর তার করুণা বর্ষণ করলেন। তার প্রিয় রসুল (দ.) কে এবং তার সত্য ধর্ম ইসলামকে রক্ষা করবার জন্য অন্য কাউকেও তিনি আহ্বান না করে বললেন তোমাদিগকে। এবং তোমরাই আল্লাহর রসুলকে বাঁচালে, আল্লাহর ধর্মকে বাঁচালে। তোমরাই সেই ব্যক্তি যাদের তরবারি রসুলুল্লাহর (দ.) শত্রুদের প্রতি ছিল নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন ও অপারেজয় । তোমাদের তরবারিই ইসলামের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে, যার ফলে আরবের সমস্ত গোত্রকে ইসলামের পতাকাতলে আজ নতি স্বীকার করতে হয়েছে। রসুল (দ.) এর তোমরাই ছিলে নয়নের মনি। স্বজাতি ও স্বদেশ ছেড়ে তিনি তোমাদের মধ্যে জীবনের অবশিষ্টকাল কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সমাধিও রচিত হবে এই মদিনার বুকে। কাজেই তোমরা তাঁর খলিফা হবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। আজ তিনি ইন্তিকাল করেছেন। সংকটের দিন এসেছে। অতএব কাল বিলম্ব না করে তোমরাই তার খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ কর।”

অতঃপর খাজরাজ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বললেন, আপনি যা বললেন তা সম্পূর্ণ সত্য। আমরা কিছুতেই আপনার উপদেশ লঙ্ঘন করব না। আপনিই আমাদের নেতা। আপনার হাতেই আমরা খেলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত করব।”

সাদ বিন আবু ওবায়দা ছিলেন খাজরাজ গোত্রের নেতা। কাজেই তার যখন খলিফা হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী আউস গোত্রের লোকদের মনে বিদ্বেষ ভাব জেগে উঠল। (গোত্রীয় বিদ্বেষে এই ধরনের ঘটনার সৃষ্টি হয় বলে ধারণা দেওয়া হয় অথচ এ বিদ্বেষ দূর হয়ে যাওয়াই মুসলমানদের সাধারণ বিশ্বাস হওয়া উচিত) একজন আউস প্রধান বললেন, আমরা সাদকে খলিফা নির্বাচন করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে মুহাজিরগণ সা'দকে যদি খলিফা বলে স্বীকার না করেন তাহলে কি হবে? এই প্রেক্ষিতে একজন বললেন, সে ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে দুইজন আমির নির্বাচন করতে হবে– একজন মুহাজিরদের জন্য অপরজন আনসারদের জন্য।

বিষয়টি নিয়ে যখন এ ধরনের তর্ক-বিতর্ক চলছিল, ঠিক সেই সময়ে হজরত আবু বকর (রা.), হজরত ওমর (রা.) ও আবু ওবায়দা (রা.) সভায় উপস্থিত হন। আনসারগণ তাদের দাবির ওপর অবিচল রইলেন। আনসারদের বক্তব্য শেষ হলে হজরত আবুবকর বললেন : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর তিনিই বিশ্ব নিখিলের প্রভু। তিনি এক অদ্বিতীয়, লা শরিক। তিনি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই। হজরত মুহাম্মদ (দ.) তাঁরই প্রেরিত রসুল (দ.)। আমরা সকলেই তাঁরই উম্মত।......... এই সংকটময় মুহূর্তে নেতা নির্বাচন অপরিহার্য, তবে হে প্রিয় আনসার ভাইগণ যে পদ্ধতিতে খলিফা নির্বাচন করতে চাচ্ছেন, তা নির্ভুল নয়।....... আপনাদের চিন্তা ও যুক্তি ন্যায় সংগত নয়, নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে আপনারা অবশ্যই স্বীকার করবে যে, খলিফার পদ লাভে কোরেশদিগের দাবিই অগ্রগণ্য। সমস্ত আরবে প্রাচীনত্বে, বংশ মর্যাদায়, জ্ঞানে-গুণে, শিক্ষা দীক্ষায়, ঐশ্বর্যে ও সামাজিক সম্মানে কোরেশ বংশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশেষ করে কাবা শরিফের রক্ষক হিসেবে তাদের মর্যাদা অনেক উচ্চে। (যদিও এই মহান দায়িত্ব কখনও আবুবকর (রা.) এর গোত্রের ওপর ন্যস্ত ছিলম না)। আরবের সমস্ত গোত্র একমাত্র কোরেশদিগকে শ্রদ্ধা করে। তাছাড়া আর একটি কথা হচ্ছে এই যে, বিশ্ব মানবের কল্যাণ কামনায় আল্লাহ যখন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নবি হজরত মুহাম্মদ (দ.) কে দুনিয়ায় পাঠালেন। তখন অন্য কোন জাতির মধ্যে তাঁকে প্রেরণ করেন নাই। এই গৌরব তিনি কোরেশ জাতিকে দান করেছেন। কোরেশ জাতি ইব্রাহিমের বংশ সম্ভত। জাহেলিয়াতের যুগে কোরেশগণ যখন পৌত্তলিকতার পাপে নিমগ্ন ছিল, নানা কল্পিত দেবদেবীকে তখন তারা আল্লাহ জ্ঞানে পূজা করতো, তখন আল্লাহর । অসীম করুনায় ইহাদের মধ্যেই আবির্ভূত হন হজরত মুহাম্মদ (দ.)। তিনি যখন অন্ধকারের মধ্যে সত্যের আলো জ্বালালেন, তখন আমরা কোরেশগণই সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও সর্বপ্রথম সে সত্যকে স্বীকার করেছিলাম। নিজেদের সংখ্যার সুস্পতা অথবা কাফিরদের পল সংখ্যাধিক্য এবং সেই সঙ্গে তাদের শত প্রকার লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও উৎপীড়ন- কোন কিছুই আমাদের ঈমানকে টলাতে পারেনি । আল্লাহর জন্য, রসুলের জন্য এবং দ্বীন ইসলামের জন্য আমরা স্বদেশ ও স্বজাতিকে বর্জন করেছি; তবু রসুল (দ.) ও ইসলামকে বর্জন করিনি । রসুল (দ.) এর প্রেমেই আমরা মক্কা ছেড়ে মুহাজির বেশে মদিনায় এসে আপনাদের সাথে বাস করছি। বাল্যকাল হতে সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে রসুলুল্লাহর অন্তরঙ্গ সহচর ছিলাম আমরাই। কাজেই রসুল (দ.) এর ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের প্রভাব আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। (হজরত ওমর (রা.) এর ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয় কারণ তিনি জীবনের এক দীর্ঘ সময় ইসলামের বিপক্ষে কাজ করেছেন) রসুল (দ.) এর নিকটাত্মীয় স্বজনও এই কোরেশদের মধ্যেই রয়েছেন। কাজেই খেলাফতের প্রশ্নে মুহাজিরদের দাবিই সর্বাগ্রগণ্য।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে, খেলাফত কোন স্থানীয় রাজনীতি নহে। ইহার সহিত সমগ্র আরব, তথা নবগঠিত সমগ্র ইসলামি রাষ্ট্রের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আনসারদের এমন কোন প্রভাব প্রতিপত্তি নেই যে, সমগ্র আরবের ওপর তারা কর্তৃত্ব করে। আজ যদি এই সভায় জনমতের আধিক্যে কোন আনসারকে খলিফা নির্বাচন করা হয়, তা কোনক্রমেই সর্বজনগ্রাহ্য হবে না। কোরেশগণ তা মানবে না, আরবের অন্যান্য গোত্রও তা মানবে না। ফলে একটি বিকৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিবে এবং তাতেই ইসলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। (অর্থাৎ ইসলামি চিন্তাধারায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতা নির্বাচন কোন সঠিক পদ্ধতি নয়)।

এ পর্যায়ে হাবাব বিন মনজার নামক জনৈক খাজরাজ গোত্রীয় আনসার নেতা বললেন ঃ

হে আনসারগণ, শাসন ক্ষমতা কিছুতেই তোমরা হাত ছাড়া করিও না। মানুষ তোমাদের অনুগত আছে, তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে এমন সাহস কারও নেই। তোমাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার ক্ষমতাও কারো নাই। তোমরা সকলে মর্যাদাবান ও বিত্তশালী, সংখ্যায় তোমরা অধিক। অভিজ্ঞতাও তোমাদের অল্প নয়। তোমরা বীরের সন্তান। মানুষ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এমতাবস্থায় তোমরা একে অপরের বিরোধিতা করে সুযোগ নষ্ট করিওনা। মুহাজিরগণ তোমাদের কথা শুনতে বাধ্য। তাঁদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে বড় জোর আমরা করতে পারি যে, একজন আমির তাদের (মুহাজিরদের) মধ্য হতে গ্রহণ করতে আমরা রাজি আছি।

মানজারের এই বক্তৃতায় হজরত ওমর (রা.) আর স্থির থাকতে পারলেন না। এইবার তিনি উত্তেজিতভাবে ওঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, “এই খাপে দুই তরবারি কখনই থাকতে পারে না আল্লাহর কসম, আরবের অধিবাসীগণ কিছুতেই তোমাদের আমির নির্বাচনের সমর্থন করবে না। কারণ রসুল (দ.) তোমাদের মধ্যে

আবির্ভূত হন নাই। তিনি এসেছিলেন আমাদের মধ্যে। আমরাই তার নিকটতম আত্মীয়। কাজেই আমরাই তার উত্তরাধিকারী হবার যোগ্য পাত্র। আরবের কোন গোত্র এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলে আমরা তার জবাব দিতে সক্ষম। কিন্তু আনসারগণের সে সামর্থ কোথায় ? সুতরাং শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে আমাদের সাথে কে প্রতিযোগিতা করতে পারে ? এ ব্যাপারে কেবলমাত্র তারাই আমাদের সাথে বিরোধিতা করবে, যারা অনাচারী ও ধ্বংসের পথের পথিক।"

হজরত ওমর (রা.) এর কথায় হাবারও উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, হে আনসারগণ, বুকে বল আনো, ওমর (রা.) বা আবুবকরের (রা.) কথায় তোমরা নিরাশ হইওনা। আজ যদি তোমরা দুর্বলতা দেখাও তা হলে সালতানাত তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। মুহাজিরগণ যদি তোমাদের বিরোধিতা করে, তবে তাদেরকে নির্বাসন দাও, তবুও সালতানাত হাতছাড়া করিও না। তোমরাই ইহার উপযুক্ত হকদার। তোমাদের তরবারির জোরেই ইসলাম আজ জয়যুক্ত হয়েছে। ইসলামের এই শান-শওকত তার রচয়িতা তোমরাই। তোমরা যদি ইচ্ছা কর, তবে এখনই এ শান-শওকত নষ্ট করে দিতে পারো।

হজরত ওমর (রা.) অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলেন, তোমরা যদি এধরনের কোন চেষ্টা কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন। হাবাবও বলে উঠলেন, আমাদের নয়, আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করবেন। বলতে বলতে মুহূর্তের মধ্যে তিনি তার খাপ হতে তরবারি তুলে নিলেন। হজরত ওমর (রা.) তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে এসে হাবাবের হাত হতে তরবারিখানি মাটিতে ফেলে দিলেন এবং সেই তরবারি নিয়া আনসারদের প্রস্তাবিত নেতা সাদ বিল ওবায়দার দিকে অগ্রসর হলেন। এক চরম মুহুর্ত ঘনিয়ে এল। ঠিক এই মুহূর্তে হজরত আবু ওবায়দা (রা.) বললেন, হে আনসারগণ, ইসলামের রক্ষার্থে তোমরাই তরবারি নিয়া সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়েছিলে, ইসলামের ধ্বংসেও তোমরাই অগ্রসর হইল। ইহার প্রেক্ষিতে আনসার নেতা বশির বিন সাদ বললেন, "আল্লাহর কসম ! মুশরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ এবং ইসলামের খিদমতে আমাদের মর্যাদা মোহাজিরদের মর্যাদার চাইতে অনেক বেশি ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা তা করেছি নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি, রসুলের মুহব্বত ও নিজেদের চরিত্র শুদ্ধির জন্য। এজন্য আমাদের কোনরূপ গর্ব অহংকার করা, দুনিয়ার সুখ সম্পদ কামনা করা আদৌ সমীচীন নয়। আমাদের সেবা ও ত্যাগের পুরস্কার আল্লাহই আমাদেরকে দান করবেন। সেই পুরস্কারই আমাদের জন্য যথেষ্ট। রসুল (দ.) কোরেশ বংশোদ্ভূত ছিলেন। কাজেই তার উত্তরাধিকারী নিয়ে কোরেশদের সাথে আমরা যেন বিবাদ না করি। হে আনসারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তারই নির্দেশ মেনে চল। মুহাজিরদের সাথে অনর্থক বিবাদ করোনা।" এহেন পরিস্থিতিতে হজরত আবুবকর (রা.), আবু ওবায়দার হস্ত ধারণ পূর্বক বললেন, হে প্রিয় আনসারগণ, আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। আমরা ও তোমরা সকলেই একই নবির উম্মত, সকলেই আমরা ভাই-ভাই। এই ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করো না। ঐক্য ও শক্তি নষ্ট হলে আমরা উভয়েই বরবাদ হয়ে যাব। আমাদের হস্তে তোমরা শাসনভার ন্যস্ত কর। আমরা এই কথা দিচ্ছি যে, তোমাদের পরমার্শ ছাড়া আমরা কিছুই করব না। (কোরায়েশদের এ ওয়াদা পরবর্তীতে প্রতিপালিত হয়নি) আমার এক পার্শ্বে ওমর (রা.) অপর পার্শ্বে আবু ওবায়দা (রা.) রয়েছেন, উভয়েই উপযুক্ত। ইহাদের মধ্যে যাঁকে খুশি তোমরা খলিফা নির্বাচিত কর। এ সময় তুমুল হট্টগোল দেখা দিল। হজরত ওমর (রা.) অতিশয় কঠোর প্রকৃতির ছিলেন বলে জনপ্রিয়ও (কিন্তু তবুও তাকে খলিফা মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল) ছিলেন না। আবু ওবায়দা সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা খুব উন্নত ছিল না। আবুবকর (রা.) এর প্রস্তাবে হজরত ওমর (রা.) প্রতিবাদ করে বললেন, আপনার এ প্রস্তাবে আমি সসম্মানে আমার অসম্মতি জানাচ্ছি।

দীর্ঘ বাক বিতন্ডার পর হজরত ওমর (রা.) বললেন আপনিই (হজরত আবুবকর রা.) খলিফা হইবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। রসুলুল্লাহর জীবিত থাকতে একমাত্র আপনাকে তিনি ইমামতি করবার অধিকার দিয়েছেন। আপনি জ্ঞানে-গুণে, মর্যাদায় আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়। অতএব, আপনিই আমাদের খলিফা হবেন। এই বলে তিনি স্বয়ং আবুবকর (রা.) এর হাতে হাত রেখে বায়াত হলেন। আবু ওবায়দা তৎক্ষণাৎ ওমর (রা.) এর অনুসরণ করলেন এবং বললেন আপনিই রসুলুল্লাহর (দ.) এর 'সওর' গিরিগুহায় কঠিন মুহূর্তে সংঙ্গী ছিলেন। সে কথা আল্লাহতা'লা কোরআন পাকে উল্লেখ করেছেন। কাজেই অন্য কেহ এ পদের যোগ্য নন। অতঃপর আন্যান্যরা আবুবকর (রা.) কে খলিফা হিসেবে অভিষিক্ত করে নিলেন। (আবু বকর রা.-গোলাম মোস্তফা)

হজরত ওমর (রা.) খলিফা হওয়ার বিবরণ :

হজরত আবুবকর (রা.) সর্বমোট সোয়া দুই বৎসর খেলাফতের দায়িত্ব পরিচালনা করেন। ৬৩৪ খৃঃ আগষ্ট মাসে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। ওফাতের পূর্বে হজরত আবুবকর (রা.) হজরত ওসমান (রা.) কে বললেন, খেলাফতের চুক্তিপত্র লিখুন। কয়েক ছত্র লেখার পরই হজরত আবুবকর (রা.) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। উল্লেখ্য অনুরূপ পরিস্থিতিতে হজরত রসুল (দ.) কে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার সুযোগ দেয়া হয়নি। হজরত ওসমান ইহা দেখে নিজেই লিখলেন, "আমি ওমর (রা.) কে খলিফা নিযুক্ত করছি। কিছুক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করে হজরত ওসমান (রা.) কে বললেন, যা লিখেছেন আমাকে পড়ে শুনান। হজরত ওসমান (রা.) পূর্ণ বিবরণ পাঠ করে শুনালেন। হজরত আবুবকর উহা শ্রবণ করত: আল্লাহু আকবর বলে উঠলেন এবং বললেন আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

(ওসিয়তনামা)

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

"ইহা আবু কোহাফার পুত্র আবুবকরের ওসিয়তনামা –যা তিনি পৃথিবী ত্যাগ করে পরজগতে প্রবেশ করবার প্রাক্কালে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। ইহা এমন একটি সময়ের ওসিয়ত যখন কাফের ঈমান এনে থাকে। গুণাহগার তওবা করে এবং সত্যের সম্মুখে মিথ্যা মাথা নত করে দেয়। আমি আমার পরে খাত্তাবের পুত্র ওমর (রা.) কে তোমাদের জন্য আমির নিযুক্ত করেছি। তোমরা তার কথা মান্য করবে এবং তার অনুগত হবে। আমি এই নির্বাচনে আল্লাহর, তদীয় রসুলের ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি আমার নিজের এবং তোমাদের সকলের দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখেছি। এতে আমি বিন্দু মাত্র ত্রুটি করিনি। এখন ওমর (রা.) যদি ন্যায় বিচার করেন, তা আমার ধারণা অনুযায়ীই হবে। আর যদি তাঁর পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। (অর্থাৎ হজরত আবুবকর (রা.) মত জ্ঞানী ব্যক্তিও তাঁর মনোনয়নের ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হতে পারেন নি তাই সাধারণ লোকের সিদ্ধান্ত যে কতটুকু নির্ভুল হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।) আমি যা করেছি সদুদ্দেশ্যেই করেছি। ভবিষ্যতের সংবাদ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেহই জানে না। যে অত্যাচার করবে, সে শীঘ্রই উহার পরিণাম ভোগ করবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।" –মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা-মূল মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, তরজমা নুরুদ্দীন আহমেদ, পৃ-৩৮)

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, হজরত আবুবকর (রা.) এর অসিয়তনামা লিপিবদ্ধ করায় একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে রসুল (দ.) এর অনুকরণেই তিনি একাজ করেছিলেন। অন্যথায় এ ধরনের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের কনসেপ্ট একটি শক্ত বিদআত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

হজরত ওসমান (রা.) এর নির্বাচন :

হজরত ওমর ফারুক (রা.) এর ওছিয়ত অনুযায়ী তাঁর খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব ছয় সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচক কমিটির ওপর অর্পণ করা হয়। এই কমিটির মধ্যে হজরত আলী (আ.), হজরত ওসমান (রা.), হজরত জুবায়ের (রা.), সাআদ বিন আবু ওয়াক্কাস, আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ও হজরত তালহা (রা.) ছিলেন। এঁদের মধ্য হতেই খলিফা হতে হবে। তবে হজরত তালহা (রা.) খলিফা হতে পারবেন না। তার ভূমিকা শুধুমাত্র নির্বাচকের। ছয়জন সর্বসম্মতিক্রমে কাউকে খলিফা নির্বাচন করলে তিনিই খলিফা হবেন।

যদি সবাই কোন একজনকে সমর্থন না করতে চায়, সেক্ষেত্রে হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ও তার গ্রুপ যাকে সমর্থন করবেন তিনি খলিফা হবেন।

যদি ছয় জনের চারজন একমত হয়ে কারও পক্ষে ভোট দেয় আর দুইজন ভিন্নমত পোষণ করে, তাহলে এই ভিন্নমতাবলম্বনকারী দুইজনকে হত্যা করতে হবে।

যদি ছয়জন সমান দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ঐ ছয়জনের বাহির হতে ওমরের (রা.) নিজ পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এর রায়ে খলিফা নির্বাচিত হবে। আবদুল্লাহর ফয়সালা মানতে না চাইলে সকলকে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এর দলের দিকে যেতে হবে। এই ফয়সালা মানতে যারা অস্বীকার করবে তাদের সকলকেই হত্যা করা হবে। বিষয়টি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই নির্বাচকদের কেহ অন্য কারো সাথে

বাক্যলাপ করতে পারবে না। সমগ্র কাজটি অবশ্যই তিন দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে অন্যথায় সকলকে হত্যা করা হবে। (ইতিহাসগত বিভ্রান্তির রহস্য– মুফাখখারুল ইসলাম, পৃ-৭৪, ইমাম জাফর সাদেক-৬, আবু যোহরা পৃ-৮০) এ ধরনের ওছিয়তের কোরআন ও হাদিসের আলোকে বৈধতা বিশ্লেষণ করাও বিবেচনার দাবি রাখে।

হজরত ওমর (রা.) এর ওসিয়ত অনুযায়ী তিন দিনের মধ্যে খলিফা নির্বাচিত করতে হবে। সুতরাং নির্দিষ্ট ছয় ব্যক্তি যথাশীঘ্র পরামর্শ সভায় বসলেন। কিন্তু বৈঠকে বসেই সকলে অনুভব করলেন যে, খলিফা নির্বাচনের কাজটি খুব সহজে সম্পন্ন হবে না। কারণ ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমত করবার সুযোগ হিসেবে খেলাফতের প্রত্যাশী সকলেই। সুতরাং বিরোধমূলক প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিল। দুইদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিতর্ক চলল। কিন্তু কোন সুরাহা হলোনা। খলিফা নির্বাচনের মেয়াদ ছিল আর মাত্র এক দিন। সুতরাং যা করার তাড়াতাড়ি করা দরকার। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) প্রস্তাব করলেন আমাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি একেক জনের পক্ষে দাবি ত্যাগ করলে ছয় জনের বিতর্ক তিনজনের মধ্যে সীমিত হতে পারে। তার এই প্রস্তাব অনুযায়ী হজরত জোবায়ের (রা.) হজরত আলী (আ.) এর পক্ষে হজরত তালহা (রা.) হজরত ওসমানের (রা.) এর পক্ষে এবং হজরত সাদ (রা.) হজরত আবদুর রহমান এর পক্ষে নিজ দাবি প্রত্যাহার করলেন।

অতঃপর হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) আবার প্রস্তাব করলেন, এখন এই তিনজনের মধ্যে যিনি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার দাবি ত্যাগ করবেন খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব তার হাতেই ন্যস্ত হবে। যদিও মূল ওসিয়ত অনুযায়ী ছয়জন যখন সমান দুই দলে বিভক্ত হবে তখন ঐ উভয় গ্রুপের বাইরে হতে ওমর (রা.) এর পুত্র আবদুল্লাহকে এনে তার রায়েই বিষয়টি চূড়ান্ত করার কথা ছিল। যাহোক, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ নিজ দাবি প্রত্যাহার করে নিলেন। এতে তিনি তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ফলে খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি হজরত ওসমান (রা.) এবং হজরত আলী (আ.) এর মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ল।

রসুলুল্লাহ (রা.) কর্তৃক কোন এক সফরে প্রদত্ত পাগড়ী মাথায় বেঁধে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) মসজিদে আগমন করলেন। তিনি মিম্বরে ওঠে রসুল (দ.) যেখানে বসতেন, সেখানে উপবেশন করলেন। অতঃপর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ মোনাজাত করলেন। যদিও তার মোনাজাতের বিষয়বস্তু সকলে শুনতে পাচ্ছিলেন না। তথাপি উৎসুক জনতা নীরবে অপেক্ষা করছিল।

পূর্বাহ্নে হজরত আলী (আ.) কে খলিফা করার পূর্ণ আশ্বাস দেওয়া হলে সকাল বেলায় মসজিদে ধনুকের ওপর ভর দিয়ে তিনি যখন তাঁর প্রথম খেলাফতি ভাষণরূপে খুৎবা দিতে মুখ খুলছেন, তখন আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) সহসা আলী (আ.) সম্মুখে প্রস্তাব করলেন, আপনি কি এরূপ ওয়াদা দিতে পারেন যে, খলিফা হয়ে আল্লাহর কিতাব ও রসুল (দ.) এর নির্দেশ অনুসারে আর তদুপরি আপনার পূর্ববর্তী দুই খলিফার শাসন-নীতি ও বিচার ব্যবস্থা প্রকৃতি মোতাবেক চলবেন।

হজরত আলী (আ.) এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত কথায় বিশেষ আশ্চার্যান্বিত হলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর কিতাব ও রসুল (দ.) এর নির্দেশের কথা বলতে পারি। আমি বিশ্বস্তভাবে মেনে চলবো। তবে পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের শাসনীতি ও বিচার ব্যবস্থা অনুসরণের বিষয়ে বলা যায় যে, যদি তারা আল্লাহর কিতাব ও রসুলের (দ.) নির্দেশানুসারে চলে থাকেন, তাহলে কে তাদের অনুসরণের খেলাপ করতে সাহস করবে। আর যদি তারা আল্লাহর কিতাব ও রসুলের নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করে থাকেন, তবে কে তাদের শাসন নীতি গ্রহণে ও অনুসরণে সাহস করবে। প্রথম শর্তটি থাকলে দ্বিতীয় শর্তটির প্রয়োজন কোথায় ? (প্রাগুক্ত - ৭৮)।

হজরত আলী (আ.) এর উত্তরের ওপর কোন রকম মন্তব্য না করে হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) হজরত ওসমান (রা.) এর নিকট উক্ত শর্তদ্বয় উচ্চারণ করলে হজরত ওসমান (রা.) তৎক্ষণাৎ শর্তদ্বয় অনুসরণের ওয়াদা করায় খলিফা পদে বরিত হয়ে গেলেন (৬৪৪)।

হজরত আলী (আ.) কে খলিফা নির্বাচন :

হজরত ওসমানের (রা.) লোকান্তরের ফলে খলিফা পদ শূন্য হয়ে যাওয়ায় নতুন নির্বাচন প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কিন্তু বিদ্রোহিদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে কেহ তখন গৃহের বাইরেই আসল না। এমন কি খলিফার লাশ

মোবারক তিনদিন পর্যন্ত বিনা দাফনেই পড়ে রইল। অতঃপর হজরত আলী (আ.) হজরত জোবায়ের (রা.) ও হজরত তালহা (রা.) প্রমুখ কতিপয় সাহাবির অসীম সাহসিকতাপূর্ণ চেষ্টার ফলে তার অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাধা হল। অতঃপর খলিফা নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্মুখে এল। এ সময় সকলেরই মনে ধারণা জন্মে ছিল যে, এইবার হজরত আলীর (আ.) খেলাফত পদে বরিত হওয়া একরূপ নিশ্চিত। কিন্তু তিনি বললেন : "বরং তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাদের খলিফা হওয়ার জন্য আমি তেমন একজনকে বেছে দেই, তোমরাই তাঁকে সাহায্য কর। আমি আগের মত তাঁকে সাহায্য করি। কারণ ইতোমধ্যে সত্য ও ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্নমুখী ধারণা পরিবেশিত হয়ে গেছে। আমি প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত ধর্ম কখনো ছাড়তে পারব না। তোমরা তাকে কঠিন মনে করে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে টিকতে পারবে না। সাতটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। খেলাফতের ব্যাপারে কোন মীমাংসাই হলো না। মিশরিয় লোকেরা হজরত আলী (আ.) কে খেলাফত গ্রহণের জন্য অতিশয় পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু হজরত আলী (আ.) বললেন, দেখ মুসলিম জাহানে এখন ভীষণ অনৈক্য বর্তমান কুফাবাসীরা জোবায়ের (রা.) কে খলিফা করতে চায়, পক্ষান্তরে বসরার লোকেরা তালহা (রা.) এর পক্ষপাতি। অন্যান্য এলাকায়ও মত বিরোধ চলছে। এমতাবস্থায় হঠাৎ কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না। বরং সকলে মিলে যা হয় করা দরকার।

মদিনায় হজরত আলী (আ.) এর ভক্ত/অনুরক্তের সংখ্যাই ছিল অধিক। তারাও হজরত আলী (আ.) কে খেলাফত গ্রহণের জন্য ধরে বসলেন। কিন্তু হজরত আলী (আ.) তাদেরকে সেই একই কথা বললেন, সকলে সমবেত হয়ে প্রকাশ্য সভায় খলিফা নির্বাচন করা উচিত। সকলে যাকে সমর্থন করবে, আমরা তাঁরই হাতে বাইয়াত হবো। হজরত আলী (আ.) একে একে হজরত জোবায়ের (রা.) ও তালহা (রা.) কে খেলাফত গ্রহণের অনুরোধ করলেন। কিন্তু তারা উভয়েই তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

অবশেষে বাধ্য হয়েই একটি সাধারণ সভা আহ্বান করা হলো। সভায় হজরত আলী (আ.) খেলাফতের জন্য প্রার্থী না হয়ে বরং প্রস্তাব করলেন যে, প্রথমে আমাদের দেখা উচিত রসুল (দ.) এর বিশিষ্ট সাহাবিদের মধ্যে কেহ খেলাফত গ্রহণে সম্মত আছেন কিনা? কিন্তু সভায় তাঁদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন না। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.), জোবায়ের (রা.), তালহা (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবিগণ মদিনায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সভায় উপস্থিত হলেন না।

লোকগণ গৃহে গৃহে গিয়ে তাদের অভিপ্রায় জানতে লাগল। কিন্তু বিশৃঙ্খলাময় মুসলিম খেলাফতের পরিচালনার দায়িত্ব কেউই গ্রহণ করতে রাজি হলেন না।

পরদিন সভা আরম্ভ হলে সকলেই হজরত আলী (আ.)কে খেলাফত গ্রহণ করবার জন্য বিশেষভাবে চেপে ধরল। কিন্তু হজরত আলী (আ.) বললেন বদর যুদ্ধের সাহাবিরা তার খেলাফত মেনে না নিলে বিষয়টির সুরাহা হবে না।

দ্বিতীয় দিনের সভায় জুবায়ের ও তালহা (রা.) যোগদান করলেন। তারা বলে পাঠালেন সকলে যাকে সমর্থন করে আমরা তাঁর হাতেই বাইয়াত করব। এহেন অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সমবেত জনতার পীড়াপীড়ি ও বিশেষভাবে মালিক আশতারের অনুরোধে হজরত আলী (আ.) এক প্রকার বাধ্য হয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সকলে তার হাতে বাইয়াত হলেন। এ সময় হজরত আলী (আ.) বললেন, হজরত জুবায়ের (রা.) ও তালহা (রা.) এর মতামত জানা প্রয়োজন। তখন মালিক আশতার কতিপয় লোকসহ গিয়ে হজরত জোবায়ের (রা.) ও হজরত তালহা (রা.) কে সভায় এনে হাজির করলেন।

তাঁরা সভায় উপস্থিত হলে হজরত আলী (আ.) বললেন, আপনাদের মধ্যে যিনি খেলাফত গ্রহণে ইচ্ছুক আমি তাঁর হাতে বাইয়াত করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তারা খেলাফত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন সমবেত জনতা তাদের উভয়কেই বললেন, যদি আপনারা দুইজন বাস্তবিকই খেলাফত গ্রহণে অসম্মতি থাকেন তাহা হলে হজরত আলী (আ.) এর হাতে বাইয়াত করুন।

হজরত তালহা (রা.) আলী (আ.)কে বললেন, আমি এই শর্তে আপনার হাতে বাইয়াত করছি যে, আপনি আল্লাহর কোরআন ও রসুল (দ.) এর সুন্নত অনুযায়ী নির্দেশ জারি করবেন ও বিচার শাসন পরিচালনা করবেন। হজরত আলী (আ.) এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করলে হজরত তালহা (রা.) হাত বাড়িয়ে হজরত আলী (আ.) এর হাতে বাইয়াত করলেন।

হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) কে বাইয়াত করতে বলা হলে তিনি স্বীয় গৃহে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং বলে পাঠালেন সকলের বাইয়াত করবার পরে আমি বাইয়াত করবো। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন তার সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ বা আশঙ্কা করবার আশঙ্কা নাই।

ইহার পর হজরত আলী (আ.) মসজিদে নব্বিতে চলে গেলেন। তথায় দলে দলে লোক এসে তাঁর নিকট বাইয়াত করে যেতে লাগলেন। এইভাবে প্রায় সকলেই হজরত আলী (আ.) খেলাফত স্বীকার করে নিল। কেবল মারওয়ানসহ কিছু সংখ্যক উমাইয়া বংশের লোক মদিনা হতে বাইয়াত করে সর পড়ল।

যাহোক খলিফা ওসমানের (রা.) শাহাদতের সপ্তাহকাল পরে ২৫ জিলহজ্ব পঁয়ত্রিশ হিজরি মোতাবেক ৬৫৬ খ্রি. হজরত আলী (আ.) খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

খেলাফতে রাশেদা :

খেলাফত শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব। অন্য কাহারো অপসৃত হওয়ার পর তার স্থানে উপবেশন করা। মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ারই নাম খেলাফত। ইমাম শব্দও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় প্রকৃতপক্ষে খলিফা ও ইমাম শব্দদ্বয় একই ব্যক্তির দুটি স্বতন্ত্র দিককে প্রকাশ করে। পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনি খলিফা ও সমসাময়িক যুগের অনুসরণীয় ও সর্বাধিক গণ্যমান্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে তিনি ইমাম ও নেতা। প্রকৃতপক্ষে পয়গম্বরের অন্তর্ধানের পর গোটা উম্মতের সকল ধরনের নেতৃত্ব দেওয়াকেই খেলাফত ও ইমামত হিসেবে বিবেচিত।

নবি করিম (স.) এরশাদ করেছেন: তোমাদের পূর্বে বনি ইসরাইল গোত্রের নবি ও পয়গম্বরগণকে নবুওয়াত ও রাজত্ব দান করা হতো। এক পয়গম্বরের অন্তর্ধানের পর আর একজন নবি এসে তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর নবুয়তির ক্রমিক ধারা সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই আমার পর কোন নবি বা রসুল হবেন না। তবে নবুয়তির কার্যধারা পথপ্রদর্শক খলিফাদের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। নবিদের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে–

আমি (খোদা) তাহাদের (বনি ইসরাইলদের) মধ্যে বারো জন নাকিব বা প্রধান দলপতি- ইমাম নিযুক্ত করিয়াছি।–মায়েদা, আয়াত -১২।

"নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়াছি এবং আমিই তাহার ভাই হারুনকে তাহার খলিফা নিযুক্ত করিয়াছি।" সুরা-ফোরকান, আয়াত -৩৫।

"ওহে দাউদ আমিই তোমাকে পৃথিবীতে আমার খলিফা নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তুমি ন্যায়ের সহিত লোকের প্রতি আদেশ কর।" সুরা সোয়াদ, আয়াত-১৭-২৬।

"আমি দাউদের পুত্র সুলায়মানকে (তার খলিফা হিসেবে) নবুয়ত ও রাজত্ব দান করি।" সুরা আন-নমল,-১৫।

ওপরের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আল্লাহ স্বয়ং নবিদের প্রতিনিধি নিয়োগ করে থাকেন।

আবার অনেক ক্ষেত্রে নবি তার অন্তর্ধানের পূর্বে তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীর নাম ও পরিচিতি বর্ণনা করে গেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ-

মরিয়মপুত্র ঈসা বললেন, হে ইসরাইলের সন্তানগণ, মনে রেখো, আমি আল্লাহর নবি, তোমাদের জানাচ্ছি ঐশি বিধান, আমার পরে আসবেন আরেকজন নবি তার সংবাদ তোমাদের দিচ্ছি, তার নাম হবে আহমদ, তাকে তিনি (আল্লাহতা'লা) পাঠাবেন সত্যের ধর্ম দিয়ে যাতে তিনি সকল ধর্মের ওপর তা' (বিজয়ী হবে মর্মে) ঘোষণা করতে পারেন ।" আছ সফ-৬।

অর্থাৎ নবিদের মধ্যে হয় পূর্ববর্তীজন পরবর্তীজনের নাম বলে গেছেন নতুবা অনুসরণ করার জন্য আল্লাহর নির্দেশে নবিগণ কাউকে সাব্যস্ত করে গেছেন।

আল্লাহর ও রসুলের পরে যাদের নির্দেশ পালন করতে ঈমানদারগণ বাধ্য তারা হলেন 'উলিল আমর' তথা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রসুলের ও উলিল আমরদের।"

অর্থাৎ আল্লাহ যে পদ্ধতিতে রসুল নিয়োগ করে থাকেন, সেই একই পদ্ধতিতে উলিল আমর নিয়োগ করে থাকেন এবং রসুলের অন্তর্ধানের পর আল্লাহর এই ধরনের উলিল আমরদের নির্দেশ পালন অন্যান্য ঈমানদারদের জন্য ফরজ ঘোষণা করেছেন। এ জন্যেই আল্লাহর অলি তথা উলিল আমরদের বিরোধিতা করা হলে তা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর হিসেবে হাদিসে কুদসিতে বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাধারণ লোক নিজ বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার কারণে আল্লাহর এ নিয়োগের চ্যালেঞ্জ করে থাকে যেমন নাকি সুরা বাকারার ২৪৭ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে–

বনি ইসরাইল বলল সে (তালুত) আমাদের শাসন কর্তৃত্ব চালাবার অধিকার কোথা থেকে পেলো? অথচ তার তুলনায় আমরা তার চেয়ে শাসন কার্যের (শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার ব্যাপারে) অধিক হকদার আর তাকে তো ধন সম্পদে প্রাচুর্য ও দেয়া হয়নি। নবি বললেন, আল্লাহ তোমাদের মোকাবেলায় তাকে নিযুক্ত করেছেন এবং জ্ঞান শক্তিতে প্রশস্ততা দান করেছেন।

বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এ নিয়োগের অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য অজ্ঞাত (অর্থাৎ সব সময় মানবিয় যুক্তিতে তা নির্ধারণ করা যায় না)। তবে প্রকাশ্যে নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অসাধারণ জ্ঞান, হিকমত, বাক পটুতা, ন্যায় বিচারের ক্ষমতা প্রভৃতির অধিকারী হতে দেখা যায়। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

"এবং দাউদের রাজত্বকে আমরা সুদৃঢ় করেছি তাকে দিয়েছি জ্ঞান, কৌশল (হিকমত) এবং চূড়ান্ত ফয়সালাকারী কথা বলার যোগ্যতা।" সুরা সোয়াদ-২০।

উলিল আমরদের জ্ঞানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার ৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আর যদি (গুজব না ছড়িয়ে) খবরটি রসুল এবং তাদের 'উলিল আমর' এর নিকট পৌঁছাত তাহলে তা এমন ব্যক্তিদের জ্ঞানে আসতো তাদের মধ্যে যারা বিষয়ের গভীরে পৌছুতে সক্ষম।"

প্রসঙ্গত বলা যায় যে সকল নবিগণ মোজজা তথা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অন্যান্য নবিগণকে যত মুজেজা প্রদান করা হয়েছে সবগুলো একত্রিতভাবে প্রিয় নবি (দ.) কে প্রদান করা তো হয়েছেই, ওপরন্তু আরও অগণিত মুজেজা তাঁকে দান করা হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তাঁর চুল মোবারক হজরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) এর টুপির মধ্যে ছিল যে কারণে তিনি সর্বদাই শত্রুর ওপর জয়ী ছিলেন। হরকল বাদশার পাগড়ীতে ছিল বলে তিনি মাথার ব্যথা হতে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। এ কারণে সাহাবাগণ রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে রসুল (দ.) এর চুল মোবারকের ধোয়া পানি পান করাতেন। তাঁর মুখ এমনি মুজেজা যে প্রত্যেকটি কালামই আল্লাহর ওহি। থুথুতে এমন মুজেজা ছিল যে হজরত জাবের (রা.) এর ঘরে পাতিলে তা দেয়ার পর তরকারীর মধ্যে বরকত হয়ে গেল। খায়বরের ময়দানে হজরত আলী (আ.) এর চোখে থু থু লাগিয়ে দিয়েছিলেন, যে কারণে তিনি স্বস্তি ফিরে পেয়েছিলেন। প্রিয় আঙ্গুল মুবারকে এত বরকত যে তা হতে পাঁচটি রহমতের পানি সমৃদ্ধ নদী প্রবাহিত হল। তার পা মোবারকে এমন মুজেজা যে যখন পাথরে পা রাখতেন, পাথরও তাঁর পদচিহ্ন নিজ বুকে ধরে রেখে চির ধন্য হয়ে যেতো। তাঁর ঘাম মুবারক হতে গোলাপের তুলনাহীন মনোহর সুগন্ধ প্রকাশিত হতো।

এই মহান নবির ইংগিতে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধের দিন এক মুষ্টি কংকর কাফিরদের ওপর নিক্ষেপ করলে আল্লাহপাক এরশাদ করলেন, "এ কংকর আপনি নিক্ষেপ করেননি বরং আমি নিক্ষেপ করেছি। সেই মোবারক হাতের মধ্যে এসে কংকর থেকে কলেমার ঘোষণা আসল। সাহাবিগণ সেই হাত মোবারকে হাত রেখে বাইয়াত করার পর রাবুল আলামিন ইরশাদ করলেন, "সেই মোবারক হাতের ওপর আমার কুদরতী হাতও ছিল।"

এই অনুপম নবির (দ.) খলিফা বা নায়েব অথবা 'উলিল আমর' এর দাবিদার হতে হলে তাকে অবশ্যই এ ধরনের মোজেজা তথা ক্ষমতার বাস্তব প্রমাণ দেখানোর যোগ্যতা থাকতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে নায়েবে রসুল নয় এমন ব্যক্তিরাই আকারে ইংগিতে রসুলের উত্তরাধিকারীদের অলৌকিক ক্ষমতা বা কেরামত সম্পর্কে জনমনে অশ্রদ্ধা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে। কারণ সকল নবিগণ যেমন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাই উলিল আমরগণকেও অবশ্যই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে।

উল্লেখ্য যে, নবিদের শারীরিক শক্তি কমপক্ষে সাধারণ ৪০ ব্যক্তির সমান। এঁরা সাধারণভাবে মানবিয় আকৃতি ও প্রকৃতির হলেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক ক্ষমতা, শারীরিক শক্তি বা জ্ঞানের দিক দিয়ে সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত নয়।

রসুলদের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান দক্ষতা ও যোগ্যতা দেয়া হয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে—

"ইউসুফ বললো, আমাকে জমিনের ভান্ডার সমূহের কার্যে নিয়োগ করো। কারণ আমি তা হেফাজতকারী এবং ওয়াকেফহাল (এতদসম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী)-ইউসুফ-৫৫।

তাই নায়েবে রসুলদের অনুরূপ জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করা হয়ে থাকে। এই আয়াত থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কোন পদের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে তা ঘোষণা বা আবেদন জানানো অবশ্যই জায়েজ বা ধর্মীয় দৃষ্টিতে অনুমোদিত। আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন বিশেষ পদের জন্য আমানতদারিতা একটি বিশেষ যোগ্যতা, আমানতদার ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে 'উলিল আমর' বা রসুলের প্রতিনিধি হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব। পবিত্র কোরানের সুরা নিসার ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত সমূহ তার যোগ্য ব্যক্তির কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য।"

আমানতদারিতার তাৎপর্য আল্লাহর আমানত, বান্দার আমানত, প্রকৃতির আমানতের সকল প্রকার মানদন্ড ও সীমারেখা বিষয়ক জ্ঞান ও তা সঠিকভাবে বিতরণের যথাযথ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত থাকা। এখানে সাধারণ জ্ঞান বা কমনসেন্স এর সুযোগ নাই। যেমন নাকি উত্তরাধিকার আইনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুরা নিসায় আল্লাহ বলেন, "তোমাদের আত্মীয়দের মধ্যে কে তোমাদের বেশি আপন সে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই।" অর্থাৎ উত্তরাধিকার আইনের সম্পত্তি ভাগের বিষয়ও সাধারণ জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত রাখা হয় নাই।

'উলিল আমর' তথা নায়েবে রসুল সম্পর্কিত যে মূলনীতি পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে; তা হলো, তোমরা যারা ঈমান এনেছ, আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসুলের আর তোমাদের উলিল আমরের। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ এবং রসুলের সমীপে পেশ করো যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখ। সুরা নিসা-৫৯।

আলোচ্য আয়াতটি পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত মূলনীতি পাওয়া যায়:

এক. আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য সকল আনুগত্যের চেয়ে অগ্রগণ্য;

দুই. উলিল আমর এর আনুগত্য আল্লাহ রসুলের পরেই।

তিন. কোন ব্যাপারে মত বিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ ও রসুলের বিধানই হবে চূড়ান্ত দলিল। তবে রসুলের অন্তর্ধানের পর উলিল আমরগণই (পবিত্র কোরআনের আলোকে) সর্বোচ্চ আপিলেট কর্তৃপক্ষ (Appeallate Authority) হিসেবে বিবেচিত হবেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, "ইসলামি আইনের একই প্রশ্নের ওপর আইন প্রণেতা এবং কাজিগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে দেখা যায় যে, ইসলামি আইনের নীতির ওপর এইসব আইন প্রণেতা তথা নিজদিগকে খুব অভিজ্ঞ ও পন্ডিত মনে করলেও তাদের অবস্থা এই যে, কোন একটি প্রস্তাবিত বিষয়ের ওপর তাদের একটি সিদ্ধান্ত অন্য আর একজনের নিকট পেশ করা হয় তখন এই দ্বিতীয় বিচারক প্রথম বিচারক হতে সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি রায় দিতে পারেন। মতামত বা রায়ের এইরূপ ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতি কেমন করে সম্ভব হতে পারে ? সকল বিচারকই তো আল্লাহ, রসুল ও কোরআনে বিশ্বাসী।

এ ধরনের মতভেদ এবং ব্যতিক্রম পর্যবেক্ষণ করে সাধারণভাবে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আল্লাহতা'লা হয়ত বা এ ধরনের মতভেদের সৃষ্টি করেছেন ফলে কোন মামলার রায় বিচারক বিশেষের কাছে বেকসুর খালাস আবার অন্য বিচারকের কাছে মৃত্যুদন্ড রায় পেয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে দুই বিচারকই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পন্ন করছেন অথবা তিনি খোদায়ি বিধানের অপব্যাখ্যা করে ধর্ম সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি হতাশা ও অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করছেন। অথবা আল্লাহর বিধান কি অসম্পূর্ণ অথবা রসুল (দ.) কি তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেননি (নাউজুবিল্লাহ)। যে কারণে এ ধরনের ভয়াবহ আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিস্থিতির কোন পরিত্রাণ নাই বলে ইসলামি আইনবিদগণ বলে থাকেন। কিন্তু সমস্ত প্রশংসা এবং গৌরব

আল্লাহর। যার আদেশ পূর্ণভাবেই নাজিল হয়েছিল এবং মহানবির দ্বারা পরিপূর্ণভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, কোন কিছুই কোরআনে বাদ দেই নাই। আবার বলা হয়েছে, "প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যাই কোরআনে রয়েছে।" অন্য এক জায়গায় আল্লাহ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন, "এই পুস্তকের (কোরআন) বিভিন্ন অংশের একটি অন্যকে প্রতিষ্ঠিত ও সত্যায়িত করে এবং তাদের কোথাও কোন অমিল এবং অসংগতি নাই।" তারপরেও তাতে সুস্পষ্ট বিশদ বিবরণ রয়েছে যে, "এই নাজেলকৃত কথা সমূহের উৎস আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উৎস থাকলে তুমি তাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুরের (অসংগতি) অমিল এবং অনৈক্য অনেক খুঁজে পেতে।"

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, "সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন পর্যবেক্ষকের নিকট কোরআন বুঝবার পক্ষে অতি সহজ ও চিত্তাকর্ষক একটি পুস্তক বলেই মনে হয় কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ অর্থ সুদূরপ্রসারী, গভীর এবং বুঝে নেয়া কঠিন। গভীর চিন্তাশীলদের জন্য ইহার মনোমুগ্ধকর গুণের শেষ হয়নি এবং বিস্ময় অফুরন্ত।" হজরত আলী (আ.), নাহজুল বাগা খোতবা (২৩)

এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই কোরআন জনসাধারনের নিকট সরাসরি দেয়া হয়নি। বরং রসুলগণের মাধ্যমে কোরআন নাজিল করা হয়েছে এবং তা ব্যাখ্যা করার অধিকার রসুলকেই দেয়া হয়েছে। যেমন নাকি সুরা নহলের ৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "হে নবি! আমি এ গ্রন্থ তোমার কাছে নাজিল করেছি এ উদ্দেশ্যে যে তুমি মানুষের জন্য নাজিল করা এ কিতাবের শিক্ষা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবে।" অন্য কোন ব্যক্তি যেহেতু এ ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয় তাই তার প্রদত্ত ব্যাখ্যা অর্থগত দিক থেকে তথা কোরআনের সার্বিক স্পীরিটের পরিপন্থি হবে বিধায় সে ভুল করে পক্ষান্তরে অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে সীমা লঙ্ঘন করে।

এ কারণেই রসুল (দ.) বলেছেন যে, কোরআনের সঠিক (আপাত দৃষ্টিতে) ব্যাখ্যা করলেও সে ভুল করে (বোখারি)। তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি আপন মতামতের ভিত্তিতে কোরআনের তফসির করে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।

যারা বলে যে, কোরআনের অর্থ তাই যা বাহ্যিক তফসিরে বর্ণিত আছে তা সঠিক নয়। হজরত আলী (আ.) এরশাদ করেন, আল্লাহতা'লা বান্দাকে তাঁর কালামের বোধশক্তি দান করেছেন। বর্ণিত অনুবাদ ছাড়া কোরআনের যদি অন্য কোন অর্থ না থাকে তবে বোধশক্তির উদ্দেশ্য কি ? রসুলে করিম (স.) বলেন: "কোরআনের একটি বাহ্যিক অর্থ আছে এবং একটি আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে। আর আছে একটি সীমা ও একটি উদায়াচল।" সুতরাং বাহ্যিক অর্থ অভ্যন্তরীণ অর্থ, সীমা ও উদয়াচল– এ সবের অর্থ কি ? হজরত আলী (আ.) বলেন, আমি ইচ্ছা করলে 'আলহামদুর–তফসির' দ্বারা সত্তরটি উট বোঝাই করতে পারি। এ উক্তির অর্থ কি ? আলহামদুর বর্ণিত বাহ্যিক তফসির তো খুব সামান্য। হজরত আবু দারদা (রা.) বলেন: মানুষ যে পর্যন্ত ফকিহ্ না হয়, সে পর্যন্ত সে যেন কোরআনকে কয়েকভাগে ভাগ করে না নেয়। জনৈক আলেম বলেন, প্রত্যেক আয়াতের ষাট হাজার অর্থ আছে এবং যে সব অর্থ অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে তার সংখ্যা আরও বেশি। অন্য একজন বলেন: কোরআন সত্তর হাজার দু'শ বিদ্যাকে পরিব্যপ্ত করে রেখেছে। কেননা প্রত্যেক কলেমার জন্য একটি বিদ্যা রয়েছে। প্রত্যেকটিরই বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ অর্থ সীমা ও উদয়াচল রয়েছে বিধায় এর অর্থ চতুর্গুণ হয়ে গেছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: কেউ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে সে কোরআন নিয়ে আলোচনা করুক। এটাও কেবল বাহ্যিক তফসির দ্বারা অর্জিত হয় না।

সারকথা এই যে, আল্লাহতা'লার ক্রিয়া কর্মও গুণাবলীর মধ্যে সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত আছে। কোরআনে তাঁর সত্তা, ক্রিয়াকর্ম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন শেষ নাই। কোরআনে এগুলির প্রতি সংক্ষেপে ইশারা করা হয়েছে। এগুলোর বিশদ বিবরণ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা কোরআনকে বুঝার ওপর নির্ভরশীল। বেল বাহ্যিক তফসির দ্বারা বিশদ বিবরণের প্রতি ইংগিত জানা যায় না। যে সকল প্রামাণ্য ও যুক্তিপুর্ণ বিষয়াদিতে মানুষের মতভেদ আছে কোরআন মজিদে প্রকৃতপক্ষে সেগুলির প্রতি ইশারা ও ইংগিত আছে। খোদা প্রদত্ত বিশেষ বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া এসব ইশারা-ইংগিত কেউ জানতে পারে না। এমতাবস্থায় বাহ্যিক শব্দের অনুবাদ ও তফসির এসব ইংগিত বুঝার জন্য। কিরূপে যথেষ্ট হতে পারে ? এজন্যই রসুল (দ.) বলেছেন: তোমরা কোরআন পাঠ কর; এর পর তার রহস্যপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্বেষণ কর। হজরত আলী (আ.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এরশাদ হয়েছে– সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য নবিরূপে প্রেরণ করেছেন, আমার উম্মত তার মূল ধর্ম পরিত্যাগ করে বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। সকল দলই

পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী হবে এবং জাহান্নামের দিকে দাওয়াত দিবে। এ পরিস্থিতি দেখা দিলে তোমরা কোরআন মজিদকে আঁকড়ে থাকবে। কারণ এতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, পরবতীদের অবস্থাও স্থান পেয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের বিধানও এতে বিদ্যমান আছে। প্রতাপশালীদের মধ্যে থেকে যে এর বিরুদ্ধাচারন করবে আল্লাহ তাকে চুরমার করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোরআন ছাড়া অন্য কিছুতে জ্ঞান অন্বেষণ করবে; আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। কোরআন আল্লাহর মজবুত রশি সুস্পষ্ট এবং যথোপকারী প্রতিষেধক। যে একে ধারণ করে, সে সুরক্ষিত থাকে, যে এর অনুসরণ করে, সে মুক্তি পায়। এর রহস্যমন্ডিত বিষয়সমূহ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না এবং অনেকবার পাঠ করার কারণে পুরাতনও হয় না। (এহয়াউল উলুমুদ্দীন, ইমাম গাজ্জালী (রা.))।

হজরত হুজায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন। রসুল (দ.) তাঁর ওফাতের পরে স্বপ্ন যোগে আমাকে উম্মতের বিভেদ ও অনৈক্যের সংবাদ দিলেন। আমি আরজ করলাম– ইয়া রসুলুল্লাহ, আমি যদি সেই যুগ পাই; তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন ? তিনি বললেন, আল্লাহর কালাম শিখবে এবং তাতে যা কিছু আছে তা মেনে চলবে। মুক্তির উপায় এটাই। আমি তিনবার এ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে তিনি একই জওয়াব দিলেন । হজরত আলী (আ.) বলেন– যে ব্যক্তি কোরআন বুঝে নেয়, সে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্ণনা করে। এতে তিনি এদিকেই ইশারা করেছেন যে, কোরআন মজিদের আয়াতসমূহ সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি ইংগিত বহন করে। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) রসুল (দ.) হতে বর্ণনা করেন যে, যাকে হেকমত দান করা হয় সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয় । এই আয়াতের তফসির প্রসঙ্গে। বলেন যে, 'হিকমত' শব্দের অর্থ কোরআনকে বুঝবার ক্ষমতা। আল্লাহতা'লা বলেন : "অতঃপর আমি ফয়সালাটির বোধশক্তি সোলায়মানকে দান করলাম। আর প্রত্যেককে দিয়েছি রাজত্ব আর জ্ঞান।" এ আয়াতে হজরত দাউদ (আ.) ও সোলায়মান (আ.) উভয়কে যা দান করা হয়েছিল তার নাম রাখা হয়েছে রাজত্ব ও জ্ঞান। আর হজরত সোলায়মানকে যা দেয়া হয়েছিল তার নাম 'বোধশক্তি' রাখা হয়েছে এবং যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য সকলে আরবি ভাষাভাষী ও এমনকি সাহাবি হওয়াও কোরআন সঠিকভাবে বোঝার মানদত নয়। এ কারণেই রসুল (দ.) এর লক্ষাধিক সাহাবা থাকা সত্ত্বেও কোরআনের বিশেষ জ্ঞানী হিসেবে শুধুমাত্র হজরত আলী (আ.), হজরত ইবনে আব্বাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও হজরত কাব (রা.) এর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পবিত্র কোরআনে রসুলগণের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "প্রকৃতপক্ষে ঈমান আনয়নকারীদের প্রতি আল্লাহতা'লার বিরাট মেহেরবাণী যে তিনি তাদের জন্য স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে এর রসুলের আগমন ঘটিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান। তাদের তাজকিয়া তথা পরিশুদ্ধ করেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।" (আল ইমরান ১৬৪)।

আলোচ্য আয়াত থেকে দেখা যায় যে, রসুল (দ.) তাঁর অনুসারীদের কাছে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করতেন, তাদেরকে আধ্যাত্মিভাবে নফসের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করতেন ও তাঁদের 'বি' ও হিকমত শিক্ষা দিতেন। তাই 'নায়েবে রসুল' ও অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম হবেন এটাই স্বাভাবিক।

সুরা নিসার রুকু ৯ এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, "যখন তারা নিজেদের নফ্সের ওপর অত্যাচার করে, তখন হে মাহবুব ! তারা আপনার নিকট আসলে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আর রসুল ও তাদের জন্য সুপারিশ করলে আল্লাহকে অবশ্যই তওবা বুলকারী ও পরম দয়ালু হিসেবে পাওয়া যাবে।"

এই পবিত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্দুল আলামিন তওবা করা এবং গুণাহ মাফ করিয়ে নেয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন। গোনাহ মাফের ওসিলা হিসেবে বিশ্বাস করে রসুল (দ.) এর মহান দরবারে উপস্থিত হওয়া। তিনি রসুল (দ.) যদি দয়া করে তার জন্য সুপারিশ করেন তখনই আল্লাহতা'লা তওবাকারির গোনাহ মাফ করবেন। এখানে যে জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, গোনাহ আল্লাহর কাছে করা হয়। কিন্তু গোনাহ মাফ করিয়ে নিতে হলে রসুলের শরণাপন্ন হতে হয়। এতে করে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যালোচনা ও অনুধাবন করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে যিনি প্রকৃতপক্ষে রসুল (দ.) এর প্রতিনিধি বা খলিফা হবেন তিনিও আল্লাহর কাছে সুপারিশ করলে তওবাকারির গোনাহ মাফ সম্ভব বলে বিবেচিত হওয়া যুক্তির খাতিরে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। এই আয়াতের মর্মানুযায়ী রসুলের সুপারিশের মাধ্যমেই কেবল উমাতের গুণাহ

মাফ হতে পারে। সকল ধর্মমতেই কোনকোন পন্থায় এই পদ্ধতি স্বীকৃত। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, খ্রিস্টানদের (ক্যাথলিক) মধ্যে আজ পর্যন্ত কিছুটা বিকৃতিসহ এই নীতি চালু আছে যাকে Confession বলা হয়ে থাকে।

সুরা আরাফে আল্লাহতা'লা রসুল (দ.) এর আইন প্রণেতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, "তিনি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেন, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন, তাদের জন্য পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করেন, অপবিত্র জিনিসগুলোকে হারাম করেন এবং তাদের ওপর থেকে যে সব বিধি নিষেধের বোঝা চাপানো ছিল তা থেকে তাদের মুক্ত করেন।" আরাফ -১৫৮। সুরা হাশরেও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় :

"রসুল তোমাদের যা-দেন তা' গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন, তা বর্জন কর এবং আল্লহকে ভয় কর। আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"

পবিত্র কোরানের উল্লেখিত আয়াতের মর্মানুযায়ী রসুলুল্লাহ (দ.) আদেশ নির্দেশ উপদেশ মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় বিধায় ইহা ইসলামি আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

রসুল (স.) এর হাদিসের বাণী মূলত: পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা নিজ ভাষায় প্রদান করলেও এর ভাব আল্লাহর। তাই রসুল (দ.) যা বলেছেন, করেছেন, সে সব কাজ এবং তার আচরণ, সুন্নাহরূপে গন্য। তিনি কি অনুমোদন করেছেন আর কি করেন নাই, তা তার আচরণ হতে বুঝে লওয়া হয়েছে। যে রীতি নীতি বা প্রথা বা কাজ মুসলিমগণ রসুল (দ.) এর সামনে বা জ্ঞাতসারে করেছেন এবং একাধিক বার করা সত্ত্বেও রসুল (দ.) বাধা দেন নি, সেই রীতি বা প্রথা বা কাজ রসুল (দ.) এর অনুমোদিত বলে গৃহীত হয়েছে। আবার যে বিশেষ আচরণ রসুল (দ.) সর্বদা এড়িয়ে চলতেন তা তাঁর অননুমোদিত সাব্যস্ত হয়েছে।

ইসলাম ধর্মে হাদিসের গুরুত্ব বিবেচনা করে একদল লোক মিথ্যা ও মনগড়া হাদিস বর্ণনা করতে শুরু করে। এর পিছনে নিম্নোক্ত কারণগুলি সক্রিয় ছিল বলে বিবেচনা করা হয় ঃ

এক. বেদ্বীন ও ফাসেক ধরনের লোকেরা এভাবে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছিল।

দুই. অনেক মূখ, সুফি ও আবেদ প্রকৃতির নেকি ও দ্বীনদারি মনে করে ধর্মীয় উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ও ফযিলত সম্পর্কিত হাদিস তৈরি করতেন।

তিন. অযোগ্য ও সংকীর্ণমনা কিছু লোক সহজে খ্যাতি লাভ করার পদ্ধতি হিসেবে মনগড়া হাদিস তৈরির প্রচেষ্টা চালায়।

চার. বিদ্আত সৃষ্টিকারী ও কোন বিশেষ মজহাবী মতের অনুসারীরা নিজেদের মতের সমর্থনে হাদিস তৈরি করত।

পাঁচ. অনেক লোক দুর্বল 'মতন' এর জন্য সর্বজন পরিচিত ও স্বীকৃত 'সনদ' তৈরি করত। আবার অনেকে সনদের মধ্যে উল্টা পাল্টা করে তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন করত। এর উদ্দেশ্যই হতো তাদের কথাই সত্য এবং এর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ আনা যেতে পারেনা। এই সঙ্গে তাদের নতুন আবিষ্কারে লোকদেরকে চমকিত করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ছয়. অনেক লোক সাহাবাদের উক্তি, আরবি প্রবাদ প্রবচন, জ্ঞানী ও মনীষীদের বাণীকেও রসুলের সাথে সম্পর্কিত করে।

সাত. হাদিস ইসলামি আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত বিধায় একদল দরবারি আলেম রাজ অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় দরবারের মর্জি মত হাদিস তৈরি করে।

আট. রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য মিথ্যা হাদিস প্রণয়ন করা হয়।

হাদিসের উদ্দেশ্য কি ? যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা হতে মর্ম উদ্ধার করাই হচ্ছে হাদিসের ব্যাখ্যার প্রধান বিষয়। অন্য কথায় যিনি আইন দাতা এবং আইন ব্যাখ্যাতার সঠিক অভিপ্রায় আবিষ্কার করতে সক্ষম তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ হাদিস ব্যাখ্যাকারী। তিনি যা বলেছেন, যেভাবে বলেছেন তা হতে অভিপ্রায় আবিষ্কার করতে হয়। যেভাবে বলা হয়েছে তার মূল্য যা বলা হয়েছে তার চাইতে কম নয়। আইন দাতা বা আইন ব্যাখ্যাদাতা অনেক কিছু অব্যক্ত রাখতে পারেন। হাদিস ব্যাখ্যাকারকের কাজ হচ্ছে যে অব্যক্তকে ব্যক্ত করা। কিন্তু আইন দাতা বা আইন ব্যাখ্যাদাতার উদ্দেশ্য কি আছে, তা কি করে জানা যায় বা তার অভিপ্রায় কিভাবে বুঝা যায় ? যেহেতু হাদিস প্রকৃতপক্ষে কোরআনের সম্প্রসারিত ব্যাখ্যা তাই রসুল (দ.) এর সাথে যোগাযোগ ব্যতীত

হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব নয়। এ কারণেই রসুল (দ.) এর অন্তর্ধানের পরেই হাদিসের ব্যাখ্যাজনিত জটিলতার কারণে ইসলামি সমাজ জীবনে এক মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং খুব কম সংখ্যক সাহাবিকেই সঠিক হাদিস ব্যাখ্যাকারীর মর্যাদা দেয়া হয়।

এ কারণেই পবিত্র কোরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যাকারীকে কোরআন প্রণেতা তথা আল্লাহ তাআলার সাথে যোগাযোগ থাকতে হবে কেবলমাত্র নায়েবে রসুল বা ওসিয়ে রসুল বা খলিফায়ে রসুলগণই এই গুণাবলীর অধিকারী হন। পক্ষান্তরে রসুল (দ.) এরপর তার সাথে অলৌকিকভাবে বা অদৃশ্যভাবে দেখা হওয়ার কনসেপ্ট অস্বীকার করা হলে কখনোই প্রকৃত সত্য বা চূড়ান্ত সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে না।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে প্রকৃত নায়েবে রসুল বা খলিফায়ে রসুল (দ.) বা অলি আল্লাহর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ চিহ্নিত করা যায়–

১। রসুলের খলিফা আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

২। তাঁর নিয়োগ আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে অথবা রসুল (দ.) কর্তৃক প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে নবির অনুসারীদের অবহিত করতে হবে।

৩। তিনি শারীরিক শক্তিতে অসাধারণ হবে (যদি সেই সমাজে প্রকাশ্য শক্তির কোন সামাজিক গুরুত্ব থাকে)।

৪। তিনি ভবিষ্যদ্বানীসহ নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

৫। তিনি সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ মুত্তাকি পরহেজগার হবেন।

৬। তিনি অসাধারণ বাক পটুতা, জ্ঞান, ন্যায়বিচার, ফয়সালাকারী, আমানতদারিতার অধিকারী হবেন।

৭। তিনি কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সঠিক ব্যাখ্যাকারী হবেন।

৮। হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যাকারী হিসেবে প্রশংসিত হবেন।

৯। তিনি অনুসারীদের কোরআন তথা জীবন বিধান শিক্ষা দিবেন।

১০। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করার যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন।

১১। তাঁর অনুসারীদের 'হিকমত' ও শিক্ষা দিতে সক্ষম হবেন।

১২। তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর অনুসারীদের গোনাহ মাফের জন্য সুপারিশকারী ব্যক্তি তথা কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবেন।

১৩। সর্বোপরি তিনি অদৃশ্য আল্লাহ বা তার রসুলের (দ.) সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করবেন এবং এই পদ্ধতিতেই তিনি আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে তাঁর ভূমিকা পালন করবেন।

উল্লেখিত মানদন্ডের নিরিখে প্রচলিত মত অনুযায়ী খোলাফায়ে রাশেদার নিয়োগ ও শাসনকালের বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে আমরা যে বৈশিষ্ট্য সমূহ দেখতে পাই তা পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হচ্ছে–

হজরত আবুবকর (র) এর নিয়োগ ও শাসনকাল :

৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন হজরত মুহম্মদ (দ.) মহাপ্রভূর সান্নিধ্যে গমন করেন। অতঃপর বনি সাইফায় (মসজিদে নয়) আনসারদের এক সমাবেশে হজরত আবুবকর (রা.), হজরত ওমর (রা.) ও আবু ওবায়দা (রা.) গমন করেন ও উপস্থিত আনসারদের হজরত ওমর (রা.) আবুবকর (রা.) কে খলিফা হিসেবে নিয়োগ করার ব্যাপারে তাদের সম্মত করান।

এই নিয়োগের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন প্রকার ইংগিত আছে বলে আজ পর্যন্ত কোন তথ্য প্রকাশিত হয়নি। অর্থাৎ অন্য কথায় অন্যান্য নবিদের ক্ষেত্রে যেমন পবিত্র কালামের মাধ্যমে নবির উত্তরাধিকারী নিয়োগ করা হয় তা আলোচ্য ক্ষেত্রে হয়নি।

হজরত রসুল (দ.) জীবিত অবস্থায় তার উত্তরাধিকারী হিসেবে হজরত আবুবকরের নাম উল্লেখ করেছেন বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। অথবা আল্লাহতা'লা তার রসুলকে (দ.) তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হজরত

আবুবকর (রা.) কে নিয়োগ করতে বলেছেন বলেও কোন তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়নি। তাই আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নবি (দ.) কর্তৃক প্রকাশ্যে ঘোষণা অনুযায়ী হজরত আবুবকর (রা.) কে নিয়োগ করা হয়নি। ওপরন্তু, পবিত্র কোরআনে প্রদর্শিত বা নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী যে হজরত মুহম্মদ (দ.) এর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করা হয়নি তা সর্বজনবিদিত। এ কারণেই হজরত আবুবকর (রা.) এর নিয়োগের পদ্ধতি পঙ্খনুপুঙ্খ রূপে পর্যালোচনা করার বিশেষ দাবি রাখে।

খলিফা নির্বাচনের সময় হজরত আবুবকর (রা.) এর প্রার্থীতা ও নিয়োগ সম্পর্কে যেসব গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করা হয়েছিল তা' নিম্নরূপ–

১) তিনি কোরেশ গোত্রীয়।

২) তিনি জ্ঞানে গুণে মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

৩) তিনি রসুল (দ.) এর অনুপস্থিতিতে নামাজের ইমামতি করেছেন।

৪) তিনি সওর গিরিগুহায় রসুল (দ.) এর সঙ্গে ছিলেন তা কোরআনে উল্লেখ আছে বিধায় তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

৫) তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত।

কোরেশ গোত্রীয় কৌলিন্য ভিত্তিক বিচ্যুতি :

প্রকৃতপক্ষে গোত্রীয় কৌলিন্য বা প্রাধান্য বিলুপ্ত করার জন্য ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটেছে। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে : "হে মানব মন্ডলী ! এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে নানা গোত্র, নানা জাতিতে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। মূলতঃ আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানাই যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে। - আল হুজুরাত।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতেরই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় রসুল (দ.) এর নিম্ন বর্ণিত হাদিস সমূহে।

ক) হে মানব জাতি ! শোন, তোমাদের রব এক। অনারবের ওপর আরবের, আরবের ওপর অনারবের কোন মর্যাদা নাই। সাদার ওপর কালোর বা কালোর ওপর সাদার নেই কোন শ্রেষ্ঠত্ব। হ্যাঁ অবশ্য তাকওয়া বিচারে।

খ) মুসলমানগণ ভাই ভাই। কারও ওপর কোন ফযিলত (মর্যাদা) নেই কিন্তু তাকওয়ার ভিত্তিতে।

গ) আল্লাহ তোমাদের চেহারা এবং ধন সম্পদের দিকে তাকান না বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যাবলীর দিকে তাকান। (- তফসির ইবনে কাসির, মুসলিম এবং ইবনে মাজার উদ্ধৃতিতে ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৭ মস্তফা মুহম্মদ প্রেস, মিশর-১৯৩৭)।

হজরত আবুবকর (রা.) কে খলিফা হিসেবে নিয়োগ করার লক্ষ্যে যখন তার গোত্রীয় মর্যাদার উল্লেখ করা হয় তখন কার্যতঃ পবিত্র কোরআন ও রসুল (দ.) এর প্রত্যক্ষ নির্দেশের অনুপস্থিতির কথা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গোত্রীয় কৌলিন্য সম্পর্কে তাঁর উল্লেখিত বাণী থেকে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে এক বিচ্যুতির সূচনা হলো। পরবর্তীতে শুধুমাত্র গোত্রীয় প্রাধান্যের জন্য প্রকৃত তাকওয়া সম্পন্ন লোককে বড় বড় পদে নিয়োগ করা থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ সৃষ্টি হলো। অর্থাৎ উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকে নেতৃত্বের জন্য খোদা ভীরুতার শর্ত কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল এবং সকল রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব কোরেশ গোত্রের কুক্ষিগত হয়ে পড়ল। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের হোরতর শত্রু আবু জাহেলের পুত্র ইকরামা যে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম কবুল করে তাকে মুসলমানদের সেনাপতি নিয়োগ করে মুসাইলামার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। যেহেতু তিনি একজন নও মুসলিম ছিলেন তাই যখন ইকরামা জানতে পারলেন শোরাহবীল ইবনে হাসানকে তার সাহায্যের জন্য একটি বাহিনীসহ পাঠানো হয়েছে এবং তারা অনতি বিলম্বে ইকরামার সাথে যোগ দেবে তখন তা তার আসমানে লাগল। কারণ তার ইচ্ছা ছিল মসায়লামাকে পরাজিত করে বিজয় মাল্য তিনি একাই পাবেন। তাই তিনি শোরাহবিল আসার পর্বেই আক্রমণ করে বসলেন। (অর্থাৎ ব্যক্তিগত খ্যাতির লোভে এই যুদ্ধ করা হয়) কিন্তু মসাইলামার পাণ উৎসর্গকারী সৈন্যবাহিনী মুসলিম সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। ইকরামা পরাজয় বরণ

করে পলায়ন করলেন । এ সংবাদ পেয়ে হজরত আবুবকর (রা.) খুবই ক্ষুদ্ধ হলেন এবং ইকরামাকে ধিক্কারমূলক পত্র দিলেন–

“ইকরামার মায়ের সন্তান : (এই পরাজয় বরণ করার পর) আমি তোমার মুখ দর্শন করব না । তুমি এখানে ফিরে আসবে না, আসলে লোকের উৎসাহে ভাটা পড়বে...“হজরত আবুবকর (রা.) এর সরকারি পত্রাবলী (মকতুবাতে হজরত আবুবকর (রা.),পৃষ্ঠা-৩৭)

আপাত দৃষ্টিতে উল্লেখিত ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, গোত্রীয় কৌলিন্যই তাকে নিয়োগ করার প্রধান কারণ ছিল । প্রকৃতপক্ষে ইকরামাকে ধর্মীয় ও অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়োগ যথাযথ ছিল না ।

অন্যদিকে ইসলামের অন্য এক দুশমন আবু সুফিয়ান ও তাঁর স্ত্রী হিন্দা (যে হজরত হামজা (রা.) এর কলিজা চিবিয়ে ছিল) ও তাদের পুত্র ইয়াজিদ ও মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের দিন নিতান্তই জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ।

এই ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে সিরিয়া যুদ্ধে সেনাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ করা হয় । যুদ্ধে রোমীয় বাহিনী পরাজয় বরণ করে এবং সেনাপতি নিহত হয় । বিজয় সংবাদ প্রচারিত হওয়ার জন্য রোমীয় সেনাপতির ছিন্ন মস্তক মদিনায় পাঠিয়ে দেয়া হয় । নিহত ব্যক্তির মৃত দেহের সাথে এ ধরনের আচরণ প্রত্যক্ষভাবে রসুল (দ.) এর নির্দেশ লঙ্ঘন তা’ সর্বজনবিদিত । এ কারণেই হজরত আবুবকর (রা.) তার এহেন কাজে দুঃখিত হয়ে ইয়াজিদকে লিখলেন–

“আমার নিকট নিহত শত্রুর ছিন্ন মস্তক পাঠিওনা । পত্র ও সংবাদ পাঠানোই যথেষ্ট ।” (হজরত আবুবকর (রা.) এর সরকারি পত্রাবলী লেখক ড. খুরশিদ আহমদ ফারুক–পৃ-১২৫) ।

রসুল (দ.) এ ধরনের প্রত্যক্ষ নির্দেশ লঙ্ঘন করে নিষ্ঠ কর্মকান্ডের হোতা যে প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানদের আদর্শ নেতা হতে পারেনা তা প্রমাণ করার জন্য কোন ধর্ম গ্রন্থ গবেষণা করার প্রয়োজন নেই । ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান পরবর্তীতে প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণ করলে তার ছোট ভাই মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে ৬৩৯ সালে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করা হয় । এই গভর্নরই মদিনার কেন্দ্রীয় শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং পরবর্তীতে মুসলমানদের রাজা হয়ে পড়ে । তার রাজত্বকালে সে তার প্রতিপক্ষকে (যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন) হত্যা করে তাঁদের মস্তক কখনও নিহতদের স্ত্রীদের কাছে পাঠিয়ে বা রেখে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন ।

রসুল (স.) এর সঙ্গে আমর ইবনে আস এর কঠিন শত্রুতা ছিল । সে রসুল (দ.) এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের প্রোপাগান্ডা করতে এবং রসুল (দ.) এর নিন্দায় কবিতা পাঠ করতো । সে বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত রসুল (দ.) বিরুদ্ধে প্রাণান্তরকর যুদ্ধ করে । ৬২৭ খৃঃ তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । সিরিয়া অভিযান কালে তাকে দায়িত্বপূর্ণ পদে সমাসীন করা হয় । পরবর্তীতে মিসর জয়ের পর তাকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করা হয় । তার নিয়োগের ব্যাপারে হজরত ওমর (রা.) নিজেই লিখেছেন–

“........ বহু বদরি সাহাবি এবং তোমার চেয়েও ভাল ও যোগ্য বন্ধু লোককে বাদ দিয়ে আমি তোমাকে মনোনিত করেছিলাম । অথচ তুমি একজন অজ্ঞাত পরিচিতিহীন ছিলে ...... ।” (-হজরত ওমরের সরকারি পত্রাবলী, লেখক-খুরশিদ আহমদ ফারিক,পৃ-৩৭৩)

একবার হজ উপলক্ষ্যে হজরত ওমর (রা.) সমস্ত গভর্নরকে ডেকে প্রকাশ্য সমাবেশে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন । এদের বিরুদ্ধে কারোর ওপর কোন অত্যাচারের অভিযোগ থাকলে তা পেশ করতে পারো । সমাবেশে তার (ইবনুল আস) বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি অভিযোগ করলো যে, তিনি অন্যায়ভাবে তাকে ১০০ দোররা মেরেছেন । হজরত ওমর (রা.) বললেন : হে অভিযোগকারী, এসে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহর করো । শেষ পর্যন্ত ইবনুল আস’কে প্রতিটি বেত্রাঘাতের জন্য দু’ আশরাফি দিয়ে আপন পিষ্ট রক্ষা করতে হয় । (কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ: প.১১৬) ।

এই ইবনুল আসই সিফফীনের যুদ্ধে মাবিয়াকে বশর আগায় কোরআন গেঁথে ইসলামে কোরআন অবমাননার এক জঘন্যতম উদাহরণ সৃষ্টির পরামর্শ দেয় । এবং পরবর্তীতে দুমাতু জুন্দুলের শালিসে সে প্রতারণা ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে মাবিয়ার ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে চিরস্থায়ি বিবাদ ও বিদ্রোহের অর্গল খুলে দিলো ।

আবদুল্লাহ ইবনে সারাহ মুসলমান হওয়ার পর মুর্তাদ হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের সময় যে সব ব্যক্তি সম্পর্কে রসুল (দ.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এরা খানায়ে কা'বার গেলাফ জড়িয়ে ধরে থাকলেও এদেরকে হত্যা করো। সে ছিলো তাদের অন্যতম। প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সারির মুসলমানগণ ইসলামের বিজয়ের জন্য যারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, যাদের ত্যাগ কুরবানির ফলে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়েছে, তাদেরকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে এই ধরনের লোক মুসলমানদের নেতা হবে, তা অবিশ্বাস্য হলেও বাস্তবে এই আবদুল্লাহ ইবনে সারাহকে প্রথম দেওয়ান নিয়োগ করা হয়। এই পদটি প্রায় গভর্নরের সমমর্যাদা সম্পন্ন। পরবর্তীতে তাকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

কুফার তরুণ শাসনকর্তা সাইদ-বিন-আল আস ও অলীদের কর্মকান্ডের চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

কোরায়েশ গভর্নর অলীদের চরিত্রহীনতা, জুলুমবাজি, পানোন্মত্ত অবস্থায় ফজর নামাজের দুই রাকাতের (সুন্নত) পর সালাম না ফিরিয়ে পরবর্তী দুই রাকাত (ফরজ) আরম্ভ করায় তাকে আর কুফার গভর্নর হিসেবে বহাল রাখা সম্ভব ছিল না। তাই সাদ বিন আল্ আসকে কুফার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। কোরায়েশ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি বিধায় তার ভিতর কোরায়েশ বংশের যাবতীয় দোষ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। ওপরন্তু তার ভিতর আভিজাত্যের অহমিকা ছিল কিছু বেশি। এজন্য সে অ-কোরায়েশ লোকদিগকে হীন মর্যাদার লোক বিবেচনা করতো। বিশেষত কুফায় বেদুঈন সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি দেখে তার গা জ্বালা করে উঠল। বেদঈনগণ স্থানীয় কোরায়েশদের নিকট নতি স্বীকার (তার মতে) করত না। এজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে সে খলিফার নিকট লিখে পাঠালেন, "যে এখানকার লোকগুলো অতিশয় বেয়াড় ও বে-আদব। ইহারা নিচ বংশীয়। সুতরাং এই বিপুল সংখ্যক লোকদেরকে আমি লৌহ দন্ড দ্বারা শায়েস্তা করব।"

মোটকথা, তার আচরণে কুফার লোকগণ– অল্পদিনের মধ্যেই অনুভব করল যে এক কোরায়েশের পরিবর্তে অন্য কোরায়েশ এসেছে, যে আরও ভয়ানক। তাদের ভাগ্যোন্নতির আশা এতে কিছুই নাই। বলার অপেক্ষা রাখেনা শাসকগোষ্ঠী সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে এইরূপ হতাশা ও বীতশ্রদ্ধ মনোভাব শাসকদের প্রতি অবাধ্যতায় রূপান্তরিত না হয়ে যায় না।

এক বৈঠকে গভর্নর সাঈদ প্রকাশ করলেন যে সোয়াদ উপত্যাকাটি এক চেটিয়া কোরায়েশদের রক্ষিত উদ্যান। এতে অ-কোরায়েশ নেতবৃন্দ বিশেষতঃ ইয়ামেনের অধিবাসীগণ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, তবে কি আমাদের শক্তিশালী ও অব্যর্থ বর্শার সাহায্য ছাড়াই কোরায়েশগণ কখনও ঐ উদ্যানগুলো দখলে আনতে পারত ? ইহাতে ক্রমেই গণবিক্ষোভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হতে লাগল। পথে, ঘাটে, গঞ্জে, বাজারে, হোটেলে, রেস্তোরায় রাষ্ট্র বিরোধী আলোচনা এরূপ প্রকাশ্যভাবে শুরু হয়ে গেল। (খেলাফাতুল মুমিনিন হজরত ওসমান (রা.), মাওলানা মাজহার উদ্দীন, পৃ.৮৭)।

এই তালিকা আরও দীর্ঘ না করে বলা যায় যে, এইসব উচ্চ পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ প্রকৃতপক্ষে ইসলামি নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত ছিলেন না। কারণ তারা যদিও আপাত: দৃষ্টিতে ঈমান এনেছিলেন কিন্তু নবি করিম (স.) এর সান্নিধ্য ও ইসলামের জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার অথবা নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ইসলামি জীবন দর্শনের আদলে আমূল পরিবর্তনও তারা করতে পারেননি। তারা বস্তুতান্ত্রিক প্রশাসনিক দক্ষতা, ব্যবস্থাপক, উৎকৃষ্ট যোদ্ধা হতে পারেন তা ঠিক। এ ধরনের প্রশাসনিক যোগ্যতা ও দক্ষতা তো রোমানরা ও পারসিকরাও দেখিয়েছে। তাই এসব যোগ্যতাকে বড় করে না দেখে ইসলামের মূল আহ্বানের সাথে এদের কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষেই সংগতিপূর্ণ কিনা, তাই মুসলমানদের মূল বিবেচ্য বিষয়।

হজরত ওসমান (রা.) এর আমলে প্রায় সব গভর্নরই ছিলেন দূনীতিপরায়ন, ক্ষমতালিপ্স ও জুলুমবাজ। যে কারণে হজরত আলী (আ.) খলিফার পদে সমাসীন হয়েই এসব গভর্নরকে তাৎক্ষণিকভাবে পদচ্যুত করেন।

পরবর্তীতে কোরায়েশদের জাত্যাভিমান এতই বিকৃতি লাভ করে যে উমাইয়া রাজত্বকালে অ-কোরায়েশ নও মুসলিমদের নিকট থেকে জিজিয়া কর আদায়ের বিধান চালু করা হয়। হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এই কু-প্রথার অবসান ঘটানোর প্রয়াস নিলে রাজস্ব হ্রাস পাবে এই আশঙ্কায় দরবারি ওমরাহগণ তাঁকে তা থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলো।

তাই খোদা ভীরুতা, চারিত্রিক পবিত্রতা, কোরআন হাদিসের জ্ঞান ছাড়া শুধুমাত্র বংশগতভাবে কোরায়েশগণই নেতৃত্বের অধিকারী এই হাদিসের ব্যাখ্যাজনিত ক্রুটির অথবা নেতৃত্বের জন্য এসব অপরিহার্য গুণাবলী অস্বীকার করার কারণে ইসলামের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গত হজরত ওসামা ইবনে জায়েদ (রা.) কে সেনাপতি হিসেবে রসুল (দ.) কর্তৃক নিয়োগের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। হজরত ওসামা (রা.) ছিলেন একজন ক্রীতদাসের পুত্র। তাঁর বয়স ছিল ১৭-২০ বৎসর । যুদ্ধ বিদ্যায় তার কোন অসাধারণ যোগ্যতা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই একথা দিবালোকের মতই পরিষ্কার যে ইসলামে খোদাভীরুতা তথা রসুল প্রেমই নেতৃত্বের একমাত্র মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত। ত্রোত্র কৌলিন্য, বয়স, পূর্ব অভিজ্ঞতা, দক্ষতা তথা অসাধারণ সামরিক বা প্রশাসনিক যোগ্যতা কোনক্রমেই ইসলামের মাপকাঠিতে বিচার্য বিষয় নয়। উল্লেখ্য যে, পার্থিব তথা বস্তুবাদী বিশ্লেষণে রসুল (দ.) এর এই নিয়োগকে তাঁর ওফাতের পর কিছু সংখ্যক সাহাবি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু হজরত আবুবকর (রা.) মত প্রকাশ করেন যে, রসুল (স.) কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করে রসুল (দ.) এর নির্দেশ পালন করাই সকলের জন্য অধিক কল্যাণকর। এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তাই প্রমাণিত হয়েছিল ঐ যুদ্ধে হজরত ওসামা ইবনে জায়েদ (রা.) বিজয়ী হয়েছিলেন।

হজরত আবুবকর (রা.) এর ভাষণ :

মসজিদে নব্বিতে বায়আত ও শপথের পর হজরত আবুবকর (রা.) যে ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি বলেছিলেন–

"আমাকে আপনাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই।... মুসলমানদের মধ্যে মত বিরোধ এবং আরবদের মধ্যে ধর্মত্যাগের ফেতনার সুচনা হবে– আশঙ্কায় আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এ পদে আমার কোন শান্তি নেই। বরং এটা একটা বোঝা যা আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ বোঝা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। এখনও আপনারা ইচ্ছা করলে রসুল (দ.) এর সাহাবিদের মধ্য হতে কাউকে এ কাজের জন্য বাছাই করে নিতে পারেন। আমার বাইয়াত এ ব্যাপারে আপনাদের প্রতিবন্ধক হবে না। আপনারা যদি আমাকে রসুল (দ.) এর মানদন্ডে যাচাই করেন, তাঁর কাছে আপনারা যে আশা পোষণ করতেন, আমার কাছেও যদি সে আশা করেন, তবে তার ক্ষমতা আমার নেই। কারণ তিনি শয়তান থেকে নিরাপদ ছিলেন। তাঁর ওপর ওহি নাজিল হতো। আমি সঠিক কাজ করলে আমার সহযোগিতা করবেন, অন্যায় করলে আমাকে সোজা করে দেবেন। আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ.) এর অনুগত থাকি, তোমরা আমার অনুগত্য করা। আমি অল্লাহ ও রসুল (দ.) এর নাফরমানি করলে তোমাদের ওপর আমার কোন আনুগত্য নাই।" (খেলাফতে রাশেদা- মুহাম্মদ আব্দুর রহিম) হজরত আবুবকর (রা.) এই বক্তৃতা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, তা হলো–

ক. তিনি মানবিয় বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে তিনি ছিলেন না।

খ. যেহেতু জনগণের ভোটে বা রায়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাই জনসাধারণ তাঁকে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও সংরক্ষণ করতো।

গ. মানবিয় বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁকে খলিফা নিয়োগ না করা হলে আরবদের মধ্যে ধর্মত্যাগের ফেতনা শুরু হতো বলে তিনি মনে করতেন। এই অবস্থা এড়ানোর লক্ষ্যে তিনি বাধ্য হয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছেন। অর্থাৎ তিনি নিজেই জানতেন যে তিনি মুসলমানদের স্বাভাবিক নেতা ছিলেন না।

হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) এর খলিফা নির্বাচনের কথা শুনে হজরত আবু জর গিফারি বলেছিলেন ?

"হে কোয়েশ লোক সকল! নবিজির পরিজনকে (আহলে বায়াত) অবজ্ঞা করিয়া বড় ভুল করিয়াছ। আল্লাহর কসম, আরবের লোকেরা তাহাদের ঈমান হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহারা তাহাদের সাবেক আনুগত্য ও ধর্ম বিশ্বাস বদলাইয়া লইয়াছে। নবি পরিবারের হাতে যদি তোমরা খলিফা নিযুক্তির ভার দিতে তাহা হইলে কোন দুই দল একে অপরের প্রতি তলোয়ার তুলিত না। এখন যখন রসুলের (প্রকৃত) উত্তরাধিকারী আলীকে (আ) আসনচ্যুত করা হইয়াছে। তখন যে যথেচ্ছার খোঁজে সেই তোমাদের আনুগত্য জোগাড় করিয়াছে এবং ইহার পরেই অপদার্থেরা খেলাফতের আশায় আগ্রহান্বিত হইতেছে। আর ঐ প্রতিযোগিতায় খুন-খারাবিও ঘটিতে যাইতেছে।

...হে লোক সকল! তোমরা ভালোভাবেই অবগত আছ যে নবিজি আলীকে তাঁহার ওছী (উত্তরাধিকারী) ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আলীর পরে হাসান (আ.), হাসানের (রা.) পর হুসাইন (রা.) এবং তাঁহাদের পরে এই পরিবারের পবিত্র বংশধরদের কথাও একে একে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা রসুল (দ.) এর হুকুম ভুলিয়া গিয়াছ । আর যে বাইয়াত (গাদেরি খুম ও অন্যান্য স্থানে) তোমরা দিয়াছিলে, তাও বিস্মৃত হইয়াছে ? যেখানে যৌবন অক্ষয়, সেখানে বার্ধক্য কখনো আসেনা, সেখানে মঙ্গল কল্যাণ চিরস্থায়ি যেখানে দুঃখ বেদনা অজ্ঞাত, সেই ফেরদৌস তোমরা বিক্রি করিয়া দিয়াছ, তোমরা পার্থিব অস্থায়ি অনিত্য জীবনের খাতিরে এসব বিক্রয় করিয়া দিলে। তোমরা যে দাম দিয়াছ, তাহা খুবই অল্প ও অস্থায়ি । ঠিক এইরূপ ব্যবহার অতীত নবিদের সন্তান সন্ততির প্রতিও করা হইয়াছিল এবং যাহারা নবিদের সন্তান সন্ততির মোকাবিলায় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল আর ঈমানকে কলুষিত করিয়াছিল, তাহারা কাফির হইয়া গিয়াছিল। তোমরা সেইসব লোককেই অনুসরণ করিতেছ। তোমরা রসুলের (দ.) পরিবার ও সম্পর্ক লঙ্ঘন করিয়াছ । কিন্তু অচিরেই সময় আসিতেছে ধ্বংস তোমাদের প্রতিদান হইবে যে অন্যায় তোমরা করিতেছ সেজন্যই। (তাবরাসি, ইহতিজাজ ও উল্লেখ, THE MUSLIM REVIEW, MARCH, 1949 (P.P. 99-105) ARTICLE -ABU ZARR AL-GHAFARI : A SINCERE FRIEND BY SYED SIBTUL HASAN HANSAVI, (ইতিহাসগত বিভ্রান্তির রহস্য-মুফাখখারুল ইসলাম, পৃ. ১৬)

হজরত আবু জর গিফারির (রা.) এর বক্তব্যের এই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। হজরত আবুবকর (রা.) এর পুত্র মোহাম্মদের পত্রে যা তিনি মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের কাছে লিখেছিলেন–

“যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নবুওয়াতের স্বীকৃতি দান করেন এবং আদ্বীনকে আলিংগন করেন তিনি হলেন আবু তালেব পুত্র আলী (আ.)। যিনি ভয় ও কষ্টের সকল পরিস্থিতির মধ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া রসুল (দ.) কে রক্ষা করিবার জন্য একাত্ম হইয়া রসুল (দ.) পাক এর সংলগ্ন হইয়া থাকিতেন। তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন যাহারা রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত এবং তাহাদের সাথে সন্ধি করিতেন, যাহারা রসুলের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইতেন। রসুল (দ.) পাককে রক্ষা করিবার জন্য ভয় ও বিপদের সকল পরিস্থিতির ওপর তিনি সর্বদাই জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। এই সকল গুণে তিনি সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন এবং সৎকর্ম অনুশীলনে কেউই তাহার সমকক্ষ নয় এবং আদর্শ চরিত্র। আমি লক্ষ্য করিতেছি যে তুমি নিজেকে আলী (আ.) চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছ অথচ তুমি তাহাই আছ এবং আলী (আ.) যাহা তিনি তাহাই আছেন।”...ধর্ম বিশ্বাসে সরল হওয়ার কারণে আলী (আ.) হইলেন সবচেয়ে বেশি সত্যাশ্রয়ী এবং তার সন্তানাদি সবার চাইতে উত্তম হওয়ার কারণে এবং তিনি ফাতেমা (আ.) স্বামী হওয়ার কারণে তিনি হলেন সবার শ্রেষ্ঠ তাঁর চাচা হজরত হামজা (রা.), ওহুদ যুদ্ধের ‘বীর শহিদ’ শিরোনাম খেতাব লাভ করেছেন এবং তার পিতা একমাত্র যিনি রসুল (দ.) কে তাঁর সবচেয়ে কঠিন দিনগুলোতে সাহায্য করেছেন।...আলী হলেন আল্লাহর যথার্থ এবং সত্য সাক্ষী এবং সত্যের এমন একজন মর্যাদাপূর্ণ সাহায্যকারী যে কোরআনে আল্লাহপাক তাঁর সৎকর্মের উল্লেখ করেছেন। আলী (আ.) কে অনুসরণ করাই সত্যকে অনুসরণ করা এবং তাঁকে অমান্য করাই বিপথগামী হওয়া। যেখানে আলী (আ.) হলেন নবি (দ.) এর রেসালতের উত্তরাধিকারী এবং মনোনীত অসি আর আলী (আ.) এর পুত্রগণ হলেন রসুল (দ.) এর পুত্র ...। রসুলের অনুসরণ বিষয়েও সবার শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর নৈকট্য লাভেও সবার উপরে অধিষ্ঠিত। আলী (আ.) হলেন একমাত্র ব্যক্তি যাকে রসুল (দ.) সমস্ত জ্ঞান ও তাঁর সমস্ত রহস্য শিক্ষা দিয়েছেন।”

মোহাম্মদ ইবনে আবুবকরের (রা.) পত্রের উত্তরে মাবিয়া লিখলেন– দয়া করে সুরণ করুন যে, আপনার পিতাসহ আমরা সবাই আলী (আ.) এর বিরাট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলীর বিষয়ে এবং তার ন্যায়সঙ্গত দাবির বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত। দয়া করে লক্ষ্য করুন যে, রসুল (দ.) এর কর্ম যখন পরিপূর্ণতা লাভ করল এবং তাকে ডেকে যখন আল্লাহ ফেরত নিয়ে গেলেন, তখন পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়ে আপনার পিতা (আবু বকর রা.) এবং খলিফা ওমর (রা.) কেবল আলীর (রা.) অধিকার জবর দখল করেছিলেন এবং তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার বাতিল করে ছিলেন। আলী (আ.) এর নিয়োগে তাঁরা বাধা দিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে যেন আলী (আ.) তাদের আনুগত্য গ্রহণ করেন। কিন্তু আলী (আ.) ইহা ছাড়িয়ে গেলেন এবং নিজে সরে রইলেন। আলী (আ.) এইরূপ সরে থাকার কারণে উভয় খলিফা এমন মারাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন যে আলী (আ.) তাদের আনুগত্য

গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই খলিফাগণ আলীকে (রা.) তাদের কর্মসংঙ্গী করেন নাই এবং খলিফাদ্বয়ের মৃত্যু ও ওসমান (রা.) তাদের উত্তরাধিকারী হওয়া পর্যন্ত তাদের গ্রোপন বিষয়ের কোন কিছুই তারা আলীকে (রা.) জানান নাই। তিনি (ওসমান রা.) তাঁর পূর্ববর্তীগণের নীতি অনুসরণ করলেন। সুতরাং তোমার কথা অনুসারে আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু যদি সত্য হয় তা হলে জেনে রেখ যে, তোমার পিতা এই সকল অন্যায় কর্মের জন্মদাতা এবং আমরা সবাই তার কর্মেরই অংশগ্রহণকারী মাত্র। আলীর (রা.) বিষয়ে তোমার পিতা যদি এইরূপ না করতেন তাহলে আমরাও আলীর (রা.) বিরোধিতা করতাম না বরং আমরা সবাই তাকে মান্য করেই চলতাম। সুতরাং আমরা যখন তোমার পিতাকে এইরূপ করতে দেখলাম তখন আমরা শুধু তাকে অনুসরণ করে গেলাম এবং তার রেখে যাওয়া পদ্ধতির উপরেই আমরা কাজ করলাম। এখন যদি তুমি আমাদিগকে দোষী করতে চাও, তবে প্রথমতঃ তোমার নিজের পিতাকে দোষী কর, অথবা এইভাবেই চলতে দাও। ইহাতে কোন দোষ ধরো না। –(ইতিহাস বিভ্রান্তির রহস্য, মুফাখরুল ইসলাম, পৃ. ১৫৭, আহমদ জাকি সাফওয়াত, তরজুমা আলী ইবনে আবি তালিব ঃ মিসরি সংস্করণ। সুবহুল আশা, প্রথম খন্ড, কৃত শেখ আবিল আব্বাস আহমদ কালা কোহাদভি, দারুল কুতুব-মিসর হিজরি ১৩৪০ (ইং ১৯২২ প্রকাশিত) উল্লেখ ও MUSLIM REVIEW, LUCKNOW) MARCH, 1957 Page 17-18, সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আবু সুফিয়ান প্রসঙ্গ)।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মাবিয়া সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে কেন্দ্রিয় খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সম্পূর্ণরূপে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করার বিষয়টির যৌক্তিকতা প্রমাণ করার লক্ষ্যেই হজরত আবুবকর (রা.) সম্পর্কে ক্ষমতা জবর দখলের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আবুবকর (রা.) নিজেই এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, "যে সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন ন্যাস্ত আমি নিজে ইচ্ছা করে এ পদ গ্রহণ করিনি। অন্যের পরিবর্তে আমি নিজে তা লাভের চেষ্টাও করিনি। এজন্য আমি কখনো আল্লাহর নিকট দোয়াও করিনি। এ জন্য আমার অন্তরে কখনো লোভ সৃষ্টি হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে মত বিরোধ এবং আরবদের মধ্যে ধর্মত্যাগের ফিতনার সূচনা হবে– এ আশঙ্কায় আমি অনিচ্ছা সত্বেও এ পদ গ্রহন করেছি।"

হজরত আবুবকর (রা.) এর মত মহান ব্যক্তির এ বক্তব্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে অন্য কোন ধারণা পোষণ করাও মহাপাপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

হজরত আবুবকর (র) রসুল (দ.) এর সার্বিক প্রতিনিধিত্ব :

রসুলগণ আল্লাহ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন এবং তিনি যাকে নবি হিসেবে মনোনীত করেন তার প্রতি সব সময় বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখেন এবং সব সময়ই তাকে ওহি দ্বারা পথ প্রদর্শন ও নির্দেশ প্রদান অব্যাহত রাখেন। এভাবে যাতে তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে নির্ভুলভাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন এবং তার দ্বারা আল্লাহর অপছন্দনীয় কোন কাজ না করেন বা না বলেন তার নিশ্চয়তা বিধান করেন। বস্তুতপক্ষে মহান আল্লাহ নবিদেরকে নিজেদের খেয়াল খুশি মত চলার কিংবা মতামত বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে চলার অবাধ স্বাধীনতা দেননি। যেহেতু তারা সাধারণ মানুষকে সুপথে পরিচালিত করার জন্যই নিয়োজিত। তাই প্রতিনিয়ত আল্লাহর হুকুম কড়াকড়িভাবে মেনে চলতে এবং কোন ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও আল্লাহর অপছন্দনীয় পথ অনুসরণ না করতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণেই পবিত্র কোরানে আপাতঃ দৃষ্টিতে একজন সাধারণ মানুষের জন্য যা ক্ষুদ্রতম বিষয় সে সকল ব্যাপারেও নবিকে (দ.) নির্ধারিত সীমারেখা অনুসরণ করার জন্য তাকিদ দিয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একজন মানুষের মধু খাওয়া না খাওয়া, একজন অন্ধের দিকে মনোযোগ না দেয়া এবং সে তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় হস্তক্ষেপ করায় বিরক্ত হওয়া, কারো জন্য দোয়া প্রার্থনা করা, অনুরূপভাবে যুদ্ধে যাওয়া থেকে কাউকে অব্যাহতি দেয়া এবং কিছু যুদ্ধবন্দীকে পণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই সব ঘটনাগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে কারণে পবিত্র কোরআনে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ আল্লাহর নবি সাধারণ নেতার মত নয় যে নিজ বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী যা খুশি তাই করতে পারবেন। নবুয়তের মহান দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার কারণে নবির নিজস্ব বিচার বিবেচনাও অভ্রান্তভাবে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক হতে হবে। তিনি নিজের বিবেকবুদ্ধি খটিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর গোপন ওহির ইংগিত সার্থকভাবে অনুসরণ করাই নবুয়তের পবিত্র দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে

রসুল (দ.) এর প্রকৃত খলিফাকে আল্লাহর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের অধীন হতে হবে তা না হলে তার অনুসরণকারীদের সমূহ ভুল পথে পরিচালিত হয়ে দুনিয়াবী অশান্তি ও আখেরাতে ক্ষতির শিকার হতে হবে। ওপরন্তু পৃথিবীর কোন কর্মকান্ডই বিচ্ছিন্ন নয় বরং তা এক গভীর রহস্যের মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ রহস্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্যই আমরা ছোট বা বড় ঘটনা ক্ষতিকারক বা উপকারী বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু যে কোন ক্ষদ ঘটনা বা বিষয়ই হোক না কেন তা যে কত বড় ধরনের ঘটনা বা বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, তা' একজন গড়পড়তা বুদ্ধিমান লোকই সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন। তাই রসুলের (দ.) প্রতিনিধির প্রতিটি কর্মকান্ডের পভাব তাঁর অনুসারীদের ওপর অপওিসিম। এ কারণেই বসলের (দ.) উত্তরাধিকারীদের আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় নিয়োগ হয়ে থাকেন এবং তা' রসুল (দ.) স্বয়ং ঘোষণা করে থাকেন।

"আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও রসুল (দ.) এর অনুগত থাকি, তোমরা আমার আনুগত্য করো। আমি আল্লাহ ও রসুল এর নাফরমানি করলে তোমাদের ওপর কোন আনুগত্য নাই।" হজরত আবুবকর (রা.) এর উক্তি থেকে যে বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা হলো তাঁর নিয়োগ বা আনুগত্য ছিলো শর্ত সাপেক্ষ অর্থাৎ যেহেতু তিনি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বলে মনে করতেন (আল্লাহ বা তার রসুল কর্তৃক নয়। তাই তার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা জনগণের সমর্থনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে নবিদের নিয়োগ কর্তা হলেন বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের মালিক আল্লাহ রাব্দুল আলামিন এ কারণেই নবি বা রসুলকে বরখাস্ত করার ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র ক্ষমতা প্রাপ্ত। কোন ব্যক্তি। জনগণ/ প্রতিষ্ঠান নয়। এ ব্যাপারে কারো কোন ক্ষমতাই নাই। হজরত মুহম্মদ (দ.) ও মানুষের নির্বাচিত বা মনোনীত আমির ছিলেন না। তিনি নিজে নিজেও তা' হননি। তিনি ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতা। নেতা হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা ছিল তারসুল হিসেবে তার ভূমিকা থেকে ভিন্নতর ছিলনা। বরং প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহর রসুল হিসেবেই মানুষের নেতা ছিলেন। আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে তিনি নেতা বা আমির ছিলেন না বরং ছিলেন আল্লাহর আজ্ঞাবহ। নিজের অনুসারীদের সাথে পরামর্শ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল; একথা ঠিক। তবে এ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে না যে তিনি সাধারণ জনগণের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য ছিলেন। যেমন নাকি পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে। তুমি তাদের ক্ষমা করো, তাদের জন্য খোদার নিকট মাগফিরাত চাও। আর জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো। অনন্তর তুমি যখন কোন সংকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে।" আল ইমরান-১৫৯। অর্থাৎ সাধারণ জনগণের রায় বা পরামর্শ তাদের কাছে পছন্দনীয় না হলেও তার রসুল (দ.) এর সিদ্ধান্ত অনুসারীদের জন্য অবশ্য পালনীয়। রসুল (দ.) এর নির্দেশ প্রতিপালনের ব্যাপারে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা যদি মোমিন হয়ে থাক, তবে আল্লাহ ও রসুলের কথামত চল (আনফল-১)। শুধু তাই নয় বরং "যারা রসুল (দ.) এর জেহাদের ডাকে সাড়া দিতে মনে মনে ইতস্তত করতেন তাদেরকে তিরস্কার করো।"

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসুলের সাথে বাদানুবাদ করে তার জেনে রাখা উচিত যে আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" (আনফল-১৩)

পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তালা স্বয়ং রসুল ও পয়গম্বর নিয়োগ করে থাকেন এবং তিনি তার সকল কর্মকান্ডের জন্য নিয়োগকারী হিসেবে আল্লাহতা'লার নিকট দায়ি থাকেন। নিয়োগের পূর্বে তাদেরকে এই মর্মে অঙ্গীকার করানো হয়ে থাকে যে তারা আল্লাহর নির্দেশাবলী সম্পূর্ণরূপে মেনে চলবেন। এই নিয়োগ স্থায়ি (Permanent) নিয়োগ বিধায় এমন কোন ব্যক্তিকে এ পদে নিয়োগ করা হয় না যিনি পরবর্তীতে কোন কারণে এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়তে পারেন। তাছাড়া এটা আল্লাহতালার নিজস্ব নিয়োগ বিধায় তা সব ধরনের ক্রটিমুক্ত। এ কারণেই নায়েবে রসুলের পদে নিয়োগের ক্ষমতা আল্লাহর এখতিয়ারাধীন থাকাই ন্যায় বিচার ও যুক্তির খাতিরে গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু আমরা হজরত আবুবকর (রা.) এর খলিফা নিয়োগের ক্ষেত্রে আল্লাহ বা তার রসুলের কোন নির্দেশ পাইনা বরং তিনি জন সমর্থনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং তিনি নিজেই ঘোষণা করেন যে, যতদিন তিনি সাধারণের মতে (আল্লাহর দৃষ্টিতে নয়) সঠিক পথে থাকবেন ততদিনই শুধু তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। অন্যথায় জনগণ তাকে পদচ্যুত করার অধিকার সংরক্ষিত করে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে,

সাধারণ লোকের অধিকাংশই আবেগ/নফস দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, তাই তাদের সমর্থন সব সময় সঠিক হবে এমন আশা করাও বাতলতা মাত্র। বরং আল্লাহতা'লা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এই ধারণার পরিবর্তে জনগণই সকল প্রকার ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব আল্লাহতা'লার এই কনসেপ্টের পরিবর্তে জনগণই সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার উৎস এই ধারণা সমাজে চালু হয়। এই শর্ত সাপেক্ষে নিয়োগের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করে। এই নিয়োগের মাধ্যমে মুসলিম জনসমাজে তাদের নেতা বা আমির নিয়োগের ব্যাপারে আল্লাহর মনোনয়নের ব্যাপারটি কার্যত অস্বীকার করা হয়। ফলে নায়েবে রসুল তথা উলিল আমরকেও আল্লাহর তরফ থেকে নিয়োগ করা হয় একথা মুসলিম জনসমাজ বিস্মৃত হয়। অর্থাৎ জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অংগীকারের সাথে সম্পর্কহীন শুধুমাত্র জনসমর্থন কোন ইসলামি রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। আল্লাহ ও জনগণের মধ্যে সংযোগকারী বা সেতুবন্ধন হিসেবে 'নায়েব রসুলের' কনসেপ্টই রাষ্ট্রীয় তথা প্রচলিত ধর্মীয় চিন্তাধারা থেকে চির বিদায় গ্রহণ করে। ইসলাম কার্যত ধর্ম ও রাষ্ট্র দই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ জনগণের সমর্থন পাস্ত ব্যক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং আল্লাহর মনোনীত 'উলিল আমর' ধর্মীয় কর্মকান্ডে প্রভাব বিস্তার করবেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে 'উলিল আমর' সমাজে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ পরিচালনার অধিকারী ব্যক্তি। কেবলমাত্র আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিগণই আল্লাহর মনোনীত মতে শাসন পরিচালনা করতে সক্ষম। ধরার বুকে কেবল তাদের দ্বারাই আলাহ তার শাসন প্রতিষ্ঠা করবার জন্য উপযুক্ত হোগ্যতা দান করে তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় যোগ্য ব্যক্তিতই তৈরি করে থাকেন। আল্লাহতালার নিজস্ব ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন লোক এই পরিচালনা জ্ঞান পেতে পারে না। অতএব, যে ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ হতে ঐশি নির্দেশ বা এলহামের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকবে সে ব্যক্তি কখনও 'উলিল আমর' তথা নায়েবে রসুল অথবা রসুলের প্রকৃত প্রতিনিধি হতে পারে না। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে হজরত আবুবকর (রা.) হজরত ওমর (রা.) এবং হজরত ওসমান (রা.) এর পরিচালিত খেলাফতের ব্যাপারে বা সমর্থনে কোন কোরআনী আদেশ বা নির্দেশ নাই বরং তা পরস্পর বিরোধী হাদিসের সমর্থনে সৃষ্ট এবং তাঁদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট বা বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে আল্লাহর রসুল তার প্রতিনিধি, ওসি, মওলা, উলিল আমরের বিষয় এবং আহলে বায়াতের মর্যাদার বিষয়গুলি পবিত্র কোরআনের শত শত আয়াতের মাধ্যমে সমর্থিত ও সুপ্রমাণিত।

হজরত আবুবকর (রা.), হজরত ওমর (রা.) ও ওসমান (রা.) এর নিয়োগ আল্লাহ বা তাঁর রসুল (দ.) এর নির্দেশ বা ইংগিত অনুযায়ী হয়নি বিধায় তারা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এ কারণেই দেখা যায় হজরত আবুবকর (রা.) খলিফা হিসেবে যত টাকা 'বায়তুল মাল' থেকে জীবিকা ভাতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তার সমুদয় অর্থ বায়তুল মালে ফেরত দিয়েছিলেন। (ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি, সাইয়েদ কুতুব, পৃ. ৬০)

হজরত ওমর (রা.) নিজেই খলিফা ছিলেন না বাদশাহ ছিলেন এই সংশয়ে পড়েছিলেন। তিনি এক মজলিসে বলেন : "আল্লাহর কসম, আমি এখনও বুঝতে পারছিনা যে আমি বাদশাহ না খলিফা। যদি আমি বাদশাহ হয়ে থাকি, তবে তা তো এক সাংঘাতিক কথা।" (তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩৬, ৩০৭)

তাছাড়া রসুল (দ.) এর খলিফা পদবী বাদ দিয়ে হজরত ওমর (রা.) বিতর্ক পরিহার করে রাষ্ট্রপ্রধানের পদবীতে আল্লাহ ও রসুল (দ.) শব্দ ব্যতিরেকে এক নতুন পদবী 'আমিরুল মোমেনীন' গ্রহণ করলেন –যা অদ্যাবধি চালু আছে বলে বিবেচনা করা হয়। লোকে এই পদবীকেই কোরআন ও রসুল (দ.) সমর্থিত ও মনোনীত উপাধি হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র প্রধানের এই পদবী নির্দেশ করে যে শাসন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মুসলমান প্রজাদের শাসক বা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নেতা। তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর হুকুমই আইন। কোরআন ও হাদিসের যে ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করবেন বা অনুমোদন করবেন তাই কোরআন ও হাদিসের সঠিক ও অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা না হলেও রাষ্ট্রীয় বিধান হিসেবে চালু হবে বা থাকবে। অর্থাৎ আমিরুল মুমেনিন পদবীর সাথে ধর্মীয় কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্কের তত্ত্ব সমাজ থেকে কার্যত বিদায় গ্রহণ করে। এ কারণেই পরবর্তীতে মুসলমানদের নেতা 'আমিরুল মুমেনিন' হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন কিন্তু 'নায়েবে রসুল' বা উলিল আমর হিসেবে তাঁর দাবি সমাজে গ্রহণযোগ্য হতো না।

মানবিয় বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা :

রসুল (দ.) এর ওফাতের কয়েক দিন পূর্বে হজরত যায়েদের পুত্র ওসামা (রা.) এর নেতৃত্বে এক বিরাট সেনাদলকে সিরিয়া অভিযানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এই সেনাবাহিনীতে হজরত আবুবকর (রা.), হজরত ওমর (রা.) কেও উসামার (রা.) অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ রসুল (দ.) স্বয়ং দিয়েছিলেন। কিন্তু রসুল (দ.) এর পীড়ার সংবাদ শ্রবনে এই যাত্রা স্থগিত রাখা হলো। এবং রসুল (দ.) ওফাতের পর সেনাদল মদিনায় ফিরে আসে। হজরত আবুবকর (রা.) খলিফা হওয়ায় সার্বিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করল। উসামার (রা.) অধীনে কাজ করবেন এমন একজন ব্যক্তি খলিফা নিয়োজিত হওয়ায় অবস্থা অধিক জটিল আকার ধারণ করল। পরবর্তীতে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব পরিবর্তন করে কোন যুদ্ধে অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তিকে সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু হজরত আবুবকর (রা.) এর দৃঢ়তার জন্য ওসামার (রা.) এর নিয়োগে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। তবে রসুল (দ.) এর ওফাতের ১৯ দিন পরে যাত্রার সময় যুদ্ধে উপস্থিত হলে হজরত আবুবকর (রা.) ওসামার নিকট একটি আবেদন পেশ করলেন : "তোমার অনুমতি হলে– হজরত ওমরকে (রা.) আমি ফিরে পেতে চাই। সে আমার পাশে থাকলে আপদে বিপদে আমি তার পরামর্শ নিতে পারব।" ওসামা (রা.) খলিফার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

এই ঘটনায় প্রতীয়মান হতে পারে যে, রসুল (দ.) নির্দেশ পালন মানবিয় সুযোগ সুবিধা বা অসুবিধার অধীন। অধিকতর পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় রসুল (দ.) এর নির্দেশ পালন কোন ব্যক্তি বিশেষের বা বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি মানবিয় বুদ্ধি অনুযায়ী অসুবিধাজনক বিবেচিত হয়, সেক্ষেত্রে এই নির্দেশ সাময়িকভাবে স্থগিত এবং এমনকি সংশোধন বা পরিবর্তন করাও ধর্মীয় যুক্তি অনুযায়ী অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ এবং তা কোনক্রমেই পাপ, গুণাহ বা ক্ষতিকারক নয়, এই মর্মে ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় রসুল (দ.) এর এই নির্দেশ সঠিকভাবে পালিত হলে ইসলামের ইতিহাসে যে কি অসাধারণ উপকার বয়ে আনতো তা আমরা আজ কল্পনাও করতে পারছি না। আর এই নির্দেশ যথার্থভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় আমরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি সে বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও চেতনা নেই। বরং রসুল (দ.) এর নির্দেশ পালন না করার স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় রসুল (দ.) এর নির্দেশ ও সাধারণ লোকের নির্দেশকে কার্যত এই পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের বিধবা নারীদের বিবাহের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা ইদ্দত অর্থাৎ চারমাস দশ দিন পূর্ণ করবে তখন তারা নিজেদের জন্য কোন বিধিমত ব্যবস্থা (বিবাহ) করলে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে ভাল করেই জানেন। আর তোমরা যদি আভাসে ইংগিতে উক্ত নারীদের বিবাহ প্রস্তাব কর বা অন্তরে তা গোপন রাখ, তাতে তোমাদের দোষ হবে না। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্পর্কে আলোচনা করবে।

কিন্তু বিধি মত কথাবার্তা ছাড়া গ্রোপনে তাদের কাছে কোন অঙ্গীকার করো না। নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করোনা। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। তাই তাকে ভয় কর, আর জেনে রাখ আল্লাহ তো ক্ষমা করেন, সহ্য করেন। -(সুরা বাকারা, ২৩৪-২৩৫)। বার হিজরির (৬৩৪) রবিউল আওয়াল মাসে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা মুরতাদের বিরুদ্ধেই বড় যুদ্ধ নয় বরং তা আরব উপদ্বীপের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ বলাই যুক্তিযুক্ত। এই যুদ্ধে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসাইলামার সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার আর মুসলিম বাহিনীর সেনা সংখ্যা ছিল ছয়/সাত হাজার। অভিযোগ করা হয়েছিল এই যুদ্ধের শেষে খালেদ বিন ওয়ালিদ মালেক ইবনে নেয়াইয়াকে হত্যার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন এবং তার অব্যবহিত পর তার স্ত্রী লায়লাকে বিয়ে করেন। এই যুদ্ধে যেদিন ১২০০ শীর্ষ স্থানীয় সাহাবি শহিদ হন। এর অব্যবহিত পরের দিন প্রত্যুষে খালেদ মাহজায়ার এই মেয়েকে বিবাহ করেন।

এ ব্যাপারে হজরত আবুবকর (রা.) খালেদকে পত্র লেখেন :

"খালেদের মায়ের সন্তান! তুমি ধৈর্যহীন মহিলাদেরকে বিবাহ করে আনন্দ উপভোগ করিতেছ। অথচ বার শত মুসলমানের রক্ত এখনও তোমার দরজা হতে শুকায় নাই। অতঃপর মুজজায়া তোমাকে ধোকা দিয়ে সঠিক

কর্মপন্থা অনুসরণ করা হতে বিরত রেখেছে। সে তার সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে সন্ধি স্থাপন করেছে। অথচ আল্লাহ তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে তোমার আয়ত্বে এনে দিয়েছিলেন।" (হজরত আবু বকর (রা.) সরকারি পত্রাবলী, ড. খুরশিদ আহমেদ ফারেক, পৃ.৪১)।

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে খালেদ যে জবাব দেন তা' আপাত: দৃষ্টিতে হজরত আবুবকর (রা.) এর নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু খালেদের (রা.) মারাত্মক ত্রুটিসমূহ ওমর (রা.) এর বিবেকে চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল; খালেদের অন্যান্য গুণাগুণের কোনটাই তা দমন করতে সক্ষম হয়নি। কোনটিই খালেদকে সেনাপতিত্ব থেকে এবং পরে খোদ সেনাবাহিনী থেকে অপসারিত করার স্বপক্ষে তার অভিমতকে পরিবর্তিত করতে পারেনি।" (-ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি, সাইয়েদ কুতুব)

একই ঘটনায় দুই মহান খলিফার কোরআনী নির্দেশ পালনের ব্যাপারে দুই ধরনের কর্মপন্থা মুসলিম উম্মাহকে এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন সঠিক সিদ্ধান্ত / মতামত নিতে দ্বিধান্বিত করে তুলেছে। যদি বিবেচনা করা হয় যে খালেদের (রা.) কার্যক্রম ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক ছিল তাহলে কি একথা মনে করার সুযোগ সৃষ্টি হয় যে কোরআনের উক্ত নির্দেশ পালনের ব্যাপারে ব্যক্তি বিশেষের ছাড় আছে বা থাকতে পারে। আর যদি সে সুযোগ থাকে তাহলে হজরত আবুবকর (রা.) এর সিদ্ধান্ত কি সঠিক ছিল। আর যদি হজরত আবুবকর (রা.) এর সিদ্ধান্ত সঠিক থাকতো তাহলে হজরত ওমর (রা.) খালিদ এর মত এত বড় বীরকে সামরিক বাহিনী থেকে কোন অপরাধে অপসারণ করলেন।

কোরআনের এই নির্দেশ অমান্য করার প্রকৃত শাস্তি বা কি। যদি খালিদ প্রকৃতপক্ষে নিরপরাধই হয়ে থাকেন, তাহলে খলিফা ওমর কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে তার ওপর অন্যায় করেছেন ? অর্থাৎ আলোচ্য ঘটনা থেকে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাজনিত একাধিক সিদ্ধান্ত হতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি বিশেষের বিচারে একজন নিরপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন, আবার অন্য বিচারকের দৃষ্টিতে তার চাকুরিচ্যুতির মত শাস্তি প্রদান করা হতে পারে। যদি বিবেচনা করা হয় যে, হজরত খালেদ (রা.) এর বীরত্বের গুরুত্ব দিয়ে লোকে আল্লাহকে অস্বীকার করছে। এ ধারণা যে কতখানি অযৌক্তিক তা বলাই বাহুল্য যুক্তির দৃষ্টিতে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

পবিত্র কোরআনে রসুল (দ.) এর আহলে বায়াতকে প্রদেয় সম্পত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "আর তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করিয়াছ, উহার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তাঁহার রসুল এবং তাহার আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকিন ও পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট।" - (সুরা আনফল, ৫ম রুকু, আয়াত ৬৩)।

সুরা হাশরের ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যা কিছুই আল্লাহ এই জনপদের লোকদের হতে তার রসুলের দিকে ফিরিয়ে দিলেন, তা আল্লাহ রসুল এবং তার আত্মীয় স্বজন, এতিম, মিসকিন ও পথিকদের জন্য।"

রসুল (দ.) এর আত্মীয় স্বজনদেরকে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে এক নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। সম্ভবত এই বিবেচনা করে যে, রসুল (দ.) সকল সময় ধর্মীয় কর্মকান্ডে ব্যস্ত থাকতেন। নিজস্ব অর্থনৈতিক চিন্তা ভাবনা এবং সেই জন্য কোন অবসর বা সুযোগ তাঁর ছিল না। তাই তাঁর নিজের, তার পরিবার পরিজনের এবং তার যেসব নিকটাত্মীয়ের ভরণ পোষণের দায়িত্ব একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে শরিয়ত মতে তার ওপর অর্পিত ছিল। এ কারণেই এই গনীমতের এক পঞ্চমাংশ তাঁর নিকটআত্মীয়দের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। ওপরন্তু নবি ও নবি পরিবারের সদস্যদের জন্য সদকা/জাকাত লব্ধ অর্থ গ্রহণ নিষিদ্ধ বা হারাম হিসেবে বিবেচিত।

পক্ষান্তরে একজন সাধারণ মুমেনের ওফাতের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন পদ্ধতি সুরা নিসার দ্বিতীয় রুকুতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্যি যে রসুল (দ.) ওফাতের পর হজরত আবুবকর (রা.) 'বাগে ফেদাক' রাষ্ট্রয়াত্ব করে নিলেন। হজরত রসুল (দ.) ইহা ফাতেমা জাহরাকে (আ) দান করেছিলেন। তিনি (ফাতেমা আ.) স্বয়ং হজরত আবুবকরের নিকট মসজিদে নবিতে যেয়ে হাজির হলেন। উক্ত বাগান রাষ্ট্রায়ত্ব করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় খলিফা বললেন : রসুল (দ.) হতে তিনি শুনেছেন যে, নবিগণের কোন উত্তরাধিকারী হয় না। উম্মতগণই নবির সকল সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকে। ইহাতে

ফাতেমা (আ) বললেন ঃ আপনি কি কোরআন পড়েন নাই ? ইহাতে লিখা নাই যে নবি সোলায়মান (আ.) তাঁর পিতা নবি দাউদ (আ.) এর সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। (সুরা নমল)।

জানা যায় যে, এই বাগান শুধু মৌখিক নয়, রসুলুল্লাহ (দ.) দান পত্র লিখেই আপন কন্যাকে ইহা দান করেছিলেন। এই দানপত্রে দাতা হলেন রসুলুল্লাহ গ্রহীতা তার কন্যা। ইহার লেখক ছিলেন আলী (আ.) এবং সাক্ষী হলেন তাদের দুই পুত্র ইমাম হাসান ও হোসাইন (আ.)।

প্রসঙ্গতঃ হজরত ফাতিমা (রা.) বলেন, "হে আবুবকর ও ওমর ! তোমরা আমার বর্ণিত হাদিসটি বিশ্বাস করবেন ? তারা উভয়ে বললেন, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস করব। তখন ফাতিমা (আ) বললেন, তবে আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করছি আল্লাহর শপথ করে বল রসুলুল্লাহ এর (দ.) মুখে কি তোমরা শুনতে পাও নাই যে তিনি ফরমাইয়াছেন। আমার কন্যা ফাতেমার (আ) সহিত মহব্বত রাখ। যে তাকে সন্তুষ্ট রাখে সে যেন আমাকে সন্তুষ্ট রাখল এবং যে তাকে নাখোশ করে সে যেন আমাকে নাখোশ করল। উভয় সাহাবি (রা.) বললেন নিশ্চয়ই এই হাদিস আমরা রসুলুল্লাহ (দ.) এর মুখে শ্রবণ করেছি। ফাতেমা (আ) বললেন, তবে আমি আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে সাক্ষী রেখে বলছি তোমরা আমাকে নাখোশ করেছ, আমার মনে আঘাত দিয়েছ। কিয়ামতে যখন রসুলুল্লাহ (দ.) এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে অভিযোগ করব। ফাতেমা (আ.) এর মুখে এই মর্মন্তুদ বাক্য শুনে আবুবকর (রা.) অঝোরে ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং বাইরে এসে লোকজনের নিকট বলতে লাগলেন, এই খেলাফতের দায়িত্ব আমি কিছুতেই বহন করতে পারব না। তোমরা অন্য কোন লোকের কাছে এই দায়িত্ব অর্পণ কর।" এই হাদিসটি সর্বজন বিদিত। –(খাতনে জান্নাত ফাতেমা যাহরা (আ) কে এম জি রহমান পৃ-১১১-১১২)।

পবিত্র কোরআনে আহলে বায়াতদের সম্পত্তির অংশ পাওয়া গেল, নবিদের উত্তরাধিকারী মিরাসের হিসেব জানা গেল। বেহেশতের সম্রাজ্ঞী ফাতেমা নাখোশ হলেন হজরত আবুবকর (রা.) কাঁদলেন। কিন্তু কোরআন ও হাদিসের মোকাবিলায় কার মর্যাদা বা গুরুত্ব বেশি তা অনিশ্চয়তার মধ্যেই রয়ে গেলো। তাই রাষ্ট্রীয় আইনের বদৌলতে আহলে বায়াতগণ আল্লাহ ও রসুল কর্তৃক নির্ধারিত সম্পত্তির অংশ হতে বঞ্চিত হয়ে চতুর্থ শ্রেণির নাগরিক হিসেবে এতিম মিসকিন তথা সাধারণ নাগরিকে পরিণত হলেন। জনগণও এক বিভ্রান্তিতে আপতিত হলো। কোরআনের লিখিত নির্দেশ লঙ্ঘন করে মহান রসুল বংশীয় লোকের অধিকার হরন কি করে সম্ভব ? পবিত্র কোরআনের নির্দেশও যে অলঙ্ঘনীয় নয় তাও দেখা গেল। ফলশ্রুতিতে কোরআনের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা প্রদানের পথ সুপ্রশস্ত হলো। অধিকতর স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায় যে, কোরআনের ব্যাখ্যা জনিত জটিলতার মাধ্যমে রসুল পরিবারের সদস্যরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হলেন। অর্থাৎ আল্লাহতা'লা যে আহলে বায়াত পাককে দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহী ও নেতৃত্ব দান করেছেন, তা অমান্য করে ইসলামি সমাজ জীবনে তাদেরকে চির অপরিচিত ও গুরুত্বহীন করে উপস্থাপিত করা হলো। ফলশ্রুতিতে এদের সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হলো এবং তাদের প্রকৃত দাবির কথা বলা হলে নানা ধরনের যুক্তি তর্কের অবতারণা করে বা ফতওয়ার মাধ্যমে তাদের দাবিকে নস্যাৎ করে দেয়া হলো। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ ঐ সম্পত্তি আহলে বায়াতদের পুনরায় হস্তান্তর করেছিলেন। এই কারণে বিষয়টি অধিকতর জটিল আকার ধারণ করল। অর্থাৎ কে ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন, হজরত আবুবকর (রা.) অথবা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রা.) তা একটি নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করে।

হজরত আবুবকর (রা.) এর ইমামতি :

বিনম্র আত্মসমর্পণ ও একাগ্রতার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর ও প্রাণবন্ত করার নাম 'খুসু'। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাজে 'খুসু' অবলম্বন করে (মুমিনুনন: ১-২)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন, এটা আত্মার সাথে সম্পর্কিত আমল। এটা যে আত্মিক আমল তার প্রমাণ কোরআনেই উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন সুরা রুমে বলা হয়েছে : "বিশুদ্ধচিত্তে তার দিকে মুখ ফিরাও, তাকে ভয় কর, নামাজ কায়েম কর আর অংশীদারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" নামাজের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। এ ব্যাপারে সুরা "আলাএ" উল্লেখ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্র। আর যে তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামাজ পড়ে।" পাক পবিত্রতা দুই

প্রকার। জাহেরি বা প্রকাশ্য পবিত্রতা, যা শরিয়ত অনুযায়ী পানির মধ্যমে অর্জিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার বাতেনি বা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। এটা তওবাহ ও তালিকন দ্বারা অন্তর পরিষ্কার করা। অর্থাৎ নবির 'পবিত্রকরণ' ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হিসেবে ইহা 'উলিল আমর' কর্তৃক বা তার নির্দেশিত পন্থায় অর্জিত হয়।

শরীর হতে অপবিত্র কিছু নির্গত হলে শরিয়ত মোতাবেক অজু নষ্ট হয় এবং পানি দ্বারা বিশেষ অংগাবলী ধৌত করলে পুনরায় অজু হয়। রসুল (দ.) এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি নতুনভাবে অজু করে আল্লাহ তার ঈমান সজীব করেন। তিনি আরও এরশাদ করেছেন : "অজুর ওপর অজু করা নুরের ওপর নুর।"

অহংকার, আত্মগর্ব, ঈর্ষা, শত্রুতা, পরনিন্দা, খারাপ অভ্যাস এবং চোখ কান, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা কুকর্ম করলে বাতেনি বা অভ্যন্তরীণ অজু বা পবিত্রতা ভঙ্গ হয়। হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন– 'চক্ষুদ্বয় ব্যভিচার করে।' অনুরূপভাবে কান, হাত পা ইত্যাদি অঙ্গ প্রতঙ্গের ব্যাভিচারে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বাতেনি অজু নষ্ট হলে বিশুদ্ধ তওবাহ এবং যেই কাজ করলে পাপ হয়, উহার মূলোৎপাটন করা প্রয়োজন। আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় কিছু অন্তর হতে বের করে এবং একমাত্র আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়েই বাতেনি অজু অর্জন করা সম্ভব। এই জাতীয় পবিত্রতা অর্জন করার পরই কেবলমাত্র নামাজে পূর্ণতা লাভ হয়।প্রকাশ্য অজুর সময় সুনির্দিষ্ট কিন্তু বাতেনি অজু সর্বক্ষণ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবদ্দশায় বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক। রসুল (দ.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তা ধান্ধা হতে মুক্ত ও পবিত্র অন্তর নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়বে আল্লাহ তার অতীতের সমস্ত গুণাহ মাফ করে দেবেন।" পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে: "তোমরা নামাজের হেফাজত কর এবং মধ্যবতি নামাজ।"

নামাজের প্রকাশ্য ফরজ সমূহ শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনা দ্বারা সম্পন্ন হয়। যেমন– দাঁড়ান, রুকু সিজদাহ করা এবং সেই সাথে আল্লাহর পবিত্র কালাম মুখ দ্বারা পাঠ করা। তাই আল্লাহতা'লা নামাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোরআনের বহু স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন। নামাজের অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য হলো : অন্তকরণের নামাজে সর্বক্ষণ লিপ্ত থাকা। পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত আয়াতে "মধ্যবতী নামাজের হেফাজত কর।" এই নির্দেশের দ্বারা অন্তকরনের নামাজকে বুঝানো হয়েছে। হুজুর (সা.) এরশাদ করেছেন : আদম সন্তানের বলব দয়াময় আল্লাহতা'লার কুদরতের অঙুলি সমূহের দুই অঙুীর মাঝখানে অবস্থিত। তিনি তার ইচ্ছা মোতাবেক উহার পরিবর্তন সাধন করেন। দুই অঙুলের অর্থ হলো : আল্লাহর ক্রোধ এবং মেহেরবাণী– এই দুইটি গুণ। সুতরাং আল্লাহর বাণী ও রসুলের হাদিস দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অন্তরের নামাজই যথার্থ নামাজ। হুজুর (সা.) এরশাদ করেছেন: নামাজ হুজুরি কলব ব্যতীত সুসম্পন্ন হয় না। কারণ নামাজিগণ তাদের মওলার নিকট প্রার্থনা করে। আর প্রার্থনা করার স্থান লব বা অন্তন। এই ক্বলব যদি আল্লাহর যিকরআযকার ভুলে যায়, তবে অঙ্গ প্রতঙ্গের নামাজ (প্রচলিত অর্থে) বিনষ্ট হয়। কারণ বলব মালিক এবং যাবতীয় অংগপ্রতংগ উহার আজ্ঞাবহ। শরিয়তের বাহ্যিক নামাজ দিন রাত পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ে লোক দেখানো বা লোক শুনানো মনোবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক মসজিদে গমন করতঃ জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নত। পক্ষান্তরে তরিকতের নামাজের কোন সময় নাই বরং জীবনব্যাপী সর্বক্ষণ আদায় করতে হয়। তরিকতের নামাজের মসজিদ কলব । উহার জামাত বাতেনি শক্তি সমূহের সাথে মিলিত মিশ্রিত হয়ে বাতেনের অন্তঃস্থলের ঐশি প্রেম এবং কেবলাহ আল্লাহর পবিত্র দরবার। অমুখাপেক্ষী মালিকের নর এবং উহার যথার্থ কেবলাহ সেই পবিত্র স্থানে কুলব ও রুহ এই নামাজের সাথে সর্বক্ষণ নিগূঢ়ভাবে তন্ময় থাকে। কলব নিদ্রিত হয়না, মৃত্যুবরণ করে না। বরং মানুষের নিদ্রিত ও জাগ্রত অবস্থায় ক্বলব ও রুহ তরিকতের নামাজে নিয়োজিত থাকে। অন্তরের নামাজ শব্দ করা, দাঁড়ানো এবং বসা ব্যতীতই ক্বলব দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। কলব আল্লাহর বাণী দ্বারাই আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলে আমরা তোমারই আরাধনা করি এবং তোমার দরবারেই সাহায্য কামনা করি।" হুজুর (দ.) এর পূর্ণ অনুসারীরাই কেবল এই জাতীয় নামাজ আদায় করতে সক্ষম হন। এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে ইহাতে আরেফদের অবস্থা এবং অতি সংগোপনে আল্লাহর দরবারে তাদের চলে যাওয়ার ইংগিত রয়েছে । এই জন্যই আরেফগণ এইরূপ সম্বোধন করার যোগ্য হয়েছেন।

যখন জাহেরি এবং বাতেনি নামাজ মিলিত মিশ্রিত হবে তখনই নামাজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। এই পূর্ণতা প্রাপ্ত নামাজের পুরস্কার হলো রুহানি শক্তির সাহায্যে সশরীরে আল্লাহর নিকট মর্যাদা লাভ করা। এই প্রেক্ষাপটেই রসুল (দ.) এরশাদ করেছেন– নামাজ মোমেনদের জন্য মেরাজ স্বরূপ। এই অবস্থায় উক্ত নামাজি প্রকাশ্যে আবেদ এবং বাতেনে আরেফের মর্যাদা লাভ করেন। যতক্ষণ সজীব ক্বলব দ্বারা তরিকতের নামাজ শরিয়তের সহিত সংমিশণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। এই অসম্পূর্ণ নামাজের বিনিময়ে শুধুমাত্র, মর্যাদা লাভ করবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হতে বঞ্চিত থাকবে। (সিররুল আসবার-হজরত বড় পির সাহেব হতে সংকলিত)। এ ধরনের নামাজ আমরা রসুল (দ.) এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হজরত আলী (আ.) কায়েম করেছেন বলে ইতিহাসে দেখতে পাই। বর্ণিত আছে হজরত আলী (আ.) নামাজে দাঁড়ালে এমনভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন যে অন্য কোন ব্যাপারে তার সামান্য সচেতনতাও থাকতনা। একবার কোন এক যুদ্ধে তাঁর বাহুতে একটি তীর এসে বিধল। যুদ্ধাবসানে তীরটি খুলে ফেলা সমস্যা হয়ে পড়ল। তখন হজরত রসুল (দ.) এর নির্দেশে স্থির হল যে, হজরত আলী (আ.) যখন নামাযে মগ্ন হবেন তখন তীর খুললে তিনি টের পাবেন। অন্যথায় সাধারণ অবস্থায় তীর খুলতে গেলে তার অধিক কষ্ট হবে। অতঃপর তাই করা হল, হজরত আলী (আ.) নামাজে রত হলেন। একজন এগিয়ে গিয়ে তার বাহুতে বিদ্ধ তীরটি টেনে তুলে ফেললেন। তাজা রক্তে শেরে খোদার সমস্ত শরীর ভিজে গেল। কিন্তু তিনি নামাজে এমনই মগ্ন ছিলেন যে তার সকল বেদনাবোধ রহিত হয়ে গিয়েছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে এ ধরনের নামাজিই যে প্রকৃতপক্ষে নামাজে জনগণের ইমাম হওয়ার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি হবেন একথা বোঝার জন্য অন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নাই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিগত চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে লয় পাতি নামাজের পকত লক্ষ্য। তাই নামাজ পতিষ্ঠা করা খুব কঠিন কাজ। যেমন নাকি পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে নামাজ তো খুব কঠিন, তবে মুমেনদের জন্য ব্যতীত। আলাহর ঘোষণা মোতাবেক নামাজ বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। নামাজ ব্যক্তিগত চরিত্রে পতিফলিত করা যে কত জটিল ও আয়াসসাধ্য তা যাঁরা এটি আন্তরিকভাবে কায়েম করতে চান তারাই জানেন। আবার ব্যক্তিগত চরিত্রে নামাজের পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য প্রয়োজন সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় অনুকূল পরিবেশ। কারণ মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণে অনুপ্রাণিত হয়ে সে অন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য। নিজের স্বার্থ ও অপরের স্বার্থের কথা চিন্তা করা প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা এই দু'টি পরস্পর বিরোধী ভাবধারাই মানুষের প্রকৃতিগত আর মানুষের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবধারার ভিত্তিতেই তার মানব জীবন গড়ে ওঠে। বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয় সমাজ আর সমাজের সামগ্রিক শক্তি আত্মপ্রকাশ করে রাষ্ট্রের মাধ্যমে। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দুটি জিনিস যুগপতভাবে দেখতে পাই। প্রত্যেকটি মানুষেরই চিন্তার একটি স্বতন্ত্র ধারা ও কর্মের একটি আলাদা পথ আছে। যার ভিত্তিতে সে চিন্তা করে এবং তদনুযায়ী কাজ সম্পাদন করে। অপর দিকে প্রত্যেক মানুষই সমাজের মধ্যে বসবাস করে বিধায় সে কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাচারিতার পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। কেননা তা করলে সমাজের অন্য লোকদের সাথে তার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই ভাবে যখন একটি মানবগোষ্ঠী সুস্পষ্টরূপে সুসংগঠিত হয় তখনই তাদের রাজনৈতিক জীবনের গোড়া পত্তন হয় এবং একটি রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় ইসলামি সংস্থা তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসক এবং তার সরকারের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো ইসলামের চারিত্রিক মানদন্ড অনুযায়ী ভাল ও সৎ গুণাবলীর বিকাশ এবং মন্দ ও অসৎ গুণাবলীর বিনাশ সাধন। যাতে করে ব্যক্তিগত জীবনে নামাজ সুপ্রতিষ্ঠিত করার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা সমাজ জীবনে বিদ্যমান থাকে। এই প্রেক্ষাপটেই কোরআন মজিদে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

"তাদেরকে আমি পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত (নামাজ) কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ভাল কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করে।" (আল হজ-৪১)।

সমাজে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, দয়া ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করাই জামায়াতের নামাজের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য। নামাজিদের প্রত্যেকেই পরস্পর কল্যাণকামী এবং সকলে মিলে মালিকের নিকট সকলের মংগলের জন্য দোয়া করছে। কোন নামাজি এখানে একাকী নয়। তাদের কেউই কেবলমাত্র নিজের

জন্য কল্যাণ কামনা করে না। বরং সকলেরই মুখে এই দোয়া যে, হে খোদা, আমাদের সকলের প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। সকলকে একই সহজ ও সোজা পথে চলবার তওফিক দাও। সকলের ওপরই শান্তি বর্ষিত হোক। জামাতের নামাজ এইভাবে সকল নামাজির দিলকে পরস্পরের সহিত মিলিয়ে দেয়, সকলের মনে একই খেয়াল ও এই চিন্তাধারা জাগরিত করে। তাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ঐক্য ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। এই কারণেই মুসলমান সমাজের মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাজ পড়ার ফজিলত বা উপকারিতা অপওিসিম। তবে সার্বিকভাবে সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠাই সম্মিলিত বা জামাতের নামাজের মূল লক্ষ্য। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ব্যক্তিগত অনুশীলন ছাড়া শুধুমাত্র জামায়াতের নামাজ পড়ার মাধ্যমেই ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধিত হয় না। অন্যদিকে সমাজ জীবনে প্রকৃত নামাজের অনুকল পরিবেশ না থাকলে ধর্ম রক্ষাই কঠিন হয়ে পড়ে এ কারণেই এই দয়ের সমন্বয় সমাজ জীবনে অপরিহার্য । রসুল (দ.) বলেছেন: হে লোকেরা, তোমরা নিজ নিজ বাড়িতেই নামাজ আদায় কর। কেননা সবচাইতে ভাল নামাজ হচ্ছে যা, তা বাড়িতে পড়া হয় । নবি (দ.) আরও বলেছেন : তোমরা নিজেদের ঘরে নামাজ আদায় কর এবং তাকে কবর বানিও না। (বোখারি) রসুল (দ.) এর পর সমাজ জীবনে প্রকৃত নায়েবে রসূলের মাধ্যমে জামায়াতের নামাজ খুব কমই পড়ানো হয়েছে। বরং শুধুমাত্র সামাজিক দায়িত্ব পালন হিসেবেই জামায়াতের নামাজকে ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে সুস্পষ্ট প্রমাণ ইসলামের ইতিহাসে অগণিত।

াহোক আবদুল্লাহ ইবনে যামআ বলেন : রসুল (দ.) এর লোগ আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছার সময় আমি মুসলমানদের একটি দলসহ তার কাছে উপস্থিত ছিলাম। এই সময় বিলাল (রা.) তাঁকে নামাজ পড়তে ডাকলেন। রসুলুল্লাহ (দ.) বললেন : নামাজ পড়াতে পারে এমন একজনকে ইমামতি করতে বল। প্রথমে আমার দেখা হলো ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর সাথে। আমি বললাম : হে ওমর, আসুন নামাজ পড়ান। ওমর (রা.) নামাজের ইমামতিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ওমর (রা.) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী। তিনি তাকবীর বললে তা শুনে রসুলুল্লাহ (দ.) বললেন : আবুবকর কোথায় ? এটা আল্লাহ ও মুসলমানগণের মনপুত নয়। আবুবকর (রা.) কে ডাকা হলো। ওমর (রা.) তাঁর আরম্ভ করা নামাজ শেষ করার আগেই তিনি (আবুবকর রা.) এলেন। তারপর তিনি (আবুবকর রা.) নামাজ পড়াতে লাগলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম-অনুবাদ আকরাম ফারুক, পৃ. ৩৭) প্রসঙ্গত বলা যায় যে যদি আবুবকর (রা.) এর নামাজের ইমামতি করার বিষয়টি খলিফা নিয়োগের সনদপত্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো তাহলে তাকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করা এত জটিল, সময় সাপেক্ষ, বিতর্কিত এবং সর্বজনমান্য নয় এমন ব্যাপার হিসেবে দেখা দিত না। আলোচ্য বিষয়টি পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় যে,

১। সাধারণভাবে নামাজ পড়াতে পারে এমন যেকোন ব্যক্তিই জামায়াতের নামাজ পড়ানোর উপযুক্ত।

২। রসুল (দ.) আবুবকরকে এই জামায়াতের নামাজ পড়ানোর অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে তাকে খলিফা হিসেবে নিয়োগ করে যাননি।

৩। রসুল (দ.) এর বিবেচনায় ওমর (রা.) জামায়াতের নামাজের ইমামতি করার জন্য সেই সময় উপযুক্ত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও পরবর্তীতে তাকে খলিফা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

রসুল (দ.) এর ওফাতের পর খলিফা নির্বাচনের জন্য আনসার ও মোহাজীরদেরকে বনি ছকীফায়ে সায়েদা হাজির হন। কিন্তু খলিফা নির্বাচন করতে তিন দিন সময় লাগে। এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নামাজের জন্য সর্বজন মান্য কোন ইমাম ছিল না। তাই জামায়াতের নামাজ যদি কেবল সামাজিক গুরুত্বের মধ্যে নিহিত না থাকতো তাহলে এ ধরনের পরিস্থিতি নিশ্চয় হজরত আবুবকর (রা.) ওমর ফারুক (রা.) ও আবু ওবায়দা (রা.) সহ অন্যান্য জলিল উল কদর সাহাবিগণ মেনে নিতেন না। এ কারণেই শুধুমাত্র জামায়াতের ইমামতির সাথে রুহানি বা আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের কোন সম্পর্ক নাই তা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

হজরত ওমর (রা.) ফজরের নামাজরত অবস্থায় মারাত্মকভাবে আহত হন। এই অবস্থায়ই তিনি নামাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে তৎক্ষণাৎ হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) কে টেনে এনে ইমামের স্থানে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং নিজে আঘাতের যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। হজরত আবদুর রহমান এই অবস্থাতেই নামাজ শেষ করলেন (আল ফারুক লেখক শিবলী নোমানি)। পরবর্তীতে হজরত ওমর

(রা.) এর শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনদিন ওমর (রা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী তার গোলাম সুহাইব মসজিদে সালাতের ইমামতি করে। জামায়াতের নামাজ অব্যাহত রাখার জন্য আবদুর রহমান ইবনে আউফ এর ইমামতি করার জন্য পরবর্তীতে খলিফা নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর কোন বিশেষ দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ইতিহাসে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে ওমর (রা.) এর গোলাম সুহাইব দীর্ঘ তিনদিন জীবিত খলিফার নির্দেশে জামায়াতের নামাজে ইমামতি করার সুযোগ লাভ করা সত্ত্বেও তাকে কোন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এবং এই কারণেই সুহাইব এর ইমামতিতে অন্যান্য জলিল উর কদর সাহাবাগণ মসজিদে নব্বিতে নামাজ পড়েছিলেন বলেই সুহাইবের মর্যাদা তাঁদের থেকে বেশি ছিল বা তার সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল একথাও বলা ঠিক হবে না। অথবা এই ইমামতি করার জন্য কখনই তাকে খলিফা পদপ্রার্থী বিবেচনা করা হয় নাই– একথা সর্বজন বিদিত। জামায়াতের নামাজ যে সমাজে মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা সৃষ্টির জন্য প্রধানত: নিয়োজিত তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। হজরত ওসমান (রা.) এর শাহাদতের পর ছিন্ন ভিন্ন মুসলিম সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রায় ছিল না। মসজিদে নবি ছিল বিদ্রোহিদের দখলে। সর্বজনমান্য খলিফা নির্বাচনে প্রায় ৭/৮ দিন সময় লেগে যায়।

তাই একথা বলা যায় যে, ধর্মীয় পদ্ধতিতে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা জামায়াতে নামাজের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই প্রেক্ষাপটেই দেখা যায় যে, হজরত আয়েশা (রা.) এর ক্রীতদাস জাওয়ান মুসহা (কোরআন মজিদ) দেখে দেখে তেলাওয়াত করে ইমামতি করতো। (বোখারি)

রসুল (দ.) এর সফর সংঙ্গী হিসেবে সওর গিরি গুহায় হজরত আবুবকর (র) :

কোরেশগণ যখন জানতে পারল যে মুহম্মদ (দ.) মদিনায় স্থানের পরিকল্পনা করেছেন তখন তারা বিচলিত হয়ে পড়ল। কারণ তারা মনে করল যে যদি মুহাম্মদ (দ.) মদিনায় গিয়ে তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন, তবে তো সবই মাটি। ইসলামকে তো ধ্বংস করা হল না বরং মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদ (দ.) অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ লাভ করবেন। এতদ্ব্যতীত অনাবশ্যকভাবে মদিনাবাসীরাও শক্ত হয়ে গেলে যার পরিণামে যুদ্ধও ঘটতে পারে।

এইসব ভেবে কোরায়েশরা পরামর্শ সভা আহ্বান করল। আলোচনা সভায় আবু জেহেল প্রস্তাব করল মুহাম্মদ (দ.)কে হত্যা করলেই ইসলামকে হত্যা করা হবে। ফলে ইসলামের প্রাণশক্তির উৎস মুখ তখনই বন্ধ হয়ে যাবে।

এই প্রস্তাব সকলেরই মনঃপুত হল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, মুহাম্মদ (দ.)কে হত্যা করবে কে ? কোন ব্যক্তি বিশেষ যদি এ কাজ করে তবে বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিব চিরকাল তার দুশমন হয়ে থাকবে। সুতরাং কেউই এ কাজে রাজি হল না। তখন আবু জেহেল পুনরায় প্রস্তাব করল : প্রত্যেক ত্রোত্র হতে একজন করে লোক নির্বাচন করা হোক এবং এই নির্বাচিত ব্যক্তিরা একযোগে মুহম্মদ (দ.)কে হত্যা করবে।

প্রস্তাবটি তখনই গৃহীত হল। প্রতিনিধি নির্বাচনের কাজও তখনই সমাপ্ত হল। স্থির হল গভীর রাত্রে সকলে মুহম্মদ (স.)–এর গৃহ ঘেরাও করে তাঁকে বন্দী করবে। অতঃপর প্রত্যুষে মুহম্মদ (দ.) কে প্রকাশ্যে হত্যা করা হবে। এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের কথা জিব্রাইল (আ.) রসুল (দ.) কে জানালে তিনি মদিনায় প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি হজরত আলীকে (আ) ডেকে তাঁর (রসুল (দ.). 'আল আমিনের' নিকট গচ্ছিত বিভিন্ন বস্তু সামগ্রী প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তর করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান করেন। অর্থাৎ হজরত আলী (আ.) রসুল (দ.) এর প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বভার বুঝে দেন।

ইতোমধ্যে আবু জেহেল ও অন্যান্য কোরায়েশনে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রসুল (দ.), এর বাস গৃহ ঘেরাও করে রেখেছিল। এদিকে হজরত আলী (আ.) রসুল (দ.) এর নির্দেশ অনুযায়ী রসুল (দ.) এর পবিত্র বিছানায় অকুতোভয় –এ শয়ন করে রইলেন। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তিনি হাসিমুখে নিজের জীবন দেওয়ার এই অপূর্ব নজির অভূতপূর্ব বিধায় এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহতা'লাই এই ঘটনার প্রশংসা করেছেন।

রসুল (দ.) হজরত আলীকে (আ.) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে একাকী এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রেখে হজরত আবুবকর (রা.) এর সাথে মদিনার উদ্দেশ্য রওয়ানা হন। অতঃপর মক্কার নিম্নভূমিতে অবস্থিত

'সাওর' পর্বতের একটি গুহার পাশে গিয়ে তার ভেতরে প্রবেশ করলেন। রসুলুল্লাহ (স.) আবুবকর (রা.)কে সাথে নিয়ে এখানে তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। কথিত আছে যে, গুহার মধ্যে অবস্থানকালে তিনি দুইটি সাপের গর্তে পা দিয়ে রসুল (স.)কে বিপদ মুক্ত রেখেছিলেন। এই গুহায় অবস্থানকালে যখন আক্রমনকারী কোরেশগণ গুহার অতি নিকটে চলে আসে তখন তিনি (আবুবকর রা.) তাঁদের নিরাপত্তার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কোরআনের এই নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয় :

"আল্লাহ সেই সময় ও তাঁহার (রসুল দঃ)কে সাহায্য করেছেন, তখন কাফেররা তাঁহাকে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিল, যখন সে (মুহাম্মদ দ.) মাত্র দুইজনের দ্বিতীয় ছিল। যখন তাহারা দুইজন গুহায় অবস্থিত ছিল। যখন সে তাহার সংঙ্গীকে বলিতেছিল "চিন্তা করিওনা আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন" ।তওবা-৪০।

আলোচ্য আয়াত পর্যালোচনা করে ইহাতে আবুবকর (রা.) এর খলিফা নিয়োগের কোন ইংগিত আছে বলে বিবেচনা করা যায় না। বরং হজরত রসুল (দ.) কর্তৃক তাঁর আমানতকে যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব হজরত আলী (আ.) কে অর্পণ করায় এটাই অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য হয় যে রসুল (দ.) প্রকৃতপক্ষে আলী (আ.) কেই তাঁর খলিফা নিয়োগ করেছিলেন।

হজরত আবুবকর (র) এর নিয়োগ :

তদানিন্তন পাকিস্তানের ইসলামি সংবিধানের মূলনীতি কমিটির অন্যতম প্রধান সদস্য জার্মানির বন (BONN) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ হামিদুল্লাহ প্রচুর গবেষণা করে এ বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন−

"এই সব শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিদের কেহই যেহেতু এখন জীবিত নেই; তাই অবশ্য এই বিষয়ের একটি সহজ মীমাংসার সুযোগ আছে। রসুল (দ.) যে মুমিনদের জন্য রুহানি মুরশিদ ও পার্থিব কর্মকান্ডের নেতার কাজ সমাধা করতেন, ইহা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই । ইসলামের মারেফতী উত্তরাধিকারের বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হয় নকশাবন্দীয়া তরিকাহ হতে নির্গত একটি শাখা তরিকার কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত সকল সুন্নীই সম্পূর্ণরূপে একমত যে হজরত আলী (আ.) রসুল (দ.) এর অব্যবহিত পরবর্তী খলিফা পার্থিব ক্ষণস্থায়ি শাসন ক্ষমতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তারা সকলেই স্বীকার করেন যে ইহা অনিত্য (ক্ষণস্থায়ি) বিষয়, এমনকি কি সুন্নিরাও বিশ্বাস করে যে প্রবল সংখ্যাধিক্যের দ্বারা নির্বাচিত হওয়া ছাড়া ঐ পদের জন্য আবুবকর (রা.) কোনরূপ দাবিই ছিল না "। (Muslim conduct of state- Dr. Md. Hamidullah, Page-46)

ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের সাবেক জাস্টিস আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার শাহ সুলায়মান একই মন্তব্য করেছেন। অবশ্য এখানে সংখ্যাধিক্যের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার মন্তব্যটি খুবই নাজুক ও প্রমাণ সাপেক্ষ। কারণ মদিনার সকল লোক ঐ নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ছিল না, মাত্র ৪০/৪৫ জন লোক ছিল। আবুবকর (রা.) সহ তিনজন মাত্র কুরায়েশ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদের উপস্থিতির তো প্রশ্নই আসেনা। এসব তথ্য পরবর্তীতে হজরত আয়েশা (রা.) তালহা (রা.) যুবায়ের (রা.) এর তরফ থেকে বসরা নগরী আক্রমণ করা হলে আলী (আ.) এর পক্ষে বসরা শহর রক্ষার্থে দাঁড়িয়ে আবদুল কায়েস গোত্রের অন্যতম মোমিন নেতা হাকিম বিন জাবালা আল আবদি (রা.) তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন : হে মুহাজির ! (অর্থাৎ আলী আ.) এর বিরোধীরা মূলত ছিল কোরায়েশ গোত্রের)..... যখন রসুল (দ.) ওফাত পেলেন, তোমরা তোমাদের মাঝের একজন (আবুবকর রা.) এর হাতে বাইয়াত করলে, তোমরা আমাদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে আলোচনাও করলে। তবু আমরা তোমাদের মনোনয়নে বেশ খুশিই থেকেছি এবং আমাদের হৃদ্যতম সহযোগিতা তোমাদিগকে দান করেছি। অতঃপর আল্লাহর ফজলে ক্রমে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করল। প্রথম খলিফা তোমাদের ভেতর হতে একজন (ওমর (রা.)কে মনোনীত করে ইন্তেকাল করলেন। কিন্তু এতেও তোমরা আমাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ কর নাই। তবু আমরা তোমাদের পিছনেই অনমনীয়ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম এবং যখন তিনিও (ওমর রা.) ছয়জনের এক গ্রুপকে খলিফা নির্বাচনের জন্য মনোনীত করে ইন্তেকাল করলেন, তিনিও এ ব্যাপারে আনসারদের সাথে কোন পরামর্শ করলেন না। তোমরা ওসমান (রা.) কে খলিফা স্থির করলে এবং তার কাছে যথাযোগ্য বাইয়াতও কবুল করলে। আমাদের কোনরূপ অভিমতই নেয়া হলনা।

পরবর্তী সময় তোমরাই তার দিক হতে মুখ ফিরালে এবং তাঁকে কতল হতে দিলে। তোমরা কি সেই খলিফাকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের সাহায্য সহায়তা চেয়েছিলে? ইহার পরে তোমরা আলী (আ.) কে খেলাফতে মনোনীত করলে এবং তার হাতে বাইয়াত করলে। আমাদের কথা আগের মতই কোন ব্যাপারে উঠল না। এক্ষণে কি কি কারণে তোমরা তার দোষ দিতেছ বল? (Dr. Md, Ishaq. Ph.D, Hakim-bin-jbala) (ইতিহাসগত বিভ্রান্তির রহস্য - মুফাখখারুল ইসলাম, পৃ. ১০৭)।

এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আলী (আ.) এর বিরোধীরা কোন জবাব দিতে সক্ষম হয় নাই। কাজেই এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে সংখ্যাধিক্য বলতে যা আমরা বুঝি সেই পদ্ধতিতে হজরত আবুবকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হননি। হজরত আবুবকর (রা.) মুসলমানদের সাধারণ জমায়েত হবার জায়গায়ও অর্থাৎ মসজিদে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে খলিফা নিযুক্ত হননি। প্রকৃতপক্ষে তদানিন্তন আরবিয় (ইসলামি নয়) ঐতিহ্য অনুযায়ী গোত্রপতিগণ যে পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতেন, হজরত আবুবকর (রা.) দৃশ্যত সেই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই বিষয়টি ইসলামি পদ্ধতি হিসেবে চালানো হয়ে আসছে এবং রাজতন্ত্রের অত্যাচারের বিপরীতে সাধারণ মুসলিম সমাজে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যাপারে এক ধরনের অযৌক্তিক শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দেশসমূহে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বস্তুতান্ত্রিক সাফল্য দেখে পাশ্চাত্য ব্যবস্থায় শিক্ষিত জনগণের মধ্যে গণতন্ত্রকে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা হিসেবে চালানোর এক অপচেষ্টা দীর্ঘদিন থেকে লালন করা হচ্ছে।

এ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা অবগত হতে হলে নবিদের জীবন তথা কার্যকাল পর্যালোচনা প্রয়োজন । ইসলাম আল্লাহতা'লার প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা। এটা কেবল হজরত মুহাম্মদ (দ.) এর প্রচারিত বিধানই নয়। বস্তুত মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায় হতে যত নবিই খোদার তরফ হতে এসেছেন, তাদের সকলেই একমাত্র এই বিধানেরই প্রচার করেছেন। খোদায়ি এই বিধানের সত্যাসত্য বা সঠিকতা যাচাইয়ের পদ্ধতি হিসেবে গণভোট বা অধিকাংশ লোকের সম্মতি বা অনুমোদনের কোন বিধান ইসলাম বা অন্য কোন ধর্মেই রাখা হয় নাই। তবে যদি কোন জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় আল্লাহতা'লার রসুলের বিধানের আনুগত্য করতে রাজি হয় তবে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে অশেষ কল্যাণের অধিকারী হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে স্বতোপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ ও তার রসুলের বিধানের ওপর আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম।

পক্ষান্তরে গণতন্ত্র তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এ ব্যাপারে তারা ঐশি প্রত্যাদেশ বা অন্য কোন বাধা/প্রতিবন্ধকতা মানতে বাধ্য নয়। জনগোষ্ঠীর নীতি, নৈতিকতা অথবা রাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক নীতি–তাই হবে যা জাতীয় অভিলাষের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে। যে নীতি জনমত প্রত্যাখ্যান করবে তাই ভ্রান্ত ও অন্যায়, এ কারণেই অবৈধ। আইন রচনা মানবিয় ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। জাতি ইচ্ছা করলে যে কোন আইন প্রণয়ন করবে এবং ইচ্ছা করলে যে কোন আইন রহিত করবে। জাতির মর্জি অনুযায়ী সরকার গঠিত হবে এবং সরকার জাতির ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হবে। সরকার তার সকল শক্তি নিয়োজিত করবে জাতির মর্জি পূরণের জন্য।

ইসলামের সুস্পষ্ট ঘোষণা এই যে, সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ আর। এটাই ইসলামি ঈমান ও বিশ্বাসের কথা। আল্লাহই সকলের প্রভু ও প্রতিপালক, তিনি মানব জাতির বাদশাও। মানুষ তাঁর প্রজা। সৃষ্টি ও প্রজার ওপর স্রষ্টা ও বাদশাহরই নিয়োগকৃত লোক তাঁর সৃষ্ট আইন ও বিধান অনুযায়ী রাজত্ব করবে এটাই স্বাভাবিক ও ন্যায় সঙ্গত। শাসকের এটি ন্যায়ানুগ ও বৈধ অধিকার পক্ষান্তরে সার্বভৌমত্ব জনগণের হাতে থাকার অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। তাহলো এ বিশ্ব পরিচালনার জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগের ব্যবস্থাপনা ও তাঁর রচিত বিধি বিধান অকার্যকর হিসেবে হোষণা করে এই ক্ষমতা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে জনসাধারণের হাতে অর্পণ করা। গণতন্ত্রের প্রথম ও মূল কথা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব জনগণের। অর্থাৎ তারা যেভাবে খুশি তাদের প্রশাসক নিয়োগ ও বাতিল করবে। এবং যখন তখন দেশ ও জাতির জন্য আইন প্রণয়ন করবে এবং যে কোন আইন রহিত। করবে। জনগণের আইন রচনার অধিকার দেওয়ার ফলে দেখা যায় একটা বস্তু কখনো বৈধ, আবার কখনো অবৈধ ঘোষণা করা হয়। আমেরিকায় একবার মদ্যপানের সর্বনাশা পরিণাম বিবেচনা করে তা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়, যেহেতু জনসাধারণ আইন রচনার অধিকারী, তাই জনগণের চাপেই আবার

মদ্যপান বৈধ ঘোষিত হয়। গর্ভপাত বা ভ্রুণ হত্যা সকল ধর্মে নিষিদ্ধ এবং বিবেকও তাই বলে। কিন্তু চরম নৈতিক অবক্ষয় ও যৌন অনাচারের ফলে যখন জনমত গর্ভপাতের দাবি জানায় তখন আইন করে তা বৈধ ঘোষণা করা হয়। অত্যন্ত ঘৃণিত ও লজ্জাকর কাজ সমকামিতা (Homosexuality) জনগণের মধ্যে যখন এই জঘন্য সমকামিতার ব্যাধি মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়লো, তখন আইন করে এ গর্হিত পাপ কাজ ইংল্যান্ড, আমেরিকাসহ সকল পাশ্চাত্য দেশে বৈধ ঘোষণা করা হলো। সাধারণ মানুষ কখনো ত্রুটির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনা এবং তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত বিধায় তাকে আইন রচনার পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে মানব সমাজে বিশৃঙ্খলা, অবিচার ও পাপাচারেই পূর্ণ হতে পারে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কোনটি ভাল এবং কোনটি মন্দ কোনটি কল্যাণকর ও কোনটি অকল্যাণকর তার পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহতা'লারই, তিনি যাকে দয়া করে জানান তারই শুধু এ জ্ঞান রয়েছে। তিনি মানুষের জন্য যা ভাল মন্দ, হালাল ও হারাম নির্ধারিত করে দিয়েছেন– যে আইন অথবা মূলনীতি ঘোষণা করেছেন, তা অভ্রান্ত এবং মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণকর। এ কারণেই তাঁর আইন বা কোন বিষয়ের ফয়সালা পরিবর্তনের অধিকার কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা কোন দেশের পার্লামেন্টের নেই। কেউ তা করলে তা একদিকে যেমন খোদাদ্রোহিতার সামিল অপরদিকে তা মানুষের জন্য অকল্যাণই ডেকে আনে।

ধর্ম যে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের সাথে সংঘর্ষশীল তা আজকাল পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা প্রকাশ্যেই বলছেন। পন্ডিমা পন্ডিতের কথায় তা শোনা যাক - In societies where loyalities to the tribe, caste, religion or linguistic force are strong, it is next to impossible to convert minorities into majorities, through discussion and persuation · which is a basic Precondition for democracy. For a large number of less developed Countries this precondition virtually does not exist today...(বাংলাদেশের মত দেশে গণতন্ত্র: পন্ডিমা পন্ডিতের ভাবনা। হরিপদ ভট্টাচার্য , বাংলাবাজার পত্রিকা, ১২ মাঘ ১৩৯৯)। অর্থাৎ "যে সকল সমাজে, জাতি, ধর্ম ও ভাষার ওপর আনুগত্য প্রবল, সেখানে আলোচনা ও বোঝানোর মাধ্যমে সংখ্যা লঘিষ্ঠ জনগণকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা প্রায় অসম্ভব। যা নাকি সকল গণতন্ত্রায়নের জন্য পূর্ব শর্ত। কিন্তু অধিকাংশ অনুন্নত দেশে এই অবস্থা বিরাজমান নয়।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, গণতন্ত্র কোন ইসলাম সম্মত রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা নয়। তাই হজরত আবুবকর (রা.) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকলেও এটাকে ইসলাম সমর্থিত বলে বিবেচনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করার কোন অবকাশ নেই। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদাসহ মুসলমানদের খলিফা নিয়োগের ক্ষেত্রে আবুবকর (রা.) এর ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি যে সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করা হয় নাই তা সর্বজনবিদিত। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে হজরত ওমর (রা.) এর নিজস্ব মতামত খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবি রাখে কারণ হজরত ওমর (রা.) আবুবকর (রা.) কে খলিফা নিযুক্তির ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেন। হজরত ওমর (রা.) এর জীবনের শেষ বছর হজের সময় এক ব্যক্তি বললো : ওমর (রা.) মারা গেলে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বায়াত করবো। কারণ আবুবকর (রা.)–এর বাইয়াত তো হঠাৎই হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হয়েছিলেন। হজরত ওমর (রা.) মদিনায় ফিরে এসে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলেন যে তখন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে হঠাৎ হজরত আবুবকর (রা.) এর নাম প্রস্তাব করে আমি। তার হাতে বাইয়াত করেছিলাম। তখন যদি এরকম না করতাম এবং খেলাফতের মীমাংসা না করেই আমরা মজলিস ছেড়ে ওঠে আসতাম তবে রাতারাতি লোকদের কোন ভুল সিদ্ধান্ত করার আশঙ্কা ছিল। আর সে ফায়সালা মেনে নেয়া এবং পরিবর্তন করা উভয়েই আমাদের জন্য কঠিন হতো। এ পদক্ষেপটি সাফল্যমন্ডিত হলেও ভবিষ্যতের জন্য একে নবির হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারেনা। এখন কোন ব্যক্তি যদি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কারো হাতে বায়াত করে তাহলে সে এবং যার হাতে বাইয়াত করা হবে, উভয়েই মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করবে।" (বোখারি, কিতাবুল মুফারিরন, ষোল অধ্যায়)।

আলোচ্য বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সাকিফায়ে বনি সায়েদার মজলিসে হজরত আবুবকর (রা.) কে খলিফা হিসেবে নিয়োগের ব্যাপারে কোন পূর্ব আলোচনা করা হয়নি বরং বিশেষ জরুরি পরিস্থিতিতে ঐ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল, ওপরন্তু এই নিয়োগ পদ্ধতি ইসলামের খলিফা নিয়োগের

কোন বৈধ পদ্ধতিও নয় কারণ এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে যে বাইয়াত করবে ও তা যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে উভয়েই হজরত ওমর (রা.) এর মতে মৃত্যুদন্ড যোগ্য শাস্তির অধিকারী হবে।

রসুল (দ.) কে বেকাফন যাহারা বনি সায়িদার সাকীফায়ে খলিফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে জমায়েত হয়েছিল, তাঁদের সম্পর্কে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রা.) বলেন :

"চুঁ সাহাবা হুব্বে দুনয়া দাস্তান্দ
মোস্তফারা বে কাফন আন্দাখ্ তান্দ।
আহলে দুনিয়া কাফিরানে মুতলাকান
বাক বাকান জাক জাকান্দার বাক বাকান।"
অর্থাৎ "সাহাবারা দুনিয়ার মুহুববতে ঘিরে,
মুস্তফাকে বে কাফনে রেখে কোথা ফিরে,
বেশক কাফির হে দুনিয়াদারেরা!
বকাঝকা জানে তারা সার দুনিয়ার সেরা।"

কোরআনে বর্ণিত অর্থনৈতিক বিধি বিধানের অত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা :

খোলাফায়ে রাশেদা কর্তৃক অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতি পদ্ধতি আলোচনার পূর্বে কোরআনে বর্ণিত ও রসুল (দ.) কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা অপরিহার্য। এই প্রেক্ষাপটে বলা যাচ্ছে যে মানব একটি ক্ষুদ্র জগত বিশেষ । তার শারীরিক গঠন, প্রকৃতি, বিন্যাস, ক্ষমতা, যোগ্যতা, বাসনা, অনুপ্রেরণা - অনুভূতি এবং সত্তাবহির্ভূত অসংখ্য সৃষ্টি-বস্তু নিচয়ের সাথে তার বাস্তব সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়সমূহ একটি বিশ্ব জগতের ন্যায় মানুষের অভ্যন্তরে বিরাজমান। এহেন, জগতের প্রতি প্রান্তে তথা ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ না করলে মানবের প্রকৃত পরিচয় লাভ সম্ভব নয় এবং পূর্ণ ও প্রকৃত পরিচয় ব্যতীত তার মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধানও অসম্ভব। আবার বিষয়টি এতই জটিল যে আদিকাল হতে অদ্যাবধি ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার লীলাভূমি হয়ে আছে। এ ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে আজ পর্যন্ত মানব রহস্যের সমুদয় তথ্য মানুষের সম্মুখে উদঘাটিত হয় নাই। আজ পর্যন্ত কোন মানবিয় জ্ঞানই চরম পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি (নবি ও অলি ব্যতীত) এমন দাবি করতে পারে না যে উক্ত জ্ঞানের সকল তথ্যাবলী তার আয়াত্বাধীন হয়েছে। ওপরন্তু যে সমস্ত তথ্যের ওপর এ যাবত আলোকপাত করা হয়েছে তার বিস্তৃতি, ব্যাপকতা, জটিলতা ও সূক্ষ্মতা আবার এত অধিক যে শুধু ব্যক্তি বিশেষ তো দূরের কথা দল বিশেষের সতর্ক দৃষ্টি এর ওপরে একই সময় নিপতিত হয় না। এর একদিক যদি জ্ঞান চক্ষে ধরা পড়ে তো অপর দিক অন্ধকারে থেকে যায়। কোথায়ও দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে আবার কোথায় ব্যক্তিগত বা শ্রেণিগত ভাবপ্রবণতা দৃষ্টি পথকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ ধরনের বহুবিধ দুর্বলতা মানব জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যাসমেত অন্যান্য সমস্যা সমাধানের সকল প্রকার প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সফলতা অর্জন করতে পারেনি। বরং এ ব্যাপারে গৃহীত নীতি বাতিলক্রমে পরবর্তীতে গৃহীতব্য নীতি প্রণয়নের সময় পূর্বে গৃহীত বিধি বিধানের অসারতা প্রভাবে দেখা দিয়ে থাকে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে মানবিয় সকল সমস্যাই একটি মৌলিক ও সামগ্রিক সমস্যার বিভিন্ন দিক মাত্র এবং এই সবগুলোই সম্মিলিতভাবেই মানুষের জীবনে ব্যাপৃত। এই একটি মাত্র মৌলিক ও সামগ্রিক সমস্যার মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি সমস্যারই একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং অবস্থানের দিক দিয়ে সেইগুলোর প্রত্যেকটিরই অশেষ গুরুত্ব আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মানুষের একটি দেহ আছে। যার একটি বিরাট অংশ তার ইচ্ছা নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। কিন্তু সে কেবল দেহই মাত্র নয়। তাই কেবল প্রকৃতি বিজ্ঞানের আলোকেই তার সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। মানুষ একটি জীবন্ত সত্তা বিশেষ। তাই সে জৈবিক নিয়ম ধারার অধীন। এক্ষেত্রে মানুষ জীব বিজ্ঞানেরও বিষয়বস্তু। কিন্তু মানুষ নিছক একটি জীবই মাত্র নয়। তাই কেবল জীববিজ্ঞান কিংবা প্রাণীবিজ্ঞান হতে তার জীবনের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেনা। মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য খোরাক, পোশাক এবং বাসস্থানের প্রয়োজন আছে। এজন্যই অর্থনীতি তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বটে। কিন্তু মানুষ কেবল একটি জৈবিক পশুই নয় - শুধু

খাওয়া, পরা, বাসস্থান নিয়েই সে বাঁচতে পারেনা। কাজেই শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থে অর্থনীতির ওপরই তার জীবন দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করা একটি মারাত্মক নির্বুদ্ধিতাও বটে। মানুষ তার প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বংশ বৃদ্ধি করতে বাধ্য। তাই তার মধ্যে প্রবল যৌন প্রবৃত্তি বর্তমান আছে। এই যৌন সম্পর্কিত জ্ঞান তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু মানুষ শুধু বংশ বৃদ্ধির একটি যন্ত্র মাত্র নয়। তাই কেবল যৌনতার দৃষ্টিতে তাকে বিচার করা অবশ্যই সংগত হতে পারে না। মানুষের মধ্যে একটি মন আছে, তার চেতনা ও অনভতির বিভিন্ন শক্তি এবং আবেগ ও লালসার বিভিন্ন ভাবধারা রয়েছে। কিন্তু সে আপাদমস্তক লে মন মাত্র নয়। তাই শুধু মনোবিজ্ঞান দ্বারাই তার জীবনের কর্মপন্থা রচিত হতে পারে না। মানুষ একটি সামাজিক জীব। তার প্রকৃতিই তাকে যৌথ জীবন যাপনে বাধ্য করে। এই দিক বিবেচনা করে দেখা যায় যে, তার জীবনের এক বিরাট অংশ হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান। কিন্তু সে নিছক সামাজিক জীবই নয়। তাই শুধু সমাজ বিজ্ঞানীরাই তার জীবন বিধান রচনা করতে পারে না।

মানুষ একটি বুদ্ধিমান সত্তাও বটে। তার মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উর্ধ্বে অবস্থিত বুদ্ধি জগতের অনুসন্ধিৎসাও বর্তমান। তাই মানুষ বুদ্ধি ও যুক্তির দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত ও স্বতঃসিদ্ধ হতে চায়। এ কারণেই যুক্তিবিদ্যা মানুষের একটি বিশেষ আবেদন পূর্ণ করে। কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণরূপে একটি বুদ্ধিময় সত্তাই নয়, কাজেই নিছক যুক্তি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তার জীবন ব্যবস্থা রচিত হওয়ার কোন সুযোগ নাই। মানুষ নীতিধর্মী ও আধ্যাতাবাদী বটে। তাই ভালমন্দের তারতম্য বিচার এবং ইন্দিয়গাহ ও অতীন্দ্রিয় নিগূঢ় সত্য লাভ করার একটি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণা তার মধ্যে বর্তমান আছে। এই দিক থেকে নীতি বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা তার জীবনের আর একটি গুরুতপূর্ণ ভূমিকা দাবি করে। কিন্তু এ শুধু নীতি ও আত্মসর্বস্ব নয় বিধায় নীতি বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মবাদ হতেই তার জীবনের বিধান রচনা করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো একই সত্তার মধ্যে এই সকল উপাদান একই সাথে ক্রিয়াশীল। তাই বিচ্ছিন্নভাবে এর কোনটির ওপর মাত্রাতিরিক্ত বা ন্যূন গুরুত্ব দিলেই ব্যক্তি চরিত্রে ও তার কর্মকান্ডের ভারসাম্য বিনষ্ট। (তাই একজন রসুল বা আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত রসুলের উত্তরাধিকারীই মানুষের অন্যান্য সমস্যাসহ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত) যাহোক, আপাতত আমরা একজন স্বাভাবিক মানুষ কিভাবে বা কি পরিস্থিতিতে তার দুনিয়ার জীবনের মুখোমুখি হয় তা বিশ্লেষণ করবো।

দুনিয়ার সংজ্ঞা পবিত্র কোরআনের সুরা আল এমরানের ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : “মানুষের জন্য তাদের মনঃপূত জিনিস নারী, সন্তান, স্বর্ণ, রৌপ্যের স্তূপ, বাছাই করা হোড়, গৃহপালিত পশ ও কৃষি জমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া এবং এসব সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ি জীবনের সামগ্রী মাত্র। মূলত চিরস্থায়ি আশ্রয়স্থল খোদার নিকটই রয়েছে।”

পার্থিব বস্তুর মোহ আকর্ষণের তীব্র প্রতিযোগিতা সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বলা :

তোমাদের বেশি বেশি ও অপরের তুলনায় অধিক সুখ সম্পদ লাভের চিন্তা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে।..... এমন কি ইহা (এই চিন্তা) তোমাদেরকে কবর পর্যন্ত নিয়ে যায়।” - সুরা তাকাসূর, আয়াত : ১-২।

আলোচ্য আয়াতটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় কোন জিনিস বেশি বেশি পাওয়ার লোভ ও কোন জিনিস হতে গাফিল হয়ে যাওয়ার কথা, তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয় নাই। এই অস্পষ্টতা ও অনির্দিষ্টতার কারণে এই শব্দগুলোর ব্যাপক অর্থ প্রকাশ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে দুনিয়ার সব রকমের স্বার্থ সুবিধা, বিলাস সামগ্রী, স্বাদ আস্বাদনের উপায় উপকরণ এবং শক্তিও ক্ষমতার উৎস বেশি লাভ করার চেষ্টা সাধনা করা, লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় অন্যদের তুলনায় বেশি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা এবং অন্যদের তুলনায় বেশি মাত্রায় দুনিয়ার স্বার্থ লাভ ও সে ব্যাপারে পরস্পর হতে অনেক বেশি অগ্রসর হওয়া এবং অন্যদের তুলনায় সে ব্যাপারে গৌরব করার ভূত যেন মানব জাতির ওপর চেপে বসে আছে।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে এই বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে টিকে থাকতে হলে প্রচন্ড পরিশ্রম তথা কষ্ট ও দুশ্চিন্তায় জীবন কাটাতে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে এই দুনিয়ায় আল্লাহতা’লা মানুষের জন্য এ ধরনের জীবনই নির্ধারণ করেছেন। পবিত্র কোরানের সুরা বালাদ এর ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

"বস্তুত আমি মানুষকে কঠোর কষ্ট ও শ্রমের জন্য সৃষ্টি করেছি"।

একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলেই দেখা, বুঝা ও অনুভব করা যায় যে বাস্তবিক পক্ষে মানুষের জন্য এই পার্থিব জগত শ্রম, কষ্ট ও কঠোরতা ভোগ করার স্থান। এখানে কোন মানুষই তা হতে মুক্ত নয়। মায়ের গর্ভে স্থান লাভ করা হতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষের জীবন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তাকে প্রতি পদে দুঃখ, শ্রম, কঠোরতা, বিপদাপদের বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এটাই মানুষের জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম অর্থাৎ পার্থিব কর্মকান্ডের কারখানাটি এরূপ ভাবে গড়ে দেয়া হয়েছে এবং মানুষের স্বভাবে কামনা বাসনা ও আকর্ষণ, উত্তেজনা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে যে সৃষ্টি জগতের সর্বত্রই কর্মচাঞ্চল্য ও সংগ্রাম মুখতা অব্যাহত গতিতে চলছে। এই স্বভাব মানব জাতিকে শুধু কর্মব্যস্তই রাখেনা বরং এর মধ্যে সে প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করে।

সৃষ্টির কারখানার আশ্চর্য লীলা হলো ভিন্ন পাত্র, ভিন্ন কাজ, অবস্থা আলাদা, উদ্দেশ্যও ভিন্ন অথচ জীবনের আকর্ষণ ও কর্মচাঞ্চল্য সর্বত্র একই রূপে বিরাজমান। নারীপুরুষ, বালক-যুবক-আমির-ফকির-আলেম-জাহেল, সবল-দুর্বল, রুগ্ন-সুস্থ্য, নিঃসঙ্গসসংগ, গর্ভবতী-স্তন্যদাত্রী ইত্যাদি সবাই নিজ নিজ কাজে গভীর ব্যস্থতা রয়েছে। প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনে, ভিক্ষুক তার দুঃখ দুর্দশার জীবনে সমানভাবেই কাজের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে। কে যে বেশি কাজ করছে, কে কম কাজ করছে তা বলা দুঃসাধ্য। একজন ব্যবসায়ি যতখানি গুরুত্ব সহকারে নিজের কোটি টাকার আমদানির হিসেব করে। ততটুকুই গুরুত্ব নিয়ে একজন শ্রমিক তার সারাদিনের পারিশ্রমিক হিসেব করে নেয়। উভয়ের কাছেই জীবনের দাবির গুরুত্ব ও আকর্ষণ সমান। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্ব স্ব ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে, সবার গুরুত্বই অপরীসিম।

এই জীবন সংগ্রাম বৈচিত্র্যময়, সুন্দর ও সুকৃঙ্খল ও অর্থবহ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে মানুষের জীবনের উপায় উপকরণের (রিজক) মালিকানায় বৈপরীত্য ও কম বেশি করে বন্টন করা হয়েছে।

এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনের সুরা আনয়ামের ১৬৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছেঃ এবং (আল্লাহতা'লা) তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে অপর কোন কোন লোকের মুকাবিলায় অধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। এই উদ্দেশ্যে যেন তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।

আয়াতটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মানুষে মানুষে মর্যাদা তথা জীবিকার উপায় উপকরণের যে পার্থক্য আছে তা আল্লাহর এক রহস্যপূর্ণ বিধানের অধীন। এ কারণেই সমাজে দেখা যায় যে কারো দায়িত্বের পরিধি অনেক বড় ও ব্যাপক আর কারো দায়িত্বের পরিধি সীমাবদ্ধ, আবার কারো অনেক বেশি জিনিসের ওপর হস্তক্ষেপ বা কর্তৃত্ব করার অধিকার-ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, কাউকে কম সংখ্যক বা পরিমাণ জিনিসের ওপর। কোন কোন মানুষ আবার কোন মানুষের নিকট আমানত স্বরূপ।

মানুষের গোটা জীবনই হলো একটি পরীক্ষাগার আর যাকে আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন তাতেই তার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ সে খোদার প্রদত্ত এই আমানতের সাথে কিরূপ ব্যবহার করছে, আমানতের দায়িত্ব সে কতখানি উপলব্ধি করছে বা তার কতখানি দায়িত্ব সে পালন করেছে এবং মানুষ হিসেবে নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার পরিচয় সে কতখানি দিতে পেরেছে। এসব বিষয়েই তার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। এই পরীক্ষার মাধ্যমেই তার জীবনের পরবর্তী স্তরে মানুষের মর্যাদা নির্ধরিত হবে। কিন্তু সাধারণভাবে দুনিয়ার এই পদ মর্যাদায় পার্থক্য ও রিজক বন্টনের ব্যবস্থার যে যুক্তি ও কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লোক তা বুঝতে পারে না। ফলে তাদের মনে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে আল্লাহ যাকে বিপুল রিজক দান করেছেন সে বুঝি তার খুব প্রিয় পাত্র আর যাকে তা অল্প ও সামান্য পরিমাণে দিয়েছেন তার প্রতি বুঝি খোদার গজব বা অসন্তুষ্টি। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

"ইহারা (খোদাদ্রোহী/জালেম) কি মনে করে আমরা যে তাহাদেরকে ধন ও সন্তান দিয়া সাহায্য করিয়া যাইতেছি, তবে কি আমরা তাহাদের কল্যাণ বিধানে তৎপর ? না, তাহা নয়, প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে ইহাদের কোন চেতনা নাই।"-মুমেনুন, ৫৪-৫৬।

সাধারণভাবে কল্যাণ, মঙ্গল ও আর্থিক বা বৈষয়িক সফলতা, সংকীর্ণ, বস্তুগত ও সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে লোক ভাল খাওয়া-পরা পেল, সুন্দর ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে পারল ধন ও জনবলে মহিমান্বিত হল সমাজে যার খুব নাম ডাক ও প্রভাব প্রতিপত্তি বস্তুবাদী লোকের দৃষ্টিতে সেই লোকই সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করল আর যে তা হতে বঞ্চিত থাকল, সে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই মৌলিক ভুল ধারণার কারণে তারা আর একটি বড় ধরনের ভুল চিন্তাধারার মধ্যে পড়ে গেল। তাহলো বস্তুগত অর্থে যে লোক কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করল সে অবশ্যই সঠিক পথে আছে এবং সে খোদার প্রিয় লোক অন্যথায় এই সাফল্য লাভ করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে। পক্ষান্তরে যে লোক এই পার্থিব সফলতা হতে বঞ্চিত সে নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট । প্রকৃতপক্ষে এই ভুল ধারণা মানব জাতিকে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে অন্য কোন মতবাদ বা ধারণা মানব জাতিকে সেরূপ ক্ষতিগ্রস্থ করতে সক্ষম হয় নাই। সুরা জুখরুফে এ ব্যাপারে আল্লাহর বিধানের স্বরুপ এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

দুনিয়ার জীবনে তাহাদের জীবন-যাপন সামগ্রী তো আমরাই বণ্টন করিয়াছি, আর তাহাদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের ওপর আমরাই প্রাধান্য দিয়াছি, যেন ইহারা পরস্পর হইতে কাজ লইতে পারে। আর তোমার খোদার রহমত সেই ধন সম্পদ হইতে অধিক মূল্যবান যাহা (তাহাদের বস্তুবাদী লোকেরা) দুই হাতে সংগ্রহ করিতেছে। সব লোক এই নীতির অনুসারী হইয়া যাইবে এই আশঙ্কা হইলে আমরা দয়াময় খোদার অমান্যকারীদের ঘরের ছাদ ও উহাদের সিড়িগুলি যাহার সাহায্যে নিজেদের বালাখানাসমূহে আরোহন করে আর তাহাদের দরজা এবং তাহাদের সেই আসনসমূহ যাহাতে তাহারা ঠেস দিয়া বসে– সবই স্বর্ণ ও চাদির বানাইয়া দিতাম। ইহা তো শুধু দুনিয়ার জীবনের জীবিকা ও সামগ্রী। আর পরকাল তোমার খোদার নিকট কেবলমাত্র মুত্তাকী লোকদের জন্য নির্দিষ্ট।

বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তার রহমত দিয়ে কাকে ধন্য করবেন আর কাকে তা দেবেন না এটা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ক্ষমতাধীন। এই ক্ষমতার আওতায় মহান আল্লাহ রাব্বল আলামিন দুনিয়ায় বসবাস করার জন্য জরুরি সাধারণ উপায়উপকরণ বণ্টন ও তাঁর হাতেই রেখেছেন। তিনি কাউকে সুন্দর, কাউকে কুৎসিত, কাউকে মিষ্ট স্বর, কাউকে ক্ষীণকায়, কাউকে সবল, কাউকে দুর্বল, কাউকে প্রতিভাশালী, মেধাসম্পন্ন, কাউকে অল্প বৃদ্ধি, কাউকে তীক্ষ স্মরণশক্তি, কাউকে বেভুলা, কাউকে নির্দোষ অঙ্গবিশিষ্ট দেহ, কাউকে পঙ্গু, অন্ধ, বধির, বোবা, কাউকে ধনী, কাউকে গরিব, কাউকে উন্নত জাতির একজন, কাউকে অনুন্নত জাতির সদস্য বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কাউকে দয়াশীল, কাউকে নিষ্ঠুর ও হিংগ্র, কেহ মার্জিত, কেহ আক্রমণাত্মক, হে ফর্সা, কেহ কালো, কেহ ভাষাতত্ত্ববিদ, হে অংকশাস্ত্রে পারদশী, কেহ সৃজনশীল ও শিল্পী, কেহ প্রকৌশলী ও কেহ বা আইনবিদ। এই জনাগত পরিস্থিতি পরিবেশ বা অবস্থার ওপরে কারও বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রন নেই। যাকে যা বানিয়ে দেয়া হয়েছে সে তাই হতে বাধ্য। আর এই বিভিন্ন জন্মগত অবস্থার যে প্রভাব তার জীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ডে প্রতিফলিত হয় তা পরিবর্তন করে অন্য কিছু হওয়া বা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তাছাড়া মানুষের পরস্পরের মধ্যে জীবনের উপকরণাদি বণ্টন, শক্তি সামর্থ, ইজ্জত সম্মান, খ্যাতি সুনাম, ধন সম্পত্তি ও ক্ষমতার বণ্টন আল্লাহ করে থাকেন। এই খোদায়ি ব্যবস্থায় একটি স্থায়ি নিয়মের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সেই বিধানটি হলো এই যে এখানে একজনকে সবকিছু দেয়া হয় নাই, আর সব কিছু সকলকেও দেয়া হয় নাই। একজন সাধারণ বিবেকবান লোক খোলা মনে চারিদিকে তাকালেই দেখতে পায় যে বিস্তীর্ণ জন-সমুদ্রে সবদিক থেকে মানুষে মানুষে কেবল পার্থক্য, বৈষম্য ও অসাম্যই বিরাজমান। কাউকে কোন জিনিস দেয়া হয়েছে অপরকে তা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যে বিশেষ যুক্তি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এইরূপ করা হচ্ছে, তাহলো: কোন মানুষ যেন অন্য লোকদের থেকে সম্পর্কহীনভাবে না থাকতে পারে বরং প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের প্রতি ঠেকা বা মুখাপেক্ষী হয়ে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হয়।

এই ধন-সম্পদ, সম্পত্তি ঐশ্বর্য কেহ লাভ করে থাকলে অনেকে মনে করে যে সে চরম ও পরম সফলতা লাভ করে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ তা আল্লাহর নিকট এতই হীন ও নগন্য যে সমস্ত মানুষের কুফরির দিকে ঝুঁকে পড়ার আশঙ্কা থাকলে প্রত্যেক খোদাদ্রোহীর ঘরকে তিনি সূর্ণ-রৌপ্যের বানিয়ে দিতেন। এই জাতীয় সম্পদের প্রাচুর্য মানুষের ভদ্রতা, পবিত্রতা, ও উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ কিভাবে হতে পারে ? এইরূপ ধন-সম্পদ তো দুনিয়ার নিকষ্টতম লোকগলোর নিকটও স্তুপাকার রয়েছে। যাদের কদর্য ও জঘন্য

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমগ সমাজ পরিবেশকে দঃসহ করে তুলেছে। এহেন জিনিসকেই মানুষেরা অজ্ঞতাবশত শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই নিখিল বিশ্ব অত্যন্ত সুন্দর আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় হিসেবে তৈরি করেছেন। বিষয়টি পবিত্র কোরআনের সুরা ফাতির এর চতুর্থ রুকুতে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

"তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করছেন, পরে উহার সাহায্যে আমরা রকম বেরকমের ফল বাহির করে আনি; যেগুলোর বর্ণ বিভিন্ন ? পাহাড়ে, সাদা, লাল, গাঢ় কালো রেখা পাওয়া যায় যেগুলোর রং ও নানা প্রকারের।

এমনিভাবে মানুষ, জন্তু জানোয়ার ও গৃহপালিত পশুগুলোর বর্ণ ও বিভিন্ন প্রকারের। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর ইলম সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে।"

এখানে একটি কথা বুঝানো হচ্ছে তা এই যে, খোদার সৃষ্টিলোকে কোথাও একই রং, একই অবস্থা ও একঘেঁয়েমীপূর্ণ অভিন্নতা নাই। চারিদিকে আছে শুধু বৈচিত্র্য ও রকম বেরকমের ছড়াছড়ি। মাটি এক, পানিও এক, কিন্তু তা হতেই বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ও বৃক্ষলতা উদগত হচ্ছে। অথচ একটি গাছের দুটি ফল ও বর্ণ, আকার স্বাদের দিক দিয়ে একই রং ও মানের নয়। এই পাহাড়ে নানা প্রকারের বর্ণ পরিদৃষ্ট হয়। যার বিভিন্ন অংশের বস্তুগত সংগঠন, সংমিশ্রণেও বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মানুষ ও জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে একই পিতামাতার দুই সন্তান কখনও এইরকম হয় না। এই বিশ্বলোকে কেহ যদি মেজাজ প্রকৃতি, স্বভাব ও মানসিকতায় ঐক্য ও সাদৃশ্যের সন্ধান করে তা হবে এক বিরাট নিবুদ্ধিতা। এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্য হতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই পৃথিবীতে এক মহা পরাক্রান্ত প্রবল সুবিজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা, অসংখ্য যৌক্তিকতা ও কল্যাণ দৃষ্টি সহকারে সৃষ্টি করেছেন। এর নির্মাতা অবশ্যই কোন তুলনাহীন সৃষ্টিকর্তা, দৃষ্টান্তহীন নির্মাতা ও শিল্পী-কুশলী। তিনি প্রত্যেক প্রকারের জিনিসের একই নমুনা নিয়ে বসে নেই। তার নিকট প্রত্যেক জিনিসের জন্য নতুন নতুন ডিজাইন ও অসংখ্য ও অপরিমেয় ডিজাইন বর্তমান। তাছাড়া বিশেষভাবে মানবিয় স্বভাব ও মানসিকতার পার্থক্য সম্পর্কে চিন্তা করলেই জানতে পারা যায়। এরূপ হওয়াটা কোন অনিচ্ছাক্রমে আপনা আপনি বা কাকতালীয় ঘটনা নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা সৃষ্টিকুশলতারই পরিচায়ক। সমস্ত মানুষকে যদি জন্মগতভাবেই নিজেদের প্রকৃতি গঠন, লালসা, বাসনা, আবেগ, উচ্ছ্বাস, ঝোঁক, প্রবণতা ও চিন্তা পদ্ধতির দৃষ্টিতে একই রকম; অভিন্নতা ও পার্থক্যহীন বানিয়ে দেয়া হত, আর কোন রকমেরই পার্থক্যের অবকাশ না রাখা হতো তাহলে দুনিয়ায় মানুষকে এক নতুন রকমের সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করাই অর্থহীন হয়ে যেতো। সৃষ্টিকর্তা যখন এই মাটির পৃথিবীতে এক দায়িত্বশীল ও এক ধরনের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সৃষ্টির অস্তিত্ব দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন তার গঠন প্রকৃতিতে সব ধরনের বিরোধ পার্থক্যের অবকাশ রাখাই অনিবার্য ছিল।

এই মহা বিজ্ঞানী আল্লাহর সৃষ্ট মানব জাতিকে তাই আকৃতিগত, প্রকৃতিগত ও বস্তুগত বিভিন্নতা নিয়ে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। অর্থাৎ কেহ চেহারার সুন্দর বৈশিষ্ট্যের জন্য জননন্দিত হয়ে সমাজে দিকপাল বা জননেতা হয়ে বিপুল পরিমাণ ধন সম্পদের মালিক হতে পারে। আবার কেহ জন্মগতভাবে ধনী লোক হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মিথ্যাচার ও ভোগ লালসার কারণে দীনহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে। কেহআবার গরিব হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও মেধাজনিত কারণে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

বস্তু তথা পরিবেশগত বিভিন্নতা, প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য ও আকৃতিগত ভিন্নতা নিয়ে সাধারণভাবে মানুষ তার জীবন ধারণের সকল প্রকার উপায় উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। অর্থাৎ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বেশি বেশি ধন সম্পদ, বৈষয়িক স্বার্থ, স্বাদ-সুখ সম্মান প্রতিপত্তি সুন্দরী স্ত্রী/মহিলা লাভ করতে সচেষ্ট থাকে এবং এ ব্যাপারে পরস্পর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতায় সকলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় মেতে ওঠে। ক্ষেত্রবিশেষে এসব জিনিস লাভ করে অন্যের ওপর গৌরব অহংকার করে এবং খোটা দিয়ে থাকে। এই সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা পরিধি ও ব্যপ্তি বোঝানোর জন্য রসুল (দ.) এরশাদ করেছেন–

"আদম সন্তান যদি দুই উপত্যকা ভর্তি সম্পদ পায় তবুও সে তৃতীয় উপত্যকা পেতে চাইবে। আদম সন্তানের পেট মাটি (কবর) ছাড়া অন্য কোন জিনিসেই ভরতে পারেনা (বোখারি)। মানুষের কর্মচেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে

ফল লাভ করা সাধারণভাবে স্বীকৃত নীতি। পৃথিবীর সকল ধর্মমত এই মূলনীতিকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এই কথাই পবিত্র কোরআনে সুরা নজম এর ৩৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : "সে কি সে সব বিষয়ে– অবহিত হয় নাই যা মুসার সহিফাসমূহের এবং ইব্রাহিমের সহিফাসমূহে বলে দেয়া হয়েছে, যে ওয়াদা পালন ও আত্মোৎসর্গ কনের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে এই যে, কোন বোঝা বহনকারী অন্য লোকের বোঝা বহন করবে না এবং মানুষের জন্য কিছুই নাই শুধু যার জন্য সে চেষ্টা করেছে।"

এই আয়াতটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু পাবে তা নিজের কর্মের ফল স্বরূপ পাবে অর্থাৎ শ্রম চেষ্টা সাধনা ব্যতীত সাধারণভাবে কাউকে কিছু প্রদান করা হয় না।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মৌলিক মানবিয় চরিত্র বলতে বুঝায় সেই সব গুণ বৈশিষ্ট্য যার ওপর মানবীয় সকল কর্মকান্ডের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। মানুষ কোন সৎ উদ্দেশ্যের জন্য কোন কাজ করুক কি ভুল ও অসৎ উদ্দেশ্যে সকল অবস্থায় এই প্রাকৃতিক বিধান কার্যকর। অর্থাৎ মানুষ, খোদা, ওহি, রসুল এবং পরকাল বিশ্বাস করে কি করে না, তার হৃদয় কলুষমুক্ত কিনা, নিয়ত ও লক্ষ্য কল্যাণময় কিনা, সে নিজে সং গুণ ও সৎকর্মে ভূষিত কিনা, এসব প্রশ্ন এখানে অবান্তর। সাধারণভাবে পার্থিব সাফল্য লাভের জন্য অপরিহার্য গুণগুলো আয়ত্ব করলেই সে কম বেশি সাফল্য অর্জন করে থাকে এবং ঐ সব গুণের দিক দিয়ে পশ্চাদপদ ব্যক্তিরা প্রতিদ্বন্দিতায় প্রথম ব্যক্তির পশ্চাতেই পড়ে থাকে।

চরিত্র ও কর্মপ্রচেষ্টা যাই হোক না কেন কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি ইচ্ছা শক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি, প্রবল বাসনা, উচ্চাশা ও নির্ভিকতা, সাহস, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা, তিতিক্ষা, ও কৃচ্ছ সাধুনা সহনশীলতা ও পরিশ্রমপ্রিয়তা, উদ্দেশ্যের আকর্ষণ ও সেজন্য সবকিছুই উৎসর্গ করার প্রবনতা, সতর্কতা, দূরদৃষ্টি, বোধশক্তি ও বিচার ক্ষমতা, পরিস্থিতি যাচাই করে তদনুযায়ী নিজেকে ঢেলে গঠন করা ও অনুকূল কর্মনীতি গ্রহণ করার যোগ্যতা, নিজের হৃদয়াবেগ, ইচ্ছা, বাসনা, স্বপ্নসাধ, উত্তেজনা, সংযম শক্তি এবং অন্যান্য মানুষকে আকৃষ্ট করা, তাদের হৃদয়মনে প্রভাব বিস্তার করা এবং তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করার দূর্বার বিচক্ষণতা কারো মধ্যে পুরোপুরিভাবে বর্তমান থাকে, তবে এই দুনিয়ায় তার জয়। তার জন্য নির্ধারিত আল্লাহর সৃষ্টি তকদির" বা ভাগ্যের অধীনে সুনিশ্চিত, পক্ষান্তরে মানব জীবনকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অনেকেই যথেষ্ট মেধা, শ্রমও ঐকান্তিকতাসহ কাজ করা সত্বেও আশানুরূপ ফল লাভে ব্যর্থ হয়। আবার প্রায় সম পরিমাণ মেধা, শ্রম ও ঐকান্তিকতা থাকা সত্বেও পার্থিব কর্মকান্ডে একই রকম ফল লাভ হয় না বরং কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন বিশেষ পরিস্থিতি/অবস্থানের কারণে যে পদ মর্যাদা লাভ করে তার সমপরিমাণ শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন সহকর্মী একই সময়ে এ ধরনের সুবিধা লাভ করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ও সম মেধা সম্পন্ন ছাত্রদের পরবর্তী জীবনের কর্ম পরিধি ও প্রাপ্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাদি কোনক্রমেই সমপরিমাণ হয় না বা হওয়াই সম্ভব নয়। কম সামাজিক সুযোগ সম্পদ প্রাপ্ত ব্যক্তির এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করলে মেধা শ্রম ও ঐকান্তিকতার অভাবই তার সামাজিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাগত যোগ্যতা, শ্রম, প্রচেষ্টা প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার করা সত্ত্বেও ব্যক্তি বিশেষের পার্থিব সাফল্যের বৈষম্যের মূল কারণই হচ্ছে তার তকদির যা তার জন্য পূর্ব নির্ধারিত। পবিত্র কোরআনের সুরা আবাসার ১৯-২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : "আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন পরে তার (তকদির/নিয়তি) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।"

অর্থাৎ মানুষ যখন মায়ের গর্ভে কেবল দানা বেঁধে উঠতে থাকে, ঠিক তখনি তার তকদির-নিয়তি-ভাগ্য নির্দিষ্ট করা হয়। সে কোন লিঙ্গের হবে, তার বর্ণ কি হবে, তার আকার আকৃতি কিরূপ হবে, তার অবয়ব কতটুকু ও কেমন হবে তার অংগ প্রতংগ কতটা নিখুঁত ও কতটা অসম্পূর্ণ হবে তার মুখের গঠন ও কণ্ঠস্বর কিরূপ হবে। তার দৈহিক শক্তি ও সামর্থ কতটা হবে। তার স্মরণ শক্তি, মেধা ও মানসিক যোগ্যতা কিরূপ হবে, কোন ভূখন্ডে কোন বংশে, কোন অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে সে ভূমিষ্ঠ বা লালিত পালিত হবে এবং শেষ পর্যন্ত সে কি হবে। তার ব্যক্তিত্ব গঠনে উত্তরাধিকারের প্রভাব, পরিবেশের প্রভাব ও তার নিজের অহংজ্ঞান তথা আত্মসচেতনতার কি ও কতটা প্রভাব পড়বে, পার্থিব জীবনে সে কোন ভূমিকা পালন করবে। সে কোন ধরনের

পরিবারে বিয়ে করবে তার সন্তান-সন্ততি তাকে কতটা উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্থ করবে, তার কখন কি কি ধরনের অসুখ হবে। এই পৃথিবীতে কতদিন তাঁকে কাজ করবার অবকাশ দেয়া হবে। তাকে কখন কি পরিমাণ রিজক তথা সকল প্রকার জীবনের উপকরণাদি প্রদান করা হবে। মানুষের সামগ্রিক কর্মকান্ডের এই পরিকল্পনার নামই হচ্ছে তকদির। অনুরূপভাবে বিশ্বলোকের প্রতিটি বস্তু ও সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের জন্য এই তকদির নির্দিষ্ট করা আছে। অর্থাৎ অপরিকল্পিতভাবে মানব সন্তানকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয় নাই।

এই তকদিরের বিধানের অধীনে আল্লাহতা'লা যাকে ইচ্ছা তাকে যে পরিমাণ তিনি বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণ জীবনের উপায় উপকরণ দান করে থাকেন। তবে এই দান একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে করা হয়। পবিত্র কোরআনে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

"তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর এক কাল নির্দিষ্ট করেছেন। আর একটি নির্ধারিত সময়সীমা আছে যা তিনিই জানেন।" (আনয়াম-২)

এই পার্থিব জীবনে মানুষ যে যে অবস্থায় আছে তা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দুনিয়ার জীবনের আরাম আয়েশের কিছু সামগ্রী ও শান-শওকত এবং ক্ষমতার দাপট যেভাবেই অর্জন করা হোক না কেন তা আল্লাহর নির্ধারিত সময়সীমার অতিরিক্ত নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখা সম্ভব হয় না। তাছাড়া এই সময়সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত নানা ধরনের জটিলতা, ক্ষয়ক্ষতি, দুশ্চিন্তা অবশ্যই ভোগ করতে হয়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

"আমরা নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, জান মালের ক্ষতি এবং জীবনের উপায় উপকরণের হ্রাস ঘটাইয়া তোমাদের পরীক্ষা করি।" - (বাকারা- ১৫৬)

মানুষ যে অবস্থানেই থাকুক না কেন আল্লাহর এই বিধানের অধীনে তার জীবন চলার পথে এ ধরনের বিপদাপদ দুঃখ, কষ্ট, শস্যহানি বা ব্যবসায়ে বা চাকুরিতে সাময়িক মন্দা বা অসুবিধা ইত্যাদি অনিবার্য ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে কারও জীবন যাত্রা নির্বাহ না হয়ে যদি নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আরাম ও অনায়াসে যদি কারো জীবিকা অর্জন হতে থাকে সেক্ষেত্রে তার চরিত্রে নানা ধরনের অসংগতি ও মানব চরিত্রের সকল জঘন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

"আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাগণকে উন্মুক্ত রেজেক দান করতেন (করেন) তা হলে তারা জমিনের বুকে খোদাদ্রোহিতা (মানুষের ওপর জুলুম অত্যাচার, গর্ব ও অহংকারে ফেটে পড়া)। কিন্তু তিনি একটা পরিমাণ অনুযায়ী (নির্দিষ্ট সময়ে) যতটা চাহেন নাজিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তার বান্দার সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।"

আলোচ্য আয়াতটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আল্লাহ সাধারণভাবে তার বান্দাদের মন মানসিকতা, বয়স প্রভৃতি বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিকে নির্ধারিত সময়ে/নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবনের উপকরণাদি সরবরাহ করে থাকেন। যদি কেহ এই খোদায়ি পন্থা ও পদ্ধতিতে অর্থাৎ হারাম হালাল বিবেচনা করে সন্তুষ্ট না হয় তাহলে অন্য একটি খোদায়ি বিধানের অধীনে তাকে বা তাদেরকে 'উন্মুক্ত রিজক' অর্থাৎ সহজ পদ্ধতিতে ন্যায় অন্যায় বিবর্জিত পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণ জীবন যাপনের উপায়/উপকরণ সরবরাহ করা হয় ফলে তারা প্রাজ্ঞ না হয়ে চালাক হয়ে যায়। সৎ না হয়েও স্বচ্ছল হয় এবং হৃদয়বান না হয়েও বিশিষ্ট হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে তারা সচরাচর বলগাহীনভাবে স্বাধীন জীবন যাপন করে এবং জৈবিক প্রবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করার ব্যাপারে কোন নৈতিক বা ধর্মীয় বিধি নিষেধ মানতে বাধ্য থাকে না। তখন আপাত মধুর ও সুখকর জীবনে সে খুবই আনন্দ পায় এবং সেই আনন্দ ত্যাগ করতে সে স্বেচ্ছায় রাজি হয় না। তখন তাকে যতই আদেশ উপদেশ অনুরোধ ও যুক্তি প্রমাণের দ্বারা নৈতিক তথা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মানতে, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে বলা হোকনা কেন, সে সঠিক বা সৎ পথে আসতে চায় না। ক্রমাগত ও অব্যাহতভাবে অন্যায় ও অসৎ কাজ করতে করতে তার বিবেক বুদ্ধি চেতনা ও প্রজ্ঞার ওপর এমন একটি আচ্ছাদন পড়ে যায় যে এ ধরনের নৈতিক শিক্ষার কোন প্রভাব তার ওপর পড়তে পারে না। এমন কি ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্যকারী হিসেবে বিবেকের যদিও কিছুমাত্র প্রাণশক্তি থেকে থাকে তবুও তা তার প্রবৃত্তিকে। প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় না। তাই সত্যকে শুধুমাত্র সত্য হওয়ার ভিত্তিতেই

স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে গ্রহণ করার এবং বলগাহীন স্বেচ্ছাচারী জীবনে যে আনন্দ ও সুবিধা সে ভোগ করতো তা ত্যাগ করতে সম্মত হয় না। যদিও বিবেক সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে প্রকৃত সত্যকে সে জানে ও তার প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল থাকে। তাই এ জ্ঞানের অনিবার্য দাবি হলো যে আচরণকে সে ভুল বা ক্ষতিকারক বা কষ্টদায়ক বলে মনে করে তা পরিহার করা এবং যা সে নির্ভুল বলে জানত তা গ্রহণ করা কর্তব্য ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্থিব ও তাৎক্ষনিক, সুখ সুবিধা, স্বাদ, আনন্দ ও জাকজমক, অহংকার, অন্যকে পদানত করা ও অধীনস্থদের সাথে খারাপ বা মানবেতর আচরণ ও তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ তথা শোষণ এবং এ ধরনের কর্ম তৎপরতার দিকে সে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে লোভ লালসা, বেআইনি প্রাপ্ত উৎকোচ গ্রহণ যে কোন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় অর্থ বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকতর বিলাসবহুল জীবন যাপন করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্রমাগতভাবে নিজেকে পতনের গভীর দিকে চালিত করে। শুধুমাত্র লোভ লালসা, কামনা ও ক্ষুধা পিপাসা নিবৃত্তি তার জীবনের ব্রত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

কোন সমাজে এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায় তাহলে তারা মানব সমাজকে কি ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যায় পবিত্র কোরআনে তা' নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

"তোমরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারলে তোমরা পৃথিবীর বুকে অশান্তি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং মানবতার সহিত যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে - ইহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। এইরূপ যারা করে তাদের ওপর খোদার অভিসম্পাত, তাদের দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি অপহৃত হয়েছে কি ? তারা কি কোরআন পড়ে চিন্তা ও গবেষণা করে না? কিংবা ইহাদের অন্তর কি তালাবদ্ধ হয়েছে ? (যে তারা কোরআন পাঠ করে অথচ তা হৃদয়ংগম করেনা ? অথবা ন্যায় ও সত্যকে গ্রহণ করে না)।

আলোচ্য আয়াতপাকগুলো পর্যালোচনা করে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করাই সকল সমস্যার সমাধান নয় বরং চরিত্রহীন, ধনী বা লোভী ব্যক্তির ক্ষমতারোহন সেই জাতির লোকদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকেরা বা তাদের অনুসারীরা সমাজে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে তাকে বর্তমান পরিভাষায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা (Capitalist system) হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। মনে রাখা প্রয়োজন সাধারণ লোকের ওপর বিভিন্ন ধরনের অন্যায় ও অবিচারের পদ্ধতিগত ও মাত্রায় খুঁটিনাটি পার্থক্য থাকলেও পৃথিবীর সকল দেশেই এ ধরনের অর্থ ব্যবস্থাই অনাদিকাল থেকে চালু আছে থাকে। এই ব্যবস্থা পরিবর্তন ঘটানোর জন্য অধিকাংশ রাজনৈতিক আন্দোলন বা সমাজ সংস্কারের কথা বলা হয়। তবে এই অবস্থা পরিবর্তনের প্রবক্তরা সাধারণভাবে অর্থনীতি রাজনৈতিক ব্যাপারে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তাই তারা জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য অথবা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আপাত মধুর ও চটকদার কথাবার্তা বলে যাতে করে এইসব অত্যাচারীদের হাত থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র তারা নিজেরা দখল করতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে জুলুমবাজ শাসকদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হলে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এইসব আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হন। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর তারা বুঝতে পারে যে সব ওয়াদা তারা ক্ষমতা দখলের জন্য করেছে তা বাস্তবায়ন করা আদৌ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং ধীরে ধীরে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্য তারা তাদের পূর্বসূরীদের অনুসৃত রীতি পদ্ধতি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রাখে বা পুনঃ প্রচলন করে জুলুমবাজ শাসক হিসেবে চিহ্নিত হয়। পরবর্তীতে একই প্রক্রিয়ায় তারা ক্ষমতা থেকে অপসৃত হয়।

যাহোক, পুঁজিবাদী বা অন্য যে কোন নামই দেওয়া হোক না কেন অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি যে মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার মূল কথা হচ্ছে : প্রত্যেক ব্যক্তি একাই তার স্বোপার্জিত সম্পদের মালিক। তার উপার্জিত সম্পদে কারোর কোনরূপ অধিকার নাই। নিজের সম্পদ সে ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারে। অর্থোপার্জনের যে সব উপায় উপকরণ তার আয়ত্বাধীন থাকে সেগুলি কুক্ষিগত করে রাখার এবং সে সব ব্যবহার করতে অস্বীকার করার অধিকারও তার রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে স্বার্থপরতা, ক্ষমতার লোভ, অহংকার, আত্মগর্ব, শত্রুতা, অশুভ প্রতিযোগিতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিকাশের মানসিকতা থেকেই প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্ম। এর পরিপূর্ণ রূপটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়

যা, মানব সমাজের প্রকৃত কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অপরিহার্য গুণাবলীকে স্তিমিত ও নিস্প্রভ করে দেয়। নৈতিক দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে এই মতবাদের অনিবার্য পরিণতিতে সম্পদ বণ্টনের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়। সম্পদ আহরণের উপায় উপকরণসমূহ ক্রমাগতভাবে একটি

অধিকতর ভাগ্যবান" বা অপেক্ষাকৃত সতর্ক মানব গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে থাকে। ফলে সমাজ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হচ্ছে বিত্তশালী ও অপরটি বিত্তহীন শ্রেণি। বিত্তশালী শ্রেণি সম্পদ আহরণের যাবতীয় উপায় উপকরণ নিজস্ব অধিকার নিয়ে কেবলমাত্র তা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারে ব্যয় করে এবং স্বীয় সম্পদ অধিকতর বৃদ্ধি করার জন্য সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে তার ইচ্ছামত বিসর্জন দেয়। আর বিত্তহীন ধন সম্পদের অংশ ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। বিত্তবানদের স্বার্থের ঘানি টানার জন্য জীবনপাত করে দিনান্তে নিজের পেট পূর্তির জন্য সামান্যতম উপাদান সংগ্রহ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না। এ ধরনের অর্থ ব্যবস্থা একদিকে সুদখোর মহাজন, কারখানার মালিক ও অত্যাচারী জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটায় অন্যদিকে সৃষ্টি করে ঋণভারে জর্জরিত ও অধিকার বঞ্চিত শ্রমিক কৃষকদের এক ধরনের সর্বহারা শ্রেণির। এই অর্থ ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবে সমাজ জীবন থেকে দয়া-মায়া, মমতা, সহানুভূতি, সহৃদয়তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পূর্ণভাবে নিজের ব্যক্তিগত আয় উপার্জনের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। সেখানে কেউ কারও সাহায্য করে না। কেউ কারও প্রকৃত বন্ধু হয় না। অভাবী ও দরিদ্রের জীবন সংকীর্ণ ও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। একে অন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও প্রতিহিংসামূলক প্রচেষ্টা ও কর্মে অবতীর্ণ হয় বিধায় সন্ত্রাস এক ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী সামাজিক অনাচার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ফলে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ ও জীবন যাপনের সামগ্রী লাভ করার জন্য সবাই সর্বশক্তি নিয়োগ করে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেগুলো কুক্ষিগত করে রাখে এবং কেবলমাত্র সম্পদ বৃদ্ধির কাজে সেসব ব্যবহার করে। আর যারা এ সম্পদ সঞ্চয় ও বৃদ্ধির অভিযানে ব্যর্থ হয় অথবা এতে পুরোপুরি অংশগ্রহণে সক্ষম হয়না দুনিয়ার বুকে তাদের কোন সহায়। থাকে না তাদের জন্য ভিক্ষাও সহজলভ্য হয় না। তাদের জন্য কারোর মনে এক বিন্দু করুনাও জাগে না। তাদের সাহায্যের জন্য একটি হাতও প্রসারিত হয়না। নির্ধন ব্যক্তিরা সাহায্য চাইলে অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তি গরিবদেরকে নির্বোধ হিসেবে গালি দেয় অথবা তাদের ধর্মপরায়ণতাও তাদেরকে ভিক্ষা করতে বাধ্য করায় বলে অভিযোগ করে। আবার অধিক সন্তান-সন্ততিই তাদের অভাবের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সমাজের উপকারী হিতৈষী হিসেবে বিবেচনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। অনেক সময় ধনী ব্যক্তিরা ধর্মীয় বা বর্ণ বা পেশাগত কারণেও দরিদ্রদেরকে সামাজিকভাবে হেয় ও অকর্ম বলে বিবেচনা করে তাদেরকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালায়। ফলে নিপীড়িত অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার এই আদম সন্তানের জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আত্মহত্যা অথবা অপরাধমূলক ও নৈতিকতা বিরোধী নিকৃষ্টতর বৃত্তি অবলম্বন করে ক্ষুধার জ্বালা নিবারনসহ অন্যান্য অভাব মেটাতে বাধ্য হয়।

প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত জীবনে খোদার বিধান পালনের কার্যত অস্বীকৃতি বা অনীহার মাধ্যমে সমাজ জীবনে এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের অমানবিক পরিবেশ খোদায়ি গজব বা অভিসম্পাতেরই ফলশ্রুতি।

কোন সমাজের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ জনগণ যখন এই আজাবের শিকার তখন এর বিষক্রিয়া শুরু হয় মানুষের ভেতর থেকে আর তা অন্ধ করে দেয় তার অন্তদৃষ্টিকে তার চর্মচক্ষুকে করে না বটে কিন্তু তার জ্ঞান চক্ষুকে অন্ধ করে দেয়। যেমন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে:

"...তাহাদের মন আছে কিন্তু উহার সাহায্যে তাহারা চিন্তা ভাবনা করে না। তাহাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা উহারা দেখে না। তাহাদের শ্রবণ শক্তি আছে কিন্তু উহা দ্বারা তাহারা শুনতে চায় না। তাহারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মতো বরং তাহা হইতেও অধিক বিভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে ইহারা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমগ্ন।" (আরাফ -১১২)।

এহেন পরিস্থিতিতে মানুষ নিজের কল্যাণের জন্য যে কোন ধরনের কার্য পদ্ধতি গ্রহণ করুক না কেন তাই-ই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার পক্ষে হানিকর হয়ে দাঁড়ায়। সাফল্যের আশা নিয়ে যে পদক্ষেপই নেয় তাই তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তার সমগ্র শক্তিই হোষণা করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

পৃথিবীর ইতিহাসে এর অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। সকল তথাকথিত সভ্য জাতি এই একই রোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আজকেও আবার আমরা এই খোদায়ি বিধানের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। পাশ্চাত্য জাতিগুলোর সমাজ জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তা দেখা যাবে। তাদেরকে যতটা সম্ভব সতর্কীকরণ করা সম্ভব সবগুলোই করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ প্রলয়কান্ড, আর্থিক দুর্গতি, বেকারের আধিক্য, কুৎসিৎ ব্যাধির প্রকোপ, পারিবারিক ব্যবস্থার মহাবিপর্যয়। তাদের যদি দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক থাকতো তাহলে তারা এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলেই বুঝতে পারতো যে অন্যায়, অত্যাচার অবাধ্যতা, আত্মপূজা ও সত্যকে গ্রহণ না করার পরিণাম কি হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে তারা এই সব চাক্ষুষ নিদর্শন থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করছে না।

বরং সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনে তারা এক খুঁয়েমীর দিকে অধিক দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি ব্যধির মূল কারণে পৌঁছুচ্ছে না। তারা শুধু রোগ লক্ষণই দেখতে পাচ্ছে এবং তারই প্রতিকার করার ব্যাপারে নিজেদের সমস্ত চেষ্টা যত্ন ব্যয় করছে। এই কারণে ঔষধ যতোই প্রয়োগ করা হচ্ছে; ব্যাধিই ততোই বেড়ে চলেছে। এখন অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সতর্কবাণী ও যুক্তি প্রমাণের পর্যায় শেষ হচ্ছে এবং চূড়ান্ত ফায়সালার সময় অত্যাসন্ন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে বিশ্বের মুসলমানরা বিষয়টির গভীরে প্রবেশ না করে পাশ্চাত্য শক্তির অনুসরণে সকল প্রকার সমস্যার সমাধান আছে বিশ্বাস করে তাদের কর্মপন্থা গ্রহণ করে মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে এ ধরনের অর্থ ব্যবস্থায় সমাজ প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয় ধনী ও দরিদ্র । তবে বিশ্বপ্রকৃতির গোটা ব্যবস্থাপনাই এমনি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত যে এখানে কোন স্থিতি ও বিরতির অবকাশ নাই। এখানে এক অবিরাম গতি, পরিবর্তন ও আবর্তন বিদ্যমান।

কোন জিনিস বা অবস্থা অপরিবর্তনীয় বা স্টেটিক (STATIC) রাখা হয় না। এখানে সৃষ্টির সাথে লয়, ভাঙার সাথে গড়া, উত্থানের সাথে পতন হাত ধরাধরি করে চলেছে। একই সমতলে এর বিপরীত নিয়মও চালু আছে। একটি ক্ষুদ্রতম বীজ যেখানে বাতাসের বেগে উড়ে উড়ে বেড়ায়। পরবর্তীতে তা মাটিতে স্থিতি লাভ করে এক প্রকান্ড ডালপালাযুক্ত বৃক্ষে পরিণত হয়। আবার তাই শুকিয়ে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যায়। অতঃপর প্রকৃতির সঞ্জীবনি শক্তিগুলো তাকে ত্যাগ করে অন্য কোন বীজের লালন-পালনে নিয়োজিত হয়। এই হচ্ছে ভাঙা গড়ার বা উত্থান-পতনের নিয়ম । দুনিয়ার গোটা পরিবেশই আবর্তিত হচ্ছে। এই গতিক্রম চক্রের আবর্তনে জন্ম-মৃত্যু, যৌবন-বার্ধক্য, শক্তি-দৌর্বল্য, শীত-বসন্ত, শুষ্কতাসজীবতা সব কিছুই হচ্ছে এই আবর্তনের বিভিন্ন রূপ বা পর্যায় মাত্র। এই আবর্তন ধারায় পালাক্রমে প্রত্যেক জিনিসেরই একবার সুদিন আসে। তখন শুরু হয় তার বিকাশ বৃদ্ধি, প্রকাশ পায় তার শৌর্য-বীর্য, পরকাষ্ঠা দেখায় সে আপন রূপ সৌন্দর্যের। এমনকি সে উন্নতি ও প্রগতির চরম প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়। অতঃপর তার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এ সময়ে সে ক্ষীণ, খর্বকায়, দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে এবং যে শক্তিগুলো তার বিকাশ বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছিল তাই শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে। গোটা সৃষ্টিজগতে এই হচ্ছে আল্লাহতা'লার বিধিবদ্ধ নিয়ম । দুনিয়ার অন্যসব জিনিসের মত মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে এই নিয়ম পুরোপুরি কার্যকরী। তা সে তার ব্যক্তিগত, জাতিগত, মান, অপমান, সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি এবং এই ধরনের সমস্ত লক্ষণই ঐ গতিক্রমের সাথে জড়িত থাকে। পালাক্রমে সবার জীবনেই আসে এই অনিবার্য পর্যায়গুলো। এখানে এমন কেউ নেই, যাকে এই ভাগাভাগির বেলায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত কিংবা যার ওপর কোন একটি নির্দিষ্ট অবস্থাকেই চিরস্থায়ি করা হয়েছে। সুদিন বা দুর্দিনে কোন অবস্থাতেই এর ব্যতয় বা ব্যতিক্রম নাই। উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে :

১। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সামগ্রিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। তাই তাকে আলাদাভাবে বিচার করে কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করা ঠিক নয়।

২। পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য মানুষকে একই সাথে অনেক ধরনের অভাব পূরণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

৩। অভাব পূরণ করার জন্য যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া অবলম্বন করা সম্ভব তা অত্যন্ত সীমিত।

৪। এই সীমাবদ্ধতার প্রধান কারণ হলো এগুলো নিয়ন্ত্রণ তার ইচ্ছা-নির্ভর নয়। বরং তা এক কঠোর বিধান তথা তকদীরের অধীন।

৫। তকদির বা ভাগ্যের অধীনে কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবন যাপনের উপায় উপকরণাদি বাড়ানো সম্ভব।

৬। জীবনের উপায় উপকরণের কমবেশি থাকার সাথে সততা বা অসততার কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ খুব আদর্শবান একজন গরিব লোক হতে পারেন। পক্ষান্তরে একজন জঘন্য চরিত্রের লোক প্রচুর অর্থের মালিক হতে পারে।

৭। উন্নত চরিত্রের অধিকারী না হয়ে হঠাৎ করে অর্থের আগমন ঘটলে খারাপ কাজ বেশি করে বেঈমান হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ফলে সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ ঘটতে পারে।

৮। পক্ষান্তরে নির্ধন ব্যক্তিও যদি কঠোর ঈমানদার না হন তাহলে বস্তুগত অভাবজনিত কারণে তিনি ধনী লোকের অন্যায় কাজের সহযোগী হয়ে ঈমান হারাতে পারেন।

৯। পার্থিব জীবন পরীক্ষাস্থল। বস্তুগত উপায় উপকরণের কমবেশি এ কারণেই সরবরাহ করা হয়েছে কে কিভাবে বিষয়টিকে গ্রহণ করে জীবন নির্বাহ করে তাই পরীক্ষার বিষয়বস্তু।

১০। রিজিকের কম বেশি হওয়ার এ একটি কারণ যেন সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং পরস্পর পরস্পরের থেকে বিভিন্ন ধরনের কাজ আদায় করে নিতে পারে। সামাজিক গতিক্রমের (Social Dynamism) ভিত্তি এটাই।

১১। সৃষ্টিকর্তা সমাজ জীবনকে গতিশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করার জন্য মানুষের চেহারা, প্রকৃতি, পরিবেশের সাথেসাথে জীবন-যাত্রার সার্বিক মানের তথা রিজিকেরও তারতম্য সৃষ্টি করেছেন।

১২। বৈধ-অবৈধ যে পদ্ধতিতেই সম্পদ সংগ্রহ করা হোক না কেন, তা কোনক্রমেই চিরস্থায়িভাবে নিজের বা তার পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট সময়ের পরই তা অবশ্যই বেহাত হয়ে যাবে।

১৩। নির্ধন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ বা তার পরিবারের বা তার পরিবারের সদস্যগণ নির্দিষ্ট সময়ের পর বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। তাই যে কোন ব্যক্তির উচ্চ সামাজিক অবস্থার কারণে গর্ব করার কিছু নাই। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র নিম্নবিত্ত হওয়ার কারণেই হীনমন্যতায় ভোগার যুক্তিসংগত কারণ নেই।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে সামাজিক বিবর্তনের এই অমোঘ বিধানগুলি পরিলক্ষিত হয়। এই প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলনীতি নিরূপণ করা হয়েছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য প্রথমে যে কথাটি জানা অপরিহার্য, তা হচ্ছে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার মূল নিয়ামক শক্তি হচ্ছে ব্যক্তির, সমাজ, জাতি তথা সমষ্টির নয়। সমষ্টি বা জাতি ব্যক্তির জন্য। মূলত যে কোন সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রধান মাপকাঠি হলো কেবল সামগ্রিক কল্যাণ নয় বরং একজন ব্যক্তির স্বতন্ত্র কল্যাণ। একটি সমাজ ব্যবস্থার ভাল ও মন্দ কল্যাণময় ও বিপর্যয়গ্রস্থ হওয়ার প্রকৃত মানদন্ড হলো একটি প্রশ্নের সরল উত্তরের মধ্যে নিহিত তা হলো –সমাজ ব্যবস্থা সঠিকভাবে ব্যক্তি সত্তার উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ এবং তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, কর্ম ক্ষমতার বিকাশ সাধনে কতদূর সাহায্যকারী ও অনুকূল বা প্রতিরোধক।

ইসলামের অন্যতম দাবি হলো সমাজ, জাতি বা সমষ্টি সামগ্রিকভাবে তাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে না বরং এক এক ব্যক্তি তার পূর্ণ স্বকীয় মর্যাদা সহকারে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবে আল্লাহর কাছে দায়ি হবে - জওয়াবদিহি করতে বাধ্য হবে। এই প্রেক্ষাপটেই দেখা যায় যে, সকল নবির দ্বীনের দাওয়াতই ব্যক্তিগত জীবনে তা গ্রহণ করার মাধ্যমেই সফলতার মুখ দেখেছে এবং যখন কোন জনগোষ্ঠীর ব্যাপক জনতা একই দ্বীনের আওতায় তাদের জীবন যাত্রা নির্বাহ করা শুরু করেছে তখনই কেবল

সার্বিকভাবে এ সকল জনগোষ্ঠীর লোকেরাই ধর্মমত প্রতিষ্ঠার কাজে সফলতা অর্জন করেছে। এ কারণেই নায়েবে রসুল বা উলিল আমর তথা আল্লাহর অলিগণ তাদের ধর্ম প্রচার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত চরিত্র সংশোধনের ব্যাপারে এত জোর দিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বর্তমান সমাজ সংস্কার প্রক্রিয়ায় যে কোন বিপর্যয়ের জন্য ব্যক্তির করণীয় বিষয়কে উপেক্ষা করে সমাজ, সরকার বা ক্ষমতাসীনদের দোষ দেয়ার কারণেই সমাজে এত অনাচার ও নৈতিক অবক্ষয়ের ধ্বংস নেমে এসেছে তা দৃঢ়ভাবে বলা যায় । এজন্য ইসলাম ব্যক্তির নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করে। তাই ইসলামের অর্থনৈতিক বিধি-বিধান সমূহ ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিপালন ও অনুসরণ করা ঈমানের অংগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ঈমানের দাবির অন্যতম শর্ত হলো মানুষের জীবনে দয়া, প্রেম, বদান্যতা, সহানুভূতি, পরোপকার ও অন্যান্য নৈতিক গুণাবলী বিশেষভাবে স্থান লাভ করা। এ কারণেই অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কেবলমাত্র আইন ও সংবিধানের ওপর নির্ভর করে না বরং এ ব্যাপারে ঈমানের সূক্ষতিসূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান শিক্ষা তথা ইবাদত ও নৈতিক চরিত্র উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের অভ্যন্তরীণ ও মানসিক সংস্কার সাধন তার রুচি ও চিন্তা পদ্ধতির পরিবর্তন এবং তার মধ্যে এমন একটি শক্তিশালী নৈতিক অনুভূতি-আত্মসচেতনা (SELF CONSCIOUSNESS) সৃষ্টি করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। যাতে করে সে নিজে ন্যায় ও সততার পথে অবিচল থাকতে পারে। এই সমস্ত উপায় পন্থা অবলম্বন করার পর যদি কার্য সিদ্ধি না হয় সেক্ষেত্রেও ইসলামের সমাজ ব্যবস্থার এমন ধরনের ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে হবে যার ফলে সামাজিক চাপের মুখে মানুষকে ইসলামি বিধি-বিধানের অনুগত রাখা সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থাও যদি পর্যাপ্ত প্রমাণিত না হলে ইসলাম আইনের শক্তি ব্যবহার করে। এভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় । সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের ভারসাম্য না থাকা সত্ত্বেও শুধু মাত্র বল প্রয়োগ তথা রাষ্ট্রীয় আইনের অনুশাসনের মাধ্যমে যে ব্যবস্থাই কার্যকরী করা হোক না তা অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদী সুফল বয়ে আনতে পারেনা। এ কারণেই সমাজে সদা জাগ্রত ঈমানদার শ্রেণির উপস্থিতি অপরিহার্য।

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি

উপার্জন মাধ্যমে বৈধ-অবৈধের পার্থক্য :

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অর্থ উপার্জন করার অবাধ সুযোগ দেয় না। বরং উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ ও অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে। এ পার্থক্যের একটা মূলনীতি রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, ধন উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বন করলে ধন উপার্জন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায় সংগত সুফল ভোগ করতে পারে তা সবই বৈধ। এ মূলনীতিটি পবিত্র কোরআনে নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে :

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেন দেন করতে পারো। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে (অথবা পরস্পর পরস্পরকে) ধ্বংস করোনা। আল্লাহ তোমাদের অবস্থার প্রতি করুনাশীল। যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে জুলুম সহকারে এরূপ করবে তাকে আমি অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করবো।” (আন নিসা: ৫ম রুকু)

আলোচ্য আয়াতে পারস্পরিক লেনদেনকে ব্যবসা বলা হয়েছে। পারস্পরিক সম্মতিকে এর সাথে শর্ত হিসেবে সংযুক্ত করে এমন সব লেনদেনকে অবৈধ গণ্য করা হয়েছে যার মধ্যে চাপ সৃষ্টি ও প্রতারণার কোন উপকরণ থাকে অথবা এমন কোন চালবাজী থাকে যা দ্বিতীয় পক্ষ জানতে পারলে এ লেনদেনে নিজের সম্মতি প্রকাশে কোন দিনই প্রস্তুত হবে না এরপর আরও জোর দেবার জন্য বলা হয়েছে, “তোমরা পরস্পরকে ধ্বংস করোনা এর দুটি অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ তোমরা একে অন্যকে ধ্বংস করোনা অথবা তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করোনা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের লাভের জন্য অন্যের সর্বনাশ করে সে যেন তার রক্তপান করে এবং পরিণামে সে এভাবে নিজের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে। এই স্থায়ি বিধান ছাড়াও কোরআনের বিভিন্ন স্থানে অর্থ উপার্জনের নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোকে হারাম গণ্য করা হয়েছে :

১। উৎকোচ (আল্ বাকারা-১৮৮)।

২। ব্যক্তি সমষ্টি নির্বিশেষে সবার সম্পদ আত্মসাৎ (আল বাকারা-২৮৩ ও আল ইমরান-১৬১)

৩। চুরি (আল মায়েদা -৩৮১)।

৪। এতিমের অর্থ অন্যায়ভাবে তসরুফ (আন নিসা-১০)।

৫। ওজন কম করা (আল মুতাফিফিন-৩)।

৬। চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহের ব্যবস্থা তথা কামোদ্দীপক সাহিত্য, সিনেমা, নাটক, অশ্লীল গান বাজনা (আন নুর-১৯)।

৭। বেশ্যাবৃত্তি ও দেহ বিক্রয় লব্ধ অর্থ (আন নুর-২, ৩৩)।

৮। মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসায় ও মদ পরিবহন (মায়েদা- ৯)।

৯। জুয়া ও এমন সব উপায় উপকরণ যে গুলোর মাধ্যমে নিছক ঘটনা চক্রে ও ভাগ্যক্রমে একদল লোকের নিকট সম্পদ হস্তান্তরিত হয় (মায়েদা - ৯০)।

১০। মূর্তি গড়া, মূর্তি বিক্রয় ও মূতি উপাসনালয়ের সেবা (মায়েদা -৯১)।

১১। ভাগ্য গণনা, হস্তরেখা, জ্যোতিষীর ব্যবসায় (মায়েদা -৯০)।

১২। সুদ খাওয়া বিষয়ক সকল কার্যক্রম (বাকারা - ২৭৫,২৭৮,২৮০, আল ইমরান ১৩০)।

ধন সঞ্চয়ের নিষেধাজ্ঞা :

বৈধ উপায়ে যে ধন উপার্জন করা হবে তা' পুঞ্জিভূত করে রাখা যাবে না। কারণ এর ফলে ধনের আবর্তন বন্ধ হয়ে যাবে এবং ধন বণ্টনে ভারসাম্য থাকে না। যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করে রাশিকৃত ও পুঞ্জিভূত করে রাখে সে নিজে যে কেবল মারাত্মক নৈতিক রোগে আক্রান্ত হয় তাই নয় বরং মূলত সে সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটি জঘন্যতম অপরাধ করে। এর ফল তার নিজের জন্যও খারাপ হয়। এজন্য কোরআন কারুনের ন্যায় সম্পদ কুক্ষিগত ও পুঞ্জিভূত করে রাখার কঠোর বিরোধিতা করে। কোরআন ঘোষণা করে ঃ যারা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে কৃপণতা করে, তারা যেন একথা মনে না করে যে তাদের এ কাজ তাদের জন্য মঙ্গলজনক বরং প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের জন্য ক্ষতিকারক।

"যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।"

অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ :

সমাজের কোন ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত অর্থ থাকে সমাজের জন্য কল্যাণমূলক (আল্লাহ রসুল প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী) কাজে তা ব্যয় করতে হবে। পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তারা কি ব্যয় করবে ? তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত (তাই ব্যয় করো)। বাকারা-২৭।

"আর সদ্ব্যবহার করে নিজের মা-বাপ, আত্মীয় স্বজন, অভাবগ্রস্থ মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশি, অনাত্মীয়, প্রতিবেশি, নিজের বন্ধুবর্গ, মুসাফির ও মালিকানাধীন দাসদাসীদের সাথে।" আন নিসা - ৬।

"আর অর্থ সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে। বিত্তবানরা মনে করে অর্থ ব্যয় করলে দরিদ্র হয়ে যাবে এবং সঞ্চয় করলে বিত্তশালী হবে। কিন্তু ইসলাম বলে, অর্থ ব্যয় করলে কমে যাবে না বরং বরকত বৃদ্ধি পাবে। যেমন পবিত্র কোরআন বলা হয়েছে–

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের ন্যায় লজ্জাকর কাজের হুকুম দেয়। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট মাগফেরাত ও অতিরিক্ত দানের ওয়াদা করেন।" বাকারা- ৩৭।

বিত্তবান মনে করে কোন কিছু ব্যয় করা হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে তা নষ্ট হয়ে যায় না বরং তার সর্বোত্তম লাভ তোমাদের নিকট ফিরে আসবে।

"সৎ কাজে তোমরা কিছু ব্যয় করবে তা তোমরা পুরোপুরি ফেরত পাবে এবং তোমাদের ওপর কোনক্রমেই জুলুম করা হবে না। বাকারা-৩৭।

"যারা আমার প্রদত্ত বেজেক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের আশা রাখে যাতে কোনক্রমেই লোকসানের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাদেরকে এর বিনিময়ে পুরোপুরি ফল প্রদান করবেন এবং মেহেরবানি করে তাদেরকে কিছু বেশি দান কবেন।" ফাতির-৪।

বিত্তবান মনে করে সম্পদ আহরন করে সুদি ব্যবসায় নিয়োগ করলে সম্পদ বেড়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে না সুদের মাধ্যমে বরং সম্পদ কমে যায়। সৎকাজে অর্থ নিয়োগ করলেই সম্পদ বেড়ে যায়। কোরআনে বলা হয়েছে–

"আল্লাহ সুদ নির্মূল করেন ও দান সদকাকে প্রতিপালন ও ক্রমবৃদ্ধি করেন।"–বাকারা-৩৮।

"তোমরা যে সুদ দাও মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির আশায় জেনে রাখ আল্লাহর নিকট তা কখনো বৃদ্ধি লাভ করে না। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জাকাত বাবদ যে অর্থ প্রদান করে থাকো একমাত্র তার মধ্যে ক্রম বৃদ্ধি হয়ে থাকে।" –সুরা রুম-৪।

ব্যয় করলে অর্থ বেড়ে যাবে এবং ব্যয়িত অর্থ কেবল বৃদ্ধিই পাবে না বরং কিছুটা অতিরিক্ত লাভ ও কল্যাণসহ পূর্ণমাত্রায় ফিরে আসবে। অন্যদিকে সুদি ব্যবসায় অর্থ বৃদ্ধির পরিবর্তে অর্থ হ্রাস ও লোকসানের সূচনা করবে এবং জাকাত ও সদকার মাধ্যমে অর্থ হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এ মতবাদটি আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মনে হতে পারে এবং অনেকে বিবেচনা করতে পারেন যে এটা আখেরাতের বিষয় সম্পর্কিত বিধায় এর সাথে আধুনিক অর্থনীতির কোন যোগসূত্র নাই । কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ দুনিয়াতেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ মতাদর্শটি একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ধন সঞ্চয় করে সুদি ব্যবসায়ে নিয়োগ করার অবশম্ভাবী ফল স্বরূপ চতুর্দিক থেকে ধন আহরিত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে চলে আসে। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা প্রতিদিন কমে যেতে থাকে। কৃষিশিল্প ও ব্যবসায় সর্বত্র মন্দাভাব দেখা দেবে। জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন পর্যায়ক্রমে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। অবশেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন পুঁজিপতিরাও নিজেদের সঞ্চিত ধন সম্পদ অর্থ উৎপাদনের কাজে বিনিয়োগের সুযোগ পায় না। পক্ষান্তরে অর্থ সম্পদ ব্যয় করলে জাকাত ও সদকা দান করলে পরিণামে জাতির সকল ব্যক্তির হাতে এ সম্পদ ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি যথেষ্ট ক্রয় ক্ষমতার অধিকারী হয়। শিল্পোৎপাদন বেড়ে যায়। সবুজ ক্ষেতগুলো ভরে ওঠে। ব্যবসায় বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় ফলে সবার অবস্থাই স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।

তাই পুঁজিবাদী এই অর্থ ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিকশিত রূপ কোন জাতির জন্য অশুভ পরিণাম বয়ে নিয়ে আসতে পারে তা পর্যবেক্ষণ করতে হলে স্বপ্নের দেশ সব পেয়েছির দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই কোরআি অর্থনীতির মতাদর্শের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়।

বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারক, অর্থনীতিবিদ, পুঁজি বিনিয়োগকারী রাজনীতিবিদ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন যতটা চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন তেমনটি আগে কখনো ছিলেন বলে মনে হয় না।

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবার্ট সালা ও জেমস টোরিন এবং সেই সঙ্গে ফোর্ড মোটরস, জেরক্স করপোরশন, অ্যাপল কম্পিউটারস এর কর্মকর্তাবৃন্দ গোল বৈঠকে বসেছিলেন। সে বৈঠকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য দিয়েছিলেন সর্বোচ্চ আলোচনা ও বিবেচনার জন্য। ১৯৮৭ সালের নোবল বিজয়ী এম.আই.টি. (MIT) এর প্রফেসর রবার্ট সলো তার বক্তব্যে বলেছেন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ৭০ দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ২৫ বছর যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির এক স্বর্ণযুগ ছিল। কিন্তু সত্তর ও আশির দশকে যখন তা কমা শুরু করছে তখন তার নিম্নগতির হার এমনই যে পারিবারিক আয় দ্বিগুণ করতে এখন ২০০ বছর লাগবে। গত ১৮ মাসে (১৯৮৩, আগস্ট) বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান এক চুলও অগ্রসর হয়নি। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত উচ্চ আয়ভুক্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ জনগোষ্ঠী আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। শতকরা ৪০ ভাগ মোটামুটি একই জায়গায় থেকেছে, বাকিরা নিচে নেমে গেছে। অ্যাপল কম্পিউটারের কর্মকর্তা আরেকভাবে বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করে বললেন: পুরনো অর্থনীতিতে আমরা খুব সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলাম; কেননা আমরা প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী ছিলাম। আমাদের বিশাল অভ্যন্তরীণ

বাজার ছিল। কিন্তু বর্তমানে শুধু তেল, গম বা কয়লার মত সম্পদ যা মাটি থেকে আসে সেগুলো দিয়েই কাজ হয় না। এখন আসল সম্পদ হচ্ছে নতুন ধারণা ও তথ্য যা মাথা থেকে আসে। এজন্য এক সময়ের সম্পদশালী ধনী দেশ আমরা এখন রাতারাতি দরিদ্রে পরিণত হয়েছি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও মুখস্থ করার ব্যবস্থা থেকে পর্যালোচনা শক্তি বৃদ্ধির শিক্ষায় পরিণত হয়নি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমনসব কাজের জন্য আমরা আমাদের তরুণ সমাজকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি যে কাজের কোন অস্তিত্ব নেই। অন্য অনেক শিল্পোন্নত দেশে ছাত্র/ছাত্রীরা অংক শিখছে, বিজ্ঞান শিখছে, পর্যালোচনার শক্তি লাভ করছে দ্রুত। আমাদের এমন শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার যা সকলকে শিক্ষিত করবে, শুধু শতকরা ১৫ বা ২০ ভাগকে নয়।"

উল্লেখ্য যে এখন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান, গণিত এবং কারিগরি ক্ষেত্রে যারা সবচাইতে ভাল করছে, তারা সবাই মূলত এশিয়া থেকে আগত। কারণ ধনী হওয়ার কারণে আমেরিকান ছাত্ররা শারীরিক বা মানসিকভাবে কষ্টকর বা ফল লাভে সময় লেগে যায়, এ ধরনের কাজে আগ্রহী হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের চিলড্রেন ডিফেন্স ফান্ড এর কর্মকর্তা একই সভায় অর্থনৈতিক সংকটের মার্কিন অর্থনীতির অন্তর্নিহিত প্রবণতার ফলাফল তুলে ধরেছেন এভাবে: ১৯৬৫ থেকে এ পর্যন্ত জি.এন.পির নিট প্রবৃদ্ধি শতকরা ৮৮ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও সে সময়ের তুলনায় দরিদ্র শিশুর সংখ্যা এখন বেশি। এবং প্রচলিত ধারণাকে খন্ডন করে এই সত্যটি যে দরিদ্র শিশুদের অধিকাংশই কালো নয়। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে ৫ লাখ শ্বেতাংগ বাবা মার সন্তান। তিনি তীব্র বিদ্রুপের সুরে বলেছেনঃ দরিদ্র সোমালিয়ার জি এন পি ৫/৬ বিলিয়ন ডলার, সেখানে হাজার হাজার শিশু দারিদ্রের মধ্যে আছে। কিন্তু যে যুক্তরাষ্ট্রের জি.এন.পি. ৫.৯ ট্রিলিয়ন ডলার এবং যে দেশ পৃথিবীর ধনীতম দেশ হিসাবে পরিচিত, সেখানে ১ কোটি ৪৩ লাখ শিশুই দরিদ্র। এর মধ্যে ৫০ লাখ শিশু মাসের মধ্যে কখনো অনাহারে থাকে এবং ৮০ লাখ স্বাস্থ্য সুবিধা পায় না। ৪ জন সদস্যের একটি পরিবারের জন্য দরিদ্র সীমার আয় ধরা হয় এখন বার্ষিক ১১.২০০ ডলার। সরকারি হিসেবেই এর নিচে জনগোষ্ঠী আছে শতকরা ১২ ভাগেরও বেশি। ভিন্নমত অনুযায়ী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এখন শতকরা ২০ ভাগেরও বেশি। ম্যাকনামারার মতে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে ৩ কোটি, প্রতি ৫ জন শিশুর একজন দরিদ্র। ১০ বছরে শতকরা ২৮ ভাগ দরিদ্র হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের যেসব শহর সবচাইতে বেশি দরিদ্র এবং যেগুলোতে দারিদ্র হার শতকরা ২৫ থেকে ৩২ ভাগ সেগুলো হলো ডেট্রয়ট, নিউ অর্লিন্স, মায়ামি, ক্লিভল্যান্ড, আটলান্টা, নিউইয়র্ক, বাফেলো, বার্মিংহাম। নিউইয়র্কের একটি বড় অংশ এর পর্যায়ভুক্ত। বর্তমানে এই দারিদ্রের ব্যাপারটি শহরগুলোর চেহারা দেখলে বোঝা যায়। এক সময়কার প্রধান শিল্প নগরী শুধু নয় শিল্পায়নের ভিত্তি সেখানে স্থাপিত হয়েছিল সেই ডেট্রয়ট এখন মৃত প্রায় নগরী। ফোর্ড জেনারেল মটরস এর আদি কেন্দ্র এটি। যে ফোর্ড মোর্টস এ শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫০ থেকে ৬০ হাজার, এখন সেখানে শ্রমিক সংখ্যা ১০ হাজার। যুক্তরাষ্ট্রে কেউ শুধু যদি ডেট্রয়ট শহরে যান তাহলে ভাবতে বাধ্য হবেন যে, যুক্তরাষ্ট্র অচিরেই তৃতীয় বিশ্বের দেশে পরিণত হচ্ছে। বিশাল কারখানা ভবন পরিত্যক্ত ভবনে পরিণত হচ্ছে। জনসংখ্যা কমে গেছে, এই শহরে বেকার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ। রাস্তাঘাট যেগুলো ভাঙা ভাঙাই আছে, বহু জায়গায় ময়লা জমে আছে দিনের পর দিন। শহরে পুরনো কাপড়, পুরনো আসবাব পত্রের দোকানগুলো বেশ জমে বসেছে, কেননা নতুন কেনার লোক এ শহরে খুব পুরো যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পখাতে এখন নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে না। নতুন প্রযুক্তি যে সব প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করছে সেখানে বরঞ্চ জনশক্তি বাড়তি হয়ে যাচ্ছে। ৮০ শতকের মাঝামাঝির মধ্যে প্রায় ১ কোটি হয় স্টিল, গাড়ি, শিল্প দ্রব্য, বস্ত্র ইত্যাদি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে চাকুরি হারিয়েছে নয়তো কম আয়ের সেবা খাতের কাজে গেছে। চাকুরি সরাসরি হরিয়েছে প্রায় ২০ লাখ। ৮০ দশকের নতুন যত কর্মসংস্থান হয়েছে তার শতকরা ৮০ ভাগই হয়েছে সেবা খাতে। এর বেশির ভাগই হচ্ছে নিম্ন আয়ের। খুচরা ব্যবসা খাতে যে কর্মসংস্থান হয়েছে সেখানে গড় পড়তা বার্ষিক আয় ৯৫০০ ডলার, যা দরিদ্র সীমার নিচে।

সাধারণভাবে মহিলাদের সন্তান পালন, ঘরকন্যার কাজ, বৃদ্ধ পিতামাতাকে দেখাশুনার কাজকে অঅর্থনৈতিক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মহিলার জীবনযাত্রা কঠোর, শ্রমসাধ্য ও অর্থনৈতিক অনিভয়তার শিকারে পরিণত করেছে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর কোন ব্যতিক্রম নয়। শ্রম শক্তিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ বিপুলভাবে বেড়েছে। মেয়েদের অনুপাত এখন প্রায় শতকরা ৪৪ ভাগ। মেয়েদের অংশগ্রহণের

এই বৃদ্ধি এমন বহু নিত্য নৈমিত্তিক কর্মকান্ডকে উল্লেখযোগ্য হারে ক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করেছে। এগুলোর মধ্যে আছে খাবার প্রক্রিয়াজাত করা, শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার যত্ন। মহিলাদের ঘরের বাইরে বের করার কারণে পারিবারিক বিপর্যয়জনিত সমস্যা আত্মপ্রকাশ করেছে এবং বেশ্যাবৃত্তি, মডেলিং, ফ্যাশন তথা সেক্স ইন্ডাস্ট্রি একটি ব্যাপক পেশা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পক্ষান্তরে একজন মা তার সন্তান নিয়ে ঠিকমত বাঁচতে গেলে কাজের বাইরে তাকে সপ্তাহে অন্তত ৫৫ ঘণ্টা সময় দিতে হয়। আর যদি বাচ্চার জন্য রান্না, দেখাশুনা, শিক্ষা ইত্যাদির জন্য লোক রাখতে হয় তাহলে ন্যূনতম মজুরিতে ৩টি চাকুরি করতে হবে এক সঙ্গে। এরকম একটি পরিস্থিতিতে শিশুদের ভোগান্তি অনেক বেশি। অধিকাংশ অভিভাবকদের পক্ষেই শিশুকে পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও মনোযোগ দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। বর্তমানে প্রায় সকল খাতেই স্থায়ি কর্মচারী নিয়োগ করার হার সাংঘাতিকভাবে কমে গেছে। শ্রমিক থেকে শিক্ষক পর্যন্ত সর্বত্রই স্থায়ি পদ উঠিয়ে দিয়ে অস্থায়ি বা খন্ডকালীন এক তৃতীয়াংশ পয়সায় একই কাজ করানো হচ্ছে এবং তা সম্ভব হচ্ছে বেকারত্বের উঁচু হার থাকার কারণে। যদিও বেকারত্ব ও আপেক্ষিক দারিদ্র পুঁজিবাদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, সে হিসেবে মার্কিন অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটি আলাদাভাবে কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এর গতি প্রকৃতি এবং ধরন। এই ধরনের তীব্রতা এবং গতি প্রকৃতির দিক থেকে মার্কিনী যে অভিজ্ঞতা তা অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বিপুল বিকাশ ঘটেছে। ৭০ দশক থেকে। পুঁজি, বিনিয়োগ ধরনে পরিবর্তন হয়েছে। মুনাফার হারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে ঝুঁকি এসেছে। সব মিলিয়ে মার্কিন অর্থনীতির গঠনই এখন দ্রুত পরিবর্তনশীল। জনগণের ওপর প্রভাব হচ্ছে দ্রুত হারে বেকারত্ব বৃদ্ধি সামাজিক সুযোগ সুবিধা হ্রাস বিকল্প কাজে স্বল্প মজুরি, সামাজিকভাবে দারিদ্রের সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি উৎপাদক থেকে অনিশ্চিত পেশার আধিক্য। তাই প্রচলিত কথা হলো– হায়ার এবং ফায়ার' যে কোন সময়ে ঘটতে পারে। এই অনিশ্চয়তা যে প্রচন্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তার বহিঃপ্রকাশ সমাজের নানা অপরাধ অস্থিরতা ও অসংলগ্নতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই আপেক্ষিক দারিদ্র বিস্তার এবং শ্রেণি বৈষম্যের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন প্রথম সারিতে অন্যান্য শিল্পোন্নত পুঁজি বা দেশগুলোর তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আছে। এমনকি এই বৈষম্য ভারতের তুলনায়ও বেশি। এটি বিশ্বব্যাংকের হিসেব।

অন্যদিকে ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড কয়েক বছর আগে যে হিসেব দিয়েছিল সেই অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ১ ভাগের কম জনগোষ্ঠীর হাতে এখন শতকরা ৪৫ ভাগ সম্পদ জমা হয়েছে। স্বচ্ছল শতকরা ১ ভাগের হাতে আছে শতকরা ৩৮ ভাগ সম্পদ এবং বাকি শতকরা ৯০ ভাগের নিয়ন্ত্রণে আছে শতকরা ১৭ ভাগ। এই হিসেব আরও ভেঙে দেখা যায় সবচাইতে ধনী শতকরা ৫ ভাগ স্টক বন্ড এবং ব্যবসায়িক সম্পদের দিক থেকে বেশি এগিয়ে আছে। এদের হাতে ব্যবসায়িক সম্পদ আছে শতকরা ৫৮ ভাগ শতকরা ৯০ ভাগের হাতে আছে শতকরা ৬.০–ভাগ।

জুয়া বা ফটকাবাজি ও অর্থকরী প্রতিষ্ঠানের আধিপত্যের বিষয়টি এখন লক্ষ্য করা দরকার যেটি মার্কিনী অর্থনীতিকে ক্রমেই অন্তসারশূন্য পরজীবী চরিত্র দান করছে। আটলান্টিক এর পাড়ে আটলান্টিক সিটি জয়ার প্রাণকেন্দ্র হিসেবেই গড়ে ওঠেছে। প্রতিদিন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এখানে খাটানো হচ্ছে। অধিকাংশ নিঃস্ব হচ্ছে কিছু পয়সার মালিক হচ্ছে। বিশাল বিশাল হোটেল ক্যাসিনো গড়ে ওঠেছে সেখানে। সেখানে ২৪ ঘণ্টা খেলা হয়। ক্লান্ত সর্বস্বান্তদের বিশ্রাম নেবার জন্য আটলান্টিকের তীরে বিচ উন্নয়ন করা হয়েছে। এখানে কোন নতুন পণ্য উৎপাদন ছাড়াই কোন ব্যবসায়িক মূল্য উৎপাদন না করেই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় ব্যয়ের প্রক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি শহরে, মোড়ে, দোকানে দোকানে পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়াও লটারি ও জুয়ার আরও অজস্র ব্যবস্থা আছে। এই জুয়া ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে কয়েক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী এবং মূল ধারার সাপ্তাহিক বিজনেস উইক প্রচ্ছদ কাহিনীর শিরোনাম দিয়েছিল ক্যাসিনো সোসাইটি। বর্তমান আমেরিকা প্রকৃতপক্ষে ক্যাসিনো সোসাইটির সকল প্রকার দোষযুক্ত একটি বিষাক্ত পরিবেশের সমষ্টি মাত্র। যাহোক আবার আমরা ইসলামি অর্থনীতি মূলনীতিতে ফিরে যাচ্ছি।

কৃপণতার নিষিদ্ধতা :

ধন-সম্পদ আয় উপার্জনের ভুল পন্থা সমহ নিষিদ্ধ হোষণার সাথে কোরআন এমনকি বৈধ পন্থায় উপার্জিত ধন সম্পদ সঞ্চয় ও পুঞ্জিভূত করার প্রতি কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং একথাই বলে যে কৃপণতা একটি বড়

ধরনের নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ। এরশাদ হচ্ছে ঃ "সেই প্রত্যেকটি লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত যারা অপরের দোষ ক্রুটি অনুসন্ধান করে আর পর নিন্দা চর্চায় পঞ্চমুখ হয় এবং গিবত করে। যারা সম্পদ কড়ায় গন্ডায় হিসেব করে এই মনে করে জমা করে থাকে, যে তাদের এ সম্পদ চিরদিন তাদেরই হাতে থাকবে। কখনো নয় বরং তাকে জ্বলন্ত অনল কুন্ডের ভিতর নিক্ষেপ করা হবে।"– হুমাজা

"যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা রাখে এবং তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করেন, তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সুসংবাদ জানিয়ে দাও।" –তওবা।

"যারা মনের সংকীর্ণতা অথবা আত্মার কৃপণতা থেকে মুক্ত রয়েছে, এমন লোকেরাই মুক্তি ও সাফল্য লাভ করবে।"

"যারা খোদা প্রদত্ত ফজল ও ধন-সম্পদের বেলায় কৃপণতা প্রদর্শন করে তারা যেন এ ভুলের মধ্যে নিপতিত না থাকে যে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক বরং তা তাদের জন্য খুবই অকল্যাণকর যে সম্পদের বেলায় তারা কৃপণতা প্রদর্শন করেছে সে সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদের গলায় হার রূপে পরিয়ে দেয়া হবে। –আল ইমরান।

অর্থপূজা ও ধন সম্পদের গর্ব নিষিদ্ধ :

পবিত্র কোরআন কৃপণতার দোষ-ক্রুটি এর পরিণতির কথা জানিয়ে দেবার সাথে সাথে অর্থের পূজা এবং পার্থিব ধন সম্পদের প্রতি লোভাতুর ও আসক্ত হওয়া এবং স্বীয় আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি গর্ববোধ ও অহংকার করাকে মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার এবং পরিশেষে তা ধ্বংসে পরিণত হবার কারণ সমূহের মধ্যে একটি বলে ঘোষণা করেছে।

"আমি সেই ধরনের কত গ্রামগঞ্জ ও জনপদ না ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা স্বীয় জীবিকা ও সহায় সম্পদ নিয়ে গর্ব অহংকার করতো। এখন তাদের ঘর-বাড়ির পানে তাকাও এরপর খুব সংখ্যক লোকে এ ঘর-বাড়িতে বসবাস করেছে।" –আল কাসাস।

"আমি যেসব বস্তি এলাকায় কোন একজনকে সতর্ককারী (নবি) মনোনয়ন দিয়ে প্রেরণ করেছি। সেখানে ধনাঢ্য লোকেরা তাকে বলতো তুমি যে নবুয়তের পয়গাম নিয়ে এসেছে আমরা তোমার তুলনায় অধিক সম্পদ ও সন্তান সন্ততির মালিক; সুতরাং আমাদেরকে কখনোই শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

অপব্যয়ের নিন্দা :

কোরআন এ কর্ম নীতির প্রতিও কঠোর ভাষায় নিন্দা করে থাকে যে মানুষ বৈধ পন্থায় তাদের উপার্জিত ধন সম্পদ অবৈধ কাজে ব্যয় করে উড়িয়ে দেবে অথবা নিজের ভোগ-বিলাস আরাম-আয়েস, আনন্দ-উৎসবে ব্যয় করতে থাকবে এবং সম্ভাব্য পরিমাণে স্বীয় জীবনের মান উন্নয়নের কাজ ব্যতীত নিজ ধন সম্পদ ব্যয় করার পাত্র ও স্থান অন করে নিবে। বলা হচ্ছে– "সম্পদ ব্যয় করার বেলায় সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেননা।" –আল আনয়াম।

"খাও এবং পান করতে থাকো কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।" – আল আরাফ ।

কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য তাদের সঠিক চরিত্র ও কর্মপন্থা হচ্ছে এই যে, তারা নিজের বেলায় ও স্বীয় পরিবার পরিজনের জন্য সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে চলবে। তার ধন-সম্পদে যেমন তার নিজের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার বেলায় কৃপণতা অবলম্বন করা কোন ক্রমেই ঠিক নয়। কিন্তু তাই বলে এমন যেন আবার না হয় যে, অধিকার মাত্র তাদেরই রয়েছে। সুতরাং সবকিছু তাদের জন্যই ঢেলে দেওয়া হোক; আর অন্যন্যরা বঞ্চিত থাকুক। বলা হচ্ছে–

আল্লাহতা'লার নেক বান্দা হচ্ছে তারাই যারা ব্যয়ের বেলায় অহেতুক কোন কিছু করেনা। অপব্যয় করেনা এবং কৃপণতা প্রদর্শন করেনা বরং উভয় পথের মাঝ দিয়ে চলে। - ফোরকান।

"আল্লাহতা'লা তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তা দ্বারা পরকালের ঘর অন্বেষণ করো। আর স্বীয় পার্থিব অংশটির কথাও ভুলে যেও না। তোমার প্রতি আল্লাহতা'লা যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমি খোদার সৃষ্টি জীবের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করো। আর স্বীয় ধন সম্পদ দ্বারা খোদার জমিনে ঝগড়া ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা প্রসারের জন্য চেষ্টা করো না।"–কাসাস।

সম্পদ ব্যয় করার সঠিক পন্থা :

একটি যুক্তিসংগত সীমারেখা (Allowable Limit) পর্যন্ত স্বীয় প্রয়োজনীয় কাজে সম্পদ ব্যয় করার পর মানুষের নিকট তার হালাল ও বৈধ পথে উপার্জনকৃত যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তা এই সকল কাজে তার নিজেরই ব্যয় করা উচিত। এরশাদ হচ্ছে–

"হে নবি! লোকেরা আপনার নিকট খোদার পথে তারা কি ব্যয় করবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে আপনি বলে দিন যে তোমাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা থেকে ব্যয় করো।" –বাকারা।

শুধুমাত্র পূর্ব বা পশ্চিমে মুখ করানোই প্রকৃত পূণ্য কর্ম নয়। বরং সৎকাজ হচ্ছে এই যে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাব ও নবিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং খোদার মহত্ত্বতে স্বীয় আত্মীয় স্বজন, এতিম মিসকিন, পথিক, সাহায্য প্রার্থনাকারীদের জন্য ধন-সম্পদ দান করার আর মানুষের বন্দীত্ব (ঋণসহ যে কোন ধরনের অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে থেকে) মুক্ত করার জন্য অর্থ ব্যয় করবে। বাকারা-১৭৭

এই আয়াতে ঈমানের সাথে অর্থ ব্যয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের উল্লেখ করায় অর্থ ব্যয়ের সঠিক বিধি-বিধান প্রতিপালন না করলে ঈমানের পূর্ণতা কোনক্রমেই আসবে না, সে ব্যাপারে তাকিদ দেয়া হয়েছে। সুরা নেসায় বলা হয়েছে–

"...যারা নিজেরা কৃপণতা করে আর অপরকে কৃপণতা করার জন্য নির্দেশ (যে সকল মতবাদ এই ধরনের কর্মপন্থা শিক্ষা দেয়) দেয় এবং খোদার ধনসম্পদ গোপন করে রাখে এমন অকৃতজ্ঞদের জন্য আমি লজ্জাজনক শাস্তি ঠিক করে রেখেছি। আর সেই সকল লোকদেরকেও আল্লাহতা'লা পছন্দ করেন না যারা মানুষকে দেখাবার উদ্দেশ্যে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে থাকে।

"(আল্লাহর পথে ব্যয় করার উপযুক্ত ব্যক্তি তারাই) যারা এমনভাবে দারিদ্রতার শিকারে নিপতিত হয়ে পড়েছে যে তারা খোদার পথে এসে এমন রূপে আবদ্ধ অর্থাৎ পার্থিব কর্মকান্ড থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত যে জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করার সুযোগ পায় না। এদের সম্পর্কে যাদের সম্যক ধারণা নাই তারা এদের ব্যক্তিত্বের কারণে তাদেরকে ধনী ও স্বচ্ছল লোক মনে করে থাকে কিন্তু তোমরা তাদের মুখ মন্ডলের পানে তাকালেই তাদেরকে চিনে নিতে পারবে। তারা লোকের পিছনে পিছনে হাত পেতে ভিক্ষা চায় না। তোমরা এদের জন্য যা কিছু ধন-সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহতা'লা সে বিষয়ে বেশ অবগত থাকবেন। –বাকারা - ৩৭২।

এই আয়াতের মর্মানুযায়ী প্রকৃতপক্ষে যে বা যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগী তাঁদের বা তাদের পরিবারবর্গের জন্য অর্থ ব্যয় করা ফরজ।

"(আর নেককার লোকেরা) আল্লাহর মহব্বতে মিসকিন এতিম এবং অভাবগ্রস্তদেরকে খানা দিয়ে থাকে। তারা বলে আমরা শুধু মাত্র আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যেই তোমাদেরকে খানা দিয়ে থাকি। তোমাদের নিকট এর বিনিময়ে কোন প্রতিদানেরও দাবি নাই আর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে সে ইচ্ছাও রাখি না।"

"আর দোজখের অগ্নি থেকে তারাই বাঁচতে পারে, যাদের ধন-সম্পদ স্থিরকৃত একটি অংশ সাহায্য প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের জন্য নির্ধারিত থাকবে। অর্থাৎ যারা নিজেদের ধন সম্পদে তাদের জন্য নিয়মিত একটি অংশ নির্দিষ্ট করে রেখে দিয়েছে।

পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যয়কে শুধু একটি মৌলিক পূণ্যের কাজ বলেই ক্ষান্ত হয়নি বরং এরূপ না করার কারণে সামগিক রূপে সমাজের জন্য যে ধ্বংস ও অনিষ্টতা রয়েছে, সে বিষয়েও জোর তাকিদ দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হচ্ছে–

"আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকো আর নিজেরা নিজেদেরকে স্বীয় হাতে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ফেলে দিওনা আর অনুগ্রহ করতে থাকো, আল্লাহতা'লা অনুগ্রহকারীদের পছন্দ করে থাকেন।" –বাকারা।

ধন দৌলত দ্বারা কাফফারা আদায় :

আল্লাহর পথে এমনি রূপে সাধারণ ও স্বেচ্ছামূলক ব্যয় বহন ব্যতীত কোরআন মজিদ কতিপয় গুণাহ বা অন্যায় ও ভুলের সংশোধনের জন্য শারীরিক-মানসিক কষ্ট স্বীকার এবং ধনী লোকদের জন্য অর্থ সম্পদ খরচের মাধ্যমে কাফফারা আদায় করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি কসম ভঙ্গ করে ফেলে তার জন্য হুকুম হচ্ছে–

"এ কাজের কাফফারা (জরিমানা) হচ্ছে এই যে দশজন মিসকিনকে খানা দিতে হবে যেমন তোমরা স্বীয় পরিবার পরিজনদের লোকদেরকে সচরাচর খানা দিয়ে থাক, অথবা তাদেরকে কাপড় দান করো কিংবা একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দাও কিন্তু এসকল কাজ করা যদি কারো সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে তবে তার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে তিনটি রোজা রাখা। –আন নেসা।

মিরাস বন্টনের বিধান :

কোন নারী বা পুরুষের মৃত্যুর পর তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে কোরআনের বিধান হচ্ছে যে এই সম্পদ তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বন্টন করতে হবে। যদি পিতা-মাতা এবং সন্তান-সন্ততি না থাকে তখন সহোদর ও বৈমাতৃক ও বৈমাতৃক ভ্রাতা, ভগ্নিদেরকে উহার অংশ দিতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ সুরা নেসার ৭ - ১১ এবং ১৭৬ নং আয়াতে লিপিবদ্ধ আছে।

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা হচ্ছে কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় যে ধন-সম্পদ এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে তা উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর একস্থানে কেন্দ্রীভূত থাকতে না দেওয়া বরং তার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে উহা বিতরণ দ্বারা বিকেন্দ্রীকরণ করাই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। তাছাড়া সম্পত্তি নিয়ে উত্তরাধিকারীরা যেন পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত না হয় তাও নিশ্চিত করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলামের মত এত সুনির্দিষ্ট ও সুন্দর উত্তরাধিকার আইন পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে নাই। কালাম মজিদে জ্যেষ্ঠত্বের অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান এ সম্পদের মালিক। অথবা পারিবারিক ব্যবস্থাপনার এবং আধুনিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে কোম্পানি, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, কনসোর্টিয়াম অথবা এধরনের সেই কর্মসূচি ও নীতিমালার সম্পূর্ণ বিপরীত, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত ব্যক্তির পরে তার কেন্দ্রীভূত ধন সম্পদ অপরিবর্তিত ও অপ্রতিহত গতিতে সকল দোষ ও গুণ নিয়ে সমাজে নিজের প্রতিপত্তি অব্যাহত রাখা। প্রসঙ্গত বলা যায় যে ইসলামি আইনের পরিবর্তে এই মানবতা বিরোধী আইন চালু থাকার জন্যই বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতিতে মহা বিপর্যয় সংঘটিত হচ্ছে।

পবিত্র কোরআন অন্য লোককে পুত্র সন্তান মনোনীত ও বিধান নির্ধারণ করে নেওয়ার নীতিমালাকেও প্রতিহত করে এই নীতি ও বিধান নির্ধারণ করে দেয় যে সকল লোক বাস্তবিক পক্ষেই আত্মীয় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে তাদেরই অধিকার রয়েছে অন্য কোন লোককে পুত্র সাব্যস্ত করে কৃত্রিম রূপে তাকে উত্তরাধিকার বা ওয়ারিশ মনোনীত করা যাবে না। এরশাদ হচ্ছে–

"আল্লাহতা'লা তোমরা যারা মুখে-মুখে পুত্র বলে সম্বোধন করো, তাকে তোমাদের পুত্র বলে মনোনীত করেন না। ইহা এমন একটি মৌখিক কথা যা তোমরা নিজেদের মুখ থেকে বের করো।" –আল আহজাব।

পবিত্র কোরআন মজিদে ওয়ারিসি আইন নির্ধারণ করার সাথে সাথে মানুষকে এই হেদায়েত দিয়ে থাকে যে তারা মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিষয়ে অসিয়ত করে যাবে। বলা হচ্ছে–

"তোমাদের জন্য এটা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে যখন তোমাদের মধ্যে মৃত্যু সময় এসে উপনীত হবে আর সে যদি যথেষ্ট পরিমাণে ধন-সম্পদ রেখে যায় তবে পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনদের জন্য বৈধ পথে অসীয়ত করে যাবে। এটা হচ্ছে মোতাকি পরহেজগারদের অধিকার।" –(আল বাকারা)

আল্লাহর পথে ব্যয়িত ধন-সম্পদ তথা ইবাদত কবুল হওয়ার অপরিহার্য শর্তাবলী :

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর পথে ব্যয় বহন কেবল সেই অবস্থায়ই সত্যিকারভাবে খোদার পথের ব্যয় নির্বাহ ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যখন সম্পদ ব্যয়কারীকে প্রকৃতপক্ষে সাচ্চা ঈমানদার হতে হবে। ওপরন্তু তার ভিতর আত্মস্বার্থ থাকবে না। লোক দেখানোর জন্য স্বীয় সুনাম হবার উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ ও দানের কথা উল্লেখ করে কারো মনে দুঃখ-কষ্ট দেবার প্রচেষ্টায় হবে না। নিজের মালগুলি শেখে খারাপ মালগুলি যেন না দেয়া হয় বরং উত্তম ও ভাল মালগুলি যেন দান করা হয়। আর উহা ব্যয় করার পিছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা ভালোবাসা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে যেন নিহিত না থাকে সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে অন্যথায় ধন সম্পদ ব্যয় করা হলেও তা আল্লাহর পথে ব্যয়িত হয়েছে বলে বিবেচিত হবেনা।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে : "তাহাদের বল ঃ তোমরা নিজেদের ধন মাল মনের ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে খরচ কর কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে যাহাই হোক তাহা কবুল করা হইবে না। কেননা তোমরা হইতেছে ফাসিক লোক। তাহাদের দেওয়া ধন মাল কবুল না হওয়ার কারণ ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। যে তাহারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি কুফরী করিয়াছে। যাহারা নামাজের জন্য আসে অবসাদগ্রস্ত অবস্থায়। আর খোদার পথে তাহারা ধনমাল ব্যয় করে বটে কিন্তু অসন্তোষ ও অনিচ্ছায়। তাহাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সংখ্যার বিপুলতা দেখিয়া তোমরা ধোকায় পড়িও না, আল্লাহ তো এসব জিনিসের সাহায্যে তাহাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনেই আযাবে নিমজ্জিত করেন।"

বাধ্যতামূলক জাকাত **ও তার পরিমাণ :**

পবিত্র কোরআন এর তালিম ও হেদায়েত দ্বারা সমাজের লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে আল্লাহর পথে স্বেচ্ছামূলক ব্যয় বহন করার অনুপ্রেরণা দান করেই ক্ষান্ত হয় না বরং রসুল (দ.) কে এই হেদায়েত দিয়ে থাকে যে তিনি ব্যয়ের নিম্নতম একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে ইসলামি রাষ্ট্রের তরফ থেকে অবশ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে আদায় করে সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করবে। বলা হচ্ছে–

"হে নবি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা আদায় করুন। এই আয়াতের 'সদকা' শব্দ দ্বারা এই কথার পানেই ইংগিত করা হয়েছে যে সাধারণভাবে মানুষ নিজেরা নিজেরা যে সদকা দিয়ে থাকে উহা ব্যতীত এদের প্রতি একটি নির্ধারিত পরিমাণে সদকা দান করা ফরজ বা আবশ্যিক করে দেয়া হোক। আর তা নির্ধারণ করার পূর্ণ ক্ষমতা রসুল (দ.)কেই দেয়া হয়েছে।"

সুতরাং এই নির্দেশ অনুযায়ী রসুল (দ.) বিভিন্ন ধরনের মাল, ধন-সম্পদের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে একটি নিম্নতম এমন সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে তার চেয়ে কম হলে আর জাকাত দেয়া ফরজ হবে না। অতঃপর নিসাব পরিমাণ তার থেকে বেশি সম্পদের মালিকানার ওপর বিভিন্ন সম্পদের বেলায় জাকাতের নিম্নলিখিত হার ধার্য করে দিয়েছেন–

১। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং নগদ মুদ্রা আকারে যে সম্পদ জমা হবে তার শতকরা আড়াই ভাগ হিসেবে বাৎসরিক জাকাত দিতে হবে।

২। কৃষি খাতে উৎপাদনশীল দ্রব্য যদি জমিতে প্রাকৃতিক উপায়ে হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে শতকরা দশভাগ জাকাত দিতে হবে।

৩। কৃষি খাতে উৎপাদনশীল দ্রব্য যদি জমিতে যান্ত্রিক বা কৃত্রিম পদ্ধতিতে পানি সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়ে থাকে, তখন শতকরা পাঁচভাগ জাকাত দিতে হবে।

৪। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূমিতে প্রাপ্ত ভূ-সম্পদ বা প্রাচীন কালে পুঁতে রাখা সম্পদ হলে তার শতকরা বিশভাগ জাকাত দিতে হবে।

৫। যে সকল গৃহ পালিত পশুর ওপর জাকাত প্রযযাজ্য হবে যা বংশ বৃদ্ধি এবং বিক্রির উদ্দেশ্যে পালিত হয়ে থাকে। ভেড়া, বকরি, গরু, উট, ইত্যাদি পশুর বেলায় জাকাতের পরিমাণ ভিন্ন যার বিস্তারিত খুঁটিনাটি ফিকাহর কিতাব সমূহে দেখা যেতে পারে।

জাকাতের এ পরিমাণ রসুল (দ.) আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানদের ওপর ফরজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন, যেমন নাকি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং নামাজের রাকাতের সংখ্যা তাঁর নির্দেশেই ফরজ করা হয়েছে। দ্বীনি কর্তব্য ও দায়িত্ব হিসেবে ও বাধ্যবাধকতার দিক থেকে এ দুটির মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। পবিত্র কোরআনে এগুলিকে রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্যের মধ্যে গণনা করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ নামাজ আদায় ও জাকাত আদায় এবং তা সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করবে। পবিত্র কোরআনে এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে–

"... ঈমানদার লোককে যদি ভূ-পৃষ্ঠে শাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করি, তবে এরা নামাজ কায়েম করবে এবং জাকাত আদায় করে যথাযথভাবে বণ্টন করে দেবে, আর লোকদের সৎ ও ন্যায় কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও অসৎ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখবে।" –আল হজ।

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত সার :

পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য যে স্কিম ও রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে, তার মৌলিক নীতিমালার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপঃ

১। এই অর্থনৈতিক নীতিমালার ন্যায়নীতি ও সুবিচার এমন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করে থাকে, যার দ্বারা একদিকে সকল প্রকার অর্থনৈতিক অন্যায়, অবিচার, জবর-দখল ইত্যাদির পথ বন্ধ করে দেয় আর অপরদিকে সমাজের নৈতিক গুণাবলী ও মহত্বের ক্রমবিকাশ ঘটে থাকে। ফলে সমাজের লোকেরা একে অপরের সাথে বিনা স্বার্থে স্বেচ্ছায় দান-দক্ষিণা, দয়া, স্নেহ মমতা এবং অনুগ্রহ ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার প্রদর্শন করবে এবং এর দ্বারা তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি, সৌজন্য,ভ্রাতৃত্ব ও দয়া দরদের মহান গুণাবলীর প্রসার ঘটবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে মানুষের মধ্যে ঈমান সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে শিক্ষা প্রশিক্ষণ দ্বারা উন্নত মানের মানুষ তৈরির কর্মপন্থার ওপর অধিকতর নির্ভরশীলতার নির্দেশ দেয় এরপরও যদি এই সমাজে কোন বিশৃঙ্খলা অবশিষ্ট থাকতে দেখা যায় তা পূরণ করার জন্য এমন বাধ্যতামূলক বিধানের প্রয়োগ করতে বলে যা সামাজিক ও সামগ্রিক মুক্তির জন্য যুক্তিসংগত ও অত্যাবশ্যক।

২। এই কর্মপদ্ধতিতে অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে কোন অবস্থাতেই নৈতিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে উভয়কেই একটিকে অপরটির সাথে জড়িত করে দেয়া হয়েছে । তাছাড়া এতে অর্থনৈতিক সমস্যাকে শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টি অর্থাৎ বস্তুগত লাভ ক্ষতির মাধ্যমে সমাধান করার পরিবর্তে তাকে এক সামগ্রিক জীবন বিধানের ফর্মুলায় ফেলে সমাধান করা হয়েছে যার ভিত্তিমূল সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি জগত সম্পর্কীয় ধ্যান ধারণা ও নৈতিক দর্শনের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

৩। এতে অর্থনৈতিক উপায় ও মাধ্যমসমূহকে মানুষের প্রতি খোদার সাধারণ অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যার অবশ্যম্ভাবী দাবি হচ্ছে ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত ও জাতিগত একচেটিয়া শ্রেষ্ঠতর, ইজারাদারী ও আধিপত্যের দুঃসাহস না করা বরং তার পরিবর্তে বিশ্ব স্রষ্টার পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির জীবিকা উপার্জনের জন্য সম্ভাব্য একটি যুক্তিসংগত সীমা রেখা পর্যন্ত উন্মুক্ত করা।

৪। এই ব্যবস্থাপনায় লোকদেরকে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা অবাধ ও সীমাহীন নয়। ব্যক্তির মালিকানা অধিকারের ওপর অন্যান্য লোকদের এবং সমাজের স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করার সাথে এ কর্মসূচি প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পর্কে তার আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি বন্ধু বান্ধব, অভাবী ও ভাগ্যহীন (প্রচলিত অর্থে) লোকদের এবং সামগ্রিকরূপে পূর্ণ সমাজের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এ অধিকারসমূহের মধ্যে কতিপয় অধিকারকে বুদ্ধিজ্ঞানের

উপলব্ধি দ্বারা এবং তা পূরণ করার জন্য স্বয়ং ব্যক্তির মানসিক, নৈতিক সংগঠন দ্বারা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৫। এ কর্মসূচী অনুযায়ী জীবনের অর্থনৈতিক নীতি পন্থা চালু করার প্রকৃতিগত পদ্ধতি হচ্ছে যে মানুষ তাকে স্বাধীন চেষ্টা ও কর্ম ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত করবে এবং উন্নতির গোপানে নিয়ে যাবে। অথচ এ' কর্মপ্রচেষ্টা, বাধ্যবাধকতাহীন ও সীমাহীন থাকবে না বরং সমাজের এবং স্বয়ং উক্ত অনুসারীদের নিজস্ব নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য তাদেরকে কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিধানের অধীন করে দেয়া হয়েছে।

৬। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় নারী, পুরুষ উভয়কেই তাদের উপার্জনকৃত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য কোন বৈধ উপকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ধন-সম্পদের সম-মালিকানা নিরূপন করা হয়েছে। আর এই দুই শ্রেণিকেই স্বীয় মালিকানা অধিকার থেকে উপকৃত ও লাভবান হবার সমান সুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

৭। এই অর্থনৈতিক কর্মপন্থার সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যে সম্পদের প্রবাহমান গতিধারা যেমন অবৈধ উপকরণ দ্বারা কোন একটি বিশেষ ব্যক্তি, শ্রেণি বা গ্রোষ্ঠীর দিকে ধাবিত না হয়। আবার বৈধ উপকরণ থেকে আগত ধন-সম্পদ যেন কোথাও আঁকড়িয়ে ধরে কর্মহীন হয়ে তার মালিকদেরকে সমাজে সীমাহীন শক্তিধর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না করে। অর্থাৎ সম্পদের গতি স্তব্ধ হয়ে না পড়ে বরং অর্থ-সম্পদ অধিকতর আবর্তনের মধ্যে থাকে এবং তা বিবর্তনের মাধ্যমে বিশেষরূপে সেই সকল ব্যক্তিগণ যেন অংশ পায় যারা কোন না কোন কারণে তা নিজেদের যথাযথ অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ইসলামি অর্থনীতি ও আধুনিক অর্থনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ

ইসলাম আল্লাহর আরাধনা উপাসনার একটি পদ্ধতি বা প্রচলিত অর্থে একটা ধর্ম মাত্র নয়। বরং তা একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে সাথে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ ব্যবস্থাও। ইসলামের লক্ষ্য কেবলমাত্র এক আল্লাহর জন্য কয়েকটি আচার অনুষ্ঠান পালনকারী হওয়া নয় বরং সেই সাথে মানুষের ওপর যে মানুষের সার্বভৌমত্ব, শ্রেণিগত বৈষম্যের জগদ্দল পাথর চেপে আছে, সুদ্দি কারবারের অমানুষিক শোষণ বঞ্চনার নির্যাতন রয়েছে। ইসলাম তা থেকেও মানুষকে মুক্তি ও নিস্কৃতি দেবে।

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টি তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হয় না। মৃত্যুকালেও তেমনি তার নিজস্ব ক্ষমতা কোন কাজে আসে না। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হয়েই মানুষকে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হতে হয় এবং আরও অসংখ্য সৃষ্টজীবের সঙ্গে থেকেও পার্থিব জীবনে মানুষকে এক স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করতে হয়। সৃষ্টিকর্তার বিধান অনুসরণ করে এই স্বতন্ত্র ভূমিকার সাফল্য বা কার্যকুশলতা প্রদর্শন করতে হয়। এ প্রেক্ষাপটেই ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা ও পরিধি আধুনিক অর্থনীতির বিবর্তিত সংজ্ঞা ও পরিধি থেকে যথেষ্ট ভিন্নধর্মী ও ব্যাপক। ইসলামি অর্থনীতিতে মানুষের জীবনের সার্বিক ও প্রকৃত কল্যাণকেই অনুসরণ করাই লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত। এ শুধু জড় জীবনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে পজিটিভ ইকোনোমিকস প্রতিষ্ঠিত করে না। মানুষের কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যকে সফল করার জন্য সামগ্রিক ও সমন্বিত বৃহত্তম জীবন সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে। এ ক্ষেত্রে জীবন শুধু জড় নয় শুধু ইহকালের জীবনও নয়, অর্থনৈতিক আচরণকে মানুষ যেন সেই সামগ্রিক ও সমন্বিত ইহকাল পরকালের সর্বোত্তম সমৃদ্ধি ও কল্যাণ অর্জনের উপযোগী করে নেয়। ইসলামি অর্থনীতির পরিকল্পনাতেও ভাবধারাতে তারই ব্যবস্থা অন্তর্নিহিত আছে। এই ভিত্তিগত পরিকল্পনা ও ভাবধারা আল্ কোরআনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আয়াতের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বস্তুগত ও বৈষয়িক উন্নতি- কেন্দ্রিক অর্থনীতির তত্ত্বগত দিক ও ব্যবহারিক দিককে মানুষের নৈতিক ও চরিত্রগত বিবেচনা থেকে পৃথক করে দেখা হয়। সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষণেও জড় অর্থনৈতিক সম্পদ অর্জন ও বিতরণ বাবস্থার যুক্তিবাদকে মূল্যায়ন করার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ইসলামি জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্যের জন্য তেমনি বিবেচনা ও পদ্ধতি প্রয়োগ সংকীর্ণধমী ও অপূর্ণাঙ্গ।

কারণ এতে মূল্যবোধ নিরীক্ষা (Norm) এবং ইহকাল ও পরকালের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসৃত সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যও নির্ধারিত থাকে না। এতদবিষয়ে বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রায়হান শরিফের বক্তব্য–

অর্থনীতির আধুনিক সংজ্ঞার অধীনে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় মৌল সম্পদকে বলা হয় ফ্যাক্টর অব প্রোডাকশন (বা উৎপাদনের উৎপাদক) আবার সমষ্টিগতভাবে সকল উৎপাদককে প্রোডাকটিভ রিসোর্সেসও বলা হয়। এ সকল উৎপাদক বা সম্পদকে অর্থনীতির ক্লাসিকাল যুগের পন্ডিত অ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে বিবর্তিত প্রথায় চারটি শ্রেণিতে ভাগ করে বলা হয় ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন উদ্যোগ। ইংরেজিতে বলা হয় : Land, Labour, Capital and Organisation. (enterprise entrepreneurship)

ইসলামি অর্থনীতিতেও এ সকল উৎপাদক বা সম্পদের ব্যবহার ভিত্তি করেই উৎপাদন প্রক্রিয়া সংগঠিত ও প্রচলিত থাকবে। কিন্তু প্রত্যেকটি উৎপাদক মৌল সম্পদের সংজ্ঞা ও ভাবধারণাতেই এক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য প্রবেশ করে। এ পার্থক্য মৌলধর্মী। কারণ কৃত্রিমভাবে এ ক্ষেত্রে সংজ্ঞা ও ভাবধারণার পরিধিকে সীমিত এবং বাজারে বিনিময়ের উপযোগী পণ্য বা সেবা উৎপাদন লক্ষ্যেই নির্ধারিত করা হয় না। ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে শুধু land and natural resources বলে আখ্যায়িত করলেই চলে না। এ সকল সম্পদের সৃষ্টিকর্তা এবং তার এক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হয়। তেমনি শ্রমকে দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতার ঘণ্টা, মাস, বছরের মেয়াদ প্রয়োগ করলেই চলে না। শ্রমকে মানুষের জীবনের সঙ্গে এবং সমাজের সংগঠিত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হয়। আর উক্ত সম্পর্কিত করার ব্যাপারেই আবার মানুষের স্রষ্টার বিধানের প্রয়োগকে বিবেচনার পরিধিতে আনতে হয়। পুঁজি ও সংগঠনকে প্রচলিত পদ্ধতিতেও মৌল ধরা হয় না। ইসলামি অর্থনীতির কাঠামোতেও তাই। তবে অমৌল ছাড়াও তখন নতুন বৈশিষ্ট্যের বিবেচনা আসে। শুধু ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে উদাহরণ হিসেবে ধরে এখানে আমরা ইসলামি অর্থনীতির অধীনে গ্রহণযোগ্য এ উৎপাদকের ভিন্নধর্মী সংজ্ঞা আর ভাবধারণা বিবেচনা করে আধুনিক পাশ্চাত্য অর্থনীতির স্বীকৃত তত্ত্ববিদ আলফ্রেড মার্শালের মতে 'ভূমি' শব্দটিকেই জমি সংক্রান্ত সম্পদ সুবিধাসহ প্রদত্ত অন্যান্য সম্পদ সুবিধাকে একত্রিতভাবে বোঝাবার জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। তার কথায় 'ভূমি' (Land) বলতে বোঝায়ঃ The materials and of the forces which nature gives freely for man's aid, in land and water, in air and light and heat (Alfred Marshal...Principles of Economics (1936) এখানে তবু ভূমির সংজ্ঞাতে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রায় সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত রাখার প্রয়াস রয়েছে। শুধু প্রকৃতি (Nature) বলতে যে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিগত সম্পদ শক্তি এবং তার বিধি বিধান বোঝায় এটুকু ধরে নিলেই ইসলামি দর্শন ও ভাবধারণার কাঠামোর সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে ইসলামি দর্শন ও ভাবধারণার কাঠামোকে আমরা প্রধানত দেখতে পাই সুরা ইব্রাহিমে; সুরা হিরে এবং সুরা নাহলে।

সুরা ইবরাহিম (৩২-৩৪)

"তিনিই আল্লাহ যিনি নভোমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দিয়ে তোমাদের জন্য রিজিক উৎপাদন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন। যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।"

"এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে ও চন্দ্রকে (অভ্যস্ত সেবক হিসাবে) আর দিন-রাত্রিকেও তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন।"

"যে সকল বস্তু তোমরা (প্রকৃতিগতভাবে) চেয়েছে তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নিয়ামত (অর্থাৎ প্রদত্ত দান সম্পদ) গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না... ।"

সুরা হিজর (১৯-২২)

"আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি।"

“আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যও সৃষ্টি করেছি, যাদেরকে তোমরা রিযিক দাও না।” “আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা প্রদান করি।”

“আমি বৃষ্টিগর্ভ বাতাস পরিচালনা করি, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে পান করাই। তোমাদের কাছে এর ভান্ডার নেই।”

সুরা নাহল (১০-১৬)

“তিনিই তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর।” “এ পানি দ্বারা (তিনিই) তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল– জায়তুন, খেজুর, আঙুর ও সব রকমের ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।”

“তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন, রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে। নক্ষত্র তারকা সকল তাঁরই বিধানে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।”

“তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যে সকল বিভিন্ন ও বিচিত্র বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা (ও গবেষণা) করে।”

“তিনিই কাজে লাগিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা (মৎস্যের) তাজা মাংস খেতে পারো এবং তা থেকে বের করতে পারো পরিধেয় অলংকার। তুমি তাতে জলযান সমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ কর ও তার অনুগ্রহ স্বীকার কর।”

“এবং তিনি পৃথিবীর ওপর ভারি পর্বত স্থাপন করেছেন যেন তা তোমাদের নিয়ে (ভারসাম্যহীনভাবে) আন্দোলিত না হয়, আর নদী ও পথ তৈরি করেছেন যাতে তোমরা পথপ্রদর্শিত হও।”

“এবং তিনি পথ নির্ণায়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন এবং নক্ষত্র তারকা দ্বারাও মানুষ পথের দিক নির্ণয় করতে পারে।”

উপরোক্ত আয়াতগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করলে দেখা যাবে–এখানে কতকগুলো ভাবধারণাগত বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধানত উল্লেখ্য হলো–

(ক) প্রকৃতি প্রদত্ত দান বা সম্পদের স্থলে স্পষ্টভাবে আল্লাহর সৃষ্ট দান বা সম্পদ বলা হয়েছে।

(খ) এ সকল দান ও সম্পদ মানুষেরই কল্যাণের জন্য।

(গ) যথাযথ কল্যাণের কাজে এ সকলের ব্যবহার করতে হলে অন্বেষণ, অনুসন্ধান, চিন্তাভাবনা বুদ্ধি-বিবেচনা (প্রয়োগের গবেষণা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রয়াস) এবং সম্পদের স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

(ঘ) ‘গ’ তে উল্লিখিত প্রয়াস ও চিন্তাশক্তির সম্পদও আল্লাহরই প্রদত্ত।

(ঙ) আকাশ, বাতাস, বায়ুমন্ডল, মৌল ধাতু, মৌল উপাদান (অনু-পরমাণু), পাহাড়, পর্বত, ভূগর্ভস্থ সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ, আবহাওয়া, বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ পানির উৎস, বনজ সম্পদ ইত্যাদিসহ এসব কিছু থেকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করার বৈজ্ঞানিক বিধিবিধানও আল্লাহ অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল করে রেখেছেন। সে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে মানুষ কল্যাণের লক্ষ্যকে অনুসরণ করবে প্রযুক্তি প্রয়োগ সাহায্যে সে উদ্দেশ্যেই আল্লাহ প্রদত্ত আইনের অধীনে মানুষকে সাহায্য করার জন্য কর্মনিয়োজিত রয়েছে আকাশ, বাতাস, দিন, রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, সাগর-মহাসাগর, নদনদী, জলপথ, স্থলপথ, আকাশপথ এবং প্রযুক্তি-নির্ভর চলাচল ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পুঁজিদ্রব্য, জীবিকাদ্রব্য, নৌযান, স্থলযান ও আকাশযান ইত্যাদি।

(চ) মৌল সম্পদ সৃষ্টি অবস্থায় পড়ে থাকাই আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়, তার যথাযথ ব্যবহার সাহায্যে মানুষের ইহকাল-পরকালের কল্যাণকে সর্বোচ্চ সম্ভব স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যেই মানুষকে সার্বিক জীবন সাধনার

অঙ্গ হিসেবে অর্থনৈতিক প্রয়াস পরিচালনা করতে হবে। এ জন্যই ইসলামি ভাবধারণাতে মানুষের ভূমিকা সর্বপ্রধান। সেজন্যই প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের মানসিক/আত্মিক/আধ্যাত্মিক শক্তিকে একত্রিতভাবে ইসলামি অর্থনীতিতে স্বীকৃত হয় মৌল উপাদান, উৎপাদক বা সম্পদ হিসেবে। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে মানুষের মৌল মানসিক আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করলে সংক্ষেপে ইসলামি অর্থনীতির 'প্রাকৃতিক সম্পদ' ভাবধারণা হবে ব্যাপকতম। এর মধ্যে আলফ্রেড মার্শালের সংজ্ঞাকে সম্প্রসারিত করে আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের সব রকম মৌল গুণাবলী ও শক্তিকে সংযুক্ত করা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সাহায্যে সে সকল গুণ ও শক্তিকে সামাজিকভাবে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে অর্থনীতির ও সমাজের কল্যাণ লক্ষ্যের অনুসরণ উপযোগী করা প্রয়োজন। ইসলামি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন প্রয়াসে এমনি উপযোগী শিক্ষা প্রশিক্ষণের উপস্থিতি হলো পূর্বশর্ত।

আধুনিক অর্থনীতির পাশ্চাত্য বিজ্ঞানরূপ আলফ্রেড মার্শালের সংজ্ঞা থেকেও সংকীর্ণ হয়ে দূরে সরে এসেছে। বর্তমানকালে সৃষ্ট জগতের বিপুল বিশাল অনাবিষ্কৃত সম্পদের পরিধির কথা বিবেচনা না করে শুধু যেসব সম্পদকে মানুষ নিজ প্রয়াসে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধীনে আনয়ন করতে পেরেছে এবং আনয়ন করার সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাকে সংজ্ঞার অধীন করেছে। এমন কি অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অসাধারণ সীমাহীনতা বৈশিষ্ট্যটিকে নির্বাসন দেওয়ার লক্ষ্য শুধু 'ভূমি' (Land) শব্দ ব্যবহার দিয়েই সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে বোঝাতে পদ্ধতিগত চেষ্টা চলেছে এবং তাই প্রথাগত হয়ে গেছে। বলা হয়ঃ "Land stands for all natural resources which yield an income of which have and exchange value It represents those natural resources which are useful and scarce, actually or potentially. এ প্রথাগত পদ্ধতিতে অন্যান্য উৎপাদক সম্পদের তুলনায় 'ভূমি' উৎপাদক সম্পদের স্বতন্ত্রকারী বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয় এমনিভাবে–

(১) ভূমি মানুষের কাছে প্রকৃতির দান,

(২) ভূমি পরিমাণে অপরিবর্তনীয়,

(৩) ভূমি নিজস্ব গুণে চিরস্থায়ি (যেজন্য ভূমির ক্ষমতাকে ডেভিড রিকার্ডো বলেছেন মৌল ও ধ্বংসহীন,

(৪) ভূমির ভৌগলিক স্থানান্তর ক্ষমতা নেই,

(৫) ভূমির গুণাগুণে সীমাহীন বিভিন্নতা রয়েছে,

উপরোক্ত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রধানত জমির ব্যাপারেই এগুলো লক্ষ্যণীয়। কিছুটা অবশ্য ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে। সমুদ্রের ও নদীনালার মৎস্য সম্পদের ব্যাপারেও তাই। কিন্তু আকাশ-বাতাসের উপাদান এবং অণু-পরমাণু সম্পর্কে উক্ত ধরনের ভাবধারণা প্রযোজ্য নয়। বৈশিষ্ট্য নির্ধারণও সম্ভব নয়। পদার্থবিদ্যা থেকে শুরু করে অণু-পরমাণুর বিশিষ্ট ক্ষেত্রে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য অনুধাবন করার জ্ঞান ও চিন্তাভাবনা নিয়ে যে বিজ্ঞানীরা অন্বেষণ করেন, তারাই অসীম অনাবিস্কৃত ক্ষেত্রের অসীম সম্পদ সম্ভাবনার সন্ধান লাভ করেন। তারা ইসলামি তত্ত্বের অন্তর্গত সৃষ্ট সম্পদের অসীমত্বের প্রমাণ তথ্য পান। মুসলিম বিজ্ঞানী আল-কোরআনের বর্ণিত সৃষ্টির সম্প্রসারণশীলতা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পান।

পাশ্চাত্য পাঁচটি বৈশিষ্ট্যকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক মনে করা যায় না। বিশেষ করে প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারেই ইসলামি অর্থনীতিবিদদের প্রতিবাদ। তাদের যুক্তি কাঠামোতে–

(১) ভূমি এবং সকল প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত দান,

(২) ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তনীয় নয়, বরং যথেষ্ট পরিবর্তনশীল,

(৩) ভূমির নিজস্ব গুণ চিরস্থায়ি নয়।

প্রথম বৈশিষ্ট্যর পার্থক্যটি ভাবধারণাতে মৌল প্রভেদ এনে দেয়। প্রকৃতির সত্তাকে সাধারণ মানুষ বুঝে না। প্রকৃতির যা কিছু আছে তার মধ্যে রূপ, সৌন্দর্য ও সম্পদকে মানুষ উপভোগ করে। প্রকৃতি থেকে আহরণকে অনেকটা অপহরণই বলা চলে। প্রকৃতির প্রতি সম্পদ অপহরণকারী কোন দায়িত্ব পালন করে না। সেজন্যেই

Ecological System- এ ভারসাম্য দ্রুত গতিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে বর্তমান কালে সভ্য দেশের বিজ্ঞানীরাও শংকিত। তারা নতুন দষ্টি দিয়ে দেখতে পারছেন এ শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে সভ্য সমাজের ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তিবাদের জন্য, সংকীর্ণ অর্থনৈতিক মূল্যবোধের উর্ধ্বলোকের কোন স্থায়ি মূল্যবোধ গ্রহণ না করার জন্য। অর্থাৎ স্রষ্টার প্রতি দায়িত্বশীলতার মূল্যবোধকে (Metaeconomic value) ভিত্তি স্বীকার না করার জন্য। ইসলামি দৃষ্টিকোণ সে ভ্রান্তিটিই ধরিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃতি এবং ভূমি পরিবর্তনশীল। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার জন্য এবং প্রকৃতির ওপর মানুষের দায়িত্বহীন শোষণ ক্রিয়া পরিচালনার জন্য ভূমির পরিমাণ নিয়ে ভাঙাগড়া প্রাকৃতিক নিয়ম চলছে –তার নিদর্শন দেখা যায় নদীর প্রবাহ পরিবর্তনে বৃষ্টি বর্ষণ ও পর্বতের বরফগলা স্রোতের পরিবর্তনে নদীর এক পার ভেঙ্গে অন্য পারে চরভূমি গড়াতে আর সাগরের মোহনা। উপকূলের কাছে বিশাল দ্বীপ সৃষ্টিতে। আবার ভয়ংকর ভূ কম্পনের ফলেও। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'দিকেই আসে পরিবর্তন। বাংলাদেশের বাস্তবতায় দৃষ্ট হয় তেমনি নিদর্শন। তার ওপর বর্তমানকালে নতুন প্রভাব মানুষের অকল্যাণকর ভূমিকা থেকেই প্রকট হয়েছে। আকাশের ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্থ করে নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টির ভয়াবহতা এনেছে।

তৃতীয়ত, ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর বর্ণিত 'মৌল ও ধ্বংসহীন' (Original and indestructible) ভূমিগুণ বর্তমান কালের নতুন বিজ্ঞান প্রযুক্তির জন্য অপরিবর্তিত থাকে। কৃত্রিম রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট অঞ্চলে ভূমি উর্বরতা হারিয়েছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের ফারাক্কা বাঁধের প্রতিফল হিসেবে বিশাল পদ্মা নদীর বুকে জন্ম নিচ্ছে ধূ-ধূ বালুকার বালিয়াড়ি আর তীরে তীরে বিশাল এলাকায় উৎপাদিকা শক্তির হচ্ছে বিপুল ক্ষতি। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি সম্পদের প্রাকৃতিক মূল্য রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকলে কল্যাণমুখী পদ্ধতির ব্যবহার করা হতো এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজে লাগানো হতো সর্বক্ষেত্রে। আর প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমন্বয় এবং সমঝোতার নীতি অবলম্বন সম্ভব হতো।

উল্লেখ্য, ইসলামি যুক্তিবাদের কাঠামোতে মানুষকে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার কল্যাণ বিধি পালন করে প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব নিতে হয়। সে দায়িত্ব পালন না করলেই স্রষ্টার বিধানের সীমালঙ্ঘন হয়। তওহিদ ভিত্তিক বিধান পালনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি অর্থনীতির বিধান থেকে পথচ্যুত হলেও তেমনি সীমালঙ্ঘন ঘটে। তার ফলে সীমালঙ্ঘনকারী মানুষের সমাজে আসে অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়। যে বিপর্যয় কখনো আসে মন্থর গতিতে আবার কখনো আসে অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিকভাবে। ইসলামি সমাজ অবশ্য তার নিদর্শন ও ইতিহাস আল কোরআন থেকেই অধ্যায়ন অনুশীলন করে। সীমালঙ্ঘন পরিহার করে।

সংকীর্ণ অর্থের 'ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধরে অর্থনীতিকে সমাজেরও মানুষের কল্যাণ লক্ষ্য অনুসরণ করতে গেলেও দেখা যাবে মানুষের প্রয়োজনের চেয়ে সরবরাহের সসীমতা বা স্বল্পতা এসেছে মানুষেরই অকল্যাণমুখী ভূমিকা অবলম্বনের জন্য। যেমন:

(ক) পৃথিবীর আয়তনের তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল। সে পরিস্থিতিতেও পৃথিবীর জল, স্থল ও আকাশ-বাতাসের সম্পদকে পৃথিবীর সকল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে ভোগ-বিলাসী স্বার্থপর অহংকারী রাজ্য ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠাতা গোষ্ঠী । সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ প্রচেষ্টাকে সংকীর্ণ জাতিগত অধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞাভুক্ত করে স্বল্প সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য বিপুল মৌল সম্পদকে কুক্ষিগত করে নিয়েছে তারা যুদ্ধ কৌশল, অস্ত্র ও সৈন্যবলের জোরে।

(খ) পরবর্তী পর্যায়ে ধাতু ও কারিগরী জ্ঞান প্রয়োগে বিপুল পরিবর্তন ঘটে মানুষের উদ্ভাবনি কৃতিত্বে, যার ফলশ্রুতিতে আসে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও সমর কৌশলে দ্রুত পরিবর্তন, আসে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও বাণিজ্যবিপ্লব। তার নতুন শ্রম চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হয় এসব জন বিরল সম্পদশীল দেশের জন্য দাস ব্যবসা সাহায্যে মানুষ শক্তি আমদানী করার। শুরু হয় বাণিজ্যের নামে ঔপনিবেশিক অভিযান এবং কালক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ । মুসলিম সভ্যতার আদর্শবাদী খেলাফত সুলতানাত এ সকল প্রক্রিয়ার সঙ্গে যথাযথ মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে বাণিজ্যিক ও মৈত্রীচুক্তি সাহায্য করে যায় সহযোগিতা।

(গ) তৃতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কঠোর দ্বন্দের ফলে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যেই ঘটে সহিংস বিরোধ ও সংঘর্ষ। এলো দু'টি বিশ্বযুদ্ধ। সে পরিস্থিতিতে দেশ ও রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ধ্বংসলীলার ফলে সারা বিশ্বে এলো আমুল পরিবর্তন।

যুদ্ধজয়ী পাশ্চাত্য মিত্রশক্তিগুলো তাদের স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূলে সৃষ্টি করল নতুন মানচিত্রের দেশ ও জাতি। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো হলো তথাকথিত উন্নত দেশের নতুন উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্রের শিকার। তারই মধ্যে বিচিত্র বেশে মঞ্চস্থ হতে থাকল পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য আর সমাজতন্ত্রবাদী সোভিয়েট জোটের পরাশক্তি ভূমিকা এবং দুই পরাশক্তির কল্যাণধ্বংসী পারমানবিক ও অন্যান্য সমরাস্ত্রের প্রতিযোগিতা। সে প্রতিযোগিতার অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের শিকার হলো জনবহুল সম্পদ, শাষিত তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলো। তারই অন্তর্গতভাবে সংগ্রামশীল অস্তিত্ব চলল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শক্তিহীন কাঠামো, যাকে বলা হয় মুসলিম উম্মাহ। সে কাঠামোর মধ্যেই এখনো সংগ্রাম করে চলছে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বহীন অধুনা ঘোষিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র।

(ঘ) মুসলিম উম্মাহর অধীনে দেশগুলো যার যার জাতীয় নেতৃত্বাধীনে বাস্তবতার সঙ্গে সমঝোতা করে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সে সমঝোতাতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্র ছাড়াও বিজ্ঞান প্রযুক্তি আর আত্মরক্ষার অস্ত্র সরবরাহ ব্যাপারে রয়েছে দুই পরাশক্তি জোটের ওপর নানা মাত্রার নির্ভরশীলতা। এমনি বাস্তবতায় ইসলামি আদর্শবাদের অর্থনীতি কাঠামো অব্যাহত থাকতে পারে না, নিজস্ব শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে পরাশক্তিগুলোর মুকাবিলাও করতে পারে না। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর সমাজ ও মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা ও আদর্শবাদ সম্পর্কে সচেতনতা নতুন রেনেসাঁ যুগের সূচনা করেছে অনেকগুলো আদর্শবাদ। তার প্রেক্ষিতে নতুন গবেষণা ও নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্যম নতুনভাবে আদর্শবাদী কাঠামোকে সক্রিয় ও ক্রমে ক্রমে বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর করার সাধনায় কর্মতৎপরতা সব দেশেই চলছে। সে প্রেক্ষিতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার এবং পাঠ্যপুস্তকের অনুসরণে আমাদের বাংলাদেশের মত অন্য আরো দেশেও পাশ্চাত্য সংজ্ঞা আর ভাবধারণা নিয়েই অনেক পরিমাণে চলে আসছিল। মুসলিম দেশগুলোতে তার পরিবর্তন আনয়ন করার দায়িত্ব এসব দেশের নেতৃত্বের। সারা পৃথিবীকে একটি ভৌগলিক রাষ্ট্রীয় একক ধরে 'ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ' উৎপাদক (Factor of Production) ভিত্তি করে কোন মুসলিম রাষ্ট্র বা উম্মাহ অর্থনৈতিক কাঠামো সংগঠন করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু গবেষকরা তুলনামুলকভাবে অনুশীলন বিশ্লেষণ করে নিভয়ই দেখাতে পারেন, তেমনি আদর্শ কাঠামোতে মানুষের জন্য কতো অধিকতর কল্যাণ সৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে এবং সারা বিশ্বের মানুষের কল্যাণের স্বার্থে সে পরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হওয়ার মত আন্তর্জাতিক ও সমন্বিত জাতীয় প্রয়াসের উন্নয়ন পরিকল্পনা আর তার বাস্তবায়ন 'বুদ্ধিমান ও চিন্তাগোষ্ঠীরই' তো কর্তব্য এবং দায়িত্ব। এ দিকে অগ্রসর হতে হতেই নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানীরা এবং অর্থনীতিবিদরা সংস্কার সাহায্যে খুঁজে পাবে ব্যাপক কল্যাণের অনুসারী তত্ত্ব সংগঠনের প্রাথমিক মৌল ভিত্তিরূপে 'ভূমি ও প্রাকৃতিক' সম্পদের যথাযথ সংজ্ঞা ও ভাবধারণা। (আল কোরআনে অর্থনীতি)

আধুনিক অর্থনীতিতে মানুষের চেহারা, প্রতিভাসহ যাবতীয় বস্তু ও সেবাকে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ বা অতি প্রাকৃত সত্তার কোন অবদান স্বীকার করা হয় না। পক্ষান্তরে ইসলামি অর্থনীতি ভাব ধারণায় মানুষের মালিকানা আল্লাহর উপরেই ন্যাস্ত। তাই তার সকল প্রকার গুণাবলী আল্লাহতা'লার মহান দান। ওপরন্ত মানুষ সৃষ্ট সকল প্রকার বস্তু ও সেবা আল্লাহর নেয়ামত স্বরূপ এবং তা উৎপাদনে বা সৃষ্টি করতে আল্লাহর রহমত স্বরূপ পানি, বাতাস, আলো, তাপ ইত্যাদির ব্যবহার অপরিহার্য। তাই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আল্লাহর বিধান পালন করা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

রসুল (দ.) এর অর্থবন্টন পদ্ধতি :

হজরত রসুল (দ.) এর সময়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার রক্ষণ সম্পদ বন্টনের ধারা তথা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান পবিত্র কোরআন হাদিস তথা ইতিহাসের আলোকে আলোচনা হচ্ছে :

পবিত্র কোরআনের সুরা তওবার ৮ম রুকুর ৬১ পৃঃ আয়াতে ছদকার হকদার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে,

“এই ছদকা সমূহ মূলত ফকির ও মিসকিনদের জন্য, আর তাদের জন্য যারা ছদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত তাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য, সেই সঙ্গে এটি গলদেশের মুক্তিদানে ও ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্যার্থে, আল্লাহর পথের পথিক মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য। এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ, আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক।”

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত আট শ্রেণির লোকেরা হচ্ছে :

১। ‘ফকির’ বলিতে বুঝায় এমন ব্যক্তিকে, যে নিজের জীবন জীবিকার ব্যাপারে অপর লোকদের মুখাপেক্ষী, সকল রকমের অভাবগ্রস্থ লোকদের জন্য এটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। তা দৈহিক ত্রুটি কিংবা বার্ধক্য জনিত স্থায়িভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হোক, কিংবা সাময়িকভাবে কোন কারণে উপস্থিত সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং কোনরূপ সাহায্য সহায়তা পেলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপযুক্ত হতে পারে। এতিম শিশু, বিধবা নারী, বেকার লোক এবং সাময়িক বিপদে পড়ে অভাবগ্রস্থ হওয়া লোক এই পর্যায়ে গণ্য।

২। ‘মিশকিন’ ‘মাসকানাত’ শব্দে অক্ষমতা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়া আয়, সম্বলহীন ও লাঞ্ছনাময় তার অর্থ অন্তর্ভুক্ত আছে। এই হিসেবে ‘সাকিন’ বলতে সাধারণ অভাবগ্রস্থ লোকদের অপেক্ষা অধিক দুর্দশাগ্রস্থ তাহাদেরকে বোঝায়। এই শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে এমন সব লোক সদকা জাকাত পাওয়ার অধিকারী বলা হয়েছে। যারা নিজেদের প্রয়োজনের অনুরূপ পরিমাণে উপায় উপাদান পায় না এবং খুবই কষ্টকর অবস্থায় নিপতিত আছে। কিন্তু তাদের আত্মসম্মান বোধ তাদেরকে কারো কাছে হস্ত প্রসারিত করতে দেয় না এবং তাদের বাহ্যিক অবস্থানও এমন নয় যে, তাহাদেরকে দেখে কেউ তাদেরকে অভাবগ্রস্ত মনে করে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। অর্থাৎ মিসকিন সেই ব্যক্তি যে তার প্রয়োজন অনুরূপ সম্পদ পায় না। না তাহাকে চিনতে পারে কেহ সাহায্য করে, না সে পথে দাঁড়িয়ে লোকদের নিকটে চাইতে পারে ।

৩। ছদকা আদায়কারী কর্মচারী : যারা ছদকা জাকাত আদায় উসুল করা ও তার সংরক্ষণের এবং হিসেব রাখার লেখার এবং তা বিলি বণ্টনের কাজে প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত। এই কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গও ছদকার অর্থ হতে তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদি দেয়ার বিধান আছে।

৪। তালিফে কলব : মন জয় করা। এই কথার মূল তাৎপর্য হলো যে সব লোক ইসলামের বিরুদ্ধতায় তৎপর তবে অর্থ দান করে তাদের বিরুদ্ধতার তীব্রতা কমানো যেতে পারে কিংবা কাফের সমাজের যে সব লোককে টাকা দিয়ে বাধ্য করা যেতে পারে, ফলশ্রুতিতে তারা ইসলামের সাহায্যকারী হতে পারে অথবা যারা সবেমাত্র ইসলাম বুল করে মুসলিম সমাজে শামিল হয়েছে এবং তাদের পূর্বতম বিরুদ্ধতা বা নৈতিক দুর্বলতা দেখে আশঙ্কা করা যায় যে, অর্থ সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে বাধ্য করা না হলে তারা আবার কুফরের দিকে ফিরে যেতে পারে। এই ধরনের লোকদের জন্য স্থায়িভাবে বা সাময়িক বৃত্তি দিয়ে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত অন্তত কম বিপজ্জনক শত্রু বানানো যেতে পারে। এই শ্রেণির লোকদের পক্ষে ফকির মিসকিন বা মুসাফির হওয়া শর্ত নয় এবং তা না হলে তাদেরকে জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না এমন কোন কথা বলার সুযোগ বা ভিত্তি নেই। বরং এ ধরনের লোক ধনী বা নেতৃস্থানীয় হলেও তাদেরকে জাকাতের অর্থ দেওয়া সম্পূর্ণভাবে বৈধ।

৫। গলদেশ মুক্ত করা ও এর অর্থ হচ্ছে দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তিদানের জন্য জাকাতের অর্থ ব্যয় করা। এর দুটি পন্থা আছে, একটি এই যে, যে ক্রীতদাস মনিবের সাথে চুক্তি করেছে যে এত পরিমাণ টাকা দিলে সে তাকে মুক্ত করে দেবে। সেক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা লাভের জন্য জাকাতের টাকা প্রদান করে সাহায্য করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পন্থা হলো জাকাতের অর্থ দ্বারা ক্রীতদাসদের খরিদ করেও স্বাধীন ও মুক্ত করে দেয়া।

৬। ঋণ ভারাক্রান্তদের : এমন লোক বুঝায় যে নিজের মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করলে তার নিকট বা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা জাকাত ফরজ হওয়া থেকে কম হবে সে উপার্জনশীল হোক কি বেকার

রোজগাওহিন এবং সাধারণভাবে সে ফকিররূপে পরিচিত হোক কি ধনী উভয় অবস্থাতেই তার জন্য জাকাতের টাকা থেকে সাহায্য করা যাবে।

৭। 'খোদার পথ' কথাটি সাধারণ অর্থবোধক। যে সব নেক ও ভাল কাজে খোদার সন্তোষ আছে তার সকল কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। এই খাত থেকে জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ সহ যে সব ব্যক্তিগণ আল্লাহ অনুসন্ধানে গৃহ ত্যাগী বা সংসার বিমুখ এ ধরনের লোকদের জন্য ধন সম্পদ ধারণা করা যেতে পারে।

৮। মুসাফির : নিজের ঘরে ধনী হলে ও বিদেশে যদি সে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তবে তার সাহায্যে জাকাত ফান্ড থেকে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

জাকাত ফান্ড পরিচালনা তথা বণ্টন পদ্ধতি যে একটি জটিল ব্যাপার তা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে কারণ এই আট শ্রেণির লোকদের মধ্যে কোন শ্রেণিকে কোন শ্রেণির ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে তার খুঁটিনাটি বিস্তারিতভাবে পবিত্র কোরআনে ব্যাখ্যা করা হয়নি। একই শ্রেণির একাধিক লোক একই সময়ে সাহায্য প্রার্থী হলে কাকে কিসের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তাও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি।

বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের কিসের ভিত্তিতে কি পরিমাণ সম্পদ প্রদান করতে হবে

তার কোন রূপরেখাও কোরআনে উল্লেখ নেই। কারণ এই জটিল ও দুরূহ কাজটি সম্পাদন করার জন্য নবুয়াতি জ্ঞান বা তার অবর্তমানে বেলায়েতি জ্ঞান (তকদিরের রহস্য) অপরিহার্য। যা হোক, বিষয়টি হাদিসের আলোকে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে রসুল (দ.) যে পদ্ধতিতে জনগণকে সাহায্য করতেন তা থেকে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা বিধি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো :

(১) একবার একজন গরিব লোক হজরতের কাছে এসে বললো– হে আল্লাহর রসুল, আমি খুব গরিব, আমাকে সাহায্য করুন। রসুল (দ.) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কিছুই নাই। লোকটি বললো হুজুর আমার বাড়িতে শুধুমাত্র একখানা কুঠার আছে তারও বাট নেই। হজরত রসুল (দ.) লোকটিকে বললেন যাও কুঠার খানা নিয়ে এসো। লোকটি বাটহীন কুঠার নিয়ে হজরতের (দ.) কাছে হাজির হলো। রসুল (দ.) নিজের হাতে কুঠারের বাট লাগিয়ে দিলেন। তারপর লোকটিকে বললেন, এই নাও, কুঠারটি নিয়ে বনে যাও। বন থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রি করো। আল্লাহ তোমার কাজে বরকত দেবেন। সে পরিশ্রম করে বন থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রী করতে লাগলো। কিছু দিনের মধ্যেই তার অবস্থার উন্নতি হলো।

(২) একদিন এক মরুবাসী মহানবির কাছে এসে বললো– সারাদিন আমি কিছু খাইনি, একটি পয়সাও হাতে নেই। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। আমাকে কিছু পয়সা দিন। হজরত (দ.) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার সঙ্গে কি কি জিনিস আছে? লোকটি বললো, আমার একটা পেয়ালা আছে এতে পানি ঢেলে খাই। একটা বিছানা আছে, তার এক অংশে শুই আরেক অংশ উল্টিয়ে গায়ে দেই। আর কিছু নেই। রসুল (দ.) বললেন ও দুটো জিনিসই আমার কাছে নিয়ে এসো। কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটা একটা পেয়ালা আর একটি বিছানা নিয়ে হজরতের সামনে হাজির হলো। হজরত (দ.) তখন তার সাহাবিদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি দুটো জিনিস কিনতে রাজি আছো : একজন দুই দিরহাম মূল্যে জিনিসগুলো কিনতে রাজি হলো। রসুল (দ.) তাকে দুইটি দিরহাম দিয়ে বললেন, এক দিরহাম দিয়ে কিছু খাবার কিনবে, আর এক দিরহাম দিয়ে একখানা কুঠার কিনবে। তারপর জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে বাজারে নিয়ে বিক্রি করবে। পরবর্তীতে তার আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল বলে জানা যায়।

উল্লেখিত ঘটনা দুটি থেকে বোঝা গেল যে শুধুমাত্র অভাবী, ভিক্ষুক হলেই তাকে জাকাত ফান্ড বা অন্য কোন খাত থেকে টাকা পয়সা দেওয়া হয়নি। বরং রসুল (দ.) নবুওতি জ্ঞান অনুযায়ী এক এক জনের অভাব এক এক পদ্ধতিতে সমাধা করতেন। আবার দেখা যায় যে রসুল (দ.) একই ব্যক্তিকে একই সময় একাধিক বার সম্পদ দান করেছেন।

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা কয়েকজন আনসারি রসুল (দ.) এর নিকট কিছু চাইলে তখন তিনি তাদেরকে কিছু দান করলেন। আবার তারা চাইলে তাদেরকে (আবার) দান করলেন। এতে তার নিকট যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন তিনি রসুল (দ.) বললেন, আমার নিকট যে মাল থাকবে আমি তা

কখনো মজুদ করে রাখবোনা । যে ব্যক্তি সওয়াল (পর মুখাপেক্ষীতা) থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন এবং যে ধৈর্য অবলম্বন করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল করেন ধৈর্যের চাইতে অধিক কল্যাণকর ও প্রশস্ততর দান আর কাউকে দেওয়া হয়নি । (বোখারি) ।

হাকিম ইবনে হাসেম (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসুল (দ.) এর নিকট কিছু চাইলাম । তিনি আমাকে কিছু প্রদান করলেন আবার তার নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আবার প্রদান করলেন, আবার তার নিকট কিছু চাইলাম । তিনি (এবারও) কিছু প্রদান করলেন ও বললেন: হে হাকিম, এ মাল শামাল ও সুমিষ্ট, যে এটা নির্লোভে গ্রহণ করে সে বরকতপ্রাপ্ত হয় । কিন্তু যে, লোভাতুর মনে গ্রহণ করে সে এতে বরকত পায় না এবং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করতে থাকে অথচ পরিতৃপ্ত হয় না । (বোখারি)

ধনী লোককে রসুল (দ.) কর্তৃক অর্থ প্রদান :

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (দ.) আমাকে কিছু প্রদান করলে আমি বলতাম আমার চাইতে যার অভাব বেশি তাকে প্রদান করুন । রসুল (দ.) বললেন, এটা গ্রহণ কর, যখন এ সম্পদ থেকে কিছু তোমার নিকট আসে অথচ তুমি তার জন্য লালায়িত নও এবং প্রার্থীত নও, তখন তুমি তা গ্রহণ করো । আর এরূপ না হলে (অর্থাৎ প্রার্থনা ছাড়া পাওয়া না গেলে) তোমার মনকে তার (মালের) পিছনে ধাবিত করো না । (বোখারি)

অলৌকিক পদ্ধতিতে অভাব পূরণ :

হজরত সালমান ফারসি (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি শামাউন ইহুদির ক্রীত দাস হিসেবে থাকার ঘটনা রসুলকে (দ.) জানালে, রসুল (দ.) এরশাদ করলেন– তুমি তোমার মালিকের নিকট হতে অর্থের বিনিময়ে মুক্তির ব্যবস্থা কর । পরে আমার ইহুদি মালিক প্রথমে আমাকে একশ মিসকল স্বর্ণের পরিবর্তে চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ দিতে হবে দ্বিতীয়ত তিনশ' খেজুরের চারা তার বাগানে লাগিয়ে আমার তত্ত্বাবধানে সাজিয়ে দিতে হবে । দ্বিতীয় শর্তটি আমার নিকট খুব কঠিন মনে হয়েছিল কারণ এখানকার মাটি এত অনুর্বর যে, একশ' খেজুরের চারা লাগালে তার মধ্যে পঁচিশটি টেকানো দায় । যা হোক আমি নবিজির (দ.) দরবারে আরজ করলে তিনি (দ.) সাহাবাগণকে আদেশ করলেন, তোমাদের এ বিপদগ্রস্ত ভাইকে মুক্ত করার জন্য প্রত্যেকে খেজুরের চারা সংগ্রহ করে দাও চারা সংগ্রহ হলে হুজুর (স.) আমাকে বললেন –"তুমি গর্ত করে আমাকে জানাবে, আমি নিজে গিয়ে চারা লাগিয়ে আসব । আমি তাই করলাম । আল্লাহর রসুল (দ.) এর পবিত্র হাতের স্পর্শে তিনশটি চারাই বেঁচে গেল এবং অল্প দিনের মধ্যেই বড় হয়ে উঠল । এবার মুক্তির দ্বিতীয় শর্ত পূরণের পালা । একদিন একজন সাহাবা ডিম্বাকৃতির একটি স্বর্ণপিন্ড এনে নবিজিকে নজরানা দিল । হুজুর (রা.) আমাকে ডেকে স্বর্ণ ডিম্বটি আমার হাতে দিয়ে বললেন এই নাও এবার তোমার মালিকের শর্ত পূরণ করে আজাদি লাভ কর । আমি বললাম ইয়া রসুলুল্লাহ (দ.) এটুকু স্বর্ণ দিয়ে কি হবে : রসুল (দ.) এরশাদ করলেন, এতেই আল্লাহ বরকত দেবেন । হজরত সালমান (রা.) উক্ত স্বর্ণ ডিম্বটি শামাউনের হাতে দিলেন । স্বর্ণ কম হবে মনে করে সে (ইহুদি) বললো এখানে কি চল্লিশ উকিয়া সোনা হবে ? সালমান (রা.) বললেন, একটু ওজন করে দেখুন তো । তখন শামাউন তার কন্যাকে উক্ত স্বর্ণ ওজন করে দেখতে বললে, সে দাড়ি পাল্লা নিয়ে এক পাল্লায় চল্লিশ উকিয়া অন্য পাল্লায় স্বর্ণ ডিম্ব দিয়ে দেখল, স্বর্ণের দিকে পাল্লা নিচের দিকেই ঝুলে যায় । বেশি ওজনের বাটখারা দিয়ে দেখল একই অবস্থা । সর্বশেষ সে চল্লিশের পরিবর্তে একশ উকিয়া পাথর দিলেও দেখতে পায় যে স্বর্ণের পাল্লা নিচের দিকেই ঝুঁকে পড়ে ।" (বোখারি) (মহা সত্যের সন্ধানে হজরত সালমান ফারসি (রা.) –শাহজাহান ইবনে হায়দার) ।

উপরোক্ত ঘটনায় সম্মিলিতভাবে ও অলৌকিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান আমরা দেখতে পাই ।

হুনাইনের যুদ্ধের পর রসুল (দ.) মক্কার সবচেয়ে ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্যতম আবু সুফিয়ান বিন হরবকে চল্লিশ উকিয়া রোপ্য ও একশত উট প্রদান করেন আবু সুফিয়ানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তার দুই পুত্র

ইয়াজিদ ও মাবিয়াকে জন প্রতি চল্লিশ উকিয়া রৌপ্য ও ১০০টি উট দেয়া হয়। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন:

আবু সুফিয়ানসহ অন্যান্য আরব নেতাদের প্রতি এরূপ বদান্যতা প্রদর্শন করায় এবং আনসারগণকে কিছুই না দেয়ায় তারা খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং কেউ কেউ আপত্তিকর কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। এমনকি কেউ কেউ বলেন, রসুল (দ.) তার আপনজনদেরকে খুশি করেছেন এ সময় সাদ ইবনে উবাদা (রা.) রসুল (দ.) এর সাথে দেখা করে বললেন: ইয়া রসুলুল্লাহ আপনি সম্পদ যেভাবে বিলি বণ্টন করলেন তাতে আনসারগণ ভীষণ ক্ষুদ্ধ হয়েছে। আপনি এসব সম্পদ নিজের গোত্র কুরাইশ ও অন্যান্যদের মধ্যে বণ্টন করলেন অথচ আনসারদের কিছুই দিলেন না। রসুল (দ.) বলেন, হে সাদ, তোমার নিজের মনোভাব কি? তিনি বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ আমি আমার গোষ্ঠীরই একজন। তিনি বললেন, তাহলে তোমার আমার গোষ্ঠীকে এখানে হাজির কর। সাদ সকল আনসারদের সেখানে জমায়েত কালেন। হজরত (দ.) বলেন, হে আনসারগণ তোমাদের পক্ষ থেকে কিছু আপত্তির কথা উচ্চারিত হতে শুনেছি এবং আমার ওপর তোমরা ক্ষুদ্ধ হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। ...হে আনসারগণ, দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ি সম্পদের জন্য তোমরা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে। এক শ্রেণির লোককে ইসলাম দরদী করার চেষ্টা করলাম (অর্থাৎ আবু সুফিয়ান, ইয়াজিদ ও মাবিয়া প্রমুখ মৌখিকভাবে কলেমা পাঠ করলেও তাদের অন্তরে প্রকৃত পক্ষে ইসলামের প্রতি কোন মহব্বত ছিল না।) তোমাদের ঈমান ও ইসলামের ওপর তো আমি আগেই আস্থাবান ছিলাম এটা কি তোমাদের পছন্দ হয়নি? হে আনসারগণ তোমরা কি এতে খুশি নও যে লোকেরা উট বকরি (রূপা) নিয়ে চলে যাক আর তোমরা তার বদলে আল্লাহর রসুলকে (দ.) নিয়ে যাও। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, রসুল (দ.) এর অর্থ বিলি বণ্টন পদ্ধতি এতই জটিল সুক্ষ্ম ও সুদূর প্রসারী এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয় ছিল যে রসুল (দ.) এর অনেক কাছের লোকেরাও এই রহস্য বুঝতে সক্ষম হতো না। (সিরাতে ইবনে হিশাম)

অধিক সম্পদ লোভর পরিণতি :

হজরত আবু উবাইদা বাহেলি (রাজি) বর্ণনা করেছেন যে, সালাবাহ হাতেম ইবনে হাতেম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলোর ইয়া রসুলুল্লাহ আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করে দিন, যাতে আমি মালদার-ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে তরিকা পছন্দ নয় ? তুমি কি আল্লাহর নবির আদর্শের ওপর থাকতে আগ্রহী নও ? শুন। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যার আয়ত্তাধীনে আমার জীবন –যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে এ পাহাড় সমূহ সোনা ও রূপায় পরিণত হয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরতো। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দনীয় নয়। লোকটি বললো, যে পবিত্র সত্তা আপনাকে সত্য নবি পাঠিয়েছেন, তার কসম, যদি আপনি দোয়া করেন এবং আল্লাহতা'লা আমাকে ধন-ঐশ্বর্য দান করেন, তবে আমি অবশ্যই প্রত্যেক হকদারকে তার হক ও প্রাপ্য পৌঁছিয়ে দিবো এবং আরও অন্যান্য নেক কাজ করবো। এতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন : "আয় আল্লাহ সালাবাহকে সম্পদ দান কর।" ফলে তার ছাগলভেড়া কীড়ার মতো অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদিনায় তার বসবাসের জায়গাটি সংকীর্ণ হয়ে পড়লে, তখন সে মদিনার বাইরে একটি প্রশস্ত উপত্যকা নিয়ে নেয়। এখানে আসার পর সে কেবল যোহর ও আসর এই দুই ওয়াক্তের নামাজ মদিনায় এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামাতে আদায় করতো এবং (পূর্বের বিপরীত) অন্যান্য নামাজ, যেখানে তার মালামাল ছিল সেখানে পড়ে নিতো।

অতঃপর এ সব ছাগল-ভেড়ার আরও প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটি ও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদিনা শহর থেকে আরও দূরে গিয়ে কোন একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে সে শুধু জুমার নামাজের জন্য মদিনায় আসতো এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামাজগুলো সেখানেই পড়ে নিতো। তারপর এসব মালামাল কীড়ার মত আরও প্রবৃদ্ধি পেয়ে গেল। এখন সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদিনা থেকে বহু দূরে সরে যায়। সেখানে জুমুআ থেকেও তাকে বঞ্চিত হতে হয়। জুমার দিন জুমা পড়ে মদিনা থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে সেখানকার অবস্থা জেনে নিতো।

কিছুদিন পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে তারা বললো যে, তার মালামাল এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না ফলে, বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে। এখন আর তাকে দেখা যায় না। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, "সালাবাহর প্রতি আফসোস" "সালাবাহর প্রতি আফসোস' "সালাবাহর প্রতি আফসোস"। ঘটনাক্রমে সে সময়েই মুসলমানদের থেকে সদকা আদায় করা সংক্রান্ত এই আয়াত নাজিল হয়।

"আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পাক-পবিত্র করে দেন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন : নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য শান্তির কারণ"। (তওবাহ : ১০৩)

আল্লাহতা'লা সদকার যথাযথ আইন নাজিল করলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহাইনা গোত্রের একজন এবং সুলাইম গোত্রের একজনকে মুসলমানদের নিকট থেকে সদকা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং দুজনের নিকটেই সদকার লিখিত ফরমান দিয়ে দিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলে দিলেন– তোমরা সা'বালাহর নিকট যাও। এছাড়া বনি সুলাইমের আরও এক লোকের কাছে যাওয়ার হুকুম করলেন, তাদের কাছ থেকে সদকা ওসুল করার নির্দেশ দিলেন।

তারা উভয়ে যখন সালাবাহর নিকট গিয়ে পৌঁছালেন এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান দেখালেন, তখন সা'লাবাহ বলতে লাগলো, এ তো জিযিয়া কর (অমুসলমানদের জন্য নির্ধারিত কর) হয়ে গেল, এ তো জিজিয়া কর হয়ে গেল, এ তো জিজিয়ার ন্যায়ই আরেকটা। তারপর বললো, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন। অতঃপর তারা সুলাইম গোত্রের লোকটির নিকট গেলেন। লোকটি তাদের কথা এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান শুনলো। তারপর নিজের পশু উট-বকরি সমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল, তা থেকে সদকার নেসাব অনুযায়ী পশু নিয়ে স্বয়ং সে দুই উসুলকারী কাছে হাজির হলেন। তারা পশুগুলো দেখে বললেন, আপনার ওপর এরূপ উৎকৃষ্ট পশু সদকায় দান করা ওয়াজিব নয় এবং আমরাও আপনার কাছ থেকে এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমি লোকটি বারবার বিনয় করে বললেন, আমি নিজের খুশিতে এগুলো দিতে চাই, আপনারা কবুল করে নিন।

অতঃপর এ দুই উসুলকারী আরও অন্যান্য মুসলমানদের সদকা আদায় করে সালাবাবাহর কাছে আসলেন এবং তার কাছে পুনরায় সদকা আদায়ের কথা বললেন তখন সে বললো, দাও দেখি সদকার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তা দেখে সে পূর্বের কথাই বলতে লাগলো, এ তো এক রকম জিযিয়া কর-ই। যা হোক, এখন আপনারা যান, আমি চিন্তা-বিবেচনা করবো।

তারা মদিনায় ফিরে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। তিনি তাদেরকে দেখেই তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই আবার সে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করলেন, যা পূর্বে বলেছিলেন। অর্থাৎ (সা'লাবাহর প্রতি আফসোস) তারপর সুলাইমির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে দোয়া করলেন। অতঃপর তারা দু'জন সা'লাবাহ ও সুলাইমি সম্পর্কিত আচার-আচরণ বিস্তারিত শুনালেন।

তখন সা'লাবাহর সম্পর্কে আয়াত নাজিল হয় :

তাদের মধ্যে কোন লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ যদি তাদের ধন-সম্পদ দান করেন, তবে তারা দান-খয়রাত করবে এবং উম্মতে সৎকর্মশীলদের (সে মতে সমস্ত হদকার, আত্মীয়-স্বজন ও গরিব-মিসকিনদের প্রাপ্য আদায় করবে) অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন তখন কার্পণ্য করতে লাগলো এবং আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য বিমুখ হয়ে গেল। তারপর এরই পরিণতিতে অন্তরে মুনাফেকি স্থান করে নিয়েছে, সেদিন পর্যন্ত– যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লঙ্ঘন করেছিল এবং এ জন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো। (সুরা তওবাহ, আয়াতঃ ৭৫, ৭৬,৭৭)।

এ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন সা'লাবাহর কতিপয় আত্মীয় সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে সা'লবাহর কাছে গিয়ে পৌঁছলো এবং তাকে ভৎসনা করে বললো, তোমার সম্পর্কে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়ে গেছে। এ কথা

শুনে সালাহ উদ্বিগ্ন হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে আবেদন করলো, হুজুর আমার সদকা কবুল করুন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহতা'লা আমাকে তোমার সদকা কবুল করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে সে নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম; তুমি তা মান্য কর নাই। এখন আর তোমার সদকা কবুল হতে পারে না। তখন সা'লাবাহর অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত হয়ে যায়। অতঃপর হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজি) খলিফা হলে সা'লাবাহ তার খেদমতে হাজির হয়ে সদকা কবুল করার আবেদন জানালো। সিদ্দিকে আকবর (রাজি) উত্তর দিলেন, যে ক্ষেত্রে স্বয়ং রসুলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবুল করেন নাই তা আমি কেমন করে কবুল করবো।

হজরত আবুবকর (রাজি) - এর ওফাতের পর সা'লাবাহ হজরত ওমর ফারুক (রাজি) এর খেদমতে হাজির হয়ে আবেদন জানালো। তিনিও সেই একই উত্তর দিলেন, যা হজরত আবুবকর (রাজি) দিয়েছিলেন। এরপর হজরত উসমান (রাজি) -এর খেলাফত আমলেও সে নিবেদন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। অবশ্য অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে হজরত ওসমান (রা.) কিয়াস করে এই অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। হজরত উসমান (রাজি) -এর খেলাফত কালেই সা'লাবাহর মৃত্যু হয়।

সপ্তম অধ্যায়

রসুল (দ.) এর ওফাত পরবর্তী অবস্থা

ধন-সম্পদ বা জীবিকা বা রিজক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'লা তাঁর বান্দাদের নিকট পার্থিব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৌঁছিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসুল হিসেবে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালনের বেলায় নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে হজরত মুহম্মদ (দ.) বলেছেন, "আমি তো খাজাঞ্চি মাত্র। যেখানে আদেশ করেন সেখানেই রাখিয়া দিই।" কিন্তু রসুল (দ.) এর পর ধন সম্পদ বণ্টনে এই কনসেপ্টের অবসান ঘটে।

রাষ্ট্র কর্তৃক বৃত্তি প্রদানে অসংগতি :

হজরত আবুবকর (রা.) মানবিয় বুদ্ধিবৃত্তি (খোদায়ি নির্দেশের আলোকে নয়) অনুযায়ী সমাজের ধন-সম্পদের বণ্টন সমস্যা সমাধানের জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। এই প্রক্রিয়ায় "রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যয় মিটিয়ে যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকত, তা তিনি সঞ্চয় করে রাখতেন না। তিনি ভাবলেন, এ অর্থের প্রকৃত হকদার রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ। তাই তিনি সেই অর্থ দ্বারা নর নারী, শিশু ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রজাকে একটি বাৎসরিক ভাতা দিতে মনস্থ করলেন। এই বিভাগের মধ্যে কোন তারতম্য ছিল না। সবাইকে সমান অংশ দেয়া হয়েছিল। প্রথম বৎসর প্রত্যেকের ভাগে পড়েছিল দশ দিরহাম। পরবর্তী বৎসর বিশ দিরহাম।" (হজরত আবুবকর (রা.), গোলাম মোস্তফা পৃঃ ১৩১)।

আমরা পূর্বেই দেখেছি পবিত্র কোরআনের নির্দেশ ও রসুল (দ.) এর ধন-সম্পদ বণ্টন পদ্ধতির সাথে এই পদ্ধতি কোনক্রমেই সংগতিপূর্ণ নয়। ফলে এই অর্থ ব্যবস্থা চালু করার প্রেক্ষিতে সমাজে অর্থ বণ্টন প্রক্রিয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর (রা.) এই অর্থ ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও চালু করেছিলেন বিধায় এই ধরনের বণ্টন পদ্ধতিকে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত অথবা রসুল (দ.) এর নির্দেশিত অর্থ ব্যবস্থা হিসেবে প্রচার করা হয়। বর্তমানে কিছু সংখ্যক লোক তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সাথে এই ব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন।

হজরত আবুবকর (রা.) ৬৩৪ইং সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ওফাতের পর হজরত ওমর (রা.) এই অর্থ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটান। হজরত ওমর (রা.) বলতেন: "যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহর (দ.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাকে আমি রসুলুল্লাহ (দ.) এর পক্ষে যুদ্ধকারীর সমমর্যাদা দিতে পারি না।" ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর 'কিতাবুল খারাজে' লিখেছেন: "হজরত ওমর (রা.) বলেছেন, খোদার শপথ এই বাইতুল মালের ধন সম্পদে প্রত্যেক নাগরিকেরই অধিকার আছে। এতে কারুর অধিকার অপরের চেয়ে বেশি নয়। এ ধরনের ব্যাপারে আমিও তোমাদের মত একজন। তবে আমাদের মর্যাদার তারতম্য আল্লাহর কিতাবের আলোকে এবং রসুল (দ.) এর সাহচর্যের অনুপাতে নির্ধারিত হবে। ইসলামের জন্য কে কি পরিমাণ দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং কে কত আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে তা বিবেচনা করতে হবে। মুসলমান অবস্থায় স্বচ্ছলতা অথবা দারিদ্রের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া হবে। খোদার শপথ! যদি আমি বেঁচে থাকি তবে সানার (ইয়েমেন) পাহাড়ে মেষ চারণকারী রাখালও বিনা পরিশ্রমে নিজের জায়গায় বসেই এই ধন-সম্পদ থেকে তার প্রাপ্য লাভ করতে পারবে।

তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম, ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের এবং হাবসায় হিজরতকারীদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক চার হাজার দিরহাম এবং বদর যোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে মাথা প্রতি দুই হাজার দিরহাম বৃত্তি নির্ধারণ করেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরতকারীদের প্রত্যেকের জন্য তিনি বার্ষিক তিন হাজার দিরহাম এবং মক্কা বিজয়ের পর ঈমান আনয়নকারীদের জন্য মাথাপিছু দুই হাজার দিরহাম এবং আনসার ও মোহাজেরদের তরুণ পুত্রদের জন্যও অনুরূপ হারে বৃত্তি নির্ধারণ করেন। হজরত হাসান (আ.) ও হজরত হোসাইন (আ.) এর জন্য বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম বৃত্তি নির্ধারিত করেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণে তিনি তাদের সামাজিক মর্যাদা কোরআনের জ্ঞান এবং ইসলামের পথে জেহাদকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট সবাইকে

তিনি এক সারিতে রাখেন। আবার কোন কোন ব্যক্তির বৃত্তি নির্ধারণের ব্যাপারে এই নিয়ম অনুসরণও তিনি প্রয়োজন মনে করতেন না। এইসব ব্যক্তিকে তিনি তার সমপর্যায়ের অন্যান্য লোকের চাইতে অধিক বৃত্তি দেন। ওমর ইবনে আবি সলেমার জন্য তিনি চারহাজার দিরহাম ধার্য করেন। ইনি হলেন উম্মুল মুমেনিন উম্মে সালমার পুত্র। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রা.) এতে আপত্তি জ্ঞাপন করে আমিরুল মুমেনিনকে বলেন, আপনি ওমরকে কিসের ভিত্তিতে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছেন ? তার পিতার মত আমাদের পিতারাও তো হিজরত এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হজরত ওমর (রা.) তাকে জবাব দেন, "আমি তাকে রসুলুল্লাহ (দ.) এর নিকট তার যে মর্যাদা ছিল তার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিচ্ছি।" যে ব্যক্তি এব্যাপারে আমার নিকট আপত্তি উত্থাপন করেছে সে উম্মে সালমার মত মা নিয়ে আসুক। আমি তার কথা মেনে নিব। তিনি উসামা ইবনে জায়েদের (রা.) জন্য চারহাজার দিরহাম ধার্য করেন। এতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আপনি আমার জন্য তিন হাজার ধার্য করলেন। আর ওসামার জন্য চার হাজার ধার্য করলেন। অথচ আমি এমন বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, যাতে উসামা অংশগ্রহণ করেননি। হজরত ওমর (রা.) তাঁকে জবাব দিলেন, আমি তাঁকে এই জন্য বেশি দিয়েছি যে, সে রসুলুল্লাহ (দ.) এর নিকট তোমার চেয়ে সে বেশি প্রিয় ছিল। তার পিতাও রসুল (দ.) এর নিকট তোমার পিতার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন। তিনি হজরত আবুবকরের (রা.) স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইসের জন্য এক হাজার দিরহাম, উম্মে কুলসুম বিনতে উকবার জন্য এক হাজার দিরহাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মায়ের জন্য এক হাজার দিরহাম ধার্য করেন। এইসব মহিলাকে তিনি তাদেরই সমপর্যায়ের অন্যান্য মহিলার চেয়ে বেশি ভাতা দেন কেননা তারা সে সব পুরুষের স্ত্রী কিংবা মা ছিলেন, তাদের অন্যান্য পুরুষের ওপর অগ্রাধিকার ছিল। হজরত আয়েশা (রা.) এর জন্য সর্বোচ্চ বার হাজার দিরহাম ধার্য হলো। (আল ফারুক ওমর, আল্লামা শিবলী নোমানি, পৃ-২৩০, ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি, সাইয়েদ কুতুব, পৃ. ৯৫) যে লোক যে পরিমাণ অভাবে আছে, তাকে সেই অনুযায়ী তো নয়ই এমনকি সকলকে সমান অংশেও না দিয়ে রাষ্ট্র কেন্দ্র হতে এমন আর্থিক অসাম্য সৃষ্টি করা হলো যার কোন উদাহরণ বা ইংগিত পবিত্র কোরআনে বা রসুল (দ.) জীবিত থাকাকালীন কোন ঘটনাতেই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। হজরত আয়েশা (রা.) কে সবচেয়ে বেশি অর্থ দেয়ায় বিষয়টি অধিকতর জটিল আকার ধারণ করলো। প্রকাশ থাকে যে রসুল (দ.) এর মুহাব্বতই যদি বাস্তবিকপক্ষে ভাতা নির্ধারনের মাপকাঠি বিবেচনা করা হতো তাহলে হজরত আলী (আ.), হজরত ফাতেমা (আ.) ও তাদের দুই পুত্রই সর্বোচ্চ বৃত্তি পাওয়ার অধিকারী হতেন, কারণ এটা সর্বজন বিদিত যে হজরত মুহাম্মদ (দ.) এর প্রিয় পাত্র বলতে এঁদেরকেই বোঝায়। অর্থাৎ বৃত্তি নির্ধারনের ওমর (রা.) কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি অর্থাৎ রসুল (দ.) এর প্রিয় পাত্র প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় নীতিতে অনুসরণ করা হয় নাই। এক্ষেত্রে রসুল (দ.) এর মহব্বতের উল্লেখের মাধ্যমে সমাজে কতিপয় লোককে বিত্তবান করে বাকি সবাইকে অভাবের দিকে ঠেলে দেয়া হতে লাগল, অভাবে পড়ে লোকে বিত্তবানের কাছেই প্রার্থী হয়ে থাকল। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য 'প্রজ্ঞা নগরীর' তোরনের কাছে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। তাছাড়া লোকেরা রাষ্ট্রকে আদর্শ ও কল্যাণমূলক কোন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করতে পারলো না বরং রাষ্ট্র যন্ত্রকে একটি অদ্ভুত ও বিসদৃশ অর্থনৈতিক মতবাদের বাস্তবায়নকারী হিসেবে দেখতে পায়। ফলশ্রুতিতে তারা আল্লাহ বা তাঁর রসুলের (দ.) প্রতিনিধির সাহায্য প্রার্থী না হয়ে বরং নিজেদের অভাব অভিযোগ মিটানোর জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট এই ধনিক শ্রেণির শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি সাধারণ লোকের শ্রদ্ধার বদলে ভয়ের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য হজরত ওমর (রা.) পরবর্তীতে নিজেই তার ভুল বুঝতে পেরে বলেছিলেন "যে সব সিদ্ধান্ত আমি ইতোপূর্বে গ্রহণ করেছি তা পুনরায় করার সুযোগ পেলে ধনিকদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিতাম।" কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি।

নব বিধান প্রবর্তন :

এই অভিনব অর্থনৈতিক প্রশাসনিক বিধি ব্যবস্থার জন্য সম্ভবত হজরত ওমর (রা.) এর শাসনের শেষের দিকে ৬৩৯ সালে সারা আরব দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং উক্ত সময় চুরির শাস্তি হিসেবে খোদায়ি বিধান হাত কাটার শাস্তি স্থগিত রাখা হয়। অর্থাৎ খোদায়ি বিধানও স্থগিত রাখার অধিকারী হিসেবে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রাধান্য চালু করা হয়। প্রসঙ্গত: স্মরণ করা যেতে পারে যে আবুবকর (রা.) এর আমলে তিনি জাকাতের বিধান স্থগিত/বাতিল করার সুপারিশ করেছিলেন।

কোরআনের আদেশ লঙ্ঘন করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারকেই অর্থ জমাননার হাতিয়ারে পরিণত করার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ১৫ হিজরিতে আবু হোরায়রা (রা.), ওমর (রা.) কর্তৃক বাহরায়েনের শাসক নিযুক্ত হন। আবু হোরায়রাহ সাল তামামিতে পাঁচ লক্ষ দিরহাম মদিনায় প্রেরণ করেন। এই বিপুল অর্থ দিয়ে কি করা যায় মজলিসে শুরায় তার আলোচনা হয়। আলী (আ.) বলেন, সারা বছরে যা কিছু অর্থ পাওয়া যায়, সবই বিলিয়ে দেয়া উচিত। জমা রাখার প্রয়োজন নেই। ওসামা (রা.) এ মতের বিরোধিতা করেন এবং অলিদ বিন হিশাম বলেন যে, তিনি শাসকদের সিরিয়ার খাজাঞ্চিখানা ও হিসেব দফতর দেখেছেন। এ প্রস্তাব ওমর (রা.) এর পছন্দ হলে তিনি মদিনায় একটি কেন্দ্রীয় কোষাগার স্থাপন করেন। হজরত আবু জর গিফারী (রা.) কোরআন বিরোধি সঞ্চয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির ব্যাখ্যাই সর্বজনমান্য বিধানে পরিগণিত হয়।

ওমর (রা.) কর্তৃক নয়া অর্থনৈতিক বিধান চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ মহা ধনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত - নবি (স.) বলেছেনঃ মুসলমানের ওপর তার ঘোড়া ও দাসের কোন জাকাত নাই। (বোখারি)

হজরত ওমর (রা.) ঘোড়ার ওপর জাকাত ধার্য করেন ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয় বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, ইহা সম্পূর্ণ নব বিধান/বেদাত হিসেবে বিবেচিত ছিল এবং সর্বজনস্বীকৃত কোন অর্থনৈতিক বিধান হিসেবে প্রচলন করা হয়নি। কারণ হজরত আলী (আ.) এর আমলে ঘোড়ার ওপর জাকাতের বিধান প্রত্যাহার করা হয়।

রসুল (দ.) এর মানবত্ব ও নবুওত বিষয়ক জটিলতা :

হজরত মুহম্মদ (দ.) এর মানবত্ব ও নবুওত্ব বিষয়টি একটি জটিল বিষয়ে পরিণত করে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ এক মহা ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছে। অথচ যারা ইসলাম গ্রহণ করেন ও মুসলিম উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, তাঁদের জন্য রসুল (স.) তখন আর কেবল বার্তাবাহক থাকেন না বরং রসুল তখন মানুষ হিসেবে তাদের জন্য একাধারে শিক্ষক, প্রশিক্ষক গুরু এবং ইসলামি জীবন পদ্ধতির নমুনারূপে পরিগণিত হন। সর্বোপরি তিনি তাদের জন্য তখন এক মহান নেতার মর্যাদা লাভ করেন যার নিরঙ্কুশ আনুগত্য সকল যুগেই হওয়া বাঞ্চনীয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "তিনি 'রসুল (দ.)' কোন মনগড়া কথা বলেন না। যা কিছু তিনি বলেন তা তাঁর কাছে ওহির মাধ্যমেই আসে"। অর্থাৎ রসুল (দ.) এর কথা ও নিজস্ব চিন্তাধারার কোন অবকাশ নেই। এ কারণেই তাকে এমন কোন নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান মনে করার কোন অবকাশ নেই যার কথা ও কাজে কোনরূপ মতানৈক্য বা বিতর্ক বা অন্যকোন ব্যক্তির নিজস্ব বুদ্ধি বা সৃজনশীল প্রতিভা অনুযায়ী রসুল (দ.) এর কথা ও কাজের ব্যাপারে ভিন্ন মতামত পেশ করার কোন অধিকার ও বৈধ ক্ষমতা কাউকে প্রদান করা হয় নাই।

হজরত রসুল (দ.) যে কুপ্রবৃত্তি তথা ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন এবং নিজের খেয়াল খুশি দ্বারা চালিত হতেন না একথাও পবিত্র কোরআনের সুরা নজমের কয়টি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, "তোমাদের সাথী (রসুল (দ.)) খারাপ পথেও চালিত হননি। পথভ্রষ্টও হননি। তিনি কোন কথাই নিজের খেয়াল খুশিমত বলেন না। প্রকৃতপক্ষে রসুল (দ.) যখন যে অবস্থায় যা কিছুই করতেন তা' রসুল হিসেবেই করতেন। তাঁর সব কিছুই গোমরাহী ও প্রবৃত্তির লালসা থেকে মুক্ত ছিল। আল্লাহতা'লা তাঁকে যে নিখুঁত, নির্ভুল, সত্যাশ্রয়ী বিবেক ও সঠিক স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন তা ছিল খোদাভীতি ও পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক। তাই তা' থেকে যা কিছু উৎসারিত হতো তা ইসলামের অভ্রান্ত মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত। এ কারণে কেহ যেন তাঁর রসুলত্ব ও মানবত্ব আলাদা হিসেবে কল্পনা করে কোন ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে মহা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তার মহান ব্যক্তিত্ব যে অনন্য সাধারণ তা পবিত্র কোরআনে আল্লাহর তরফ থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে। হজরত রসুল (দ.) এর সাথে বাদানুবাদ করার অধিকার কোন মুসলমানকে দেয়া হয়নি। তাঁর সামনে উচ্চ স্বরে কথা পর্যন্ত বলা নিষিদ্ধ ছিল; শুধু উচ্চ স্বরে বা বেয়াদবির ভাবভঙ্গী প্রকাশ পায় এমনভাবে কথা বললেন সারা জীবনের সমস্ত নেক আমল নষ্ট হয়ে যাবে

বলে সুরা হুজুরাতে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার সাথে বাদানুবাদ করলে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে বলে সুরা নিসায় সতর্ক করা হয়েছে।

রসুলের মানবত্ব ও রসুলত্ব আলাদা আলাদা বিষয় পবিত্র কোরআনে এ ধরনের কোন বক্তব্য আভাসে ইংগিতেও দেয়া হয়নি। বরং বলা হয়েছে– “আল্লাহ ও রসুলকে যারা পার্থক্য করে অথবা অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে তাহলে তারা কাফের।” আরও উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসুল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর কোন মুমিন নারী-পুরুষের নিজেদের ব্যাপারে নতুন করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আর থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের নাফরমানি করে সে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে যাবে । (আহজাব)

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে হজরত মুহম্মদ (দ.) এর নবি জীবন ও ব্যক্তি জীবনে পার্থক্য করার কোন অধিকার শরিয়ত অনুসারে আমাদের নেই; আর কার্যত সে পার্থক্য করা সম্ভবও নয়। নবি জীবনের এ দু’ভাগের সীমানা আমরা নিজেরা নির্ধারণ করতে পারি না। অর্থাৎ আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না যে অমুক অমুক বিষয় নবির নবি জীবনের আওতাধীন আর অমুক অমুক বিষয় তাঁর ব্যক্তি জীবনের আওতাধীন। এজন্য একটিকে মেনে নেয়া জরুরি ও অপরটিকে মেনে নেয়া ঐচ্ছিক হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য এই যে রসুল (দ.) জীবিত থাকাকালীনই কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তাঁর নবি সত্তা ও মানব সত্তাকে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালিয়েছেন এবং নবি হিসেবে তাঁর কাজকে অবশ্য পালনীয় হিসেবে গণ্য করার কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে মানুষ হিসেবে তার কাজ পালন করা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ইচ্ছা অথবা সুবিধা-অসুবিধার অধীন হিসেবে গণ্য করেছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর কাজকে সমালোচনা করেছেন অথবা তিনি যেন তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে না পারেন সে ব্যাপারেও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন। পবিত্র হাদিস গ্রন্থসমূহ ও ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় হজরত ওমরই (রা.) এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

ষষ্ঠ হিজরিতে রসুল (দ.) ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের প্রাক্কালে নির্দেশ দিলেন, তোমরা কেবল ভ্রমনকালে তরবারি ভিন্ন আর কোন অস্ত্রাদি সঙ্গে লইওনা। হজরত ওমর (রা.) যুদ্ধের উপযুক্ত অস্ত্রাদি সঙ্গে নিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু রসুল (দ.) তা লইতে দেননি। যিনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমা বলবেন তিনিই জান্নাতে দাখিল হবেন। এই হাদিস ওহি মারফত পেয়ে হজরত আবু জর গিফারিকে (রা.) দিয়ে ইহা প্রচার করার উদ্দেশ্যে পাঠালে হজরত ওমর (রা.) তাকে প্রহার করেন। এই হাদিস প্রচার করা হলে জনসাধারণ নামাজ রোজা ছেড়ে দিবে, তাই তিনি ইহা প্রচারে বাধা দিলেন (বোখারি)। আলোচ্য ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে রসুল (দ.) এই হাদিস প্রচার হওয়ার গুরুত্ব সম্যক উপলদ্ধি করতে পারেননি (নাউজুবিল্লাহ)। আর ওমর (রা.) ইসলামের প্রতি দরদের জন্য রসুল (দ.) এর নির্দেশ পালনের কারণে একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে প্রহার করেন। অথচ দূর্ভাগ্যবশতঃ কিছু সংখ্যক অজ্ঞলোক এই ঘটনায়ও হজরত ওমর (রা.) এর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার ও ধর্মীয় জ্ঞানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়েন। অথচ স্বাভাবিক ভদ্রতা ও আদবের দৃষ্টিতে বিষয়টি তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, এটা একটি মারাত্মক অবমাননাকর বিষয়। হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় ওমর (রা.) রসুল (দ.) এর সাথে যে ব্যবহার করেছিলেন তা’ সকল ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেজন্য হজরত ওমর (রা.) বড় অনুতপ্ত হয়েছিলেন। (নজির আহম্মদ চৌধুরী প্রণীত হজরত ওমর ফারুক, পৃ. ২৪)।

হজরত ওমর (রা.) রসুল (দ.) এর সামনে হজরত মুসা (আ.) এর প্রশংসা করছিলেন। তখন রসুল (দ.) এর চেহারা মোবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। তিনি ফরমাইলেন, “যদি মুসা (আ.) বর্তমান সময়ে জীবিত থাকতেন তবে আমার দ্বীন গ্রহণ করতেন।” (বোখারি)

এই হাদিস সমূহ পর্যালোচনা করে বোঝা যায় তখন পর্যন্ত হজরত ওমর (রা.) ইসলাম ধর্মের প্রকৃত গৌরব ও মর্যাদা এবং অন্যান্য নবির তুলনায় হজরত রসুল (দ.) শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না। অনুরূপভাবে একদিন হজরত (দ.) মসজিদে নামাজের পর মিম্বরে উপবেশন করে সকলকে আহ্বান করে বললেন, “যদি তোমাদের মধ্যে হে স্বীয় দোষ জানিতে পার, তাহা হলে তা আমার নিকট বল আমি তার

ক্ষমার জন্য খোদার নিকট প্রার্থনা করি।" ইহা শুনে এক ব্যক্তি যিনি এতদিন নিজকে ভক্ত ও ধর্মপরায়ণ মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে আসছিলেন, দাঁড়িয়ে নিজকে প্রতারক ও দুর্বল মুসলমান হিসেবে স্বীকার করলেন। তখন হজরত ওমর (রা.) চিৎকার করে বললেন, খোদাতালা যা গুপ্ত রাখেন, আপনি কেন তা প্রকাশ করছেন ? এই প্রেক্ষিতে তিনি (রসুল (দ.)) ওমর (রা.) কে তিরস্কার করে বললেন, হে ওমর ! পরজগতে কষ্ট সহ্য করা অপেক্ষা ইহজগতে তা দূর করার চেষ্টা করা শ্রেয়। ইহা বলে তিনি (রসুল (দ.) ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মোনাজাত করে বললেন, "হে দয়াময় খোদা, তাকে (ওমর (রা.) কে) অকপট ও ধর্মপরায়ণ কর এবং যাকে হিতাহিত জ্ঞান বলে তা তার অন্তরে সমর্পন কর। আর তার অন্তর হতে মানসিক দুর্বলতা হরন কর।" (শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, পৃ. ৩৭২)।

ধর্মীয় বনাম রাষ্ট্রীয় অনুশাসন :

রসুল (দ.) ওফাতের ৩/৪ দিন পূর্বে তাঁর ঘরে উপস্থিত লোকদিগকে বললেন, লেখার সরঞ্জামাদি নিয়ে আস, আমি এমন কিছু লিখে যাব যাতে তোমরা বিপথগামী হতে না পার। ওমর (রা.) তখন লোকদিগকে বললেন যে, লোকটি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে (নাউজুবিল্লাহ)। তোমাদের তো কোরআনই আছে, আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। রসুলুল্লাহ (দ.) এর বিবিগণের কেউ পর্দার অন্তরাল হতে বললেন, রসুল (দ.) যা বলছেন, তা কি তোমরা শুনছ না। তখন ওমর (রা.) বললেন, তোমরা ইউসুফের (আ.) সাহাবিদের মত যখন রসুল (দ.) অসুস্থ হন তখন কাঁদো, আর যখন সুস্থ হন, তখন তাঁকে বিরক্ত কর। তখন রসুল (দ.) ওমর (রা.) কে বললেন, তাদেরকে ছাড়! তারা তোমাদের চাইতে উত্তম। লোকেরা তাদের ভিতরের মতভেদের জন্য একে অপরকে গালি-গালাজ করতে লাগল। শুনে রসুল (দ.) বললেন, এখান হতে তোমরা চলে যাও, আমার সম্মুখে তোমাদের ঝগড়া করা শোভনীয় নয় (বোখারি ও মুসলিম)। লেখার সরঞ্জামাদি আনতে দেয়া হল না।

এক সময় হজরত ওমর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, ঘটনা সত্যিই যে মৃত্যুরোগের সময় রসুল (দ.) জনসমক্ষে আলী (আ.) কে খলিফা হিসেবে উল্লেখ করে যেতে চেয়েছিলেন। আমিই তা করতে দেইনি। তা আমি সম্পূর্ণ ইসলামের প্রতি দরদের বশেই দেইনি। কারণ আল্লাহর কসম, কুরাইশগণ আলী (আ.) কে খলিফা করবার ব্যাপারে কিছুতেই রাজি হতো না। আর যদি লোকে (রসুল দঃ) আলীকে খলিফা কতেনই তাহলে সমগ্র আরব তাকে আক্রমণ করত। কাজেই রসুলুল্লাহ তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পারলেন যে, তার মনে যা ছিল, তা আমি ঠিকই ধরতে পেরেছি, তখন তিনি চুপ রইলেন। অন্য সময় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সঙ্গে আলাপে হজরত ওমর বলেছিলেন, "তোমাদের আহলে বায়াত হতে লোকেরা কি ছিনিয়ে নিয়েছিল তা কি তুমি জান, ইবনে আব্বাস ? ইবনে আব্বাস বললেন না। ওমর (রা.) বললেন, "নবুয়ত ও খেলাফত উভয় গৌরব তোমরা (হাশেমিরা) পেয়ে যাও আর তাদের বিনিময়ে তোমরা গৌরবান্বিত হও কুরায়েশরা তা পছন্দ করে নাই। সেইভাবে তারা তাদের সুবিধাটাকে বেছে নিয়েছিল এবং একজন অ হাশিমিকে খলিফা করে নিয়েছিল। তাতে তারা অবশ্য ঠিক কাজটি করেছিল। (শরাহনাহজুল বালাগা. ইবনে আবিল হাদিস তিসরা বালাম। পৃ. ১০। (ইতিহাসগত বিভ্রান্তির রহস্য-মুফাখখারুল ইসলাম পৃ. ১৩০-১৩১

প্রসঙ্গত বলা যায় যে খলিফা নিয়োগের সময়মাত্র ৩ জন কোরায়েশ উপস্থিত ছিলেন। অন্য একবারের কথা। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন : শ্যাম দেশে (সিরিয়ায়) সফরে আমি উমরের সঙ্গী ছিলাম। একদিন যখন তার উটে তিনি একা ছিলেন তখন আমি তার নিকটস্থ হয়েছিলাম; তিনি বললেন, হে ইবনে আব্বাস ! তোমার চাচাতো ভাই (আলী আ.) এর বিষয়ে আমি তোমার কাছে নালিশ জানাই। আমি তাঁকে সিরিয়া যাওয়ার সময় আমার সঙ্গী করতে চাইলাম। কিন্তু সে আসল না। আমার মনে হচ্ছে, সে এখনো আমার প্রতি গোস্বা পোষণ করছে। তুমি কি জান আমার প্রতি তার এই গোস্বার কি কারণ ? আমি বললাম না আমিরুল মুমিনন। আমি জানিনা। আমি মনে করি যে খেলাফত প্রাপ্তির বিষয়ে সে এখনো আমার প্রতি বেজার। আমি বললাম হ্যাঁ ঠিকই। তিনি বলেন তিনি যাতে খলিফা হন রসুল (দ.) তাই চেয়েছিলেন। ওমর বললেন, হ্যাঁ রসুলুল্লাহ যা চেয়েছিলেন তা যদি আল্লাহ চেয়ে থাকেন, তাহা হলে ত কিছু করবার নাই। রসুলুল্লাহ (স.) চেয়েছিলেন যাতে আলী (আ.) খলিফা হন। তবে আল্লাহর ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়েছিল, রসুলুল্লাহ (দ.) এর ইচ্ছা নয়।

রসুল (দ.) যা চেয়েছিলেন তার সবই কি কার্যে পরিণত হয়েছে ? তিনি চেয়েছিলেন যেন তাঁর চাচা আবু লাহাব মুসলমান হয়; কিন্তু আল্লাহ তা চাননি, বলে তিনি মুশরিক থেকে গিয়েছেন। (প্রাগুপ্ত)

উল্লেখিত ঘটনাবলীতে প্রমাণিত হয় যে, হজরত ওমর (রা.), রসুল (দ.) এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রতিপালন বা অনুসরণ করেননি বা করার ব্যাপারে বাধা প্রদান করেছেন এবং এধরনের নির্দেশ পালন না করার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছে (নাউজিবিল্লাহ) বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন এবং যারা এ ধারণা পোষণ করতনা, তাদের চিন্তাধারা ভুল বা অন্যায় অথবা অপ্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য করতেন। এই ধরনের মন মানসিকতা সম্পন্ন হজরত ওমর (রা.) ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে নিজে ক্ষমতার শীর্ষস্থানে পৌঁছেন এবং এ মতাদর্শ চালু করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যেহেতু তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাই তার পছন্দনীয় নয় এমন কোন মতবাদ বা কর্মপন্থা মুসলিম সমাজে কিছুতেই গ্রহযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কোন সযোগ ছিল না। হজরত ওমর (রা.) কর্তৃক জারিকৃত কয়েকটি বিধি বিধান সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। রসুল (দ.) এর নির্দেশাবলী যেগুলো অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পর্কিত সেগুলো অবশ্য পালনীয় পক্ষান্তরে সমাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক নির্দেশাবলী যা সাধারণ বুদ্ধি অনুযায়ী পালন করা কঠিন বা আয়াসসাধ্য বা ক্ষতিকর সেগুলো কোন একটি যুক্তি প্রদর্শন করে পালন না করা রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় ধর্ম বলতে আচার অনুষ্ঠান, নামাজ, রোজা, হজের রীতি পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি কর্মকান্ড ধর্মীয় অনুশাসন থেকে পৃথক হয়ে রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু প্রথমটি প্রত্যক্ষভাবে ঐশি জ্ঞান নির্ভর বিবেচনা করে এসকল বিষয়াদি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা হয়। তাই ইসলামও এক প্রকার ধর্ম নিরপেক্ষ সামাজিক প্রতিষ্ঠান (SECULAR SOCIAL SYSTEM) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে এই কনসেস্ট উমাইয়া ও আব্বাসী ও পরবর্তী মুসলমান শাসকদের আমলে প্রভাবে দেখা দেয়। এমনকি বর্তমান সময় পর্যন্তই শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে নামাজ, রোজাদার ব্যক্তিকেই ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে মনে করা হয়। যদিও সেই ব্যক্তি মানবিয় বিচারে (সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে আল্লাহ বা তার রসুলের বিধানের অনুসরণের কোন গুরুত্বই প্রদান করেন না।) একজন জঘন্য চরিত্রের অধিকারী হতে পারে।

রসুল (দ.) এর জীবিতকালে সমস্ত সাহাবাগণ (রা.) তাঁকে সম্বোধন করে বলতেন, “ইয়া রসুলুল্লাহ (দ.) আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর উৎসর্গ (কোরবান) হোক।” এই সম্বোধনের মাধ্যমেই এটা সর্বজনবিদিত ছিল যে রসুল (দ.) এর সাহাবা (রা.) বা অনুসারীগণ। প্রকৃতপক্ষে তার অধীনস্থ প্রজা-গোলাম বা অনুরূপ। অর্থাৎ রসুল (দ.) ছিলেন সবারই মওলা বা প্রভু এবং এ ব্যাপারে কোনপ্রকার মতদ্বৈততা বা বিতর্কের অবকাশ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্ম নেতারাই তাদের অনুসারীদের কাছে একই ধরনের কর্তৃত্বের অধিকারী হতেন। তাই পৃথিবীর সকল ধর্মেই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সম্বোধনই প্রভু বা লর্ড, পতি, মনিব, মালিক ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এব্যাপারে কোন প্রকার ব্যত্যয় ইতিহাসে কেহ দেখাতে পারবে না। আবার পেশাগতভাবে প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, সচিব প্রভৃতি সম্বোধনে ডাকা হয়ে থাকে। এতে করে সামাজিক কৃঙ্খলা ও ভদ্রতাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। এতে করে সমাজের বিরাট কোন ক্ষতি হয় বলে কেহ মনে করেন না। কারণ পৃথিবীর সকল দেশে সকল সময়েই এ ধরনের সম্বোধনের প্রচলন থাকতে দেখা যায়।

হজরত ওমর (রা.) তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত “আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক” –এই সম্বোধন অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তাই ইহা ব্যবহার না করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন (আল ফারুক, শিবলী নোমানি)। কিন্তু রসুল (দ.) কর্তৃক অনুমোদিত এই সম্বোধনই রসুলের (দ.) এর সাথে তাঁর অনুসারীদের প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয়ে কোনরূপ দ্বিধা দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ থাকত না। কিন্তু ওমর (রা.) এই সম্বোধন সম্পর্কে ঘৃনা প্রকাশ করায় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তা বাতিল করায় বর্তমান সময় পর্যন্ত রসুল (দ.) এর সাথে তাঁর উম্মতের প্রকৃত সম্পর্ক অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে মুসলমান উম্মর মধ্যে এক মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

রসুল (দ.) এর সাথে স্মৃতি বিজড়িত জায়গাসমূহ লোকে বরকত হাসিল করতে পারে মর্মে কোরআনে ও হাদিসে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও হজরত ওমর (রা.) এসব জায়গার কোন বিশেষ মর্যাদা আছে বলে মনে করতেন

না। বরং এ সকল জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করার জন্য তিনি এবার রসুলুল্লাহ (দ.) যে গাছটির নিচে দাঁড়িয়ে সাহাবি (রা.)দের নিকট হতে জেহাদের শপথ গ্রহণ করেছিলেন সেই গাছটি কেটে ফেলেন। (আল ফারুক, শিবলী নোমানি)। রসুল (দ.) যে মসজিদে নামাজ পড়তেন এ ধরনের মসজিদের ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহ বা শ্রদ্ধা দেখানোও তিনি পছন্দ করতেন না।

রসুল (দ.) এর আকার-আকৃতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় হাদিস সমূহ বর্ণনা করা হজরত ওমর (রা.) নিরুৎসাহিত করেন। কারণ এগুলোর সাথে নাকি শরিয়তের কোন সম্পর্ক নাই অথচ রসুল (দ.) এর চেহারা মোবারকের চিন্তা করাও ইবাদত। তাছাড়া তাঁর চরিত্র, আচার ব্যবহার হলো বিশ্ব মানবতার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া রসুল (দ.) কে ভালোবাসা উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য ফরজ। তার সম্পর্কে এসব তথ্য না জানা থাকলে তার প্রতি মুহব্বত কেমন করে হবে তা বোধগম্য নয়। এই প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে পরবর্তীতে রসুল (দ.) ও আহলে বায়াতকে বাদ দিয়ে নিষ্প্রাণ নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত প্রভৃতি আনুষ্ঠানিকতা পালনকেই ধর্ম তথা ইসলামের ভিত্তি হিসেবে মুসলিম সমাজে চালু করা হয়েছে।

হাদিস রেওয়াত করার জন্য হজরত ওমর (রা.), হজরত আবু দারদা এবং আবদুল্লা ইবনে মাসউদকে কয়েদ করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ তোমরা অত্যন্ত বেশি হাদিস বর্ণনা করতে আরম্ভ করেছ। (আল ফারুক- শিবলী নোমানি)।

হাশেমি বংশীয় হজরত আলী (আ.), রসুল (দ.) এর বৈধ খলিফা ছিলেন কিন্তু তাকে নানা কৌশলে ক্ষমতায় যেতে দেয়া হয়নি। একারণে হজরত ওমর (রা.) বনি হাশিম গোত্রের কাউকেও কোন বড় পদে নিয়োগ করেননি (আল ফারুক- শিবলী নোমানি)। অথচ ইসলামের চিরশত্রু আবু সুফিয়ানের নও মুসলিম দুই পুত্র ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান ও মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে সিরিয়ার গভর্নর ও আবু সুফিয়ানেরই জারজ পুত্র জিয়াদ ইবনে সুমাইয়াকে হজরত আবু মুসা আশআরির মির মুনশি পদে বহাল করেন (আল ফারুক- শিবলী নোমানি)। এই উমাইয়া বংশই পরবর্তীতে ইসলামের মূল উৎপাটনের কাজ অত্যন্ত সফলতার সাথেই সম্পন্ন করে। হজরত ওমর (রা.) যে বিভিন্ন কাজে বাড়াবাড়ি করেছিলেন তা নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর খেলাফতকালে একবার সারা দেশময় অনাবৃষ্টির কারণে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হজরত বেলাল (রা.) রওজা মুবারকের কাছে দণ্ডয়মান হইয়া বলিলেন, "আস্সালামু আলাইকুম ইয়া রসুলুল্লাহ (দ.)। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। আপনার উম্মতগণ হালাক হয়ে যাচ্ছে। আপনি আপনার উম্মতদের প্রতি নেক দৃষ্টি দান করতঃ আল্লাহতা'লার দরবারে দোয়া করুন। এই কথা বলিয়া হজরত বেলাল (রা.) চলিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি রাত্রে ঘুমের ঘোরে দেখিতে পাইলেন যে, হজরত বেলাল (রা.) এর নিকট নবি করিম (দ.) বলিতেছেন যে, হে বেলাল, তুমি উমরের নিকট যাও, এবং তাহার নিকট আমার সালাম বল। আল্লাহর ইচ্ছায় অতি শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে। আর ওমর (রা.) কে কোমলতা ও নরম পন্থা অবলম্বন করিতে বলিবে।" (ইসলামের জীবন্ত কাহিনী –ওয়াহেদুল হক)

৬৪৪ সালে হজরত ওমর (রা.) শাহাদত বরণ করেন। ওফাতের পূর্বে তিনি পৃথিবীর সম্ভবত সবচেয়ে জটিল ও নিষ্ঠুরতম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার উত্তরাধিকারী নিয়োগের জন্য অসিয়ত করেন। এই প্রক্রিয়ায় ও আবদুর রহমান বিন আউফের প্রদত্ত কোরআন সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী খলিফাদের নীতি অনুসরণের শর্তে ওসমান (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন।

হজরত ওসমান (রা.) স্বীয় জামাতা হারেস ইবনে হাকামকে তার বিয়ের দিন বায়তুলমাল থেকে দুই লাখ দিরহাম দান করেন। পরদিন প্রাতে বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ জায়েদ ইবনে আকরাম (রা.) বিষন্ন বদনে ও অশ্রুসজল নয়নে খলিফার নিকট এসে তাকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে অনুরোধ করেন। তিনি তার নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে মুসলমানদের ধনাগার থেকে তার জামাতাকে দান করার কারণেই তিনি ইস্তফা দিতে চান। হজরত ওসমান (রা.) বিস্ময়ের সাথে বললেন, ইবনে আরকাম, আমি আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করেছি –এই জন্য তুমি কাঁদয়ো ? ইসলামের প্রাণশক্তি সম্পর্কে সুতীব্র অনুভূতির অধিকারী সেই ব্যক্তি এ প্রশ্নের যে জবাব দিলেন তা হলো না, আমিরুল মোমিনিন। কথা সেটা নয়। আমি এই চিন্তা করে কাঁদছি যে আপনি রসুলুল্লাহর (দ.) জীবদ্দশায় মুসলমানদের জন্য যে বিপুল অর্থ

দান করতেন তারই প্রতিদান হিসেবে এই অর্থ গ্রহণ করলেন না তো ? খোদার শপথ করে বলছি আপনি তাকে একশো দিরহাম দিলেও তা বেশি হতো। খলিফার আত্মীয় স্বজনের জন্য একশো দিরহাম ব্যয় করাকেও যার বিবেক সংগত মনে করতো না, সেই ব্যক্তিটির ওপর হজরত ওসমান (রা.) ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং বললেন, ইবনে আরকাম তুমি চাবি রেখে যাও, আমি অন্য লোক অবশ্যই পাব। এই ধরনের দৃষ্টান্ত হজরত উসমান (রা.) এর আমলে বহু দেখা যায়।

একবার তিনি জুবায়েরকে ৬ লাখ, তালহাকে ২ লাখ এবং মারওয়ান ইবনুল হাকামকে আফ্রিকার এক পঞ্চমাংশ রাজস্ব প্রদান করেন। এতে হজরত আলীর (আ.) নেতৃত্বাধীন সাহাবাদের একটি দল আপত্তি তুললে খলিফা জবাব দেন আমার অনেক আত্মীয় স্বজন রয়েছে এবং তাদের সাথে আমার সদ্ব্যবহার করা উচিত। লোকেরা এই জবাবকে আরও আপত্তিকর অখ্যায়িত করে প্রশ্ন করলেন হজরত আবুবকর (রা.) ও ওমরের (রা.) কি আত্মীয় স্বজন ছিল না ? হজরত ওসমান জবাব দিলেন, "আবুবকর (রা.) ও ওমর (রা.) আত্মীয় স্বজনকে বঞ্চিত করে আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশা করতেন আর আমি তাদেরকে দান করে পুণ্য অর্জন করতে চাই। এতে তারা রাগান্বিত হয়ে ওঠে চলে এলেন এবং বললেন খোদার শপথ। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সেই দুইজনের নীতিই আমাদের নিকট আপনার নীতির চেয়ে অধিক প্রিয়।" উল্লেখ্য তিনি পূর্ববতী এই দুইজনের নীতি অনুসরণ করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ধন-সম্পদ ছাড়া পদ ও চাকুরির অবস্থা ছিল এই যে ওসমান (রা.) এর আত্মীয় স্বজনের ওপর তা বৃষ্টির মত বর্ষিত হচ্ছিল। এদেরই অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন মাবিয়া। ওসমান (রা.) মাবিয়ার রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে ফিলিস্তিন ও হেমসকেও তার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাকে সমগ্র সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি বানিয়ে দেন এবং তিনি যাতে পরবর্তীতে আর্থিক ও সামরিক শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে হজরত আলী (আ.) মোকাবেলায় খেলাফতের দাবিদার হয়ে দাঁড়াতে পারেন সেজন্য তার পথ খোলাসা করে দেন। চাকুরির সুবিধা লাভকারীদের মধ্যে ছিল অন্যতম রসুলুল্লাহ (দ.) কর্তৃক মদিনা থেকে বহিষ্কৃত হাকাম ইবনে আস (মারোয়ানের পিতা) যাদেরকে প্রথম দুই খলিফা মদিনায় ফিরিয়ে আনতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন এবং ওসমান (রা.) এর দুধভাই মুর্তাদ আবদুল্লাহ ইবনে সারাহ যাকে কাবা শরিফের গিলাফের ভিতরে পালালেও হত্যা করার নির্দেশ খোদ রসুল (দ.) দিয়েছিলেন। মারওয়ানকে তিনি তার মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে প্রধান উজির নিয়োগ করেছিলেন। আবদুল্লাহকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। সাহাবারা এই সব কার্যকলাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা চিন্তা করে বার বার মদিনায় ছুঁটে আসতেন এবং ইসলামি রীতিনীতিকে বিকৃতির হাত থেকে এবং মুসলমানদের নেতাকে মহা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা চালাতেন। একবার জনগণ সমবেত হয়ে হজরত আলী (আ.), হজরত ওসমান (রা.) এর সাথে আলাপ আলোচনার জন্য প্রেরণ করে। তিনি গিয়ে বলেন– "ওসমান (রা.) জেনে রাখুন যে, ন্যায়পরায়ন শাসক নিজেও সুপথে থাকে, অপরকেও সুপথে পরিচালিত করে সুন্নতকে প্রতিষ্ঠিত এবং বেদাতকে বিলুপ্ত করে –সেই হলো আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি। খোদার শপথ সবকিছুই স্পষ্ট। রসুলুল্লাহ (দ.) এর নীতি এখনো প্রতিষ্ঠিত এবং তার পতাকা এখনো উড্ডীন। আল্লাহর নিকট সবচাইতে অধম ব্যক্তি হচ্ছে সেই যে সুন্নতকে বিলুপ্ত এবং বেদাতকে প্রচলিত করে। আমি রসুল (দ.)কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন জালেম শাসককে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় হাজির করা হবে। তার ওজর আপত্তি শ্রবণ করা হবে না এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (তাবারি)।"

হজরত ওসমান জবাব দিলেন, আমি জানি তুমি যা বলেছ লোকেরাও তাই বলে থাকে। শোন ! খোদার শপথ করে বলছি, যদি তোমার স্থলে আমি হতাম তাহলে আমি তোমার নিন্দা বা সমালোচনা করতাম না এবং তোমাকে সমালোচনার মুখে অসহায় ছেড়ে দিতাম না। আমি এ আপত্তি তুলতাম না যে তুমি আত্মীয় স্বজনদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করলে কেন ? ওমর (রা.) যাদেরকে শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করতেন তাদেরকে নিয়োগ কেন করলেন ? আলী ! আমি খোদার শপথ দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান না মুগিরা ইবনে শোবা সেই পদে নিযুক্ত আছে। তিনি বললেন, হ্যা জানি ! ওসমান (রা.) তাহলে আমি যদি আত্মীয়তার জন্য ইবনে আমেরকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে থাকি তাহলে তোমরা আমাকে সমালোচনা কর কেন ? আলী (আ.) আমি আসল ব্যাপার আপনাকে বলছি, ওমর (রা.) যাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন ওমরের জুতা তার মস্তকোপরি থাকতো। তার বিরুদ্ধে টু শব্দটি শুনলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে হাজির হতে বলতেন এবং তার

শেষ মীমাংসা করে, তবে ক্ষান্ত হতেন। এই কাজটাই আপনি করেন না। আপনি নিজে দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে নম্র ব্যবহার করা শুরু করেছেন। ওসমান (রা.) : তুমি নিশ্চয়ই জান, ওমর (রা.) তাঁর খেলাফতের গোটা যুগ ধরেই মাবিয়াকে শাসনকর্তা পদে বহাল রাখেন। আমিও তো তাকে শাসনকর্তা হিসেবে বহাল রেখেছি। আলী ! আমি আপনাকে খোদার শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি আপনি কি জানেন না যে, ওমরকে ওমরের গোলাম ইয়ারফা যত ভয় করতো মাবিয়া তার চাইতে বেশি ভয় করতেন ? ওসমান : হ্যাঁ। আলী : কিন্তু এখন অবস্থা এই যে, মাবিয়া আপনার মতামত না নিয়েই সিদ্ধান্ত করতে থাকেন অথচ আপনি তার খবরও রাখেন না তিনি নিজের হুকুমকে লোকদের মধ্যে ওসমানের হুকুম বলে চালিয়ে দেন। এসব ব্যাপার আপনার কাছে পৌছে কিন্তু আপনি মাবিয়ার উক্তির কোন প্রতিবাদ করেন না।

হজরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে আলী (আ.) বলেন– আমি যদি ঘরে বসে থাকি তবে তিনি ওসমান (রা.) বলবেন যে, তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছ আমার অধিকার অগ্রাহ্য করেছ। আর যদি তার সাথে আলাপ আলোচনা করি তা হলেও তিনি নিজের খেয়াল খুশি অনুসারেই কাজ করেন। মারওয়ান তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করায়। রসুলুল্লাহ (দ.) এর সাহচর্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও বার্ধক্যের কারণে তিনি পুরোপুরিভাবে তাদের খপরে পড়ে গেছেন। তারা তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চালিত করে। (ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি-সাইয়েদ কুতুব -৬৯-৭১)।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাকাতের সঠিক অর্থ আমরা অনুধাবন করতে চাই না। কারণ তা' মুসলমানদের বিলাসী জীবন যাপনের প্রত্যক্ষ পরিপন্থী। সুবিধাবাদী শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কোন যুগেই পদলেহনকারী তথাকথিত আলেমের অভাব হয়নি তারা সব সময় ধনিকদের স্বার্থেই ফতোয়া দিয়ে ইসলামি অর্থনীতিকে ধনী লোকদের অত্যাচারের হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণ এবং তা কার্যত পরিতাজ্য আদর্শে পরিণত করেছে। যদি আমরা বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করি তাহলে দেখা যাবে যে হজরত ওসমান (রা.) আমল থেকে প্রকৃতপক্ষে জাকাতের অর্থনৈতিক বিধানের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাজনিত জটিলতার সূত্রপাত হয় অদ্যাবধি তা মুসলিম সমাজে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে চালু করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে হজরত আবু জর গিফারি (রা.) এর সাথে মাবিয়া ও পরবর্তীতে হজরত ওসমান (রা.) এর সাথে যে আলোচনা হয় তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। হজরত আবু জর গিফারি (রা.) প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে হলে তাঁর সম্পর্কে রসুল (দ.) এর বাণী অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন। যেখানে হজরত আবুবকর (রা.) সম্পর্কে রসুল (দ.) বলেছেন, আবুবকরের মাল দৌলত আমাকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত করেছে। আর আমি যদি বন্ধু হিসাবে কাউকে গ্রহণ করতাম তবে আবু জর (রা.) কে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের এই সঙ্গীটি আল্লাহর বন্ধু। আবুবকরের জন্য রয়েছে ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ।

অথচ অন্য জায়গায় চারজন নিঃস্ব লোক সম্পর্কে রসুল (দ.) বলেছেন বরকতময় ও গৌরবময় আল্লাহ চার ব্যক্তির প্রতি আমাকে ভালোবাসা পোষণ করতে হুকুম করেছেন এবং আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন তিনিও এই চার ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। এরা হলেন, আলী (আ.), আবু জর (রা.), আল মিকদাদ (রা.) ও সালমান ফারসি (রা.)। নবিজি যখন তাবুক যুদ্ধে গমন করেন তখন আবু জর (রা.) কে মদিনার আমির নির্বাচিত করেন। অথচ পরবর্তীকালে রসুল (দ.) এর এই প্রিয় সাহাবিকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রদান করা হয়নি বরং তার ওপর যে নির্যাতন করা হয়েছে তা ভাবতে অনেকেই শিউরে উঠবেন আবু জর (রা.) সম্পর্কে হজরত (দ.) বলতেন– জমিনের ওপর এবং আসমানের নিচে আবু জরের চাইতে সাচ্চা কেউ নাই। তিনি (দ.) আরও বলতেন– আবু জরকে একাই একটি জাতি করে উঠানো হবে।

হজরত আবু জর গিফারি (রা.) বলতেন পাহাড় এলাকা পর্যন্ত আবাদি পৌঁছিলে রসুল (দ.) তাকে মদিনা ত্যাগ করে সিরিয়া যেতে বলেছেন। রসুল (দ.) এর নির্দেশে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার সিরিয়া যাওয়ার বিষয়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও গবেষণার দাবি রাখে।

হজরত আবু জর গিফারি (রা.) যখন সিরিয়া যান তখন মাবিয়া দোর্দন্ড প্রতাপশালী গভর্নর হিসেবে তাঁর মর্মর প্রাসাদ নির্মাণের জন্য হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োগ করেছেন। একদিন মাবিয়া অত্যন্ত গর্বের সাথে শ্রমিকদের কাজের তদারকি করছিলেন। হজরত আবু জর গিফারি (রা.) মাবিয়াকে বললেন– মাবিয়া এই অর্থ যদি

বায়তুল মালের হয়ে থাকে তবে তা খিয়ানত আর যদি তোমার হয়ে থাকে তবে তা অপব্যয়। আবু জর (রা.) বলতে লাগলেন এখন তো দেখছি এমন সব কার্যকলাপ শুরু হয়েছে, যার অনুমোদন না কোরআনে আছে, না হাদিসে পাওয়া যাবে। আল্লাহর কসম আমি লক্ষ্য করছি সত্য অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, মিথ্যার পুনরুজ্জীবন ঘটছে। সত্যবাদীকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, মিথ্যাবাদীকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

...অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সেই লোকদের যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা/পুঁজি করিয়া রাখে এবং তা খোদার পথে খরচ করে না। একদিন অবশ্যই আসবে যখন এই স্বর্ণ-রৌপ্য এর ওপর জাহান্নামের আগুণ উত্তপ্ত করা হইবে এবং পরে উহার দ্বারাই সেই লোকদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পিঠে দাগ দেয়া হইবে। ইহাই হইতেছে সেই সম্পদ যাহা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করিয়াছিলে। নাও এখন তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ করো।" তওবা –৪৩।

হজরত আবু জরের (রা.) এ ধরনের বক্তৃতা সমাজ জীবনে খুব প্রভাব সৃষ্টি করল। তিনি যেখানেই যান লোকজন তাকে ঘিরে ধরে বক্তৃতা শুনতে লাগল ও অন্যভাবে নিপীড়িত লোক তাকে আপনজন ও তাঁর বক্তব্যে তথা পবিত্র কোরআনের মধ্যে তাদের সমস্যার সমাধান আছে বলে স্থির বিশ্বাস স্থাপন করল। পক্ষান্তরে মাবিয়া এই আয়াত ইহুদিদের জন্য নাজেল হয়েছে বলে ঘোষণা করল। কিন্তু মাবিয়া যেহেতু নও মুসলিম ছিল তাই হজরত আবু জর (রা.) এর বক্তব্যের বিপরীতে তার এই তথাকথিত ব্যাখ্যার কোন গুরুত্ব থাকল না। তাই মাবিয়া কয়েকজন সাহাবাকে আবু জর (রা.) প্রদত্ত উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার সঠিকতা যাচাই করার জন্য প্রেরণ করেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন হজরত আবু দারদা, আমর ইবনুল আস, ওবাদা ইবনে সামেত, উম্মে হারাম। মাবিয়া এদেরকে বলেন, আবু জর (রা.) যেমন রসুল (দ.) এর সাহচর্যে ছিলেন তেমনি আপনারাও ছিলেন। তিনি যেমন নবিজির সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তেমনি আপনারাও করছেন, কাজেই আপনারা কি তাকে বোঝাতে পারবেন। মুসনদে আহমদে বর্ণিত এদের সাথে আবু জর (রা.) আলোচনা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

হজরত আবু জর (রা.) প্রথমে ওবাদা ইবনে সামেতকে বললেন হে আবুল অলিদ! আপনি আমাদের সবার মধ্যে অগ্রগণ্য এবং বয়োজ্যেষ্ঠ আমাদের চেয়েও আপনার বুজুর্গি অনেক বেশি। আপনি নবিজির সান্নিধ্যও আমার চেয়ে বেশি লাভ করেছেন। কাজেই আমি আপনার ব্যাপারে অবাক না হয়ে পারি না। বর্তমানে প্রতিনিধি দলে আপনাকে অন্তর্ভুক্ত দেখে আমার সবচেয়ে ঘৃণা হচ্ছে।

আবু দারদাকে (রা.) সম্বোধন করে বললেন : হে আবু দারদা নবি করিম (স.) এর তিরোধান ঘনিয়ে আসার সময় তুমি ঈমান এনেছ। তারপর সৎ এবং আদর্শ মুসলমানে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ তুমি মাত্র সেদিন ঈমান এনেছ। তুমি আমাকে কি বোঝাবে হে ? আমি যা বুঝি ততটুকু বোঝার যোগ্যতা তোমার হয়নি।

আমর ইবনুল আস'কে সম্বোধন করে বললেন : আমর! তুমি নিজেই বলো দেখি জেহাদে অংশগ্রহণ ছাড়া তুমি নবিজির কাছ থেকে আর কি পেয়েছো ? অর্থাৎ "মহানবির যে সংস্পর্শ তুমি পেয়েছে তাতে ইসলামের শরিয়ত সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই। উম্মে হারামকে কি আর বলবো, বেচারী মেয়ে মানুষ তার বুদ্ধিও একজন মেয়ে মানুষের মতই।"

এই ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, নবি (দ.) এর সান্নিধ্য পেলেই সবাই সমানভাবে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন নাই। তাছাড়া মাবিয়ার উক্ত প্রতিনিধি দলের সদস্যদের যে কোরআন হাদিস সম্পর্কে হজরত আবু জর (রা.) এর বিপরীতে কোন উল্লেখযোগ্য জ্ঞান ছিলনা তা বলাই বাহুল্য। এ কারণে মাবিয়ার এই মিশন একেবারে বিফলে যায়।

পবিত্র কোরআন বা হাদিসের তথা তত্ত্বীয়ভাবে হজরত আবু জর (রা.) এর বক্তব্যের ব্যাপারে কোন ত্রুটি না পাওয়ায় মাবিয়া আবু জর (রা.) কে তোষণ নীতি অবলম্বন করলেন।

মাবিয়া আবু জর (রা.) কে দাওয়াত দিলেন। বহু রকমের উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হলো। আবু জর (রা.) দাওয়াতে আসলেন। দস্তরখানা বিছানো হল। কিন্তু আবু জর (র) কিছুই খেলেন না। তিনি বললেন রসুল (দ.) এর সময় হতে সপ্তাহে দুই সের গমের ছাতু খাচ্ছি। সেই অভ্যাসই বহাল আছে। কিন্তু তোমাদের তো সব কিছুই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মাবিয়া আজ তুমি যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করো, যেরূপ বস্ত্র পরিধান করো।

রসুলুল্লাহ (স.) এর জমানায় তো তেমন করতে না। আমি রসুল (দ.) কে বলতে শুনেছি ও কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার সর্বাপেক্ষা নিকট থাকবে। যে ব্যক্তি ঠিক সেই অবস্থায়ই দিন কাটায়, যে অবস্থায় আমি তাকে দুনিয়া ছেড়ে যাব। (ইতিহাসগত বিভ্রান্তির রহস্য– মুফাখখারুল ইসলাম)।

হাদিসের এই আলোকেই রসুল (দ.) এর প্রকৃত নিকটবর্তী লোকদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে অন্য কোন মানদন্ডে নয়। আবু জর (রা.) এর সমালোচনায় মাবিয়া বিরক্ত হলেন। কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তবে তাকে অনুরূপ সমালোচনা বন্ধ করার জন্য বললেন। আবু জর (রা.) বললেন : যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা গরিবদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করে না দিবে ততক্ষণ আমি চুপ হবো না। এ পদ্ধতিতে সুবিধা না হওয়ায় মাবিয়া আবু জর (রা.) এর চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে ভাবলেন রাত্রে টাকা দিলে যদি আবু জর (রা.) গ্রহণ করেন, তবে সকালে তল্লাসী করে তা বের করা হলে প্রমাণ হবে যে তিনিও টাকা সঞ্চয় করে রাখেন। তাই মাবিয়া রাত্রির অন্ধকারে এক সহস্র দিনার আবু জর এর (রা.) নিকট পাঠিয়ে দেন। আবু জর (রা.) কিন্তু সমস্ত দিনারই রাতের মধ্যেই সাহাবিদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এদিকে সকালে মাবিয়ার সেই লোকটিই আবু জরের নিকট ফিরে আসল। লোকটি বলল : মাবিয়ার অত্যাচার হতে আমাকে বাঁচান। ভুলক্রমে আমি আপনাকে দিনারের পুটলি দিয়ে গিয়েছি। আবু জর (রা.) বললেনঃ আমি তো রাতেই সব বন্টন করেছি। আমাকে তিন দিন সময় দেয়া হলে তা ফেরত দিতে পারবো।

এসকল কৌশল সফল না হওয়ায় অনেক ভেবে চিন্তে মাবিয়া স্থির করলেন যে, আবু জর (রা.) তো জিহাদের নামে পাগল সুতরাং তাকে জিহাদে প্রেরণ করা হলেই উদ্দেশ্য সফল হবে (আবু জর মৃত্যু বরণ করবেন)। মাবিয়া তাই ঠিক করলেন এবং তাকে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। অভিযান সাফল্য লাভ করল। অন্যান্য মুসলমান গাজিদের সাথে আবু জর (রা.) ফিরে আসলেন। মাবিয়ার আশা সফল হলোনা। অর্থাৎ আবু জর (রা.) যুদ্ধে মারা গেলেন না। আবু জর (রা.) পূর্বের ন্যায় পুনরায় ধনী লোকদের সমালোচনা করতে লাগলেন। এমনকি একদিন মাবিয়া খোতবা দিচ্ছিলেন, খোতবায় তিনি বললেন সম্পদ আমার। গনিমতের মালও আমার। আমি যাকে ইচ্ছা দেবো, আর যাকে ইচ্ছা দিবনা। শ্রোতাদের মধ্য হতে একজন বাধা দিয়ে বললো : অবশ্যই নয়, সম্পদ আমাদের। গনিমতের মালও আমাদের। সুতরাং যে ব্যক্তিই এই সম্পদ ও আমাদের মাঝখানে দন্ডায়মান হবে আল্লাহর নামে আমরা তার বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করব।

মাবিয়া বায়তুল মালের অর্থ কর্জ করে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতেন এবং যুক্তি হিসেবে বলতেন যে সম্পদের মালিক আল্লাহ তাই আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়েছেন এবং প্রচুর খরচ করার সুযোগ দিয়েছেন। আবু জর (রা.) মাবিয়ার যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন আল্লাহর মালিকানার ব্যবহারিক অর্থ সমগ্র উম্মর মালিকানা। আল্লাহ সম্পদ সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। কার্যতঃ সম্পদের মালিক সমগ্র উম্মা। তিনি মাবিয়াকে আরও বলেন যে, তিনি (মাবিয়া) যেন মুসলিমদের অর্থকে আল্লাহর অর্থ বলে তা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার না করেন।

হজরত আবু জরের (রা.) প্রচারণার ফলে ধনী লোকরা রাস্তায় বের হলেই জনতা তাদেরকে 'দাগী', 'দাগী' বলে তিরস্কার করতে লাগল। সামাজিক বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এদিকে বিত্তহীনেরা সম্পদ ন্যায় বিচার ভিত্তিক বন্টনের দাবি জানাতে থাকে। অবস্থা এরূপ দেখা দেয় যে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়।

ধনী ব্যক্তিবর্গ তাদের পুঞ্জিভূত সম্পদ রক্ষার জন্য মাবিয়ার সহায়তা কামনা করে। ধনীদের পক্ষ থেকে মাবিয়াকে জানানো হয় যে এই সব ধনী লোকদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারলে মাবিয়ার প্রতি সমর্থন তারা প্রত্যাহার করবে।

এমন পরিস্থিতিতে মাবিয়া হজরত ওসমান (রা.) কে জানান যে আবু জর (রা.) খলিফা ও সিরিয়ার গভর্নর এর বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করছেন। হাজার হাজার লোক খলিফার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মাবিয়া খলিফাকে পরামর্শ দেন আবু জর (রা.)'কে যেন অবিলম্বে মদিনায় নিয়ে আসা হয়। খলিফা অনুমতি দেন আবু জর (রা.) কে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়া হোক।

খলিফার অনুমতি পাওয়া মাত্র মাবিয়া আবু জর (রা.) কে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পাঁচজন হাবশি ক্রীতদাস ঠিক করা হয় তাঁকে মদিনায় নিয়ে যাবার জন্য। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যাতে করে তার অশেষ কষ্ট হয়। নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত দাসরা ওঠের পৃষ্ঠে কোন হাওদা না দিয়ে এটা এত দ্রুত ধাবিত করে যে তার পবিত্র শরীরের কয়েক জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ভ্রমনকালীন যাতনার সময় তিনি এই কথা স্মরণ করে সান্তনা লাভ করেন যে, রসুল (দ.) বলেছিলেন "আবু জর আমার পর আল্লাহর পথে কাজ করার জন্য তোমাকে অশেষ কষ্ট করতে হবে।"

আবু জর (রা.) মদিনায় হজরত ওসমান (রা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করলে খলিফা তাকে তিরস্কার করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষ সৃষ্টির অভিযোগ আনেন। আবু জর (রা.) সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন তিনি শুধু আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী লোকজনকে ধন পুঁজি করার বিরুদ্ধে সাবধান করে দেন এবং পরিণতির (জাহান্নামের) ভয় দেখান। খলিফাও আবু জর (র) এর সাথে কথা কাটাকাটি হয়। কিন্তু খলিফা আবু জর (রা.) বক্তব্য খন্ডন করতে পারেন না। তাই তিনি উত্তেজিত হয়ে লোকদের বলেন আপনারা আমাকে পরামর্শ দেন একে নিয়ে আমি কি করবো। আমি একে 'ফাসাদ' সৃষ্টিকারী হিসেবে হত্যা করবো না তাহাকে পবিত্র ইসলামের ভূমি থেকে নির্বাসিত করবো। হজরত আলী (আ.) বলেন "আমি আপনাকে সে কথাই বলবো, যা একজন মুমিন ফেরাউনের উত্তরাধিকারীদের বলেছিল। যদি আবু জর (রা.) মিথ্যা বলে থাকে। তবে তার পক্ষে সে বিপন্ন হবে আর যদি সে সত্য পথে থাকে তবে (মিথ্যা অভিযোগের জন্য) আপনি বিপন্ন হবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।

অন্য একদিন খলিফা আবু জর (রা.) কে ডেকে বললেন– আবু জর (রা.) তুমি তোমার প্রচারণা থেকে বিরত হবেনা ? আবু জর (রা.) জবাব দেন দরিদ্রের অবস্থার পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত আমি বিরত হবে না। যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে খলিফা জিজ্ঞেস করেন যদি কেউ জাকাত দিয়ে অর্থ নিজ তত্ত্বাবধানে রাখে তবে তা-কি অন্যায় ? কাউল আহবার বলেন, আমিরুল মুমেনিন কখনই নয়। কাবের জবাবে আবু জর (রা.) অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তিনি কাবকে বললেন : ওহে, ইহুদি সন্তান তুমি মিথ্যা বলছ। এ সময় আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) এর পরিত্যক্ত সম্পদ খলিফার নিকট আনয়ন করা হয়। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টনের পর প্রায় লক্ষাধিক দিরহাম মূল্যের সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে। তা' বায়তুল মালে জমা দেয়া হয়।

খলিফা মন্তব্য করেন আমি মনে করি আবদুর রহমান ইবনে আউফ একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। কারণ তিনি অতিথি সেবা করতেন সদকা দিতেন এবং তারপরও প্রচুর বিত্ত সম্পদ রেখে গেছেন। কাব জবাব দেন খলিফা আপনি সত্য কথা বলেছেন এবং আবদুর রহমান সম্পদ উপার্জন করেছেন, ব্যয় করেছেন। সম্পদ রেখে গেছেন। আল্লাহ তাঁকে দু'জগতের কল্যাণ দান করেছেন। কাবের এ মতামতের প্রেক্ষিতে হজরত আবু জর (রা.) বললেন, একদিন আমি রসুল (দ.) এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বলেছেন, শেষ বিচারের দিন ধনীগণের জন্য থাকবে দূর্ভাগ্য। যদি আমার এই উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ থাকতো, আমি সব কিছুই আল্লাহর পথে ব্যয় করতাম। তিনি কাবকে বললেন, রসুল (দ.) বলে গেছেন এমনি কথা আর তুমি বলয়ো যে, আবদুর রহমান প্রচুর ঐশ্বর্য রেখে গেছেন তাতে কোন অন্যায় হয়নি। খলিফার নির্দেশে আবু জর (রা.) কে নির্বাসনে রবজায় প্রেরণের নির্দেশ দেন। ইহা মদিনা থেকে ইরাকে যাওয়ার পথে মরুভূমির অভ্যন্তরে একটি ছোট মরুদ্যান। এই মরুদ্যানের অধিবাসীদের মধ্যে ছিলেন ১২ জন পুরুষ এবং জন কয়েক নারী। আবু জর তাঁর প্রিয় বন্ধু রসুল (দ.) এর কথা স্মরণ করে আশ্বস্ত হন। তিনি একবার আবু জর (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন, যদি তোমাকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হয় কোথায় যাবে ? আবু জর (রা.) জবাব দেন আমি মক্কায় যাবো এবং পায়রার মত আল্লাহর ঘর আকড়ে ধরে থাকবো। রসুল (দ.) জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে যদি সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় তবে কোথায় যাবে ? আবু জর (রা.) বলেন, আমি সিরিয়ায় যাবো। মহানবি (দ.) জিজ্ঞেস করেন যদি সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয়। আবু জর বলেন, তখন আমি আমার তলোয়ার বের করে দুশমনের সম্মুখীন হবো। রসুল (দ.) তা করতে তাকে নিষেধ করেন এবং ধৈর্য্য ধরার নির্দেশ দেন।

এসব কর্মকান্ড পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, হজরত আবু জর (রা.) কার্যক্রমের মধ্যে একটি যৌক্তিক পরম্পরা রয়েছে। অর্থাৎ তিনি রসুল (দ.) এর ওসিয়তের মর্মানুযায়ী কাজ করছিলেন।

বত্রিশ হিজরি জিলহজ মাস। অবু যর (রা.) এর স্ত্রী বললেন : তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে, আমি একজন মেয়ে মানুষ। এ পাথুরে মাটিতে তোমার জন্য কবর খননের মত শক্তি আমার নাই। আর ঘরে একটি কাপড়ও নাই, যা দিয়ে আচ্ছাদিত করে তোমাকে কাফন করবো।

এসব শুনে আবু জর (রা.) মধুর কণ্ঠে বললেন: কেঁদো না, কেন কাঁদবে না শোন। একদিন আমি নবি করিম (দ.) এর একদল সাহাবার সাথে ছিলাম। নবিজি তখন বললেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে একজন লোক জনমানবহীন প্রান্তরে প্রাণ দেবে। মুসলমানদের একটি দল তার জানাজায় এসে হাজির হবে। নবিজির কাছে এ বাণী শোনার পর থেকে আমি লক্ষ্য করে দেখলাম সে সময়ে তাঁর সাথে যে কয়জন সাহাবা ছিলেন তারা সবাই কোন শহরে বা জনপদে ইন্তেকাল করেছেন। শুধু আমিই বাকি রয়েছি। আমি এই নির্জন প্রান্তরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি। তুমি যাও রাস্তায় গিয়ে বসো। মুসলমানদের একটি দল অবশ্যই আসবে। কারণ আল্লাহর কসম আমি মিথ্যা বলছি না। আবু জর (রা.) এর স্ত্রী বললেন : আল্লাহ জানেন এখন কোথা থেকে লোক আসবেন। হাজ্বীদের আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, পথ জনশূণ্য নির্জন। তিনি একবার স্বামীর শয্যাপাশে যাচ্ছিলেন আবার রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ দূরে ধুলোবালি দেখা গেল। ক্রমে সে দৃশ্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। ইবনে সা'দ লিখেছেন। সেই কাফেলা এমন দ্রুত বেগে আসছিল ঠিক যেন এক ঝক পাখি উড়ে আসছে। উটের পিঠে পাগড়ি পরিহিত কাফেলা একজন মহিলাকে একাকী রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের একজন জিজ্ঞেস করলেন: বেগম সাহেবা, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? কোন দুঃসংবাদ আছে কি ?

আবু জর (রা.) এর স্ত্রী বললেন: মুসলমানের একজন মানুষ মারা যাচ্ছে, আল্লাহর ওয়াস্তে তার দাফনের ব্যবস্থা করো। বেচারার কাছে কাফন পর্যন্ত নাই। তার জন্য কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। কিছুক্ষণ পর আবু জর (রা.) বললেন : আমার কাছে যদি আমাকে কাফন দেয়ার মত পরিমাণ কাপড় থাকতো, তাহলে কি যে ভাল হতো, তাহলে নিজের কাফনের জন্য আমাকে অন্যের কাপড় দিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করতে হতো না। অতঃপর বললেন, আমি তোমাদের অসিয়ত করছি আল্লাহর কসম দিচ্ছি আমাকে যে ব্যক্তি কাফন দেবেন তিনি যেন কোন প্রদেশের গভর্নর/ কর্মকর্তা, কোন প্রভাবশালী লোক, অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনে নিয়োজিত কার্যক্রমে লিপ্ত কেউ না হন। অবশেষে ঐ কাফেলায় একজন আনসার যুবক পাওয়া গেল। তিনি বললেন: আমার থলের মধ্যে দুটো চাদর আছে। সে চাদরের সুতা আমার মা কেটেছেন। আবু জর (রা.) বললেন : তুমি আমার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি তোমার চাদর দিয়েই আমার কাফন দিও। গোসল দেয়ার পর তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী তার লাশ মোবারক রাস্তায় রেখে দেয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিখ্যাত সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) উপস্থিত হন ও তার জানাজায় নামাজ পড়ান।

এগুলো অবাক হবার কথা হলেও রসুল (দ.) এর প্রকৃত ও নিকটতম সাহাবিদের জন্য এতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তবে এই মহান আল্লাহর বন্ধু ও তাঁর প্রিয়তম রসুলের (স.) সাহাবি তদানীন্তন খেলাফতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতেন তা তার কাফন সম্পর্কে অসিয়ত বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। (হজরত আলী (আ.)-মওলানা মুজীবর রহমান, হজরত আবু জর গিফারি (রা.) - সাইয়েদ মানাজির আহসান জিলানি)

হজরত ওমর (রা.) এর আমলে জমির অধিকার তাহাদেরই থাকত, যারা নিজেরা জমি চাষ করত। হজরত ওসমান (রা.) এই নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে দেন। ফলে বিত্তশালী নাগরিকরা ইচ্ছামত কৃষি জমি ক্রয় করার সযোগ লাভ করে। কেননা খলিফা আবুবকর (রা.) এর আমল হতে ক্রমাগত দেশ জয়ের ফলে মুসলমানদের অনেকের হাতে বিপুল অর্থ জমে যায়। তাদের কেহ কেহ বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করেও উদ্বৃত অর্থ কি কাজে লাগাবে ভেবে পাচ্ছিলেন না। হজরত ওসমান (রা.) এ নতুন ব্যবস্থা চালু করার ফলে এই নব্য ধনিক সম্প্রদায় সঞ্চিত অর্থের দ্বারা হেজাজ, সিরিয়া, ইরাক ও মিশরের বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের সুযোগ-সুবিধা মত জমি খরিদ করে প্রচু স্থাবর সম্পত্তির মালিক হওয়ার সযোগ লাভ করে। এই নব বিধান প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলা হয় যে, কুফা শহরের লোক সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তন্মধ্যে অভিজাত ধনী লোকের তুলনায় নিম্ন শ্রেণির লোকদের সংখ্যাই অধিক। এর ফলে নাগরিক সভ্যতা ও শালীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শহরের নৈতিক মানও অনেক অবনতি হয়। কারণ নবাগত

অধিবাসীদের অধিকাংশই যাযাবর বেদুঈন কিংবা গ্রাম্য আরব। তারা মুখ, বর্বর। তাদের রুচি, আচরণ কদর্য, ভাষা কথাবার্তা ভদ্রতাহীন এবং ব্যবহার রীতিনীতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ। ঝগড়া কলহ, মারামারি তাদের চিরন্তন অভ্যাস। এজন্য শহরের শান্তিও বিপন্ন প্রায়। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে। যুদ্ধের সময় খলিফার আহবানে গ্রাম অঞ্চল হতে দলে দলে লোক শহরে আসত এবং সৈনিক দলে ভর্তি হতো। কিন্তু এই সব সৈনিকদের অধিকাংশ উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলনা বরং যুদ্ধ একটি লাভজনক পেশা/ব্যবসা হিসেবে গণ্য করে তারা এইসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। এইসব লোক যুদ্ধে লব্ধ গনিমতের মাল লাভ করে শহরে থাকার সুযোগ পেত। পরবর্তীতে তাদের পরিবারবর্গকে শহরে নিয়ে আসত। এদের সঙ্গে আসত অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতা।

এইসব লোক ছাড়া আরও এক শ্রেণির লোক দ্বারা নাগরিক জীবন কলুষিত হচ্ছিল। ইহারা ছিল যুদ্ধ বন্দী নর-নারী। বন্দী অবস্থায় শহরে আনিত হওয়ার পর তারা যুদ্ধ লব্ধ সম্পত্তি হিসাবে বিজয়ী যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টিত হতো। এই শ্রেণির লোক সংখ্যা ছিল বিপুল। বিজয়ীদের গৃহে তারা দাস-দাসী রূপে জীবন-যাপন করত। বিজিতদের অনেকেরই নৈতিক চরিত্রের মান গড় অথবা নিম্নমানের ছিল বিধায় তারা দাস-দাসী হিসেবে জীবন-যাপন করত। পরাধীন জীবন এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে নৈরাশ্য এদের স্বভাবে ও কাজে কর্মে এনেছিল নীচতা, কপটতা, হীনতা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা। তারা মালিক পক্ষকে শত্রু ও অত্যাচারী হিসেবে গণ্য করত এবং সযোগ পেলে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করত। এইসব দাস দাসীদের সন্তান-সন্ততিরাও তাদেরই মনোবৃত্তি নিয়ে বড় হতো। এ কারণেই এই নতুন প্রজন্মের সন্তান-সন্ততিদের অনেকের মনেই ঈমান গভীরভাবে প্রবেশ করার সযোগ পেতনা। তাই তারাও গ্রাম অঞ্চল হতে আগত মুর্খ বর্বর আরবদের বংশধরগণ শহরে এক নিম্নস্তরের সমাজ গড়ে তোলে। এদের সংশ্রবে এসে শহরের সংখ্যা লঘু অধিবাসীরা নিজেদের কৃষ্টি, ঈমানের দৃঢ়তা, ইসলামি কৃষ্টি, শালীনতা ও সাংস্কৃতিক চেতনা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিল। ইসলামি সাম্রাজ্যের তখন প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত দুঃসময়।

এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য হজরত ওসমান (রা.) কুখ্যাত মারওয়ান ও মাবিয়ার সাথে আলোচনা করলেন। তারা বলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বিধি ব্যবস্থা তথা প্রচলিত আইন-কানুনে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এই আলোচনার আলোকে তিনি ঘোষণা করলেন এখন থেকে আরবেরা যে যেখানে বাস করে তাদের গণীমত সেখানেই পাঠিয়ে দেয়া হবে। তাতে বহিরাগত লোকদের আর শহরে থেকে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। সামরিক বাহিনীর লোক ছাড়া অন্য যাদের সেখানে বাস করা একান্ত প্রয়োজন শুধু তারাই সেখানে বাস করবে। খলিফার এই নব বিধান শুনে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করল গণীমত স্বরূপ যারা ভূমির মালিকানা লাভ করবে তাদেরকে উহা কিভাবে পৌঁছাইয়া দেয়া হবে ? ইহার উত্তরে বললেন, এখন হতে জমি ক্রয় বিক্রয় চলবে। এই জবাব শুনে মদিনার বিত্তশালী লোকেরা খুব খুশি হলো। কেননা তারা বুঝল এখন হতে তাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা যথেষ্ট জমির মালিক হওয়া যাবে। এই ব্যবস্থা চালু হবার পর ধনী ব্যক্তিরা জমির সন্ধানে ছুঁটে বেড়াতে লাগলেন এবং যে যেখানে পারলেন জমি খরিদ করে সঞ্চিত অর্থের সদ্বব্যহার করতে মনোনিবেশ করলেন। এইরূপ বলা হয় যে তেত্রিশ হিজরি হতে চৌত্রিশ হিজরি পর্যন্ত এক বছর ধরে এই জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ধুম লেগেছিল। ফলে বড় বড় ব্যবসায়ী ও ধনশালীগণ রাতারাতি জমিদার হয়ে গেলেন। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণ খলিফা হতে ভূমি পুরস্কার লাভ করে জায়গিরদার হয়ে গেলেন। এইভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্রে জমিদারি-জায়গিরদারি প্রথার উদ্ভব হলো। ছোট ছোট জমির মালিক এবং প্রকৃত কৃষকগণ নগদ টাকার লোভে জমি বিক্রয় করে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হলো। পক্ষান্তরে বহু জমির মালিকদের জমি চাষাবাদেও সমস্যা দেখা দিল। তখন ভূমিহীন কৃষকগণই জমিদারের জমিতে মজুর খেটে তাদের ফসল ফলিয়ে দিতে লাগল। কোন কোন জায়গিরদার সেলামি নিয়ে কর ধার্য করে ভূমিহীনদের নিকট জমি পত্তন দিল। এইভাবে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে শ্রেণি বৈষম্য দেখা দিল। একদিকে জায়গিরদার, জমিদার ও মুনিব মহাজন ও অন্যদিকে ভূমিহীন প্রজা ও মজরের দল।

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রথম তিন খলিফার আমলে অন্য যে কোন যোগ্যতার চেয়ে কোরায়েশ বংশে জন্ম গ্রহণ করাই পদ লাভের জন্য সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হিসেবে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের স্থান আনসারদের অপেক্ষা উপরে ছিল। অন্য আরবদের সঙ্গে তাদের মোটেও তুলনা চলত না। খলিফা ওসমানের

(রা.) খলিফা হবার মাত্র ছয় বছরের মধ্যে কোরায়েশ গোত্রের উমাইয়া শাখা রাষ্ট্রের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দখল করে। ফলে সর্বত্র এই দুর্বিনীত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব লিপ্সু ব্যক্তিবর্গের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

হজরত আবু বকর (রা.) যখন কোরায়েশ বংশোদ্ভূত হওয়ার সুবাদে খলিফা হিসেবে রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হন। তখন থেকেই মদিনার আনসারগণের রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা দ্বিতীয় নম্বরে পদাবনতি ঘটে। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকেও তাদের পিছনের সারিতে স্থান লাভ করল।

হজরত ওসমানের (রা.) খেলাফত আমলের শেষ পর্যায়ে উমাইয়াগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করায় আনসারদের সহযোগিতা বা পরামর্শের ক্ষেত্র সংকুচিত হতে হতে সাধারণ আরব ও তাদের মধ্যে পার্থক্য দূর হয়ে যায়। মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে নবির (দ.) সহচরদিগকে যারা আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি আদরে নিজেদের সংসারে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং নিঃস্বার্থভাবে তাদেরকে নিজ নিজ পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পর্যন্ত দানে আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা এই ভাগ্য বিপর্যয়ে নিজেদের নিয়তির লিখন বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং রসুল (দ.) এর অসিয়ত অনুযায়ী এ ব্যাপারে কোনরূপ উষ্মা প্রকাশে পর্যন্ত বিরত ছিলেন। খলিফা ওসমানের (রা.) কার্যকলাপে তারা নির্বিকার থাকতেন এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু হিজরতের প্রাক্কালে যারা কিশোর বালক ছিল আনসারদের সেই সব সন্তানগণ তখন বয়স্ক হয়েছে, তারা এইসব রাষ্ট্রীয় নীতি তথা তাদের ভাগ্য বিপর্যয় নির্বিবাদে স্বীকার করে নিতে পারল না। কোরায়েশদের তুলনায় তাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে তা তারা গভীর বেদনার সাথে অনুভব করল। এই বেদনা ক্রমে ক্ষোভে রূপান্তরিত হতে লাগল। একথা তাদের নিকট খুব ভালভাবেই জানা ছিল যে মক্কার কোরায়েশগণই নবি (দ.) ও ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল।

বর্তমানে সেইসব কোরায়েশগণই অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিরা ইসলাম ধর্মের রক্ষাকর্তা ও ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা। এ কারণেই হিজরতের চৌত্রিশ বছর পরে খলিফা ওসমানের (রা.) ভাগ্যাকাশে যখন বিপদের ঘনঘটা ছেয়ে আসল তখন মদিনার অধিবাসীরা যারা হিজরত যুগের সেই মহানুভব আনসারদেরই সন্তান ছিলেন। তারা খলিফাকে রক্ষার জন্য যেভাবে এগিয়ে আসা উচিত ছিল সেভাবে এগিয়ে আসে নাই।

কোরায়েশ ও আনসারদের পরবর্তী পর্যায়ে ছিল আরবের সাধারণ অধিবাসী। এদের মধ্যে ইরাক, সিরিয়া, হেজাজ ও ইয়েমেনের মুসলমানগণ অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিমগন হতে নিজদিগকে উৎকৃষ্ট ও উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করত। কারণ তারা হজরত আবুবকর (রা.) ও হজরত ওমর (রা.) এর যুগে ইসলামের বিজয় অভিযান সমূহে অংশগ্রহণ করত এবং তাদেরই বীরত্ব ও তেজ ইসলামি রাষ্ট্রকে দুনিয়ার ইতিহাসে স্থায়িত্ব দান করেছিল পক্ষান্তরে মক্কার কোরায়েশগণ ইরাক, প্রভৃতি অঞ্চলের সাধারণ মুসলিমদিগকে নিজেদের সমপর্যায়ে গণ্য করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসন দিতে কখনও রাজি হয় নাই। তাহা ছাড়া উমাইয়াদের উদ্ধত্য ও আভিজাত্যের গর্ব সাধারণ আরবদের মনে খুব পীড়া দিত। সাধারণ আরবদের ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। যখন দেখা যায় হজরত ওসমান (রা.) বহু সুযোগ্য গভর্নরকে পদচ্যুত করে তাদের স্থলে নিতান্ত তরুন ও শাসন কাজের অনভিজ্ঞ উমাইয়াদের নিয়োগ করেন।

আরব দেশের বাইরে যেসব এলাকা মুসলিমগণ দখল করেছিল সেসব এলাকার অধিবাসীগণই অনাআরব। তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। অবশিষ্ট লোকেরা স্বধর্মে বহাল ছিল। এরাই জিম্মি নামে পরিচিত। তাদেরকে খলিফা ওমর (রা.) নিয়মিত জিজিয়া প্রদান ও আনুগত্য সাপেক্ষে সাধারণ আরবদের তুল্য অধিকার প্রদান করেছিলেন। তারা যাতে তাদের বাড়িঘর ও জমি জমা হতে উৎখাত না হয় সে সম্পর্কে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু খলিফা ওসমান (রা.) এর আমলে ভূমি হস্তান্তরের ব্যবস্থা প্রণয়ন করায় জায়গিরদারি ও জমিদারি প্রথার উদ্ভব তাদেরকে দ্রুত অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়েছিল। ভূ-স্বামীগন প্রায় সকলেই কোরায়েশ ছিলেন তাদের অধীনে কিছু সংখ্যক লোকের অন্ন সংস্থান ব্যবস্থা হলেও গোটা জাতি ধীরে ধীরে নিঃস্ব হতে চলেছিল। তাছাড়া এই সময় তাদের প্রতি কতিপয় নতুন কর ও ধার্য করা হয়। ফলে বিজিত জাতিগুলোর মধ্যে যারা চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ছিল তারা মনে মনে খলিফার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। বিজিত দেশ সমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনআরবগণ এইভাবে খলিফার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ায় খলিফার প্রতি একটি অবশ্যম্ভাবী দুর্যোগ ঘনিয়ে আসল।

ভূ-স্বামী ও ধনী ব্যবসায়ীগণের জীবন যাপন প্রণালী এই সংঘাতকে আরও দ্রুততর করে নিচ্ছিল। কারণ আরব জাতি বিগত কয়েক বছরে তাদের পাশ্ববর্তী কতিপয় প্রাচীন সভ্য জাতির সংস্পর্শে এসে এসব জাতির জীবন ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। মাত্র দেড় দুই যুগ আগেও যারা কাঁচা মাটির ঘরে অর্ধাহারে দিন কাটাত। এখন তারা বিপুল ধনের মালিক। এই সদ্য সৌভাগ্যে তাদের আত্মগরিমা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক বৈকি। চির বুভুক্ষু লোকের সম্মুখে আজ সকল প্রকার ভোগের দরজা উন্মুক্ত। সুতরাং সামর্থবান জমিদারগণ পারসিক অথবা রোমক সামন্ত রাজাদের অনুকরণে জীবন যাপন শুরু করে। তারা বহু দাস দাসী কর্মচারী ও প্রজাপু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় গৌরব বোধ করত। এদের মোসাহেব, স্তাবক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবক দলেরও অভাব হতোনা। কেননা এই শ্রেণির লোকেরা এই ব্যবসায়ের দ্বারা নিশ্চিন্ত ভরন পোষণের ব্যবস্থা করে নেয়। অনেকে অনাহুত হিতৈষী বন্ধু বা আমোদ-প্রমোদের সহচর হিসেবেও ধনীদের খাবার টেবিলে নিত্যকার শরিক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করত। এই ধরনের সৌখিন ও বিলাস জীবন যাপনে ধনী জমিদার ও জায়গিরদারদের আর যাই হোকনা কেন আরও বেশি আয়ের প্রয়োজন হতো। এজন্য তাহাদের প্রজাদের ওপর চাপ পড়ত মারাত্মকভাবে। তারা তাদের ওপর নির্মমভাবে শোষণ চালাতো। প্রজাগণ ক্রমশই নিঃস্ব হতে নিঃস্বতর হয়ে পড়ল। একদিকে ঐশ্বর্যের মোহে গঠিত বিলাসী নিষ্ঠুর জমিদার আর অন্যদিকে কপর্দকহীন রিক্ত মজুর দলে সমাজ বিভক্ত হলো। সমাজের এই বিভেদ পরবর্তীকালে আর কখনও বিদূরিত হয় নাই বরং ক্রমশ ব্যাপকতর রূপ ধারণ করেছে।

রসুলে করিম (দ.) এর প্রধান সাহাবাগণ তখনও যারা জীবিত ছিলেন তাঁরা যখন দেখলেন, নবির (দ.) একটি মৌলিক নীতি ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য মোচন এখন প্রতিপালিত হচ্ছে না বরং এতদিন যে সাম্য নীতির প্রভাবে ইসলাম গৌরবমন্ডিত ছিল, তা বিলুপ্ত হয়ে নতুন করে বিভেদ সৃষ্টির ব্যবস্থা শুরু হয়েছে, দুঃস্থ নির্যাতিতের দীর্ঘশ্বাসে আরবের বায়ু বিষাক্ত হয়ে ওঠেছে। তখন ঐ সাহাবিদের অন্তর ব্যথিত না হয়ে পারলনা। তারা সকলে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলেন। যেসব সাহাবি হজরত ওসমান (রা.) এর বিভিন্ন কর্মকান্ড চ্যালেঞ্জ করে বসেন তাদের অন্যতম হলেন, হজরত আবু জর গিফারি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আমার বিন ইয়াসির।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন। কোরআন কণ্ঠস্থ করার, উহার বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ তিনি শ্রেষ্ঠতম সাহাবাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আবিসিনিয়া ও মদিনায় হিজরত করেছিলেন। বদর, ওহুদ প্রভৃতি জিহাদে তিনি রসুল (দ.) এর সংঙ্গী ছিলেন। বদর প্রাঙ্গণে ইসলামের জঘন্যতম দুশমন আবু জাহেলের শিরোচ্ছেদ তিনিই করেছিলেন। তিনি সর্বদা রসুলুল্লাহ (দ.) এর সঙ্গে থাকতেন। তাঁকে সবাই রসুলুল্লাহ (দ.) এর পরিবারভূক্ত মনে করত। রসুল (দ.) এর ওফাতের পর তিনি সিরিয়ার জিহাদে অংশগ্রহণ এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন কিন্তু হজরত ওমর (রা.) তাকে কুফায় প্রেরণ করলেন। কুফাবাসীদের তিনি লিখলেন তোমরা ইবনে মাসউদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করো। আমি নিজের অভাব বাকি রেখে তাকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। অতঃপর তিনি কুফায় বায়তুল মালের খাজাঞ্চী নিযুক্ত হন। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এর (রা.) পদচ্যুতির পরও অলিদ বিন ওবার প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। তৎপর তাকে তথা হতে সিরিয়া আসতে হয়। কারণ গভর্নর অলিদ বায়তুল মাল হতে কিছু কর্জ নিয়েছিলেন। কর্জ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হলে ইবনে মাসউদ (রা.) তা আদায়ের জন্য তাকিদ দিলেন। অলিদ টালবাহানা শুরু করতে থাকলে ইবনে মাসউদ (রা.) পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। এতে অলিদ তাঁর বিরুদ্ধে এক ঘোরতর অভিযোগ করে খলিফার দরবারে পত্র প্রেরণ করলেন। তখন খলিফা ইবনে মাসউদ(রা.) কে লিখলেন ঃ তুমি আমার খাজাঞ্চি ! অলিদ বায়তুল মাল হতে যে অর্থ গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে তুমি পীড়াপীড়ি করোনা। ইবনে মাসউদ (রা.) এতে অসন্তুষ্ট হলেন এক বায়তুল মালের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে গৃহে আশ্রয় নিলেন।

হজরত ওসমান (রা.) কোরআন শরিফ একত্রে সন্নিহিত করে জায়েদ ইবনে সাবেতের তত্ত্বাবধানে কতিপয় ব্যক্তিবর্গকে তা লিপিবদ্ধ করার ভার দিলেন। অন্যান্য নোসখা (কপি) জ্বালিয়ে দিলেন। বহু মুসলমান ইহা পছন্দ করলেন না। ইবনে মাসউদ (রা.) এর বিরোধিতায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটল। তিনি কুফায় প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে ওয়াজ করতে লাগলেন। ইবনে মাসউদ (রা.) বলতেন, সর্বাপেক্ষা সত্য বাণী কোরআনের, সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্র মুহম্মদ (দ.), এর সবচাইতে নিকৃষ্ট কাজ বেদআত এবং প্রত্যেক নতুন কাজই বেদআত। প্রত্যেকটি বেদআত গোমরাহী এবং প্রত্যেকটি গোমরাহই আগুণে নিক্ষিপ্ত হবে (এ ‘বেদাআত’

বলতে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পলিসিতে যে সব সংযোজিত হয়েছে তা বুঝানো হচ্ছে। আমরা বেদআতকে যেমন সীমিত অর্থে বুঝে থাকি তা নয়।) ওপরুন্তু এসব অভিযোগ যে সরাসরি হজরত ওসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে ছিল তা বলার অপেক্ষাই রাখে না।

অলিদ এই বিষয় উল্লেখ করে খলিফাকে পত্র দেন। তিনি এও লিখলেন যে এটা খলিফার প্রতি আঘাত স্বরূপ। খলিফা তাকে মদিনায় পাঠিয়ে দিতে বললেন। সেই অনুসারে তাকে মদিনায় প্রেরণ করা হলো। কুফা হতে ইবনে মাসউদের (রা.) বহিস্কারের সময় কুফাবাসীগণ খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠেছিল।

ইবনে মাসউদ (রা.) মদিনায় পৌছে যখন মসজিদে নব্বিতে প্রবেশ করলেন খলিফা তখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে খোতবা দিচ্ছিলেন। ইবনে মাসউদ (রা.) কে দেখে তিনি বলে উঠলেন, ঐ দেখ ! নষ্টের কীট আসছে, যে পাতে খায়, সেখানেই বমি করে, মলত্যাগও করে। ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন: আমি নিশ্চয়ই সেরূপ নই। আমি বইয়াত এ বেদওয়ান ও বদরে রসুলুল্লাহ (স.) এর সংঙ্গী ছিলাম।

অতঃপর ইবনে মাসউদকে (রা.) খলিফার নির্দেশে জোর পূর্বক মসজিদ হতে বের করে দেয়া হলো। বের করে দেয়ার সময় তাঁকে সজোরে মাটিতে ফেলে দেয়া হলো। এই আঘাতে তার পশ্চাদ্দেশের হাড় ভেঙে গেল। ইহা দেখে হজরত আলী (আ.) ওঠে দাঁড়ালেন এবং খলিফার কাজের প্রতিবাদ করে বললেন আপনি অলিদের কথায় এইসব করছেন ? খলিফা বললেন না আমি অলিদের কথায় এইসব করছি না। আমি জোবাইদ ইবনে কাসিরকে পত্র লিখেছিলাম। তিনি শুনেছেন যে ইবনে মাসউদ (রা.) আমার খুন বৈধ সাব্যস্ত করেছে। হজরত আলী (আ.) বললেন, যোবাইদ নির্ভরযোগ্য লোক নয়। অতঃপর আলী (আ.) ইবনে মাসউদ (রা.) কে গৃহে পৌছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বললেন।

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) ছিলেন মক্কার ইসলামের জন্য নির্যাতন ভোগকারীদের অন্যতম। তাঁর পিতা ও মাতা যথাক্রমে মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে প্রথম শহিদ। হজরত আম্মার (রা.) প্রথমে হাবসায় পরে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, সর্বপ্রথম মক্কায় আশ্মারের (রা.) গৃহেই নামাজের মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মসজিদে নব্বি নির্মাণে অংশগ্রহণের সময় তিনি দুইখানা করে ইট বহন করতেন। একদিন লোকের মধ্যে এরূপ কানা ঘুষা শোনা গেল যে খলিফা নিজ প্রয়োজনে বায়তুল মাল হতে কিছু মণি-মুক্তা নিয়েছেন এবং পরিবারের কারো অলংকারাদিতে ব্যবহার করেছেন। এই সংবাদে মুসলমানগণ খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু খলিফাও এতে রাগান্বিত হলেন এবং ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, আমি রাজস্ব হতে নিজ প্রয়োজন মত গ্রহণ করবো। ইহাতে তোমাদের কিছু লোক যদি অসন্তুষ্ট হও তাহা হতে পারো। ইহাতে হজরত আলী (আ.) বললেন, ইহাতে আপনাকে অবশ্যই বাধা দেয়া হবে।

আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.) বললেন, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি এই কাজে আমি সর্বপ্রথম প্রতিবাদী। খলিফা রাগান্বিত হয়ে বললেন, বাঁদীর বাচ্চা ! আমার প্রতি "এতখানি বাড়াবাড়ি ? ধর ওকে।" সুতরাং আমার (রা.) ধৃত হলেন। অতঃপর খলিফা তাকে এরূপ প্রহার করলেন যে আম্মার (রা.) সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। উম্মুল মুমেনিন হজরত উম্মে সালমার গৃহে তাঁকে উঠিয়ে আনা হলে সেখানে তিনি সারাদিন বেহুশ অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায় যোহর, আসর ও মাগরিবের নামাজ ছুঁটে গেল। অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে আসলে তিনি ওজু করত: নামাজ পড়ে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বললেন– আয় আল্লাহ ! তোমার অজস্র শুকরিয়া আদায় করছি। তোমার পথে এই নির্যাতন আমার প্রতি আজ নতুন নয়।

বর্ণিত আছে, হজরত উম্মে সালমা ও হজরত আয়েশা (রা.) রসুলুল্লাহ এর পবিত্র কেশ তারই বস্ত্র এবং জুতা বের করে বললেন, এই দেখ রসুল (দ.) এর ব্যবহৃত এইসব দ্রব্যাদি পুরাতন হয়নি অথচ তোমরা তাঁর আদর্শ ভুলে যাচ্ছ। হজরত ওসমান (রা.) ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু কি করতে হবে বুঝতে না পারায় চলে গেলেন। অন্য আর একদিন খলিফার কার্যকলাপের প্রতিবাদ করে কিছু সংখ্যক সাহাবি একখানা সারকলিপি পেশ করেন। হজরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) এই স্মারকলিপি খলিফার নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন। খলিফা এইজন্য তাকে তিরস্কার করেন এবং জুতা পরা অবস্থায় এমনভাবে পদাঘাত করেন যে, ইহাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.) হজরত আবু জর (রা.) এর প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। খলিফা মনে করলেন আবু জরের (রা.) বহিষ্কারে অবশ্যই আম্মারের আপত্তি থাকবে।

সুতরাং হজরত আম্মার (রা.) কেও যেতে নির্দেশ দিলেন। আম্মার (রা.) মদিনা ত্যাগের বন্দোবস্ত করলে তার মৈত্রী গোত্রের চাপ ও হজরত আলী (আ.) এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়। হজরত ওসমান (রা.) এর কিছু অর্থনৈতিক নীতি ছাড়াও তাঁর শাসন আমলে তার কতগুলি কার্যকলাপ মুসলিম উম্মাহর ও কিছু সংখ্যক 'জলিল উল কদর' সাহাবাগণের দৃষ্টিতে কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিতর্কিত বা অবৈধ ও স্বেচ্ছাচারী আচরণ হিসেবে গণ্য হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করল। এ' কর্মকান্ডগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপ–

১। **ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর** (রা.) **এর বিচার :** হজরত ওসমান (রা.) খলিফা হওয়ার পরেই সর্বপ্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হন তা ছিল ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক হজরত ওমর (রা.) এর হত্যাকারীর হত্যাকান্ডের বিচার। আবু লুলু ছিল হজরত ওমর (রা.) এর হত্যাকারী। আবু লুলুকে গ্রেপ্তার করার পূর্বেই সে কয়েকজন লোককে আহত করে আত্মহত্যা করেছিল। তাই তার জবানবন্দী গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। অর্থাৎ এই হত্যাকান্ডে আর কেউ জড়িত ছিল কিনা তা জানার বৈধ প্রক্রিয়া ছিল না।

হজরত ওমর (রা.) এর শাহাদতের পর তাঁর পুত্র ওবায়দুল্লাহ উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে বের হয়ে এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত মনে করে প্রথমে হরমুনকে (মুসলমান) হত্যা করেন। তারপর জুফাইনাকে (খ্রিস্টান) হত্যা করেন। তাঁকে হত্যা করে তরবারি দিয়ে তার চোখ চিরে দেন। অতঃপর আবু লুলুর ঘরে গিয়ে তার কন্যাকেও হত্যা করেন।

অতঃপর খলিফার বিচারের জন্য ওবায়দুল্লাহকে আটক করা হলো। ওবায়দুল্লাহ নিজ হাতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন। যা' আইনের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। তদুপরি তিনি যাকে হত্যা করেছিলেন তারা যে প্রকৃতপক্ষেই তার পিতার হত্যাকারীর সাথে জড়িত ছিল তার কোন প্রমাণও ছিল না। সুতরাং শরিয়তের বিচারে তিনি একজন মুসলিম ও দুইজন জিম্মির প্রাণ হরণের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড বিধান ছিল অনিবার্য।

হজরত আলী (আ.) ও অন্যান্য ফকিহ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ওবায়দুল্লাহকে শাস্তিদানের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। পক্ষান্তরে একদল লোক বলতে লাগল । "সেদিন হজরত ওমর (রা.) কে শহিদ করা হলো। আজ আবার তাঁর পুত্রকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হচ্ছে। হজরত ওসমান (রা.) উদার পথই অবলম্বন করলেন। তিনি নিহত ব্যক্তিদের পক্ষে রাষ্ট্র প্রধান তথা অভিভাবক হিসেবে ওবায়দুল্লাহকে মৃত্যুদন্ড হতে মুক্তি দিলেন।" আর বায়তুল মাল থেকে অর্থ দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় করলেন। সমস্যার সমাধান হলো বটে। তবে আইনজ্ঞ সাহাবি ও সাধারণ জনগণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হলো। হজরত ওমর (রা.) এর পুত্র হওয়ার কারণেই ওবায়দুল্লাহর ক্ষেত্রে কোরআনের আইনের ব্যাখ্যাজনিত জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড শাস্তি প্রদান করা হলো না বা রহিত করা হলো। অর্থাৎ কোরআনের বিধান সর্বক্ষেত্রে সমভাবে পালনীয় নয় সমাজে এই ধারণা সৃষ্টি হলো। এই কারণেই ওবায়দুল্লাহ পরবর্তীতে মাবিয়ার পক্ষে যোগদান করেন ও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে হজরত আলী (আ.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

২। **কোরান মজিদ দগ্ধকরণ :** ওসমান (রা.) একটি কোরআন সংকলন কমিটি গঠন করে নির্ভরযোগ্য সাহাবিদের সহযোগীতায় সরকারি তত্ত্বাবধানে কোরআন সংকলন করেন। অতঃপর তার কপি প্রস্তুত করে মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, দামেস্ক প্রভৃতি প্রাদেশিক প্রধান শহরগুলোতে প্রেরণ করেন এবং উহা সরকারি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন এবং এইসব কপি ছাড়া অন্যান্য সকল কপি জ্বালিয়ে ফেলেন। কুফায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) দাবি করেন যে তাঁর নিজ হাতে সংকলনকৃত কোরআন সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল। কারণ আয়াতগুলো যখন রসুল (দ.) এর পবিত্র জবান মোবারক হতে বের হয়েছে, তখনই সেইভাবেই তিনি তা লিখে রেখেছিলেন। সুতরাং সেই সংকলনখানি পুড়িয়ে ফেলা কিছুতেই ঠিক হয়নি। এই বলে তিনি খলিফার বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালাতে লাগলেন। খলিফার এই কাজ নিছক ধর্ম বিরুদ্ধ। তাই ছিল এই প্রচারণার মূল কথা। যেহেতু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) একজন কোরআনের বিশেষজ্ঞ সাহাবা ছিলেন তাই তার বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে জনগণ গ্রহণ করতে লাগল।

৩। **নামাজে সেজদা বৃদ্ধি :** হজরত ওসমান (রা.) হজ সংক্রান্ত কোন কোন ব্যাপারে নব বিধান চালু করার জন্য সমালোচনা ও আন্দোলনের শিকার হন। তিনি মিনায় কোরবাণী সম্পাদন উপলক্ষ্যে দুই/এক দিন অবস্থান করার সময়ে সেখানে তাবু স্থাপন করেছিলেন। এধরনের ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটেনি। মিনায় ও আরাফার পাহাড়ে ইতোপূর্বে যে কয় রাকাত করে নামাজ আদায় করা হতো, ওসমান (রা.) তার ওপর আরও দুই রাকাত নামাজ বেশি পড়বার নির্দেশ দেন এবং এতে মোট চারটি সিজদাহ অতিরিক্ত দিতে হয়। অনেকেই এই নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন যে পূর্ববর্তী দুই খলিফার আমলে কোনদিন এরূপ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রসুলে করিম (দ.) হজের ব্যাপারে যে সকল রীতিনীতির প্রচলন করেছিলেন, পরবর্তী খলিফাদের আমলেও তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হওয়ায় এবং কেহ উহার বিন্দু-বিসর্গ অন্যথা না করায় ঐ সকল রীতিনীতি ও কাজকর্মের একটি ক্ষুদ্রতম অঙ্গও যথাযথভাবে পালনের দায়িত্বও জনগনের মনে একটি অতীব শ্রদ্ধাপূর্ণ বিধানে পরিণত হয়। তা অনুমাত্র ব্যত্যয়ও সবাই ভয়ানক গুণাহের কাজ মনে করত। অর্থাৎ নবি (স.) যা'প্রচলন করেছেন তার কম করাও অন্যায় বেশি করা ও অন্যায়। এ ধারণাই সমাজে চালু ছিল। সুতরাং সাহাবাগণ খলিফা ওসমান (রা.) কে এই নতুন বিধি প্রণয়নের শরিয়তি ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। কিন্তু খলিফা এ' সম্পর্কে কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তাঁর কথায় প্রকাশ পায় যে তিনি ইহা উত্তম মনে করেন। তাছাড়া ইয়েমেনের লোকজন হজব্রতে এসে সুদূরে অবস্থিত তাদের বাড়িঘর ও স্ত্রী পুত্র পরিজনের কুশল এবং কল্যাণের জন্য অতিরিক্ত নামাজ পড়ত। নবির (দ.) আচরিত বিধির খেলাফ বলে তুমুল আন্দোলন গড়ে ওঠে। এমনকি ওসমান (রা.) কে যিনি নানা কৌশলে খলিফা নিয়োগকারী সেই আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এই ব্যাপারটি অনুমোদন করেননি। স্বয়ং নবিজি (দ.) এর পবিত্র বিধানের বিপরীত কার্যের ফলে সাহাবা মহলেও তার এমন একটি দুর্নাম রটে যা তার পক্ষে ভবিষ্যতে সমূহ ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

৪। **কছর নামাজ প্রসঙ্গ :** খলিফা ওসমান (রা.) মক্কায় গিয়ে কছর নামাজ পড়তেন। পুরো নামাজ আদায় করতেন এই ব্যাপারেও সাহাবা ও ওলামা সম্প্রদায়ের আপত্তি ছিল। তাদের প্রশ্নের জবাবে ওসমান (র.) বলেন আমি নিজেকে মক্কায় স্থায়ি অধিবাসী (মুকিম) বলে মনে করি এবং এ কারণেই মক্কায় তিনি নামাজের কছর (প্রবাসকালীন নামাজ) পরিত্যাগ করেন মর্মে মত প্রকাশ করেন।

এ' প্রসঙ্গে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অভিমত ছিল রসুল (দ.) এর হিজরতের পর থেকে প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাথে মক্কার স্থায়ি বাসের তথা নাগরিকতার সম্পর্ক তিরোহিত হয়েছে। রসুল (দ.) এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন । অর্থাৎ রসুল (দ.) মক্কায় গিয়ে কছরের নামাজ পড়তেন। ওসমান (রা.) পূর্ববর্তী দুই খলিফাও অনরূপ নীতি অবলম্বন করেন। তাই হঠাৎ করে ওসমান (রা.) প্রবর্তিত ধর্মীয় এই নব বিধানও তার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে।

৫। **মদিনার মসজিদ সম্প্রসারণ :** ওসমান (রা.) মদিনার মসজিদ সম্প্রসারণ করতে গিয়ে জমির মালিকদের কাছ হতে প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। তিনি সে বাধা অবহেলা করে কার্য সাধন করেন। শেষ পর্যন্ত যাদের জমি হুকুম দখল রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়েছিল, তারা জমির অস্বাভাবিক মূল্য দাবি করায় খলিফা তাদেরকে কারারুদ্ধ করেন। এই ঘটনার ফলে মদিনার বহু লোক খলিফার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।

৬। **পশুচারণ ভূমি নির্ধারণ :** পূর্বে বাকি নামক চারণ ভূমিতে সর্বসাধারণের অধিকার ছিল। কিন্তু খলিফা ওসমান (রা.) সরকারি সদকার পশুগুলির খাদ্যের জন্য তা সরকারি খাস চারণ ভূমি হিসেবে সংরক্ষণ করেন এবং এতে জনগণের অধিকার খর্ব করে দেন। এ ব্যাপারে মদিনার লোকেরা প্রতিবাদ মুখর হন এবং এতে খলিফার নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে বলে প্রচার করে। শরিয়তি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ বলতে থাকেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ.) পানি, বাতাস, আগুণ ও চারণ ভূমির ওপর জনসাধারণের অবাধ অধিকার দান করেছেন। সেক্ষেত্রে এই অধিকার খর্ব করার অধিকার খলিফার নাই।

খলিফার উল্লেখিত বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কোরআন, হাদিস ও এমনকি পূর্ববর্তী দুই খলিফার খেলাফ নীতি প্রবর্তন করার জন্য জ্ঞানী সাহাবিবৃন্দ খলিফার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এহেন পরিস্থিতিতে হজরত ওসমান (রা.) সহ অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিরুদ্ধে তুমুল গণ আন্দোলন গড়ে উঠল। এমনকি কোরআন

সংকলনের প্রধান ব্যক্তি জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.), কবি হাসসান (রা.) তার ভ্রাতা কাব ইবনে মালিক আবু ওয়াসিদ প্রমুখ যারা এতদিন খলিফার একান্ত অনুগ্রহভাজন ছিলেন তারা এবং খলিফার অনেক নিকট আত্মীয়ও খলিফার বিরোধী দলে যোগদান করেন।

ইতোমধ্যে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের আন্দোলনকারীরা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা একযোগে কুফা, বসরা, মিশর হতে মদিনায় উপস্থিত হয়ে খলিফার নিকট দাবি দাওয়া পেশ করবে এবং সবাই একযোগে এর প্রতিকার দাবি করবে। খলিফা তাদের দাবি দাওয়া মেনে না নিলে তারা তার পদত্যাগ দাবি করবে। অচিরেই বিদ্রোহিরা মদিনার উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করল। বিদ্রোহিদের প্রতিনিধি দল খলিফার সমীপে তাদের কিছু অভিযোগ ও দাবি উত্থাপন করে এর আশু প্রতিকার দাবি করল। খলিফা বিভিন্ন অভিযোগের সন্তোষজনক উত্তর দিলেন। উত্তর শুনে বিদ্রোহিগণ খুশি হল এবং তাদের হঠকারিতার জন্য খলিফার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করল। খলিফা তাদের ক্ষমা করে দিলেন। খলিফা ও বিদ্রোহিদের ভিতর এই সমঝোতার ব্যাপারে হজরত আলী (আ.) এর ভূমিকাই ছিল প্রধান। খলিফা তার ওয়াদা পালনে স্থির থাকবেন বলে তার পক্ষে আলী (আ.) নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। বিদ্রোহিদের প্রতিনিধিগন খলিফার নিকট হতে পরিষ্কার আশ্বাস লাভ করে শিবিরে অবস্থানরত বিদ্রোহিদের কাছে গিয়ে তা বিবৃত করল এবং তারা তাদের শিবির উঠিয়ে যার যার দেশে রওয়ানা করল।

এদিকে খলিফা বৈঠকে বিদ্রোহিদের দাবি দাওয়া মেনে নিলেন এবং তার আশু ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু তিনি সেখান হতে ওঠে ঘরে যাওয়া মাত্র মারওয়ান সেখানে উপস্থিত হল এবং খলিফার মনোভাব পরিবর্তন করে ফেলে। পরবর্তীতে খলিফার কাজ কর্মে সেই পরিবর্তনেরই লক্ষন দেখা দিল। কারণ খলিফার তরফ থেকে বিদ্রোহিদের দাবি দাওয়া পূরণের কোন আভাসই দেখা গেলনা। বিদ্রোহি নেতাগণ আবার রুদ্র মূর্তি ধারণ করল। তারা পুনরায় মিশর, কুফা, বসরার বিদ্রোহি জনতা একত্র করে মদিনা অভিমুখে ধাবিত হল। সুরণ রাখতে হবে এই বিদ্রোহিদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০/২২ হাজার। যাহোক, খলিফার কানে এই সংবাদ পৌঁছামাত্র এবারও তিনি আলী (আ.) ও মুহম্মদ বিন মুসলিমকে তাদের নিকট প্রেরণ করতে চাইলেন কিন্তু হজরত আলী (আ.) খলিফার পূর্বের আচরণের জন্য বর্তমানে এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করলেন। মুহম্মদ বিন মুসলিম বললেন, আমি আল্লাহর সাথে এক বৎসরে দুইবার ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারবো না। অবশ্য এতদসত্ত্বেও এবারও তারা মদিনার নাগরিকদের সাথে একত্রিতভাবে বিদ্রোহিদের শহরে প্রবেশ না করার ব্যাপারে একমত ছিলেন।

এহেন পরিস্থিতিতে বিদ্রোহিগণ উম্মুল মুমেনিনদের নিকট এবং শহরের বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট এই বলে প্রতিনিধি পাঠাতে লাগল যে খলিফা কিছুদিন পূর্বে যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন তা ভঙ্গ করেছেন। আমাদের দাবি শুধু এইটুকু তিনি তার অত্যাচারী গভর্নরগণকে পদচ্যুত করত: তাদের বদলে সং ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক নিয়োগ করুন।

এদিকে পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য খলিফা মসজিদে নব্বিতে সভা আহ্বান করলেন। হজরত তালহা (রা.) দাঁড়িয়ে তার সাথে কঠোর ভাষায় তর্ক করলেন। হজরত আয়েশা (রা.) এর নিকট হতে পয়গাম আসল যে, আবদুল্লাহ ইবনে সারাহর মত ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে সাহাবি হত্যার অভিযোগ আছে তাকে কেন খলিফা মিশরের শাসনকর্তার পদ হতে অপসারণ করছেন না।

হজরত আলী (আ.) এই মত সমর্থন করলেন। তখন খলিফা বললেন, মিশরের বিক্ষোভকারীরা নিজেরাই তাদের শাসনকর্তা নির্বাচিত করুক। আমি তাকেই আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারার স্থানে নিযুক্ত করব (অর্থাৎ খলিফা কর্তৃক নিয়োজিত অযোগ্য ও দুনীতিপরায়ণ। কর্মকর্তার ব্যর্থতা প্রমাণিত হওয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন)। যাহোক, বিদ্রোহিদের পক্ষ হতে মুহম্মদ ইবনে আবুবকরের নাম প্রস্তাব করা হলো। হজরত ওসমান (রা.) তৎক্ষণাৎ তার নামে ফরমান লিখে দিলেন। মুহম্মদ ইবনে আবুবকর কিছু সংখ্যক মুহাজের ও আনসারকে সঙ্গে নিয়ে মিশরের পথে রওয়ানা হলেন। বিদ্রোহিদের একটি দাবি তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ হওয়ায় সকল এলাকার বিদ্রোহিরাই মনে করল এবার খলিফা তাদের প্রতি সুবিচার করবেন। তাদের অভাব অভিযোগের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখবেন– যেমন মিশরিয়দের ক্ষেত্রে চোখের সম্মুখেই ব্যবস্থা করতে দেখা গেল।

বিদ্রোহিদের মদিনা ত্যাগের পর কয়েকদিন রাজধানি বেশ শান্তিপূর্ণ রইল। কোনখানে কোনরূপ গোলযোগ, ষড়যন্ত্র বা শলাপরামর্শও দেখা গেল না। মানুষের মন হতে চিন্তা ও আশঙ্কার ভাব অনেকটা দূরীভূত হলো। খলিফা নিয়মিতভাবে মসজিদে আসেন ও জামাতে ইমামতি করেন। কোন অসুবিধা বা বাধা বিপত্তি নাই। কিন্তু সহসা একদিন জনগণ পরম বিস্ময়ে শুনতে পেল মদিনার অলিগলি 'ইনতেকাম', 'ইনতেকাম' (প্রতিশোধ-প্রতিশোধ) আওয়াজে প্রকম্পিত হচ্ছে। এদের এরূপ হঠাৎ প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা হজরত ওসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে এমন এক অভিযোগ করল যা শুনে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা বলল, মুহম্মদ ইবনে আবুবকরের কাফেলা তৃতীয় মঞ্জিলে পৌছিবার পর দেখা গেল জনৈক রাজকীয় উষ্টারোহী দ্রুতবেগে মিশরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মুহম্মদ ইবনে আবুবকরের সঙ্গীগণ তাকে ধরে ফেললেন। তারা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে এবং কোথায় যাচ্ছ ? লোকটি উত্তরে বলল, আমি আমিরুল মোমেনিন এর ক্রীতদাস, মিশরের শাসনকর্তার নিকট যাচ্ছি।

লোকেরা মুহম্মদ ইবনে আবুবকরকে দেখিয়ে বললেন ইনি মিশরের শাসনকর্তা। লোকটি বললেন, ইনি নন। এই বলে সে চলতে আরম্ভ করল। লোকেরা তাকে পুনরায় ধরে ফেলল। এবং তল্লাশী করলে তার নিকট একটি পত্র পাওয়া গেল। পত্রটিতে হজরত ওসমান (রা.)

এর সিলমোহর লাগানো ছিল এবং মাবিয়ার উদ্দেশ্যে লেখা ছিল "মোহাম্মদ ইবনে আবুবকর ও তার অমুক অমুক সঙ্গী যখনই তোমার নিকই পৌছবে, সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে এবং অভিযোগকারীকে দ্বিতীয় নির্দেশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বন্দী করিয়া রাখিবে।"

বিদ্রোহিরা বলতে লাগল। হজরত ওসমান (রা.) আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আমরা উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করব। হজরত আলী (আ.), হজরত তালহা (রা.) হজরত জোবায়ের (রা.) ও হজরত সাদ (রা.) প্রমুখ অনেক সাহাবিই সমবেত হলেন, বিদ্রোহিগণ হজরত ওসমান (রা.) এর বলে কথিত পত্রটি তাদেরকে দেখাল। খবর পেয়ে হজরত ওসমান (রা.) ও তথায় আগমন করলেন। হজরত আলী (আ.) হজরত ওসমান (রা.) কে বললেন, এই গোলাম কি আপনার ? হজরত ওসমান (রা.) হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন অনুরূপভাবে কথিত উষ্ট্রি ও সীলমোহরও হজরত ওসমানেরই (রা.) ছিল বলে তিনি স্বীকার করলেন। তবে আল্লাহকে হাজির জেনে তিনি শপথ করে বললেন যে এই পত্র আমি লিখি নাই বা কাউকে লিখার জন্য নির্দেশ দেই নাই। এমনকি এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। বললেন: পত্রের লিপি পরীক্ষা করে দেখা গেল উহা মারওয়ানের হস্তাক্ষর। এই সময় মারওয়ান হজরত ওসমান (রা.) এর গৃহেই অবস্থান করছিল। লোকেরা দাবি তুলল, আপনি মারওয়ানকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। কিন্তু হজরত ওসমান (রা.) উহা করতে অস্বীকার করলেন। ফলে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। হজরত ওসমান (রা.) যে মিথ্যা শপথ করতে পারেন না তা অনেকেই বিশ্বাস করল কিন্তু মারওয়ানকে তাদের হাতে তুলে না দেয়ায় জনতা বিদ্রোহি হয়ে গেল। তিনি মারওয়ানকে কোন অবস্থাতেই তাদের হাতে তুলে দিবেন না বলে জানিয়ে দিলেন।

এইবার বিদ্রোহিরা হজরত ওসমান (রা.) এর গৃহ অবরোধ করে বসল। তাদের দাবিও পাল্টিয়ে গেল। এখন তারা খলিফারই পদত্যাগ দাবি করতে লাগল। হজরত ওসমান (রা.) জবাব দিলেন। আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি আল্লাহ প্রদত্ত এই মর্যাদা ত্যাগ করতে পারব না। দীর্ঘ চল্লিশ দিন ধরে অবরোধ চলে খলিফার গৃহে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হলো। বিদ্রোহিরা প্রচার করল যে, মারওয়ানকে বিদ্রোহিদের হাতে সোপর্দ করা না হলে হজরত ওসমান (রা.) কে হত্যা করা হবে।

এই খবর শুনে হজরত আলী (আ.) সত্বর হজরত হাসান (আ.) ও হজরত হোসেন (রা.) কে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা গিয়ে উন্মুক্ত তরবারি হাতে খলিফার দরজা পাহারা দিবে, কোন বিদ্রোহিই যেন গৃহে প্রবেশ করতে পারে না।

৩৫ হিজরির ১৮ জিলহজ মোতাবেক ১৭ জুন ৬৫৬ বিদ্রোহিরা খলিফার প্রাসাদ আক্রমণ করল। বিদ্রোহিরা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হজরত ওসমান (রা.) কে কোরআন পাঠরত অবস্থায় হত্যা করল। তার স্ত্রী নায়লা তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে তার কয়েকটি অঙ্গুলি কেটে যায়। (ইন্নালিল্লাহে ---- রাজেউন)। জার্মান ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসনের মতে ওসমানের (রা.) হত্যা ইসলামের ইতিহাসের জন্য যে কোন ঘটনা

হতে অধিক যুগান্তকারী। এই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হাতে খলিফার প্রাণ বিসর্জন হলো। এতে খেলাফতের পবিত্রতা ও খলিফার দৈহিক নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হলো। অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ খলিফার পদচ্যুতি বা হত্যা সম্পর্কে নানা মতবাদ গড়ে ওঠে। হজরত ওসমান (রা.) কে হত্যা মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের দ্বার উম্মোচন করে। এই গৃহযুদ্ধ একবার আরম্ভ হয়ে আর কখনও বন্ধ হলো না। মুসলিম জামাতের ঐক্য বিনষ্ট হলো এবং খলিফা বা আমিরুল মোমেনিন বা নায়েবে রসুল হিসেবে রাষ্ট্র প্রধান পদমর্যদা সম্পন্ন ব্যক্তি যে মুসলিম বিশ্বের অবিসম্বাদিত নেতা এ ধারণা সমাজ জীবন থেকে তিরোহিত হলো। এখন থেকে তরবারির দ্বারাই খেলাফতের অধিকার মীমাংসিত হতে লাগল। খেলাফতের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হলো। তাছাড়া রাজনীতিতে সাহাবা বা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রাধান্য হ্রাস পেলো। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য এটা একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করল।

খলিফা ওসমান (রা.) এর শাহাদতের পর ৬৫৬ সনের ২৩ জুন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনতার দাবিতে হজরত আলী (আ.) খলিফা পদ গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। রসুল (দ.) এরশাদ ফরমাইয়াছিলেন: "হে আলী (আ.) আমার অবর্তমানে তোমার ওপর অনেক মুসিবত আপতিত হবে। সে সব তুমি ধৈর্য সহকারে সহ্য করবে। তুমি হচ্ছ কাবার মতো, কাবা কখনো জনগণকে তওয়াফ করতে যায় না, জনগণই কাবাকে তওয়াফ করতে আসে।" হলো তাই, যত রকম কারসাজি করে আলী (আ.) তেইশ বছর শাসন ক্ষমতা হতে দূরে সরিয়ে রাখা এবং কঠিন বিপদে পড়লে বিভিন্ন জটিল বিষয়ে নামমাত্র তার পরামর্শ গ্রহণ করা ছাড়া রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করায় সমাজ জীবনে যে মারাত্মক পরিণতির সৃষ্টি হলো সে অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে তারা আলী (আ.) কেই তওয়াফ করবার জন্য ঘিরে ধরল। কিন্তু এই ২৩ বছরের ফাঁকে জিন ইনসানরা শয়তানরা এমনভাবে জেঁকে বসেছিল যে তাদের বিষ নিঃশ্বাস হতে কোন কিছুই বাঁচান সম্ভব হয়নি। হজরত আলী (আ.) শুধু আদর্শটিকে উড্ডীন করে রেখেছেন। এটা যে হবেই তা তিনি জানতেন বলেই খেলাফত গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু লোকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে অনুরোধ করায় আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ও রসুল (দ.) কর্তৃক ঘোষিত প্রকৃত খলিফার পক্ষে এই পবিত্র দায়িত্ব এড়ান সম্ভব হয় নাই। আর এই মহান দায়িত্ব না নেওয়া হলে ইসলামের নামও বর্তমান দুনিয়ায় থাকত বলে মনে হয় না।

হজরত ওসমান (রা.) এর সময়কালীন গণ অভ্যুত্থান মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ সাইয়দ কুতুব বলেন : শেষ পর্যন্ত এক ভয়াবহ অভ্যুত্থান শুরু হলো এর মধ্যে সত্য ও অসত্য, ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের কার্যকারণ মিশ্রিত ছিল। তবে সামগ্রিকভাবে ব্যাপারটিকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একথা স্বীকার না করে উপায় নাই যে এই অভ্যুত্থান মোটামুটিভাবে ইসলামি ভাবধারার একটি গণ বিস্ফোরণ ছিল। অবশ্য এই মত প্রকাশ করার সময় আমরা এ সত্য অগ্রাহ্য করছি না যে এই বিস্ফোরণের পিছনে অভিশপ্ত ইহুদি সন্ত্রাসবাদী নেতা ইবনে সাবারও গোপন হাত সক্রিয় ছিল। হজরত ওসমান (রা.) এর আমলে সম্পদের কেন্দ্রায়ন এমন প্রকট হয় যে ইসলামি সমাজ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত এবং ইসলামের প্রধান প্রধান মূলনীতিগুলো অবলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। আমরা এই সময়কার আর্থিক প্রাচুর্য সম্পর্কে মাসউদি কথিত কতিপয় নমুনা পেশ করছি। তিনি বর্ণনা করেনঃ "ওসমানের (রা.) আমলে সাহাবারা ধন সম্পদ উপার্জন করেন। যেদিন ওসমান (রা.) শাহাদাত বরণ করেন, সেদিন তার কোষাধ্যক্ষের নিকট তার দেড় লাখ দিনার ও দশ লাখ দিরহাম নগদ জমা ছিল। ওয়াদিল কুরু ও হোনাইন প্রভৃতি স্থানে তাঁর যে ভূসম্পত্তি ছিল তার দাম ছিল এক লাখ দিনার। এছাড়াও তিনি বহু সংখ্যক ঘোড়া ও উট রেখে যান। জোবাইর (রা.) এর ইন্তেকালের পর তাঁর পরিত্যক্ত একটি ভূ-সম্পত্তির মূল্যই ছিল ৫০ হাজার দিনার। তাছাড়া তিনি একহাজার ঘোড়া ও একহাজার বাদী রেখে যান। তালহার (রা.) ইরাক থেকে দৈনিক একহাজার দিনার আয় হতো। সারাত থেকে এর চেয়েও বেশি আয় হতো। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এর আস্তাবলে একহাজার ঘোড়া ছিল, তার এক হাজার উট এবং দশহাজার ছাগল-ভেড়াও ছিল। তার ইন্তেকালের পর তার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের মূল্য দাঁড়ায় ৮৪ হাজার দিরহাম। জায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) এতবেশি গোনা রূপা রেখে যান যে, তা কুড়াল দিয়ে কাটতে হতো। যেসব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তিনি রেখে যান তা এর চেয়েও বেশি। জোবায়ের (রা.) বসরায়, মিশরে, কুফায় ও আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি করে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এমনিভাবে তালহা (রা.) কুফায় একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মদিনায়ও তিনি সেগুণের কাঠ ও চুন সুরকি দিয়ে এক বিরাট

কোঠা নির্মাণ করেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) আকিক পাথরের একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ গম্বুজসহ সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মিকদাদ (রা.) মদিনার ভিতরেও বাইরে কারুকার্য খচিত এক মনোরম প্রাসাদ তৈরি করেন। ইয়ালা ইবনে মুম্বা (রা.) ৫০ হাজার দিনার নগদ এবং তিনলাখ দিরহাম মূল্যের ভূ-সম্পত্তি রেখে যান। (ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি সাইয়েদ কুতুব, পৃ.১০১)।

ওমর (রা.) এঁর আমলে ধন বণ্টনে মর্যাদার তারতম্য করার অনিবার্য ফল হিসেবে সম্পদের এই ভারসাম্যহীন প্রাচুর্যের উৎপত্তি হয়। যদিও পরবর্তীতে ওমর (রা.) এই নীতি ও ফলাফলের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাঁর শাহাদতের পর এ প্রাচুর্য ক্রমশ বেড়েই যেতে থাকে। হজরত ওসমান (রা.) সেই নীতি অব্যাহত রাখেন এবং তার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে। হজরত ওসমান (রা.) অসম বণ্টন ছাড়াও যে সব উপহার উপঢৌকনাদি এবং জায়গির ইত্যাদি প্রদান করেন। সেগুলোও মুসলিম সমাজে ধনবাদী প্রবণতার বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে সহায়তা করে। তারপর এমন কতগুলো কার্যকারণ আত্মপ্রকাশ করে যার দরুন ধন-সম্পদের ভারসাম্যহীন প্রাচুর্য অস্বাভাবিকভাবে প্রসার লাভ করে। বিশেষত– ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একত্রিকরণ এবং লাভজনক কারবারের উপায় উপকরণ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হওয়ার ফলে মুসলিম সমাজে পুঁজিবাদী প্রবণতা ব্যাপক প্রসার ঘটে। হজরত আবু জর (রা.) এর মন থেকে যে গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ আবেদন বের হয়েছিল তার বিরোধিতা ও উপেক্ষার কারণেও পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। যদি তার আবেদন সফলকাম হতো এবং তিনি যদি রাষ্ট্র প্রধানকে স্বমতে দীক্ষিত করতে পারতেন তাহলে তার মধ্যমে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার সুযোগ ছিল।

হজরত ওসমান (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন কার্যত উমাইয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। খলিফা নিজেই তাদেরকে এ সুযোগ সরবরাহ করেন। সারা দেশে বিশেষত সিরিয়ায় তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং অন্যান্য যাবতীয় সম্পদকে তারা নিজেদের কুক্ষিগত করে। তারা সৌভ্রাতৃত্ব অপরের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান, সামাজিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতি কাজকে উপেক্ষা করতে থাকে। আর এ সবই হজরত ওসমানের খেলাফতের ছত্রছায়ায় লালিত পালিত হতে থাকে ।

হজরত আলী (আ.) যে শাসন পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তার রূপরেখা তিনি তার অভিষেক অনুষ্ঠানের ভাষণেই নির্দেশ করেন।

"...ভাইসব আমি তোমাদের নবির নীতি অনুসারে তোমাদের পরিচালিত করবো এবং তাঁরই আইন চালু করবো (অর্থাৎ তা সমাজে চালু ছিল না)। শোন, ওসমান (রা.) যাকে জায়গা জমি এবং আল্লাহর ধন থেকে যা কিছু দিয়েছেন তা বায়তুল মালে ফেরত আনা হবে। কেননা বাস্তবকে কোন জিনিস পরিবর্তন করতে পারেনা। এমনকি যদি আমি দেখি এই রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিয়ে কিংবা বাদী খরিদ করার কাজে ব্যয়িত হয়েছে অথবা তা' বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তবুও তা আমি ফেরত আনবো (কার্যত তাই হয়েছিল) কারণ ন্যায়নীতি অত্যন্ত উদার ও ব্যাপক জিনিস। কিন্তু ন্যায়নীতি যার পক্ষে দুঃসহ হবে, তার জুলুম ও অত্যাচার আরও বেশি দুঃসহ হবে।

কিছুদিন আগে যাদের ওপর দুনিয়ার স্বার্থ প্রবল হয়ে পড়েছিল এবং তারা বড় বড় দালান কোঠা, উট, ঘোড়া, দাসদাসী ও চাকর নফরের মালিক হয়েছিল, তাদেরকে যখন আমি এই সব কিছু থেকে বঞ্চিত করবো এবং তাদের আসল অধিকারের আওতায় ফিরিয়ে আনবো তখন যেন তারা বলতে আরম্ভ করবে যে আবু তালেবের বেটা আমাদেরকে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। জেনে রাখ ! রসুলুল্লাহ (দ.) এর সাহাবি, মুহাজের ও আনসারদের মধ্য থেকে কেউ যদি এরূপ মনে করে থাকে যে, রসুল (দ.) এর সাহচর্য লাভের দরুন তার অন্যের ওপর অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব রেছে তাহলে তার জানা উচিত যে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকারের স্বীকৃতি শুধু আল্লাহর নিকট পাওয়া যাবে। জেনে রাখ ! যে ব্যক্তি খোদা ও রসুলের দাওয়াতে সাড়া দেবে, আমাদের জাতীয়তাকে (ভাবধারা) গ্রহণ করবে-আমাদের সত্য দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তার নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধ্য হবে। তোমরা সকলে আল্লাহর দাস এবং এই সম্পদ আল্লাহর সম্পদ। এটা তোমাদের মধ্যে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে। এব্যাপারে কাউকে কারুর ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবেনা। খোদাভীরু লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

মুনাফাখোর, বৈষম্যপ্রিয়, স্বার্থন্বেষী ও সুবিধাবাদী মহল হজরত আলী (আ.) এর নীতিতে খুশি হতে পারেনি এবং তা না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাই এ মহল হজরত আলী (আ.) এর সর্বাত্মক বিরুদ্ধাচারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত কূট ও দুস্কর্মের শিরোমণি উমাইয়া নেতা মাবিয়ার শিবিরে মিলিত হয়। এই শিবিরে তারা ইনসাফ ও ন্যায় নীতি জলাঞ্জলী দিয়ে নিজেদের তুচ্ছ স্বার্থের শেষ রক্ষা করতে তৎপর হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে মাবিয়ার নীতি সম্পর্কে তিনি নিজেই সন্ধির পর কুফার জনতার উড়দ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলে, কুফাবাসীগণ ! তোমরা কি মনে করেছ যে আমি নামাজ, জাকাত ও হজের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছি ? আমি তোমাদের ভাল করেই জানি যে তোমরা নামাজ, জাকাত ও হজরীতি পালন করে থাক। আসলে আমি যুদ্ধ করেছি তোমাদের ও তোমাদের গর্দানের ওপর আমার শাসন চালাবার জন্য। তোমাদের অসম্মতি সত্ত্বেও আল্লাহ আমার অভিলাষ পূর্ণ করেছেন। (তার সকল কুকর্মের দায় দায়িত্ব যেন আল্লাহর নাউজিবিল্লাহ)। জেনে রাখ এই হাঙ্গামায় যত জানমালের ক্ষতি হয়ে থাকনা কেন, তার কোন ক্ষতি পূরণ দেয়া হবে না। আর আমি যত প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকিনা কেন তা সব এই যে আমার পায়ের তলে পিষ্ট করে দিলাম। একইভাবে তিনি মদিনাবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন :

"খোদার শপথ ! আমার যতদূর জানা আছে আমি তোমাদের প্রতি ভালোবাসার পরিণতিতে ক্ষমতা লাভ করিনি। তোমরা এতে খুশিও হওনি –তাও আমি জানি। আমি এই তরবারির সাহায্যে সংগ্রাম করেছি। তোমাদের ব্যাপারে আমি আবুবকর (রা.) ও ওমরের (রা.) কর্মপন্থা অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম অন্তত ওসমানের (রা.) উদারনীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মনকে সম্মত করতে পারলাম না। সুতরাং আমি নিজেকে এমন এক পথে চালিত করার সিদ্বান্ত নিয়েছি যাতে আমার ও তোমাদের উভয় পক্ষেরই কল্যাণ সাধিত হবে। সকলে সুচারুরূপে মিলে মিশে পানাহার করতে হবে (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সুবিধা যে যথেচ্ছা ভাগ করবে এতে কোন ন্যায়নীতি অনুসরণ করা হবে না)। তোমরা যদি আমাকে শাসক হিসাবে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে মনে না কর, তথাপি আমি তোমাদের জন্য উত্তম শাসক।" (ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি - সাইয়েদ কুতব–পৃ. ৮৬-৮৭)।

রসুল (দ.) ওফাতের ২৩ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি বিধানে যে পরিবর্তন/সংশোধন করা হয়েছে, তা থেকে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

হজরত রসুল করিম (দ.) এর সময় মদ্যপায়ীকে চল্লিশ দোররা মারার ব্যবস্থা ছিল (বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ, তিরমিজি)। আবুবকর ছিদ্দিকের (রা.) সময়ও চল্লিশ 'দোররা' মারার ব্যবস্থা থাকে। ওমর ফারুকের (রা.) খেলাফতের প্রথম দিকেও এই দন্ড বহাল ছিল। পরে তিনি চল্লিশের পরিবর্তে আশি দোররা মারার আদেশ দেন। হজরত ওসমান উভয় ব্যবস্থাই বলবৎ রাখিয়াছিলেন। আমির মুসাবিয়া আবার আশি দোররার দন্ড নির্ধারণ করিয়া দেন। (মোছলেম, আবু দাউদ প্রভৃতি)।

হজ উপলক্ষে মিকাৎ হইতে কেবল ওমরার নিয়ত করিয়া এহরাম বাঁধিলে তাহাকে 'তামাত্তে' বলা হয়। এ অবস্থায় মক্কায় আসিয়া ওমরা পুরো করিয়া এহরাম খুলিতে হয়। তাহার পর ৮ জিলহজ তারিখে হজের নিয়ত করিয়া আবার এহরাম বাঁধিতে হয়। পক্ষান্তরে মিকাৎ হইতে কেবল হজের নিয়ত করিয়া এহরাম বাঁধিলে তাহাকে 'এফরাদ' বলা হয়। এফরাদের নিয়ত করিয়া এহরাম বাঁধিলে হজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এহরামের অবস্থায় থাকিতেও তাহার সমস্ত নিয়ম পালন করিতে হয়। কোরআন মজিদে স্পষ্টাক্ষরে 'তামাত্তা' করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। (সুরা বকরা ১৯৬)। কিন্তু হজরত ওমর 'তামাত্তো' কে নিষেধ করে সকলকে হজে এফরাদ করিতে নির্দেশ দান করেন। বিখ্যাত সাহাবি ইবনে-আব্বাস ইহার কঠোর প্রতিবাদ করিতে থাকেন এবং হজরত ওমরের এই নির্দেশ উপলক্ষে অনেকের সহিত তাঁহার বাদ-বিসম্বাদ হইতে থাকে "এই বাদ-প্রতিবাদে এবনে-আব্বাছ বহু সহি হাদিসের উল্লেখ করতে থাকেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়া দিলে ইবনে-আব্বাস বললেন, সত্বর তোমাদের ওপর আসমান হইতে পাথর বর্ষিতে আরম্ভ হইবে। আমি বলিতেছি –'রাসুলুল্লাহ বলিয়াছেন' আর (তাহার মোকাবেলায়) তোমরা বলিতেছ-আবুবকর বলিয়াছেন ওমর বলিয়াছেন।"

অথচ বহু বিশ্বস্ত হাদিস হইতে নিঃসন্দেহভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত রসুলে করিম নিজে কয়েক্রবার (এমন কি বিদায়ের হজের) 'তামাত্তো' করিয়াছেন। আবুবকর, ওমর, ওসমান ও অন্যান্য বহু ছাহাবা (রা.) এই হজে তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন (মোছলেম, আবু দাউদ, তিরমিজি প্রভৃতি)। এবনে আব্বাসের ন্যায় হজরত আলী ওমর ফারুকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু হজরত ওসমান "তামাত্তে" করিতে নিষেধ করেন। ইহা লইয়া হজরত আলীর (রা.) সহিত তাহার বাদ-বিতন্ডাও হইয়া যায় (মোছলেম, নাসায়ি)। হজরত ওসমান এই মতের অনুকরণ করিয়াছিলেন।

তালাকের বিধান পরিবর্তন :

ঋতুস্থানের পর হইতে পুনরায় ঋতু আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে 'তোহর-বা শুচিকাল' বলা হয়। সুরা করার ২২৯ আয়াতে বলা হইয়াছে –

"তালাক দুইবার, অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিহিতভাবে রাখিয়া দিতে হইবে অথবা সদ্ব্যবহারের সহিত বিদায় দিতে হইবে।" ২২৮ আয়াতে তালাকি স্ত্রীদিগকে তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুরা তালাকের প্রথম আয়াতে ও এই শ্রেণির আদেশ বিদ্যমান আছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হইতেছে- 'তালাক দুইবার' অর্থ এই যে, দুই তোহরে স্বামীকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে তালাক দিতে হইবে। তারপর সদ্ব্যবহারের সঙ্গে বিদায় অর্থাৎ তৃতীয় তালাক। ইহা ব্যতীত আরো অনেক শর্ত ইহার সঙ্গে আছে, যাহাতে তালাককে এক প্রকার অসম্ভব করিয়া তোলা হইয়াছে। হজরত রসুলে করিম এইজন্য তালাককে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা অভিশপ্ত হালাল কাজ" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন (আবু দাউদ, হাকেম, এবনে-মাজা প্রভৃতি)।

হাদিসের বর্ণনামতে ইহাও নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে যে, হজরত রসুলে করিমের সময়, প্রথম খলিফা হজরত আবু বকরের সময় এবং হজরত ওমরের খেলাফতের প্রথম অবস্থায় (দুই বৎসর পর্যন্ত) কেহ এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহা একই তালাক বলিয়া গণ্য হইত। তার পর হজরত (রা.) ওমর যখন দেখিলেন যে, লোকে নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি এক সঙ্গে তিন তালাক দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন তিনি (দন্ডস্বরূপ) নির্দেশ দিলেন, অতঃপর কেহ একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহা তিন তালাক বলিয়া গণ্য হইবে। (মোছলেম, আবু দাউদ, নাসায়ি)।

ইহা যে কতবড় গুরুতর পরিবর্তন, তাহার আভাস দেওয়ার জন্য এখানে একটি হাদিসের উল্লেখ করা হচ্ছে- ছাহাবা মাহমুদ এবনে লবীদ (রা.) বলিতেছেন– "এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়াছিলেন। এই সংবাদ হজরত রসূলে করিমের (স.) নিকট পৌঁছিলে তিনি ক্রোধভরে দন্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন।

"কী; - আমি এখনও তোমাদের মধ্যে (বাঁচিয়া) আছি, আর মহামহিম ও পরম প্রতাপান্বিত আল্লাহর কেতাবকে লইয়া খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।" এই ব্যাপারে সাহাবিদিগের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া যায়। এমন কি একজন ঐ তালাকদাতার প্রাণবধ করার জন্য হজরতের অনুমতি প্রার্থনা করেন (নাসায়ি)। বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে–

(১) একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া কোরআনের ভাব, ভাষা ও উদ্দেশ্যের বিপরীত একটা জঘন্য বেদআৎ।

(২) একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া হলে হজরত রসুলে করিমের (দ.) সময় তাহা মাত্র এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইত।

(৩) হজরত আবুবকর (রা.) সময়, এমন কি স্বয়ং হজরত ওমরের (রা.) খেলাফত যুগের প্রথম দুই বৎসর পর্যন্ত এক সঙ্গে দেওয়া তিন তালাক এক তালাক বলিলেই গণ্য হত।

(৪) হজরত ওমর (রা.) এই সমস্ত শাস্ত্রীয় আইন ও নজীরের বিপরীত নির্দেশ দিলেন যে, কেহ এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তা অতঃপর তিন তালাক বলেই গণ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা (রা.) ইহাকে হারাম বলিয়াছেন– লামাআৎ। প্রসঙ্গত বলা যায় বর্তমানে তালাকের বিধানে কোরানের নির্দেশ বা রসুল (দ.) এর নির্দেশের পরিবর্তে হজরত ওমর (রা.) এর নির্দেশ চালু থাকায় মুসলিম সমাজে এক ভয়াবহ সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

জাকাতের **বিধান পরিবর্তন :**

(৫) সুরা তওবায় ৬০ আয়াতে জাকাত প্রাপক দিগকে আট শ্রেণিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার এক শ্রেণি হইতেছে ইসলামের দিকে মন আকৃষ্টকারী দিগের। হজরত রসুলে করিম (স.) বলিয়াছেন –

"আল্লাহ জাকাত সম্বন্ধে নবির বা অন্য কাহারো নির্দেশের ওপর নির্ভর করেন নাই। সে নির্দেশ তিনি নিজে প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন।" (আবু দাউদ) কিন্তু হজরত ওমর (রা.) মনে করলেন, বর্তমানে মুসলমান সমাজের অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়ে গিয়াছে যে, এই শ্রেণির লোকদিগকে সাহায্য দেওয়ার আর কোন দরকার নেই। সুতরাং তিনি এই শ্রেণীটাকে জাকাত প্রাপকদের তালিকা থেকে বাদ দিলেন এবং এর ফলে তাহাদের প্রাপ্য বন্ধ হয়ে গেল।

(৬) কোরআনের সাত প্রকার 'কেরআৎ' স্বয়ং রাসুলুল্লাহ পুনঃপুন স্বীকার করিয়াছিলেন, (বোখারি, মোসলেম, মালেক প্রভৃতি)। হজরত ওসমান (রা.) যখন সিরিয়া যুদ্ধে লিপ্ত, সে সময় উপস্থিত মুসলমানদিগের পাঠ বৈষম্য দেখিয়া সাহাবি হোজায়ফা-বেন-য়্যামান বিচলিত হইয়া হজরত ওসমানের (রা.) নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন-আমিরুল মোমেনিন, ইহুদি ও খ্রিস্টানদিগের ন্যায় নিজেদের কেতাবের পাঠ বৈষম্য ঘটাইবার পূর্বে আপনি এ উম্মতের প্রতি অবহিত হউন।" ইহার পর হজরত ওসমান (রা.)ই কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবার ওপর এক খন্ড কোরআন লিখিবার ভার অর্পন করেন এবং লেখা সমাপ্ত হওয়ার পর ইহার এক একটা নোসখা (কপি) খেলাফত-এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাইয়া দেন। পক্ষান্তরে অন্য যে সব নোছখা চলিতে ছিল তাহা পুড়াইয়া ফেলিবার আদেশ প্রদান করেন। এই সংস্করণে খলিফার আদেশে সাতটার মধ্যে ছয়টা পাঠ বাদ দিয়া মাত্র একটি ফেরকাকে বহাল রাখা হয় (বোখারী, তিরমিজি)। তৃতীয় খলিফা ওসমানের (রা.) সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হওয়ার কারণ প্রদর্শন করে জাকাত আদায়ের রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতার আইন পরিবর্তন করা হয়। এবং ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ জাকাত আদায় করার বিধান চালু করা হয়। এই প্রথা অদ্যবধি মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

(জাকাত কালোত্তীর্ণ অর্থনৈতিক বিধান, আলহাজ এম, এ ওহাব ঢাকা। মাসিক, তর জুমান, ঈদ সংখ্যা ৯৫)

(৭) আজকাল জুমার দিন দুইবার আজান দেওয়া হয়। একবার খোবা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে, আর একবার খোৎবার জন্য ইমাম মেম্বরের ওপর বসার পর। হজরত রসুলে করিমের (দ.) সময়ে এবং আবুবকর সিদ্দিক (রা.) ও ওমর ফারুকের (রা.) খেলাফত-যুগে প্রথমোক্ত আজান প্রচলিত ছিল না। ইহাদের ইন্তেকালের পর, হজরত ওসমানের (রা.) সময়ে লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। তখন তিনি খোৎবা শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে মসজিদের বাহিরে অবস্থিত 'জাওরা' নামক একটি উচ্চস্থানে আর একবার আজান দিলেন। সেই হইতে জুমআর দু আজান প্রচলিত হয় (বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজি নাসায়ি)।

জুমআর আজান সম্বন্ধে কোরআন মজিদেও উল্লেখ আছে। এই আয়াতে এক আজান দেওয়ারই পরোক্ষ নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় (সুরা জুমা, ৯ আয়াত)। রসুলুল্লাহর সময়ে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার আমলদারিতে এক আজান দেওয়ার ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। অথচ হজরত ওসমান (রা.) এই সমস্ত আইন ও নজিরের ব্যতিক্রম করিয়া আর একটা আজানের প্রবর্তন করিলেন।

(৮) রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা সম্বন্ধে হজরত ওমর (রা.) যে সব নতুন বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন এবং রোমান ও পারসিক প্রভৃতি অমুসলমান জাতিগণের নিকট হতে যে সকল নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইমাম ইউসুফের 'কিতাবুল খেরাজ' এবং ইমাম এবনে জওজির লিখিত হজরত ওমরের জীবনি (৫৭-৬০ পৃষ্ঠা) প্রভৃতি হইতে তাহার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিবে। কেতাব ও সুন্নতের কোন দলিল-প্রমাণে এইসব বিধি ব্যবস্থা ও নিয়ম-পদ্ধতির কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। তবুও হজরত ওমর ঐগুলিকে প্রবর্তিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। (মাওলানা আকরাম খাঁ-আবু জাফর, পৃ. ৪৫৬-৪৬৮ হতে সংক্ষেপিত ও সংকলিত)

(৯) রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণের মধ্যে জমিন বিতরণ করা ছিল একটি প্রাচীন রীতি। জনসাধারণ একে শাসকের অধিকার বলে মনে করত । শাসকবর্গ বড় বা ছোট পরিমাপের জমিন অভাবী জন, দরিদ্র, অলি-দরবেশ এবং সরকার সমর্থক রাজনৈতিক কর্মীগণের মধ্যে বিতরণ করতেন। সেই প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে রসুল (দ.) মদিনাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেই মুসলিম মুহাজির আনসার ও আরবদের মধ্যে বড় ও ছোট পরিমাপের জমিন কতাইই (এক বচন কাতিয়া) সমভাবে বিতরণ করতেন। পরবর্তীতে কাতিয়া পদ্ধতি ইকতা নামে পরিচিত হয় এবং এই নামেই বর্তমানে পদ্ধতিটি সুবিদিত। ইহা এক ধরনের স্থায়ি মঞ্জুরি ছিল অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে অর্জিত সম্পত্তি হস্তান্তর বিক্রি বা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যেত। ঐতিহাসিক অয়াকিদি পরিষ্কারভাবেই লিখেছেন যে মঞ্জুর লাভকারীর মৃত্যু হলে আইন সংগত উত্তরাধীকারীগণ তাদের কাতিয়ার/তুমার উত্তরাধিকারী হতেন। রসুল (দ.) এবং আবুবকর (রা.) এর শাসনকাল পর্যন্ত এই আইন বলবৎ ছিল। কিন্তু খলিফা ওমর (রা.) ফরমান জারি করে মৃত ব্যক্তির তুমায় (উক্ত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত) রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত করে নেন। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ স্থানান্তর, বিক্রি বা উত্তরাধিকার স্বরূপ লাভ করতে পারতেন না। (রসুল (দ.) এর সরকার কাঠামো-৬ মুহাম্মদ ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী, পৃ. ২৯৫-৩০২) যেহেতু প্রথম তিন খলিফার আমলে ধর্মীয় বিধি বিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয়। এ কারণে পরবর্তীতে বিভিন্ন শাসক তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সুবিধা অনুযায়ী ইসলামের বিভিন্ন বিভিন্ন আইন-কানুন পরিবর্তন করতে কোন রকম দ্বিধা করতেন না। বরং তাদের কাজের সমর্থনে প্রথম তিন খলিফার কর্মপদ্ধতির কথা উল্লেখ করতেন। ফলে কোরআন ও হাদিসের নির্দেশ অপরিবর্তনীয় বা নির্দিষ্ট ? এ ধারণাই মুসলিম সমাজ জীবন থেকে অপসৃত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

হজরত আলী (আ.) এর খেলাফতকাল

হজরত আলী (আ.) এর খেলাফত সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে রসুল (দ.) এর পবিত্র জবান মোবারক থেকে হজরত আলী (আ.) এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে যে শত শত বাণী আছে তার থেকে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে–

১। ইবনে আল আসির (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুলে করিম (দ.) হজরত আলীকে (রা.) সম্বোধন করে বলেন, হে আলী ! আল্লাহ তোমাকে এমন কিছু দিয়ে ভূষিত করেছেন যা থেকে দামি ভূষণ তাঁর বান্দাদের জন্য নাই। দুনিয়ার বিরাগ তোমার জন্য এমনভাবে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যে দুনিয়া তোমার থেকে উপকৃত হবে না এবং তুমিও তা থেকে উপকৃত হবে না। দুর্দশাগ্রস্থ জনগণকে ভালোবাসার দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পিত হয়েছে। তারা তোমার নেতৃত্বে গৌরবান্বিত এবং তারা তোমাকে অনুসরণ করায় তুমিও গৌরবান্বিত। তোমাকে যে ভালবাসে সেই পরিতৃপ্ত এবং সেই তোমার প্রকৃত বন্ধু এবং তার জন্য অনুশোচনা যে তোমার প্রতি শত্রুতা করে এবং তোমার সম্পর্কে মিথ্যা বলে বেড়ায়।

২। 'আস সয়ুতি' তার গ্রন্থে বলেছেন : হজরত আলী (আ.) এর প্রতি ভালোবাসা হচ্ছে ঈমান তাঁর প্রতি শত্রুতা হচ্ছে বিদ্রোহ (ধর্মদ্রোহিতা)।

৩। আবু নঈম (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুল (দ.) আনসারদের সম্বোধন করে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কোন বিষয়ের দিকে পরিচালিত করবো যা আমার ওফাতের পর আঁকড়ে ধরলে তোমরা বিপথগামী হবে না। তারা বললেন হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসুল (দ.)। তিনি বললেন : তা হচ্ছে আলী ! আলীকে ভালবাস যেমন করে আমাকে ভালবাস। আলীকে শ্রদ্ধা করো, যেমন ভাবে আমাকে শ্রদ্ধা করো। হজরত জিব্রাইল (আ.) এর মাধ্যমে একথা তোমাদের জানানোর জন্য আল্লাহ আমাকে হুকুম দিয়েছেন।

৪। মুহিত আত তাবারি (রা.) হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি আমার পিতাকে (হজরত আবুবকর (রা.) দেখেছি বার বার হজরত আলী (আ.) এর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন। আমি বললাম : আব্বা আমি দেখতে পাই আপনি প্রায়ই হজরত আলী (আ.) এর চেহারার দিকে তাকান। তিনি বললেন : হে, আমার কন্যা। আমি শুনেছি যে নবি করিম (দ.) বলেছেন: হজরত আলীর (আ.) চেহারার দিকে তাকানোই ইবাদত।

উষ্ট্রের যুদ্ধের পর যখন হজরত আয়েশা (রা.) বসরায় অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁর ভাই মুহম্মদ বিন আবুবকর উম্মুল মুমেনিনকে খোদার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি আমাকে ঐ কথা বলুন যা আপনি এক সময় আমাকে রসুল (দ.) বরাত দিয়ে বলেছিলেন যে, সত্য সব সময় আলীর সাথে থাকবে এবং এই দুই কখনো একে অন্য থেকে আলাদা হবেনা। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন: ইহা অবশ্যই সত্যি কথা। লোকেরা তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল তাহলে আপনি আলী (আ.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন কেন ? উত্তরে উম্মুল মুমেনিন বললেন: খোদা আলী (আ.) এর ওপর দয়া করুন, তিনি অবশ্যই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু আমি এমন একজন স্ত্রীলোক ছিলাম যে পিতৃকুলের লোকদের প্রভাবাধীনে ছিলাম।

হজরত আলী (আ.) এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এই হাদিস বর্ণনা করলে মাবিয়া এই হাদিসের সত্যতা চ্যালেঞ্জ করেন এবং হজরত তাকে উম্মুল মুমেনিন হজরত সালমা (রা.) এর নিকট ইহার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে হজরত সালমা (রা.) ও হজরত আলীর (রা.) সত্যের পথে অধিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসটি অবশ্যই সত্য বলে প্রত্যায়ন করেন।

গদিরে খুমে হজরত আলী (আ.) অভিষেকের পর হজরত ওমর (রা.) রসুল (দ.) কে নিবেদন করলেন–আমার পার্শ্বে একজন খুবসুরত যুবক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন –হে ওমর (রা.) রসুল (দ.) আলী (আ.) কে মওলা ঘোষণার মাধ্যমে এমন একটি কঠিন গিরা (শর্ত) আরোপ করিলেন, যাহা মুনাফেক ব্যতীত কেহই খুলিবে না। তখন রসুল (দ.) এরশাদ ফরমাইলেন, তিনি আদম সন্তান ছিলেন না বরং তিনি

জিবরাইল (আ.) ছিলেন। আমার ঘোষণা দেওয়ায় তোমাকে তাকিদ করার জন্য আসিয়াছিলেন যাহা আমি আলীর সম্পর্কে বর্ণনা করেছি।

পরবর্তীতে হজরত আলী (আ.) এক মজলিসে জিজ্ঞাসা করলেন এখানে রসুল (দ.) এর সাহাবিদের মধ্যে কারা কারা উপস্থিত আছেন। বার জন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গেলেন যাহাদের মধ্যে খালেদ-বিন-ফায়দ (রা.), আবু আইয়ুব আনসারি (রা.), খোজাইমা বিন সাবেত (রা.), সাবেত-বিন কয়স-বিন শাম্মাম (রা.), আম্মার বিন ওকবা (রা.), সাদ বিন আবি ওকক্কাস (রা.) ও হাবিব বিন-বদিল-বিন ওরাকা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। এরা প্রত্যেকে সাক্ষী দিলেন রসুল (দ.) কে আমি গাদীরে খুমে ফরমাইতে শুনিয়াছি, "আমি যাহার মওলা আলীও তাহার মওলা। অতঃপর হজরত আলী (আ.) আনাস বিন-মালেক, বরা বিন আযেব কে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের দুজনকে এ ব্যাপারে সাক্ষী দিতে কিসে বাধা দিল ? যাহা অন্যান্যরা শুনিয়াছেন তাহা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছিলে। আরো ফরমাইলেন: হে আল্লাহ তাহারা যদি শত্রুতাবশত ইহা গোপন করিয়া থাকে তবে তাহাদিগকে এখনই কোন বিপদে পতিত কর। সাথে সাথে বরা বিন আযেব তখন অন্ধ হইয়া গেলেন, যে নিজের বাড়ির রাস্তা অন্যকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ।আনাস বিন-মালেকের গায়ে কুষ্ঠ দেখা দিল। ইহাও বর্ণিত আছে যে, হজরত আলী (আ.) ব্যাপারে সাক্ষী দেওয়ার প্রসঙ্গে আনাস বিন মালেক স্মরণশক্তি হারানোর ওজর পেশ করলেন। তখন হজরত আলী (আ.) বলেন: হে আল্লাহ যদি সে মিথ্যা কথা বলে থাকে তাহলে তাহাকে কুষ্ঠ ব্যধিতে এমন করে বাঁধিয়া ফেলো যেন সে পাগড়ি দিয়েও তা গোপন করতে না পারে। রসুল (দ.) এর ওফাতের দীর্ঘ ২৩ বছর পর জনগণ বাধ্য হয়ে হজরত আলী (আ.) কে আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। তবে মানবিয় বুদ্ধির মাধ্যমে এই দীর্ঘ সময় তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না করার ফলে ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবে কি থাকবেনা এই প্রশ্নের সম্মুখীন। তখন এই মহা বিকৃঙ্খলাময় পরিস্থিতিতে হজরত আলী (আ.) ক্ষমতাসীন হন।

খেলাফত হজরত আলী (র.)র জন্য সূচনা থেকেই এক কন্টকশয্যা হয়ে দাঁড়ালো। ঘরে এবং বাইরে অর্থাৎ রাজধানি মদিনা আর প্রদেশগুলোতে আগে থেকেই অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। শাসন কর্তাদের দুনীতি সকল প্রকার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো। কোরেশ আর বেদুঈনদের ঝগড়া আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো ছিলোই, তার ওপর এবার নতুন করে দেখা দিলো বিদ্রোহিদের তথা ওসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি বিধানের দাবি। বিশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রদ্রোহে সমাজ দেহে দেখা দিলো ভাঙন-শাসন যন্ত্র প্রায় অচল। বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় স্বার্থ থেকে বড় হয়ে উঠলো দল, উপদল ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ আর তা নিয়ে সংঘর্ষ।

লুণ্ঠপাটের সুযোগ দেখে এবার বেদুঈনরা এসে হানা দিল নগরে। দাস দাসীরা ও জিম্মীদের কিছু অংশও ভিড়ে পড়লো ওদের সাথে, এদের সংখ্যা তখন প্রচুর। বহু বছর ধরে যুদ্ধবন্দী হিসাবে অসংখ্য দাস মদিনায় বন্যা স্রোতের মত এসে জুটেছিল– অন্যান্য শহরে ও ঘটেছিল একই দশা। এদের পিছনে কোন কৌলিন্য বা আভিজাত্য ছিল না। এদেরকে গৃহ-ভৃত্য দ্বাররক্ষক-দেহরক্ষী ইত্যাদি কাজে-ই নিয়োগ করা হতো। এদের কেউ কেউ আবার মনিবের নামে ব্যবসা চালাতো–মুনাফার ভাগ দিতে মনিবকে। বিদ্রোহের সময় এরাও হয়ে উঠল উচ্ছৃঙ্খল ও অবাধ্য। মদিনায় এদের প্রাধান্য ছিল বেশি, কারণ এরাই পাহারা দিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার আর ধনী-বিত্তবানদের বালাখানা, কাজেই নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে এরা খুব ছিল সচেতন। বিশেষত এরা ছিল অশ্ব চালানায় দক্ষ। বসরা আর অন্যত্র বিদ্রোহে এরাই অংশ নিয়েছিল। খলিফা তথা সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হলো দাসরা নিজ নিজ মনিবের কাছে ফিরে না গেলে তাদের বিদ্রোহি ও বে-আইনি জনতা হিসেবে গণ্য করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এতে পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটলো না। তাই আমির উল মোমেনিনকে কয়েকটি জটিল ও কঠিন সমস্যার মোকাবেলা করতে বাধ্য করা হয়–

পূর্বেই বলা হয়েছে যে হজরত ওসমান (রা.) এর খেলাফত কালে যাবতীয় বিকৃঙ্খলা ও অশান্তির মূল কারণ ছিল শাসনকর্তাদের অন্যায় আচরণ ও বাড়াবাড়ি। সুতরাং খেলাফতের চতুর্থ দিনেই হজরত আলী (আ.) হজরত ওসমান (রা.) এর আমলে অধিকাংশ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পদচ্যুত করে তদস্থলে নতুন শাসনকর্তাদের নিয়োগেরফরমান জারি করিলেন।

হজরত আলী (আ.) কর্তৃক গভর্নর বরখাস্ত ও নিয়োগ ঃ

হজরত ওসমান (রা.) এর সময়কার গভর্নর ও হজরত আলী (আ.) কর্তৃক তাহাদের পদচ্যুতি ও তদস্থলে নতুন গভর্নর নিয়োগের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো–

প্রদেশের নাম	ওসমান (রা.) এর নিয়োজিত গভর্নরগণ	আলী (আ.) কর্তৃক নিয়োজিত গভর্নরগণ
সিরিয়া	মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান	সহেল বিন–হানিফ
কুফা	আবু মুসা আশআরি (রা.)	আমর ইবনে হাসান
বসরা	আবদুল্লাহ ইবনে আমের	ওসমান ইবনে হানিফ
মিশর	আবদুল্লাহ ইবনে সাদ আবি সারাহ	কায়েস বিন সাআদ আনসারি
ইয়ামন	লয়ালি বিন মায়েন	আবদুল্লাহ বিন আব্বাস
হামদান	জাবির বিন আবদুল্লাহ আল জবলী	অপরিবর্তিত

হজরত আলী (আ.) নব নিযুক্ত গভর্নরদিগকে অবিলম্বে তাঁহাদের স্ব-স্ব নিযুক্ত এলাকায় গমনের নির্দেশ দিলেন।

বসরার নব নিযুক্ত গভর্নর ওসমান-বিন-হানিফ বসরায় পৌঁছিলে, তথাকার অধিকাংশ জনসাধারণ তাহাকে শাসক হিসেবে মেনে নেয় এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

কুফার গভর্নর আমর ইবনে হাসান নতুন খলিফার নির্দেশ অনুযায়ী কুফার পথে রওয়ানা হলেন। কিন্তু কুফায় পৌঁছার পূর্বেই পথিমধ্যে মাবিয়ার অনুসারী তালহা বিন খোরশি তাকে বলেন কুফাবাসীগণ আবু মুসা আশারির স্থলে অন্য কোন ব্যক্তিকে শাসনকর্তা হিসেবে গ্রহণ করবে না। তাই তার মদিনায় ফিরে যাওয়া উচিত। অন্যথায় তাকে খোরশির বাহিনীর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। অবস্থা অনুকূল নয় দেখে আমর ইবনে হাসান মদিনায় ফিরে গেলেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে ইয়মেনে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি সেখানে পৌঁছার আগেই পূর্বতন গভর্নর লয়ালি বিন মায়েন মক্কা চলে গিয়েছিলেন। সুতরাং ইবনে আব্বাস নির্বিবাদে ইয়ামেনে শাসন কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিলেন।

মিশরে নব নিযুক্ত গভর্নর কায়েস বিন সাআদ আনসারি সেখানে পৌঁছিয়াই সেখানকার শাসন কর্তৃত্ব বুঝে নিলেন। সেখানকার লোকেরা তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিল।

সিরিয়ায় নিযুক্ত নতুন গভর্নর সহেল বিন হানিফ মদিনা হতে রওয়ানা হলেন। তাবুকে পৌঁছিলে মাবিয়ার সমর্থন পুষ্ট একদল অশ্বারোহীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তারা সহেলকে জিজ্ঞাসা করলঃ আপনি কোথায় যাইতেছেন, তিনি জবাব দিলেন আমি সিরিয়ায় গভর্ণরের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য রওনা হয়েছি। অশ্বারোহীদল বলিল ওসমান (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ যদি আপনাকে নিযুক্ত করে থাকে তাহলে এই পরিকল্পনা আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় আমাদের সাথে আপনাকে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সহেল পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে মদিনায় ফিরে আসলেন।

ওসমান (রা.) এর আমলে হামদানের শাসনকর্তা ছিলেন জবির বিন আবদুল্লাহ আল-জবলি। হজরত আলী (আ.) তাকে পদচ্যুত করেন নাই বরং তাহাকে লিখিয়াছিলেন যে তুমি হামদানের লোকদের নিকট হতে আমার নামে বায়াত গ্রহণ করে অবিলম্বে মদিনায় চলিয়া আসিবে। জবির উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী বায়াত গ্রহণ করে মদিনায় চলে আসেন।

অর্থাৎ হজরত আলী (আ.) কর্তৃক নিয়োজিত পাঁচজন গভর্নরদের মধ্যে তিনজন নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হলেন। দুইজন কর্তব্য সম্পাদনে অপারগ হয়ে ফিরে আসেন।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হজরত আলী (আ.) কুফার গভর্নর মুসা আল আশআরি ও সিরিয়ার গভর্নর মাবিয়ার নিকট আনুগত্যের দাবিসহ পত্র প্রেরণ করলেন। কুফার গভর্নর জানালেন যে সেখানকার অধিকাংশ লোক স্বেচ্ছায় নতুন খলিফার বায়াতভুক্ত। কিন্তু মাবিয়ার নিকট যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল, তিন মাস পর্যন্ত তার

কোন জবাব আসল না। অবশেষে মাবিয়ার পুত্র বাহক ও হজরত আলী (আ.) এর পত্র প্রেরক উভয়ে একসাথে মদিনায় হাজির হলেন। মাবিয়ার দূত হজরত আলী (আ.) নিকট পত্র হস্তান্তর করল। পত্রের ওপর লিখা ছিল। মাবিয়ার তরফ হইতে আলী (আ.) এর নিকট।" কিন্তু খামের মধ্যে কোন পত্র দেখা গেল না। অর্থাৎ বুঝিয়া শুনিয়াই হজরত আলী (আ.) মত মহান ব্যক্তি ও বৈধভাবে নিয়োজিত ইসলামের খলিফার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন এই তথা কথিত পত্রই তার প্রমাণ।

এই বিদ্রোহি গভর্নর মাবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া এই সমস্যার অন্য কোন পন্থা খোলা থাকল না। হজরত আলী (আ.) সিরিয়া অক্রমণ করবেন এইরূপ ধারণা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মদিনাবাসীদের মধ্যে তিনটি মনোভাব সৃষ্টি হলো। একদল হজরত আলী (আ.) এর কার্যকলাপে সন্তুষ্ট এবং মাবিয়ার জঘন্য কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তাকে দমন করা অপরিহার্য। সুতরাং আমিরুল মুমেনিনকে সাহায্য করা এই ক্ষেত্রে ন্যায়ত ও ধর্ম সংগত। এই মতাবলম্বীদের মধ্যেই বিশিষ্ট সাহাবা (রা.) গণসহ প্রকৃত মোমেনগণ ছিলেন।

দ্বিতীয় দল হজরত আলী (আ.) এর মহান ব্যক্তিসত্তা স্বীকার করেন কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হোক পছন্দ করলেন না। ফলে তথাকথিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলেন। এদের মধ্যে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় দল প্রকৃত পক্ষে মাবিয়ার সমর্থক। আপাতত দৃষ্টিতে এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে খেলাফত পরিচালনার সমস্যা মোকাবেলার প্রতি কোন গুরুত্ব বিবেচনা না করে শুধুমাত্র হজরত ওসমান (রা.) হত্যাকারীদের বিচার কামনা করে। পূর্বেই বলা হয়েছে বিশিষ্ট সাহাবি হজরত জোবায়ের (রা.) ও হজরত তালহা (রা.) হজরত আলী (আ.) হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। তারা ওমরা করার জন্য মক্কা গমনে খলিফার অনুমতি চাইলে তাদেরকে তা প্রদান করা হয়।

মক্কার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিন আমের, হজরত ওসমান (রা.) এর হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওঠে পড়ে লাগলেন। যে সমস্ত দূনীতিবাজ ও সুবিধাভোগী উমাইয়া নেতৃবৃন্দ খলিফার হত্যাকান্ডের পর মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিলেন তারা তার সাথে একযোগে কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। এই দলের মধ্যে সাঈদ ইবনুল আস ও অলিদ বিন ওবাও ছিলেন। ইহারা উভয়েই ওসমান (রা.) কর্তৃক নিয়োজিত গভর্নর পদ হতে দুনীতিজনিত কারণে পদচ্চুত হয়েছিলেন। নতুন খলিফা কর্তৃক বসরা হতে পদচ্যুত হয়ে আবদুল্লাহ বিন আমের মক্কায় এসে এই দলে যোগ দিলেন। ইয়েমেনের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা লয়ালি বিন মায়েন এই সময় মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি ইয়েমেনের বায়তুল মাল হতে ছয়শত উট ও ছয়লক্ষ দিরহাম তসরুফ করে এনেছিলেন। সুতরাং হজরত ওসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

হজরত জোবায়ের (রা.) ও হজরত তালহা (রা.) এদের সাথে যোগ দিলেন। হজরত তালহা (রা.) এর বসরায় বিরাট জমিদারি ছিল। তাছাড়া ভূতপূর্ব গভর্নর আবদুল্লাহ বিন আমের সেখানে তার কুকর্মের অনেক সহযোগী ছিল মর্মে ধারণা করে ছিলেন।

হজরত ওসমান (রা.) হত্যার পিছনে যে নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেই মারওয়ান যার রচিত জাল চিঠিটি হজরত ওসমান (রা.) এর মৃত্যুর আশু কারণ হিসেবে বিবেচিত, সেও এদের দলে যোগ দিল। মুগিরা ইবনে শোবাও এই কাজে শরিক হলেন।

মোটকথা ওসমান (রা.) আমলের পদচ্যুত গভর্নরগণ, হজরত ওসমান (রা.) আমলের দারুল খেলাফতের মন্ত্রনাদাতাগণ ও অপরাপর উমাইয়াগণ নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই অভিযানকে একটি মহাসযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। উল্লেখ্য এই দুনীতিবাজ পদচ্যুত গভর্নরগন নিজ নিজ এলাকায় বায়তুল মালের সম্পদ লুট করে নিজেদের সাথে নিয়ে এসেছিলেন। এতে করেই প্রমাণিত হয় যে তারা কত নিচু স্তরের মানুষ ছিলেন। একারণেই এই সব লোকদের পদচ্যুতি সঠিক সময়ে করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে কারো কোন রকম মতদ্বৈততা থাকা উচিত নয়। আর এই ধরনের দুস্কৃতিকারী লোক যে হজরত আলী (আ.) মত মহান খলিফার আন্তরিক সহযোগী হতে পারেনা তা বলাই বাহুল্য। এরাই পরে মাবিয়ার অনুসারী হয়েছিল।

বিদ্রোহি দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো উম্মুল মুমেনিন আয়েশা (রা.) হজরত জোবায়ের ও তালহা (রা.) বসরাভিমুখে রওয়ানা হচ্ছেন যারা ইসলামের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, যারা খলিফা ওসমানের (রা.) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তারা যেন অবিলম্বে এই সেনাদলে যোগদান করে। তাদেরকে সওয়ারী অশ্ব, সস্ত্র ও আনুষংগিক সকল প্রকার সযোগ প্রদান করা হবে। ঘোষণা অনুযায়ী এই উমাইয়া দুস্কৃতিকারী, সুবিধাবাদী, এবং আবেগতাড়িত ও গনীমতের লোভে বহু ভাড়াটিয়া লোক এই বাহিনীতে যোগদান করল।

কাফেলা অগ্রসর হতে লাগল। পথিমধ্যে মারওয়ান, তালহা (রা.) ও জুবায়ের (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন যদি আপনারা যুদ্ধে জয়ী হন, তাহলে খলিফার পদে কাকে অভিষিক্ত করবেন ? উভয়ের মধ্যে যাকে লোকেরা নির্বাচন করবে তিনিই খলিফা হবেন। সাঈদ বিন আল আস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হজরত তালহা ও জুবায়েরের (রা.) জবাব শুনে তিনি বলেন– আপনারা তো কেবল হজরত ওসমান (রা.) এর অন্যায় হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, খেলাফত হজরত ওসমান (রা.) এর পুত্রকেই দেওয়া উচিত। উভয়েই বললেন– তুমি আর কারো কথা বললে না হয় তবুও হত। কিন্তু মোহাজির ও আনসারদের মধ্যে বৃদ্ধ ও বুজর্গ লোকেরা জীবিত থাকতে তা কিরূপে সম্ভব ? সাঈদ বললেন– তাহলে আমি আপনাদের সাথে থাকতে পারব না। সাঈদ এর দেখাদেখি আবদুল্লাহ বিন খালিদ বিন আমদ ও হজরত মুগিরা ইবনে শোবাও তাকে অনুসরণ করলেন। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রকৃত পক্ষে হজরত ওসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উছিলায় উমাইয়াদের ক্ষমতা দখল প্রক্রিয়া বংশানুক্রমিক করাই এই গ্রুপের উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীতে দেখা যায় এই মুগিরা ইবনে শোবা মাবিয়াকে তার পুত্র ইয়াজিদকে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে নিয়োগের পরামর্শ দেন।

হজরত যোবায়ের (রা.) ও তালহা (রা.) অবশিষ্ট্য সেনাদল সহ চলতে লাগলেন। কাফেলা হোয়াব নামক ঝর্ণার নিকট উপস্থিত হলে কুকুরগুলি চিৎকার করতে লাগল। কুকুরের অস্বাভাবিক চিৎকার শুনে উম্মুল মুমেনিন হজরত আয়েশা (রা.) উক্ত স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করলে স্থানীয় লোকজনের কাছে এই নির্ঝরনীর নাম হোয়ার বলে জানায়। এই কথা শুনামাত্র হজরত আয়েশা (রা.) বললেন : আমাকে অবিলম্বে ফিরাইয়া নিয়া চলো। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: রসুল (দ.) এরশাদ করেছেন যে, তাঁর বিবিদের একজন যখন তাঁর অমনোনিত কাজ করতে উদ্যত হবে তখন হোয়াবের কুকুর অস্বাভাবিকভাবে চীৎকার করতে থাকবে। এই বলে আয়েশা (রা.) তাঁহার উটের গর্দানে সজোরে হাত মারলেন, উট সেখানেই বসে পড়ল। কাফেলা সেখানেই অবস্থান করতে লাগল। হজরত আয়েশা (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হতে রাজি হচ্ছিলেন না, এহেন পরিস্থিতিতে কুচক্রি মারোয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী উম্মুল মুমেনিনকে মিথ্যা কথা বলা হলো, তারা কসম করে বলল এই জায়গার নাম হোয়াব নয়। ভুলক্রমে তা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হোয়াবের সাথে এই স্থানের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং হজরত আয়েশা (রা.) এর কাফেলা পুনরায় এগিয়ে চলল। এই দলের পক্ষ হতে আবদুল্লাহ বিন আমেরকে কুফাবাসীদের নিকট পাঠানো হলো। সেই সঙ্গে কুফার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে দলের আনুগত্যের অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেয়া হলো।

এদিকে হজরত আলী (আ.) এর নিযুক্ত বসরার গভর্নর ওসমান বিন হানিফ যখন সসৈন্য জুবায়ের, তালহা ও তার সঙ্গীদের আগমন সংবাদ পেলেন, তখন তিনি বসরার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাদের নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন। বসরার নেতাগন হজরত তালহা ও জুবায়েরকে সসৈন্য বসরায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন আমরা হজরত

ওসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য এসেছি। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনারা কি হজরত আলী (আ.) এর হাতে বাইয়াত করেন নাই ? জওয়াবে তারা বললেন হ্যাঁ। তবে যে শর্তে বাইয়াত গ্রহণ করা হয়েছিল সে শর্ত প্রতিপালিত হচ্ছে না।

সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে ওসমান বিন হানিফ বসরার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট এ ব্যাপারে তাদের মতামত জানালে তারা নীরবতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু গভর্নর হিসেবে তিনি এতবড় ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারেন না। তিনি বাইয়াত ভঙ্গকারীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ওসমান বিন হানিফের পক্ষে কায়েস নামক জনৈক ব্যক্তি মসজিদে বক্তৃতাকালে বললেন : "হে

জনমন্ডলী, হজরত তালহা (রা.) ও জুবায়ের (রা.) এখানে আত্মরক্ষা বা জীবন রক্ষার জন্য এসেছেন তা বিবেচনা করার ভিত্তি নাই। কারণ মক্কা শরিফে পাখিদের জীবনও নিরাপদ। সেখানে কেহ কারো ওপর অত্যাচার করতে পারে না। আর যদি তারা হজরত ওসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এসে থাকেন তাহলে তাও একটি মিথ্যা অভিযোগ মাত্র। কারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, আমাদের মধ্যে হজরত ওসমান (রা.) এর হত্যাকারী কেহ নেই। সুতরাং তারা যেদিক হতে আগমন করেছেন সেদিকেই তাদের ফিরাইয়া দেওয়া কর্তব্য। কায়েসের বক্তব্য শেষ হলে আমুদ বিন সাদি দাঁড়াইয়া বলিলেন : "প্রকৃতপক্ষে হজরত ওসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তারা আমাদের সাহায্য প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন।"

হজরত জোবায়ের (রা.) ও তালহা (রা.) যে খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আগমন করিয়াছেন তা পরিষ্কার হওয়ার পর ওসমান বিন হানিফ তার বাহিনী প্রস্তুত করলেন। ওদিকে বায়াত ভঙ্গকারী গ্রুপ মদির নামক স্থানে উপনীত হইলেন। যুদ্ধে ওসমান বিন হানিফ পরাজিত হইলেন। হজরত তালহা (রা.) ও হজরত জোবায়ের (রা.) বসরার আধিপত্য লাভ করিলেন।

হজরত জুবায়ের (রা.) ও হজরত তালহা (রা.) যে তাদের বাইয়াত বা ওসমান । (রা.) এর মৃত্যু সম্পর্কে কুফাবাসীদের নিকট সঠিক অবস্থা বর্ণনা করেন নি তার প্রমাণ আমরা কুফাবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে লিখিত হজরত আলীর (রা.) পত্রে জানতে পারি।

এই চিঠি আল্লাহর খাদেম ও বান্দা আমিরুল মুমেনিন আলী (আ.) নিকট থেকে আনসারদের নেতা ও সভ্রান্ত কুফাবাসীদের প্রতি আল্লাহর হামদ আর রসুলের প্রতি দরুদের পর ওসমান হত্যার ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি কিছু আলোকপাত করতে চাই। তাহলে সব কিছুই তোমাদের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হবে। জনসাধারণ ওসমানের (রা.) ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠেছিল –নানা অভিযোগ তুলে নিন্দা করছিল তার। মোহাজেরদের মধ্যে একমাত্র আমিই তাদের বুঝতে আর শান্ত করতে চেষ্টা করেছিলাম। আর ছিলাম এ অসন্তুষ্ট জনতার থেকে দূরে সরে । কিন্তু তালহা (রা.) আর জোবায়ের (রা.) এদের দিচ্ছিল উসকানি। –তারা দুজন ওসমানের (রা.) বিরুদ্ধে যে সব কথা বলছিল তা জনতার অভিযোগ থেকেও ছিল মারাত্মক - হজরত আয়েশা (রা.) ও ওসমানের বিরুদ্ধে কম অভিযোগ উত্থাপন করেননি। (তিনি হজরত ওসমান (রা.) কে 'নাসেল' নামক ইহুদির সাথে তুলনা করতেন।) এ অবস্থায় কয়েকজন লোক ওসমানকে হত্যার জন্য কৃত সংকল্প হয় এবং অবশেষে তারা একদিন তাকে হত্যা করতেও সমর্থ হয়। তারপর সবাই (শত্রু-মিত্র দুপক্ষই) আমার কাছে এসে বাইয়াত গ্রহণ করে। এর জন্য আমার দিক থেকে কোন ইচ্ছা কি আগ্রহ কোন অনুরোধ উপরোধ বা কোন রকম জবরদস্তিই ছিল না। তারা আমার কাছে এসেছিল স্বেচ্ছায় কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়া বরং আনন্দ উৎফুল্ল মনে। তোমাদের জানা থাকা ভালো যে নগরীতে (মদিনায়) রসুলে আকরাম (দ.) হিজরত করে এসেছিলেন, এখন সে নগরবাসীরা নগর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে অসন্তোষ আর বিপদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খলিফার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে বিদ্রোহ। আমি তোমাদের সাহায্য কামনা করছি –তোমাদের খলিফাকে সাহায্য করে এসো লড়াই করো শত্রুর বিরুদ্ধে। (হজরত আলী –আবুল ফজল, পৃ. ১৬৩)।

হজরত আলী (আ.) তালহা (রা.) কে ও জোবায়ের (রা.) যৌথভাবে সম্বোধন করে যে চিঠি লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ:

"যতই তোমরা আসল সত্য গোপন করে তার ওপর পর্দা ঢাকা দিতে চাও না কেন তোমরা নিজেরাই ভালো করে জানো যে, জনসাধারণকে আমি কখনো আমার বাইয়াত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিনি। তারাই নিজেরা এসে স্বেচ্ছায় আমাকে খলিফা করতে চেয়েছে। বাইয়াত গ্রহণের জন্য আমি কখনো নিজে হাত বাড়াইনি–তারাই তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার প্রতি যারা বাইয়াত গ্রহণের জন্য আমার চারিদিকে ভিড় জমিয়েছিল তাদের মধ্যে তোমরা দুজনও ছিলে।

আমার ক্ষমতা বা আমার পক্ষ থেকে কোন রকম নির্যাতনের ভয়ে তোমরা সবাই সেদিন আমার বাইয়াত গ্রহণ করতে আসনি অথবা আমার কাছ থেকে টাকা পয়সা পাবে তেমন কোন সম্ভাবনাও ছিল না তোমাদের। যদি তোমরা দুজন সেদিন স্বেচ্ছায় আর স্বাধীনভাবে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকো, তাহলে বাইয়াত ভঙ্গ করো না। আবার ফিরে এসো সে বাইয়াতের রাস্তায়। বাইয়াত বা শপথ ভঙ্গের জন্য আল্লাহর কাছে করো তওবা। আর

তোমাদের শপথ গ্রহণ যদি স্বেচ্ছায় আর আন্তরিক না হয়ে থাকে, প্রথমে আমার প্রতি আনুগত্যের ভান করে পরে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে তোমাদের চরিত্রের স্বপক্ষে তা খুব প্রশংসার কথা নয়। এতে আমার পক্ষের যুক্তিই প্রবল হয় আর তা যায় তোমাদের বিপক্ষে।

আমার জীবনের শপথ – অন্যান্য মুহাজিরদের তুলনায় তোমাদের এমন কি অমোঘ প্রয়োজন ছিল, যার জন্য তোমরা আমার কাছে তোমাদের আসল উদ্দেশ্য গোপন করতে, আর বিশ্বাস ও আনুগত্যের ব্যাপারে এমন মুনাফেকি করতে বাধ্য হয়েছে। বরং আনুগত্যে আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন তা ভাঙ্গার চেয়ে তখন আনুগত্যের শপথ গ্রহণ না করাই তোমাদের পক্ষে যুক্তিসংগত হতো। তোমরা দুজনেই সচ্ছল অবস্থার মানুষ আর তোমাদের পিছনে তোমাদের গোষ্ঠীগোত্র যথেষ্ট প্রভাবশালী। তোমাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য কেউ বাধ্য করেনি। জানো কি সেদিন কি সে তোমাদেরকে মুনাফিক বানিয়েছিল আর আজ মুক্তিপ্রাপ্ত দাসে ? তার মূলে স্রেফ তোমাদের এক অদম্য মতলবই ছিল সক্রিয়।

তোমরা লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছ আমিই নাকি খলিফা ওসমানের (রা.) হত্যার জন্য দায়ি। তোমরা না আমি খলিফা হত্যার জন্য কে দায়ি তার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মদিনায় এমন বহু লোক আছে যারা নিরপেক্ষ যারা আমার তোমাদের কারো পক্ষ কখনো গ্রহণ করেনি। গোড়া থেকেই যারা আমার কাছ থেকেও দূরে সরে ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করা হলে সব কিছুরই মীমাংসা হয়ে যাবে – তারাই বলে দেবে কে বা কারা দায়ি। এ হত্যার জন্য আমরা কে কতটুকু খলিফাকে করেছি সাহায্য বা কে করেছি উত্তেজিত ও করেছি হত্যা কর্মের সহায়তা।

আমার সম্মানিত বন্ধুগণ। তোমাদের বর্তমান মনোভাব ত্যাগ করো। যদিও আমি জানি এ করতে গেলে নিজেদের ভুল এখন স্বীকার করলে জনগণের চোখে তোমরা হাস্যস্পদ ও বিদ্রুপের পাত্র হয়ে পড়বে। তবুও এও সত্য ভুল আর পাপের পক্ষে তোমরা চলতে থাকলে আসামি দিন তোমরা এই দুনিয়ায় আরো বেইজ্জতি হাসিল করবে নিজেদের জন্য, আর হাসিল করবে পরকালের জন্য দন্ড। (হজরত আলী –আবুল ফজল, পৃ. ১৭৯-১৮০)। এই পত্রে বর্ণিত তথ্য সম্পর্কে হজরত জুবায়ের (রা.) ও তালহা (রা.) কখনো চ্যালেঞ্জ করে কোন বক্তব্য পেশ করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ নাই। একারণেই হজরত আমিরুল মুমেনিন এদের গ্রুপকে "নাকিতুন" বা বাইয়াত ভঙ্গকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। এরা ছিল প্রকৃতপক্ষে অর্থ পূজারি ও কুসংস্কারের ধারক ও বাহক। ন্যায় বিচার ও ক্ষমতা সম্পর্কে হজরত আলী (আ.) যত ভাষণ দিয়েছেন তার অধিকাংশ ছিল এই দলের উদ্দেশ্যে।

হজরত আলীর (আ.) উপুর্যপরি অনুরোধ সত্বেও জুবায়ের (রা.) তালহা (রা.) ও মারওয়ানের দল খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখার প্রেক্ষিতে বসরা খেলাফতের নিয়ন্ত্রনে পুনরায় আনার জন্য হজরত আলী (আ.) এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কুফা বাসীদেরকে খেলাফতের কেন্দ্রের সাথে সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য হজরত ইমাম হাসান (আ.) ও হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.) কে কুফায় পাঠান। হজরত ইমাম হাসান (আ.) যখন কুফায় পৌঁছলেন তখন গভর্নর আবু মুসা আশআরি (রা.) মসজিদে একটি বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন। তিনি বলছিলেন ? রসুলে করিম (দ.) যে ফিতনার ভয় দেখিয়েছিলেন তা বর্তমানে আমাদের ওপর এসে পড়েছে। কাজেই এখন অস্ত্র ত্যাগ করে গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে যাও। রসুল (দ.) বলেছেন "ফিতনা ও বিপর্যয়ের সময় শয়নকারী উপবেশনকারীর চাইতে এবং উপবেশনকারী চলন্ত ব্যক্তির চাইতে ভালো।" এই ভাষণ চলাকালীন সময়ে হজরত হাসান (আ.) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি এই হাদিসের সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি বিধায় তা পালনীয় নয় মর্মে উল্লেখ করে জনগণকে হজরত আলী (আ.) কে যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, এরকমভাবে অনেকেই কোরআন বা হাদিসের অপপ্রয়োগ বা অপব্যাখ্যা করে এমন কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় যা সঠিক ধর্মীয় দৃষ্টিতে কখনোই গ্রহযোগ্য নয়, উল্লেখ্য, সে সময়ে অনেক প্রখ্যাত সাহাবিও (রা.) এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন। যদিও তারা পরবর্তীতে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে তাদের কর্মপন্থার মাধ্যমে তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ক্ষতিসাধনই করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের এই

আফগোস করার মাধ্যমে ইসলামের কোন কল্যাণ করা সম্ভব হয়নি আবার কোরআন বা হাদিসের এরূপ ব্যাখ্যা যে ভুল ছিল তাও জনসমক্ষে যথাযথভাবে প্রচার হয়নি। ফলে এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যাই সমাজে চালু হয়েছে।

হজরত হাসানের (রা.) বক্তৃতার প্রেক্ষিতে কুফার প্রভাবশালী নেতা হাজর ইবনে আদী বললেন-হে লোকেরা, আমিরুল মুমেনিন নিজের পুত্রকে পাঠিয়ে তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করো এবং হায়দরী পতাকা তলে সমবেত হয়ে ফিতনা ও বিপর্যয়ের অগ্নি নির্বাপিত করো । পরের দিন সকালে প্রায় সাড়ে নয় হাজার কুফাবাসীদের একটা বিরাট দল অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ইমাম হাসান (আ.) এর নেতৃত্বে রওয়ানা হলো এবং অবশিষ্ট সৈন্যদল গিয়ে হজরত আলী (আ.) এর মূল বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। উল্লেখ্য বিশ্ববিখ্যাত অলিকুল শিরোমণি হজরত ওয়ায়েস করনি (রা.) এখানেই হজরত আলী (আ.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধ :

৬৫৬ সালে ডিসেম্বর মাসে জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের সময় হজরত আলী (আ.)'র একজন সহচর সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দের জালে আটকা পড়েন। তিনি তাঁর চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন একদিকে হজরত আলী (আ.) এবং তাঁকে ঘিরে ইসলামের মহান ব্যক্তিগন উম্মুক্ত তরবারি হাতে দন্ডায়মান এবং অপরদিকে রয়েছেন রসুল (দ.) এর স্ত্রী হজরত আয়েশা (রা.) যার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ "এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মায়ের মত।" তিনি আরো দেখতে পেলেন হজরত আয়েশা (রা.) এর পার্শ্বে রয়েছেন হজরত তালহা (রা.) ইসলামের একজন অগ্রসেনা যার অতীত রেকর্ড অত্যন্ত উজ্জল, ইসলামের জন্য যুদ্ধে তিনি কৃতিত্বের দাবিদার এবং ইসলামের সেবায় যার বহু অবদান রয়েছে। তিনি আরো দেখলেন হজরত আয়েশা (রা.) পার্শ্বে রয়েছেন হজরত জুবায়ের (রা.) যার অতীত রেকর্ড হজরত তালহার(রা.) চেয়ে ভাল। এই বেচারা সাধারণ মুসলমানদের মতই দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন হজরত আলী (আ.), হজরত তালহা (রা.), হজরত জুবায়ের (রা.) এরা সবাই কি ইসলামের প্রথম সারির সৈনিক নন ? এখন তারা সংগ্রামরত কেন ? সত্যের কাছাকাছি অবস্থান কার ? এখন এই বিরোধে কি করা কর্তব্য ?

এই লোক আমিরুল মোমেনিনের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হলেন এবং বললেন, এটা কি সম্ভব যে হজরত তালহা (রা.), হজরত জুবায়ের ও হজরত আয়েশা (রা.) মিথ্যার পিছনে সংঘবদ্ধ হয়েছেন। আল্লাহর রসুলের এই সব সাহাবা যারা মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তারা কি ভুল করতে পারেন ? এটাও কি সম্ভব ? এর উত্তরে হজরত আলী (আ.) বলেছেন: "তুমি প্রতারিত হয়েছে, সত্য তোমার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের মাপকাঠিতে সত্য ও মিথ্যার পরিমাপ করা যায় না। এটা ঠিক নয় যে, তুমি প্রথমেই ব্যক্তিত্বের ওজন করবে এবং সেই ওজন দিয়ে সত্য ও মিথ্যার পরিমাপ করবে এইভাবে যে কোন কিছু এর সাথে খাপ খেলেই তা সত্য এবং তা না হলেই তা মিথ্যা, ব্যক্তি বিশেষকে কোনক্রমেই সত্য ও মিথ্যার মাপকাঠি করা যাবে না বরং সত্য এবং মিথ্যাই হবে ব্যক্তি বিশেষের মান ও তার ব্যক্তিত্বের মাপকাঠি।"

যুদ্ধের মধ্যে হজরত আলী (আ.) ঘোড়া অগ্রসর করে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থানে আসলেন এবং হজরত জুবায়েরকে (রা.) বললেন : হে আবু আবদুল্লাহ। তোমার কি সে দিনের কথা মনে আছে যেদিন রসুল (দ.) তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "তুমি কি আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখো ? তখন তুমি বলেছিলে হ্যাঁ রাখি আল্লাহর রসুল। রসুল (দ.) তোমাকে বলেছিলেন "একদিন তুমি তার (হজরত আলী (আ.)) বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। হজরত জুবায়ের (রা.) বললেন, হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়েছে।" এই কথা স্মরণ পড়ার সাথে সাথে জুবায়ের (রা.) যুদ্ধ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন এবং নিজের পুত্র আবদুল্লাকে বললেন আমি আর কোন ক্রমেই যুদ্ধ করতে পারবো না। কারণ আমরা অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত আছি। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করায় হজরত তালহা (রা.) যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। নারকীয় শয়তান মারওয়ান তাঁকে বিষমিশ্রত তীর নিক্ষেপ করলে এই তীরের আঘাতেই তার মৃত্যু হয়। অনুরূপ কথা তালহা (রা.) কে আলী (আ.) বললেন: তিনিও যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর (রা.), উম্মুল মোমেনিন হজরত আয়েশা (রা.) বিনতে আবুবকর (রা.) কে মদিনায় রেখে আসেন।

'আল কাসিতুন' (যারা অন্যায় আচরণ করে) নামে যাদেরকে হজরত আলী (আ.) অভিহিত করেছিলেন তারা ছিল প্রকৃত পক্ষে রাজনীতিক কপটাচার ও বিদ্রোহি মনোভাবাপন্ন। উল্লেখ্য যে এই শব্দটি পবিত্র কোরআনের এই আয়াত থেকে যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় (আল কাসতুন) তারা দোজখের ইন্ধন।" সুরা হাদীদ,আয়াত নং ১৫ থেকে নেয়া হয়েছে।

সরকারি ক্ষমতা নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করার জন্য হজরত আলী (আ.) এর সরকারের ও তার শাসন ক্ষমতার ভিত্তি বিনষ্ট করার নিমিত্তে তারা হত্যাকান্ডের আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় এসে তারা যা চায় তার কিছুটা তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনেকেই হজরত আলী (আ.) কে পরামর্শ দিয়েছিলো। কিন্তু তিনি এ অন্যায় প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কারণ এ ধরনের নীতিহীন কাজে ক্ষমতার ভাগাভাগি করার মত লোক তিনি ছিলেন না। অন্যায় কে মেনে নিয়ে তাতে স্বাক্ষর করার চেয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যেই তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। এই কাসিতুনদের নেতা মাবিয়া ও তার দল হজরত আলী (আ.) এর খেলাফতের ঘোর বিরোধিতা করে এবং তারাই তাদের অবৈধ কর্মতৎপরতা চালু রাখার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করার জন্য ওঠে পড়ে লেগে গেল।

এই "কাসিতুনদের নেতা মাবিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে বিশ্বের মুসলিম সমাজ আজ পর্যন্ত দিশেহারা। তাই মাবিয়ার সঠিক পরিচয় সকল মুসলমানদের জন্য জানা অপরিহার্য।

হজরত আলী (আ.) এর খেলাফত কালে মাবিয়ার কার্যকলাপ :

ইসলামের জঘন্যতম শত্রু আবু সুফিয়ান। তিনিই হজরত মুহাম্মদ (দ.) এর বিরুদ্ধে ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে কাফেরদের নেতৃত্ব দান করেন। ইসলামকে ধ্বংস করার এমন কোন প্রচেষ্টা বাকি ছিল না যা আবু সুফিয়ান করেন নাই। ইসলামের অন্য এক জঘন্য শত্রু উৎবা। এই উৎবার কন্যা হিন্দা। উবা বদর যুদ্ধে হজরত হামজা (রা.) হাতে নিহত হয়। ওহুদের যুদ্ধের সময় হিন্দা ওয়াসি নামক এক ক্রীতদাস দ্বারা হজরত হামজা (রা.) কে শহিদ করে। রসুল (দ.) এর শ্রদ্ধেয় চাচার পবিত্র মরদেহ হিন্দা বিকৃত করে তাঁর নাক, কান কেটে মালা গলায় পড়ে, এমন কি তার হৃৎপিন্ড বের করে চিবিয়েছিলো। এই রাক্ষসী হিন্দাই ছিল মাবিয়ার মাতা। আবু সুফিয়ান দম্পত্তি ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে ১১ জানুয়ারি মক্কা বিজয়ের সময় জীবন রক্ষার খাতিরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই সময়ে মাবিয়াও ইসলাম ধর্মে দাখিল হয়। মুসলমান হলেও রসুল (দ.) হিন্দার মুখ দর্শনে অস্বীকৃতি জানান। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নবি যার মুখ দর্শন করতে চান না তার চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে।

এই মাবিয়া তার পিতা-মাতার কুকর্মের পূর্ণ অনুসারী হিসেবে ইসলামের বৈধ খলিফার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, গুপ্ত হত্যা, কূটনীতি, ঘুষ, বিচারের নামে প্রহসন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মুসলমানদের নেতা হয়ে বসে। কি পদ্ধতিতে সে ক্ষমতা কুক্ষিগত করলো সেই পদ্ধতির বৈধতা বা অবৈধতার প্রশ্ন বা তার অন্যান্য জঘন্য কার্যকলাপের নিরপেক্ষ বিচার বিবেচনা বিশ্লেষণ করে যে কোন মানবিয় মূল্যবোধ সম্পন্ন লোকই তাকে সৎ বা ভালো লোক বলার মত ধৃষ্ঠতা বা দুঃসাহস দেখাবে না। অথচ সেই ব্যক্তির সকল অপকর্ম আলোচনা বা সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখার জন্য তাকে কখনো সাহাবা, কখনো 'কাতেবানে ওহি' কখনো 'মুজতাহিদ' প্রভৃতি বিশিষ্ট শব্দের আবরনে তার কর্মকান্ডের একটি ধর্মীয় যৌক্তিকতা খোজার প্রবনতা তার রাজত্বের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত অব্যহত আছে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও বাস্তব সত্য যে, মাবিয়া ফিতনা ইসলামের একটি বড় ধরনের সমস্যা। কারণ সাধারণত বলা হয়ে থাকে হজরত আলী (আ.) ও মাবিয়া পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে কি হবে এঁদের দুজনেই ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এক্ষেত্রে কোন মুসলমানকে সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করার সযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। কারণ কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের জন্য সকল প্রকার আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে যখন যুদ্ধের মত ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন বিবদমান সকল পক্ষ কিভাবে সঠিক পথে থাকে তা বোধগম্য নয়। কারণ পবিত্র কোরআনেই ঘোষণা করা হয়েছে: "মোমেনগন মোমেনগনের ভাই, তারা মুমেনদের প্রতি কোমল তবে কাফেরের প্রতি বজ্র কঠোর।"

আবার সুরা হুজুরাতের ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে আর যদি ঈমানদার লোকদের মধ্য হতে দুইটি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হইয়া পড়ে– তাহা হলে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। পরে তাদের মধ্যে হতে একটি দল অন্য দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন মূলক আচরণ করে তা হলে সীমা লঙ্ঘনকারীর দলটির সাথে লড়াই কর।

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াত সমূহে বিবাদমান দুইটি দলকে কোন ক্রমেই সঠিক পথে আছে বলা হয়নি। অথচ বিভিন্ন যুক্তি জালের আলোকে যেহেতু মাবিয়ার সম্পর্কে কোন খারাপ কথা বলা যাবে না মর্মে পূর্বেই স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাই বলা হয় উভয়েই ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাছাড়া ন্যায় যুদ্ধ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য সামরিক অভ্যুত্থান বা সামরিক কার্যক্রম গ্রহণকে একই মানদন্ডে মূল্যায়ন করা কখনো ন্যায় বিচার ও যুক্তির স্বার্থে গ্রহযোগ্য হতে পারেনা। পক্ষান্তরে অবৈধভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করার লক্ষ্যে মাবিয়া যে সব রাজনৈতিক চাল চালেন তা ভুল অথবা ইচ্ছাকৃত শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ ছিল এই সমস্যার সমাধানও আজ পর্যন্ত করা হয়নি।

হজরত ওমর (রা.) এর সময়ে ৬৩৬ সিরিয়া মুসলমানদের করতলগত হয়। তদানীন্তন খলিফা ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে মাবিয়াকে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেন। হজরত ওসমান (রা.) এর শাসনের শেষদিকে মাবিয়া সমগ্র সিরিয়ার শাসন কর্তৃত্ব পান। দীর্ঘ একুশ বৎসর ধরে সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে শাসন পরিচালনার ফলে প্রকারান্তরে মাবিয়া তথাকার স্থায়ি শাসকে পরিণত হন। সাধারণভাবে গভর্নরদের ২/৩ বছর পর বদলীর বিধান থাকলেও মাবিয়ার ক্ষেত্রে এই নিয়ম অজ্ঞাত কারণে অনুসরণ করা হয়নি।

সিরিয়ার ন্যায় একটি বিশাল প্রদেশ কার্যত স্বাধীনভাবে শাসন করার সুযোগ পাওয়ায় মাবিয়া বায়তুল মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাছাড়া সিরিয়া রোম সাম্রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত বিধায় সর্বদাই তাকে একটি বিশাল সেনাবাহিনী সুসজ্জিত রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। আর্থিক স্বচ্ছন্দ্য ও সেনাবাহিনী সুসজ্জিত রাখার অনুমতি এই দুইটি সুযোগকে মাবিয়া খুব উত্তমরূপে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন এবং এই দীর্ঘ সময়ের সযোগে উমাইয়া বংশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা তার ব্যক্তিগত একটি বিরাট শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। তার প্রতি এই বাহিনীর আনুগত্য খেলাফতের নির্দেশ নির্ভর ছিল না এটাং বরং একান্তই তার নিজস্ব বাহিনী ছিল। তাছাড়া কিছুদিন পূর্বে সিরিয়ার লোকেরা রোম সাম্রাজ্য হতে মুক্তি পেয়ে ইসলামি সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাই সিরিয়াবাসী বাহ্যত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও রোমান সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, জাঁকজমক ও শাহি চাল চলনের প্রতি অনুরাগ কাটিয়ে উঠতে পারে নাই। বিশেষ করে তাদের নেতা নও মুসলিম মাবিয়া নিজেই শাহি আচার-আচরণ গ্রহণ করে এবং রোম সম্রাটের ন্যায় জাঁকজমকপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে স্থানীয় লোকদের দীর্ঘকালের ইসলাম বিরোধী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভ্যাসগুলোকে সজীব রেখে নিজেকে তার প্রতিকৃতি হিসেবে উপস্থাপন করে। এই কারণেই মাবিয়া ও ইয়াজিদের সেনাবাহিনী ইসলামের ইতিহাসে যে জঘন্যতম ধর্মোদ্রোহী কাজ করেছে অন্য প্রদেশের মুসলমান এ ধরনের কাজ করতে কোন ক্রমেই সম্মত হতো বলে মনে হয় না। এই সমস্ত কাজের মধ্যে হুসেইন (আ.) কে নৃশংসভাবে হত্যা, রসুল (দ.) রওজা শরিফকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করা ও কাবাগৃহে অগ্নি সংযোগ অন্যতম। অর্থাৎ সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মাবিয়া হজরত ওসমান (রা.) এর প্রধান সেনাপতি হিসেবে ইসলামি দুনিয়ায় দুই নম্বর ব্যক্তিতে পরিগণিত হন। তাই এ সময়ে তার পূর্ব পুরুষের লালিত স্বপ্ন উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে। হজরত ওসমান (রা.) এর নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড তার সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের সুবর্ণ সুযোগ ডাকিয়া আনে।

ওসমান (রা.) এর আমলে রাজনৈতিক ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণে ইসলামের মূল ভিত্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, পরকালের জবাবদিহিতা ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক সৎ গুণাবলী অর্জনের সাধনা ইসলামি সমাজ থেকে প্রায় দূরীভূত হয়। তাই চতুর্থ খলিফার সময় এই ধরনের প্রকৃত ইসলামি জীবন-দর্শন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবর্তন করার চেষ্টা করা হলে, ক্ষমতাসীন শ্রেণি তা পছন্দ করতে পারে নাই। এ কারণেই হজরত আলী (আ.) এর খেলাফত তদানীন্তন উমাইয়া ধনিক শ্রেণির লোকেরা গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। তা ছাড়া আলী (আ.) কর্তৃক উমাইয়া গভর্নরদের পদচ্যুতি ও আলী (আ.) এর ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল বিধায় তারা সঠিকভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিল যে আলী (আ.) এর খলিফা হিসেবে ক্ষমতা বৃদ্ধির

তাৎপর্যই হচ্ছে উমাইয়াদের, ধনিক শ্রেণি ও বিলাস বহুল জীবন-যাপন করতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতা তথা প্রাধান্যের অবসান। এ কারণেই এরা সম্মিলিতভাবে আলী (আ.) এর খেলাফতকে কিভাবে দুর্বল করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় সে ব্যাপারে সবাই অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে ওসমান (রা.) এর আমলে মাবিয়ার মত ক্ষমতা লিপ্সু, দুনীতিপরায়ণ ও বায়তুল মালের অর্থ খেয়ানতকারী গভর্নরদের কারণেই বিভিন্ন প্রদেশে খেলাফতের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহিরাই এক পর্যায়ে হজরত ওসমান (রা.) এর বাসগৃহ আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে। এ ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য মুসলিম বিশ্ব কখনই প্রস্তুত ছিল না তাই এর একটা বিহিত হওয়া উচিত সবাই তা আশা করছিল। উমাইয়াগণ এ ধরনের জনমতকে আলী (আ.) বিরুদ্ধে ও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার ব্যাপারে সর্বাত্বক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এদের মধ্যে মাবিয়াই ছিলো সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যার সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অসবোর্ন বলেন, "বিচক্ষণ, বিবেকরহিত ও নির্মম, উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা তার নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এমন অপরাধ নাই যা করতে সংকোচ বোধ করতেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারণ করার জন্য হত্যাই ছিল তার চিরাচরিত রীতি। হজরতের দৌহিত্রকে (হাসান আ.) তিনি বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। আলী (আ.) এর বীর সহকারি মালিক আল-আশতারকে অনুরূপভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তার পুত্র ইয়াজিদের উত্তরাধিকার নিরাপদ করার জন্য মাবিয়া আলী (আ.) এর একমাত্র জীবিত পুত্র হুসাইনের সঙ্গে তার প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করতে দ্বিধা করেননি। তথাপি এই ধীর মস্তিষ্ক, হিসাবি, নাস্তিক ইসলামি এলাকার ওপর রাজত্ব করেছিলেন এবং ১২০ বছর কাল তার বংশধরদের হাতে রাজদন্ড অক্ষুণ্ন ছিল। (দ্য স্পিরিট অব ইসলাম-স্যার সৈয়দ আমির আলী-পৃ. ৪০১)।

মাবিয়া ইতোমধ্যেই তার উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। হজরত ওসমান (রা.) এর রক্তমাখা জামা ও হজরত নায়েলার কাটা আঙুল দামেস্কের মসজিদে লটকাইয়া দেওয়া হল। ভাড়াটে লোক এই সব জিনিস হাতে নিয়ে ওসমান (রা.) এর ফজিলত বর্ণনা করতো ও তার মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা বর্ণনা করতো। এই নিষ্ঠুরতম হত্যাকান্ডের ব্যাপারে হজরত আলী (আ.) এর সম্পৃক্ততার কথা বলে কেঁদে কেঁদে আহাজারি করতো। তাছাড়া মাবিয়া সিরিয়ার প্রতিটি নগর-বন্দর ও গ্রামে গ্রামে বেতনভূক বক্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তারা জনগণকে হজরত ওসমান (রা.) এর হত্যাকান্ডের বর্ণনা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করে কাঁদত। এইভাবে সে তার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন সকল অঞ্চলে ওসমান (রা.) হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষে প্রবল জনমত গড়ে তোলে। আর কূটনীতি, অর্থ ও পদের লোভ দেখিয়ে তদানীন্তন আরবের এক কালের বড় বড় সমর নায়কগণকে নিজের দলভুক্ত করে নিলো। এদের মধ্যে আমর ইবনুল আস, মুগিরা ইবনে শোবা, জিয়াদ ইবনে সামিয়া, মারওয়ান প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব মহা ধড়িবাজদের রাজনৈতিক অপকৌশল, কূটনৈতিক চালবাজি, মিথ্যাচার মুসলমানগণ পূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই। এদের বিপরীতে ইসলামি আদর্শ সমুন্নত রেখে শাসনকার্য পরিচালনা যে কি কষ্টকর ব্যাপার ছিল তার ব্যাপকতা ও জটিলতা শুধু আলী (আ.)–ই সম্যক অবহিত ছিলেন।

হজরত ওসমান (রা.) এর শাহাদতের পর হজরত আলী (আ.) প্রচলিত রীতি ও খোদায়ি বিধি-বিধান অনুযায়ী খলিফা নিযুক্ত হন। ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী বৈধ ভাবে নিয়োজিত রাষ্ট্র প্রধানের বৈধ নির্দেশ পালন করা ফরজ। হজরত ওসমান (রা.)– এর সময়ে নিয়োজিত প্রাদেশিক শাসনকর্তাগনের মধ্যে দুর্নীতিবাজ ও শরিয়ত বিরোধী কাজের নায়ক হিসেবে যারা কুখ্যাতি অর্জন করে, মাবিয়া ছিলেন তাদের অন্যতম। তাই হজরত আলী (আ.) খলিফা হয়ে এই প্রমাণিত দুনীতিবাজ গভর্নরকে পদচ্যুত করেন। মাবিয়া এই মহান খলিফা তথা রাষ্ট্র প্রধানের বৈধ নির্দেশ লজ্ঘন করেন। ফলে মাবিয়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ফরজ তরক করার দায়ে প্রকাশ্য কবিরা গোনাহের অভিযোগে অভিযুক্ত। আবার বৈধ সরকারের আদেশ অমান্যকারী একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী । উল্লেখ্য হজরত ওমর (রা.) খালেদ বিন অলিদকে পদচ্যুত করলে একজন মুসলমান হিসেবে উল্লেখিত কারণে তিনি তা মেনে নেন। হজরত ওসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের বিচার না করে হজরত আলী (আ.) তাদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বিধায় হত্যাকারীদের মাবিয়ার হাতে 'কিসাসের' আইন অনুযায়ী তুলে দেওয়ার যে দাবি জুবায়ের (রা.) তালহা (রা.) ও মাবিয়া উত্থাপন করে ছিলেন তা- পবিত্র কোরআন, যুক্তি ও ন্যায় বিচারের দিক থেকেই ছিল অগ্রহযোগ্য। প্রসঙ্গত বলা যায় যে হজরত ওসমান (রা.) এর শাসনকালে তাঁর ও তাঁর গভর্নরদের অনুসৃত নীতি, অবৈধ কার্যকলাপ, ধর্মীয় ও

অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইসলামি সাম্রাজ্যে এক ব্যাপক গণআন্দোলন সূচিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশে হাজার হাজার আন্দোলনকারীরা আন্দোলনের এক পর্যায়ে মদিনা অবরোধ করে এবং এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন হজরত ওসমান (রা.) কে শাহাদত করে। যদিও প্রকৃতপক্ষে খলিফার হত্যাকারী ছিল কয়েকজন কিন্তু যেহেতু এটা ছিল একটি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড এবং গণবিদ্রোহের মাধ্যমে তা সংঘটিত হয় তাই এককভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে এই হত্যাকান্ডের জন্য দোষী করার আইন সংগত কোন সুযোগ ছিল না। কারণ এই বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত বিদ্রোহি জনতা তাদের আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে দাবি করেছিল হজরত ওসমান (রা.) এর পদত্যাগ। হজরত ওসমান (রা.) এই দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানান। প্রকৃত পক্ষে এ কারণেই বিদ্রোহিদের কয়েকজন কুখ্যাত ব্যক্তি হজরত ওসমান (রা.) কে হত্যা করে। বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে আন্দোলনকারী হাজার হাজার জনতা হজরত ওসমান (রা.) পদত্যাগ করানোর ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এদের উপস্থিতি ও দাবির কারণেই কয়েকজনের কোন ভূমিকা সমস্যা। এই হত্যাকান্ডের যায় যে হজরত ওসমান বদহটি নুরের অধিকার একটি দল এই হত্যা কান্ড ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। তাই এই হত্যাকান্ডে আন্দোলনকারীদের কোন ভূমিকাই নাই একথা বলাও যুক্তি সংগত কারণেই সম্ভব নয়। এরপরে রয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীর সমস্যা। এই হত্যাকান্ডের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন হজরত ওসমান (রা.) এর স্ত্রী হজরত নায়েলা। প্রসঙ্গত বলা যায় যে হজরত ওসমান (রা.) সাথে রসুল (দ.) তাঁর দুই কন্যাকে বিবাহ দিয়েছিলেন এ কারণে তাঁকে 'যুন্নরাইন' বা দুইটি নুরের অধিকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু হজরত ওসমান (রা.) তাঁর শাহাদতের কিছু দিন পূর্বে নায়েলা নামক এক অল্প বয়সী মহিলাকে বিয়ে করেন। যদিও ইহা কোন আপাতদৃষ্টিতে শরিয়ত বিরোধী কাজ নয় তবুও রসুল (দ.) জামাতার এই কাজকে সাধারণ মুসলিমগণ ভাল চোখে দেখে নাই।

হজরত নায়েলাকে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এই হত্যাকান্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি হত্যাকারীদের চিনতে পারেননি বলে জানান। কারণ বাস্তবিক পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না কারণ এরা ছিল অন্য প্রদেশের লোক। তাছাড়া সেই যুগে মুসলিম পর্দানশীল মহিলার পক্ষে নিজের পরিবারেরই সীমিত সংখ্যক পুরুষ লোক দেখার সুযোগ ছিল। ওপরুন্তু পর্দাজনিত কারণে তিনি তাঁর মুখ ঢেকে ছিলেন বলে হত্যাকারীদের তিনি দেখতেও পারেননি। তবে হজরত নায়েলা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন যে মুহম্মদ ইবনে আবুবকর এই হত্যাকান্ডে জড়িত ছিলেন না। মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর হজরত ওসমান (রা.) এর দাড়ি মোবারক ধরায় ওসমান (রা.) বলেছিলেন "ভাতিজা তোমার বাবা আবুবকর (রা.) বেঁচে থাকলে এই দৃশ্য দেখলে তিনি কি মনে করতেন।" এই কথায় লজ্জা পেয়ে মুহম্মদ বিন আবুবকর সেই স্থান ত্যাগ করেন। মনে রাখতে হবে এসব কথা জানা সত্ত্বেও মাবিয়া তার প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য মুহম্মদ ইবনে আবুবকরকে ওসমানের (র.) এর হত্যাকারী হিসেবে মাবিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। পরবর্তীতে মাবিয়া সুযোগ পেয়েই মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর (রা.) কে রসুল (দ.) নির্দেশ বিরোধী পদ্ধতিতে আগুণে পুড়িয়ে হত্যা করেন।

এতে করে প্রমাণিত হয় যে, মাবিয়ার মতো হিংস্র, নিষ্ঠুর ব্যক্তির কাছে কোন ব্যক্তির বিচারের ভার অর্পণ করা কোনক্রমেই উচিত নয়। আর এই ধরনের চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কখনো ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায় বিচারক হতে পারে না। ওসমানের (রা.) রক্তের বদলা নেয়ার দাবি যে আসলে আলী (আ.) ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মাবিয়ার একটা অজুহাত ছাড়া কিছুই ছিলো না তা জঙ্গে জামালের পর আমর বিন আস এবং হজরত আয়েশা (রা.) মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোপকথন থেকে সুস্পষ্ট। আমর আয়েশা (রা.) কে বললেন : "আমার আশা ছিল জামালের যুদ্ধে আপনি নিহত হয়ে বেহেশতবাসী হয়ে যাবেন আর আমরা আলী (আ.) এর মানহানি ও কুৎসা রটনার জন্য আপনার মৃত্যুকে অত্যন্ত শক্তিশালী উছিলা পেয়ে যেতাম।" (কামিল, ১ পৃ-২৬৭)।

'কিসাস' সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার ১৭৮ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে, "ঈমানদারগণ তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির, দাসের বদলায় দাস, নারীর বদলায় নারী। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয় তবে প্রচলিত নিয়মে তার অনুসরণ এবং তা ভালভাবে প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সহজ ও বিশেষ অনুগ্রহ। তারপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য রয়েছে

কঠিন আজাব।” উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে ফিকাহবিদদের সর্বসম্মত অভিমত হলো : কিসাস গ্রহণ করার অধিকার নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রয়োগ করতে পারবেনা। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীরা নিজেরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অপরাধীকে হত্যা করতে পারবে না। এই অধিকার আদায় করার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা কোন অবস্থাতে কিসাস ওয়াজেব হয় এবং কোন অবস্থায় হয় না। এ সম্পর্কে আইনের অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক রয়েছে যা সকলের পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ উত্তেজনার বশে বাড়াবাড়ি করে ফেলতে পারে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ আছে (তফসিরে মাআরেফুল কোরআন, প্রথম খন্ড, অনুবাদ মহীউদ্দিন খান, প্রথম খন্ড, পৃ. ৫১৫) তাছাড়া আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার সুযোগ কোন ন্যায়ানুগ সরকারই দিতে পারে না।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে আমেরিকায় বিনা বিচারে উন্মুক্ত জনতা আসামিকে ফাঁসী দিত। এই পদ্ধতিকে লঞ্চিং (LYNCHING) বলা হতো। তবে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এই অবৈধ কর্মকান্ডকে প্রতিহত করে থাকে।

উক্ত বিশ্লেষণের আলোকে একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, হজরত ওসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের হজরত জোবায়ের (রা.), হজরত তালহা (রা.) বা মাবিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার যে দাবি জানানো হয়েছিল তা ইসলামি শরিয়ত, যুক্তি ও ন্যায় বিচারের নিরিখেই গ্রহণযোগ্য নয়।

‘কিসাস’ গ্রহণের ব্যাপারে যে বাস্তব সমস্যা ছিল সে সম্পর্কে জোবায়ের ও তালহা (রা.) কে হজরত কায়ফার (রা.) যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। হজরত কায়ফার (রা.) বলেন, ‘কিসাস’ গ্রহণের জন্যই প্রথমে ইমামত ও খেলাফতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত করা উচিত। উহাকে শক্তিশালী করা আবশ্যক। যাহাতে শাসনযন্ত্র সক্রিয় থাকে এবং তাহাতে কোন প্রকার দুর্বলতা দেখা না দেয়। এইভাবে শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তিতে পরিচালিত হইতে থাকিলে তখন হজরত ওসমান (রা.) এর ‘কিসাস’ গ্রহণ অতি সহজেই সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু দেশের শাসন ব্যবস্থাই যদি ঠিক না থাকে, শান্তি শৃংঙ্খলা যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হলে কাহারো পক্ষেই কিসাস গ্রহণ সম্ভব নয়। দেখুন এই বসরাতেই আপনারা (জুবায়ের (রা.) ও তালহা (রা.) এর দল) হজরত ওসমান (রা.) এর কিসাস গ্রহণের নামে বহু লোককে হত্যা করিয়াছেন। অথচ, হজরত ওসমান (রা.) হত্যা সংশ্লিষ্ট বিপ্লবাদীদের একজন প্রধান নেতাকেও আপনারা ধরিতে পারেন নাই। তাহাকে ধরিবার জন্য আপনারা যখন তাহার অনুসরণ করিয়াছেন তখন ৬০০০ হাজার লোক তাহার পক্ষাবলম্বন পূর্বক আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হইয়াই আপনারা তাহার অনুসরণে বিরত হইয়াছেন। (হজরত আলী (আ.) মওলানা মুজিবুর রহমান, পৃ-২০১-২০২)।

এ সম্পর্কে হজরত আলী (আ.) নিজেই বলেছেন “ওসমান হত্যা আইয়ামে জাহেলিয়ারই একটা আচরণ। আমি এই দাবির (ওসমান (রা.) হত্যার বিচার) প্রতি মোটেও নির্বিকার নই; কিন্তু এ পরিস্থিতিতে তারা (হত্যাকারীরা) আমার নাগালের বাইরে। যখনই তাদের ধরতে পারব, উচিত সাজা দিতে মোটও কসুর করবো না।” –তাবারি।

ওসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের মাবিয়ার হাতে তুলে দেয়ার দাবির প্রেক্ষিতে হজরত আলী (আ.) মাবিয়ার কাছে যে পত্র লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ:

“কোরায়েশ আমাদেরই গোত্র, তবুও তারা রসুলে করিমকে (দ.) হত্যা করতে চেয়েছিল, চেয়েছিল আমাদের বংশকে নিশ্চিহ্ন করতে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল– আমাদের ক্ষতি সাধনের জন্য করেছে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র। চেয়েছে আমাদের ভয় দেখাতে, আঘাত হানতে। তারা আমাদের গৃহ ও বাস্তভিটা থেকে করেছে বিতাড়িত, আমাদের বাধ্য করেছে শোয়ব-ই আবু তালিব গুহায় (এখানে রসুল (দ.) পরিবারের সদস্যদের গাছের পাতা খেয়ে দিন কাটাতে হয় এই অবস্থা প্রায় আড়াই বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল) গিয়ে আশ্রয় নিতে।

অত্যন্ত কঠিন ও দুঃখময় ছিল জীবন ওখানে– তেমন কঠিন জীবন-যাপন করতে তারা আমাদের করে ছিল বাধ্য। তারা শুধু নিজেদের গোত্রকে নয়, অন্যান্য গোত্রদেরকে আমাদের বিরুদ্ধ লড়াই করতে উস্কিয়েছিল। পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছেন– তিনি আমাদের রক্ষা করেছেন– বাঁচিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যাদের রসুল ও ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ছিল-তারা রসুল আর তার প্রচারিত ধর্মকে রক্ষা করতে হয়েছিল দন্ডায়মান। তারা শুধু আল্লাহর রহমতেরই ছিল প্রার্থী। আমাদের মধ্যে (বনি হাশিম) যারা তখন ইসলাম কবুল করেনি (যেমন আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিব) তারাও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। কারণ তারাও আমাদের আর আমরাও তাদের ছিলাম (অর্থাৎ একই বংশের অন্তর্ভুক্ত)। কোরায়েশদের মধ্যে যারা যারা ইসলাম কবুল করেছিল, তাদের অবস্থা খুব মন্দ ছিল না। হয় তাদের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের আত্মরক্ষামূলক সন্ধি ছিল অথবা ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও কোন কোন গোত্র স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে ওদের সাহায্যে এসেছিল এগিয়ে।

যখনই কোন যুদ্ধে রসুল (দ.) এর সংঙ্গীদের কেউ যদি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতো– যা অনেক সময় ঘটতো অথবা কেউ যদি মুসলিম সৈন্যদের আতঙ্কিত করে তুলতো, তখন হজরত (দ.) নিজের বংশের (বনি হাশিমদের) লোকদের পাঠিয়ে দিতেন যুদ্ধ করতে ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের শত্রুর আক্রমন থেকে বাঁচাতে। অনেক সময় বনি হাশিমকে শত্রুর বিরুদ্ধে একাও লড়তে হয়েছে এমন লড়াইয়ে অনেকে শাহাদত বরণ করেছেন, যেমন ওবাইদা ইবন হারিস শহিদ হয়েছেন বদর যুদ্ধে, (৬২২ ইং) হামজা ইবন আবদুল মোত্তালিব ওহোদের যুদ্ধে (৬২৭ইং) আর জাফর ইবনে আবু তালিব মুতার যুদ্ধে (৬২৯ ইং)। এছাড়া আরো একজন (এখানে তিনি নিজের প্রতিই ইংগি করেছেন) শাহাদত বরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, আমি তাঁর নাম উল্লেখ করতে পারতাম, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর তারিখ আগেই নির্ধারিত হয়ে আছে। তাই এসব যুদ্ধে তিনি বেঁচে গেছেন।

হে সময় ! হে পৃথিবী ! তোমাদের খেয়ালীপনা দেখে আমি রীতিমত অবাক ! লোকেরা এমন লোককে (মাবিয়ার প্রতি ইঙ্গিত) আমার সমকক্ষ মনে করতে শুরু করেছে, যে সারা জীবন ইসলাম বা আল্লাহর জন্য কিছুই করেনি। অথচ জীবনের প্রতিটি দিন আমি তা করে এসেছি। আমার সঙ্গে তুলিত হতে পারবার মত ইসলামে তার তেমন কোন পদ, পদবী, সম্মান ও মর্যাদা নেই। এক মুনাফিক ছাড়া এ বিষয়ে কেউই তাকে আমার ওপর প্রাধান্য দিতে পারে না। আমার মত এমন একাগ্র নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সঙ্গে ইসলাম আর ইসলামের রসুলের সেবা আর কে করেছে আমার জানা নাই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ সাক্ষী– আমি যা বলেছি তার কণামাত্র মিথ্যা নয়। এসব ব্যাপারে আমার সঙ্গে কারো তুলনাই চলে না। সব গৌরব, প্রশংসা আর মাহাত্ম্যের মালিক একমাত্র আল্লাহই– আর কেউ নয়।

তুমি লিখেছ ওসমান হত্যার জন্য যারা দায়ি, তাদের সবাইকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি– দেখেছি এ করা আমার বা অন্য কারো সাধ্য নয়। আমি আমার জীবনের শপথ নিয়ে বলছি তুমি যদি তোমার মুনাফেকি লোভ আর বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ না করো, তাহলে তারা (ওসমান হত্যাকারীগণ) একদিন তোমার সামনে গিয়েও হাজির হবে। তখন তুমি যেমন আজ ওদের জীবন দাবি করছে, সেদিন ওরাও তোমার জীবন দাবি করে বসবে। স্থলে, জলে, সমতলে। আর পাহাড়-পর্বতে, সর্বত্রই তখন তুমি তাদের উপস্থিতি দেখতে পাবে আর তাদের মোকাবিলা করা তখন তোমার পক্ষে মোটেও হবে না সহজ- আর তুমি অভিসম্পাত দেবে সেদিনকে, যেদিন তুমি ওদের হাতে পাওয়ার জন্য তুলেছিলে দাবি। (হজরত আলী , লেখক আবুল ফজল- পৃ- ১৬৪-১৬৫)।

মাবিয়া হজরত ওসমান (রা.) এর আত্মীয়তার সূত্র ধরে 'কিসাস' এর যে দাবি করেছিল প্রকৃতপক্ষে ভিত্তিহীন ছিল। কারণ মাবিয়া হজরত ওসমান (রা.) কোন বৈধ উত্তরাধিকারী ছিল না। মাবিয়ার সাথে হজরত ওসমানের (রা.) সম্পর্ক ছিল এরূপ : উমাইয়ার দুই পুত্র হারব ও আবুল আস। হারবের পুত্র আবু সুফিয়ান ও তার পুত্র মাবিয়া অন্যদিকে আসের পুত্র আফফান ও তার পুত্র ওসমান (রা.)। তাই কিসাসের বিধান অনুযায়ী এত দূরবর্তী আত্মীয় এ ধরনের অভিযোগ করার জন্য আইনানুগ ব্যক্তি ছিলেন না। ওপরুন্ত হজরত ওসমান (রা.) স্ত্রী, পুত্র, কন্যা জীবিত থাকায় মাবিয়ার জন্য এই দাবি করা একেবারেই অবৈধ ও অযৌক্তিক ছিল।

প্রসঙ্গত আরো বলা যায় যে, একজন বৈধ খলিফা প্রাক্তন খলিফার মৃত্যুর বিচার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় না রেখে দুর্নীতির দায়ে পদচ্যুত একজন সরকারি কর্মচারীর নিকট হত্যার দায়ে অভিযুক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গকে হস্তান্তর করা কোরআন হাদিস ও ন্যায় বিচারের নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ ব্যাপারে আরো বলা যায় যে মাবিয়া যখন পুরোপুরি সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসেন তখন ওসমান (রা.) এর কন্যা মাবিয়ার কাছে তার পিতার হত্যাকারীদের বিচার দাবি করলে মাবিয়া বলেন, ওসমান (রা.) হত্যাকারীদের বিচার করা হলে তুমি আর আমিরুল মোমেনিনের ভাতিজী থাকবে না বরং এক সাধারণ মহিলায় পর্যবসিত হবে। তাই এ ব্যাপারে আর কোন উচ্চবাচ্য করো না। (আল এ রসুল ও মাবিয়া- ফল এ মওলা- মঞ্জুর আলম কাদেরি)। একারণে ওসমান (রা.) হত্যাকারীদের বিচার মাবিয়া করেননি। এতে করে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে ওসমান (রা.) হত্যাকারীদের বিচার তথা 'কিসাসের' ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ বা আগ্রহ কিছুই ছিল না। বরং তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য তিনি হজরত আলী (আ.) এর নিকট এ ধরনের অবৈধ দাবি উত্থাপন করেছিলেন।

হজরত আলী (আ.) সঠিকভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, মাবিয়া কিছুতেই তাঁর খেলাফত মেনে নেবে না। হজরত ওসমান (রা.) এর হত্যাকান্ডের প্রতিশোধের দাবি মাবিয়ার একটি রাজনৈতিক চালমাত্র। কিন্তু তবুও তিনি মাবিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার পূর্বে আর একবার শান্তির চেষ্টা করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই হজরত আলী (আ.)র দূত জরির বিন আবদুল্লাহ দামেস্কে উপনীত হলেন। জরির মাবিয়াকে হজরত আলী (আ.) পত্র অর্পণ করলেন। পত্রে হজরত আলী (আ.) লেখেছেন :

"তোমার ও তোমার অধীনস্থ লোকদের– সকলেরই আমার বায়াত করা অবশ্য কর্তব্য-ফরজ। কারণ মোহাজেরিন ও আনসারগণ সর্ব সম্মত্তিক্রমে আমাকে খলিফা নির্বাচিত করিয়াছেন। আবুবকর (রা.), ওমর (রা.), ও ওসমান (রা.)কে ইহারাই নির্বাচিত করিয়াছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই ব্যাপারে বিরোধীতা করিবে বা অন্যকে বিরোধীতা করিতে উৎসাহিত করিবে, তাহাকে বলপূর্বক আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করা হইবে। সুতরাং তুমি মোহাজেরিন ও আনসারদের অনুসরণ করো" ইহাই সর্বোত্তম পন্থা নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

"ওসমান (রা.) এর হত্যাকান্ডকে তুমি তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উছিলা হিসেবে তুমি গ্রহণ করিয়াছ। ওসমান (রা.) হত্যাকারীদের নিকট থেকে কাসাস গ্রহণে যদি সত্যিই তোমার ইচ্ছা থাকিয়া থাকে, তবে প্রথমে তুমি তোমার আনুগত্য স্বীকার করো, অতঃপর যথা নিয়মে মোকদ্দমা পেশ করো। আমি আল্লাহর কিতাব ও সুন্নতে রসুলুল্লাহ (দ.) মোতাবেক ফয়সালা করিব। নতুবা তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহা নিছক ধোকা ও প্রতারণা মাত্র। (হজরত আলী (আ.) মুজিবুর রহমান পৃ. ২৩৯)।

উত্তরে মাবিয়া জানালেন আগে ওসমান (রা.) হত্যাকারীর কতল করা হোক। তারপর মুসলমানরা মিলে স্বাধীনভাবে করুক খলিফা নির্বাচন। তাহলেই সে মানতে রাজি আছে তেমন খলিফাকে। (হজরত আলী- আবদুল ফজল- পৃ. ৭৪)।

"কাজেই মাবিয়া যে কোন ধর্মীয় বা শরিয়ত সম্মত পন্থায় এ সমস্যা সমাধানে আগ্রহী ছিলো না তা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। মাবিয়ার নীতি ও ধর্ম মিথ্যাচারের নমুনার কিছুটা নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

"গোড়াতে তিনি (মাবিয়া) তালহা আর জুবায়েরকে নিজের পক্ষে ভিড়াতে চেয়েছিলেন। –দিয়েছিলেন কপট আশ্বাস। সিরিয়ায় বসে মাবিয়া যখন শুনতে পেলেন ওসমান (রা.) নিহত হওয়ার পর লোকে হজরত আলীর বায়াত গ্রহণ করেছে। তখন তিনি ঝটপট জোবায়েরকে লিখে পাঠালেন। আমি ইতোমধ্যে আপনার প্রতি বাইয়াত গ্রহণ করে বসেছি, আর বাইয়াত নিয়েছি আপনার পরবর্তী খলিফা হিসেবে তালহার ওপর।" এভাবে মাবিয়া চাইলেন এক গুলিতে দুই পাখি শিকার করতে। সঙ্গে সঙ্গে এ আশ্বাসও দিলেন, সমগ্র সিরিয়ার অকুণ্ঠ সমর্থন তারা পাবেন। দামেস্কে তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে খেলাফতের আসন। তারা যেন এসে দয়া করে তা গ্রহণ করেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধ ও অন্যান্য ব্যাপারে হজরত আলী (আ.) যখন ব্যস্ত, তখন মাবিয়া নির্বিঘ্নে নিজের শক্তি বৃদ্ধি ও ব্যাপক প্রস্তুতির সুযোগও পেয়েছিলেন। তালহা ও জোবায়ের ইহলোকে আর নেই শুনে ত্বরিতকর্মা মাবিয়া,

মারোওয়ান, ইবন কাইম, অলিদ ইবনই-আকাবা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা, আমর ইবন আস প্রমুখকে নানাভাবে প্ররোচনা দিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে নিলেন। (এ কারণেই এদের বর্ণিত হাদিস সমূহ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে।) শেষোক্ত জনকে (আমর ইবন-ই আস) ভিড়াতে দশ লাখ দিনার আর মিশরের শাসনকর্তার পদ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল। (হজরত আলী (আ.) আবুল ফজল পৃ. ৭৫) ৬৫৭ সালে হজরত আলী (আ.) যুদ্ধ যাত্রার খবর মাবিয়ার কানে পৌঁছতেই তিনিও সসৈন্য যাত্রা করলেন খলিফা বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য। তারাও তাবু গাড়লো সিফ্‌ফিন এর অন্য প্রান্তে। এইভাবে দুই বাহিনী শক্তি পরীক্ষার জন্য মুখোমুখি দাঁড়ালো সিফ্‌ফিন এর প্রান্তরে।

সিফফিনের যুদ্ধ :

মহান খলিফা আসন্ন যুদ্ধের কথা চিন্তা করে যার পর নাই চিন্তিত হলেন তাই যুদ্ধ এড়ানোর জন্য আবার তিন সদস্যের এক শান্তি মিশন পাঠালেন মাবিয়ার কাছে। মিশনের বশির নামক সদস্য মাবিয়াকে সম্বোধন করে বলেন : হে মাবিয়া এ জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আল্লাহর সামনে তোমাকে যেতে হবে। একদিন করতে হবে তোমার কার্যকলাপের জবাবদিহি। আমি আল্লাহর নামে তোমাকে অনুরাধ জানাচ্ছি– মুসলমানে-মুসলমানে বিবাদের বীজ বপন করো না। গৃহ যুদ্ধের সূচনা করে পাতু করো না মুসলমানদের রক্তের।

তোমার দোস্ত আলীকে এ পরামর্শ দাওনা কেন ? বিদ্রুপ-মিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠলেন মাবিয়া। উত্তরে বশির বললেন, “তোমার তুলনায় আলী (আ.) ব্যাপারটা কিছু আলাদা নয় কি ? তিনি অত্যন্ত সুপন্ডিত মানুষ। মুসলমানদের মধ্যে তার আসনও অনেক উচ্চে। আল্লাহর রসুলের ওপর যারা প্রথম ঈমান এনেছিলেন তার মধ্যে তিনি অন্যতম। তার ওপর তিনি রসুলের নিকটতম আত্মীয় (আহলে বায়াত) এসব কারণে খেলাফতের তিনিই তো সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার। তোমার উচিত তার বাইয়াত গ্রহণ করে দ্বীন-দুনিয়া দুই জাহানের সুনামের ভাগী হও।”

“তুমি কি বলতে চাও ওসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধের দাবি আমি ছেড়ে দেবো? আল্লাহর নামে বলছি, তা আমি কখনো ছাড়বো না, বললেন মাবিয়া।

এবার শান্তি মিশনের অন্য সদস্য শরবত বিন রবয়ি : মাবিয়া তুমি কি বলতে চাও তা আমরা জানি। হজরত ওসমানের (রা.) গৃহ যখন আক্রান্ত হয়েছিল, তুমিত তাঁর সাহায্যে ছুঁটে যাওনি, বরং সুযোগ দিয়েছ তার আততায়ীদের। এখন তার হত্যাকে তুমি খেলাফত দখলের একটা অজুহাত করে নিয়েছ। জেনে রাখো, এতে তোমার ভালো হবে না। অকৃতকার্য হলে থাকবে না তোমার দুর্গতির সীমা। যদি সফলও হও তাহলে দোযখের আগুণ থেকে নেই তোমার পরিত্রাণ।

“একথা শুনে মাবিয়া ক্রোধে ফেটে পড়লো। যাও সরে পড়ো তলোয়ারই করবে সব কিছুর মীমাংসা। শান্তি মিশন ফিরে এল শূন্য হাতে । (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭)।

৩৬ হিজরির (৬৫৮) জিলহাজ্ব মাসে “শুরু হলো একক যুদ্ধ এরপরে কয়েকদিন পর শুরু হলো খন্ডযুদ্ধ” কিন্তু আমিরুল মোমেনিন আল্লাহর নির্দেশের আলোকে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য পুনরায় সাহাবি হজরত আবু সায়েদ (রা.) এর নেতৃত্বে মাবিয়ার সাথে শেষবার আলোচনার জন্য একটি প্রতিনিধি দল গঠন করলেন। এই দলের নেতা ছিলেন বিখ্যাত হাতেম তাঈর পুত্র আদি ইবনে হাতিম। প্রতিনিধি দল মাবিয়ার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমরা প্রেম ও শান্তির প্রস্তাব নিয়েই এসেছি। আপনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ গৃহ যুদ্ধের অবসান ঘটবে। ঘটবেনা কোন রক্তপাত। ভেবে দেখুন, আলী (আ.) আপনার ভাই, মুসলমানদের মধ্যে এখন তিনি উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত। আপনি আর আপনার অনুবতীরা ছাড়া আর সবাই তাকে খলিফা মেনে নিয়েছে। দয়া করে আপনিও তাঁকে খলিফা মেনে নিন। অবসান ঘটুক এ কলহের। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে মাবিয়ার কাছে হজরত আলী (আ.) সাথে তাঁর যুদ্ধের কারণ জানতে চাইলে মাবিয়া পুনরায় বলেন যে হজরত আলী (আ.) ওসমান হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়াছেন, যদি তিনি তাহাদিগকে আমার (মাবিয়ার) নিকট সমর্পণ করেন তাহলে আমিই সর্বপ্রথম তাঁহার হাতে বাইয়াত করিতে প্রস্তুত আছি। এই মিশনও ব্যর্থ হল।

মাবিয়ার প্রতিনিধি হাবিব বিন মোসলেমা হজরত আলী (আ.) সাথে দেখা করে অন্যায় ও অসংগতভাবে হজরত আলীকে (রা.) কে হজরত ওসমান (রা.) এর হত্যার ব্যাপারে দায়ি করেন। ওপরন্তু ওসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের মাবিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে পুনরায় দাবি উত্থাপন করে হজরত আলীকে (রা.) খেলাফতের পদ হতে সরে যাওয়ার শর্ত আরোপ করেন। হজরত আলী (আ.) এর প্রেক্ষিতে বলেন খেলাফত ও ইমাম (নেতৃত্ব) সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার মদিনার মাহাজের ও আনসার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির (এ পর্যায়ে) নাই। অতঃপর তিনি বলেন : আমি তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি যে তোমরা কি করে মাবিয়ার বশীভূত হলে : একসময় যার পিতামাতা ও পরিবার সবাই তো মুসলমানদের বিরোধিতা করেছে। এবং প্রাণ বাঁচানোর জন্য অন্য কোন উপায় না দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তোমরা এ ধরনের লোকের সাহায্য করছে এবং আহলে বায়াতের সাথে শত্রুতা করছে। পক্ষান্তরে আমি (আলী (আ.)) আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী খেলাফত পরিচালনা করছি ও শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করছি।

এই কথা শুনে মাবিয়ার প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করল আপনি একবার সাক্ষ্য দেন না যে, হজরত ওসমান (রা.) মজলুম (অত্যাচারিত) ভাবে শহিদ হইয়াছেন ? হজরত আলী (আ.) ও জওয়াব দিলেন, “একজন খলিফা কিভাবে জালিম অথবা মজলুম হবেন ?” ইহার পর কোন সমঝোতার চেষ্টা হইল না। উল্লেখিত প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে যে কোন নিরপেক্ষ লোকই বলতে বাধ্য হবে যে সিফ্‌ফনের যুদ্ধের দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে মাবিয়ার ওপরই বর্তায়। তাই কোরআন ও হাদিসের আলোকে প্রকৃত অবস্থা যাচাই করেই প্রখ্যাত আওলিয়া ও ফকিহ হজরত হাসান বসরি (রা.) সঠিকভাবেই বলেছেন মাবিয়ার চারটি অপকর্মই এমনই ঘৃণ্য যে এর যে কোন একটিই একজন মানুষের ধ্বংসের (পথভ্রষ্ট/দোজখে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সেগুলি হচ্ছে : উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, পরামর্শ ব্যতীত ক্ষমতা হস্তান্তর করুন, জায়েদ ইবনে সুমাইয়াকে পরিবারভুক্ত করন এবং হাজর ইবনে আদি (রা.) ও তার অনুসারীদের নিধন।

৩৭ হিজরির (৬৫৭) পহেলা সফর শুরু হলো এই ভয়াবহ যুদ্ধ। এক সপ্তাহ ধরে জয় পরাজয় রইলো অনিশ্চিত। অষ্টম দিনে সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে হজরত আলী (আ.) দিলেন এক অনলবর্ষী বক্তৃতা। আর নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। সারা রাত ধরে যুদ্ধ চললো। দুই পক্ষে অসংখ্য সৈন্য হতাহত হলো। খলিফার পক্ষ শহিদ হলেন বিশ্ব বিখ্যাত আউলিয়া হজরত ওয়েস করনি (রা.), কাদসিয়া বিজয়ী হাশিম আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.) বয়স তখন তাঁর নব্বই ওপরে তবুও তিনি অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করছেন মাবিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে। হাশিমকে শহিদ হতে দেখে তিনি বলে উঠলেন হাশিম তুমি কি ভাগ্যবান। ঐ বেহেস্ত দেখা যায়, আমি যেন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তুমি তাতে প্রবেশ করছ আর হুর গেলমানেরা তোমায় জানাচ্ছে সাদর সম্ভাষণ। এই বলে বৃদ্ধ নব বলে বলীয়ন হয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু বাহিনীর ওপর। অচিরেই তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হলো। অর্থাৎ তিনিও শহিদ হলেন। রসুল (দ.) বলেছিলেন “আম্মার, একদিন এক অবিশ্বাসী ও খোদাদ্রোহী দলের হাতে তুমি নিহত হবে।” এই হাদিস সর্বজন বিদিত ছিল বলে সবাই বুঝতে পারল যে প্রকৃতপক্ষে মাবিয়া অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত আছে– ফলে মাবিয়ার সৈন্যদলে মারাত্মক হতাশা দেখা দিল। হজরত আম্মার (রা.) এর হত্যা করার পর তাঁর পবিত্র মস্তক মাবিয়ার কাছে নিয়ে আসা হলো যা রসুল (দ.) এর পবিত্র নির্দেশ লজ্ঘন। মাবিয়া হত্যাকারীকে প্রচুর অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

এমনিভাবে জাহেলিয়াত যুগের মৃতদেহের অবমাননার যে রীতি চালু ছিল মাবিয়া এই জঘন্যতম অমানবিক শরিয়ত বিরোধী রীতি পুন প্রবর্তন করেন। আম্মার (রা.) এর হত্যা সম্পর্কে উক্ত হাদিসের মাবিয়া ব্যাখ্যা দিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে আম্মারের হত্যাকারী তারাই যারা আম্মারকে এই যুদ্ধে আসতে উৎসাহিত করেছে। এই যুক্তির প্রেক্ষিতে হজরত আলী (আ.) বলেছিলেন মাবিয়ার যুক্তি যদি সঠিক হয় তবে বলতে হবে বদর ও ওহুদ যুদ্ধে যে সব বুজর্গ শাহাদত বরণ করেছেন যাদের নেতা ছিলেন আমির হামজা (রা.) এর মত মহান ব্যক্তিত্ব তাকে কাফেররা হত্যা করে নাই বরং রসুল (দ.) স্বয়ং তাদের হত্যা করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)।

ন্যায় যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে দুষ্টের শিরোমনি কুচক্রী আমর ইবনুল আস মাবিয়াকে পরামর্শ দিলো, কোরআনের পাতা ছিড়ে বর্শার মাথায় গেঁথে তুলে ধরো। আমাদের সৈন্যদেরকে তা করতে বলো। ওদের মধ্যে কেউ যদি কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে না চায় তাহলে শুরু হবে ওদের দলে বিভেদ ও অনৈক্য আর শ্রদ্ধা দেখিয়ে যদি যুদ্ধ থামায় তাহলে আমরা বেঁচে যাব। মাবিয়ার দল এই শয়তানী বুদ্ধি দ্বারা পবিত্র

কোরআনকে বর্শার আগায় নিয়ে কোরআনের যে বেইজ্জতি করলো তার কোন উদাহরণ দুনিয়ায় আর পাওয়া যায় না। কোন মুসলমান পবিত্র কোরআনকে এহেন পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারে না। তাই এহেন জঘন্য কাজ করার জন্যেও মাবিয়া ধর্মদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। এ বিষয়টি আলীর (রা.) সৈন্যদল বুঝতে ব্যর্থ হলো। তাই মাবিয়া বাহিনীর তরফ থেকে যখন বলা হলো 'আল্লাহর কালাম', 'আল্লাহর কালাম', 'আল্লাহর কালাম' অনুসারেই আমাদের মীমাংসা হোক। আল্লাহর কালামই বিচার করুক আমাদের ও তোমাদের সমস্যা।"

হজরত আলী (আ.) বুঝতে পারলেন এ স্রেফ একটা চাল। শত্রুপক্ষ কোন রকমে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচতে চায়। নিজের দলকে তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন– এ শুধু শত্রুর ছলচাতুরী। হজরত আলী (আ.) বললেন ? তারা পবিত্র কোরআনের লেখা ও কথার। আড়ালে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চায়। পরে তারা তাদের চিরাচরিত বিরোধী ভূমিকাই গ্রহণ করবে। যখন কোরআনে বর্ণিত সত্যের বিরোধিতা করা হয় তখন তার কাগজ ও বাঁধাই কার্যত মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আমি নিজেই হচ্ছি বাস্তবতা ও পবিত্র কোরআনের সত্যিকার প্রকাশ– কোরানে নাতেক"। পুস্তকাকারে কোরআন কথা বলে না কিন্তু ব্যক্তির মাধ্যমে কোরআনের সঠিক আদেশ নিষেধ প্রকাশিত ও বিকশিত হয় এ কারণেই এই "জীবন্ত কোরআনকেই" ধর্মের দুশমনেরা সবচেয়ে বেশি ভয় করে এবং যেনতেন প্রকারে এই সব। জীবন্ত কোরআনকে অবদমিত, বিপর্যস্ত বা হত্যা করাই শয়তান তথা ধর্মাদ্রোহীর প্রধান উপজীব্য।

ভালো মন্দের প্রভেদ নিরূপণে অক্ষম, অজ্ঞ, ও ধর্মের রক্ষাকারী একদল লোক। যাদের সংখ্যা মোটেও কম ছিল না- হজরত আলী (আ.) যুদ্ধ বন্ধ না করার নির্দেশে পরস্পরের দিকে ইশারা ইংগিত করলো তারা বলে উঠলো : হজরত আলী (আ.) কি বোঝাতে চাইছেন ? আমরা কি কোরআনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের সংগ্রাম এবং তারা এখন কোরআনের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে। কাজেই আমরা কি জন্যে যুদ্ধ করবো ? হজরত আলী (আ.) বললেন, আমিও বলছি ? আমি কোরআনের জন্য যুদ্ধ করছি। কিন্তু কোরআনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য পবিত্র কোরআনের কথা কাগজ ও লেখাকে তুলে ধরেছে মাত্র।

হজরত আলী (আ.) বললেন : যদি প্রকৃত ও তেজস্বী মুসলমান থাকে তাহলে ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে মুসলমানদের বিজয়কে সুনিন্ডিত করার জন্য আক্রমণ করা। প্রকৃতপক্ষে পুস্তক কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের মূলে রয়েছে তার অন্তর্নিহিত অর্থ। কোরআনের অন্তর্নিহিত অর্থের জন্যই আজকের সংগ্রাম। কিন্তু এই সব লোকেরা কোরআনের প্রকৃত অর্থকে বিনষ্ট করার পন্থা হিসেবে পুস্তক কোরআনের পৃষ্ঠাগুলোকে তুলে ধরেছে।

তারা বললো : আমরা কোরআনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। আমরা জানি যে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পাপ এবং এইরূপ যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আমরা হত্যাকান্ড চালাবো। যারা কোরআনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। বিজয় অর্জনের জন্য মাত্র একঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন ছিল। মালিক আসতার যুদ্ধ চালু রাখার জন্য মাত্র কয়েক মিনিট সময় চাইলেন, অনুমতি দেওয়া হলে যুদ্ধ শেষ করে শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করেই তিনি ফিরবেন। কিন্তু ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী এই সম্প্রদায় বলে যদি মালিক আসতারকে যুদ্ধ বন্ধ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহলে তারা হজরত আলী (আ.) হত্যা করবে বলে হুমকি দিলো। তখন আবার খবর পাঠানো হলো যে মালিক যদি হজরত আলী (আ.) কে জীবিত দেখতে চান তাহলে তিনি যেন যুদ্ধ বন্ধ করে ফিরে আসেন। মালিক আসতার ফিরে এলেন এবং শত্রুপক্ষ তাদের কৌশল সফল হওয়ার আনন্দে মেতে উঠল।

যুদ্ধ বন্ধ করা হলো যাতে উভয় পক্ষ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পবিত্র কোরআনের দ্বারস্থ হতে পারেন। একটি সালিশী কমিটি গঠন করা হলো এবং উভয় পক্ষের সম্মতি অনুযায়ী কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য দুপক্ষ থেকেই মধ্যস্থতাকারী মনোনীত করা হলো। যাতে উভয় পক্ষের শত্রুতার অবসান ঘটে এবং উভয়পক্ষের মধ্যে বিরাজমান মতদ্বৈততার সাথে আরও একটি মতদ্বৈততা যুক্ত হয়ে পরিস্থিতির অবনতি না ঘটে।

হজরত আলী (আ.) বলেছিলেন তারা তাদের পক্ষের মধ্যস্থতাকারী বেছে নিক, পরে তিনি তাঁর প্রতিনিধি মনোনয়ন করবেন। তারা কিছু মাত্র দ্বিধা না করে সর্ব সম্মত্তিক্রমে ঘোর কুচক্রী ও চালবাজ আমর ইবনুল আসকে সালিশ মনোনীত করলেন।

হজরত আলী (আ.) কোরআনের বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী ও রাজনীতিতে অভিজ্ঞ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) অথবা স্বার্থত্যাগী, ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী মালিক আশতারকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগের কথা বললেন। তাতে তারা রাজি হলোনা। তারা আবু মুসা আল-আশআরি-কে নিয়োগ করা পছন্দ করলে হজরত আলী (আ.) বললেন জঙ্গে জামালের পূর্বে যে আলী (আ.) এর বিরোধী ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলো এ ধরনের ব্যক্তিকে এ মধ্যস্থতাকারীর মত গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা সঠিক নয়। কিন্তু এই অজ্ঞ লোকেরা জিদ করে বসলো যে অন্য কারো নিয়োগ তারা মেনে নেবে না। অতঃপর হজরত আলী (আ.) বললেন বিষয়টি যখন এতদূর গড়িয়েছে তখন তাদের যা ইচ্ছা তাই তারা করুক। কাজেই শেষ পর্যন্ত হজরত আলী (আ.) এবং তার সংঙ্গীদের পক্ষ থেকে আবু মুসাকেই মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হলো।

অবশেষে একটি চূড়ান্ত একরার নামা (চুক্তি) প্রস্তুত করা হলো। এতে লেখা হলো: এই একরার নামা আলী ইবনে আবু তালেব ও মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে সম্পাদিত হইল। আলী (আ.) কুফাবাসী ও তাহার সংঙ্গীয় অন্যান্যদের পক্ষ হতে, মাবিয়া সিরিয়াবাসী তাহার অন্যান্য সাথীদের পক্ষ হতে সালিশ নির্বাচন করিতেছেন। আমরা খোদাতালার পাক কোরআন ও তাঁহার আদেশকে বিচারক মনোনীত করিয়া একরার করিতেছি যে, খোদাতালার আদেশ ও কোরআন শরিফের ফয়সালা ব্যতীত অন্য কিছু মান্য করিবো না।

আমরা "আলহামদু হইতে উন্নাস" পর্যন্ত সমগ্র কোরআন শরিফ যে কার্য করিবার জন্য আদেশ দিয়াছে, তাহা পালন করিব। আর পবিত্র কোরআনের এই ফয়সালা দান করবেন দুইজন সালিশ যাহাদের নাম যথাক্রমে আমর বিন আস ও আবদুল্লাহ বিন কায়েস (আবু মুসা আশআরি) যাহা আল্লাহর কিতাবে না পাওয়া যাইবে উহা রসুল (দ.) এর হাদিস মোতাবেক মীমাংসা করিবেন। এই চুক্তিনামা সাইত্রিশ হিজরির ১৭ সফর মোতাবেক ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সম্পাদিত হলো। অতঃপর শালিসদ্বয়ের নিকট হতে শপথ নেওয়া হলো। তাহারা শপথ করিলেন। আমরা আল্লাহকে হাজের ও নাজের জানিয়া কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাত এ রসুলুল্লাহ (দ.) মোতাবেক সহিহভাবে এই বিবাদের মীমাংসা করিবো। রসুল (দ.) এর উম্মতগণকে আর যুদ্ধ ও বিবাদ-বিসংবাদে নিপতিত করিব না। শালিসদ্বয়কে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুর্ধ্ব ছয় মাস সময় দেওয়া হলো। তাদেরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হলো ছয় মাসের মধ্যে যে কোন সময় তারা উভয় পক্ষকে সংবাদ দিয়া দমাতুল কুফা ও দামেস্কের মধ্যবর্তী জল এর নিকটবর্তী আজরহ নামক স্থানে তাহাদের রায় ঘোষণা করবেন। আরো স্থির হলো যে, কুফা হতে আবু মুসা আশআরি এবং দামেস্ক হতে আমর ইবনুল আস যখন ফয়সালা ঘোষণা করবেন তখন উভয় পক্ষের চারশত জন করিয়া লোক নিবেন। এই আটশত লোক সমস্ত মুসলমানের প্রতিনিধি হিসেবে পরিগণিত হবেন। অতঃপর উভয় পক্ষের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের স্বাক্ষরের পর এই চুক্তিনামার দুখানা কপি উভয় পক্ষের সালিসকারীকে অর্পণ করা হইল।

হজরত আলী (আ.) সিফ্ফিন যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার প্রাক্কালে তার বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক একানামার বিরোধিতা করতে লাগিল। অথচ এই লোকেরাই কোরআনের পবিত্রতা রক্ষার অজুহাতে যুদ্ধ বন্ধের জন্য হজরত আলী (আ.) কে এমনকি হত্যার হুমকি দিচ্ছিল। তারাই হজরত আলী (আ.) কে বলল, আপনি এ সময় দেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে সিরীয় বাহিনীকে পিছন দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে তাদেরকে ধ্বংস করুন।

হজরত আলী (আ.) বললেন চুক্তিনামা স্বাক্ষর করার পর আমরা শরিয়তের বিধান অনুযায়ী এই চুক্তিনামা মানতে বাধ্য। তাই এ ধরনের ধর্ম বিরোধী কাজ করা কিছুতেই সংগত নয়। তারা আরো দাবি করল পবিত্র কোরআনের পরিবর্তে মানুষকে শালিস মেনে হজরত আলী (আ.) শরিয়ত বিরোধি কাজ করে মহাপাপী হয়েছেন। তাই আর তার নেতৃত্ব করার যোগ্যতা নাই। কুফার কাছাকাছি পৌঁছে এই চরমপন্থী দলের ১২ হাজার সৈনিক হজরত আলী (আ.) মূল সেনাবাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইহারা পরবর্তীকালে খারেজি নামে অভিহিত হয়।

আমিরুল মোমেনিনের বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা অন্যত্র চলে যায়। সেখানে পৌঁছে তাহারা নিজেদের মধ্যে নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রচার করল

"আনুগত্য কেবল মাত্র কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতেই রাসুলুল্লাহ মোতাবেক সৎকার্জের আদেশ দান ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা আমাদের কর্তব্য। আমাদের মধ্যে কোন খলিফা ও আমির নাই। আমরা জয় লাভ করলে সমস্ত কার্য সকল মুসলমানের পরামর্শ ও অধিকাংশ লোকের মতানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে। আলী (আ.) ও মাবিয়া উভয়েই দোষী।

এইসব লোকদের ধর্মীয় চিন্তাধারায় যে সব ভুলভ্রান্তি ছিল তা নিরসনের জন্য হজরত আলী (আ.) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে তাদের নিকট পাঠালেন। হজরত আবদুল্লাহ বাদানুবাদ করা কালীন হজরত আলী (আ.) সেখানে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হন। তিনি তাদেরকে তাদের নেতার নাম জিজ্ঞাসা করলে তারা তাদের নেতা আবদুল্লাহ বিন কাওয়াব নাম উল্লেখ করে।

হজরত আলী (আ.) ইবনে কাওয়াবকে প্রশ্ন করলেন : আমার বাইয়াত গ্রহণ করে আবার আমার বিরোধিতার কারণ কি ? ইবনে কাওয়ার জবাব দিলেন, আপনি ধর্মীয় ব্যাপারে মানুষকে মধ্যস্থতাকারী মানার দরুন আমাদিগকে বিরোধিতা করিতে বাধ্য করেছেন।

হজরত আলী (আ.) বললেন ঃ খোদার কসম করিয়া বলো মাবিয়ার সৈন্যগণ যখন বর্শার অগ্রভাগে পবিত্র কোরআন বাধিয়াছিল তখন আমি কি তোমাদের বলি নাই যে, উহা তাহাদের ধোকা যুদ্ধ বন্ধ করিওনা। কিন্তু তখন তোমরা আমার কথা অমান্য করিয়া যুদ্ধ বন্ধের জন্য পীড়াপীড়ি করো নাই ? তোমরাই কি শেষ পর্যন্ত আমাকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য কর নাই ? তিনি আরো বলিলেন : আমি তো নিতান্ত বাধ্য হয়ে তোমাদের চাপেই শালিস নিযুক্তিতে সম্মতি দিয়াছি। তবুও শালিসকারীরা পবিত্র কোরআন অনুযায়ী ফয়সালা করিবেন।

তাহারা যদি কোরআন অনুযায়ী ফয়সালা করেন তবে উত্তম। অন্যথায় আমি উহা কিছুতেই মানিব না।

খারেজিদের নেতা কাওয়াব বলল মাবিয়া মুসলমানদের রক্তপাতের ব্যাপারে অগ্রণী অর্থাৎ প্রথম আক্রমণকারী তাই ধর্মোদ্রোহিতার আচরণে দোষী। ইহার জন্য পবিত্র কোরআনে পরিষ্কার বিধান আছে যে এ ধরনের ব্যক্তি হত্যার উপযুক্ত।

এই কথার উত্তরে হজরত আলী (আ.) বলিলেন: আমি পবিত্র কোরআনের মতে সালিশ মানিয়াছি। নিযুক্ত শালিসকারীগন কেবল কোরআনের সঠিক আদেশ ঘোষণা করিবেন। এই প্রেক্ষিতে খারেজিগণ বলিল তাহা দীর্ঘ ছয়মাস মীমাংসার জন্য স্থির করিবার কি প্রয়োজন? হজরত আলী (আ.) বলিলেন, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এমনও হতে পারে যে, মুসলমানদের মধ্যে যে বিভেদ দেখা দিয়াছে, তাহা আপনি আপনিই দূর হইয়া যাইবে।

অতঃপর খারিজিরা সন্তুষ্ট হয়ে হজরত আলী (আ.) সঙ্গে কুফায় গমন করল।

শালিসকারকদের ভূমিকা :

এদিকে দেখিতে দেখিতে ছয় মাস সময় কেটে গেল। শাবান মাসে সালিশদ্বয় তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। আশা করা গিয়েছিল যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছেই সালিশদ্বয় তাহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। কিন্তু তা করলেন না। বরং বিভিন্ন স্থান হতে আগত বিশিষ্ট বুজর্গ ব্যক্তিদের সামনে একটি সভা আহ্বান করা হলো। এবং উক্ত আলোচনা সভায় উভয় সালিশের মধ্যে বিতর্ক শুরু হলো। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মের কয়েকটি মূলনীতির ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি করার জন্যই আমর বিন আস প্রকাশ্যভাবে এই সভার আয়োজন করে। তা আলোচনার গতি প্রকৃতি দেখে বুঝা যায়। কারণ এটা উপস্থিত সকল সাহাবা (রা.) এর জানা ছিল যে, হজরত আবুবকর (রা.) ওমর (রা.) রসুল (দ.) এর নির্দেশের যথাযথ অনুসরণ না করে নিজস্ব বিচার বুদ্ধি ও তদানীন্তন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ইসলাম ধর্মে এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নীতির প্রবর্তন করেন। এই নব-বিধান চালু করার জন্য যে এই মহা রাজনৈতিক জটিলতার উদ্ভব হয়েছিল তা প্রায় সবাই অনুভব করেছিলনে। তাছাড়া এই মহান দুই খলিফার বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তনের ফলে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। প্রথম দুই খলিফার রাষ্ট্রীয় নীতিতে কোরআন ও হাদিসের যে ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় সেই নীতির সূত্র ধরেই হজরত ওসমান (রা.) খলিফা বা রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে

এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার পূর্ণ সুযোগ উমাইয়া বংশীয় গভর্নর ও সরকারি কর্মচারীরা গ্রহণ করে। কিন্তু হজরত আবুবকর (রা.) ও হজরত ওমরের (রা.) আমলে সাধারণ লোকের ঈমানের দৃঢ়তা, চারিত্রিক মহত্ত ও পবিত্রতা বেশি থাকায় সমাজে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যাপক আকারে দেখা যায়নি। পক্ষান্তরে ওসমান (রা.) খেলাফত কালে প্রথম দুই খলিফার প্রবর্তিত নীতির সকল প্রকার কুফল উমাইয়া শাসক শ্রেণির অপকর্মের সাথে যোগ হয়ে অবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যেহেতু হজরত আলীর (রা.) বুজর্গি ও মর্যাদা ও রসুল (দ.) কর্তৃক তাকে খলিফা হিসেবে নিয়োগের ব্যাপারে সবাই অবহিত ছিলেন। একারণেই অনেকে মনে মনে প্রথম দুই খলিফার নিয়োগ ও তাদের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠেন। একারণেই আমরা দেখতে পাই যে, এই দুই খলিফার কর্মকান্ড সম্পর্কে মাবিয়া কাউকে টু শব্দ করতে দেয়নি। অর্থাৎ এই দুই খলিফার সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা এবং হজরত আলী (আ.) কে গালাগালি তথা মর্যাদাহীনতা প্রচারই উমাইয়া বংশীয় রাষ্ট্র প্রধানদের স্থায়ি নীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই নীতির প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে সালিশে আমর বিন আস তার প্রদর্শিত সকল যুক্তি রেকর্ড করার জন্য চাপ সৃষ্টি করার দাবি করতে থাকে। যাতে করে তার প্রদর্শিত যুক্তিজাল ভেদ করে যেন কেহ প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করতে সক্ষম না হয়। তাছাড়া ধর্মীয় ব্যাপারে কোরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রয়োজন নেই বরং যে কোন ব্যক্তি নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী যা যুক্তিসংগত মনে করতে পারে সেটাকেই পবিত্র কোরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা হিসেবে সাধারণ মুসলিম জনতা বিবেচনা করতে পারে। ফলে ঈমানদার লোকেরা এক ধরনের সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগতে থাকবে এই ফাঁকে উমাইয়ারা নির্বিবাদে রাজত্ব তথা তাদের সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় জুলুম চালাতে সক্ষম হয়। দুই সালিশকারীর কথোপকথনে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

সূচনায় আল্লাহর রসুল তার বাণী যে সত্য এ বিষয়ে তারা যথারীতি একমত হলেন। তারপর তারা একমত হলেন হজরত আবুবকর (রা.) ও হজরত ওমর (রা.) সত্যিকার ও ন্যায়বান খলিফা ছিলেন। অপ্রাসঙ্গিক বিষয় তবুও উল্লেখিত কারণেই এ বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে মর্মে গণ্য করা যায় ।

আমর : মুসলমানদের সাধারণ ভোটে হজরত ওসমান (রা.) নির্বাচিত হয়ে ছিলেন। (ইহা তথ্যগতভাবে সঠিক নয় এ ব্যাপারে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। আর তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলমান।

আবু মুসা : এখনকার আলোচ্য বিষয়তো এটি নয়।

আমর : তুমি যদি তাকে বিশ্বাসী মনে না করো তাহলে কি বলতে চাও তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন। (অবান্তর প্রশ্নের মাধ্যমে জনতার মনে আবেগ সৃষ্টি করাই তার উদ্দেশ্য এটা পরিষ্কার)।

আবু মুসা : আচ্ছা এটিও লিখে রাখা হোক। তাহলে শুধু এ প্রশ্নটাই বাকি থাকে, তিনি কি ন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন না অন্যায়ভাবে? (এব্যাপারে সঠিক ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) আবু মুসা আমতা আমতা করে বললেন: তা তিনি অন্যায়ভাবেই নিহত হয়েছেন।

আমর : তা হলে এটাও তো ঠিক যে কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে আল্লাহ তার ওয়ারিশদের প্রতিশোধ গ্রহনের অধিকার দিয়েছেন?

আবু মুসা : হ্যাঁ আল্লাহ সে অধিকার দিয়াছেন।

আমর : তুমিত জানো ওসমানের নিকটতম আত্মীয় হচ্ছে মাবিয়া। **আবু মুসা :** তাহলে মানতেই হবে ওসমানের হত্যাকারী যারাই হোক আর তারা যখানেই থাকুক তাদের শাস্তি দেওয়ার অধিকার মাবিয়ার রয়েছে? (এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে)। তাও অবশ্য সত্য, কিন্তু আমর এ ঝগড়াটা মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছে অসীম দুর্গতি। চলো আমরা এ দূর্গতির হাত থেকে মানুষকে রেহাই দেই। আর এমন একটি পন্থা বেছে নেই যা মানুষকে দেবে শান্তি।

আমর : তোমার কি তেমন কোন প্রস্তাব আছে?

আবু মুসা : আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সিরিয়াবাসীরা কখনো আলীকে (রা.) মানবে না আর ইরাকিরাও মানবে না মাবিয়াকে এ অবস্থায় এ দুজনকে বাদ দিয়ে তৃতীয় একজনকে খলিফা নির্বাচন করাই উচিত নয় কি ?

আমর : উচিত কিন্তু কাকে করতে চাও ?

আবু মুসা : মাবিয়া খেলাফতের যোগ্য নহেন এবং খেলাফতের ওপর তার কোন অধিকার ও নেই। যদি তুমি আমার সাথে একমত হতে পারো, তাহা হলে (আমার জামাই) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কে খলিফা করে ওমরের শাসন ফিরাইয়া আনা যায়।

আমর : আপনি বারবার আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (আপনার জামাইয়ের) কথা বলছেন। কিন্তু আবদুল্লাহকে (আমার পুত্র) কেন আপনি মনোনীত করছেন না ? তাঁর জ্ঞান গরিমা বিচার বুদ্ধি ও অন্যান্য ক্ষমতার কথা তো আপনার কিছুই অজানা নাই।

আবু মুসা : তোমার পুত্র আবদুল্লাহ সত্যি খেলাফতের উপযুক্ত। কিন্তু তাকে গৃহযুদ্ধে টেনে এনে সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আছে।

(হজরত আলী (আ.) লেখক আবুল ফজল, হজরত আলী (আ.) লেখক মুজিবুর রহমান খাঁ)

উপরোক্ত কথোপকথন বিশ্লেষণ করে হজরত আবু জর গিফারির (রা.) সেই মূল্যবান বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। "হে কুরাইশ লোকেরা নবিজির (আহলে বায়াত) পরিজনকে অবজ্ঞা করিয়া বড় ভুল করেছে। আল্লাহর কসম আরবেরা তাহাদের ঈমান হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। তারা তাদের সাবেক আনুগত্য ও ধর্ম বিশ্বাস বদলাইয়া লইয়াছে। নবি পরিবারের হাতে যদি তোমরা খলিফা নিযুক্তির ভার দিতে তাহা হইলে কোন দুই দল একে অপরের প্রতি তলোয়ার তুলিত না। এখন যখন, রসুল (দ.) এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী আলী (আ.) কে আসনচ্যুত করা হইয়াছে তখন যে যথেচ্ছ খোজে, সেই-ই তোমাদের আনুগত্য জোগাড় করিয়াছে এবং পরে পরেই অপদার্থরা খেলাফতের দিকে আশাপ্রদভাবে আগ্রাহান্বিত হইতেছে এবং এই প্রতিযোগিতায় খুন, খারাবি ঘটিতে যাইতেছে। হে লোকজন, তোমরা ভাল ভাবেই জানো, যে নবিজি আলীকে (রা.) তাঁহার ওসি (প্রতিনিধি) ঘোষণা করিয়াছেন। আলীর (রা.), পরে হাসানকে (রা.), হাসানের পরে হুসাইন (রা.) এবং তাহাদের পরে এই পরিবারের পাক বংশধরদের কথাও একে একে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা রসুলের হুকুম ভুলিয়া গিয়াছ। আর যে বায়াত তোমরা দিয়েছিলে, তাও ভুলে গেছ"

আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ও রসুল (দ.) কর্তৃক ঘোষিত খেলাফতের একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী আলী (আ.) ও মুসলমানদের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত বেহেস্ত এর সরদার ইমামদ্বয়কে বাদ দিয়ে আমর বিন আস ও মুসা আশআরি তাদের ছেলে ও জামাইকে খেলাফতের আসনে যোগ্য বিবেচনা করে তাদেরকে ক্ষমতায় দেখতে আগ্রহী হয়। খেলাফতের মর্যাদা কি পর্যায়ে গেলে এটা একটি স্বাভাবিক ও সাধারণ কথা হিসেবে সালিশদ্বয় জনসমক্ষে তা প্রকাশ করে। এবং এ ব্যাপারে শত শত লোক নির্বিকার হয়ে এদের কথা শুনে কোন মন্তব্য করেনা বা দুঃখিতও হয় না বরং সঠিক বলে মেনে নিয়ে আত্মতৃপ্তি পায়। এ ধরনের সমাজ যে এক কাঠোর খোদায়ি গজবের সম্মুখীন তা এই অবস্থা দেখেই বোঝা যায়।

যাহোক, সালিশকারকদ্বয় একটি বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হলো যে, যেহেতু হজরত আলী (আ.) ও মাবিয়ার বিবাদের ফলে মুসলমানদের শোণিত প্রবাহিত হচ্ছে। উম্মতে মোহাম্মদীরা মহা ফেতনায় পতিত হচ্ছে। সুতরাং উভয়েরই কর্তব্য এই যে, তাদের উভয়কেই পদচ্যুত করে মুসলমানদের হাতে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। মুসলমানগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের নেতা বাছিয়া নেবে। এই স্থির হলো, এই সিদ্ধান্ত সকলের সামনে ঘোষণা করা হোক। তদনুযায়ী তৎক্ষণাৎ সেখানে একটি মিম্বর স্থাপিত হলো।

আবু মুসা আশআরি ঘোষণা করলেন : হে মুসলিম জনতা, আমরা উভয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। একটি ব্যবস্থা ব্যতীত আমরা উভয়ে কিছুতেই আর কোন ব্যবস্থায় একমত হতে পারছি না। এক্ষণে আমরা আমাদের সেই ঐকমত্য অবস্থার কথাই ঘোষণা করছি। আমরা আশা করি উহা কার্যে পরিণত করা হলে তা উম্মতে মুহাম্মদীদেরকে ফেতনার হাত হতে রক্ষা করবে মুসলমানদের মধ্যে একতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। আমরা উভয়ে যে ব্যাপারে একমত হয়েছি, তা হলো : আমরা আলী ও মাবিয়া উভয়েই পদচ্যুত করিলাম, আর তোমাদিগকে নতুন খলিফা নির্বাচন করিয়া লইবার এখতিয়ার দেওয়া হইল।"

আমর ইবনুল আস বলিলেন, আপনারা সাক্ষী থাকবেন, আবু মুসা আলী (আ.) কে বরখাস্ত করেছেন। আমিও তাঁহাকে (আলী (আ.) বরখাস্ত করলাম। কিন্তু মাবিয়াকে আমি বরখাস্ত করছি না, আমি তাঁকে খেলাফতে

বহাল রাখিলাম।” তিনি ওসমানের উত্তরাধিকারী তাহার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং খেলাফতের হকদার। আমরের ঘোষণা শুনিয়া আবু মুসা আশআরি তাজ্জব হয়ে গেলেন তিনি বলিলেন : ছিঃ ছিঃ কি বেঈমানি কি ধোকাবাজি ইত্যাদি।

ইসলামের এই মহা কলংকময় অধ্যায়কে কোনক্রমেই শুধু ‘বেঈমানি’ বা ‘ধোকাবাজি’ বলে সীমিত করা ঠিক হবেনা বরং এই তথাকথিত বুজর্গদ্বয় যে পবিত্র কোরআন ও রসুল (দ.) এ হাদিসের বাণী সম্পর্কে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা না দেখিয়েই হজরত আলী (আ.) কে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আল্লাহর জমিনে রসুল (দ.) প্রকৃত উত্তরাধিকারী, স্বয়ং খোদা কর্তৃক নিয়োজিত কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যাকারী ও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহ ও “জ্ঞান নগরীর দ্বার” হজরত আলী (আ.) বলেন, “এই পদ থেকে বরখাস্ত করার কোন ক্ষমতা কাউকেই দেওয়া হয়নি। তারা শুধু (সালিশদ্বয়) আল্লাহর কালামকে নয়, বরং রসুলের বাণীকেও করেছে প্রত্যাখ্যান, তারা আল্লাহ, রসুল (দ.) আর সৎ মানুষের দুশমন, তারা ধর্মোদ্রোহী। (হজরত আলী (আ.) লেখক আবুল ফজল)।

জনসাধারণ বজ্রঘাতের মতো সালিশদ্বয়ের এই ঘোষণা শ্রবণ করল। প্রকৃত পক্ষে আলী (আ.) ছিলেন ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে রসুল (দ.) উত্তরাধিকারী– খলিফা। মাবিয়া ছিলেন দুনীতিবাজ প্রাদেশিক শাসনকর্তা। কেন্দ্রীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহি বিধায় ধর্মীয় দৃষ্টকোণ থেকে ফরজ তরককারী ও রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধী। কিন্তু এই সালিশের মাধ্যমে এই দুনীতিবাজ, ধর্মোদ্রোহী, ব্যক্তি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে হজরত আলীর (রা.) প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বসলেন। মুসলিম উম্মাহর জন্য এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি আর কি হতে পারে।

এই ঘটনায় কার্যত মাবিয়া স্বাধীন খলিফার ন্যায় ব্যবহার করতে লাগলেন এবং হজরত আলীকে (রা.) গালিগালাজ এর নীতি প্রচলন করেন, যা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রা.) এর সময়কাল পর্যন্ত বহাল ছিল।

হজরত আলীর (রা.) শাহাদতের পর মাবিয়া ‘আমিরুল মুমেনিন’ উপাধি ধারণ করে তার নিজের মনগড়া ধাঁচে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন।

খারেজি বিদ্রোহ :

খারেজি মতবাদের উৎস অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের রসুল (দ.) এর ওফাতের পরবর্তী ঘটনায় ফিরে যেতে হবে। পবিত্র কোরআনে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ আছে। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশনা ও বিধি বিধানের উল্লেখ নাই। এসকল বিষয়ের মধ্যে এমন কি নামাজ ও জাকাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ যার ওপর কোরআন সর্বাপেক্ষা বেশি জোর দিয়েছে, এই নামাজ পড়ার সার্বিক পদ্ধতি পবিত্র কোরআনে লিপিবদ্ধ নেই। অনুরূপভাবে কোন সম্পদ হতে কি হারে জাকাত আদায় করা হবে তাও উল্লেখ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রসুল (দ.) ই এ সবের বিস্তারিত দিক ও বিভাগ তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ নবি বা রসুল (দ.) কে ঐশি গ্রন্থের আলোকে কোরআনে বর্ণিত মূলনীতি ও মৌলিক বিষয়গুলোর বিস্তারিত নীতিমালা প্রণয়ণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তার আসল কাজ ইসলামি জীবনব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তিগুলোর কেবল পরিপূর্ণ বিশ্লেষন সহকারে উপস্থাপনই নয়, বরং এই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণ ও আবেগময় আবেদনের মাধ্যমে এগুলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।

রসুল (দ.) এর ওফাতের পর আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত ও নবি (দ.) কর্তৃক ঘোষণাকৃত এমনকি অসিয়তকৃত কোন উত্তরাধিকারীর কনসেপ্ট অস্বীকার করা হয় এবং নবুয়তের উত্তরাধিকারী জনগণ বা রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নির্বাচিত হবেন, এটাই রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তি পবিত্র কোরআন ও রসুলের (দ.) হাদিসের আইন সংগত ব্যাখ্যাকারী হিসেবে বিবেচনা করার মতবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কার্যক্রমের ফলে ইসলাম ধর্মে এক মারাত্মক বিশৃঙ্খলার সূচনা হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব কর্তৃক প্রদত্ত কোরআনের ব্যাখ্যা সঠিক অথবা অবশ্য পালনীয় অথবা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যারা রসুল (দ.) এর পবিত্র জবানী থেকে কোরআনের বা হাদিসের ব্যাখ্যা শুনেছিলেন তাদের মত বা পথ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। হজরত আলী (আ.) জ্ঞান নগরীর স্বর্ণদ্বার, আলে রসুল, তথা আহলে

বায়াত, আলে মুহাম্মদ (দ.) ও কোরআন, একে অন্য থেকে আলাদা হবে না। আহলে বায়াতকে 'আল্লাহর রজ্জ' হিসেবে গণ্য করে যে, তাদেরকে আঁকড়ে ধরবে সেই মুক্তি পাবে। এ ধরনের হাদিস বাস্তবিকপক্ষে সমাজ জীবনে অকার্যকর হয়ে দাঁড়ালো অথবা বিতর্কিত হয়ে পড়ল।

এই সব হাদিসের মর্মানুযায়ী এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে জ্ঞান বলতে কোরআনের ও হাদিসের জ্ঞানকেই বোঝায়। রসুল (দ.) জ্ঞানের বৈধ উত্তরাধিকারী আলী (আ.) তাছাড়া তিনি 'আহলে বায়াত'। প্রত্যেক নামাজে এঁদের উদ্দেশ্যেই সালাম পেশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ধর্মীয়ভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর এই মহান মর্যাদা স্বীকৃত হলেও রসুল (দ.) এর ওফাতের পর আলী (আ.) কর্তৃক কোরআনের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিধি বিধান রাষ্ট্রনীতিতে গ্রহণ করা হয়নি। বরং কোরআনের ব্যাখ্যা জনিত কারণে রসুলের (দ.) কলিজার টুকরা মা ফাতিমা (রা.) ও হজরত আলী (আ.) কে পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। যেহেতু তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাই এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত কি ছিল তাও বোঝার কোন সুযোগ থাকল না। যদিও হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ কোরআনের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রায় ৬০ বছর পরে এই সম্পত্তি আহলে বায়াতদের নিকট হস্তান্তর করেন।

রসুল (দ.) ওফাতের সুদীর্ঘ তেইশ বছর যাবত রাষ্ট্রীয় প্রধানগণ তাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুযায়ী কোরআন ও হাদিসের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাকেই প্রকৃত ইসলাম হিসাবে উপস্থাপন করা হলো।

এই সময়ে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম পবিত্র কোরআন ও রসুল (দ.) হাদিসের পরিপন্থী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নীতি ইসলামি সমাজ জীবনের জন্য ক্ষতিকারক, অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে বিবেচনা করা হলেও ইসলামি উম্মাহর একতার স্বার্থে এ ব্যাপারে কোন বড় ধরনের আন্দোলন না হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুসৃত কোরআনের অনেক ব্যাখ্যাই যে সঠিক ও যথাযথ নয় এ ব্যাপারে অনেকেই দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করতে থাকেন।

অথচ ইসলামের খলিফা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে যে সব নীতি গ্রহণ করতেন তাই ধর্মীয় অনুশাসনের মর্যাদা পেত। এবং তা অবশ্য পালনীয় হিসেবে গণ্য হত। আর প্রকৃত বা সঠিক ধর্মীয় ব্যাখ্যা সর্বসাধারণের অগোচরেই থেকে যেত অথবা ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত ধর্মীয় নীতি সঠিক এবং এর বিপরীত মতবাদই ভুল এ ধরনের ধারণাও সমাজে চালু হয়ে গেল। ফলে সমাজ জীবনে যে ধর্মমতের প্রচলন হলো তা ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা সম্মলিত অনুশাসন বা মতবাদ নয়। এ কারণে ধর্মীয় দিক থেকে একই সমাজ ব্যবস্থায় একাধিক মতবাদের সৃষ্টি হলো।

ইতিহাসের এই ক্রান্তি লগ্নে শুরু হলো যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রকৃতিগত কারণেই মানব জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলো লালনের কোন অবকাশ থাকে না। তাই যুদ্ধের প্রয়োজনে বিভিন্ন চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটার কোন সুযোগ পাওয়া গেল না। পক্ষান্তরে যুদ্ধের মাধ্যমে দুর্ধর্ষ আরবজাতি ধর্মীয় বহু বিধি বিধান পালন থেকে কার্যত অব্যহতি পেয়ে গেল। অর্থাৎ ইসলাম মানবিয় চরিত্রকে যে নিয়ন্ত্রনে রাখে যুদ্ধজনিত কারণে সমাজ জীবন থেকে সেই সব সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে শিথিল হয়ে পড়লো। ওপরুন্ত কিছু দিন পূর্বের দরিদ্র জাতি হঠাৎ করে বিপুল নগদ অর্থ সহ সকল প্রকার পার্থিব সযোগ সুবিধা পেয়ে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় মেধা ও যোগ্যতা অর্জনের সময় পেল না।

বিজিত দেশগুলির নব-দীক্ষিত মুসলমানদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মমতের সাথে ইসলাম ধর্মমতের এক সংমিশ্রণ শুরু হলো। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে ধর্মের সঠিক মতবাদ শিক্ষা দেওয়ার কোন সুযোগ দেখা গেল না। কারণ বিজিত দেশগুলোর অধিকাংশ গভর্নরই ছিলেন সামরিক ব্যক্তিত্ব বা নও মুসলিম। তাদের নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞানই ছিল খুব সীমিত তাছাড়া একটি বৈরী দেশে বিজয়ীর ভূমিকার অবস্থান করে প্রশাসনিক, সামরিক, কর আদায়ের মত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে তাদেরকে অধিক সময় ব্যয় করতে হতো। ওপরুন্ত বিজয়ী সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ একটা বিরাট সমস্যা ছিল। তাই ধর্মের এসব দিক বিশ্লেষণ করার মেধা, জ্ঞান, সুযোগ বা ইচ্ছা কোনটাই অনেকের ছিল না।

এহেন পরিস্থিতিতে হজরত ওসমান (রা.) র আমলে সার্বিক অবস্থা সকল ধরনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে শুরু হলো গণবিদ্রোহ। মনে রাখতে হবে হজরত ওসমান (রা.) এর বিভিন্ন কোরানিক ব্যাখ্যাজনিত নীতি-পদ্ধতি অত্যন্ত মর্যাদাবান কিছু সাহাবি চ্যালেঞ্জ করতে বাধ্য হলেন। এটা না করা হলে তদানীন্তন প্রচলিত রাষ্ট্রনীতি যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য থেকে বিশ্বের মুসলমানরা বঞ্চিত হতো। সেক্ষেত্রে মাবিয়া অর্থাৎ উমাইয়ারা বা আব্বাসীগণ রাজ্য শাসন বা দেশ জয়ে অত্যন্ত দক্ষ হলেও ধর্মীয়ভাবে তারা অত্যন্ত নিচুমানের ছিল। এই বাস্তব সত্য কথা বলার মত কোন তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে থাকতো না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ওসমান (রা.) এর ওফাতের পর বৈধভাবে নিয়োজিত খলিফা হজরত আলী (আ.) রসুল (দ.) এর ভ্রাতা, জামাতাও "জ্ঞান নগরীর দ্বার" জানা সত্ত্বেও যারা তার সাথে যুদ্ধ করেছে। তারা সবাই মৌখিকভাবে কালেমা পাঠকারী, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতকে ইসলামের স্তম্ভ হিসেবে বিশ্বাস করতো। এই কঠোর বাস্তবতা এটাই শিক্ষা দেয় মানব জীবন তথা ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার ভিত্তিতে পরিচালিত কর্মকান্ডকে কোনক্রমেই এই পাঁচটি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ওপরুন্তু শুধুমাত্র এই পাঁচটি কাজ করলেই সে প্রকৃত পক্ষে ঈমানদ্বার হওয়া যায় এমনটি মনে করারও কোন অবকাশ নাই। বরং প্রকৃত ঈমান বলতে এসব কর্মকান্ড সহ অতিরিক্ত (সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ধর্মীয় বিধি বিধান পালন না করলে পূর্ণ মুসলমান হওয়া যায় না) আরো বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। এ প্রসঙ্গে রসুল (দ.) এর বাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঈমানের ৭০/১২০টি শাখা প্রশাখা রয়েছে। এর সবচেয়ে ছোট শাখা হলো রাস্তা থেকে কাটা সরানো। (বোখারি) দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য যে ধর্মের এই সুগভীর অন্তনিহিত তাৎপর্য তখনও যেমন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বুঝতে সক্ষম হয়নি। বর্তমানেও মুসলমান জাতির অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গই একইভাবে তা বুঝতে পারছেন না।

এসব তথ্য একথা প্রমাণ করে যে হজরত মুহম্মদ (দ.) এর ওফাতের পরবর্তী ২৩ বছরে ইসলাম ধর্মের মধ্যে একাধিক মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই প্রেক্ষাপটেই খারেজি মতবাদ পর্যালোচনা করতে হবে।

খারেজি মতবাদ :

হজরত ওসমান (রা.) এর সময়ে উমাইয়াদের ধর্মহীনতা, ধনলিপ্সা ও অন্যান্য কর্মকান্ডে বিক্ষুব্ধ হয়ে যে সকল সংশোধনকামী গ্রুপ ছিল খারেজিগণ তাদের অন্যতম। তারা পবিত্র কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে হিজরত করে নিজেদের আল্লাহর পথে বহির্গত বলে দাবি করে। কারণ কোরআন বলে যারা আল্লাহ ও তার রসুলের জন্য গৃহত্যাগ করে হিজরত করে ও পরে মৃত্যুবরণ করে, তাদের পুরস্কার আল্লাহর হাতে এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। তারা দাবি করত যে তারা আল্লাহর পথে বহির্গত –খারাজ। সেই কারণে তারা নিজেদেরকে খারেজি বলে অভিহিত করতো। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে তাদের অপব্যাখ্যা এবং তৎপ্রেক্ষিতে উগ্র ভাবধারা, উচ্ছৃঙ্খল ও নিষ্ঠুর কার্যাবলীর জন্য প্রকৃত মুসলমানরা তাদের বলত যে তারা ইসলামের সীমা হতে বহিগত। সে কারণেই তারা খারেজি। আবার খাওয়ারিজ বা খারিজ অর্থাৎ বিদ্রোহি শব্দটি এসেছে 'খুরুজ' শব্দ থেকে যার অর্থ বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহিতা।

খারেজিরা পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করতো তা হলো "তোমরা যে জন্য খুব তাড়াহুড়া করছে। তাতে আমার কাছে নেই। সব ব্যাপারেই ফয়সালা করার হুকুম দেয়ার অধিকারও কারুরই নেই ? এক আল্লাহ ছাড়া, তিনিই সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।" আনআম - ৫৭।

"হুকুমদানের আইন-বিধান রচনার চূড়ান্ত অধিকার কারুরই নেই। এক আল্লাহ ছাড়া। সেই আল্লাহই ফরমান দিয়েছেন যে, হে মানুষ তোমরা কারুরই দাসত্ব করবেনা। করবে কেবল মাত্র সেই এক আল্লাহকে।" ইউসুফ

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আলোচ্য আয়াতে 'হুম' শব্দটির মধ্য দিয়ে আল্লাহর গুণাবলীর একটি বিশেষ দিকের কথা বলা হয়েছে। এই 'হুকুম' শব্দটির প্রকৃত অর্থ অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে একথা বলা যায় যে, এখানে হুকম (বিচার) হচ্ছে মানুষের জীবনের আইন ও কৃঙ্খলা, এখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এই আইন জারির ক্ষমতা নাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে

আল্লাহতা'লা অথবা আল্লাহ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থাৎ রসুল - নায়েবে রসুলগণের একটি পর্যায়কে অবশ্যই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে কারণ আল্লাহ সরাসরি কাউকে কোন নির্দেশ প্রদান করেন না বরং তা রসুল বা নায়েবে রসুল বা তার মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু খারেজিরা হুকুমের অর্থ করেছে সরকার তথা হুকুম করার মধ্যে হাকিমিয়াতের মধ্যস্থতার আভাস পেয়ে এ থেকেই তারা যে শ্লোগানের সৃষ্টি করেছে তা হলো : লা হুকমা- ইল্লা বিল্লাহ, অর্থাৎ সরকার (হুকুমত) মধ্যস্থতা (আশআয়াত) এবং নেতৃত্ব, আইন জারির ক্ষমতার মতই আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা এবং আল্লাহতা'লা ছাড়া আর কারো মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার বা মানুষকে শাসন করার অধিকার নাই।

এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই বিশ্ব ব্রক্ষান্ড পরিচালনায় আল্লাহর দুই ধরনের বিধান চালু আছে– মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত- সূর্য সমানভাবে সকলকে আলো দান করে অথবা মানুষের শরীরের হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও মানুষের ইচ্ছা নির্ভর– অর্থাৎ ইচ্ছা করলে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে তা সে পালনে অস্বীকার বা অপারগতা প্রকাশ করতে পারে। মনে রাখতে হবে সকল ধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের ইচ্ছা নির্ভর ক্ষমতার ওপর। অর্থাৎ মানুষের নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত পার্থিব, প্রাকৃতিক বা শারীরিক বিধি বিধান সম্পর্কে খোদায়ি যে বিধান চালু আছে সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে যে সকল বক্তব্য আছে তা পৃথিবীর সকল অবিকৃত ধর্মেই এক। এ ব্যাপারে কোন ধর্মেই কোন প্রকার মতদ্বৈততা বা বিতর্কের কোন অবকাশ নাই। এ কারণেই শুধুমাত্র আল্লাহর একত্ব বা তৌহিদে বিশ্বাসকে ধর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়নি। বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদ ও রবুবিয়াতের স্বীকারোক্তি প্রত্যেক নেক ও বদ সকলেই রোজ-এ-আজলে (রুহ সৃষ্টির সময়) "আলা বি রাব্বকুম" বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমেই করেছে। শয়তানও আল্লাহ পাককে এক হিসেবে বিশ্বাস করতো। কিন্তু আল্লাহর মনোনীত খলিফা আদম (আ.) এর নবুওয়াতের যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা স্বীকার না করার জন্য আল্লাহ তাকে 'কাফের' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইবলিশ কখনো মুশরিক ছিল না। এই ঘটনায় প্রমাণিত হলো প্রকৃতপক্ষে কাফের হলো আল্লাহর একত্ববাদে অবিশ্বাসী হওয়া নয় বরং আল্লাহর নিয়োজিত রসুল বা নায়েবে রসুলের কনসেস্টে কার্যত অস্বীকৃতি বা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায় যে, যে আল্লাহর রসুলের বা নায়েবে রসুল বা অলি মুর্শিদ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কোন ধরনের ক্ষমতা আছে বলে স্বীকার করা বা এ ধরনের ক্ষমতাকে কোন প্রকার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার নামই শিক পক্ষান্তরে তা কার্যত আল্লাহর ক্ষমতার অস্বীকৃতি বিধায় কুফরি। কারণ আল্লাহপাকের একত্ববাদের পরিচিতি লাভ হয় নবুওতের আয়নাতে। যদি নবি-নায়েবে-নবি-অলি-মুর্শিদকেই বিশ্বাস করা না হয়, তবে আল্লাহপাকের পরিচিতি লাভ হবে কোথা হতে। কোরআন মজিদ প্রিয় নবির আগমনের বহু পূর্বে লৌহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল। আমরা এই কোরআনের সন্ধান পেয়েছি হজরত মোহাম্মদ (দ.) এর মাধ্যমে। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ ও রবুওয়াতের বিশ্বাস করা কোন দ্বীন ও ধর্ম নয়। বরং প্রকৃত ঈমান হলো আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রিয় নবি বা নায়েবে রসুলকে (দ.) সমভাবে বিশ্বাস করা। এর মাধ্যমেই আল্লাহপাকের ওপর সঠিক বিশ্বাস তথা ঈমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ পাকের তৌহিদ শুধু এই আন্তরিক বিশ্বাসের জন্য যাতে করে রসুল (দ.) কে আল্লাহর সত্য নবি হিসেবে বিশ্বাস করে তার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত কর্মপদ্ধতি নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করা যায়। এ কারণেই রসুল (দ.) কে বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহকে বিশ্বাস করা, আল্লাহ তাঁর মনোনীত পদ্ধতি হিসেবে ঘোষণা করেন নাই। অনুরূপভাবে রসুল (দ.) এর পরে আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত নায়েবে রসুল বা অলি মুর্শিদকে অস্বীকার করলে কোনক্রমেই ধর্মীয় বিশ্বাসে পূর্ণতা আসতে পারেনা এবং তা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তা এক ধরনের খোদাদ্রোহীতা বা আল্লাহকে অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র।

উল্লেখ্য, বর্তমান বিশ্বে অনেকে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু 'নবুয়ত' অস্বীকার করার কারণে তারা কোন প্রকার ঐশি বিধি বিধান মানে না ফলে তারা কার্যত খোদাদ্রোহী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহকে মৌখিক বিশ্বাস করার মাধ্যমে সমাজের কোন উপকার হয় না কারণ এ বিশ্বাসের প্রয়োগিক দিক হচ্ছে ঐশি নির্দেশের আলোকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমূহ প্রতিষ্ঠা করা। যারা এ ধরনের মতবাদ স্বীকার করে না তারা কার্যত রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে আল্লাহর কোন অস্তিত্ব স্বীকার করে না,

একবার হজরত আলী (আ.) যখন মুনাজাত রত ছিলেন (অথবা মিম্বর থেকে জনতার উদ্দেশ্যে) ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন তাকে লক্ষ্য করে খারেজিরা বলে ওঠে : লাকমা ইল্লা বিল্লাহ। লা-লাকা ওয়ালি আসহাবিকা। অর্থাৎ "হে আলী (আ.) শাসন একমাত্র আল্লাহরই অধিকার, শাসন বা মধ্যস্থতা করার অধিকার আপনার বা আপনাদের বন্ধুদের নাই।"

জবাবে তিনি বলেন : কথাটি ঠিক, কিন্তু এর যে অর্থ (তারা) করেছে তা ভুল। এটা সত্য যে, আইন জারি (হুকুম বিচার) একমাত্র আল্লাহর অধিকার (কিন্তু এসব লোক বলছে শাসন একমাত্র আল্লাহর) সত্য এই যে, মানুষের একজন শাসনকর্তা দরকার এবং এই শাসনকর্তা ভাল হতে পারেন বা খারাপও হতে পারেন তার শাসনাধীনে বিশ্বাসী লোকেরা সৎকাজ করে এবং অবিশ্বাসীরা পার্থিব সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে এবং আল্লাহ সব কাজেরই সমাপ্তি টানেন। শাসনকর্তার মাধ্যমে কর আদায় করা হয়, শত্রুদের দমন করা হয়, রাস্তা-ঘাটের নিরাপত্তা রক্ষিত হয়। এবং সবলের নিকট থেকে দুর্বলের অধিকার আদায় করা হয় যাতে পূণ্যবান ব্যক্তিরা শান্তিতে থাকতে পারেন এবং দুষ্ট লোক থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারেন। মানবিয় ইচ্ছা নির্ভর আল্লাহর নির্দেশাবলী বা আইন নিজ থেকে বাস্তবায়িত হতে পারেনা বরং এমন একজন বা একদল লোক অবশ্যই থাকা দরকার যারা আইনকে মানবে ও তা সমাজে বাস্তবায়িত করবেন।

খেলাফত সম্পর্কে খারেজিদের বিশ্বাস :

আধুনিক গণতন্ত্রের প্রবক্তাতাদের চিন্তাধারার সাথে খারেজিদের খেলাফত সম্পর্কে মতবাদের এক অপূর্ব মিল দেখা যায়।

খারেজিরা বিশ্বাস করতো যে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে খলিফা বেছে নিতে হবে এবং এ পদের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি যার ধর্মবিশ্বাস ও কর্তব্য পরায়নতার ক্ষেত্রে পূর্ণ গুণী ব্যক্তি বা ইনসানে কামেল হতে যার ঘাটতি রয়েছে অর্থাৎ (গড় পড়তা ঈমানদার ব্যক্তি।) তিনি কোরাইশ গোত্রের হতে পারেন, নাও হতে পারেন, কোন প্রসিদ্ধ খ্যাতিমান গোত্রের হতে পারেন, আবার কোন পন্ডাতপদ ও অখ্যাত গোত্রের হতে পারেন। আরবও হতে পারেন আবার অনার ও হতে পারেন।

নির্বাচিত হয়ে প্রত্যেকের আনুগত্য লাভের পর খলিফা যদি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলে তাকে খলিফার পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। তিনি যদি আপত্তি করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করতে হবে। অথচ পবিত্র কোরআনে খলিফা তথা ইমাম নির্বাচন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "(ওহে রসুল (দ.) বনি ইসরাইলদের সেই সময়ের কথা স্মরণ করাও) যখন ইব্রাহিমকে (আ.) তাঁহার প্রভু কয়েক বিষয়ে পরীক্ষা করেন এবং উহাতে সফলতা অর্জন করলে আল্লাহ ঘোষণা করলেন। যে আমি তোমাকে লোকের ইমাম বানাইব, হজরত ইব্রাহিম (আ.) বলেন আমার সন্তানদিগকেও কি ? উত্তরে বলা হয় "এই পদে কোন জালিম নিযুক্ত হতে পারে না" (বাকারা-১২৪) আলোচ্য আয়াতটি পর্যালোচনা করে বোঝা যায়। খলিফা বা ইমাম পদে নিয়োগের ব্যাপারে আল্লাহতা'লা পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এ ব্যাপারে অন্য কারো কোন এখতিয়ার নাই।

এই পদে অধিষ্ঠিত করার পূর্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে আল্লাহতা'লা প্রার্থীকে প্রশিক্ষন প্রদান করে থাকেন।

এই পদগুলো ইব্রাহিম (আ.) এর বংশের সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য সংরক্ষিত। তবে যালিম ব্যক্তিগণ এই সম্মান বা পদের উপযুক্ত নয়। যেহেতু রসুল (দ.) এর গোত্র– হাশেমী গোত্র ঐতিহাসিকভাবেই সৎকর্মশীল হিসেবে বিবেচিত তাই হাশেমি বংশের পবিত্র চরিত্রের জ্ঞানী ব্যক্তিগণই আল্লাহ কর্তৃক এই পদে বরিত হয়ে থাকেন। এই প্রেক্ষাপটে রসুল (দ.) বলেছেন– কোরআন ও আহলে বায়াত কে ইসলামের রজ্জু হিসেবে আঁকড়ে থাকলেই ইহ ও পরকালে নাজাত পাওয়া যাবে অন্য কোন পন্থায় নয়।

পবিত্র কোরআনের ও রসুল (দ.) এর হাদিস দ্বারা প্রকাশ পায় যে জনসাধারণের দ্বারা পয়গম্বরের প্রতিনিধি বা খলিফা নির্বাচন করার কোনও এখতিয়ার নাই। নবি রসুলগণ যখন তাদের উম্মতদের দ্বারা নির্বাচিত হন নাই বরং লোকের দ্বীন-দুনিয়ার হেফাজতের জন্য স্বয়ং আল্লাহরই দ্বারা নির্বাচিত হয়ে প্রেরিত হন। সেইরূপ তাদের খলিফা বা নায়েব, ইমামগণ ও তাঁদের কাজের সহায়তায় ও তাদের অনুপস্থিতিতে নবুওত বা রেসালতের দায়িত্ব ও লোকদের দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজন মিটাতে, গোমরাহী হতে বাঁচিয়ে যাবতীয় বিপর্যয়, ভ্রান্তি হতে মুক্ত করে অন্ধকার হতে আলোর পথে অর্থাৎ খোদার সত্যপথে পরিচালিত করতে 'হাদি' রূপে খোদার দ্বারাই নির্বাচিত হন। দুনিয়ার রাজা, বাদশাহ বা প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রী দেশের লোকদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে প্রজাদের বা দেশবাসীর কেবলমাত্র পার্থিব প্রয়োজন মিটাতে পারেন। কিন্তু আখেরাত ও দ্বীনের কর্তৃত্ব করার ব্যাপারে তাদের কোন অধিকার নাই। দুনিয়ার নেতাগণ কেবল লোকের শারীরিক ও বাহ্যিক অবস্থার নিয়ন্ত্রক হতে পারেন কিন্তু নবি বা রসুলগণ মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও আত্মিক অর্থাৎ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়ের 'হাদী' হন। পার্থিব তথা রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ যেমন সাধারণ মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে তাদের প্রতিনিধিও মানুষের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকে, যেহেতু নবি-রসুলগণ আল্লাহ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত তাই তাঁর অলি বা প্রতিনিধি অবশ্যই আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত হবেন এটাই স্বাভাবিক কথা। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে যে,–

"যখন আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ.) কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দেন তবে কোন মোমিন ও মোমিনার কোনও অধিকার নাই যে সে নিজের প্রয়োজনে কাহাকেও মনোনীত করে এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ.) এর নাফরমানি করে তাহারা গোমরাহীতে নিমগ্ন হয়।" (আহজাব- ৩৬)। পবিত্র কোরানের এ ধরনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রসুল (দ.) পরে যারা নিজেদের ইচ্ছা, বুদ্ধি বা সুবিধা অনুযায়ী তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের নেতা/পরিচালক নিয়োগ করা যায় মর্মে বিশ্বাস করে তারা পবিত্র কোরানের উল্লেখিত আয়াত মোতাবেক চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়। তাছাড়া ঐশি নির্দেশ বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে পার্থিব কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর সংশ্লিষ্টতা বা সংশ্রব ত্যাগ করার কথাই নির্দেশ করে।

এ কারণেই তারা কার্যত খোদাদ্রোহিতার শিকারে আপতিত হয়ে গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

উল্লেখ্য যে সালিশের সময় আমর ইবনে আল-আসের প্রতারণা মূলক রায় ঘোষণার সাথে সাথে সভায় গোলমাল শুরু হলো। সব লোক আবু মুসার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং তাকে লাঠিপেটা করে তবে ছাড়লো। পরে আবু মুসা পালালো মক্কায় ও আমর ইবনে আল আস চলে গেল দামেস্কে।

ঘটনার এই পরিস্থিতির জন্য দায়ি খারেজিরা তাদের নিজের চোখে এই সালিশীর কলংকময় রূপ দেখলো এবং তারা যে ভুল করেছে তা বুঝতে পারলো। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হলো তাদের আসল ভুলটা কোথায়। তারা ভাবলো না যে মাবিয়া ও আমর ইবনে আল আসের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে এবং রসুলের ওসি হজরত আলী (আ.) এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিতে কোরআনকে ব্যাখ্যা করে অসময়ে যুদ্ধ বন্ধ করে তারা ভুল করেছে। তারা একথাও ভাবলো না যে সালিশ নিয়োগের ক্ষেত্রে জ্ঞান নগরীর দ্বার আলী (আ.) মতামতের তোয়াক্কা না করে তাদের ধারণা অনুযায়ী তথাকথিত নিরপেক্ষ সালিশকারক আবু মুসা আশয়ারিকে এই কাজে দায়িত্ব দিয়ে তারা মারাত্মক ভুল করেছে। বরং তারা বললো, আল্লাহর ধর্মের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার জন্য দুজন মানুষকে বিচারক। নিযুক্ত করাই আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা হয়েছে এবং এইভাবে তারা অবিশ্বাসের কাজ করেছে। কারণ একমাত্র বিচারক হচ্ছেন আল্লাহ, মানুষ নয়। হজরত আলী (আ.) এর কাছে এসে তারা বললো, "আমরা বুঝতে পারিনি, আমরা একজন মানুষকে সালিশকারক নিয়োগ করে ছিলাম। এইভাবে আপনি একজন অবিশ্বাসী হয়েছেন এবং আমরাও অবিশ্বাসী হয়েছি। তবে আমরা অনুতপ্ত এবং আপনিও অনুতপ্ত হোন - তওবা করুন।

হজরত আলী (আ.) বলেন যে কোন পরিস্থিতিতে অনুতাপ করা ভাল। আমরা আমাদের পাপের জন্য সব সময় অনুতাপ করছি।

কিন্তু তারা বলল, না এটাই যথেষ্ট নয় বরং হজরত আলী (আ.) কে স্বীকার করতে হবে যে সালিশী ব্যাপারটাই পাপ । আর এই পাপের জন্য তাকে অনুতাপ করতে হবে । হজরত আলী (আ.) বললেন যে সালিশী তো তিনি চান নি বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তারাই চেয়েছে এবং তার করুন পরিণতিও তারা দেখেছে। তবুও ইসলাম যে কাজকে বৈধ করেছে এ ধরনের একটি কাজকে তিনি পাপ বলে ঘোষণা করবেন অথবা কিভাবে যে পাপ তিনি করেন নি তা স্বীকার করবেনই বা কি করে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, পবিত্র কোরআনে স্বামী-স্ত্রীর মতবিরোধ নিরসনের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "আর যদি দুজনের (স্বামী-স্ত্রী) মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করো তবে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও তার স্ত্রীর) পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে যদি তারা দুজনে নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সচেতন।" (নিসা-৩৫)।

আলোচ্য আয়াতগুলিতে দাম্পত্য কলহ নিরসনের জন্য শালিশ নিয়োগের বিধান আছে। তাই দুইটি বিবদমান দলের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সালিশ নিয়োগ কখনোই কোরআনের দৃষ্টিতে অবৈধ হতে পারে না।

খারেজিগণের ধর্মীয় মতবাদ ছিল অত্যন্ত উগ্র, তারা মনে করতো যে তাদের মতবাদ যারা মানে না তাদের মতে তারা সকলেই কাফের এবং তাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

তাদের মতে সগিরাহ বা কবীরা যে কোন প্রকারের পাপ মানুষকে ধর্মচ্যুত করে এবং এ ধরনের পাপীকে নরকের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাদের মতে কেবল তারাই আল্লাহর পথের যাত্রী এবং যারা গৃহে বসে থাকে, এবং তাদের সাথে আল্লাহর পথে বের হয় না তারা কাফের। তারা নারী ও শিশুসহ সকলকে (যারা তাদের বিরোধিতা করে) হত্যা করার পক্ষপাতি ।

তারা বলৎকারের শাস্তি রহিত করে কারণ, তাদের মতে এর জন্য শাস্তি কোরআনে বর্ণিত হয়নি। তাদের মতে কাফেরের সন্তানাদি তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে নরকের অগ্নিতে শাস্তি পাবে।

তারা মনে করতো বাস্তব কর্মছাড়া ঈমানের কোন মূল্য নাই। আর এ কর্মধারা তাদের (খারেজিদের) মনোনীত হতে হবে।

তাদের মতে যে সকল মুসলমান নিয়মিত নামাজ পড়ে না, রোজা রাখেনা বা অন্যান্য ধর্মীয় আহকাম আরকান পালন করেন তারা কাফের, এবং মৃত্যুদন্ড শাস্তির উপযুক্ত।

তাদের মতে মৃতের জন্য কাঁদা নিষিদ্ধ। তারা মনে করতো কবিরা গুণাহ করা ব্যক্তি মুমিনও নয়, কাফেরও নয়।

খলিফার প্রতি আনুগত্যকে তারা মনে করতো রীতিমত গুণাহর কাজ। তাদের মতে এটাও এক রকম 'ব্যক্তিত্ব পূজা'।

খলিফার অনুবর্তী বললেন নর/নারী নির্বিশেষে সবাইকে তারা হত্যা করতো অত্যন্ত নির্দয়ভাবে। এই বিকৃত মতবাদের উত্তরসূরিরাই আল্লাহর অলি বা নায়েবে রসুল বা পির মতবাদকে শিরক মনে করে। পক্ষান্তরে নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা সকল সমাজেই গ্রহণীয়। অমুসলমানদের প্রতি তাদের কোন আক্রোশ ছিল না। কিন্তু তাদের থেকে ভিন্নমত পোষণকারী মুসলমানদের তারা কিছুতেই রেহাই দিত না। এভাবে সারা দেশে তারা এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। খারেজিরা মনে করতো, আল্লাহর শাসন কায়েম করার জন্য তাদের বিদ্রোহ/আন্দোলন এবং তাদের পতাকা খোদাই পতাকা। অতএব তাদের সাহায্যে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবেই। তাদের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম। তাই জয় তাদের সুনিশ্চিত। এ শয়তান দুনিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের যদি মৃত্যু ঘটে তাতেও ক্ষতি নাই- বেহেশত তথা পরকালের সাম্রাজ্য তাদের জন্য অবধারিত।

এ ধরনের ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহারিক ও বাস্তব জীবনে তারা এক বিপজ্জনক ও ভয়াবহ সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তাদের মধ্যে সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের দৃঢ় মনোবল ছিল এবং নিজেদের বিশ্বাস ও ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। ইতিহাসে এমন অনেক নিঃস্বার্থ খারেজির সন্ধান পাওয়া গেছে– যাদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে তেমন মানুষ ইতিহাসে বিরল। তাদের এই পরার্থপরতা ও স্বার্থত্যগই ছিল তাদের সকল সাহস/ শক্তির উৎস।

আল্লাহর আরাধনা ও আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা ছিল খারেজিদের বিশেষ গুণ। তাদের রাত কাটতো নামাজে, দুনিয়ায় তাদের কাঙ্খিত কিছু ছিল না। দুনিয়ার কোন প্রলোভন তাদের আকর্ষণ করতো না। জানা যায় যে, সেজদা দিতে দিতে তাদের কপালে দাগ পড়ে গেছে। শুকনো ও গরম মাটিতে ঘন ঘন হাত পড়ার ফলে তাদের হাত উটের পায়ের মত শক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মনে কোন দ্বিধা নাই-তারা দৃঢ় সংকল্প। তাদের অনেকে দিনের বেলায় খাদ্যবস্তু ঘরে আনতো এবং রাতে কখনো বিছানা পাততো না। কারণ তারা দিনে রোজা রাখতে এবং সারারাত নামাজ- বন্দেগিতে কাটিয়ে দিত।

তারা একদিকে যেমন আপোষহীন গোঁয়ার আর চরম ধর্মান্ধ অন্যদিকে ভয়ানক নীতিবাগীশ। ধর্মের নামে নরহত্যা লুটতরাজ করতে ওদের একটু বাধত না। কিন্তু মালিককে দাম দেওয়া হয়নি বলে গাছতলায় কুড়িয়ে পাওয়া একটি খেজুর ভক্ষণে এদের ঘোর আপত্তি। ভুলে এক খারেজির তীরে এর একটি শুকর মারা পড়েছিল খারেজিটি তৎক্ষণাৎ শুকটির মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির। ধর্ম তথা কোরআন ও হাদিসের অন্তনিহিত অর্থ না বুঝে বাহ্যিক তথা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে যা হয় খারেজিদের কার্যকলাপ অবিকল তাই হয়ে দাঁড়ালো।

খারেজিদের বাইরের সাধুতা ও ধার্মিকতার প্রকৃতিই এমন ছিল যে প্রতিটি ঈমানদার লোকের মনই সন্দিহান হয়ে উঠতো এবং প্রকৃত ধর্ম বা ঈমানদার সম্পর্কে এক ধরনের অনিশ্চিতি ও বিভ্রান্তি সকলের মনকে ছেয়ে ফেলতো। তবুও ধর্মান্ধতার গুণে অজ্ঞ লোকদের ওপর তাদের প্রভাব পড়তো। এসব সম্মোহিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন শক্তি দাঁড়াতে পারে ? আপাতদৃষ্টিতে এই সব নিষ্ঠাবান পূণ্যবান লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না তেমন দৃঢ় মানুষ কোথায় ?

এই ধরনের লোকদের স্বরূপ উৎঘাটন করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা এক গৌরবের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে, হজরত আলী (আ.) বলেছেন "আমি এবং কেবল আমিই এই সব ধর্মান্ধদের দিক থেকে ইসলামের সামনে যে বিপদ আসতে পারে তা বুঝতে পেরেছিলাম। তাদের কপালের দাগ অথবা ধর্মভীরুদের পোশাকের মত তাদের পোশাক অথবা তাদের ঘন ঘন আল্লাহর নাম উচ্চারণ এমনকি আল্লাহর প্রতি তাদের দৃঢ় ও অবিচল বিশ্বাস তাদের সম্পর্কে আমার অন্তঃদৃষ্টির পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। আমি প্রথমে বুঝতে পেরেছিলাম যে তারা যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহলে হয়ত সবাই তাদের রোগে (মতবাদে বিশ্বাসী) আক্রান্ত হবে। যার ফলে মুসলিম জাহান অত্যন্ত অনমনীয় হয়ে উঠবে এবং (ধর্মের) বাহ্যিক প্রাণহীন দিকগুলোর প্রতিই বেশি করে ঝুঁকে পড়বে যার ফলে ইসলামের মেরুদন্ডই বেঁকে যাবে। এই কথাগুলোই রসুল (দ.) এভাবে বলেছেন : দুটো দল ইসলামের পৃষ্ঠদেশ ভেঙ্গে দেবে– একদল যারা জানে কিন্তু অবিবেশির মত– (মাবিয়ার দল) অপর দল-যারা অজ্ঞ, কিন্তু ধার্মিকতার ভান করে।

অর্থাৎ হজরত আলী (আ.) যদি ইসলামি বিশ্বে খারেজি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করতেন তাহলে আর কেউ এমন ছিলেন না যিনি দেখতে পেতেন যে সেজদা দিতে দিতে যাদের কপালে দাগ পড়ে গেছে তারা- ইসলামের পথে একটা প্রতিবন্ধক। যারা মনে করেছে যে তারা ইসলামের খেদমতে কাজ করছে প্রকৃত পক্ষে তারা ইসলামের শত্রু। এদের বিরুদ্ধে সঠিক পদ্ধতিতে ইসলামের মূল আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করার কেউ ছিল না। নবির (দ.) প্রকৃত উত্তরাধিকারীই কেবল এ ধরনের প্রজ্ঞা জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তির অধিকারী হতে পারেন। হজরত আলী (আ.) খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন বলে পরবর্তী ধর্মতত্ত্ববিদগন তাদের ভুল মতবাদ ও

কর্মকান্ড সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে এ ধরনের আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিও যে দ্বীন ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছেন।

প্রকৃতপক্ষে খারেজিরা ছিল অজ্ঞ ও অশিক্ষিত এবং তারা তাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার জন্যই ধর্মীয় বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারেনি এবং ইসলামের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের অপব্যাখ্যা করেছে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের এই ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণাগুলোই তাদের ধর্ম বিশ্বাসে পরিণত হয় এবং এই পরিণতি লাভের প্রক্রিয়ায় তারা সর্বাধিক আত্মত্যাগ করেছে বলে মনে করে। প্রথম দিকে মন্দকাজ পরিহার করার ইসলামি বিধানই তাদেরকে একটি দলে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা দেয়– যে দলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল একটি ইসলামি আচরণ বিধির পুনঃরুজ্জীবন ।

খারেজিদের মত একটি দলের অজ্ঞতার বিপদ এই যে, এরা অতি সহজেই চতুর লোকদের হাতে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ইসলামের উচ্চতর মহান স্বার্থ হাসিলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ধর্মহীন- কপটচারীরা সহজেই সরল ধর্মান্ধদেরকে ইসলামের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারে। তারা এই সব কপটচারীদের হাতে তরবারি হিসেবে এবং তাদের ধনুকের তীর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হজরত আলী (আ.) অত্যন্ত সুন্দর ও সঠিকভাবে তাদের বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণনা করেছেন।

"তোমরা হচ্ছ সর্বাধিক খারাপ লোক, তোমরা শয়তানের হাতের তীর। শয়তান তার লক্ষ্য বস্তুর বিরুদ্ধে তোমাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং তোমাদের মাধ্যমেই সে লোকদের কে হতবুদ্ধি ও সন্দিহান করে তোলে।"

প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল সংকীর্ণমনা ও ক্ষীণ দৃষ্টির মানুষ। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের তাদের নিজস্ব সীমিত ধারণার চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সকল সংকীর্ণমনা মানুষের মত তারাও দাবি করতো যে অন্যরা সবাই ভুল বুঝেছে অথবা কিছুই বোঝেনি। সবাই ভুল পথে চলেছে এবং দোজখে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে। তারা আল্লাহতা'লার দয়াকে সংকুচিত করে ফেলে। তারা মনে করে আল্লাহ একটি ক্রোধের সিংহাসনে বসে আছেন– অপেক্ষা করেছেন তাঁর বান্দাদের ভুলের জন্য যাতে তিনি তাদের ওপর চিরস্থায়ি শাস্তি আরোপ করতে পারেন। এদের মৌলিক বিশ্বাস ছিল কবিরা গোনাহ করলে অবিশ্বাসী বা কাফের হয়ে যায়। এবং তারা ইসলামের বাইরের লোক। কাজেই সীমিত সংখ্যক লোক ছাড়া প্রত্যেকেই নরকবাসী হবে।

খারেজিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল তাদের কুসংস্কারচ্ছন্ন ও গোঁড়া মনমানসিকতা। তারা সবাইকে অধার্মিক বলতো তার মূলেও ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে হজরত আলী (আ.) বলেছেন, রসুল (দ.) কাউকে শাস্তি দিয়েছেন। আবার তার জানাজার নামাজও পড়েছেন। যদি বড় ধরনের কোন পাপ করলেই কাফের হয়ে যেত, তাহলে রসুল (দ.) এটা করতেন না কারণ কাফেরের জানাজা পড়া জায়েজ নয়। পবিত্র কোরআনেই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রসুল (দ.) সুরাসক্ত ব্যক্তিকে চাবুক মেরেছেন। পরে আবার তাদের সবাইকে ধর্মীয় মজলিসে ঠাঁই দিয়েছেন। বায়তুল মাল থেকে তাদের ভাতা বন্ধ করেননি এবং তাদেরকে অন্য মুসলিমের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। রসুল (দ.) ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী অন্যায়ের শাস্তি দিয়েছেন, কিন্তু শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে মুসলমানদের তালিকা থেকে বাদ দেননি।

হজরত আলী (আ.) খারেজিদেরকে প্রশ্ন রেখেছিলেন যদি ধরা নেয়া যায় যে, তিনি অন্যায় করেছেন এবং তার ফলে তিনি নাস্তিক হয়ে গেছেন। তাহলে তারা সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে নাস্তিক বলে নিন্দিত করে কেন ? তার অর্থ কি এই যে কোন একজন বিপথে গেলেই অন্যরাও বিপথে গেছে বলে ধরে নিতে হবে এবং তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেছেন, তারা কেন এই সব লোকের কাঁধের ওপর অস্ত্র উচিয়ে ধরে? তাদের তরবারি নিস্পাপ ও পাপীকে সমানভাবে বিদ্ধ করে কেন ? এখানে হজরত আলী (আ.) দুটো বিষয়ে তাদের নিকট প্রতিবাদ জানিয়েছেন– তার প্রতিরোধী ক্ষমতা দুদিক থেকে তাদেরকে প্রতিহত করেছে। একটি হচ্ছে এই যে তারা নিরপরাধ লোকদেরকেও পাপীদের সাথে একাকার করে ফেলেছে এবং তাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছে। এবং অপরটি হচ্ছে, পাপ করেছে– এমন লোককে তারা নাস্তিক

বলে ধরে নিয়েছে এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দিতে চেয়েছে। অর্থাৎ ইসলামকে তারা সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে - এবং বলে দিয়েছে যে, কেউ ইসলামের কোন নিয়ম নীতির সীমা অতিক্রম করলে ইসলাম থেকেই সে বেড়িয়ে গেছে বলে গণ্য করা হবে।

হজরত আলী (আ.) এর শাহাদত :

হজরত হাসান (আ.) বর্ণনা করেন সকাল বেলা আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি বলতে লাগলেন, "বৎস ! রাত্রিভর এতটুকু ঘুমাইতে পারি নাই। একবার বসিয়া বসিয়াই একটু তন্দ্রার ভাব হইলে রসুল (দ.) কে স্বপ্নে দেখিলাম। বলিলাম ইয়া রসুলুল্লাহ, আপনার উম্মত দ্বারা আমি বড় কষ্ট পাইয়াছি। তিনি বলিলেন দোয়া কর, যেন খোদা তোমাকে উহাদের কবল হইতে মুক্তি দেন। তারপর আমি দোয়া করিলামঃ হে খোদা আমাকে উহাদের চাইতে উত্তম সংঙ্গী দাও এবং উহাদিগকে আমার চাইতে নিকৃষ্ট সংঙ্গীর কবলে পতিত কর।" হজরত হাসান (আ.) বলিলেন : এই সময় ইবনুল বান্না মোয়াজ্জেন আসিয়া নামাজের জন্য ডাকিতে লাগিলেন। আমি পিতার হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া মসজিদের দিকে যাইতে শুরু করিলাম। ইবনুল বান্না তার অগ্রে এবং আমি পশ্চাতে ছিলাম। দরজার বাহিরে আসিয়া তিনি ডাকিতে শুরু করিলেন। লোক সকল! নামাজ! বরাবর তাঁহার নিয়ম ছিল লোকদিগকে তিনি মসজিদে আসার জন্য নিন্দ্রা হইতে ডাকিয়া জাগাইতেন।

তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলেন ? মৃত্যুর জন্য কোমর বাধিয়া লও কারণ মৃত্যু অবশ্যই তোমার সহিত মিলিত হইবে। মৃত্যুকে ভয় করিও না। যদি মৃত্যু আসিয়া উপনীত হয়। মসজিদের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুইটি তরবারি একত্রে চমকিতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি আওয়াজ শোনা গেল। রাজ্য আল্লাহর, হে আলী তোমার নয়। শবীরের (ব্যক্তির নাম) তরবারি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। কিন্তু স্রষ্টার নিকৃষ্ট সৃষ্টি খারেজি ইবনে মুলজিমের তরবারি তার ললাট দেশে বিদ্ধ হইয়া মস্তিষ্ক পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল। আহত হইয়াই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন। কাবার প্রভুর শপথ, আল্লাহর শপথ, আমি কৃতকার্য হইয়াছি ।"

আমিরুল মোমেনিন, হজরত হাসান (আ.) কে বলিলেন ঃ এই ব্যক্তি বন্দী (হত্যাকারী) উহার সহিত সদ্ব্যবহার কর। ভাল খাইতে দাও। নরম বিছানা দাও। যদি– বাঁচিয়া থাকি তবে আমি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব অথবা উহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। আর যদি মরিয়া যাই, তবে উহাকে আমার পিছনেই প্রেরণ করিয়া দিও। আল্লাহর দরবারে উহার নিকট জওয়াব চাইব। হে বনি আবদুল মোতালিব, সাবধান আমার হত্যা ব্যতীত আর কাহাকেও হত্যা করিওনা। হে হাসান (আ.)! উহার এই আঘাতে যদি আমার মৃত্যু হয়। তবে উহাকেও এক আঘাত দ্বারা শেষ করিয়া দিও। উহার নাক কান কর্তন করিয়া লাশ বিকৃত করিওনা। আমি রসুল (দ.) কে বলিতে শুনিয়াছি, সাবধান নাক কান কাটিও না যদি কুকুরও হয়। (তাবারী) হজরত আলী (আ.) ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ২৪ জানুয়ারি ওফাত প্রাপ্ত হন।

হজরত হাসান (আ.) খেলাফত লাভ :

হজরত রসুল (দ.) এর সুন্নত মোতাবেক হজরত আলী (আ.) ওসিয়তনামা রেখে গিয়েছিলেন। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেই যেটা লেখা হয়, "এটি আল্লাহর বান্দা আলী ইবনে আবু তালিবের ওসিয়ত নামা। আল্লাহর রহমত হাসিলের জন্য তাঁর সম্পত্তি কিভাবে ব্যয়িত হবে এ তারই নির্দেশ (অর্থাৎ তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন)- যে রহমত তাঁকে দেবে শান্তি আর বেহেস্তে প্রবেশাধিকার। আমার পর আমার পুত্র হাসান (আ.) হবেন আমার সম্পত্তির মুত ওয়াল্লি বা তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক। তিনি আল্লাহর হুকুম আর ইসলামি আইন অনুসারে গরিব দুঃখী অভাবগ্রস্তের সাহায্যে এ সম্পত্তি থেকে ব্যয় করতে পারিবেন। যদি হাসানের (রা.) কিছু ঘটে আর হোসাইন (আ.) জীবিত থাকেন তাহলে হাসানের পর তিনিই মুতওয়াল্লি ও তত্ত্বাবধায়ক হবেন এবং এখানে লিখিত নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবেন।" (হজরত আলী (আ.), আবুল ফজল, পৃ. ১৬১)।

উক্ত ওসিয়তের মর্মানুযায়ী আমিরুল মোমেনিন হজরত আলীর (রা.) পর তার অনুসারীগণ হজরত হাসান (আ.) হাতে বাইয়াত হলেন এবং তাঁকে আমিরুল মোমেনিন হিসেবে বরন করে নিলেন। ইরাকিদের দ্বারা হাসানকে (রা.) খলিফা ঘোষণা এবং হিজাজ, ইয়েমেন ও পারস্য হতে কোন প্রতিবাদের অনুপস্থিতি ছিল মাবিয়ার জন্য একটা বিরাট ভয়ের কারণ। কারণ, তিনি ওসমানের (রা.) মৃত্যুর পর থেকেই ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় রত ছিলেন এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন আলী (আ.) আর জীবিত নেই তখন শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পথকে একেবারে নিষ্কন্টক দেখতে পেয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে আর দেরী করলেন না। তিনি হজরত হাসান (আ.) কে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি হাসান (আ.) বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য বহু গুপ্তচর পাঠান। এই সমস্ত গুপ্তচরেরা ইয়েমেন, পারস্য ও হিজাজ প্রভৃতি দেশে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও ট্রান্স জর্ডানের সমস্ত সেনাপতিদের ডেকে পাঠিয়ে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সিরিয়াধিপতি ষাট সহস্রের সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মেসোপটেমিয়া থেকে মাসকিনের মধ্যে সাওয়াদের দিকে মসুলের টাইগ্রিস নদীর তীর ধরে হজরত হাসান (আ.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন।

খেলাফতের ইতিহাস, উত্তরাধিকার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হজরত হাসান (আ.) ও মাবিয়ার মধ্যে এই সময়কার পত্রালাপ অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস।

হজরত হাসান (আ.) তার পত্রে মাবিয়াকে আহলে বায়াতদেরকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে রসুল (দ.) এর ওফাতের পর খেলাফত থেকে বঞ্চিত করার ঘটনা পুণর্ব্যক্ত করে তিনি তাঁর পুত্রের শেষাংশে লিখেছিলেন :

"কজন ব্যক্তি ইসলামের দিক থেকে অগ্রগামী এবং বিভিন্ন গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও (প্রথম তিন খলিফা প্রসঙ্গে) আমাদের (আহলে বায়াত) থেকে জোর করে খেলাফতের অধিকার কেড়ে নেওয়া দর্শনে আমরা মর্মাহত হয়েছিলাম। আর এখন হে মাবিয়া, তোমার অধিকার চর্চার দৃশ্য দেখাটা কি গভীর মর্ম বিদারক। কি অদ্ভুত ! দ্বীনের ক্ষেত্রে তোমার কোন খ্যাতি নাই। তোমার মধ্যে ইসলামের এমন কোন 'আসন'নেই যা কখনো প্রশংসিত হয়েছে। বরং, তুমি হচ্ছো গিয়ে 'হিজবে মিনাল আজহাবো" এর (মাবিয়া ও তার কুখ্যাত পিতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে অনেকগুলি দল একত্রিত হয়ে মদিনাকে ধ্বংস করার যে সর্বশেষ প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন সেদিকে ইংগিত) পুত্র। তোমার পিতা ছিলেন কুরাইশদের মধ্য হতে, রসুলদের (দ.) বড় শত্রু। সুতরাং বাতিলের পক্ষে সংগ্রাম করা থেকে বিরত হও এবং অন্যদের মত তুমিও আমার আনুগত্য স্বীকার করে নাও। কারণ তুমি নিশ্চয় জানো যে খোদা ও সমস্ত ভালো লোকদের চোখে তোমার চেয়ে আমি খলিফা হওয়ার জন্য অনেক বেশি যোগ্য। আল্লাহকে ভয় কর এবং বিদ্রোহ ও মুসলমানদের রক্ত ক্ষরণের দায় নিয়ে তোমার প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তুমি কোন ভাল প্রতিদান লাভ করতে পারোনা।" (মাকাতিল, পৃ. ৫৬) (আবু মিখনাফ হতে), ইবনে আসেম, ৪, পৃ. ১৫১)।

হজরত হাসানের (রা.) প্রতি মাবিয়ার প্রত্যুত্তর ছিলো : তুমি রসুল (দ.) এর ওফাতের এবং সে সময়ে মুসলমানদের মধ্যে উপস্থিত বিবাদের কথা উল্লেখ করেছে। এতে তুমি সুস্পষ্টভাবে আবুবকর (রা.), ওমর (রা.) ও আবু উবায়দার এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্য হতে নিবেদিত প্রাণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছে। যে সমস্ত ব্যক্তিদের আচার-আচরণ আমাদের মত লোকদের সমালোচনার ঊর্ধ্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করাকে আমি ঘৃণা করি। নবিজির পরে নেতৃত্ব নিয়ে যখন উম্মাহর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় তখন তারা তোমার পরিবারের গুণাবলী, যোগ্যতা ও রসুলের (দ.) সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন না, কিংবা তারা ইসলামি গুণাবলী সম্পর্কে অসচেতন ছিলেন না। কিন্তু তারা দেখতে পেলেন যে এ জিনিসটি (খেলাফত) সাধারণ কুরাইশদের জন্যই উপযুক্ত আর তাই তারা আবুবকর (রা.) কে মনোনীত করেন। এটা উম্মাহর স্বার্থের দিকে তাকিয়েই করেছিলেন। (একই যুক্তি হজরত ওমর (রা.) উপস্থাপন করেছিলেন। মাবিয়া প্রকৃতপক্ষে আবুবকর, ওমর (রা.) অনুসারী ছিলেন বিধায় তাদের সম্পর্কে কোন সমালোচনাই বরদাশত করতেন না ।) তুমি আমাকে বিষয়টার শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত

হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলেছে, কিন্তু তোমার আর আমার অবস্থাটা এমন এক স্থানে উপনীত হয়েছে ঠিক যেমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিলো রসুলের (দ.) এর ওফাতের পর তোমার পরিবার ও আবুবকরের মধ্যে। যদি আমার মনে হতো যে শাসিত জনগণের ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার জ্ঞান বেশি, তুমি আমার চেয়ে ভালভাবে উম্মাহর রক্ষণাবেক্ষন করতে পারবে। আমার চেয়ে ভালোভাবে মুসলমানদের জানমালের হেফাজত করতে এবং শত্রুদের পরাভূত করতে সক্ষম হবে-তাহলে তুমি আমাকে যা করতে বললে আমি ঠিক তাই করতাম। কিন্তু আমি অনেক বেশি সময় ধরে শাসন কাজ চালিয়েছি। তোমার চাইতে নীতি নির্ধারনে আমি পাকা এবং বয়সেও বড়। তাই তুমি আমাকে যা করতে বলছ সেটার ওপর বেশি জোর করে কোন লাভ হবে না, তুমি যদি এখন আমার আনুগত্য স্বীকার করে নাও, তাহলে আমার পরে তুমিই হবে, খলিফা। (মাকাদিল, পৃ. ৫৭ আবু মিখনাফ হতে) ইবনে আসেম, ৪, পৃ. ১৫২)।

মুসাবিয়ার এ পত্র এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এ থেকে মুসলিম রাজনীতি তখন থেকে যে সুস্পষ্টভাবে দুটি খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল সে সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।

রসুলের (দ.) এর ওফাতের পর খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে রসুলের (দ.) নির্দেশ লঙ্ঘন করে মানবিয় বুদ্ধিতে আবুবকর (রা.) ও তৎপরবর্তী খলিফা নিয়োগ যে যথাযথ ছিল না মাবিয়া তা স্বীকার করতেন না। বরং এ ধরনের যে কোন আলোচনাকেই তিনি ঘৃণা করতেন। প্রকৃতপক্ষে মাবিয়া তথা উমাইয়া বংশীয়রা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কারণেই খলিফা নির্বাচনের খোদায়ি বিধান ও রসুলের (দ.) সঠিক নির্দেশ সাধারণ জনতা জানতে পারেনি। বরং মাবিয়া ও তার অনুসারীদের প্রদর্শিত যুক্তিই ইসলামের বিধান হিসেবে অদ্যাবধি চালানো হয়ে আসছে এবং খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি ও সমালোচনা উর্ধ্বে রাখা হয়েছে।

তাছাড়া খেলাফতের জন্য মাবিয়ার দাবির স্বপক্ষে প্রদত্ত যুক্তিগুলোই প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কোরআন ও রসুল (দ.) এর নির্দেশ অনুযায়ী আলে মুহাম্মদ বা আহলে বায়াতদের মর্যাদা ও শানের প্রত্যক্ষ অস্বীকৃতি। পক্ষান্তরে এই যুক্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নেতৃত্ব এক বা একাধিক ব্যক্তির মতামত, বুদ্ধি, ব্যবহারিক জ্ঞান বা প্রশাসনিক যোগ্যতাকে ঐশি নির্দেশের ওপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই চিন্তা ধারায় প্রথম তিন খলিফার আমলে যে বিষয়টি অস্পষ্ট ছিল অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর ধর্মীয় নেতৃত্ব কার্যত পৃথক। অর্থাৎ রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে স্বতন্ত্রীকরণ, যা এখন থেকে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কালক্রমে অধিকাংশ মুসলমান রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে বাধ্যতামূলক স্বীকার করে নিয়ে (জনতার) ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রদান করে ধর্মের জিম্মাদার হিসেবে কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যাকারক উলেমা সম্প্রদায়ের ওপর। অর্থাৎ তারা সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে কোন আগ্রহ দেখাতেন না ফলে শাসক সম্প্রদায় তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ল এবং শাসক কর্তৃক নিয়োজিত আলেমগণই তাদের ধর্মীয় নেতা হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি পেল। মুসলমানদের আরেকটি অংশ, যদিও তারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে আহলে বায়াত ছাড়া তারা আর কারো নেতৃত্বের মধ্যে ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি খুঁজে পাননি বা রাষ্ট্রীয় ওলেমাগণকে চূড়ান্ত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকার করে নিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একদল রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়োজিত মসজিদের ইমামকে নায়েবে রসুল মনে করে তার নেতৃত্বকেই একমাত্র বৈধ ধর্মীয় নেতৃত্ব হিসেবে মেনে নিলেন। পক্ষান্তরে অন্যদল বিকল্প হিসেবে আহলে বায়াতকে, নায়েবে রসুল, বা আল্লাহর অলির সান্নিধ্যে ধর্মের সার্বিক রূপরেখা অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন।

হজরত হাসান (আ.) খেলাফত গ্রহণ করেছেন এই সংবাদ জানা মাত্র মাবিয়া ইরাকের ওপর আক্রমণ পরিচালনার আদেশ দেন। হজরত হাসান (আ.) উহার মোকাবিলার জন্য একটি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু খেলাফত নিয়ে এভাবে যুদ্ধ বিগ্রহে আরও রক্তপাত ঘটাতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। ওপরুন্ত দুইটি বিবদমান গ্রুপের মধ্যে শান্তি স্থাপন সম্পর্কে হজরত হাসান (আ.) সম্পর্কে রসুল (দ.) যে অসিয়ত করেছিলেন তার আলোকে হজরত হাসান (আ.) মাবিয়ার সাথে কয়েকটি শর্তে সন্ধি স্থাপন করেন।

১। মাবিয়ার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় মাবিয়া হজরত আলী (আ.) এর যে গালি গালাজের রীতি প্রবর্তন করেন তা রহিত করুন।

২। ইসলামের সকল প্রকার আইন-কানুন অনুসরণ করে প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদন করবেন।

৩। মাবিয়ার পর হজরত হাসান (আ.) অথবা তার অবর্তমানে হজরত হোসাইন (আ.) পরবর্তী খলিফা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

উল্লেখ্য যে এর একটি শর্তও মাবিয়া প্রতিপালন করেন নি। তবে এই চুক্তি করায় খেলাফত পরিত্যাগের পর হজরত হাসান (আ.) সপরিবারে মদিনায় ফিরে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই মাবিয়ার ইংগিতে হজরত হাসান (আ.) কে বিষপান করানোর ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে মাবিয়া কর্তৃক সাক্ষরিত এই চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে আহলে বায়াতগণই রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বৈধ অধিকারী।

প্রকৃত ঈমানদারগণ ইতিহাসের সকল পরিস্থিতিতে আহলে বায়াতদের ভালোবেসে আসছেন। এ ভালোবাসার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা আশেক-কে এক তীব্র আলোকে আলোকিত করে তোলে এবং তাকে এঁদের প্রতি টেনে আনে। এই অপার্থিব অথচ শাশ্বত শক্তি সব সময় মুসলমান নামধারী খোদাদ্রোহী শাসকদের জন্য এক চরম পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আহলে বায়াতের সিদ্ধ পুরুষ যারা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রজ্ঞা ও ধর্মের অনুশীলন করেছিলেন– যাদের হাতে না ছিল অস্ত্র, ধনসম্পদ, তাদের অনুসারীদের মনের ওপর অধিকতর দৃঢ়তার সাথে শাসন চালিয়েছিলেন এবং সেনাবাহিনীর প্রভু, প্রাসাদবাসী খলিফার চেয়ে জনগণের অধিকতর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আহলে বায়াতদের পরিবর্তে যাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে তাদের পাপাচার ও দুঃশাসনের ফলে জনমনে আকুল বাসনা জেগেছে যে আহলে বায়াতদেরকে খোদা প্রদত্ত অধিকার পুন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ কারণেই প্রকৃত ঈমানদারগন মাবিয়ার পরিবর্তে আলী (আ.)। আলী (আ.) পর হাসান (আ.) কে, ইয়াজিদদের পরিবর্তে হজরত হোসায়েন (রা.) কে পরবর্তীতে জয়নাল আবেদীন (রা.), ইমাম বাকের, জায়েদ (রা.), ইয়াহিয়া (রা.), ইমাম জাফর সাদেক (রা.), কে তাদের প্রকৃত মুরশিদ বিবেচনা করতেন এ কারণেই আবুল আব্বাস আহলে বায়াতদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করে নিজেই অবৈধ দখলদার হয়ে ক্ষমতায় গেলেন। এমনকি আব্বাসীয় বংশের খলিফা আল মামুন তার পূর্ব পুরুষদের অপকর্মের মাশুল দেওয়ার লক্ষ্যে আহলে বায়েতদের আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায় সংগত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে ছিলেন। তদনুযায়ী তিনি অষ্টম ইমাম, আলী ইবনে মুসা উপনাম রিজাকে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তাছাড়া মামুনের বোন উম্মুল ফজলকে তার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। তিনি আব্বাসীয়দের কালো রং বর্জন করে আহলে বায়েতদের সবুজ রংও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতালোভী মুসলমান নামধারী আব্বাসীয়রা এই মহান নেতাকে হত্যা করে।

নবম অধ্যায়

মাবিয়ার রাজত্বকাল

মাবিয়া প্রায় ৪০ বৎসর যাবত খেলাফতের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষমতাসীন ছিলেন। হজরত ওমর (রা.) আমলে গভর্নর হিসেবে কিন্তু কেন্দ্রীয় খলিফার গোলামের চেয়েও বেশি খলিফাকে ভয় করতেন। হজরত ওসমান (রা.) এর সময়ে খলিফাকে কোন রকম তোয়াক্কা না করে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। হজরত আলী (আ.) এর আমলে বিদ্রোহি গভর্নর হিসেবে কেন্দ্রীয় শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেন। হজরত আলী (আ.) এর ওফাতের পর মুসলিম বিশ্বের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে রাজ্য শাসন করার সুযোগ পান। তার মত দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্ষমতার প্রভাব বলয়ে থাকার সযোগ খুব কম মুসলিম নেতাই পেয়েছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার প্রেক্ষিতে তিনি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গীতে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা তথা মতবাদ চালু করেন। যেহেতু তিনি ইসলামি শাসক ছিলেন তাই সেগুলো ইসলাম ধর্মীয় বিধান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মতবাদই সঠিক ইসলাম নয় তা বলাই বাহুল্য। তার আমলে বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুতি নিম্নে প্রদান করা হলো।

মাবিয়ার আমলে আদর্শগত বিভ্রান্তি :

এক অদৃশ্য মহাশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করার নাম ইসলাম। এই আত্মসমর্পণ রসুল (দ.) এর অবর্তমানে নায়েবে রসুল তথা অসিয়ে রসুল (দ.) এর মাধ্যমে করতে হয়। এ কারণেই পৃথিবীর সকল ধর্মে গুরুরূপী শিক্ষকের অনসুন্ধান করতে বলা হয়েছে। যিনি তাঁর অনুসারীদের পার্থিব সকল প্রকার কর্মকান্ডে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে পার্থিব কর্মকান্ড সহজ সরল ও আরামদায়ক করে তুলবেন। ফলশ্রুতিতে তার অনুসারীরা পরকালেও সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মানুষ সাধারণভাবে এক অদৃশ্য সত্তার ওপরে সহজে আস্থাশীল বা বিশ্বাসী হয় না। কারণ পার্থিব জীবনে মানুষ অসংখ্য মৌলিক বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। স্বভাবগত এই বস্তুবাদী বিকেন্দ্রিক বা একাধিক বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট মনকে কেন্দ্রের তথা এক অদৃশ্য আল্লাহ বা তাঁর প্রতিনিধির প্রতি আন্তরিক আকৃষ্ট করে তোলা এক দুরুহ ব্যাপার। এ কারণেই অদ্বৈত একেশ্বরবাদ প্রকাশ ও বিকাশের পথে সর্ব প্রথম যে বিরোধী ভাব চোখে পড়ে তাহলো একাধিক ঈশ্বরের অর্চনা করা বা মূর্তি পূজা।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মূর্তিপূজা ও এতদসংক্রান্ত ধর্মীয় আচার আচরণ বাদ দিয়ে অন্তত পক্ষে মৌখিকভাবে কলেমা পাঠ করে কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করাকে আমরা তৌহিদ বা একেশ্বরবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সহজ ও সরল ব্যাপারটাই দ্বীন ইসলাম নয় যদিও এর বাহ্যিক রূপ আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়।

এ কারণেই বলা হয়েছে জাহির ও বাতেন উভয় দিকের শিরক হতে আত্মরক্ষা করা প্রয়োজন। জাহেরি শিরক হচ্ছে প্রতিমা পূজা করা। পক্ষান্তরে সৃষ্টির ওপর ভরসা করা, তাকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা বাতেনি শিরক। আল্লাহ ব্যতীত যার ওপরই ভরসা করা হয় উহাই এক একটি প্রতিমা বিশেষ। কলব মুশরিক থাকা অবস্থায় মৌখিক তওহিদ কোন উপকারে আসে না। অন্তর অপবিত্র থাকলে দৈহিক পবিত্রতা কোন কাজেই আসে না। অন্যকে প্রদর্শনেচ্ছাও (রিয়া) এক ধরনের প্রতিমা পূজা। এ ধরনের ব্যক্তি দুনিয়া বা আখেরাতে আল্লাহর নৈকট্য পেতে পারে না।

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে কোন ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার আশায় কোন সম্পদশালী মানুষের নিকট মাথা নত করলে তার ধর্মের (ঈমানের) দুই তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে যায়। অহংকারী এবং মুনাফিক স্বীয় কাজের জন্য গর্ব করে। সারা বৎসর রোজা রাখে সারা রাত ইবাদত করে, শুকনো রুটি আহার ও মোটা কাপড় পরিধান করে। প্রকৃতপক্ষে স্বীয় কলব দ্বারা আল্লাহর দিকে এক কদমও অগ্রসর হয় না। তাদের দুঃখ কষ্ট বরণ করা একেবারেই বৃথা। তাই শুধুমাত্র মৌখিক কলেমা পাঠ ও কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমেই ধর্মের

কাজ শেষ হয়ে যায় না। বরং সর্ব প্রথম দুনিয়ার আসল রূপ কি তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে যেমন নবি-রসুল অলি এবং আবদালগণ দেখেছেন এদের পূর্ণ অনুসরণ দ্বারাই দুনিয়ার আসল রূপ দেখা যেতে পারে। তাদের পদাংক অনুসরণ করলে, লোকালয়ে ও নির্জনে তাহাদের ন্যায় হলে তাদের অনুকরণের মাধ্যমে, তাদের মত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আকৃতি ও প্রকৃতিগত কাজ করলেই তাদের রোজার ন্যায় রোজা রাখলে তাদের মত নামাজের মত নামাজ আদায় করলে এবং তাদের মত ও পথ গ্রহণ ও বর্জন করলে এবং তাদের অন্তরের সাথে ভালোবাসলে আল্লাহ একটি নুর দান করেন যার সাহায্যে নিজের নফস ও অন্যকে দেখা যায়। তাছাড়া এতে নিজের ও অন্যের অন্যায় চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এর পরেই কেবল মাত্র নফস তথা প্রবৃত্তি (ব্যাপক অর্থে) ও অন্য ব্যক্তি/বস্তুর প্রতি অনাসক্ত হওয়া যায়। এই অবস্থা কোন ব্যক্তির মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই কলবে খোদা নৈকট্যর নুর আসবে এবং সে মোমিন, ইয়াকিনের অধিকারী হয়। তখন সকল কিছুর প্রকৃত বা আসল রূপে দেখা যায়। প্রকৃত জ্ঞানীরাই দুনিয়াকে কুশ্রী কদাকার ও বৃদ্ধা রমনীর ন্যায় দেখেছেন। এ কারণেই এরা দুনিয়াকে বর্জন করতে সক্ষম। এই প্রেক্ষাপটে নায়েবে নবি মওলা হজরত আলী (আ.) বলেছিলেন “হে দুনিয়া আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়েছি।”

স্মরণ রাখতে হবে যে রসুল (দ.) মানুষকে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে নিজেদের চরিত্র সংশোধন করে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ষড় রিপু থেকে বিমুক্ত হয়ে আল্লাহর ওপর আত্মসমর্পণের শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ ষড় রিপুর কারণেই মানুষ পাপ করে আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়ে। আল্লাহতা’লা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন, “হে ঈমান আনয়নকারীগণ ! তোমরা মুসলমান না হইয়া মরিওনা” (আল ইমরান) অর্থাৎ মৌখিকভাবে কলেমা পাঠ করে দুই একটি ধর্মীয় কাজকর্ম করাই মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং ঈমানদারদের মুসলমান হওয়া একটি কঠিন আয়াসসাধ্য ব্যাপার। এ কারণেই প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যিনি এক আল্লাহর (ষড় রিপুর নয়) ওপর আত্মসমর্পণ করে থাকেন। নবুয়তির যুগে তখন নবির ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং নবির পরবর্তী যুগে নবির প্রকৃত উত্তরাধিকারী যিনি যুগশ্রেষ্ঠ মহামানব ইমাম (আল্লাহর অলি) হিসেবে হেদায়াতের দায়িত্ব পালন করে থাকেন তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তার নির্দেশিত পথে পরিচালিত হওয়াকেই আল্লাহর ওপর আত্মসমর্পণ বলা হয়েছে। কারণ নবি রসুলের পর উলিল আমরা, অলি-আল্লাহগণ, আল্লাহর বন্ধু ও আল্লাহতা’লার মনোনীত বিধায় তারা আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ ধরনের প্রতিনিধিত্বকে ‘বেলায়েত’ বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে রেসালতের হাকিকি উত্তরাধিকারীত্ব বেলায়াতের ওপর বর্তায়। রসুলকে (দ.) মানুষের চরিত্র সংশোধনের গুরু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে রসুল (দ.) বলেছেন "আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি” (ইবনে মাজাহ)।

এ কারণেই নবি (দ.) এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী কে অবশ্যই তাঁর অনুসারীদেরকে শিক্ষকতার কাজ করতে হবে। এই মহান ব্যক্তিগণ যে পদ্ধতিতে মানবিয় চরিত্র সংশোধন করতেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থার নামই হলো ইলমে তাসাউফ। সঠিক ইসলাম ধর্মের শিক্ষা খুব জটিল ও ব্যাপক। এ ব্যাপারে রসুল (দ.) বলেছেন, “শরিয়ত আমার বাক্য, তরিকত আমার কাজ, হাকীকত আমার অবস্থা, মারেফাত আমার নিগূঢ় রহস্য”। অর্থাৎ তাঁর শিক্ষাময় জীবনে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারফতের এক সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় আছে।

যারা বাহ্যিকভাবে তথা স্থূলভাবে মূর্তিপূজা এবং বস্তু পূজা করতো এ ধরনের মুশরিকগণের বিরুদ্ধে রসুল (দ.) প্রচার চালিয়েছেন এবং তাঁর জীবনের সকল জেহাদ-মূলত এদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। তাই সাধারণ জনগণ অতি সহজেই সত্য ও মিথ্যা মূর্তি পূজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করে সত্যের সপক্ষ ও মিথ্যার বিপক্ষে ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল। এ কারণেই রসুল (দ.) নবুওতের শেষ দশ বছরে মুনাফেকদের প্রচারণা কোন সফলতা অর্জন করতে পারে নাই। এই মুনাফেকদের কর্মকান্ড খুব গোপন তৎপরতার মাধ্যমেই হত। রসুল (দ.) এর ওফাতের তেইশ বছরের মধ্যেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নরূপ ধারণ করেছিল। রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রকৃত ‘নায়েবে নবির’ হাতে না থাকায় তৌহিদ ধর্মের স্বরূপ জটিল আকার পরিগ্রহ করে ছিল। সবচাইতে বড় সমস্যা ছিল এই যে, ‘নাস্তিক্যবাদ’ উলঙ্গ ও আবরণ মত্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি বরং মুসলমান ধর্মাবম্বীরা নাস্তিক্যবাদের রূপ ধারণ করে এসেছিল। প্রকাশ্য নাস্তিক-মুশরিক বা কাফেরের মুখোমুখি হলে হয়ত মোকাবিলা করা সহজ হতো কিন্তু সেখানে প্রথমেই ছিল তৌহিদের স্বীকৃতি, রিসালতের স্বীকৃতি। নামাজ ও

রোজা সম্পাদন এবং কোরআন ও হাদিস থেকে যুক্তি প্রমাণ গ্রহণ আর তার পিছনে ধর্মোদ্রোহিতা ও অংশীবাদিতা নিজের কাজ করে যাচ্ছিল। মুশরিকগণের অংশীবাদ মূর্তিপূজা ছেড়ে দ্বীনের নামে দুনিয়া উপার্জন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একই ব্যক্তির মধ্যে ইসলাম ও মুশরিকী (রিপুর দাসত্ব) সমাজে এমন কঠিন জটিলতা সৃষ্টি করল যে তার সঙ্গে মোকাবিলা করা প্রকাশ্য মূর্তি পূজারির বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার চাইতে কঠিন প্রমাণিত হলো। এহেন আর্থ-ধর্মীয় সামাজিক পরিবেশে মাবিয়া ৬৬১ সালে আরব, ইরান, সিরিয়া, মিশর ইয়েমেন তথা সমগ্র মুসলিম জাহানে বাস্তবে শাহানশাহ হয়ে আমিরুল মুমেনিন উপাধি ধারণ করলেন। আবু সুফিয়ান জীবিত থাকলে দেখতে পেতেন রসুল (দ.) এর যে সকল কাজের বিরোধিতা তিনি সর্বদা করতেন, সেই সকল কাজের বিরোধিতা না করেই তার পুত্র সমস্ত মুসলিম জগতের অধীশ্বর হয়ে গেলেন।

মাবিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের নতুন ধরনের কৌশল হলো ভীতি প্রদর্শন, চাপ সৃষ্টি, অর্থ প্রদান, প্রতারণা এবং বিশেষ সযোগ সুবিধাদি প্রদান। যথারীতি চলতে থাকে দুর্নীতি, আদর্শবাদ তথা নৈতিকতার অবদমন এবং দায়িত্ববোধের হনন– যাকে বলা যেতে পারে নিপীড়নের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার নিপীড়ন। এই শাসক শ্রেণি এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে ফেললো। এরা ইসলামের মূল ভিত্তি যথা ঈমান, জেহাদ, জেহাদের বুনিয়াদ এবং ইসলামের প্রতি আঘাত হানলো।

কিন্তু নব্য নাস্তিক্যবাদের প্রতিভূ ও ক্ষমতাসীনরা স্পষ্টতই বুঝতো মুহাম্মদ (দ.) এর পরিবার যারা কোরআনের সাথে অভিন্ন, আলী (আ.) এর হত্যা, হাসান (আ.) এর সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেই দ্বীন ইসলামের জয়ের অগ্রগতি রোধ করা যাবে না। এরা জানতো এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মূল ভিত্তি ধ্বংস করে অনাদিকালের বিপ্লবী বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব না। গোপন হত্যাযজ্ঞ, ইনসাফ বিরোধী কর্মাদি, ইসলামি আন্দোলনের ব্যক্তি চেতনা সত্য বিশ্বাসের তীক্ষ্ণধার, ইসলামি শক্তি থেকে উৎসারিত মহান চিন্তাভাবনা এবং নবির (দ.) প্রকৃত মিশনের প্রকৃত অর্থ কোন কিছুই কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করতে পারে না ।

উমাইয়া শাসক জানতো যে কালো ছাইয়ের অন্তরালে চাপা পড়ে আছে লালাভ জীবন্ত আগুন যা শক্তিশালী বিস্ফোরকে পরিণত হতে পারে। সত্যের সৈনিকরা পরাজিত হতে পারে। কিন্তু ইসলাম বড়ই প্রাণবন্ত। বিশ্বাসের পক্ষাবলম্বনকারীগণকে সাময়িকভাবে ক্ষমতা থেকে অন্তর্হিত করা গেছে কিন্তু বিশ্বাস নিজেই রয়েছে যথেষ্ট জীবনাবেগ সম্পন্ন। যার উৎস মানুষের অন্তর ও মনে, যদি এ উভয় উৎস ধ্বংস না হয় সকল বিজয় অর্থহীন এবং সকল ক্ষমতাই হুমকির সম্মুখীন। এই দুটি প্রাণবন্ত থাকলে আবু জর গিফারি (রা.) ইয়াসির (রা.) মালেক আশতার তাদের মৃত্যুর পরেও চিরঞ্জীব থাকবেন এবং ময়দানে নতুন যোদ্ধা পাঠাবেন। তাই মহান আদর্শের এই চেতনা যদি নির্বাপিত করা না যায়, আঁধার ও আলোর মধ্যে কোন সৌহার্দ্য হতে পারে না। গণহত্যাকারীরা তা সম্ভব করতে পারেনা। রক্তের সাগর ও মৃত কবরগাহ রচনা করলেও তারা মুহূর্তের জন্য নিরাপদ হতে পারে না।

কুফার মসজিদে শাহাদত প্রাপ্ত হলেও আলী (আ.) এখনে বেঁচে আছেন। সত্য মুক্তি ও ন্যায় বিচারের পতাকাবাহীরা সবাই নিহত হয়েছেন। সকল স্থান বিজিত হয়েছে। তথাপি সত্য, মুক্তি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অদ্যাবধি চলছে এবং উল্লেখিত দুটি কেন্দ্রকে ভিত্তি করেই তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এ দুটি কেন্দ্রকেই ধ্বংস করতে হবে। শুরু হলো আক্রমণের প্রস্তুতি। এ দুটি ভিত্তি বিস্ফোরণ ও অগ্নির উৎস ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য মানুষকে পরিচালনাকারী, দুটি শক্তি তথা বিবেক ও মনকে ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছে।

কিন্তু এই বিশেষ ধরনের যুদ্ধের জন্য অন্য এক ধরনের সৈন্যবাহিনী, বর্ম-বর্শা ও ধনুক, পন্থা, পরিকল্পনা শাসক ও বিজেতা। এ সেনাবাহিনী ও আক্রমণ পরিচালনার জন্য কোন নারী বা ক্ষমতার প্রদানেরও প্রয়োজন নাই বরং এ বিস্ময়কর আক্রমণে কোরআন হচ্ছে অস্ত্র, নবির সুন্নাহ হচ্ছে বর্ম। চিন্তা শক্তি ও বিজ্ঞান এর অস্ত্র ঈমান, এর দুর্গ ইসলাম হচ্ছে প্রতীক এবং মুফাচ্ছির, জ্ঞানী বক্তা, ধর্মবিশারদ বিচারক এবং নেতৃবৃন্দ সবাই এ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন নবি (দ.) প্রখ্যাত সাহাবাগণ নামে খ্যাত গুরুত্বপূর্ণ সব ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং বিখ্যাত মুফতীগন আক্রমণ আরম্ভ হলো। এরা এমন এক মোহিনী শক্তি সম্পন্ন সুরা ব্যবহার করেছে। যা

সকল আচার নিষ্ঠা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বেরই জানা। এর প্রস্তুত প্রণালী তারা বংশপরম্পরা একের পর পর হস্তান্তর করে চলেছে। এটা যে এই অশুভ নেশা যার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য ফেরাউন ও কারুনকে ধ্বংসের জন্য মুসা (আ.) কে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল।

আত্ম-বিক্রয় করল বুদ্ধিজীবীরা। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্ক স্থাপন করল ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে। সকল মূল্যবোধ ধ্বংস করা হলো। তারা ইসলামের চেতনার বিলুপ্তি ঘটলো। ইসলাম যে লক্ষ্যে পৃথিবীতে আগমন করেছিল তা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করলো। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মেকি ধর্মের বেদীতে বলি দিল জনসাধারণকে।

এটা হচ্ছে এমন একটি সময় যখন ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং অন্যান্য পদক্ষেপ সমূহ জায়েজ তথা বৈধ করে নেয়ার রেওয়াজ প্রচলিত হলো। বাধ্যবাধকতার কারণেই ধর্মবিশারদগণ সব ব্যাপারেই খোদাকে জড়িত করে দুটি মারাত্মক বীজ যা জনতার মাঝে বদ্ধমূল হলো তা হচ্ছে 'আল্লাহর নামে' এবং 'আল্লাহর জন্য' প্রথমটা হচ্ছে ধর্মবিশারদগণের আভ্যন্তরীণ ক্যান্সার। তারা হচ্ছে ইসলামের সকল বিশেষজ্ঞ, এবং উলামাবৃন্দ। তারা হচ্ছে ওয়ায়েজ (বক্তৃতাকারী), ইসলামি বিশারদ এবং সমাজের নেতৃবৃন্দ। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোণে বসে অধ্যায়ন করে শিখেন, শিখান। এরা শুধু এই মতবাদই জনগণকে শিক্ষা দিল কারা কিভাবে ধর্মীয়, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের 'বৈধ' অধিকারী এবং তা কখন থেকে এবং কি পদ্ধতিতে ও প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা প্রাপ্ত, তার ব্যাখ্যাও নিত্য নতুন তথ্য তত্ত্ব- মতবাদ। শুরু হলো নিত্য নতুন প্রচারণা।

ধর্মের বিকৃত উপস্থাপন :

আল্লাহতা'লা প্রেমময়। প্রেমই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। সৃষ্টির কারণ পরম সুন্দরের প্রকাশ বাসনা বা প্রেম। হাদিসে কুদসিতে উল্লেখ আছে "আল্লাহ বলেন আমি ছিলাম গুপ্ত ভান্ডার, নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলাম, এবং নিজেকে প্রকাশের নিমিত্তে বিশ্ব সৃষ্টি করলাম।" এ কারণেই আল্লাহর সাথে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনই ইবাদত। আল্লাহর প্রতি অটুট প্রেম হলেই প্রত্যেক সৃষ্টি জীবের প্রতি মহব্বত তৈরি হয় এবং মহাগ্রন্থ আল কোরআনের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও আখেরি নবির প্রতি অবিচল প্রেম শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ জন্ম নেয়। আল্লাহতা'লা এরশাদ করেছেন, "যে মহব্বতের রাস্তায় আমাকে চিনতে পারলো না সে এ জগতে অন্ধ এবং পরজগতেও অন্ধ ও পথভ্রষ্ট।" (কোরআন)

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, রসুল (দ.) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা খোদাকে এজন্য মহব্বত কর যেন খোদা নেয়ামত সমূহ দান করেন এবং আমার সঙ্গে এজন্য মুহব্বত করো যেন তোমরা খোদার সঙ্গে মহব্বত রেখেছ। এবং আমার আহলে বায়াতকে আমার খাতিরে মহত করো। (তিরমিজি-মেশকাত)। জায়েদ বিন আরকাম (রা.) বলেছেন হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা এগুলোকে শক্তভাবে ধরে রাখো আমল কর, তবে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। এই দুই জিনিসের এক জিনিস (আহলে বায়াত) অন্য জিনিস হতে উত্তম, আল্লাহর কিতাব এক রজ্জুর মতো যা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অন্যটি হলো আমার আহলে বায়াত (ইতরাত)। খোদার কিতাব এবং আমার আহলে বায়াত কিয়ামতের দিন পর্যন্ত একে অন্য হতে পৃথক হবে। এমনকি তা হাউজে কাউসার পর্যন্ত আসবে। অতএব তোমরা দেখ যে আমার পরে। তোমরা এই দুই জিনিসের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করো" (তিরমিজি, মেশকাত ৩য় খন্ড পৃ. ২৭৩)। অর্থাৎ রসুল (দ.) এর পরে আহলে বায়াতের আনুগত্য উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য ফরজ। এই আনুগত্যের তথা মহব্বতের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত হেদায়েত-শান্তি ও মুক্তি। রসুল (দ.) এর পরে এই মহান ব্যক্তিদের সাথে কিরূপ আচরন করা হয় রসুল (দ.) উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য এই পরীক্ষা আল্লাহরই নির্দেশেই নির্বাচন (এক্সজামিনেশান সেট) করেছেন। এই পরীক্ষায় সাফল্যের মাধ্যমেই রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ ও নাজাত।

সাহাবাদের জীবনি বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা মানুষকে সত্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়। কেননা ধর্মের প্রতিটি বিষয়ের এঁরাই (সাহাবাগণই) স্তম্ভ। এঁদের কাছ থেকেই আমরা ধর্মের দীক্ষা নিয়েছি। তাঁদের কাছ থেকে আমরা দ্বীনের মূলনীতি পেয়েছি, বিভ্রান্তি ও অন্ধকারের অভিশাপ থেকে আমরা খোদা প্রদত্ত নুরের আলোকচ্ছটা তাদের কাছ থেকেই পেতে পারি যা দিয়ে আল্লাহর বিধি বিধান স্বচ্ছভাবে দেখা যায়। বড়

বড় আলেমগণ তাঁদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। এর ওপর ভিত্তি করে বেশ কিছু গ্রন্থ তারা রচনা করেছেন। স্মরণ রাখতে হবে যে প্রাথমিক যুগের আলেমগণ আহলে বায়াতের সাথে শত্রুতা পোষণকারী উমাইয়া ও আব্বাসী বংশের খলিফাদের নেক নজরের ভিত্তিতেই শুধু ইতিহাসই লেখেননি, অন্যান্য গ্রন্থও লিখেছেন। তাই তাদের লেখনিগুলোকে বিনা বাদ-বিচারে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। আবার আহলে বায়াতের সপক্ষে যে লেখনী রয়েছে তাকেও অগ্রাহ্য করা যায় না। কোন্ বিচারে আহলে বায়াতের সাথে সম্পর্কের কারণে যাদেরকে হত্যা করা হয়, দেশান্তরিত করা হয়, নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে দেওয়া হয়, তাদের জীবনকে ধ্বংস করা হয়। তাই এই জালেম ও স্বৈরাচারী প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ঘোত এই সব আলেমগণই ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ইতিহাস এত রক্তাক্ত, ঘটনাবহুল, নিষ্ঠুর ও বিতর্কের মূল ঘোতাই হচ্ছে সাহাবা। কারণ তারাই হুজুর (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত বিভ্রান্ত থেকে উম্মতকে বাঁচাতে যে অসিয়ত লিখতে চেয়েছিলেন, এর প্রতিবাদ করেন। তারাই উম্মতে মোহাম্মদীকে ফজিলত থেকে বঞ্চিত করে গুমরাহীর দিকে নিয়ে যান। সে জন্য আজ উম্মত শতধা বিভক্ত-মত পার্থক্যের গহ্বরে নিমজ্জিত। উম্মতগণের ঐক্যের ভীত দুর্বল হয়ে গেছে। ইসলামের উজ্জ্বলতা পার্থক্যের চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে। তারাই খেলাফতের ব্যাপারে অদূরদর্শী ফায়সালা করতে গিয়ে কিছু লোককে ক্ষমতা পাওয়ার ব্যাপারে অবৈধভাবে সহযোগিতা করেন। ফলে কিছু লোক পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে। এবং একদল আলীর (রা.) অনুসারী অন্যদল মাবিয়ার অনুসারী হয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরাই তারা, যারা আল্লাহর কিতাব ও হাদিসে রসুলের এখতেলাফ (মতভেদ) সৃষ্টি করে দেয়, ফলে উম্মতদের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তার উদ্ভব হয়। বিভিন্ন দর্শনের আবির্ভাব হয়। যার সবগুলোই রাজনৈতিক কারণে ক্ষমতা আগলে রাখার মানসিকতায় সৃষ্ট। যদি তারা সাহাবি না হতেন তাহলে তাদের কৃতকর্মের ফল উম্মত ভোগ করতো না, বিভক্ত হতো না। কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো না। অথচ সকলের খোদা এক, কোরআন একটি, রসুল এক, কেবলা সবই ঠিক ঠিক মিল আছে কিন্তু হুজুর (সা.) এর ওফাতের পর সর্বপ্রথম বিভক্তিটি হয়েছে সাকিফা ই-বণি সায়দায়। যা আজও অব্যাহত আছে। এই প্রেক্ষাপটে সাহাবাদের কার্যকলাপ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ বা বর্জন করা প্রয়োজন। এই আলোকে সাহাবিকে তিন গ্রুপে ভাগ করা যায় :

১। সেই সব বুজর্গ সাহাবি, যাঁরা আল্লাহ ও রসুলকে সত্য ও সঠিকভাবে জেনেছেন, অনুগত্য নিষ্ঠার সাথে করেছেন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবির প্রতি ভালোবাসাকে সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন। কথায় ও কাজে রসুল (দ.) এর প্রকৃত সাহাবি ছিলেন। রসুল (দ.) এর ইন্তেকালের পর তারা পরিবর্তিত হননি। বরং তাদের প্রতিজ্ঞায় তারা অটল ছিলেন। আর তারাই সেই সব সাহাবি যাদের সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে প্রশংসা করেছেন, সম্মানিত করেছেন। রসুল (দ.) বিভিন্ন স্থানে তাদের উক্ত মর্যদার কথা ঘোষণা করেছেন।

২। সেই সব সাহাবি যারা ইসলাম গ্রহণ করে, রসুল (দ.) এর আনুগত্য করেন কোথায়ও ভয়ে, আবার কখনো আবেগে তারা হুজুর (সা.) এর কাছে মুসাহেবী করে বলতো আমরা ঈমান এনেছি আবার কখনো তাঁকে কষ্টও দিত। রসুল (দ.) এর আদেশ নিষেধ যথার্থভাবে পালন করতো না। বরং সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও নিজের মতকে গুরুত্ব দিতেন, কখনো কোরআন তাদের এহেন কর্মের ব্যাপারে হুঁশিয়ারী ও ধমকী দিয়েছে। হুজুর (দ.) অনেক সময় তাদেরকে শাসিয়েছেন।

৩। সেই সব মুনাফেক যারা হুজুরের (সা.) সাথে শুধু অনিষ্ট করার জন্য থাকতো। প্রকাশ্যে মুসলমান ছিল কিন্তু আসলে তারা ছিল কাফের। ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যই শুধু তারা রাসুলের সঙ্গে থাকতো। গোটা 'সুরা মুনাফেকুন' তাদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়। কোরআনের অনেক যায়গায় তাদের সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে তাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহতম স্থানে রাখা হবে। রসুল (দ.) তাদেরকে বহু নসিহত করেছেন ও সেই মুনাফেকদের থেকে অন্যদের সাবধান থাকতে বলেছেন। অনেক সাহাবাকে এই মুনাফেকদের নাম, আচরণ ও তাদের আলামতও বলে দিয়েছেন।

এই তিন প্রকার ছাড়াও এক প্রকার আছেন। যদিও তারা সাহাবি কিন্তু তারা রসুল (দ.) এর নিকটতম, মানসিক, চারিত্রিক উভয় দিক দিয়ে আত্মীয়। আল্লাহ ও রসুল (দ.) এর দোয়া বিশেষত্বের কারণে তারা সকলের উর্ধ্বে। তাদের সমকক্ষ কেউ নয় এবং তারাই আলে মুহাম্মদ বা আহলে বায়াত। আহলে বায়াতগণকে আল্লাহ অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। তাদের ওপর দরুদ পড়া (আহজাব-৩৩) ততটুকু ওয়াজেব যতটুকু ওয়াজেব হুজুর (দ.) এর ওপর দরুদ পড়া। মুসলমানদের আয়ের এক পঞ্চমাংশ তাদেরকে দেওয়া ওয়াজিব করা হয়েছে। (আনফাল-৪১)।

রেসালতের পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রত্যেক মুসলমানদের ওপর তাদেরকে ভালোবাসা ওয়াজিব করা হয়েছে। (সুরা-২৩) উনারাই 'উলিল আমর' যাদের আনুগত্য করা ফরজ করা হয়েছে। (সুরা নেছা- ৫৯) তারাই 'রাসেখানা ফিল ইলম' যারা কোরআন -মুহকাম ও মুতাসাবে আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন। (সুরা আলে ইমরান-৭) তারাই আহলে জিকর, যাঁদেরকে হুজুর (দ.) হাদিসে সাকালাইন, 'কোরানের সাথী' ঘোষণা দিয়েছেন এবং উভয়কে (কোরআন ও আহলে বায়াত) একই সঙ্গে থাকার কথা বলেছেন। (কানজোল আমাল প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৪, মাসনদে হাম্বল পঞ্চম খন্ড পৃষ্ঠা ১৮৮) তাঁদেরকে 'নূহের নৌকা' বলা হয়েছে যারা তাতে উঠলো বেঁচে গেলো যারা উঠলো না তারা ডুবে মরলো। প্রসঙ্গত বলা যায় যে সাহাবাদের চেয়ে আহলে বায়াতের মর্যাদা অনেক বেশি তা নিম্লোক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায়।

"রসুল (দ.) পাকের কোন সাহাবিকেই আহলে বায়াতদের সাথে তুলনা করা যায় এবং কাহাকেও তাহাদের সমতুল্য গণ্য করা যায় না। যারা আল্লাহর দান বিতরণ করেন এবং যাহারা তাহা গ্রহণ করেন ইহাদের মধ্যে কোনরূপ সদৃশ্য থাকিতে পারে না। আহলে বায়াতগণ হলেন ধর্মের ভিত্তি এবং বিশ্বাসের স্তম্ভ। তাদের নিকট চরম ধর্মান্ধ ব্যক্তিগণ হেদায়েত ও মুক্তির জন্য যেমন উপস্থিত হইতে পারেন, তেমনই সত্য ও ধর্মপথের মোজাহেদগণ। ইমামত (নেতৃত্ব) এবং খেলাফতের (বেলায়েত) স্থান এবং বিশেষ অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য তাহারা দক্ষতার সহিত সমর্থ এবং সযোগ্য। তাহারা নবি পাকের ন্যায়সংগত উত্তরাধিকারী রুপেই চলিয়া আসিতেছেন এবং এখনও তেমনি রহিয়াছেন। তাঁহাদের ইমামতি (ঐশি নির্দেশে) উইল করিয়া গিয়াছেন।" (নাহজুল বালাগা খোতবা - ৬)। এই প্রেক্ষিতে ইমাম আহমদ হাম্বল (রা.) তাঁর পুত্রের নিকট সাহাবাদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে হজরত আবুবকর (রা.) হজরত ওমর (রা.) হজরত ওসমান (রা.) এর নাম উচ্চারণ করেন কিন্তু হজরত আলীর (রা.) নাম উল্লেখ না করায় তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বিস্ময় প্রকাশ করলে ইমাম আহমেদ হাম্বল বলেন, হজরত আলী (আ.) তো সাহাবা নয় বরং 'আহলে বায়াত'। তিনি আল্লাহ ও রসুল (দ.) এর প্রিয় আহলে বায়াতগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহকে মহব্বত করাই যে ইসলামের ভিত্তি এ কথা মাবিয়ার আমলে যথাযথভাবে প্রচার করা হয়নি। কারণ এই ঐশি মুহাব্বতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে আহলে বায়াতদের মহব্বত জড়িত। তাই আল্লাহর প্রেমময় রূপ ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবে সমাজে উপস্থাপন করা হয়নি। বরং আল্লাহকে শুধুমাত্র শাস্তিদাতা বা নির্যাতনকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ফলে মুহব্বতের বিপরীতে ভয় ইসলামের শিক্ষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই মতবাদ বর্তমানেও ব্যাপকভাবে সমাজে চালু আছে।

আহলে বায়াতদের গালি দেওয়ার বিধান চালু :

আল্লাহ ও তাঁর মহান রসুল (দ.) এর নির্দেশের তোয়াক্কা না করে মাবিয়ার শাসনামলে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বেদাত চালু করা হয়। মাবিয়া নিজে এবং তার নির্দেশে তার গভর্নরেরা মসজিদের মিম্বরের পবিত্রতার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে হজরত আলী (আ.) এর ওপর প্রকাশ্য গালি গালাজ শুরু করে। এমনকি মসজিদে নব্বি যেখানে রসুল (দ.) মিম্বরে (যে মসজিদে রসুল ও আলী এর (রা.) এমনকি জানাবাতের অবস্থায়ও দু'বার অনুমতি ছিল) দাঁড়িয়ে নবিজির (দ.) রওজার সামনে রসুল (দ.) সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ও নিকটাত্মীয় ও আল্লাহ ও রসুল (দ.) কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষিত এই মহান ব্যক্তিকে গালি দেওয়া হতো। কারো মৃত্যুর পর তাকে গালি দেওয়া শরিয়ত তো দূরের কথা, মানবিয় চরিত্রেরও পরিপন্থী। বিশেষ করে মসজিদে প্রদত্ত খোতবাকে এভাবে কলংকিত করা দ্বীন ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে আরো জঘন্য কাজ।

রসুল (দ.) বলেছেন, "যে আলীকে (রা.) গালি দিল সে আমাকে গালি দিল যে আমাকে গালি দিল সে খোদাকে গালি দিল।"

মনে রাখা প্রয়োজন যে আল্লাহ ও রসুল (দ.) নির্দেশের মর্মানুযায়ী হজরত আলী (আ.) কে গালি দেওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ বা তার রসুলকে গালি দেওয়া তথা দ্বীন-এ ইসলামকে গালি দেওয়া। আলী (আ.) মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত না থাকার অর্থ দ্বীন ইসলামের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হওয়া। ফলে হেদায়েতের পথ থেকে গোমরাহীর অন্ধকার গহব্বরে নিপতিত হওয়া।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, তদানীন্তন সময়ে মসজিদ সরকারি প্রচারণার একমাত্র মাধ্যম ছিল। বিশেষ করে আলী (আ.) মত বা মর্যাদা সম্পর্কে সরকারি ভাষ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকার মতামত অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করা হতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কুফায় হজর ইবনে আদি হজরত আলী (আ.) কে প্রকাশ্যে এ ধরনের গালি-গালাজ করা সহ্য করতে পারেন নি। কুফার গভর্নর জিয়াদ খোতবায় হজরত আলী (আ.) কে গালি দিলে হজর (রা.) তার সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন। জিয়াদ ১২ জন সংঙ্গীসহ তাকে গ্রেফতার করেন এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন যে হজরত আলী (আ.) এবং তার বংশধর ব্যতীত অন্য কারো জন্য খেলাফত জায়েজ নয় এ মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। তিনি (হজরত) আলী (আ.) কে সমর্থন করেন এবং তার জন্য রহমত কামনা করেন এবং তার বিরোধীদের থেকে দূরে থাকেন। অভিযুক্তকে মাবিয়া এর নিকট প্রেরণ করা হয়। মাবিয়া তাকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। হত্যার পূর্বে জল্লাদরা তার সামনে যে কথাটি পেশ করে তা হলো "তুমি আলীর (রা.) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করলে তোমাকে মুক্তি দান, অন্যথায় হত্যা করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" তিনি তা করতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন "আমি মুখে এমন কথা উচ্চারণ করতে পারি না। যা আমার রবকে অসন্তুষ্ট করে।" অবশেষে ৭ জন সংঙ্গীসহ তাকে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে অবদুর রহমান ইবনে হামসানকে মাবিয়া জিয়াদের নিকট ফেরত পাঠান। তিনি জিয়াদকে লিখেন একে নৃশংসভাবে হত্যা করো। জিয়াদ তাঁকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেন। (তাবারি - ৪র্থ খন্ড ১৯০ ২০৭)।

মনে রাখতে হবে ইজর ইবনে আদি (রা.) অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক ছিলেন বলে প্রাদেশিক গভর্নর তাঁর মামলাটি মাবিয়ার নিকট প্রেরণ করে। তাছাড়া দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি এ ব্যাপারে এত নৃশংস হতে পারে সেক্ষেত্রে অন্যান্য গভর্নরগণ সাধারণ লোকের প্রতি কি ধরনের আচরণ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। মাবিয়া নিজেও হজরত আলীর (রা.) মর্যাদা তার নিজের থেকে বেশি তা কখনো স্বীকার করেন নাই (দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরের নিকট মাবিয়ার পত্র)

এ কারণেই স্বয়ং ইয়াজিদ ইবনে মাবিয়া হজরত আলী (আ.) তথা আহলে বায়াতদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতো তা হুসাইন (রা.) এর শাহাদতের পর কারবালার যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে তার মতামত পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে : ইয়াজিদ অতঃপর মজলিসের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তোমরা জান কি, কেন ইহা ঘটিল? ইহা হোসাইনের ভ্রান্ত ধারণার পরিণাম। তাহার ধারণা ছিল যে আমার পিতার চেয়ে তাহার পিতা আমার মাতার চেয়ে তাহার মাতা এবং আমার নানা অপেক্ষা তাহার নানা শ্রেষ্ঠ। এবং তিনি নিজেকেও ইয়াজিদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং এই জন্য তিনি হুকুমতের অধিক হকদার। কিন্তু তাহার পিতা হজরত আলী আমার পিতা মাবিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই ধারণা ঠিক ছিল না।" (নাউজিবিল্লাহ) (মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা, মূল লেখক আবুল কালাম আজাদ, পৃ. ১৩৯)।

এটি ইয়াজিদের ব্যক্তিগত ধারণা ছিল বলে মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করার কোন কারণ নেই। কারণ ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রা.) ব্যতীত সমগ্র উমাইয়া শাসনামলে তরবারির মাধ্যমে ও আলেম ওলেমাদের দ্বারা মাবিয়া ও ইয়াজিদের এই ধর্মীয় বিশ্বাস রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। উল্লেখ্য এটা কোন রাজনৈতিক ব্যাপার নয়। যে রকম অজ্ঞতা বশত অনেক লোক বলে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের এই বিকৃতি ব্যাখ্যা ইসলাম ধর্মের যে ক্ষতি করেছে তা আজ পর্যন্ত পূরণ হয় নাই। ইয়াজিদের এই মতবাদ কতখানি গভীরভাবে সমাজের আলেমদের মধ্যে গ্রোথিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন সিরিয়া দেশের কতিপয় আলেম ও মাশায়েখ আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, খলিফা তাহাদিগকে বলেন, "তোমরা সর্বদা বনু উমাইয়ার হিতৈষী রহিয়াছ। কখনও বনি হাশিমের নিকট আসো নাই। তোমরা একথা মনে করো নাই যে, বনু হাশিম রসুল (দ.) এর আহলে বায়াত এবং সে জন্য তাহারা সমস্ত দুনিয়ার সম্মানের পাত্র।" সেই আলেম ও মাশায়েখগণ কসম খাইয়া বলেছিলেন আজ পর্যন্ত আমাদের জানা ছিল না যে বনু হাশিম রসুল (দ.) এর

আত্মীয়। আমরা জানিতাম বনু উমাইয়াগণ সকল সম্মানের মালিক। (খেলাফতের ইতিহাস, লেখক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার সিদ্দিকী পৃ. ১৪৫) অর্থাৎ আলে রসুল বা আহলে বায়াতদের বিশেষ মর্যাদা এত অল্প সময়ের মধ্যে কোরআন ও হাদিসের শিক্ষকরাই জানতেন না তখন সাধারণ লোকের এ ব্যাপারে ধারণা বা জ্ঞান সহজেই অনুমান করা যায়।

পরবর্তীতে আব্বাসীরাও আহলে বায়াত সম্পর্কিত উমাইয়াদের অনুসৃত নীতিই চালু করে। এ কারণেই উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজকীয় মতবাদের অনুসারী বিদ্বানদের লিখিত ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়ে সাধারণ আলেম ও মুসলমানগণ কোরআন ও হাদিসের সঠিক প্রেক্ষাপটে আহলে বায়াতদের প্রকৃত মর্যাদার কথা বর্ণনা করলেই বর্ণনাকারীকে কাফের বা পথভ্রষ্ট বা শিয়া বলে মনে করে নিজেকে অত্যন্ত পাকা ঈমানদার মনে করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে থাকে।

এলমে জাহের ও এলমে বাতেন সম্পর্কিত অপপ্রচার :

প্রত্যেক নবি রসুলের প্রচারের মধ্যেই দুইটি বিষয়ে জ্ঞান বিদ্যমান ছিল। একটি ইহলৌকিক জ্ঞান-জাগতিক জ্ঞান, তথা আল্লাহর প্রত্যাদেশ অনুযায়ী পার্থিব কর্মকান্ড পরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞান প্রচলিত অর্থে শরিয়ত সম্মত উপায়ে জীবন যাপন করার জ্ঞান অন্যটি পরলৌকিক জ্ঞান– অর্থাৎ আধ্যাত্ম বা এলমে গায়েব অথবা এলমে আখেরাত। প্রকৃতপক্ষে এলমে আখেরাতের জ্ঞান বা সঠিক ধ্যান ধারণা দেয়ার দায়িত্ব নিয়েই নবি রসুলগণ খোদার তরফ থেকে প্রেরিত হয়ে থাকেন। এই জ্ঞানকে এলমে লাদুন্নি, এলমে কাশফ, এলমে মারফত, এলমে আখেরাত, এলমে আরওয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। বাংলা ভাষায় একে পারলৌকিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আধ্যাত্ম জ্ঞান, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান, আত্মতাত্তিক জ্ঞান, অদৃশ্য জগতের জ্ঞান, দৈবজ্ঞান, প্রত্যাদেশ জ্ঞান, গোপন জ্ঞান, অদৃশ্য জগতের জ্ঞান।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "আমি খিজিরকে (আ.) এলমে লাদুন্নি শিক্ষা দিয়েছি।" –সুরা কাহাফ। হজরত সুলায়মান (আ.) এর আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান সম্পর্কে কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, আমি সোলায়মানকে তৎবিষয়ে অন্তনিহিত জ্ঞান বা গোপন ভেদকে বুঝিয়া দিলাম।"

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ভাষায় আরো বলা হয়েছে যে, "আমি প্রত্যেক জাতির জন্য একটি করে শরিয়ত ব্যবস্থা এবং একটি করে মিনহাজ বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দান করেছি।"

আদি পিতা হজরত আদম (আ.) তার আপন সন্তানদেরকে আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা বা ঐশি জগত সম্পর্কে অবহিত করে গেছেন এবং তাঁর ওফাতের পর তার এই দায়িত্বভার নিজ পুত্র শিস (আ.) কে ন্যস্ত করেছেন। এলমে বাতেন অর্থ দেহতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব সাধনায় ব্রত হওয়া। এই আধ্যাত্মবাদ বিদ্যায় চরম উৎকর্ষ সাধনের নিয়মাবলী শিক্ষাদানের জন্য নবি রসুলগণ মানব সমাজে প্রেরিত হয়েছিলেন। কেননা আত্মার উন্নতি বিধানই প্রত্যেক ধর্মের মূখ্য উদ্দেশ্য। এই জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মানবজাতি ঐশি সত্তার ধ্যান ধারণায় অনুপ্রানিত ও উৎসাহিত হবে এটাই কাম্য। সাধারণভাবে মানবাত্মা মানব দেহের জৈবিক আচ্ছাদানে আচ্ছাদিত জৈবিক প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির কালো যবনিকায় মানবাত্মা চির আচ্ছাদিত। এই তমসাচ্ছন্ন আত্মাকে স্বচ্ছ ও দীপ্তিময় করে কোরআনের ভাষায় ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের মহা জ্যৈর্তিময় দীপ্তি বা সত্তার "সাথে বিলীন হয়ে যাওয়াই প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতের ভিত্তি। এই প্রেক্ষাপটেই বলা হয়েছে আমি মানুষ ও জ্বিনকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" মহা পবিত্র সত্তার সাথে বন্ধুত্ব বা বিলীন হতে হলে নিজেকে পবিত্র রাখতে হবে। এই পবিত্রতা মানসিক ও দৈহিক উভয়ই হতে হবে যেহেতু মানুষের পরিচালক তার আত্মা, দেহ নয় । তাই আত্মার পবিত্রতাই মূখ্য।

এ কারণেই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করেছে, যে তার আত্মার পবিত্রতা লাভ করেছে। আর সেই ব্যক্তিই তার প্রতিপালকের নাম সদা সূরণ করেছে। বাস্তবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত নামাজ সমাধা করেছে। কেননা নামাজের মূখ্য উদ্দেশ্যই হৃদয়ে আল্লাহপাকের স্মরণ প্রতিষ্ঠা করা। আর যার হৃদয়ে আল্লাহপাকের সার্বক্ষনিক স্মরণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিনিই প্রকৃত নামাজি বা আল্লাহর অলি। উল্লেখ্য রসুল (দ.) ওফাতের পর বেলায়েতের এই মহান দায়িত্ব হজরত আলী (আ.) ওপর অর্পন করা হয়।

স্বয়ং রসুল (দ.) ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানের এক গুপ্ত ধন ভান্ডার বিশেষ। আর হজরত আলী (আ.) ছিলেন এই তত্ত্বজ্ঞানের গোপন ধন ভান্ডারের প্রবেশদ্বার। হজরত আলীকে বাদ দিয়ে কেউ কখনো এই তত্ত্বজ্ঞানের গোপন ভেদ বা বেলায়ত লাভ করতে পারবে না। কেননা তিনি স্বয়ং এই বেলায়েতের গোপনদ্বার। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আহলে বায়াতরাই এই জ্ঞানের বৈধ অধিকারী। সুতরাং হজরত আলী (আ.) তার প্রিয় পুত্র হজরত ইমাম হোসাইনকে তরিকায়ে আবরারের মুজাহেদিনের নেতৃত্ব দান করে আসছেন। এই জ্ঞান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে হজরত আবদুল কাদের জিলানি (রা.) বলেছেন, সৃষ্টি জগতের চিরন্তন বিধান হলো একজন পির ও একজন মুরিদ একজন পরিচালক ও একজন পরিচালিত (অনুসারী), একজন শিক্ষক ও একজন ছাত্র, একজন মনিব ও একজন ভৃত্য রয়েছে। এই বিধান কিয়ামত অবধি বিদ্যমান থাকবে। অনুরূপভাবেই হজরত আদম (রা.) একজন ছাত্রের ন্যায় আর তার শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ। অন্য কথায় আদম (আ.) একজন মুরিদ আল্লাহ স্বয়ং তার পির মুর্শিদ। এমনিভাবে হজরত নুহ (আ.) পর্যন্ত এই শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে চলে আসে। অতঃপর এই শিক্ষা ব্যবস্থা হজরত ইব্রাহিম (আ.) পর্যন্ত চলে আসে। পরবর্তী সময়ে তার থেকে তদীয় সন্তানগণ শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে এই শিক্ষা আজ অবধি বিদ্যমান আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। যেমন ইব্রাহিম (আ.) তদীয় সন্তানদেরকে এবং হজরত ইয়াকুব (আ.) তদীয় পুত্রদেরকে শিক্ষামূলক উপদেশ দিয়ে যান। অনুরূপভাবে হজরত ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারী হওয়ারীদের তালিম ও তরবিয়ত শিক্ষা দিয়ে যান। সর্বশেষ মহানবি হজরত আলী (আ.) কে এই শিক্ষা প্রদর্শন করেন। আলী (আ.) এর মাধ্যমেই এই জ্ঞান কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে।

মাবিয়া হজরত আলী (আ.)কে তার যথাযথ মর্যাদা না দেওয়ার ফলে দ্বীন ইসলাম থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচারিত তথাকথিত 'শরিয়তি' দৃষ্টিকোণ থেকে এই জ্ঞান যা ইসলাম ধর্মের অবিচ্ছিন্ন অংশ তা মাবিয়া ও পরবর্তী বাদশা বা প্রচলিত অর্থে শরিয়তের আলেমগণ সাধারণভাবে জানতে পারেননি। ফলে এই জ্ঞা কে অস্বীকার করা হয় এবং আল্লাহর এই মহান ব্যক্তিবর্গকে কখনো কাফির বা ধর্মত্যাগী, রাষ্ট্রবিরোধী-শরিয়ত বিরোধী প্রভৃতি ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার প্রভৃতি শাস্তি আরোপ করা হয়। ওপরুন্তু এই সব লোকের চারিত্রিক সততা, পবিত্রতা ও দয়া সর্বোপরি তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতার কারণে সাধারণ লোক এদের প্রতি ধর্মীয় কারণে যে অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে তা অব্যাহত থাকলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাচ্যুত হবেন এই ভয়ে রাজা বাদশাহগণ এদেরকে অত্যন্ত ভয় করতো। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে এরা নবুওতের উত্তরাধিকারী (খলিফা/আমিরুল মোমেনিন) হিসেবে দাবি করলেও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী না হওয়ায় পরিস্থিতি অধিকতর জটিল আকার ধারণ করতো।

দুর্ভাগ্যবশত মাবিয়া হজরত আলী (আ.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য এই জ্ঞানকে অদ্যাবধি অনেকে ধর্মীয় জ্ঞান হিসেবেই স্বীকার করতে চান না।

জীবন্ত কোরআন ও পুস্তক কোরআন :

মানব সমাজে ঐশি জ্ঞান লাভের দুইটি মাত্র উপায় রয়েছে। এক আল্লাহর কালাম দুই নবি রসুলগণের ব্যক্তিত্ব। নবি রসুলদের আল্লাহতা'লা তাঁর বাণী পৌঁছিয়ে এবং তার শিক্ষা ও উপলব্ধি করার মাধ্যম হিসেবেই পাঠাননি। বরং সেই সাথে তাদেরকে বাস্তব নেতৃত্ব দান, পথ প্রদর্শন তথা দৈনন্দিন কাজ কর্মে ঐশি নির্দেশের যথাযথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তারা আল্লাহর বাণীর সঠিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সাধারণ মানুষ ও সমাজের সংস্কার/সংশোধন করতে পারেন। এবং বিকৃত সমাজও সুষ্ঠুভাবে পুনর্গঠিত করে দেখান। এ ধরনের লোকই প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত কোরআন–সাহেবে কোরআন।

এ দুটি বিষয় প্রকৃতপক্ষে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে একটিকে অন্যটিকে আলাদা করে, না মানুষ দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পেরে, আর না সে হেদায়েত লাভ করতে পেরেছে। আল্লাহর কিতাবকে নবি থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তা এক কান্ডারী বিহীন তরী হয়ে পড়ে। জীবন সংগ্রামে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোনক্রমেই তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। আবার নবিকে আল্লাহর কিতাব থেকে আলাদা করলে খোদার প্রাপ্তি সঠিক পথ পাওয়ার পরিবর্তে মানুষ বিভ্রান্ত ও পথ হারা হতে বাধ্য।

এই প্রেক্ষাপটেই রসুল (দ.) এর বাণী পবিত্র কোরআনের সাথে তাঁর মহান আহলে বায়াতের অবিচ্ছিন্নতার সম্পর্ক এই নিরীখেই বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে অতীতের সকল ধর্মই প্রকৃতপক্ষে এই দুইটির সঠিক সম্পর্ক চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়ে বিকৃত হয়ে গেছে এবং ঠিক একই কারণে আল্লাহর সর্বশেষ ঐশি গ্রন্থের ধারক ও বাহক হিসেবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ৭৩ ভাগে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর অন্য ধর্মাবলম্বীর সাহায্যে সহযোগিতা ছাড়া নিজের অস্তিত্ব টিকবেনা বিশ্বাস করে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

রসুল (দ.) তাঁর ওফাত পরবর্তী সময়ে পবিত্র কোরআনের একমাত্র বৈধ সংরক্ষণকারী বা কোরআনের একমাত্র ব্যাখ্যা প্রদানকারী হিসেবে আহলে বাইতগণকে ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু মাবিয়ায় সময় থেকে আলী (আ.) তথা আহলে বায়াতদেরকে আল্লাহর রসুল (দ.) কর্তৃক ঘোষিত এই নির্দেশের লংঘনের কারণে ইসলাম ধর্ম তথা পবিত্র কোরআনের কোন বৈধ ব্যাখ্যাকারী বা সংরক্ষণকারীর স্বীকৃতি দেওয়ার অবকাশ রাখা হলো না। ফলে শুধুমাত্র আরবি ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আওতাভুক্ত ব্যক্তিদেরই কোরআনের ব্যাখ্যাকারী তথা ধর্মের সংরক্ষণকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হলো। এ যেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, যারা দেশের শাসন তন্ত্রের সংরক্ষক ও বৈধ ব্যাখ্যা প্রদানকারী তাদেরকে বাদ দিয়ে কেবল কোন ইংরেজি ভাষার জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে বিচারপতি হিসেবে বিবেচনা করা হলো। প্রকৃতপক্ষে রসুল (দ.) এর পরে হজরত আলী (আ.) বা তাঁর কোরআন সম্পর্কিত জ্ঞানকে কোরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা গণ্য না করে অন্যান্য ব্যক্তির একাধিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করার জন্যই মুসলিম সমাজ আজ এত দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। রসুল (দ.) এদের মধ্যে শুধুমাত্র একটি দল যারা রসুল (দ.) এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর আহলে বায়তের অনুসরণকারী তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত বলে ঘোষণা করেছেন।

কোরআনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে রসুল (দ.) এর অবমূল্যায়ন :

পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। আল্লাহ স্বয়ং ইহার সংরক্ষক। তাই ইহার ব্যাখ্যাজনিত ভিন্নতা তথা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে রসুল (দ.) এর সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করা মাবিয়া তথা উমাইয়া রাজত্বকালের একটি স্থায়ি নীতি ছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে ইসলামি অর্থনৈতিক বিধানের ক্ষেত্রে কোরআনের যে সব আয়াত আবু জর গিফারি (রা.) ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন, মাবিয়া সেই সব আয়াতের অপব্যাখ্যা করে ইসলামকে এক রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদী ধর্মরূপে রুপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল। হজরত আলী (আ.) এর ওফাতের পর মাবিয়া সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে কোরআনের ব্যাখ্যাকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিজস্ব ব্যাখ্যা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তা বলাই বাহুল্য।

রসুল (দ.) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে যে সব মন্তব্য/বক্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে তা– পর্যালোচনা করে দেখা যায়– হজরত মুহম্মদ (দ.) আমাদের মত মানুষ নয়। তিনি নুরের নবি। তিনি ও কোরআন অবিচ্ছিন্ন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন নবিদেরকে সাধারণ মানুষ মনে করা কুফরি। কোন ধর্মেই তাদের নবিকে সাধারণ মানুষ বা কোন স্কুল কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্র বা শিক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হয় না বরং তাদেরকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেবলমাত্র কাফেরগণই নবি ও রসুলকে তাদের মত সাধারণ মানুষ মনে করে থাকে। এ কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও পবিত্র কোরআনের কিছু সংখ্যক আয়াতকে যে ভাবে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার ১২ নমুনা উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো :

রসুল (দ.) ব্যক্তিগত ইচ্ছায় আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত হালাল জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেন এবং স্ত্রীগনের সন্তুষ্টি বিধান করেন (নাউজুল্লিাহ)। প্রচলিত প্রায় সকল তফসির গ্রন্থে সুরা তাহরিম এর ১নং আয়াতের অর্থ এভাবে লেখা হয়।

"হে নবি আল্লাহ আপনার জন্য যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা আপনি কেন হারাম করিয়াছেন। আপনার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি সন্ধান করিতেছেন"। প্রকৃতপক্ষে রসুল (দ.) কখনও স্ত্রীগনকে সন্তুষ্ট করার জন্য অথবা অন্য

কোন কারণে আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত কোন হালাল বস্তুকে কোন অবস্থাতেই নিজের জন্য হারাম করে নিতে পারেন না ।

অনুরূপভাবে প্রচলিত তফসিরে সুরা কলমের তফসিরে বর্ণনা করা হচ্ছে "তুমি এমন ব্যক্তির আনুগত্য অনুসরণ করিও না যে খুব বেশি কড়া কসম করে ও গুরুত্বহীন ব্যক্তি । যে লোক গালিগালাজ করে, অভিশাপ দেয়, চোগলখুরি করিয়া বেড়ায়, ভাল কাজের প্রতিবন্ধক, জুলুম ও সীমা লঙ্ঘন মূলক কাজে লিপ্ত, বড়ই অসৎ কর্মশীল, দুর্দম, চরিত্রহীন আর এ সবের সঙ্গে সঙ্গে বদজাত (হারামজাদা) এই কারণে যে সে বিপুল ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির অধিকারী । (আয়াত ৪-১৬) ।

এই আয়াতে মানব চরিত্রের ১০টি দোষের কথা উল্লেখ আছে এই সকল দোষে দুষ্ট কোন ব্যক্তিকে পৃথিবীর কোন বিবেকবান ব্যক্তি অনুসরণ করতে পারে না । অথচ রসুল (দ.) এ ধরনের ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত তাকে অনুসরণ না করা বা তাদের ফাঁদে না পরার জন্য বলা হচ্ছে । আবার সুরা দোহায় রসুল (দ.) সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রচলিত তফসির গ্রন্থ সমূহে লেখা হয়েছে এবং তোমাকে পথ অনভিজ্ঞ রূপে পাইয়াছেন, পরে হেদায়েত দান করিয়াছেন ।

পবিত্র কোরআনের আয়াতসমুহের এ সব ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ যদি ভুল বা মিথ্যা হিসেবে গ্রহণ না করা হলে যে কোন সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোককে অবশ্যই বলতে হবে যে রসুলুল্লাহ (দ.) আমাদের মত সাধারণ মানুষ । জঘন্য চরিত্রের ধনী লোককে অনুসরণ করিতে চান, বা তার দ্বারা প্রভাবিত হন । তিনি পথভ্রান্ত মানুষ হিসেবে দিন কাটাইতে ছিলেন, হঠাৎ করে আল্লাহতা'লা তাকে সঠিক পথ প্রদান করে নবি হিসেবে নিয়োগ করলেন । (নাউজুবিল্লাহ)

অথচ আমরা স্থির নিশ্চিতভাবে জানি যে রসুল (দ.) বলেছেন, তিনিই হলো সৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দু উম্মি (মূল) । তাঁকে না সৃষ্টি করা হলে কিছুই সৃষ্টি করা হতো না । এই প্রেক্ষাপটেই রসুল (দ.) এরশাদ করেছেন আদম (আ.) যখন কাদামাটিতে তখনও আমি নবি ।" (বোখারি) ।

হজরত মুহম্মদ (দ.) সম্পর্কে আল্লাহতা'লার পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, আমার প্রিয় রসুল নিজ ইচ্ছায় কিছুই বলেন না, যাহা কিছু বলেন তাই ওহি এ খোদা হয়ে প্রকাশিত হয় । রসুল (দ.) সম্পর্কে সুরা আহজাব ৪৫-৪৬ আয়াতে বলা হয়েছে :

হে নবি, আমরা তোমাকে সাক্ষ্য ও সুসংবাদ দাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর নির্দেশে তার দিকে আহ্বানকারী এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে প্রেরন করেছি ।

আলোচ্য আয়াত সমূহে দেখা যায় হজরত মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে 'সাক্ষী' নিয়োগ করা হয়েছে । সেই সাথে উজ্জ্বল প্রদীপ তথা 'সিরাজাম মুনীরা' উপাধি দান করার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় মোহাম্মদ (দ.) এর চেয়ে প্রিয় ও সম্মানিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর কেহ হতে পারে না । এই মর্যাদার বিস্তারিত ও পরিধি মানবিয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় । তবে সাধারণ মানুষ গুণাহ করলে তার কাছে তা প্রকাশ করে যদি কেহ তওবা করে এবং রসুল (দ.) তা অনুমোদন করে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করলে আল্লাহ অবশ্যই তা কবুল করবেন বলে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন ।

"এবং যখন এরা (সাধারণ মানুষগণ) নিজ আত্মা সমূহের ওপর অত্যাচার করে (গুণাহ করে) এবং হে আমার মাহবুব । এরা আপনার নিকট এসে যায়, আর আপন গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চায় এবং রসুল যদি তাদের জন্য সুপারিশ করেন তবেই তারা আল্লাহকে তওবা কলুকারী ও দয়াময় হিসেবে পাবে ।" অথচ উপরে বর্ণিত কোরআন শরিফের যে সব আয়াতের ব্যাখ্যা সমূহ প্রদান করা হয়েছে এতে করে রসুল (দ.) এর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে সাধারণের মনে এক ধরনের সংশয় সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক ।

প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ (দ.) এর সঠিক মর্যাদা অনিশ্চিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে ঐগুলো তারই প্রমাণ । প্রসঙ্গত বলা যায় আওলিয়া বা প্রকৃত নায়েবে রসুলের মাধ্যমে যারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাঁরা রসুল (দ.) সঠিক মর্যাদা অবগত হয়েছেন। পক্ষান্তরে যারা উমাইয়া-আব্বাসীয় আলেমগণের পক্ষপাত দুষ্ট কিতাবসমূহ অধ্যায়ন করে ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন তারাই নবির মর্যাদা

সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে থাকে যা ধর্মে এত ফেরকা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। সব মতবাদের প্রবক্তারাই তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছে। ফলে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট করে ফেলছে।

জাল হাদিস প্রণয়ন :

মাবিয়ার সকল প্রকার চালবাজি কূটনীতি, অপপ্রচার হারেমাইন শরিফে, খেলাফতের সকল মসজিদের মিম্বরে, হাটে বাজারে, সভা সমতিতে, হজরত আলীর (রা.) বিরুদ্ধে গালিগালাজ রাষ্ট্রীয় অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে অভিসম্পাত দান। কোন কিছুতেই হজরত আলী (আ.) এর মান মর্যাদা, শান-শওকতকে ম্লান করিতে সক্ষম হলো না। অবশেষে বনু উমাইয়া কর্তৃক দুনিয়া পূজারি, ঈমান বিক্রয়কারী তথাকথিত উলামাকে নিয়ে হাদিস বোর্ড গঠন করা হলো। এই হাদিস বোর্ডের মূল দায়িত্ব ছিল মাবিয়ার মান মর্যাদাকে লোক চক্ষে সমুন্নত করা। নতুন নতুন মনগড়া হাদিস রচনা করে মাবিয়াকে সাহাবিগণের মধ্যে উচ্চতম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা কল্পে অনেক হাদিস রচনা করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে হজরত আলী (আ.) রসুল (দ.) সম্পর্কে বর্ণিত অগণিত ফজিলত সমূহে সকল সাহাবাই জানতেন। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি মাবিয়ার রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তাদের মধ্যে কেহ কেহ তৎকালীন পরিবেশে মাবিয়াকে সন্তুষ্ট করার ও ধন-দৌলত, মসনদ, বড় বড় পদ, জমিদারি প্রভৃতির লোভে নিত্য নতুন হাদিস সমুহ বর্ণনা করে। হজরত আলী (আ.) এর নাম উঠাইয়া দিয়া সেখানে মাবিয়ার নাম ঢুকাইয়া দিতে থাকিলেন। এই সব হাদিস সমূহ হতে সহিহ হাদিস অনুসন্ধান করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। আল্লামা জওজি বর্ণনা করেন:

"আবদুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ হাম্বল (রা.) তাঁহার পুত্রের প্রশ্নের জবাবে বলেন "বাবা, মওলা আলী (আ.) এর মর্যাদা সম্বন্ধে যে সমস্ত পবিত্র হাদিস আল্লাহপাকের নবি (দ.) ফরমাইয়াছেন এমন আর কারো জন্য এরশাদ করেন নাই। কিন্তু হজরত আলী (আ.) এর অনেক শত্রু ছিল তারা সম্মিলিতভাবে আলী (আ.) এর দোষত্রুটি খুঁজিতে থাকে। কিন্তু ইহাতে বিফল হইয়া মওলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। ইহাদের মধ্যে মাবিয়াই প্রধান এবং যে হাদিসগুলো আলী (আ.) এর প্রশংসা যুক্ত ছিল এইগুলি বিকৃত করিয়া অন্য নতুন হাদিস রচনা শুরু হইল আর রসুল (দ.) এর নামে চালু করিয়া দিল। এইভাবে ইহারা নিজেরা ধোঁকাবাজি করিতে থাকে এবং অন্যকেও একাজ করার জন্য উৎসাহিত করে। সওয়াইফ এ-মুহারিকা নামক বই এ হজরত আলী (আ.) নামের স্থলে মাবিয়ার নাম ঢুকাইয়া দেওয়া মিথ্যা হাদিস সংকলন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ২/১ টি উল্লেখ করা হলো।

আমিন আল্লাহর কাছে তিন ব্যক্তি "আমি (মুহাম্মদ (দ.) জিব্রাইল ও মাবিয়া (প্রকৃতপক্ষে হজরত আলী)। প্রসঙ্গত বলা যায় যে জিবরাঈল (আ.) এর নামের পর মাবিয়াকে আমার জন্য মাবিয়াকে (প্রকৃতপক্ষে আলী (আ.) ডাক না কেন মাবিয়া আমার কাছে অত্যন্ত বিশ্বাসী ব্যক্তি।

এ ধরনের ব্যক্তিগত মর্যাদা পূর্ণ হাদিস ছাড়াও বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফযিলতের হোতা হিসেবেও শত শত মিথ্যা হাদিস রচিত হয়। যেমন "মুসলিম নৌ-বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মাবিয়ার ফযিলত।" এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মাবিয়া সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে সমুদ্রাভিযান করার অনুমতি চাইলে হজরত ওমর ফারুক (রা.) লিখলেন, তুমি জান যে আল্লাহতা'লার উম্মতে মুহাম্মদীর কল্যাণকামিতা ও সহানুভূতিশীলতার দাসত্ব আমার স্কন্ধে অর্পণ করেছেন। অতএব আমি তাদেরকে (উম্মতে মুহাম্মদীরা) কিছুতেই সমুদ্রের ভয়াবহতার মাঝে নৌকায় আরোহন করে কবরস (সাইপ্রাস) দ্বীপে আক্রমণ করার অনুমতি দেওয়া সংগত মনে করছি না। (হজরত ওমরের সরকারি পত্রাবলী-খুরশিদ আহমদ ফারিক, পৃ. ১১৩)

যদি মুসলিম নৌ বাহিনী গঠন রসুল (দ.) এর নির্দেশেই থাকতো তাহলে হজরত ওমর (রা.) এ সমুদ্র অভিযান সম্পর্কে এ ধরনের বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন না বা অনুমতি প্রদান থেকে বিরত থাকতেন না। প্রসঙ্গত বলা যায় হজরত ওসমান (রা.) এই অনুমতি বিভিন্ন শর্তে প্রদান করেন। তাই হাদিছটি যে বানোয়াটি তা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।

কিছুদিন পর মাবিয়ার মোসাহেবগণ বুঝিতে পারিল যে হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও জনসাধারণ, রসুল এ খোদার 'অসি', শেরে খোদা, হজরত মওলা আলী এর মোকাবেলা মাবিয়ার মত 'তোলাকা' (নওঃ মুসলিম) দুরাচারী স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী সকল অন্যায়ের হোতাকে কোন মতেই গ্রহণ করিতে রাজি হবে না। তখন তাহারা হজরত আলীর (রা.) বিপরীতে হজরত আবুবকর (রা.) ও ওমর (রা.) কে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করলো। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে হজরত আলী (আ.) কে হেয় বা কম মর্যাদাপূর্ণ প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রথম দুইজন খলিফার মর্যাদা হজরত আলী (আ.) থেকে অনেক বেশি তা তলোয়ারের মাধ্যমে জারি করা হলো এবং এদের অনুসারীদের লিখিত বইয়ের মাধ্যমে চালু করা হইল।

মাবিয়া তথা উমাইয়া শাসকগণ যে প্রথম খলিফাদ্বয়গণের মর্যাদা হজরত আলী (আ.) মর্যাদা থেকে বেশি তা তরবারির মাধ্যমে চালু করেছে তা নিম্নের ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সাঈদ বিন জুবাইয়ের (রা.) একজন অত্যন্ত বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন তিনি দুই রাকাত নামাজে কোরআন খতম করতেন। তিনি আহলে বায়াতদের যথাযথ মর্যাদায় বিশ্বাস করতেন। এ কারণেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ "বেহেশতে যাওয়ার আশায়" হজরত সাঈদ (রা.) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।" সাঈদ (রা.) ও হাজ্জাজের কথোপকথোন নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো :

হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করিল তোমার নাম কি ? – সাঈদ তার নাম বলিলেন।

হাজ্জাজ বলিল – না তোমার নাম বরং দুর্ভাগা (সাঈদ অর্থ ভাগ্যবান)।

সাঈদ বলিলেন – এ ব্যাপারে আমার আব্বার জ্ঞান তোমাপেক্ষা বেশি ছিল যে আমার নাম কি হওয়া উচিত।

হাজ্জাজ – তোমার বাপ ও তুমি দুজনেই দুর্ভাগা।

সাঈদ – তুমি গায়েবের খবর জান না। হাজ্জাজ – আমি তোমাকে নিশ্চয়ই জাহান্নামে পাঠাব।

সাঈদ – জাহান্নামে পাঠানো তোমার ক্ষমতাধীন জানা থাকিলে তোমারই এবাদত বন্দেগি করতাম।

হাজ্জাজ – প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা সম্বন্ধে কি আকিদা রাখিস।

সাঈদ – আমি তো তাঁহাদের উকিল নই।

হাজ্জাজ – ঐ দুইজনের মধ্যে কে তোর বেশি প্রিয় ?

সাঈদ – যিনি আপন স্রষ্টাকে বেশি রাজি করিতে পারিয়াছেন।

হাজ্জাজ – স্রষ্টাকে বেশি রাজি করিতে কে পারিয়াছিলেন।

সাঈদ – সেই বলিতে পারে যে ঐ দুইজনের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত।

হাজ্জাজ (ক্রোধান্বিত হইয়া) – তাহা হইলে তুই আমার কথায় সায় দিবি না। (অর্থাৎ আমার মত হইল প্রথম দুইজনের মর্যাদা হজরত আলী (আ.) থেকে বেশি)।

সাঈদ – আমি এটা চাই না তোকে মিথ্যাবাদী বলি।

হাজ্জাজ – (ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল) আচ্ছা এখন এ কথা বল কিভাবে তুই মরতে চাস ?

সাঈদ – যেভাবে তোর মর্জি হয়, নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে নে, আল্লাহর কসম যে প্রকারে আমাকে হত্যা করবি সেই একই প্রকারে কিয়ামতের মাঠে আমি তোর প্রতিশোধ নিব।

হাজ্জাজ – জল্লাদকে বলিল, ইহাকে বাইরে নিয়ে কতল করে দে। জল্লাদ যখন সাঈদকে কতল গাহে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি হেসে ফেললো।

হাজ্জাজ – হাসছিস কেন ?

সাঈদ – এ কারণে হাসছি যে, তুই আল্লাহ পাকের সামনে এমন বড়াই করছিস আর আল্লাহপাক তোর এই সব দেখিয়াও অসীম সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছেন। মৃত্যুকালে তিনি কলেমা শাহাদত পড়ছিলেন আর দোয়া করছিলেন। রাবুল আলামিন, হাজ্জাজকে আর এত সময় দিবেন না যাতে সে আর কাউকে হত্যা করতে পারে। তাহাই ঘটিয়াছিল। এই ঘটনার চল্লিশ দিন শেষ হওয়ার পূর্বে আহলে বায়াতের অনুসারীর দোয়ায় মৃত্যু হাজ্জাজকে জাহান্নামের দরজায় ঠেলিয়া দেয়। (আলে রসুল ও মাবিয়া ফজল- এ মওলা মঞ্জুর আলম কাদেরি, ২২৮-২২৯)।

আহলে বায়াতগণের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীলদের হত্যা করা উমাইয়া নেতা হাজ্জাজের দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হলো। এবং প্রথম তিন খলিফার মর্যাদা আহলে বায়াতের চেয়ে বেশি এ মতবাদে অবিশ্বাসীদের হত্যা করাও পূণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচিত হতে লাগলো।

হাজ্জাজের সাথে হজরত সাঈদ বিন-জুবাইর (রা.) কথোপকথনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে বর্তমানে আমরা যেমন সরল অংকের মত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফার মর্যাদা মূল্যায়ন করে থাকি প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এত সহজ নয়। বরং হজরত আলী (আ.) এর মর্যাদা যে প্রথম তিনজন থেকে কম তা মাবিয়া ও তৎপরবর্তী সময়ে তরবারির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মাবিয়ার সাহাবিয়াত :

পূর্বেই বলা হয়েছে মাবিয়ার মর্যাদা বাড়াবার জন্য ক্ষমতা লোভীদের চামচারা বিভিন্ন মিথ্যা হাদিস রচনা করে। এই পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর না হওয়ায় মাবিয়ার কর্মকান্ড যেন কখনো কেহ সমালোচনা করতে সাহসী না হয় সে কারণে তাকে কখনো সাহাবা, কখনো কাতেবানী ওহি, কখনো মুজতাহিদ প্রভৃতি অর্থ বিশিষ্ট 'টার্মিনোলজি' সৃষ্টি করা হয় এবং এই সকল শব্দের সংজ্ঞা এ রকম ভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে করে এই সংজ্ঞা রূপী বর্মভেদ করে এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওপরন্তু এ শব্দমালাসমূহ সমাজে চালু করার জন্য সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য, সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যহত রাখা হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম মনমানস আজ পর্যন্ত এই ধুম্রজাল ভেদ করতে সমর্থ হয় নাই।

'সাহাবি' শব্দটি আরবি, এক বচন সাহেব। বহু বচনে সাহাবা অর্থ জীবন সাথী; সংঙ্গী, হামসর-সহচর; একত্রে একই পথ ও মতে জীবন যাপনকারী। বাংলায় একে একনিষ্ঠ অনুসরণকারী বা গুণমুদ্ধ ভক্ত ও ভাবশিষ্য বা সহযোগি বলা যেতে পারে। একই আদর্শে বিশ্বাসী ও সেই অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করেছেন যিনি। এই সহজ বিষয়টি অত্যন্ত জটিলভাবে উপস্থাপন করে কিছু সংখ্যক আরবি ভাষার বিদ্বান ব্যক্তি 'সাহাবা' শব্দের সংজ্ঞা দিলেন যারা রসুল (দ.) কে ঈমানের সাথে একবার মাত্র দেখেছেন, তারাই সাহাবা। অর্থাৎ কোন রকমে একবার রসুল (দ.) কে চোখে দেখাই একটি বিশেষ মর্যাদা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঈমানের সাথে অথবা মৌখিকভাবে কলেমা পাঠকারী অথবা মুনাফেকীর উদ্দেশ্যে ইসলামে দাখিল বহু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ সকল প্রকার অবৈধ কাজ করা সত্ত্বেও এই সংজ্ঞায় তাদের কার্যকলাপকে মূল্যায়ন না করার একটি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ বাহ্যিক কাজকর্মের বদলে আন্তরিক অনুভূতিকে প্রাধান্য দেওয়ায় কারো কাজকর্মের সঠিক মূল্যায়ন এক দূরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মাবিয়া তো বটেই ইসলামের জঘন্যতম দুশমন ও নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তার বাবা আবু সুফিয়ান, মা হিন্দা, এমনকি ওয়াসির মত ব্যক্তি যে রসুল (দ.) এর চাচা হামজা (রা.) অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল বলে রসুল (দ.) তার মুখ দেখতে অস্বীকার করেছিলেন সেই নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও সাহাবার কাতারে শামিল হলো। এবং কিছু সংখ্যক লোক এদের নামের শেষে রাযি আল্লাহতা'লা আনহুম না বলা বা লিখা না হলে শক্ত গুণাহ হবে বলে ভয় দেখালেন। অনুরূপভাবে সাহাবাদের ভাবশিষ্য/অনুসারী তথা তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনদের সংজ্ঞা নিরূপিত হলো এবং এদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন প্রকার আলোচনা সমালোচনা বা তাদের কার্যকলাপের নিরপেক্ষ, বিশ্লেষণ করা থেকে সমস্ত মুসলমান সমাজকে বিরত রাখা হলো। এদের কার্যকলাপ ইতিহাসের আলোকে ও বিবেকের দৃষ্টিতে যতই খারাপ, কদর্য ও নিষ্ঠুর মনে হোক না কেন ঈমান হারাবার ভয়ে মুসলিম সমাজ এদের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করতে পারে না। ফলে মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে মুনাফেক হতে হচ্ছে। অর্থাৎ এই সাহাবা, তাবেঈ, তাবে তাবেঈনদের এই ব্যাপক সংজ্ঞার আওতায় এক বিপুল জনগোষ্ঠী - বিশেষ করে শাসক সম্প্রদায়ের কাজকে আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করা সত্ত্বেও তা মুখে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছেনা এটা এক ধরনের মুনাফেকি ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃত আলেম বা সত্যান্বেষী ব্যক্তিগণ অসৎ ও নীতিহীন ব্যক্তিবর্গের কর্মকান্ডকে সমালোচনার উর্ধে রাখার জন্য প্রণীত 'সাহাবা' সম্পর্কে উল্লেখিত সংজ্ঞা গ্রহযোগ্য বলে বিবেচনা করেন না।

আল্লামা সাখাবি তাহার ফতহুল মুগীস কিতাবে উল্লেখ করেছেন ঃ আবু হুসাইন মুতামিদে কহিয়াছেন সাহাবি তিনি-ই যিনি তরিকা মোতাবেক দীর্ঘকাল ধরিয়া আ. হজরত (দ.) এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন এবং তার কাছ থেকে লব্ধ জ্ঞান ব্যক্তিগত জীবনে আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত যদি কেহ দীর্ঘ বা

অতিদীর্ঘ সাহচর্য লাভ করিয়াও থাকেন তবুও তিনি সাহাবি নন।" (ওসওয়ায়ে সাহাবা ফাসালুল খিতাব, পৃ ১৯৭)।

হাদিস শরিফ পর্যালোচনা করে দেখা যায় হজরত রসুল (দ.) সাহাবা শব্দটি সীমিত অর্থে ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, একদা হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এর সাথে খালেদ বিন অলিদ এর কথা কাটাকাটি হয়। সংবাদটি হজরত রসুল (দ.) নিকট পৌঁছিলে তিনি খালেদকে বলিলেন, "তুমি কখনো আমার সাহাবিদের সমকক্ষ হতে পারবে না। যদিও তুমি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ গোনাও দান কর না কেন। এই হাদিস থেকে 'সাহাবি' শব্দের সীমিত ব্যাবহারের ব্যাপারটি সুনিশ্চিত। ওপরন্ত এই হাদিসের আলোকে এটা প্রমাণিত হয় মহাবীর খালেদ বিন অলিদ সাহাবা হিসেবে বিবেচিত ছিলেন না। হজরত খালেদ 'হুদায়বিয়া' সন্ধির পর ৬২৭ খ্রিস্টব্দে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অথচ মাবিয়া মক্কা বিজয়ের দিন অর্থাৎ ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

তাই মাবিয়া বা তৎপরবর্তী ইসলাম গ্রহণকারীকে সাহাবির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হাদিসের আলোকেই বিধি সম্মত নয়।

এ কারণেই আল্লামা জালালুম উদ্দীন সুয়ুতি (রা.) তাঁহার আল-খাসায়েস এ কুবরা নামক পুস্তকে সাহাবি ঐ মহান ব্যক্তিদের মধ্যে সীমিত করিয়াছেন যাঁহাদের কোরআন মোতাবেক সত্যবাদিতা ও সততা সুপ্রমাণিত।

ওপরন্ত যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান আনিয়াছেন এবং এই কারণে তাঁরা জান মাল কোরবানি করিয়াছেন অথবা অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। এছাড়া হুদাইবিয়ার সন্ধি, সুরা নুর নাজিল হওয়ার সময় উপস্থিতি, সাহাবা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই যে সমস্ত আরবি বিদ্বানগণ অন্যান্য ব্যক্তিগণকে ঢালাওভাবে 'সাহাবা' হিসেবে গণ্য করেন তারা অবশ্যই ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টীকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত হাদিস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে রসুল (দ.) ফরমাইয়াছেন, "আর এমন হইবে যে ফেরেশতা আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আগুণে নিক্ষেপ করিবে। তখন বলিব, হে আমার রব, ইহারা তো আমার সাহাবি। ইরশাদ করা হবে আপনি কি অবহিত নন যে আপনার পরে তাহারা কি কি নতুন বেদআত (বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড যা শরিয়ত সম্মত নয়) প্রবর্তন করিয়াছে।" অতঃপর ফেরেশতাগণ বলিবেন, "ইহারা প্রকৃতপক্ষে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পূর্বের (জাহেলিয়াতের) ধর্মে ফিরিয়া গিয়াছিল"। (বুখারী)। মাবিয়ার সকল কুকর্মের সহযোগী ওমর ইবনুল আস হজরত আলী (আ.) এর খেলাফতের প্রথমদিকে মাবিয়ার নিকট পত্র লিখিয়াছেন তাহার নিম্নোক্ত উক্তি মাবিয়ার সঠিক পরিচয় বহন করে :

"হে মাবিয়া তোমার চিঠি পাইলাম, তুমি চাহিতেছ যে, আমি ইসলাম হতে খারিজ হইয়া তোমার সাথে পথভ্রষ্টদের শ্রেণিতে দাখিল হই। মিথ্যাকে সাহায্য করি, আর আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (আ.) এর বিরুদ্ধে তলোয়ার উন্মুক্ত করি; এই মিথ্যা অপবাদে যে তিনি হজরত ওসমান (রা.) কে হত্যা করাইবার জন্য লোকদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন যাহা ডাহা মিথ্যা, বোকাবাজি ও পথভ্রষ্টতা।"

কয়েস বিন-সাদ-বিন-এবাদা আনসারি মিশরের গভর্নর থাকাকালীন মাবিয়ার নিকট পত্রে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন :

তুমি প্রতিমা পুজারি। প্রতিমা পুজারির পুত্র। জোর করে (স্বেচ্ছায় নয়) ইসলামে দীক্ষিত হয়ে পুনরায় খুশি মনে ইসলাম হতে খারিজ হয়ে গিয়াছো। তুমি খোদার দুশমন এবং তোমার দল শয়তানের শ্রেণিভুক্ত।"

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, উম্মুল মুমেনিন হজরত আয়েশা (রা.) ও উম্মে সালমা (রা.), হজরত আবু দারদা, আম্মার বিন ইয়াসির, কয়স বিন সাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হজর বিন আদি (রা.) প্রভৃতি জলিল উর কদর 'সাহাবি' ও 'তাবেঈ' ওমর বিন আস, হজরত হাসান বসরি, হজরত ওয়ায়েস করনি, ইমাম নেছাঈ, তাবারি, ওষি প্রমূখ মাবিয়াকে পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ বলিয়া মনে করতেন। (আলে রসুল ও মাবিয়া- ফযল এ মওলা মনজুর আলম কাদেরি, পৃ. ১৭৬-৮০)

খাতা এ ইজতে হাদী :

যখন মিথ্যা হাদিসের মাধ্যমে মাবিয়াকে সাহাবিত্ব দান করিয়াও মুসলিম জনমতকে মাবিয়ার কর্মকান্ডকে ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গীতে সঠিক প্রমাণিত করা গেল না তখন উমাইয়া রাজ দরবারের আলেমগণ মাবিয়ার সম্মান বজায় রাখিবার জন্য নতুন এক 'কনসেপ্ট' জারি করিল। এই নতুন তত্ত্বের নাম হলো খাতা-এ-ইজতেহাদি অর্থাৎ মাবিয়ার কর্মকান্ডে কোন ভুলত্রুটি হইয়া থাকিলেও তাতে কোন দোষ নাই।

'খাতা-এ-ইজতেহাদি' বিষয়টি ইসলামি আইন বিজ্ঞানের (Islamic jurisprudence) এর একটি জটিল পরিভাষা। অর্থাৎ ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কোরআন হাদিসে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নাই তাই সেক্ষেত্রে মানবিয় যুক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য। সেই সব সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্র শুধুমাত্র আইনতত্ত্ববিদ বিচারকগণ সন্দেহাতীত ভাবে মানবিয় কোন প্রকার লাভ ক্ষতির ঊর্ধ্বে থেকে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে সম্পূর্ণ নেক নিয়তের সহিত পুরোপুরি চিন্তা ভাবনার পর কোন প্রকার রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদান করলে সেই সিদ্ধান্ত বা রায় যদি ভুল ক্ষতিকারক হিসেবে বিবেচিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত রায়টি 'খাতা-এ-ইজতেহাদী' বা রায় প্রদানে অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র সেই সব বিষয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে যে সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বা রসুল (দ.) এর হাদিসে কোন সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান নেই। অর্থাৎ কোরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বিষয়ে এই পদ্ধতির ব্যবহার নিষিদ্ধ/হারাম। হজরত হাসান (আ.) কে বিষ প্রয়োগে হত্যা, ও তাতে খুশি হওয়া (আল ইসতিয়াব) হাজর বিন আদি (রা.) কে হত্যা করা, আবদুর রহমান ইবনে খালেদ, মালেক আশতারকে হত্যা, মাতাল ফাসেক ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ প্রভৃতি কাজকে কোনক্রমেই খাত-এ-ইজতে হাদির। আওতায় ফেলা সম্ভব নয়।

কাতেবে ওহি :

মাবিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য একটি বিষয়কে অত্যন্ত যত্নের সাথে জনসমক্ষে প্রচার করা হয় – তা হলো কাতেবেনে ওহি। কাতেব শব্দের অর্থ হলো লেখক, কাতিব শব্দের বহু বচন কাতিবীন অর্থাৎ লেখক বৃন্দ। কাতেবিনে ওহি বলতে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ কোরআন নাজিল হওয়ার পর তা লিপিবদ্ধ করিতেন তাহাদেরকে ইসলামি পরিভাষায় 'কাতেবানে ওহি' বলা হয়।

মনে রাখতে হবে কোরআন নাজিলের প্রথম দিকে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব কম ছিল। তাই কোরআন লেখার জন্য লেখাপড়া জানা লোকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ছিল। তাই ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত শুধুমাত্র শিক্ষিত হওয়াই ওহি লেখক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বশর্ত ছিল। মানবিয় চরিত্রের অন্যান্য গুণাবলী এ কাজে মূখ্য ভূমিকা হিসেবে বিবেচনা করার অবকাশ ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে বদরের যুদ্ধবন্দীদের (যারা কাফির ছিল) মুক্তিপণ হিসেবে মুসলমানদের সন্তানদের শিক্ষাদান করা ফিদিয়া (মুক্তিপণ) ধার্য করা হয়েছিল। অর্থাৎ ভাষা বা অক্ষর পরিচয় জ্ঞান বিধর্মীদের কাছ থেকে শিক্ষা করাও ইসলামি শরিয়তে বৈধ। যেহেতু রসুল (দ.) এইসব কাফিরদেরকে মুসলমানদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন তাই এই সব শিক্ষকদের অসাধারণ কোন মর্যাদা ছিল বা আছে বলে মনে করা সঠিক হবে না। অনুরূপভাবে আরবি ভাষায় অসাধারণ পান্ডিত্য বা জ্ঞান থাকাটা পাক্কা ঈমানদান হওয়ার সর্বপ্রধান যোগ্যতা নয় তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় সৈয়দ আহমেদুল হক সাহেবের রচিত 'প্রবন্ধ বিচিত্রা' পুস্তকে সৈয়দ হক লিখেছেন :

আমি একবার জেরুজালেম গিয়েছিলাম। একদিন এই দিক ঐদিক ঘুরাঘুরি করিতে করিতে আমি খ্রিস্টানদের বড় গীর্জায় ঢুকিয়া পড়ি। ইহা খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় গীর্জা। এইখানে যিশু খৃষ্টকে ক্রসবিদ্ধ করা হইয়াছিল বলিয়া খৃষ্টানগণ মনে করেন। খৃষ্টানরা ঐখানে নতজানু হইয়া জোড় হাতে প্রার্থনা করিতেছিলেন। তাহাদের সামনে জ্বলিতেছিল কয়েকটি ঘি এর প্রদীপ। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উহা দেখিতেছিলাম। হঠাৎ একজন পাদ্রি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ( ) অর্থাৎ আপনি কি কোন মাজহারের লোক ? আমি উত্তর করিলাম আমি মুসলমান। ভদ্রলোক আমাকে বাহিরে নিয়া আসিলেন। আমি আরবি জানি কি না জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম সামান্য মাত্র আরবি জানি। তিনি বলিলেন তাহার মাতৃভাষা আরবি এবং তিনি কোরান ও হাদিস মুখস্ত বলিতে পারেন। সত্য সত্যই তিনি কিছু আবৃত্তি করিয়াও শুনাইলেন এবং অর্থ ইংরেজিতে বুঝাইয়া দিলেন। আমি আভাম্বিত হইলাম; এই ভদ্রলোক কোরআন হাদিসের এতকিছু জানিয়াও কেন মুসলমান হন

নাই। আসল কথা তাহার মধ্যে ঈমানের নুর ছিল না। ফিলিস্তানের ইহুদিদের মাতৃভাষা আরবি কিন্তু তাহারা মুসলমান নহে। তাহারা মুসলমানদের দুশমন। আর এবার দুবাইতে আমি এক অমুসলমান হাফেজে কোরআনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। তিনি শৈশব কালে পিতার সঙ্গে সুদানে ছিলেন। ঐখানে তাহাকে বাধ্য হইয়া কোরআন মুখস্ত করিতে হয়। কিন্তু মুসলমান হন নাই। পাঠকদের অনেকেই হয়তো ঐতিহাসিক হিট্টি সম্বন্ধে জানেন। 'হিস্ট্রি অব দি আরবস' তাহার একটি কুখ্যাত ইতিহাস। তিনি বৈরুতের এমেরিকান ইউনির্ভাসিটিতে ইতিহাসের প্রফেসার ছিলেন। সুতরাং আরবি জানা থাকিলে কোরআনের তফসির করা যাবে না। এবং কেবল ফার্সি জানা থাকিলে, মৌলানা রুমীর মসনবি বুঝা যাইবেনা। পাঠকদের মধ্যে অনেকেরই জানা আছে ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনেক মোনাফেক ইহুদি ধর্মযাজক নাটকীয় ভাবে হঠাৎ মুসলমান হইয়া যাইত এবং সরলপ্রাণ মুসলমানদিগকে ধোঁকা দিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া পড়িত এবং ইসলাম ধর্মের বড় আলেম সাজিয়া মুসলমানদের ঈমান দুর্বল করিবার চেষ্টা করিত। ইহারা মুসলমানদের সামরিক ও অন্যান্য তথা সংগ্রহ করিয়া মুসলমানদের দুশমন ইহুদিগকে সরবরাহ করিত এবং পরে ইহুদি হইয়া যাইত।

এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখেই কাতেবে ওহির ব্যাপারটি পর্যালোচনাকরা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যে সমস্ত মহান কাতেবানে ওহি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশংসা সূচক বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায় তা তাদের ইসলামের প্রতি অবদান, চারিত্রিক সততা ও সত্যবাদিতার জন্যই বলা হয়েছে। তারা শুধুমাত্র পবিত্র কোরআন লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন বলেই তাদের অসাধারণ মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে তা ন্যায় ও যুক্তির বিচারে গ্রহযোগ্য হতে পারে না। স্মরণ রাখতে হবে যে মাবিয়া ৬৩০ ১১ই জানুয়ারি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে দেড় বৎসর যাবত তিনি সম্ভবত রসুল (দ.) সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে পবিত্র কোরআনের খুব কম সংখ্যক আয়াতই নাজেল হয়েছিল। ওপরুন্ত তখন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল বিধায় তার মত একজন নওমুসলমানদের দ্বারা এ ধরনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ করানোর সম্ভাবনা খুবই কম ছিল।

সম্ভবত উমাইয়া যুগে তার মর্যাদা বৃদ্ধির একটি উপাদান হিসেবে 'কাতেবানী ওহি' নামক একটি নতুন কনসেস্ট চালু করা হয়েছে মনে করার মত সংগত কারণ আছে।

সব-মাফ মতবাদ :

এই মতবাদের প্রবক্তারা দাবি করে থাকেন যে, পাপী হোক অথবা নিষ্কলুষ হোক, কেউ যদি অন্যায়, কোন প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা মূলক কাজ অথবা ষড়যন্ত্র করে কাউকে হত্যা করে বা করায় বা যত জঘন্য ধরনের অপরাধই করুক না কেন তার জন্য অবশ্যই মার্জনা লাভের আশা রয়েছে। এ জন্য সে তা আশা করতে পারে যে আল্লাহ বলেছেন "এমন লোকেরাও আছেন যারা খোদার নির্দেশ (ক্ষমার) লাভের প্রত্যাশা করছে।"

যে কোন ধরনের গোনাহ মাফযোগ্য। আর যখন আল্লাহর মার্জনার পথ এত প্রশস্ত সে ক্ষেত্রে কোন স্বাভাবিক মানুষকে অপরাধী হওয়ার দুর্ণাম দেয়াটাই পাপ। এ ধরনের জঘন্য রকম ব্যক্তিবর্গকে কোনক্রমেই কোন অপমানজনক বিশেষনে ভূষিত করা যাবেনা বা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করা যাবে না। কারণ তাদেরকে ক্ষমা করা হতে পারে।

এ কারণেই যখন এ ধরনের কাউকে অপরাধী বলে সম্বোধন করা হয় বা অত্যাচারী বা ষড়যন্ত্রকারী বলে ভৎর্সনা করা হয় তাহলে এই তিরস্কারকারী বা জুলুমবাজ বা ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আখ্যাদানকারী কার্যত খোদায়ি দাবি করছেন (নাউজিবিল্লাহ)। কেননা আল্লাহতা'লা হচ্ছেন প্রকৃত নির্দেশদাতা এবং তার নির্দেশের ভিত্তিতে সব কিছুরই হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা হবে এবং তিনি প্রত্যেকের গৃহীত কার্যপ্রণালী এবং আচরন ইনসাফের মানদন্ডে যাচাই করবেন। সুতরাং কারো কোন অধিকার নাই 'নিপীড়নকারী', 'গোনাহগার, 'জালেম' ষড়যন্ত্রকারীর কর্মকান্ড যাচাইয়ের। এ ধরনের কোন ব্যক্তি বিশেষকে বিচারের মিজান বা পাল্লায় স্থাপন করার কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই। এ দায়িত্ব শুধু খোদার এখতিয়ারভুক্ত। এ ধরনের কাজ করে যে মানব সন্তানকে অপরাধী বানাতে চায় এবং আল্লাহ কর্তৃক হিসেব-নির্দেশ গ্রহণের পূর্বে নিজেই সে হিসেবের কাজ সমাপ্ত করতে চায়, ষড়যন্ত্রকারী, অবৈধক্ষমতা দখলকারী বা অন্য কোন শক্ত গোনাহগার বান্দার কাজকর্মের মূল্যায়ন পূর্বক বিচার করার দায়িত্ব আমাদের নয়। অপরাধীকে দন্ড দেয়ার অধিকার আমাদের দেয়া হয়নি।

এটাও আমাদের অনুমতি দেয়া হয়নি যে, আমরা বিশেষ কোন দলের পক্ষাবলম্বন করি। সবাইকে বুকে টেনে নিতে হবে। কাউকে খারাপ, দুষ্ট, অন্যায়কারী বলা যাবে না এবং শাস্তি দানের বিষয়টি বা দোষী হিসেবে চূড়ান্তভাবে আল্লাহতা'লা কর্তৃক ঘোষণা শুনার আগ পর্যন্ত কোন প্রকার মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ সময়কার আলেমদের পক্ষ থেকে সে সময়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তা হচ্ছে "সব কিছু আল্লাহর হাতে ছেড়ে দাও।" অর্থাৎ মাবিয়া যাই করুক না কেন তার কার্য কলাপকে সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখার জন্য এই মতবাদ চালু করা হয়েছিল তা মনে করার সংগত কারণ আছে।

এই মতবাদ যে সমাজ ব্যবস্থায় ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এর প্রভাবে সৎ ও ধর্মভীরু লোকদেরকে দুনিয়ার ঝামেলা মুক্ত করে নির্জনবাসী করে তোলে ও অবাঞ্চিত ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি হয় এবং তারপর সে জুলুমকারীর সহজ শিকারে পরিণত হয়। ফলে সে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের জন্য পথ পরিষ্কার করে দেয়। অসৎ লোকেরা খোদার দুনিয়ায় সকল প্রকার নীতিহীন কাজ ও জুলুমবাজির মাধ্যমে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করে অবাধে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং ক্ষমতা দখল করা বা অন্যায় যুদ্ধে জয়লাভ করা বা অবৈধ পন্থায় সম্পদের অধিকারী। হওয়াকে আল্লাহর তরফ থেকে তাদের সাহায্য বলে মনে করতে থাকে। এ মতবাদের মাধ্যমে লোকের সকল ধরনের কুকর্ম করার ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া হয়।

পবিত্র কোরআনের সকল আয়াতে আল্লাহতা'লা গুণাহ মাফ করে থাকেন মর্মে যে উল্লেখ রয়েছে তা আয়াতের সঠিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অনুধাবন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তার ক্ষমতার প্রয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁর ক্ষমতাও নিরঙ্কুশ। তিনি তাঁর কাজের জন্য কাউকে জবাবদিহি করেন না বা কেহ তাঁকে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগের হেতু জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে ক্ষমতা প্রাপ্ত নন। তাই কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষেই কোন অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হয় তাহলে মহান আল্লাহতা'লা তাঁর বিশেষ ক্ষমতা (Prerogative. Discretion power) প্রয়োগের মাধ্যমে তা ক্ষমা করার ক্ষমতা পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেন। যেহেতু আল্লাহতা'লা ন্যায় বিচারক তাই তাঁর এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ অত্যন্ত সুবিবেচনার সাথে করা হয় এ কারণেই তিনি 'আজিজুল হাকিম'। হাদিসে উল্লেখ আছে শবে বরাতের পূণ্যময় রজনীতে যে সকল বান্দাদের প্রতি মহান আল্লাহপাক ক্ষমা ও অনুকম্পা বর্ষণ করেন না তারা হলো :

১। মুশরিক : যে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাবাস্ত করে।

২। হিংসুক : যে কারো নেয়ামত ও সুখ অবলোকন করে মনে মনে দগ্ধ হয় এবং তা অবসান হওয়ার কামনা করে এবং তা নিজের করার ও হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা করতে সক্ষম হয়।

৩। যে আত্মীয়তার বন্ধন অকারণে ও গর্হিত পন্থায় ছিন্ন করে।

৪। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাকারী। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড রয়েছে যা করা হলে আল্লাহ এ ধরনের দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। অর্থাৎ কোন কোন কর্ম ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। তাছাড়া পার্থিব কর্মকান্ডে যদি ন্যায় অন্যায় কাজকর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য না করে পুরস্কার বা তিরস্কারের মতবাদ অস্বীকার করা হয় তাহলে বিচারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অথচ পৃথিবীর কোন সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের মতবাদের কোন বাস্তব স্বীকৃতি নাই।

প্রকৃতপক্ষে কোন কাজের কেবলমাত্র উদ্দেশ, সৎ হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং সেই সদুদ্দেশ্য সম্পন্ন কাজ করার জন্য যে উপায় ও পন্থা অবলম্বন করা হয় এবং তাতে যে সব দ্রব্য সামগ্রী ও উপাদান ব্যবহার করা হয় তাও সনেতীতভাবে সৎ ও পবিত্র হতে হবে। নাপাক, অপবিত্র ও অসৎ পন্থায় এবং অপবিত্র উনি ও সামগ্রীর দ্বারা সৎ উদ্দেশ্য লাভ আশা করা কোনক্রমেই সংগত নয়। কেবলমাত্র পাক পবিত্র উপায়ে সৎ উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জিত বস্তুই আল্লাহর নিকট গ্রহযোগ্য হতে পারে। এ প্রসঙ্গে রসুল (দ.) বলেছেন কেউ যদি হারাম মাল অর্জন করে এবং তা হতে দান/সদকা করে এবং মাল-সম্পদে বরকত দান করা হবে বলে মনে করে তা মোটেই সম্ভব নয়। তার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত মাল-সম্পদ কেবল জাহান্নামের পথেই যেতে পারে। বস্তুত আল্লাহর স্থায়ি নিয়ম হচ্ছে এই যে, তিনি খারাপ জিনিস দ্বারা খারাপ জিনিস দূর করেন না। প্রকৃতপক্ষে খারাপ

জিনিসকে ভালো জিনিস দ্বারাই দূর করে থাকেন। এটাই স্বতঃসিদ্ধ কথা যে নাপাকী দ্বারা নাপাকী দর হতে পারে না (মুসনদে আহমেদ)। উল্লেখিত পর্যালোচনা দ্বারা ইহা সুস্পটভাবে প্রমাণিত হয় যে খারাপ কাজ করার লাইসেন্স হিসেবে কোরআনের কোন আয়াতকে ব্যাখ্যা করা জায়েজ নাই। অথচ মিথ্যার আশায় এ রোগ বা ধর্মীয় প্রতিভূদের এ ক্যান্সার উমাইয়া রাজত্বের প্রথম দিকেই মুসলমানদের করল চলৎশক্তিহীন। কেননা এই প্রজন্মের লোকেরা ইসলামি আদর্শের যথার্থ প্রশিক্ষণ নিতে পারেনি এবং নবি, উলিল আমর, অলি, মুহাজির এবং আনসারদের মুখ থেকে কোরআন ও ইসলামের সঠিক ভাষা বা ভাবধারা তারা শুনতে পায়নি। তাই দ্বিতীয় স্তরের ধর্মীয় প্রশিক্ষক যারা নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ বিক্রয় করে দিয়েছিল। তাদের কাছ থেকে এ যুগের উত্তরসূরিরা শিক্ষা লাভ করেছিল। স্বাভাবিক কারণেই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়েছে। এ কারণেই তাদের চেতনা-অনুসন্ধিৎসা ও ধর্মীয় অনুভূতি সব কিছুই উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত উলামাদের প্রচারণায় বিষাক্ত হয়েছিল। প্রকৃত দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানদের এটা হচ্ছে দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমর বিন-মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ মুসলমানদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা মানুষের পাশাপাশি বিরাজমান খোদা ও শয়তানকে এক করে ফেলে এবং একজনকে অপরের ব্যাপারে কোন কিছু করার নাই বলে ধারণা করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদ তথা মাবিয়ার সকল কুকর্মকে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখার একটি ধর্মীয় বাস্তবতা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

অদৃষ্টবাদ :

প্রাচীন কালের অন্যান্য জাতির মত প্রাক ইসলামি আরবেরাও ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলো। ইসলাম ধর্মে মানবিয় কর্মকান্ডে এই অদৃষ্টবাদকে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ও মানবিয় ইচ্ছার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এটা লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহর বিধান সম্বলিত উদ্ধৃত অনেক আয়াতেই সুস্পষ্টভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের কথা উল্লেখ আছে। তারকা ও গ্রহরাজির সুনির্দিষ্ট গতি রয়েছে। অনুরূপ রয়েছে সৃষ্টির অন্যান্য বস্তুর কার্যধারা, নক্ষত্র মন্ডলের গতায়াত, নৈসর্গিক ঘটনাবলী, জীবন মৃত্যু সবই নিয়মের অধীন। অন্যান্য আয়াতে প্রশ্নাতীতভাবে মানুষের ইচ্ছার ওপর ঐশি ইচ্ছার কার্যকারিতা নির্দেশ করে। আবার এমন আয়াত আছে যাতে ঐশি কর্তৃত্ব মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা ঐশি সাহায্য অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আর যে হৃদয়ের জটিলতা থেকে মুক্ত হয় আল্লাহ তার ওপর রহমত বর্ষণ করেন ।

সে সব আয়াতে জোরালো ভাষায় মানবিয় দায়িত্ববোধ ও মানবিয় ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে উক্ত হয়েছে তার কয়েকটি এ রকম, "যে কেউ গোনাহ কামাই করেছে তার ফলাফল নিজেই ভুগবে।" (৪ : ১১১) "আর তাদেরকে বর্জন করো যারা নিজেদের ধর্মকর্ম নিয়ে খেল তামাশায় মেতে ওঠেছে। আর পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে।" (৬ : ৭০)

"তারা যখন অপকর্ম করে তখন তারা বলে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে আমরা এসব করতে দেখেছি, আর আল্লাহ এসবের নির্দেশ আমাদেরকে দান করেছেন" (৬ : ২৮)। "আপনি ঘোষণা করে দিন (রসুল (দ.)) আল্লাহ অশ্লীল অপকর্মের নির্দেশ মোটেই দেননা।" "তারাই তো নিজেদের ওপর জুলুম করেছে (৯ : ৭০)।" "সেখানে সবাইকে যাচাই করা হবে। যা কিছু আগাম পাঠিয়েছে, "আর যে কেউ বিভ্রান্ত হলে তাতে তার নিজের অনিষ্ট ঘটল।" (১০ : ১০৮)

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাই তাকে বিভিন্ন ধরনের কর্মে প্ররোচিত করে। প্রত্যেক মানুষের দুটি প্রবণতা রয়েছে– একটি তাকে উত্তম কাজের দিকে প্ররোচিত এবং অপরটি মন্দ কাজের দিকে প্ররোচিত করে ঐশি সাহায্য মানুষের নিকটবর্তী যে ব্যক্তি তার মনের কুমন্ত্রণাকে জয় করার জন্য আল্লাহপাকের সাহায্য প্রার্থনা করে সে তা পায় । তোমার নিজের আচরণই তোমাকে স্বর্গে বা নরকে নিয়ে যাবে যেমন তুমি সেজন্য পূর্ব থেকে নির্ধারিত। মানুষের আচরণ কোনক্রমেই আকস্মিক নয়। একটি কাজ অন্য একটি কাজের ফল অর্থাৎ মানব জীবনে সাধারণভাবে যে ধরনের কাজ করা হবে ফল তারই অনুরূপ হবে।

পবিত্র কোরআনে ও রসুল (দ.) এর হাদিসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও উমাইয়া শাসনামলে যে নতুন ইসলামি মতাদর্শের জন্ম হয় তা হচ্ছে ধর্মীয় কর্তৃত্ব সম্পন্ন গোষ্ঠী। তারা সকল নীতিমালা

ও বিশ্বাসকে বিশেষ করে জিহাদি চেতনার প্রাণশক্তি রহিত করার জন্য কোরআনকে ব্যবহার করে অদৃষ্টবাদের ধ্যান-ধারণা একটি ঐশি দর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করে। "প্রভু হচ্ছেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান নির্দেশদাতা। এই আয়াতকে এই বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এই ধরনিতে যে ধরনের দুঃখ-দুর্দশাই নেমে আসুক কেন আল্লাহর ইচ্ছাই তা ঘটছে। একজন যা করে তা আল্লাহর অভিপ্রায় অনুযায়ী করে, একজন যে অবস্থা ও পরিস্থিতি অতিক্রম করুক না কেন, যে অভিরুচিই সে পোষণ করুক, যে তৎপরতায় সে নিয়োজিত হোক– সে কাজ অশুভ হোক কিংবা পবিত্রই হোক, সে খুনী হোক বা খুনী নাই হোক, দন্ডপ্রাপ্ত হোক, দন্ডদাতাই হোক সব কিছুই প্রভুর ইচ্ছা ও নির্দেশেই বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহই ক্ষমতা দেন আবার তা কেড়ে নেন। আল্লাহই হত্যা করেন বা করান আবার জন্মও দেন। সম্মান, অসম্মান তাঁর কাছ থেকেই নির্ধারিত হয় কোন ব্যাপারে কারো অন্য কোন এখতিয়ার নাই।

ধর্মবিশারদদের এ শিক্ষায় রয়েছে এমনি এক প্রতিক্রিয়া যা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত মুসলমানদের চিন্তাভাবনায় আনে এক বন্ধাত্য– এক স্থবিরতা। এটা বুঝান হয় আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন বলেই মাবিয়া শাসনকর্তা হয়েছেন। হজরত আলী (আ.) যদি পরাজিত হয়ে থাকেন তবে আল্লাহর নির্দেশেই তা ঘটেছে, ভাল যদি উচ্ছেদ হয় এবং মন্দ-অন্যায়, জুলুম যদি ক্ষমতাসীন হয় বুঝতে হবে এটা ঐশি বা উচ্চস্তরের প্রজ্ঞা বা সিদ্ধান্তেই ঘটেছে। আমাদের কাছে সেটা অস্পষ্ট, আল্লাহর ওপর সব নির্ভরশীল এটা আমাদের এখতিয়ারের বাইরে। অতএব ক্ষমতাবানদের যে কোন দূর্বব্যবহার, অপরাধ অথবা অসদাচরণ, আল্লাহর ইচ্ছা, তাই মতাবানদের নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত ঐশি নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরই নামান্তর।

হজরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী তাঁর দাউযান শানটি তবরীহ গ্রন্থে আলী (আ.) তাৎপর্য নির্দেশ করিয়েছেন। "এটা কুফরি নয়। আমি কাফির নই। যতদিন হইতে এই সৃষ্টি আছে, আলী আছেন, যতদিন সৃষ্টি থাকিবে আলী থাকিবেন।" সৃষ্টিতে আলীই মাত্র একটি স্থান সেখানে কোনরূপ নোংরামি লইয়া প্রবেশ করা যায় না। রসুল (দ.) বলেছেন হে আলী (আ.) ! মোনাফিক তোমাকে পছন্দ করতে পারবে না।" এই যাবত আলী (আ.) এর বিরোধিতা করে মাবিয়া যে তথাকথিত সম্মান অর্জন করেছেন। এই সম্মান আল্লহ তাকে দিয়েছেন মর্মে তিনি মুহম্মদ বিন-আবুবকর কে চিঠিতে উল্লেখ করেন যে "আপনি আবু তালেব আলী (আ.) সৎ গুণাবলী এবং শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করিয়াছেন এবং রসুল পাকের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন এবং রসুল পাকের দুঃখ কষ্ট ও বিপদের দিনগুলিতে রসুলের প্রতি আলী (আ.) সহায়তাও সমর্থনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আলী (আ.) শ্রেষ্ঠত্বের এবং সর্বাগ্রবর্তী মুসলিম হওয়ার বিষয়ও আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনার অভিমত অন্যের শ্রেষ্ঠত্বের দীর্ঘ যুক্তির ওপর ভিত্তি করা হইয়াছে। আপনার নিজ শ্রেষ্ঠত্বের ওপর নয়। আমি আমার আল্লাহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যে আপনা হইতে ভিন্নমুখী করিয়াই আল্লাহ আমাকে সম্মান দান করিয়াছেন।" অর্থাৎ আলী (আ.) এর বিরোধিতা করে ঈমান নষ্ট হলে কি হবে, যেহেতু মাবিয়া পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। তাই তিনি নিজেকে সম্মানিত বলে ভাবছেন। এবং এই সম্মান আল্লাহতা'লা দান করেছেন বলে মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন এবং তার বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ করছেন। তোমাদের সুনামের প্রতি কলংক লেপন করিয়াছেন অর্থাৎ আল্লাহতা'লা মাবিয়াকে সকল প্রকার ধর্মোদ্রোহিতার কাজ কর্মে সহায়তা করে তাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রেখেছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। কারবালায় বিশ্বের জঘন্যতম হত্যাকান্ডের মাধ্যমে ইমাম হুসায়েনকে (রা.) অন্যায়ভাবে শাহাদাত করানোর পরেও তার কুকর্মকে কি সুকৌশলে আল্লাহর কাজ (নাউজুবিল্লাহ) বলে চালানো হয়েছিল - দয়া করে লক্ষ্য করুন।

কারবালা হত্যাকান্ডের পর ইয়াজিদ সিরিয়ার প্রধান ব্যক্তিগণকে এক সভায় আহ্বান করলো। আইলে বাইতগণকেও সভায় স্থান দিল। তৎপর ইমাম জয়নাল আবেদীনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ আলী, (জয়নাল আবেদীন) তোমার পিতাই আমার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন। আমার দাবি অস্বীকার করিয়াছেন। আমার কর্তৃত্ব হরণের চেষ্টা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা-ত দেখিতেই পাইয়াছ। (মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা–মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, পৃ- ১৩৭) অর্থাৎ

কারবালার যুদ্ধের কাজ কর্মের ব্যাপারে ইয়াজিদের কোন দায় দায়িত্ব নাই। বরং আল্লাহতা'লাই ইয়াজিদকে এই জঘন্য পদ্ধতিতে কাজ করার সৌভাগ্য দান করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)।

অনুরূপভাবে কারবালার যুদ্ধের হোত ইবনে জিয়াদ জামে মসজিদে শহরের লোকগণকে সমবেত করত: তাহাদের সম্মুখে এক বক্তৃতায় বলিল ঃ "আল্লাহকে ধন্যবাদ! . তোমাদিগকে (জয়নাল আবেদীন এর সংঙ্গীগণ) তিনি লাঞ্চিত করিয়াছেন, ধ্বংস করিয়াছেন"

অর্থাৎ পৃথিবীর জঘন্যতম কর্মটি সে আল্লাহর রহমতেই করিয়াছে এ ব্যাপারে তার কোন দায় দায়িত্ব নাই (নাউজুবিল্লাহ)। মাবিয়ার আমলেই এই শিক্ষা মুসলিম সমাজে চালু করা হয়। উপরোক্ত ঘটনাবলী তারই প্রমাণ।

মাবিয়া কর্তৃক ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ :

মাবিয়া তার নিজস্ব মতবাদ, গোত্রীয় ও শ্রেণি স্বার্থ চিরস্থায়ি করার লক্ষ্যে তার নিজ বংশের মধ্য থেকে তার উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বিষয়টি সহজ ছিল না। কারণ তখন পর্যন্ত মুসলিম জনগোষ্ঠী এই ধরনের উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে খলিফা নিয়োগ ধর্মীয় দৃষ্টিতে সঠিক বলে মনে করতেন না। মুগিরা ইবনে শোবা মাবিয়ার এই দুর্বলতার কথা জানতেন। ইতিমধ্যে মাবিয়া ইবনে শোবাকে কুফার গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করার কথা বিবেচনা করছিলেন। তিনি (শোবা) এ বিষয়ে অবহিত হলেন। তৎক্ষণাৎ কুফা থেকে দামেস্কে পৌছে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন : শীর্ষস্থানীয় সাহাবি ও কুরাইশদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছিনা আমিরুল মুমেনিন তোমার পক্ষে বায়াত গ্রহণে কেন বিলম্ব করছেন। ইয়াজিদ তার পিতার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে। মাবিয়া মুগিরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি ইয়াজিদকে কি বলেছো ? মুগিরা জবাব দেন হজরত ওসমান (রা.) এর হত্যার পর যতো মত-বিরোধ এবং খুন খারাবী হয়েছে, তা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, কাজেই এখন আপনার জীবদ্দশায় ইয়াজিদকে স্থলাভিষিক্ত করে বায়াত গ্রহণ করাই আপনার জন্য উত্তম।

"মনে রাখতে হবে হাসান (আ.) এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে পরিষ্কার উল্লেখ ছিল মাবিয়ার পরে খেলাফত আহলে বায়াতদের ওপর বর্তাবে সেই মোতাবেক হজরত হুসাইন (রা.) ইসলামের ন্যায়ত ও ধর্মত ও আইনত একমাত্র বৈধ খলিফা। চুক্তি ভংগ করা কবিরা গুণাহ জানা সত্ত্বেও মাবিয়া মুগিরার এই অবৈধ প্রস্তাব যা কিসরা ও হিরাক্লিয়াসের অনুসৃত রীতি ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ অধর্ম সে সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়েও তার গোত্রীয় স্বার্থে ইয়াজিদকে তার উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মাবিয়া মুগিরাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব কে নেবে ? জবাবে তিনি বললেন আমি কুফাবাসীকে সামলাবো। আর জিয়াদ (বসরার গভর্নর) বসরাবাসীকে। এরপর বিরোধীতা করার কেউ থাকবে না। এ কথা বলে মুগিরা কুফা গমন করেন এবং দশজন লোককে ৩০ হাজার দেরহাম দিয়ে একটি প্রতিনিধি দলের আকারে মাবিয়ার নিকট প্রেরণ করে ইয়াজিদ তার স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে চাপ প্রদান করে। মুগিরার পুত্র মুসা ইবনে মুগিরার নেতৃত্বে এই তথাকথিত প্রতিনিধি দল তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে। পরে মাবিয়া মুসাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার পিতা এদের নিকট থেকে কত মূল্যে এদের ঈমান ক্রয় করেছেন ? তিনি বললেন ৩০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে । মাবিয়া বলেন, তাহলেতো এদের ধর্ম এদের দৃষ্টিতে নিতান্ত নগন্য।

ইয়াজিদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে লোকদের সমর্থন লাভের জন্য মাবিয়া দরাজ হস্তে বায়তুল মালের ধন সম্পদ বিতরন করেন। এই উদ্দেশ্যে মাবিয়া হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর নিকট এক লক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে তাঁকে হাত করার চেষ্টা করেন। তিনি বললেন : ওহো ! এই উদ্দেশ্যে আমার জন্য টাকা পাঠানো হয়েছে, তাহলে তো আমার দ্বীন আমার জন্য খুব সস্তা। তিনি ঘৃণা ঘরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। (আল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃ. ১২-৫০. আল বেদায়া ৮ম খন্ড, পৃ-৮৯, খেলাফত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, পৃ- ১৫৩)।

ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করার মতলবে ওমরা করার অজুহাতে মাবিয়া মদিনা ও মক্কায় পৌঁছে বুঝতে পারলেন হজরত হোসাইন (আ.) ইবনে ওমর (রা.), ইবনে আবুবকর (রা.) ও ইবনে জুবাইর (রা.) যতক্ষণ না সম্মত হবেন জনসাধারণ ইয়াজিদকে গ্রহণ করবেনা। উল্লেখিত মহান ব্যক্তিগণকে ধন-দৌলতের মাধ্যমে বশীভূত করতে সক্ষম হয়ে মাবিয়া জোর জবরদস্তি শুরু করলেন। এই পদ্ধতিতে সফলকাম না হয়ে সরাসরি মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মসজিদে নব্বিতে জনসাধারণের সম্মুখে মিম্বরের ওপর দাঁড়াইয়া ঘোষণা করলেন, "এই চার জন ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করেছেন, তোমরাও তাদের অনুসরণ কর।" প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল ডাহা মিথ্যা। ইবনুল আসীর তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন :

ইরাক, শাম এবং অন্যান্য এলাকা থেকে বায়াত গ্রহণ করে মাবিয়া হেজায গমন করেন। কারণ হেজাজের ব্যাপারটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম জাহানের যে সকল প্রভাবশালী ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিরোধিতার আশঙ্কা ছিল তাঁরা সকলেই সেখানে ছিলেন। মদিনা শহরের বাইরে থেকে হজরত হুসাইন (আ.), হজরত যুবাইর (রা.), হজরত ইবনে ওমর (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর (রা.) এর সঙ্গে মাবিয়া সাক্ষাত করেন। মাবিয়া তাদের সাথে এমন কঠোর আচরণ করেন যে, তাঁরা শহর ত্যাগ করে মা চলে যান। এভাবে মদিনার ব্যাপারটি সহজ হয়ে যায়। এরপর মাবিয়া মক্কা গমন করেন এঁদের চারজনকে শহরের বাইরে ডেকে এনে তাদের সাথে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেন এবং এঁদের সাথে শহরে প্রবেশ করেন। তাদেরকে একান্তে ডেকে ইয়াজিদের বায়াতে তাদের রাজি করার চেষ্টা করেন। এ প্রেক্ষিতে ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন : আপনি রসুল (দ.), আবুবকর (রা.), ওমর (রা.) কর্তৃক অনুসৃত যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করুন। মাবিয়া অন্যান্যদের মত জানতে চাইলে তারা একই প্রস্তাব দেন। অতঃপর মাবিয়া বলেন : এতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে এসেছি। এবার আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার কথার জবাবে তোমাদের কেউ যদি একটি কথাও বল, তবে তার মুখ থেকে পরবর্তী শব্দটি প্রকাশ করার অবকাশ দেওয়া হবে না। সবার আগে তার মাথায় তরবারি পড়বে। এরপর মাবিয়া তার দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধানকে নির্দেশ দেন : এদের প্রত্যেকের জন্য এক একজন লোক নিয়োগ করে তাকে বলে দাও যে এদের কেউ আমার পক্ষে বা বিপক্ষে মুখ খুললে তার মস্তক যেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাঁদেরকে নিয়ে মসজিদে গমন করে ঘোষণা করেন : এরা মুসলমানদের সর্দার এবং সর্বোত্তম ব্যক্তি। এঁদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজই করা হয় না। এঁরা ইয়াজিদের মনোনয়নে সন্তুষ্ট এবং এরা বায়াত করেছেন। সুতরাং তোমরাও বায়াত করো। কাজেই মক্কাবাসীরাও সবাই বায়াত করে। (ইবনুল আসির, ৩য় খন্ড পৃ. ২৫২)

এমনি করে মিথ্যাচার; ধোঁকাবাজি ও অস্ত্রের বলে ন্যায়পরায়ণতার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম জনতার ভাগ্যে তাদের ইপ্সিত রাজত্ব কায়েম করা সম্ভব হয়নি। মাবিয়া নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন : যেখানে চাবুই যথেষ্ট, সেখানে আমি তরবারি ব্যবহার করিনা এবং যেখানে কথাতেই কার্যোদ্ধার হয় সেখানে চাবুক ব্যবহার করি না। কাহারও সাথে চুল পরিমাণ সম্পর্ক থাকতে আমি তা নষ্ট করি না। অপরে যখন টান দেয়, আমি তখন ঢিল দিই; অপরে ঢিল দিলে আমি টান দেই।"

হিজরি ৬০ সালে অর্থাৎ ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুসাবিয়া পরলোক গমন করলে তার পুত্র ইয়াজিদ দামেস্কের সিংহাসনে আরোহন করে।

দশম অধ্যায়

ইয়াজিদের শাসনকাল

ইয়াজিদের আমলে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা :

ইসলাম ধর্মের নির্দেশাবলীর মান্যতা কোন পর্যায়ে গেলে এর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা ইয়াজিদের মত কোন ব্যক্তিকে মান্যতা কোন পর্যায়ে পেলে এর ক্ষমতায় নিয়ে আসলো তা মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হয়েছে। রসুল (দ.) এর ওফাতের পর থেকে বিভিন্নভাবে ইসলামের মূলনীতির ব্যত্যয় ঘটানোর শেষ পরিণতি ছিল এটাই। উল্লেখিত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নবি (দ.) কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রচারিত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অতুলনীয় আদর্শ শাসন ব্যবস্থা থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত হওয়া কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিল না। বরং এ অবস্থায় পরিবর্তনের পেছনে বেশ কিছু কারণও ছিল, যেগুলো ধীরে ধীরে উম্মতকে রাজতন্ত্র-জুলুমতন্ত্র বা বর্তমানে গণতন্ত্র অথবা যে কোন মতবাদ এদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলে তাই ইসলাম সম্মত বলে মেনে নেওয়ার মন মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। যদিও রসুল (দ.) এর উম্মত হিসাবে বিশ্ববাসীকে ঐশি জ্ঞানের মাধ্যমে আদর্শ শাসন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াই তাদের প্রধান দায়িত্ব হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছে। রসুল (দ.) এর মূল শিক্ষা থেকে রাজতন্ত্রে তথা মাবিয়া ইয়াজিদের শাসনামলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি ছিল। একটির স্থান অপরটি দখল করায় মূলত কি পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

খলিফা নিয়োগের রীতিতে পরিবর্তন :

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবি যেমন আল্লাহ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন তেমনি রসুলের খলিফাও আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ও রসুল কর্তৃক ঘোষিত হয়ে থাকেন। হজরত মুহম্মদ (দ.) তার বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে হজরত আলী (আ.) এর নাম গাদেরিখুমসহ বিভিন্ন জায়গায় ঘোষণা করে ছিলেন। কিন্তু এই নির্দেশ কার্যকর করা হয় নাই। বরং এই পদ্ধতি বা ঘটনা যে সঠিক নয় তা প্রমাণ করার জন্য যে মেধা ও শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে তার কোন সীমা নাই। ফলে ইসলামে খলিফা বা তার উত্তরাধিকারী নিয়োগের ব্যাপারটি একটি চিরস্থায়ি গোলক ধাঁধায় পর্যবসিত হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রকৃত পদ্ধতি সম্বলিত মতবাদ চালু থাকলে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃ হত্যার নিয়ম চালু হতো না। বর্তমানে মুসলমানদের খলিফা নিয়োগের পদ্ধতি এত জটিল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে তা বাস্তবে কার্যকর করার কোন ব্যবস্থা নাই। যেহেতু হজরত আবুবকর (রা.), হজরত ওমর (রা.) ও হজরত ওসমান (রা.) মানুষ হিসেবে ছিলেন অসাধারণ, তারা ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থের বিষয়টি চিন্তা করে অনেক কাজ করেছেন। তাদের সততা, সত্যবাদিতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, ন্যায় পরায়নতা ছিল প্রশ্নাতীত। পক্ষান্তরে মাবিয়ার ব্যক্তিগত ধর্মনিষ্ঠা, সততা ও ইসলামের প্রতি তার মনোভাব উল্লেখ করার মত কোন বিষয় নয়। সেই মাবিয়া হজরত আলী (আ.) মতো মহান ব্যক্তির সাথে ক্ষমতার জন্য যুদ্ধ করেন এবং তলোয়ারের মাধ্যমে তা হাসিল করেন। তার ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে জনগণ যে মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না তা তিনি জানতেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি মোটেও পরোয়া করতেন না। বল প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি শাসন ক্ষমতা চালাতেন বলে তিনি নিজেই ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাই মুসলিম সমাজে চিরস্থায়ি গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য অনেকে তাকে বৈধ শাসক বলে ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছেন। বল প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোন পন্থায় উমাইয়া শাসন খতম করা যাবে এ ধারণা স্বপ্নেও কেহ পোষণ করত না। আর বল প্রয়োগ করার জন্য অন্য কেহ আছে বলেও উমাইয়ারা চিন্তা করার সুযোগ রাখেনি। এ থেকে বাধ্যতামূলক বায়াত এবং বংশধরদের উত্তরাধিকার সূত্রে বাদশাহী লাভের এক স্বতন্ত্র ধারা চালু হয়। আল্লাহর সাথে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোন সম্পর্ক আছে তা মুসলমানদের চিন্তা চেতনা থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমনকি মুসলমানদের স্বাধীন বা অবাধ পরামর্শক্রমেও নয়, বরং বল প্রয়োগের মাধ্যমেই ক্ষমতা দখলের, এক বিধান চালু হয়। বাইয়াতের সাহায্যে ক্ষমতা লাভের পরিবর্তে ক্ষমতার সাহায্যে বাইয়াত হাসিল শুরু হয়। অর্থাৎ বাইয়াত করা না করার ব্যাপারেও মুসলমানগণ স্বাধীন থাকেনি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা এবং অধিষ্ঠিত থাকার

জন্য বাইয়াত লাভ আর শর্ত হিসেবে গণ্য হয়নি। এর ফলে কার্যত মুসলমানেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ক্ষমতার পূজারি হয়েছে।

খলিফাদের জীবন ধারার পরিবর্তন :

রাজতন্ত্রের সূচনা লগ্নে বাদশাহ বেশধারী খলিফারা সিজার ও কাইজারের অনুরূপ জীবন ধারা অবলম্বন করে। পূর্ববর্তী খলিফার চেয়ে তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি ছিল আলাদা। মাবিয়া শাহি মহলে বসবাস শুরু করেন। রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনী তার রাজ প্রাসাদের হেফাজতে নিয়োজিত হয় এবং সর্বদা তার পাহারায় নিযুক্ত থাকে। তার এবং জনগণের মধ্যে দেহরক্ষী ও প্রহরী অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে প্রাথমিক যুগে খলিফাগণ জনগণের মধ্যে বাস করতেন। সেখানে যে কোন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতো। খলিফারা পাঁচ বার মসজিদে ইমামতি করতেন এবং সরকারের পলিসি জনসমক্ষে প্রকাশ করতেন। মাবিয়া নামাজের জন্য মসজিদে আলাদা বেষ্টনী নির্মাণ করান এবং পূর্ববর্তী খলিফাদের সাদাসিধা জীবন পদ্ধতি ত্যাগ করে রোম মডেল গ্রহণ করেন। এই ধারা (অর্থাৎ অমুসলিম রাজা-বাদশাহদের মতো জীবন-যাপন) আজ পর্যন্ত মুসলিম জাতির জন্য এক ধর্মীয় নির্দেশের মত অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। অর্থাৎ এটা যে একটি ধর্ম বিরোধী কাজ সে কথা আজ কেহ মনেই করে না।

বায়তুল মালের মালিকানার পরিবর্তন :

বায়তুলমাল সম্পর্কে প্রথম চার খলিফার সাধারণ নীতি ছিল যে এই সম্পদ খলিফা এবং তাঁর সরকারের নিকট আল্লাহ এবং জনগণের আমানত, তাই একে ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহারের কোন অধিকার নাই। রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা বে-আইনিভাবে তাতে কিছু জমা করতে পারেন না। তা থেকে তার ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করতেও পারে না। মাবিয়ার আমল থেকে বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের এ নীতি আমূল পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তা বাদশাহ ও শাহি বংশের মালিকানাধীন হয়ে পড়ে। প্রজারা পরিণত হয় বাদশার নিছক কর দাতায়।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ-গনিমতের মাল বণ্টনের ব্যাপারেও মাবিয়া আল্লাহর কিতাব এবং রসুলুল্লাহ (দ.) সুস্পষ্ট বিধানের লঙ্ঘন করেন। এ সকল বিধানের আলোকে গনিমতের মালের ৫ ভাগের ১ অংশ বায়তুল মালে জমা করতে হবে অবশিষ্ট চার অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। কিন্তু মাবিয়া গনিমতের মাল থেকে স্বর্ণ-রোপ্য তার জন্য পৃথক করে রেখে, অন্যান্য মাল বণ্টনের নির্দেশ দেন।

এই সময় থেকেই বাদশাহ তথা খলিফার তথাকথিত ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বিভিন্ন রকম জনকল্যাণ মূলক কাজ করার প্রথা চালু হয়। অর্থাৎ কোন পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জন করা হয়েছে সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করার অবকাশ থাকবে না। শুধুমাত্র জনহিতকর কাজ-মসজিদ, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল নির্মাণ করলেই জনগণ রাজাকে ‘মহান’, ‘দাতা’, ‘দয়ালু’ ‘গরিবের বন্ধু’ জনহিতকর কাজে ‘অগ্রগণ্য’, প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করার পদ্ধতি চালু হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান খোদা প্রদত্ত দায়িত্বে এ ধরনের কাজ করবেন নইলে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর কাছে তিনি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন নাই বিধায় আখেরাতে শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী হবেন এই কনসেপ্ট সমাজ থেকে অন্তর্হিত হয়। এই মন মানসিকতা অদ্যাবধি ইসলামি সমাজ জীবনে সগৌরবে চালু আছে। তাছাড়া খলিফা ব্যক্তিগতভাবে এত টাকার মালিক কিভাবে হলেন তাও জনগণের বিবেচনার বাইরে থেকে যায়।

মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতার বিলুপ্তি :

মাবিয়ার আমলে “আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার”– ভাল কাজের নির্দেশ দান ও অন্যায় কাজ থেকে বারন করার স্বাধীনতা হরণ। অথচ ইসলাম এটাকে ফরজ ঘোষণা করেছে। রসুল (দ.) নিজেই তার বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে এ ধরনের কাজকে উৎসাহিত করেছেন।

রাজতন্ত্রের যুগে “প্রশংসার জন্য মুখ খোল, অন্যথায় চুপ থাকো”– এটাই তখন রীতিতে পরিণত হয়। যদি কারো বিবেক এতই শক্তিশালী হয় যে সত্য ভাষণ থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে না তাহলে কারান, প্রাণদন্ড ও

চাবুকের আঘাতের জন্য প্রস্তুত হও। তাই সে সময়ে যারা সত্য ভাষণ ও অন্যায় কাজে বাধা দান থেকে নিবৃত্ত হননি তাদেরকে কঠোরতম শাস্তি দেয়া হয়েছে। সমগ্র জাতিকে ভীত সন্ত্রস্ত তথা আতংকিত করাই ছিল এর লক্ষ্য। এ সম্পর্কে হজরে আদি (রা.) এর হত্যাকান্ডসহ বিভিন্ন ঘটনা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

বংশীয় এবং গোত্রীয় ভাব ধারার উদ্ভব :

রাজতন্ত্রের যুগে অপর যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়, তা ছিল এই যে, জাহেলি যুগের যে সব বংশ-গোত্রীয় ভাবধারা নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণকারী সকল মানুষকে সমান অধিকার দিয়ে এক উম্মতে পরিণত করেছিল। এই সময়ে পূর্বের এসব জাহেলি ধারণা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বনি উমাইয়া সরকার শুরু থেকেই ইসলামি খেলাফত নয় বরং আরব সরকারের রূপ ধারণ করেছিল। আরব মুসলমানদের সাথে অনারব মুসলমানদের সমান অধিকারের ধারণা এ সময় প্রায় অনুপস্থিত ছিল। ফলে তখন হতে মুখতার ও উগ্রতার এক ঊষর মরুভূমি সারা মুসলিম জাহানের সমাজে কার্যকর ও বিস্তার লাভ করেছে। এ কারণেই ইসলাম কবুলের পূর্বে আরবেরা যেমন মন-মানসিকতার পরিচয় দিত। পরেও সেরূপ চিন্তা-চেতনার পরিচয় দিয়া অবদমিত (নেফস নিয়ন্ত্রণ বা চার এ সংশোধন সম্পর্কে) ইচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রসুল ও রসুলের 'আহলে বায়াত' হতে (নফস নিয়ন্ত্রণ বা চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে) তারা কিছু গ্রহণ করে নাই। বরং তাহাদের ধর্ম সম্পর্কে এই ধারণা বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে গৃহীত হয়–

নামাজ পড়ি রোজা করি
বেহেশতে যাব সরাসরি।
এর মধ্যে আবার আল্লাহ-রসুল
আহলে বায়াত কেন ভেবে মরি।

যুদ্ধ ও জেহাদ :

পররাজ্য যারা সামরিক অভিযানের মাধ্যমে দখল করেছে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোককে মুসলমান করতে গিয়েছে তারা আর যাই হোক পুরোপুরি মুসলমান নয়, তা তাদের কান্ডকীর্তি দেখলেই বোঝা যায়। যারা নিজেরাই প্রকৃত পক্ষে মুসলমান নয় তারা অন্যকে কিভাবে মুসলমান করতে পারে? অথচ এই মুসলমান নামধারী জনগোষ্ঠীকে পররাজ্য অভিযানে হামেশা এমন উত্তেজিত ও লোভাতুর করে রাখা হতো যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সম্পদ লালসায় কখনোই বুঝতে পারে নাই যে তারা নিজেরাই পুরোপুরি মুসলমান নয়। এই কারণে মুসলমানদের রাজ্য বিস্তার ও ধর্মান্তরিত হওয়ার হারের কোন সংগতি নাই। অথচ এই ধরনের লোকদেরকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা আদর্শ মুসলমান মনে করে এক মহা ভ্রান্তিতে পড়ে গেছে। এই সব আক্রমণকারীদের কার্যকলাপের জন্যই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পৃথিবীতে সকল প্রকার বিভ্রান্তি, দুর্নাম, অপযশ ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তা যে কোন ইতিহাসের ছাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। তবে সৌভাগ্যবশত ইরাক, ইরান ও ভারতে কিছু সংখ্যক আল্লাহর মহান অলিদের উছিলায় লোক প্রকৃত দ্বীন ইসলামের স্বাদ অনুভব করেছে।

যুদ্ধের এই গভীর কুফল অনুধাবন করেই হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রা.) যুদ্ধের মাধ্যমে নতুন এলাকা জয়ের নীতি ত্যাগ করে নিজ পরিবারের লোকদেরকে প্রকৃত মুসলমান বানানোর জেহাদে শাহাদত বরণ করেন।

আইনের সার্বভৌমত্বের অবসান :

রাজতান্ত্রিক শাসনামলে মুসলমানদের ওপর সবচেয়ে বড় যে বিপদ নিপতিত হয়, তা হচ্ছে এই যে, সে সময় আইনের প্রাধান্যের নীতি ভঙ্গ করা হয়। ইসলাম যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে শরিয়ত তথা আইন সব কিছুর ঊর্ধ্বে, সকলের ওপরে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপ্রধান শাসক এবং শাসিত ছোট-বড় সাধারণ অসাধারণ সকলেই শরিয়তের অধীন। কেউ শরিয়তের ঊর্ধ্বে নয়, নয়-কেউ ব্যতিক্রম। শত্রু হোক বা মিত্র হোক, যুদ্ধে লিপ্ত কাফের হোক বা চুক্তিবদ্ধ কাফের, মুসলিম-প্রজা, জিম্মি-প্রজা, রাষ্ট্রের অনুগত মুসলমান, যুদ্ধে লিপ্ত বিদ্রোহি– এক কথায় যে কেহ যে কোন ধরনের আচরণই করুক না কেন তার সাথে শরিয়ত যে ধরনের আচরনের বা

বিচারের বিধান দিয়েছে তার সাথে ঠিক সেইরূপ আচরণ করার জন্য সরকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অন্য কোন পন্থা নয় ।

কিন্তু এ সময়ে উমাইয়ারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ করে নিজেদের শাসন পাকাপোক্ত করার ব্যাপারে শরিয়ত নির্ধারিত বিধি-বিধান লঙ্ঘন এবং তার সীমারেখা অতিক্রমে কুণ্ঠাবোধ করেনি। যদিও সে সময়ে সে দেশের ঘোষিত আইন ইসলামিই ছিল, তাদের কেহই আল্লাহর কিতাব এবং রসুল (দ.) এর সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা অস্বীকার করেননি। কিন্তু বাস্তবে বাদশাহের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি দ্বীন শরিয়তের অনুবর্তী ছিল না। বৈধ-অবৈধ সকল উপায়ে তাদের স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করে রাষ্ট্রের দাবি মেটাতেন। অন্য কথায় রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের হাতে অন্যকে শোষণের বা জুলুম করার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। এ ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পার্থক্য তারা করতেন না।

মাবিয়া তার গভর্নরদেরকে আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দেন এবং তাদের বাড়াবাড়ির জন্য শরিয়তের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্পষ্টত অস্বীকৃতি জানান। তার গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে গাইলন একবার বসরার মিম্বরে দাঁড়িয়ে খোতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তার দিকে কংকর নিক্ষেপ করে। এতে তিনি তাকে গ্রেফতার করে তার হাত কেটে ফেলেন। অথচ শরিয়তের বিধান অনুযায়ী এটা এমন কোন অপরাধ ছিল না, যার জন্য কারো হাত কাটা যায়। মাবিয়ার কাছে সু-বিচার দাবি করা হলে তিনি বলেন আমি বায়তুল মাল থেকে হাতের দিয়াত (ক্ষতি পূরণ) আদায় করবো কিন্তু গভর্নর থেকে কিসাস গ্রহণের কোন উপায় নাই। অনুরূপভাবে কুফার গভর্নর জিয়াদ এ ধরনের অপরাধে একই শাস্তি দিয়েছিলেন। অথচ পবিত্র কোরানের বিধান অনুযায়ী "হাতের বদলে হাত চোখের বদলে চোখ– এ বদলা নেয়ার বিধান আছে।

গভর্নরদের কর্মকান্ডে এ ধরনের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা প্রদান তথা তাদের স্বেচ্ছাচারিতামূলক কার্যক্রমকে আইনের ঊর্ধ্বে রাখা হলে তা কি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

উমাইয়া রাজত্ব খোদায়ি অভিশাপ :

উমাইয়াদের ক্ষমতাসীন হওয়া যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ বাস্তবায়ন না করার জন্য খোদায়ি গজব হিসেবে উম্মতে মোহাম্মদীর ওপর আপতিত হয়েছিল তার প্রমাণ পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

"স্বপ্ন যাহা আপনাকে আমরা দেখাইয়াছি, তাহা এবং শজরে মালাউন অভিশপ্ত বৃক্ষ যাহার ওপর পবিত্র গ্রন্থে অভিসম্পাত দেওয়া হইয়াছে। উহা লোকদের জন্য এক মহা বিপদ। (বনি ইসরাইল–৬০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি তাহার বিখ্যাত দুররে মনসুর তফসিরে লিখেছেন: রসুল (দ.) বনি উমাইয়া কওমকে বাঁদরের আকৃতিতে দর্শন করেন। যারা লাফ দিয়ে তাঁর মেম্বার শরিফের ওপর আরোহন করিতেছিল। ইহার মমার্থ

এই ছিল যে, উমাইয়াগণ রসুল (দ.) এর পর সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের নেতা হয়ে বসবে। রসুল (দ.) ইহাকে আহলে বায়াত ও প্রকৃত ঈমানদারদের জন্য এক ভয়াবহ বিপদ বলে গণ্য করলেন, মনে রাখতে হবে নবিদের স্বপ্নও এক ধরনের ওহি। তাছাড়া রসুল (দ.) কে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানানো হয়েছিল যে কারণে তিনি এত মর্মাহত হয়েছিলেন যে ওফাতের পূর্বে কখনও হাসেন নাই। (আলে রসুল ও মাবিয়া। মঞ্জুর আলম কাদেরি, পৃ. ২২০)।

রসুল (দ.) এর ভবিষ্যৎবাণীর অপব্যাখ্যা :

রসুল (দ.) তার অনন্ত জ্ঞানে অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় জানতেন। উম্মতগণের সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণের সুবিধার্থে অনেক ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন যা পরবর্তীতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু রসুল (দ.) এই বিষয়টি অবহিত ছিলেন তাই বিষয়টিতে তাঁর অনুমোদন রয়েছে মর্মে হাদিসের এ ধরনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে উমাইয়াদের সকল ধরনের অপকর্মকে এক ধরনের ইসলামি লেবাস দেওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে কারবালার ঘটনা রসুল (দ.) মূল ঘটনা ঘটার বহু পূর্বে ভবিষ্যদ্বানি করে

ছিলেন, তাই এই জঘন্যতম নিষ্ঠুরতার জন্য ইয়াজিদের কোন দায়দায়িত্ব নাই মুসলিম সমাজে এ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য উমাইয়াদের কিছু তথাকথিত উলামাগণ এ ধরনের যুক্তি জাল বিস্তার করে। বর্তমানেও তাদের মতানুসারী কিছু ব্যক্তিবর্গ এ তত্ত্ব বা মতবাদ সঠিক বলে মনে করে।

ইয়াজিদের আমলে মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্তি :

হজরত হোসাইন (আ.) দ্বীন-ইসলামের 'জীবন্ত প্রতিচ্ছবি', পবিত্র কোরআনে এই আহলে বায়াতগণকে মহাপবিত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ হোসাইন (আ.) চির পবিত্র ছিলেন বিধায় তিনি নফস বা প্রবৃত্তির তাড়না থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তাই ব্যক্তিগত ক্ষমতা বা অন্য কোন পার্থিব আকর্ষণে কোন কাজ করা তাঁর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আল্লাহর নির্দেশে রসুল (দ.) তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে যাদের নাম ঘোষণা করেছেন হজরত হোসাইন (আ.) তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (হজরত আবু জর গিফারির বক্তব্য উল্লেখ্য)। রসুল (দ.) তাঁর ওফাতের পর উম্মতে মুহাম্মদীর হেদায়েতের জন্য পুস্তকাকারে কোরআন-নির্বাক কোরআন ও সবাক কোরআন হিসেবে 'আহলে বায়াতগণ'কে রেখে গিয়েছেন মর্মে ঘোষণা করেছেন। তাই ইহকালে ও পরকালে সকল প্রকার কল্যাণ ও পথ নির্দেশনার জন্য সেই জটিল পরিস্থিতিতে হজরত হোসাইন (আ.) কে অনুসরণ করা সব মুসলমানের জন্য ফরজ ছিল। ওপরুন্ত হজরত হোসাইন (আ.) কে বেহেশতের সর্দার হিসেবে ঘোষণা করায় তার অনুমোদন ব্যতীত কেহ বেহেশতে যেতে পারবে না ইহা একটি স্থির নিশ্চিত ব্যাপার।

উল্লেখিত কারণেও ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে হজরত হোসাইন (আ.) কে অনুসরণ করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। এছাড়া তদানীন্তন সামাজিক প্রক্রিয়ায় হজরত আলী (আ.) সকল দিক থেকেই ইসলামের বৈধ খলিফা ছিলেন। তাঁর ওফাতের পর হজরত হাসান (আ.) ইসলামের বৈধ খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি বিশেষ জরুরি পরিস্থিতিতে মাবিয়ার সাথে চুক্তি করেছিলেন। তার অন্যতম শর্ত ছিল মাবিয়ার পর খেলাফতের দায়িত্ব হজরত হোসাইন (আ.) ওপর বর্তাবে।

উল্লেখিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে একথা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যায় যে হজরত হোসাইন (আ.) মাবিয়ার পর তদানীন্তন সময়ে ইসলামি বিশ্বের ধর্মীয় ও পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে একমাত্র বৈধ খলিফা নেতা-তথা আমিরুল মোমেনিন ছিলেন। তাই তাঁকে অনুসরণ অনুকরণ ও তার নির্দেশ পালন সকল ব্যক্তির জন্য ফরজ বা অবশ্য পালনীয় ছিল। রসুল (দ.) এরপর আহলে বায়াত তথা কোরআন-এ-নাতেক বা সবাক কোরআনের সাথে আল্লাহর রসুল (দ.) এর নির্দেশ মোতাবেক সঠিক ব্যবহার করার পরীক্ষায় মাবিয়া সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার ন্যায়-নীতি ও সততার দাবি অনুযায়ী একজন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আল্লাহর রসুল (দ.) এর বৈধ প্রতিনিধি ও আমিরুল মোমেনিনের সাথে সম্পাদিত চুক্তি নামা লঙ্ঘন করেন তাছাড়া সকল প্রকার ধর্মীয় ও প্রচলিত রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে নিজ গোত্রের হাতে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে বল প্রয়োগ, ঘুষ, দুর্নীতি, মিথ্যাচার ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তার দুরাচার, লম্পট, নাস্তিক পুত্রকে মুসলমানদের রাজা মনোনয়ন করে তিনি ধর্মদ্রোহিতার মত অমার্জনীয় অপরাধ ও মুসলমান উম্মাহর জন্য অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন। কিন্তু তদানীন্তন মুসলিম সমাজে ধর্মীয় বিভ্রান্তি জনিত কারণে এবং উমাইয়াদের শ্বেত সন্ত্রাসের ভয়ে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা রসুলের (দ.) এর ধর্মীয় বিধান রক্ষা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলো। ইয়াজিদ বাস্তবিক পক্ষে বিনা বাধায় ৬৮০ সালে মুসলিম সাম্রাজ্যের অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী ব্যক্তি হয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

অবৈধ ক্ষমতার অধিকারীরা সব সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে বিধায় তারা সমাজের ক্ষমতার প্রভাব বলয়ে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে নিরঙ্কুশ আনুগত্য দাবি করে থাকে। 'বাইয়াত' শব্দের অর্থ হলো বিক্রি হওয়া, বিনিত হওয়া অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকারকারী ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় কাজ করার স্বাধীনতা বর্জন করার নামই বাইয়াত। অর্থাৎ এই আনুগত্যের ফলশ্রুতিতে কেহ কোন প্রশ্ন না করে নিজের জীবন বিসর্জনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় তথা ক্ষমতাসীনদের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃত পদ্ধতি ছিল বাইয়াত বা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি (Oath of Allegianace) এর মমার্থ ছিল শপথকারী স্রষ্টার নামে এই মর্মে শপথ করবে যে কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির বিরোধিতা করবে না। তদানীন্তন

সময়ে প্রকৃত মুসলমানগণ মিথ্যা কথার কৌশল রপ্ত করতে সক্ষম ছিলেন না বলে বিভিন্ন কথার মারপ্যাঁচে তা অস্বীকার করা বা বাইয়াত করার পর প্রাণের ভয়ে বা বস্তুগত সুবিধার জন্য তা প্রত্যাখ্যান করা ধর্মীয় দিক থেকে প্রায় অসম্ভব ও সামাজিক দিক থেকে খুব কষ্টকর ছিল। কারণ তদানীন্তন সামাজিক রীতি অনুযায়ী বাইয়াত ভঙ্গকারীর স্ত্রী তালাক হয়ে যেত এবং দাসদাসী থাকলে তারা মুক্ত হয়ে যেতো। মোটের ওপর তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে এক মহা ক্ষতির মধ্যে আপতিত হতেন। সর্বোপরি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে কোন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তির কাছ হতে এ ধরনের বাইয়াত গ্রহণকে ক্ষমতা দখলকারীরা এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুমোদন হিসেবে বিবেচনা করতো।

এ কারণেই তাদের কাছে তাদের বাইয়াতের ব্যাপারটি অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত হতো। আমিরুল মোমেনিন হজরত হোসাইন (আ.) কে এই কারণেই ক্ষমতা জবর দখলকারী ইয়াজিদ বাইয়াত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। হজরত হোসাইন (আ.) এমন এক পরিস্থিতির শিকার যার বিরোধীর আয়ত্তাধীন রয়েছে 'আদর্শ', 'ধম', 'কোরআন', 'সম্পদ', 'তরবারি', 'প্রচার মাধ্যম', 'জনতা' এবং নবি (দ.) এর মিথ্যা উত্তরাধিকার।

হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) রসুল (দ.) এর একমাত্র জাহেরি ও বাতেনি ক্ষমতার প্রতিনিধি ও বেহেশতের সম্রাজ্ঞীর পুত্র। নিজে বেহেশতের সর্দার, জীবন্ত কোরআন ও সাক্ষাৎ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ এর প্রতিচ্ছবি। তিনি কেমন করে অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীর পুত্র, বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়োজিত রাষ্ট্রপ্রধান, ইসলামের প্রকাশ্য দুশমনকে কিভাবে, কোন যুক্তিতে রসুল (দ.) বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে, তথা আমিরুল মমামেনিন হিসেবে, কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যাকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ধর্মের সংরক্ষক হিসেবে মেনে নিতে পারেন। তিনি কিভাবে ইয়াজিদের মতো দুশ্চরিত্র, পানাসক্ত, ধর্মহীন, ফাসেক ও কাফের ব্যক্তির রাজত্ব মেনে নিতে পারেন ? কখনো নয়। তাছাড়া সুরা আহজাবের নবম রুকুতে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন।" তিনি আকাশ-ধরিত্রীর নিকট তাঁহার আমানত রক্ষার গুরুভার অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আকাশ-ধরিত্রী এই গুরুভার গ্রহণ করিতে আতংকিত হয়ে এদের অপারগতার কথা নিবেদন করিল। অথচ মানব নির্ভয়ে এই মহাভার মাথায় গ্রহণ করল।" কোরআন বিশেষজ্ঞগণ বলেন এই 'আমানত' বলিতে বুঝায় পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদত করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে, তার বন্দেগিতে আত্মনিয়োজিত থাকা। আমিরুল মোমেনিন হজরত হোসাইন (আ.) এই আমানতের মহান উত্তরাধিকারী। তাই যে কোন মূল্যে তাঁকে এই আমানত রক্ষা করতেই হবে।

আত্মদান একটি পবিত্র ধর্মীয় দায়িত্ব :

হজরত হোসাইন (আ.) আত্মদানের কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের পবিত্র কোরআনের সুরা 'রাদ' এর ৩ নং আয়াত পর্যালোচনা করতে হবে। উক্ত আয়াতে এরশাদ হচ্ছে : আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়ার পর যারা তা ভেংগে দেয় এবং আল্লাহ যে সব সম্পর্ক সুদৃঢ় করার আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে ও পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যপৃত করে তাদের ওপরই আল্লাহর অভিশাপ এবং তাদের জন্য জঘন্যতম ঠিকানা রয়েছে।

এখানে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে মানব সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পক্ষে যে সমস্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেই সমস্তগুলোকে বুঝানো হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, বন্ধু ও প্রতিবেশির সম্পর্ক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিধান বা বিভিন্ন দেশ বা সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা প্রকৃতপক্ষে মানব সভ্যতার ভিত্তিই হলো এই সব সম্পর্কের ভারসাম্যপূর্ণ ও সামাঞ্জস্যতা।

পৃথিবীতে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা এসব সম্পর্ক ও পদ্ধতির সূচারুরূপে চালু থাকা ও তা টিকে থাকার ওপরই নির্ভরশীল। এগুলোকে বিনষ্ট করে দেওয়ার ফলে পৃথিবীতে যুদ্ধ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। এজন্য আল্লাহ এগুলোকে বিনষ্ট করাকেই 'ফাসাদ' নামে অভিহিত করেছেন এবং এর জন্য হুশিয়ারী দিয়েছেন।

যে শাসন তথা রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষমতাকে মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরিবর্তে জুলুম অবিচার ও লুটতরাজ চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয় তাকেও 'ফাসাদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। উল্লেখিত চরিত্রের লোকেরা ক্ষমতাসীন হলে ফাসাদ সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "সে যখন শাসকের আসনে বসে তখন পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করতে সচেষ্ট হয় এবং ফসল এবং প্রাণীকুলকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয় অথচ আল্লাহ ফাসাদ ভালোবাসেন না।" (বাকারাহ - ২৫)

আল্লাহর পথ অবরোধ করাকেও 'ফাসাদ' হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা এমন একটা অপরাধ যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রয়োজন। আল্লাহর পথ অর্থ সত্য দ্বীন ইসলামকে 'পথ' হিসেবে অভিহিত করা পবিত্র কোরআনের একটি চমৎকার ভঙ্গী বিশেষ । অর্থাৎ ইসলাম যেন একটি সরাসরি রাস্তা যা সরাসরি আল্লাহর কাছে নিয়ে যায় এবং এর ওপরে স্থানে স্থানে শয়তান ও তার অনুচরের রাহাজানি-হাইজ্যাক করার জন্য ওৎপেতে বসে থাকে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে কোরআনে বর্ণিত ফেৎনা ও ফাসাদের তাৎপর্য বুঝা গেল। এবার যদি ফেৎনা ও ফাসাদ নামে অভিহিত অপরাধমূলক কাজগুলোর ওপর একটু নজর বুলানো হয় তা হলেই পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, এই খোদাদ্রোহী ও অসদাচারী সরকার ঐসবগুলোর উৎস।

যে সরকার অন্যায় ও অধর্ম কাজের পৃষ্ঠপোষকতা করে তা নিজস্বভাবেই একটি ফেতনা। একটি অবাঞ্ছিত অনাসৃষ্টি, বিড়ম্বনা। কেননা সরকার যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়ে থাকে এর অস্তিত্ব তার পরিপন্থী। তার খারাপ প্রভাব কোন একটি দিকে সীমিত থাকেনা বরং তা হয়ে ওঠে সকল খারাপ কাজের উৎস ও অমঙ্গলের উৎস। ফেতনা ও ফাসাদের সকল শাখা প্রশাখার বিস্তার ঘটে এই বিষবৃক্ষ থেকেই। আল্লাহর পথ অবরোধের মত জঘন্য কাজে আশ্রয় ও প্রশ্রয় এই সরকার থেকেই আসে। সত্য ও ন্যায়ের উৎখাত ও উচ্ছেদের কাজও চলে এর তত্ত্বাবধানে। পাপী ও জালেমরা যাবতীয় শয়তানী খোদাদ্রোহিতা ও অপকর্মের উৎসাহ পায় এর কাছ থেকেই। একই উদ্যোগে চালু হয় চরিত্র ধ্বংসকারী এবং সামাজিক ন্যায় বিচার খতমকারী কালা কানুন। এই ধরনের সরকারই মানবজাতির মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের বীজ বোনে। পৃথিবীতে যুদ্ধ ও নারকীয়তার হিংস্রতার আগুণ জ্বলে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে নেমে আসে প্রতিহিংসার অভিশাপ ও ধ্বংসের বিভীষিকা। মোট কথা এই সরকারই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার শক্তি কোন না কোন প্রকারে প্রত্যেক অন্যায় ও পাপাচারের উপলক্ষ্য বা তার প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির কারণ হয়ে থাকে।

এই প্রেক্ষাপটেই ইসলাম যাবতীয় অন্যায় ও অসততার নির্মূল ও প্রতিহত করার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেছে। সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম দ্বারা এবং প্রয়োজন হলে সহস্র সংস্রামের মাধ্যমে এ ধরনের অসত্যাশ্রয়ী সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উৎখাত করতে হবে। অতঃপর তার স্থলে আল্লাহর ভয় ও নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে সেই ন্যায় নীতি ও ন্যায় বিচার ভিত্তিক সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণি ও জাতিগত স্বার্থের তল্পীবাহক হবে না বরং তা হবে সত্যিকার মানবতার স্বার্থরক্ষক, সেবক ও কল্যাণকামী। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হবে সত্য ও ন্যায়ের বিকাশ সাধন এবং সকল প্রকার অন্যায় ও অসত্যের উচ্ছেদ। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্মী হবে কেবল সেই পুণ্যবান মানুষ যারা নিজ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং অহংকার ও বড়াই জাহির করার জন্য নয় বরং মানবতার কল্যাণ ও সন্তুষ্টি সাধনের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

পবিত্র কোরআনের অমোঘ নির্দেশ হলো স্বৈরাচারী ও হঠকারীর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা। মানুষকে বলা হয়েছে এ ধরনের ক্ষমতাসীন লোকের আনুগত্য না মানতে। কোথায়ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–

"সই সব উচ্ছৃঙ্খল লোকের আনুগত্য করো না যারা, পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করে; সংশোধনমূলক কাজ করে না।" (সুরা শোয়ারা - ৮)

কোথায়ও এরশাদ হয়েছে– "যার মনকে আমি আমার স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি যে আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার আদেশ বাড়াবাড়ির নামান্তর, তার আনুগত্য করো না। (সুরা কাহাফ-৪)।

আবার পবিত্র কোরআনে "ধ্বংসের অন্যতম কারণ হিসেবে স্বৈরাচারীর আনুগত্যকে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে–

"তারা প্রত্যেক হঠকারী খোদাদ্রোহীর কথা মেনে চলতো (কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতো) এজন্য এ দুনিয়াতেও তাদের ওপর অভিশাপ পড়েছে, কিয়ামতের দিনও পড়বে।" (সুরা হুদ - ৫)।

এ কারণেই ইসলামের দৃষ্টিতে একজন আদর্শ মানুষের কর্তব্য হলো নিজের যে শক্তি আছে তা দিয়ে সমগ্র মানব জাতির মুক্তির জন্য চেষ্টা করা, মানব জাতির নৈতিক, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর করার জন্য সংগ্রাম করা এবং যাবতীয় শোষণ, অন্যায়, অনাচার-জুলুম-অবিচার ও অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে যুদ্ধ করা এবং যতদিন ঐ সব পৈশাচিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে উৎখাত না হয় ততদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। এই প্রেক্ষাপটে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

"এভাবে আমি তোমাদের একটি সুমহান ও শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে তৈরি করেছি যেন তোমরা মানব জাতির সামনে সত্যের সাক্ষী হও এবং রসুল ও তোমাদের সামনে সাক্ষী হয়ে দাঁড়ান"। (বাকারা-১৭)

আল্লাহর পথে যেমন জেহাদ করা উচিত সেইভাবে জেহাদ কর। তিনি তোমাদেরকে একাজের জন্য মনোনীত করেছেন, তিনি তোমাদের ওপর ইসলামের সীমার মধ্যে কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। এটা হলো তোমাদের মহান পিতৃ পুরুষ ইব্রাহিম (আ.) এর আদর্শ। আল্লাহ এ গ্রন্থে এবং এর আগে তোমাদের নাম মুসলমান (অনুগত, আত্ম নিবেদিত) রেখেছেন যেন, রসুল (দ.) তোমাদের ওপর সাক্ষী হন এবং তোমরাও দুনিয়ার মানুষের ওপর সাক্ষী হও। অতএব, তোমরা নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও ও আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক (কোন অবস্থাতেই অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করো না)। (সুরা আল হজ্ব-১০)

পরস্পর বিশ্লেষণকারী উপরোক্ত আয়াত দুটি পড়লে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এখানে মুসলমানদের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে সেই বিশ্বজনীন মানব সেবাকেই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, যে গোষ্ঠীটিকে চরম উগ্রতা ও চরম শৈথিল্যের মধ্যবর্তী ন্যায়নীতি ও সুবিচারের পথে চালিত করা হয়েছে-তোমরাই সেই গোষ্ঠী। আল্লাহ তোমাদেরকে এই বিশেষ কাজটির জন্য মনোনীত করেছেন যে তোমরা আপন কাজ ও কথার দ্বারা সত্যের সাক্ষ্য দেবে এবং দুনিয়াতে সত্যের জীবন্ত প্রতীক বা সাক্ষী হয়ে থাকবে যেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমাদের কথাবার্তা ও আচরণ পদ্ধতি দ্বারা দুনিয়াবাসী বুঝতে পারে কোনটা সত্য, কোনটা ন্যায়, কিসের নাম ন্যায়-বিচার আর কাকে বলে সততা, বা প্রকৃত ধৈর্যশীল বলতে কোন অবস্থাকে বুঝায়। এটাই সত্যের সাক্ষ্য এবং এটাই তোমাদের জীবনের লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই তোমাদের এ আদর্শের নাম দেওয়া হয়েছে 'মুসলিম' বা আনুগত্যকারী। এই প্রেক্ষাপটেই ইসলামের স্বভাবগত দাবি এই যে তাদেরকে সমগ্র মানবতার সেবক হয়ে থাকতে হবে। আমাদের আরো ভেবে দেখতে হবে যে, মুসলমানদের করণীয় সেই 'আম' সেবামূলক কাজ কি। কোরআনের ভাষায় "আমর বিন মারুফও .... নাহি আনিল মুনকার" -(সৎ কাজে আদেশ অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এই সেবার প্রকৃতি ও তাৎপর্য গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। 'মারুফ' আভিধানিক অর্থে যে কোন চেনা বা জানা জিনিসকে বলা হয়। আর পারিভাষিক অর্থে এমন যে কোন কাজ– যা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির নিকটে সুপরিচিত; মানুষের সুস্থ ও বিকারমুক্ত মন যাকে ভাল বলে জানে এবং যা দেখে প্রত্যেক মানুষের মন বিনা বাধায় বলে ওঠে বস্তুত এটা ভালো কাজ। ঠিক এর বিপরীত হলো 'মুনকার' শব্দটি। আরবি অভিধানে এর অর্থ অজানা ও অচেনা। পারিভাষিক অর্থে যা সুস্থ বুদ্ধির কাছে অবাঞ্ছিত, সুস্থ বিবেক যাকে খারাপ মনে করে এবং সাধারণ মানুষ যা অপছন্দ করে সেটাই মুনকার। বিশ্বস্ততা, সততা, সত্যবাদিতা, সংযম, দায়িত্ব সচেতনতা অনাথ-দুর্বলের সাহায্য, বিপন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি, মজলুমদের সহায়তা, ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা .... এবং নিজের অধিকার সমূহ বুঝা ও তা প্রদান করা এবং এমনি ধরনের আরো বহু গুণ বা বৈশিষ্ট্য মারুফের অন্তর্গত। এগুলোকে নিজে বাস্তবায়িত করা এবং অন্যদেরকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার নাম "আমর বিন মারুফ"। পক্ষান্তরে বিশ্বাসঘাতকতা পরসু অপহরণ ও আত্মসাৎ, ব্যাভিচার, মিথ্যাচার, বিভেদ-বিশৃকংখলা ও নৈরাজ্য বিস্তার বেইনসাফি, সীমালঙ্ঘন করা, অন্যদের অধিকার হরণ করা, অন্যায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা করা, সত্য ও ন্যায়কে দাবিয়ে রাখা, দুর্বল ও অসহায়দের কষ্ট দেওয়া, ইত্যাকার যাবতীয় মানবতা বিরোধী– বিবেক বিরোধী কাজ মুনকার। এ গুলো থেকে নিজে বিরত থাকা এবং অন্যদের বিরত রাখার নাম "নাহি আনিল মুনকার"।

সুরা হজের "আমর .... মুনকার" আয়াতের মর্মানুযায়ী নিজের ভালো হওয়া ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা সর্বোচ্চ অধিকারের দাবি রাখে। অন্যদেরকে ভালো হিসেবে গঠন করা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখার স্থান তার পরেই। বস্তুত অন্যকে ভালো করতে হলে আগে নিজের ভালো হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু মহত্বের বিচারে ভালো কাজের বিস্তার ঘটানো ও মন্দ কাজ রোধ করাটাও নিজের ভালো হওয়া ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার চাইতে মহৎ কাজ। কেননা একটি হলো আত্ম সেবা, অপরটি হলো পরোপকার। একটি মানবতার প্রাথমিক স্তর, অপরটি পূর্ণাঙ্গ মানবতা। অবশ্য নিজে সৎ কাজ করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা যে একটি ভাল কাজ এবং মহৎ স্বভাব তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মহত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন এবং শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যতক্ষণ না সে অন্যদেরকে সৎ কর্মশীল হতে উদ্বুদ্ধ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এটা মানুষের সহজাত বৃত্তি যে, সে কোন জিনিস অপছন্দ হলে তা বর্জন করে। অপছন্দের চেয়ে আর এক ধাপ উপরে ওঠে যদি সে তা ঘৃণা করে তা হলে ঐ কাজটি দেখা বা শুনা সহ্য করবে না। আর ঘৃণার চেয়ে আর এক ধাপ উপরে ওঠে যদি শত্রুতার সৃষ্টি হয় তা হলে সে তাকে নিশ্চিহ্ন ও নির্মুল করার জন্য ওঠে পড়ে লেগে যাবে। আর যদি শত্রুতা ও নিছক নাম মাত্র শত্রুতার পর্যায়ে না থাকে বরং প্রচন্ড ধরনের আক্রোশ ও প্রতিহিংসার রূপ ধারণ করে তাহলে সে তাকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করবে এবং এমনভাবে তার পেছনে লাগবে যে তাকে নিশ্চিহ্ন করে না দেওয়া পর্যন্ত তার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। পক্ষান্তরে যখন সে কোন জিনিসকে পছন্দ করে তখন তা সে নিজে গ্রহণ করে। যখন তাকে ভালোবাসে তখন তাকে দেখে ও তার কথা শুনে আনন্দ পায়। যখন ভালোবাসা প্রেম ও আসক্তির পর্যায়ে উন্নীত হয়, যেন সে পৃথিবীর সর্বত্র আর প্রেমাস্পদের প্রতিকৃতি বা প্রতিবিম্ব শোভা পাক এবং হারানোর একটি মুহূর্তেও সে ছাড়া অন্য কারো চেহারা দর্শনে ও স্মৃতি চারনে ব্যয়িত না হোক। তারপর সেই প্রেম যদি আরো উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়ে আত্মোৎসর্গের ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে তাহলে সে আপন জীবনকে তারই সেবায় নিয়োজিত করে এবং তারজন্য নিজের জান, মাল, ইজ্জত, সম্মান সবই উৎসর্গ করে দেয়। সুতরাং "আমর বিল মারুফ" কথাটা আসলে ন্যায় ও সত্যের প্রতি চরম ও পরম আসক্তিরই নামান্তর। আর "নাহি আনিল মুনকার" হলো অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণা বিদ্বেষ ও আক্রোশ । যিনি 'মারুফ' বা সৎ কাজের আদেশ করেন তিনি আসলে সততা ও ন্যায়নীতির প্রতি আসক্ত ও উৎসগীকৃত হয়ে থাকেন। আর 'মুনকার' তথা অন্যায় ও অসত্য থেকে যিনি নিষেধ করেন তিনি শুধু অন্যায় থেকে সংযমকারী ও তার প্রতিরোধকারী হন না বরং তার ধ্বংসকামীও হয়ে থাকেন। এই প্রেক্ষাপটেই রসুল (দ.) বলেছেন– "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন দুস্কর্ম হতে দেখবে তার উচিত তা হাত দিয়ে পাল্টে দেয়া। যদি তা না পারে তবে মুখ দিয়ে। যদি তাও না পারে আন্তরিকভাবে উক্ত কাজটিকে ঘৃণা করে।"

"আমর বিন মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের" ভিত্তি হিসেবে আরো একটি মনোবৃত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা হলো মানবপ্রেম ও মানব হিতৈষণার মনোবৃত্তি। স্বার্থপর মানুষ আল্লাহর যে নেয়ামত লাভ করে তা একাই ভোগ করে। অন্য কাউকে ভাগ দিতে চায় না। অনুরূপভাবে সে নিজে কোন বিপদে পড়লে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিন্তু অন্য কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানব হিতৈষী ও মানব প্রেমিক; সে নিজের সুখ ও সম্পদে সকলকে অংশীদার করে সকলের মধ্যে তা বন্টন করে এবং নিজের বিপদে যেমন অস্থির হয় তেমনি অন্যের বিপদ আপদেও ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে পড়ে। এই পরস্পর বিরোধী স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিশীলতাকে আমরা সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বস্তুগত লাভালাভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার জগতে এই গুণ সমূহের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষ আরো প্রচন্ড ও আরো সাংঘাতিক। যেহেতু মানুষের বস্তুগত শুভাশুভ ও কল্যাণ অকল্যাণ তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অনুসারী । তাই এই গুণাবলীর সংঘাত সত্যিকারভাবে দুই জগতেই দেখা দিয়ে থাকে। একজন সত্যিকার মানব প্রেমিক ও মানব হিতৈষী কেবল নিজে সৎ হয়েই সন্তুষ্ট হতে পারে না। যে যতক্ষণ ভ্রাতৃপ্রতিম মানব জাতিকে অন্যায় ও অসত্যের কৃংখল থেকে মুক্তি দিয়ে সততার পথে চালিত করতে না পারবে ততক্ষণ সে স্বস্তি পায় না। তার অন্য এক ভাইকে পাপে ও অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখে তার আত্মা অস্থির ও অশান্ত হয়ে ওঠে। জননী যেমন নিজের সন্তানকে বিপদগামী দেখে অধীর হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে একজন আদর্শবান মানুষ অন্য মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের

পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেখে বেদনায় মুষড়ে পড়েন, মর্মাহত হন। তিনি যখন কোন জিনিসের মধ্যে নিভৃত মহত্বের/কল্যাণের সন্ধান পান তখন তার মন চায় যে, সকল মানুষ তা দ্বারা উপকৃত হোক। পক্ষান্তরে যখন তিনি কোন জিনিসে নিভৃত অশুভ ও অকল্যাণ দেখতে পান তখন তিনি চান যে, একটি মানুষও যেন তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হতে পারে। তিনি মর্মে মর্মে উপলদ্ধি করেন যে কোন জিনিস যদি ভালো ও কল্যাণকর হয়ে থাকে তবে তা শুধু আমার জন্য কল্যাণকর নয় সকলের জন্য ভালো, সকলের জন্য কল্যানকর এবং সকল মানুষের কাছে এ উপলদ্ধিটুকু পৌছে দেয়া আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। অনুরূপভাবে ক্ষতিকারক ও খারাপ জিনিসের উপলদ্ধিও অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি থাকেন বদ্ধ পরিকর।

এই পর্যালোচনার আলোকে হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) এর কর্মকান্ডকে বিশ্লেষণ করতে হবে। তিনি নিভৃতভাবে ইয়াজিদের রাজত্বের কুফল সম্বন্ধে তাঁর শরিয়তি ও বেলায়তি জ্ঞানের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন। এবং সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ইয়াজিদ যে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের নেতা হওয়ার যোগ্য নয় তাও বলেছিলেন। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য আহলে বায়াতের এই মহান ব্যক্তিত্বের মহা মূল্যবান কথার কোন গুরুত্ব না দেওয়ায় মদিনার লোকেরা যুদ্ধের পরিণতি ভোগ করছে আর তার জের মুসলিম জাতি আজ পর্যন্ত ভোগ করছে।

ইয়াজিদ কর্তৃক বাইয়াত তলব :

হজরত হোসাইন (আ.) মদিনার গভর্নর ওয়ালিদের আহবানে তার দরবারে তশরিফ নিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে আলোচনা করলেন। মদিনার গভর্নর বললো ইয়াজিদ আপনার বাইয়াত তলব করেছেন। হজরত হোসাইন (আ.) বললেন, ইসলামের খলিফা হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীর হাতে বাইয়াত করা সংগত কারণেই তার পক্ষে সম্ভব নয় । মনে রাখতে হবে ইয়াজিদের আচরণ ছিল অমানুষিক ও নিষ্ঠুর। বিরুদ্ধ দলীয় ব্যক্তির জীবন নাশ করিতে সে এটুও কুণ্ঠিত হইত না। এমনকি কাউকেও বিচার বিবেচনা করে হা-কিংবা না করবার অবসরটুকুও দিত না। এহেন চরিত্রের ইয়াজিদ আমিরুল মোমেনিন হজরত হোসাইন (আ.) কে গোপনে হত্যা করার জন্য মদিনায় লোক প্রেরণ করে।

হজরত হোসাইন (আ.) বিষয়টি অবহিত হয়ে পরিবারের সদস্যদের একত্রিত করে বললেন আমার প্রিয়জনেরা, যদি আমি মদিনা শহরে অবস্থান করি তাহলে আমারই কারণে রসুল (দ.) কর্তৃক ঘোষিত পবিত্র ও শান্তির নগরীতে যুদ্ধ, ফিতনা, অশান্তি, রক্তপাত হবে যা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। এ কারণেই তিনি পরিবারের সদস্যদের সহ মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কি দুঃখজনক কথা ! অবস্থা কেমন সংঙ্গীন হয়ে গিয়েছিল যে, আহলে বায়াত পাক এর পঞ্চম স্তম্ভ হোসাইন (আ.) কে মদিনা শরিফ ত্যাগ করতে হচ্ছিল। যে মদিনা শরিফে তার দেহের অংশ মহানবি (দ.) এর রওজা মোবারক অবস্থিত। এই মহা পবিত্রস্থানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আপনজনদের বিরহ-বেদনা সহ্য করে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা মদিনায় আসে। যেখানে উকুনের জীবন পর্যন্ত নিরাপদ, অথচ রসুলেরই কলিজার টুকরাকে আজ নিরাপত্তাজনিত কারণে এই স্থান ত্যাগ করতে হচ্ছে, এর চেয়ে দুঃখের, কষ্টের মুসলমান জাতির জন্য অপমানের কথা আর কি হতে পারে !

মক্কায় হজরত হোসাইন (আ.) কে হত্যার প্রচেষ্টা :

হজরত হোসাইন (আ.) মক্কায় এসে বুঝতে পারলেন যে ইয়াজিদের নিয়োজিত আততায়ীগণ এহরামের পোশাকের নিচে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে মুসলমানদের নেতাকে গুপ্তভাবে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছিল। মক্কার পবিত্রতা ও হুরমত নস্যাতের আশঙ্কায় তিনি মহান হজের প্রাক্কালেই হজকে ওমরায় রূপান্তরিত করে মক্কা ত্যাগ করে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। হজের মাত্র একদিন বাকি ঠিক এমনি মুহূর্তে যেখানে মশা মাছির জীবনও নিরাপদ সেই পবিত্র স্থানে জীবন্ত ইসলামের জীবন বিপন্ন এবং সেই কারণেই তাঁকে সে স্থান ত্যাগ করতে হচ্ছে। ইসলামের অনুসারীদের ইতিহাসে এর চেয়ে জঘন্যতম, লজ্জাজনক ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা আর কি হতে পারে । মক্কার পবিত্রতা বিনষ্ট হবে বিবেচনা করে হোসাইন (আ.) মক্কা ত্যাগ করে চলে যান।

আমিরুল মোমেনিন হোসাইন (আ.) কে গুপ্তভাবে হত্যা করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় ইয়াজিদ এক নতুন চাল চালল। সে প্রচার করল, যে হোসাইন (আ.) ইয়াজিদের তথাকথিত বৈধ সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত বিধায় ফিতনা সৃষ্টিকারী-রাষ্ট্রদ্রোহী তথা ধর্মদ্রোহী। তাই "ওয়াজেবুল কতল"। আগেই বলা হয়েছে কোরআন হাদিস অপব্যাখ্যাকারীরা সবাই মাবিয়া ইয়াজিদ চক্রের হাতে ক্রীড়নক ছিল। এবং এই আলেমরাই তদানীন্তন দামেস্কে মসজিদের ইমাম, প্রধান ফকিহ বা কাজি বা অনুরূপ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। তাছাড়া আহলে বায়াতদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে গালিগালাজ পূর্ব থেকে চালু থাকায় এ ধরনের মতবাদ সমাজে সহজ গ্রহযোগ্য করা হয়েছিল। মাবিয়া কর্তৃক ইয়াজিদের নিয়োগ যে অবৈধ তা এইসব ফকিহগণ। বিবেচনায়ই আনলেন না।

দুর্ভাগ্যবশত এখনও কিছু সংখ্যক আলেম নামধারী ব্যক্তি মাবিয়া ইয়াজিদ সম্পর্কে পূর্বাপর ঘটনা বিশ্লেষণ না করে ইয়াজিদকে একজন ইসলামি রাষ্ট্রের বৈধ কর্ণধার হিসেবে বিবেচনা করে হজরত হোসাইন (আ.) এর কর্মকান্ডের তাৎপর্য উপলদ্ধি করতে ব্যর্থ হন। ফলে তারা এই কারবালার ঘটনাকে তথা এই মহান শাহাদাতের যথাযথ মর্যাদা না দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, তাদের শিক্ষার মাধ্যমে অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করছে এবং তাদেরকে গোমরাহীর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে হোসাইন (আ.) কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন কারণ মক্কা শরিফে আগমনের সাথে সাথে কুফা থেকে লাগাতার চিঠিপত্র এবং সংবাদ বাহক আসতে শুরু করলো। অল্প সময়ের মধ্যেই এই মহান নেতার কাছে বিপুল সংখ্যক চিঠি এসে পৌঁছল। সেই যুগে ডাক আদান প্রদান অতি সহজ ছিল না। লোকেরা চিঠিপত্র,পত্র বাহকের মাধ্যমে প্রেরন করত এবং পত্রবাহক পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে গন্তব্যস্থানে চিঠি পৌঁছিয়ে দিত। উল্লেখিত চিঠিপত্রগুলোর মর্মানুযায়ী হাজার হাজার লোক হজরত হোসাইন (আ.) এর কাছে বায়াত নেয়ার জন্য অপেক্ষমান ছিল। প্রত্যেক চিঠির বিষয়বস্তু খুবই আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে :

"হে মহান নেতা, আমরা আপনার পিতা হজরত আলী (আ.) এবং আহলে বায়াতের অনুসারী। আমরাতো মাবিয়াকে সমর্থন করিনি, তার অনুপযুক্ত ছেলেকে নেতা হিসেবে বরণ করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমরা আপনার পিতা আমিরুল মোমেনিন হজরত আলী (আ.) ও আপনার মহান ভাই হজরত হাসান (আ.) এর সমর্থক। আমরা ইয়াজিদের অনুসারী নই। ইয়াজিদ এখন ক্ষমতায় আরোহন করেছে কিন্তু আমরা ইয়াজিদকে খলিফা বা ইমাম মানতে পারি না। আপনাকে বরহক ইমাম, বরহক খলিফা তথা আমিরুল মোমেনিন মনে করি। আপনি মেহেরবাণী করে কুফায় তশরিফ আনুন। আমরা আপনার হাতে বায়াত করবো। এবং আপনাকে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করবো । আপনার জন্য আমাদের জানমাল কোরবান করতে প্রস্তুত এবং আপনার হাতে বায়াত করে আপনাকে অনুসরণ করে জিন্দেগী অতিবাহিত করতে ইচ্ছুক। তাই আপনি আমাদের কাছে তশরিফ আনুন। আমাদের প্রতি মেহেরবাণী করুন এবং আমাদেরকে আপনার স্নেহাবর্তে রেখে আপনার ফয়েজ বরকত দ্বারা আমাদেরকে উকৃপত করুন।"

অনেকে এই ধরনের চিঠিও লিখেছেন "হে মহান নেতা, আপনি যদি আমাদের কাছে আসেন, আমাদেরকে বাধ্য হয়ে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত করতে হবে। কারণ ইয়াজিদের সরকারের মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহতা'লা যখন জিজ্ঞেস করবেন কেন আমরা ফাসেক ও অনুপযুক্ত ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম, তখন আমরা পরিষ্কার বলব হে মওলা ! আমরা আপনার নবি (দ.) এর দৌহিত্রের কাছে চিঠি লিখেছিলাম সংবাদ পাঠিয়েছিলাম, জানমাল কুরবানি করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি (হজরত হোসাইন আ.) তশরিফ আনেননি। এবং আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করেননি। হজরত হোসাইন (আ.) যখন আমাদের প্রস্তাব আগ্রাহ্য করলেন। তাই আমরা বাধ্য হয়ে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত করেছি। তাই এ ব্যাপারে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব আপনার ওপরই বর্তাইবে। মনে রাখতে হবে যে, কোরান হাদিস ও তদানীন্তন ঐতিহ্য অনুযায়ী হজরত হোসাইন (আ.) ছিলেন বৈধ আমিরুল মোমেনিন। কিন্তু কুফা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশ থেকে এ ধরনের কোন দাওয়াত তাঁকে প্রদান করা হয়নি। যতই ইয়াজিদ সময় পাবে ততই তার অবৈধ ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য সে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। সেটাই স্বাভাবিক। তাই সকল দিক বিবেচনা করে দ্বীন ইসলামের "জীবন্ত প্রতিচ্ছবি" হজরত হোসাইন (আ.) হজরত মুসলিম (রা.)

কে প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও হোসাইন (আ.) এর পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য কুফায় প্রেরণ করেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তাঁদের লেখায় হজরত হোসাইন (আ.) কারো পরামর্শ গ্রহণ না করে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে যেন ভুল করেছিলেন (নাউজুবিল্লাহ) মর্মে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাদের জানা উচিত কোন পরিস্থিতিতে কোরআন ও হাদিসের আলোকে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এ ব্যাপারে কারো কাছ থেকে কোন প্রকার পরামর্শ গ্রহণ করা হজরত হোসাইন (আ.) এর জন্য কোন বিবেচনাযোগ্য বিষয় ছিল না, কারণ তিনি বৈধ আমিরুল মোমেনিন ও রসুল (দ.) ও আলী (আ.) এর উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে তাঁর মতের বিপরীত কোন মতামত ব্যস্ত বা চিন্তা করাই ছিল ধর্মদ্রোহিতা, ভুল বা অন্যায় ।

কারবালার ঘটনা :

কুফায় পৌঁছে মুখতার বিন উবায়দুল্লাহ সাকফি, যে আমন্ত্রণকারীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল ও আহলে বায়াতের অনুরক্ত ছিল; এর ঘরেই হজরত মুসলিম তশরিফ রাখলেন। যখন কুফাবাসীরা খবর পেল যে হজরত মুসলিম (রা.) আমিরুল মোমেনিন হোসাইন (আ.) এর প্রতিনিধি হিসাবে এসেছেন; তখন কুফাবাসীরা দলে দলে এসে তার হাতে বায়াত হতে লাগলো। অল্প দিনের মধ্যে চল্লিশ হাজার লোক তার হাতে বায়াত হয়ে গেল। এমন ভালোবাসা ও মহব্বত দেখালো যে হজরত মুসলিম অভিভূত হয়ে গেলেন। তাই তিনি হুসাইন (আ.) কে চিঠি লিখলেন । আপনি আমার চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসুন। এখানকার অবস্থা খুব সন্তোষজনক।

ইয়াজিদ এ খবর জানতে পেরে কুফার গভর্নর নোমান বিন বশিরকে পদচ্যুত করে আবু সুফিয়ানের অবৈধ পুত্র যিয়াদের ছেলে উবাইদুল্লা কে নিজ দায়িত্ব (বসরার গভর্নর) সহ কুফার গভর্নর নিয়োগ করে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর, মিথ্যাচারী, জঘন্য চরিত্রের এই উবাইদুল্লাহকে ইয়াজিদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে সকল প্রকার অমানবিয় কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতার প্রতি হুমকি স্বরূপ এই গণআন্দোলনকে চিরতরে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে ফেলার সকল কর্মপন্থা গ্রহণের লাইসেন্স প্রদান করে। তাছাড়া দামেস্ক জামে মসজিদের ইমাম সহ বিভিন্ন ফকীহদের লিখিত ফতোয়া পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ফতোয়ায় উল্লেখ করা হয় যে যেহেতু মাবিয়া একজন বৈধ খলিফা ছিলেন এবং তার অসিয়ত মোতাবেক ইয়াজিদ খলিফা নিয়োজিত হয়েছে তাই ইয়াজিদের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের কর্মতৎপরতা অবৈধ অন্যায় তথা অধর্ম তাই মৃত্যুদন্ড যোগ্য অপরাধ।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উবায়দুল্লাহ কুফায় শ্বেত সন্ত্রাস কায়েমের মাধ্যমে আহলে বায়াতের অনুসারীদের খতম ও নিরস্ত্র করলো। হজরত মুসলিমকে নৃশংশভাবে হত্যা করলো। ইতোমধ্যে হজরত হোসাইন (আ.) কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। এক্ষণে উবাইদুল্লাহ পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে কুফা অভিমুখী হজরত হোসাইন (আ.) কে আক্রমণ করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো।

আমিরুল মোমেনিন হোসাইন (আ.) তাঁর পরিবার ও সাথীগণকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদূর যেতেই উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের এক সামরিক কর্মকর্তা হোর ইবনে ইয়াজিদ এক হাজার সৈন্যসহ উপস্থিত হলো। হোর বাহিনীর প্রতি উবাইদুল্লাহর নির্দেশ ছিল যে, তারা আমিরুল মোমেনিন হোসাইনের (রা.) কাফেলার অনুসরণ করবে, এবং তাঁকে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সম্মুখে না পৌঁছা পর্যন্ত হোসাইন (আ.) এর সঙ্গ পরিত্যাগ করবে না। অর্থাৎ তাকে ঘিরে থাকবে।

হজরত হোসাইন (আ.) হোরের বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন, "বন্ধুগণ ! খোদার সম্মুখে এবং তোমাদের সম্মুখে আমার কৈফিয়ত এই যে, আমি স্বেচ্ছায় এখানে আসি নাই। আমার নিকটে তোমাদের চিঠি পৌঁছিয়াছে। কাসেদ (প্রতিনিধি) গিয়াছে। আমাকে বারবার এই বলে আহ্বান করা হয়েছে। আমাদের কেহ ইমাম (নেতা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অর্থে) নাই। আপনি এখানে চলে আসুন, যেন খোদা আমাদিগকে আপনার হাতে বাইয়াত এর মাধ্যমে একত্রিত করেন। তোমরা যা বলেছে তা যদি এখনও সত্য হয়, তবে আমি আসিয়াই পড়িয়াছি, তোমরা এখন আমার সহিত বিশ্বস্ততার পরিচয় দাও যেন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাদের শহরে প্রবেশ করিতে পারি। আর যদি তোমরা আমার আগমনে অসন্তুষ্টি হইয়া থাকো তবে আমি যেখান হতে

আসিয়াছি সেখানে ফিরিয়া যাই।" ইতোমধ্যে মোয়াজ্জিন জোহরের আযান দিল। আমিরুল মোমেনিন হোসাইন (আ.) হোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি নামাজ আলাদা পড়িবে ? (উল্লেখ্য মুসলমান সমাজে জামায়াতের নামাজের ইমামতির ব্যাপারটি ইতিমধ্যে একটি নাম মাত্র আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল)। হোর বলিল আপনার পিছনেই পড়িব, আপনি ইমামতি করুন। (আহলে বায়াত পাকের প্রতি আন্তরিকভাবে এই সম্মান দেখানোর জন্যই আল্লাহতা'লা হোরকে প্রকৃত ঈমান দান করেন যেমন নাকি হজরত মুসা (আ.) কে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ফেরাউনের যাদুগরদ্বয় বলেছিল আপনি প্রথমে আপনার যাদু (নিদর্শন) প্রদর্শন করুন)। সেখানেই আসরের নামাজের ওয়াক্ত হলো। সকলেই আমিরুল মোমেনীনের ইমামতিতে নামাজ পড়ল। নামাজের পরই তিনি আবার একটি ভাষণ দিলেন ঃ বন্ধুগণ ! যদি তোমরা খোদা ভীরুতার পথ অবলম্বন করিয়া থাক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃত দাবিদার সম্বন্ধে সচেতন হও তবে ইহা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হবে। আমরা রসুলুল্লাহ (দ.) এর আহলে বায়াত এই সকল (ইয়াজিদ, উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ প্রভৃতি) দাবিদারগণের চেয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তথা খেলাফতের (প্রকৃত) উত্তরাধিকারী। এই সকল লোক হুকুমতের সত্যিকার দাবিদার নহে। তাহারা গায়ের জোরে তোমাদের ওপর রাজত্ব করিতেছে তারা অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী (usurper)। যদি তোমরা আমাদিগকে অপছন্দ কর আমাদের দায়িত্ব বুঝিতে না পার এবং চিঠিপত্র এবং দূত মারফত যে সব প্রতিশ্রুতি তোমরা আমাকে দিয়াছ এখন যদি তোমরা উহা হইতে ফিরিয়া যাইয়া থাক তবে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।" প্রসঙ্গত বলা যায় যে, কেহ স্বেচ্ছায় আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত গ্রহণ না করিলে রসুল (দ.) বা নায়েবে রসুল (দ.) এর কোন দায়িত্ব বর্তায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহতা'লা জোর করে কাউকে হেদায়েত প্রদান করেন না। ইহাই আল্লাহর স্থায়ি বিধান।

আমিরুল মোমেনিন হোসাইন (আ.) পথিমধ্যে বায়াযা নামক স্থানে কুফাবাসীদের লক্ষ্য করে ভাষণ দেন : "বন্ধুগণ ! রসুলুল্লাহ (দ.) বলিয়াছেন যে, শাসক অত্যাচার করে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে (রাষ্ট্রীয় সামাজিক সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ডে রাষ্ট্রপ্রধানকে আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখার অধীন না থাকা) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

(আল্লাহর সকল বান্দাদের নিকট গৃহীত ওয়াদা, সুন্নাতে নবির বিরোধিতা করে অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের ওপর রাজত্ব করে, তাহার (রাষ্ট্রপ্রধানের) এই অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া যে ব্যক্তি কথায় ও কাজে ইহার প্রতিবাদ না করে আল্লাহ তার পরিণাম ভাল করেন। দেখ ইহারা (ইয়াজিদ ও তার সংঙ্গীগণ) শয়তানের অনুগত এবং রহমানুর রাহিম আল্লাহর অবাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অধর্মাচরণ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হইতেছে গনীমতের মালের ওপর অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (মাবিয়ার আমল থেকে এ সম্পর্কে নতুন ফতোয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভাবেই গনিমতের মালের শরিয়ত সম্মত বণ্টন ও অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছিল) হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল রূপে গণ্য করা হইতেছে)। তাহাদের উদ্ধত আচরণ ও জুলুমবাজিকে ন্যায় ও সুবিচারে পরিবর্তিত করার সর্বাধিক দায়িত্ব ও দাবি আমারই। (ইহাই আহলে বায়াতদের আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ.) কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব)।

তোমাদের অসংখ্য চিঠি এবং কাসেদ (দূত) আমার নিকট বাইয়াত করার সংবাদ লইয়া পৌঁছিয়াছে যে তোমরা ওয়াদা এবং বাইয়াতের প্রতিশ্রুতিতে অটল। ইহাই হেদায়েতের পথ। কেননা আমি হজরত আলী (আ.) ও হজরত ফাতেমার (রা.) পুত্র রসুলুল্লাহ (দ.) এর দৌহিত্র। ইহাদের পথই একমাত্র হেদায়াতের পথ অন্য কেহই ধর্মের ভিত্তি বা আদর্শ স্থানীয় নয়। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার সন্তান সন্ততিগণও তোমাদের সন্তান সন্ততিগণের সহিত একই সূত্রে বাধা থাকিবে । (অর্থাৎ হেদায়েতের এই ধারা বংশানুক্রমে চালু থাকিবে ইহাই বিধান) আমাকে তোমরা আদর্শরূপে গ্রহণ করো (ন্যায় ও সত্যের মাপকাঠি) আমার নিকট হইতে মুখ ফিরাওনা (অর্থাৎ সত্যের বা ধর্মের বা ন্যায়ের বা হেদায়েতের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করিও না) অবশ্য যদি তোমরা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করো নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না কর এবং আমার প্রতি বাইয়াতের রশি (সুরা আলে ইমরানের আল্লাহর রুজু কথাটির প্রতি ইংগিত) ছিড়িয়া নিক্ষেপ কর তাহাও তোমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে।

তোমরা আমার পিতা ও চাচাতো ভাই মুসলিমের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করছ। তোমাদের ওপর যে নির্ভর করে সেই প্রতারিত হয়। স্মরণ রাখিও, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতি সাধন করিয়াছ, নিজেদের ভাগ্য বিপর্যয় ডাকিয়া

আনিয়াছ। তোমরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করিয়াছ। যে প্রতারণা করে সে নিজের সঙ্গেই প্রতারণা করে। (স্মরণ রাখতে হবে এই কুফার লোকেরা তাদের ঈমানী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই বিশ্ব মানবতার এই দুরবস্থা বিশেষ করে আহলে বায়াতদের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ তাদের মনগড়া বিধি বিধানকে ইসলাম ধর্ম হিসেবে চালু করে যা আজ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে চালু ও সমাদৃত হয়ে আসছে)। বিচিত্র নহে শীঘ্রই আল্লাহ আমাকে তোমাদের মুখাপেক্ষিতা হইতে মুক্ত করিবেন। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতু।" (ইবনে জবির, কামেল ইত্যাদি)

অন্য এক ভাষণে আমিরুল মোমেনিন বলেন : অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ। পৃথিবী তাহার রূপ পরিবর্তন করিয়াছে তাহার গতি ফিরাইয়াছে। কেবল একটু প্রলেপ অবশিষ্ট রহিয়াছে। জীবন অতি জঘন্য পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে।

বিভীষিকা চর্তুদিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আফসোস তোমরা দেখিতেছ না যে সত্য পদদলিত হইতেছে প্রকাশ্যে অন্যায় আচরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে বাধা দিবার কেহ নাই সময় আসিয়া পড়িয়াছে সত্যের জন্য মোমেনের এখন একমাত্র আল্লাহরই আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। আমি শহিদি মৃত্যু কামনা করি। জালেমের সঙ্গে বাঁচিয়া থাকাও পাপ। (মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ)।

হজরত হোসাইন (আ.) সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এবার তিনি নিজ সংঙ্গীদিগকে একটু বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হোর ইহাতে বাধা দিল। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাদানুবাদ চলিল। অতঃপর কুফার দিক হতে একজন অশ্বারোহী আসতে দেখা গেল। হজরত হোসাইন (আ.) কে দেখা মাত্র সেই অশ্বারোহী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু হোরকে অভিবাদন জানাল এবং হোরের হাতে ইবনে জিয়াদের একখানা চিঠি অর্পণ করল। চিঠিতে লিখা ছিল হোসাইন (আ.) কে কোথাও আশ্রয় লওয়ার সুযোগ দিবে না। খোলা প্রান্তর ছাড়া কোথাও তাহাকে তাঁবু ফেলিতে দিবে না। কেল্লা কিংবা কোন জলাশয়ের নিকটে আশ্রয় লইবার সুযোগ যেন তিনি না পান সাবধান ! আমার নির্দেশ তুমি কতদূর পালন কর তাহা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমার প্রেরিত এই দূত তোমার সঙ্গেই থাকিবে। হোর এই পত্রের বিবরণ হজরত হোসাইন (আ.) কে জানাইয়া বললেন; "এবার আমি নিরুপায়, আমি আপনাকে বৃক্ষলতা ও পানি শূন্য প্রান্তর ছাড়া অন্য কোথাও তাবু ফেলিবার সুযোগ দিতে পারি না।" অতঃপর হোসাইন (আ.) 'আকর' নামক গ্রামে শিবির স্থাপন করার জন্য তাঁর অনুমতি চাহিলে তিনি গ্রামের নাম 'আকর' শুনিয়া বলিলেন 'আকর' অর্থ কাটা, ব্যর্থতা, নিস্ফল। অতএব সেখানে শিবির স্থাপন করা সমীচীন নয়। অতঃপর তিনি আরও অগ্রসর হইয়া এক নিদারুণ প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানেই স্থান লইলেন। হজরত হোসাইন (আ.) জিজ্ঞাসা করিলেন এই স্থানের নাম কি ? জানিতে পারিলেন ইহার নাম কারবালা। তখন তিনি বলিলেন "ইহা কারব এবং বালা অর্থাৎ কষ্ট ও বিপদ।" এই স্থান নদী হতে দূরে এবং একটি পাহাড়ের ব্যবধানে ছিল। বর্তমান ইরাকের রাজধানী বাগদাদ হতে ইহার দূরত্ব ৪০ মাইল। এই ঘটনা হিজরি ৬১ সালের ২ মহররম তারিখে অর্থাৎ ৬৮০ সালের ২ অক্টোবর সংঘটিত হইয়া ছিল।

পরদিন হোরের সেনাবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় পানিহীন কারবালা প্রান্তরে সংঙ্গী ও পরিবারবর্গ লইয়া আমিরুল মোমেনিন হোসাইন (আ.) তাঁবু ফেলিয়া রহিয়াছেন। ওমর ইবনে সাদ (কারবালা যুদ্ধের অপারেশন চিফ) আরও চার হাজার কুফাবাসী সৈন্যসহ উপস্থিত হইল। ওমরের সাথে হোসাইন (আ.) এর আলোচনা অব্যাহত থাকাকালীন ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ওমরকে পত্র মারফত নির্দেশ দিল।

"এখন সে (হোসাইন (আ.)) আমাদের হাতের মুঠায় আসিয়া পড়িয়াছে আর মুক্তি অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু এখন আর নিষ্কৃতির সুযোগ নাই। হোসাইন (আ.) কে বল, প্রথমে তিনি তাহার সকল সাথীসহ ইয়াজিদ ইবনে মাবিয়ার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। তারপর দেখা যাইবে। আর হোসাইন (আ.) এবং তাহার সাথীগণের জন্য পানি সরবরাহ বন্ধ করিয়া দাও। এক ফোঁটা পানিও যেন তারা পান করিতে না পারে। যেমন ওসমান (রা.) ইবনে আফফানকে পানি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য মাবিয়ার অপপ্রচারণার গুণে উমাইয়া বংশীয় লোকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে হজরত ওসমান (রা.) এর শাহাদতের

জন্য আহলে বায়াতরাই দায়ি। অথচ ঐ সময়ে ওসমান (রা.) এর বাড়ী পাহারা দিতে গিয়ে উভয় ইমামপাকই জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং দুশমনের হাতে শাহাদাত বরণ করার হাত হতে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের পত্রের মর্ম অবগত হয়ে হজরত হোসাইন (আ.) তাঁহার সকল সাথীকে একত্রিত করে বললেন ঃ "আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি। সুখ ও দুঃখ সকল অবস্থাতেই আল্লাহর শোকর গোযারী করিতে থাকিব। ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাদের গৃহ নবুয়তির সম্মান দ্বারা ভূষিত করিয়াছ, তোমার কালাম কোরআন বুঝিবার শক্তি দান করিয়াছ তুমি দ্বীন কে বুঝিয়া দিয়াছ। আমাকে দেখিবার বুঝিবার এবং ঘটনা প্রবাহ হইতে শিক্ষা গ্রহণের শক্তি দান করিয়া কতই অনুগ্রহকরিয়াছ। (অর্থাৎ নবুয়তের প্রকৃত উত্তরাধিকার আহলে বায়াতদেরকেই করা হইয়াছে এবং এই জ্ঞানের আওতায়ই কোরআন বুঝিবার সঠিক যোগ্যতা নিহিত আছে এবং এই জ্ঞানের আলোকেই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। হোসাইন (আ.) আরো বলেন, বন্ধুগণ আমার সাথীদের চেয়ে উৎকৃষ্ট লোক এই পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা আমি জানি না (নাই)। আমার পরিবারের লোকদের চেয়ে অধিকতর সহানুভূতি সম্পন্ন এবং পরোপকারী কোথায় আছে ? হে বন্ধুগণ ! আমার পক্ষ হইতে আল্লাহ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমি মনে করি আসামি দিন শত্রুপক্ষ আর আমার মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন। আমি চিন্তা ভাবনা করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা সকলে আজ রাতেই চুপে চুপে বাহির হইয়া যাও। পরিবারবর্গের হাত ধরিয়া তোমরা বিভিন্ন দিকে সরিয়া পড়। আমি সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদিগকে বিদায় করিয়া দেই। আমার দিক হতে কোনই আপত্তি ইহাতে নাই। শত্রুরা আমারই জীবন নাশ করিতে চায়। তারা উহা পাইলে আর তোমাদের সন্ধান করিবার প্রয়োজন বোধ করিবে না।"

পরিবারের লোকেরা ইহা শুনিয়া দুঃখে মর্মাহত ও অধীর হইয়া পড়লেন। হজরত আব্বাস বলিলেন, কেন ইহা বলিতেছেন ? আপনার পরেও আমরা যেন বাঁচিয়া থাকি সেই জন্য ? আল্লাহ যেন তা আমাদের না দেখান। হজরত হোসাইন (আ.) মুসলিমদের আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া বলিলেন।

"হে আকিলের বংশধরগণ ! একা মুসলিমের জীবন দানই যথেষ্ট। তোমরা সব চলিয়া যাও আমি তোমাদিগকে অনুমতি দিলাম। আকিলের বংশধরগণ বলিলেন লোকে কি বলিবে ? লোকে বলিবে যে আমরা আমাদের ধর্মনেতা (নায়েবে রসুল) সরদার (রাজনৈতিক নেতা) এবং পিতৃব্যপুত্রকে শত্রুর কবলে ফেলিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পালাইয়া আসিয়াছি। আমরা তাদের প্রতি একটি তীর ও নিক্ষেপ করি নাই। একটি বর্শা বা তলোয়ারও চালাই নাই, না ইহা হইতে পারে না। আমরা আমাদের জান-মাল, পুত্র-পরিজন সবই আপনার জন্য বিসর্জন দিব। আপনার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিব। আপনার যে দশা হইবে আমাদেরও সেই দশা হইবে। আপনি যদি জীবিত না থাকেন তবে আমরাও বাঁচিয়া থাকিতে চাই না।

মুসলিম ইবনে আউসাজা আসাদি বলিলেন, আমরা আপনার সঙ্গ কিরূপে ত্যাগ করিব, আমরা কি আপনার দাবি পরিশোধ করিতে পারিয়াছি ? খোদার কসম আপনার সঙ্গ কখনও ছাড়িতে পারি না। আমি শত্রুর বুকে আমার বর্শা চূর্ণ করিব। যতক্ষণ হাত থাকিবে তরবারি চালাইব। হাতের অস্ত্র ফুরাইলে শত্রুর মস্তকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিব। সাআদ ইবনে আবদুল্লাহ আল হারাফি বলিলেন যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে আপনাকে ছাড়িয়া যাইব না। যদি জানিতে পারি যে আমি শত্রুর হাতে নিশ্চিত নিহত হইব, আমাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া ভস্মিভূত করা হইবে। অতঃপর আমার দেহভস্ম উড়াইয়া দেওয়া হইবে তথাপি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব না।

যোহায়ের বলিলেন: "খোদার কসম করিয়া বলিতেছি যদি সহস্রবার আমাকে করাত দিয়া খন্ড-বিখন্ড করা হয় তবু আপনাকে ছাড়িয়া যাইব না। আমার জীবন দিয়াও যদি আপনার আহলে বায়াতের এবং আপনার ছোট ছোট শিশু সন্তানের জীবন রক্ষা পায়, তবে ইহা একান্তই সৌভাগ্য মনে করিব" (ইবনে জবির, কামল, সারহে নাহজুল বালাগা)

ইহা গভীরভাবে অনুধাবন করার বিষয় যে, এই সব মহান ব্যক্তিরা হোসাইন (আ.) সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন তা তারা পরবর্তীতে কার্যে পরিণত করেছিলেন। তাই এই বক্তব্যকে আবেগ তাড়িত মন্তব্য বলে মনে করার কোন অবকাশ নাই। বরং পবিত্র কোরআনের দাবি অনুযায়ী আহলে বায়াতের প্রতি 'মোয়াদ্দাত' তথা প্রগাঢ় ভালোবাসার বাস্তব নমুনা এটাই। এই প্রেক্ষিতে রসুল (দ.) বলেছেন যতদিন হে তার নিজের জীবনের চেয়ে আমাকে (রসুল) বেশি ভালো না বাসে তাহলে তার ঈমানের পূর্ণতা আসবে না। এই কারণেই

সাহাবাগণ (রা.) বলতেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান" (আমিই তো কিছুই না)। তাই আহলে বায়াতদের প্রতি এই মুহব্বতের গভীরতার রহস্য না বুঝলে কোনক্রমেই ঈমানের পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

১০ মুহররম শুক্রবার। ওমর ইবনে সাদ প্রভাতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে সৈন্য পরিচালনা করল। এদিকে হজরত হোসাইন (আ.) পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন শিশুগণের কান্না থামাও, কারণ শত্রুগণ আমাদের দুরবস্থা বুঝতে পারলে আরো উৎসাহিত হবে এবং আমাদের সৈন্যগণের সাহস কমে যাবে। এই বলে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করলেন : হে পরোয়ারদেগার! যারা আমাকে এমনভাবে প্রতারিত করল। আমার বাইয়াত ভঙ্গ করে আমাদের সর্বনাশ করল তাদের বিচার তোমার হাতে রইল। অতঃপর তিনি নিজ পক্ষীয় বীরগণকে যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে বললেন এবং নিজে যুদ্ধসাজ পরিধান করলেন। মাথায় নবিজির (দ.) পাগড়ী বাঁধলেন এবং গায়ে নবির (দ.) ব্যবহৃত জামা পরলেন, কোমরে পরলেন ভ্রাতা হাসানের (রা.) কটিবন্ধ এবং হাতে নিলেন শেরে খোদা আলীর (রা.) ঐতিহাসিক বেহেশতি তলোয়ার জুলফিকার। পৃষ্ঠদেশে ঢাল বাম হাতে বর্শা। অতঃপর তার প্রিয় দুলজানায় সওয়ার হলেন। শরীরে উজ্জ্বল কান্তি মাথায় সামান্য পাকা লম্বা চুল, মুখে ধুসর বর্ণের দাড়ি এবং চোখের তারায় গভীর মর্মভেদী দৃষ্টি। সব মিলিয়ে আমিরুল মোমেনিনকে এমনই সোম্য দর্শন ও মহীয়ান করে তুলেছিল সর্বোপরি রসুল (দ.) এর সাথে তার পবিত্র চেহারা মোবারকের সাদৃশ্য দেখে ভক্ত ও অনুচরগণের প্রাণে এক অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হল। ক্ষণিকের তরে তারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, চিন্তা ভাবনা সব ভুলে গেল। ঘন ঘন আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে তারা রণক্ষেত্র কাঁপিয়ে তুললো।

শত্রুবাহিনী নিকটবর্তী হলে হজরত হোসাইন (আ.) তাহার উষ্ট্রীতে আরোহন করলেন এবং কোরআন শরিফ সম্মুখে রাখিয়া শত্রুবাহিনীকে সম্বোধন করিয়া উচ্চস্বরে।

'এতেমাই-হুজুজত' অর্থাৎ নিজের দাবি চূড়ান্তরূপে প্রমাণ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি বা নায়েবে নবিগণ কর্তৃক তাঁদের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য সঠিক যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করা। এই যুক্তি আগ্রাহ্য করা হলে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর ওপর তার বান্দাদের এই দাবি করার অধিকার থাকে না যে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে তারা বেখবর বা অনবহিত ছিল। তাই এই যালেমদের জন্য প্রদেয় শাস্তি মাফের পক্ষে আর কোন যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ থাকে না। অর্থাৎ এই বক্তব্য শোনার, জানার ও বুঝবার পর শ্রোতৃবৃন্দকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে তারা আল্লাহর রসুল (দ.) বা নায়েবে রসুলের কথা অনুযায়ী কাজ করবে কিনা। যে বা যারা তাঁর অনুসরণ করবে সে বা তারা প্রকৃত মুমেন হিসেবে আল্লাহর আইনে বিবেচিত হবে অন্যথায় তারা কাফের হিসেবে বিবেচিত হয়ে কঠোর শাস্তির উপযোগী হবে। ইহা কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর স্থায়ি বিধান।

দ্বীন ইসলামের 'জীবন্ত প্রতিচ্ছবি' বলতে লাগলেন– তোমরা তাড়াহুড়া করিও না। প্রথমে আমার বক্তব্য শ্রবণ কর। আমার উপদেশ শুন। আমার কৈফিয়ত শুনিয়া লও, আমার আগমনের কারণ বলিতে দাও। যদি আমার কৈফিয়ত যুক্তি সংগত হয় এবং তোমরা উহা গ্রহণ করিতে পার আর আমার প্রতি সুবিচার কর, তবে ইহা তোমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হইবে (আল্লাহর আইনে মোমেন হিসেবে পরিগণিত হইবে)। এবং তোমরা অনর্থক আমার সহিত শত্রুতা হইতে বিরত থাকিবে। আমার বক্তব্য শুনিবার পরে যদি তোমরা কৈফিয়ত গ্রহণ না কর। ন্যায় বিচার হইতে বিরত হও (অর্থাৎ স্বেচ্ছায় খোদাদ্রোহিতার পন্থা অবলম্বন কর) তবে আমার বলিবার কিছুই থাকিবে না। তোমরা তোমাদের সকল সৈন্যসহ একযোগে আমার ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িও। আমাকে আর অবকাশ না দিয়াই আক্রমণ করিও। সর্বাবস্থায় আমার ভরসা একমাত্র আল্লাহরই ওপর, কেননা তিনি সৎ কর্মশীলদের সহায়ক। তোমরা আমার কুল মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য কর। একটু চিন্তা করিয়া দেখ আমি কে ? তোমাদের অন্তরের নিকট একবার গভীরভাবে প্রশ্ন করিয়া দেখ আমাকে হত্যা করা এবং আমার মর্যাদাকে পদদলিত করা তোমাদের পক্ষে জায়েজ কি না। আমি কি তোমাদের নবির কন্যার গর্ভজাত নই ? আমি কি ঐ পিতার সন্তান নই, যিনি রসুল (দ.) এর চাচাত ভাই ছিলেন; এবং তাঁর অছি (প্রতিনিধি) ও মুমেনদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা ছিলেন।

শহিদগণের অগ্রনায়ক হজরত হামজা (রা.) কি আমারই পিতার চাচা ছিলেন না? হজরত জাফর তাইয়ার (রা.) (বেহেশতের দুই ডানা ওয়ালা হিসেবে খ্যাত) কি আমারই চাচা নহেন ? তোমরা কি আমার এবং আমার ভ্রাতা সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দ.) কে একথা বলিতে শুন নাই যে, আমরা বেহেশতের যুবকগণের সর্দার হইব ? আমার এই উক্তি সত্য এবং নিশ্চিতরূপে সত্য কেননা জ্ঞান হওয়া অবধি আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। এখন বল দেখি তোমাদের ভোলা তরবারি লইয়া কি আমাদের সম্মুখে আসা উচিত ? যদি তোমরা আমার এই কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পার। তবে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারি (রা.) আবু সাঈদ খুদরি (রা.) সোহায়েল ইবনে সায়েদি (রা.) জায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) আনাস ইবনে মালেক (রা.) প্রভৃতি এখনও জীবিত আছেন। তোমরা তাহাদের নিকট আমার দাবির সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ আমার এবং আমার ভ্রাতা (হাসান আ.) সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দ.) এর এই উক্তি তাহারা শুনিয়াছেন কি না ? ইহাও কি আমার রক্তপাত নিবারণের জন্য যথেষ্ট হইতে পারেনা (অর্থাৎ বেহেশতের সর্দারকে দুনিয়ায় হত্যা করা ঐশি বিধান মতে কোনক্রমেই কি বৈধ হতে পারে ? আল্লাহর কসম এই সময় সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র আমি ছাড়া নবির কন্যার পুত্র আর কেহই জীবিত নেই। আমি তোমাদের নবির সরাসরি দৌহিত্র। কেন তোমরা আমাকে হত্যা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছ, আমি কি কাহারও রক্তপাত করিয়াছি ? কাহারও সম্পদ হরণ করিয়াছি ? বল, তোমরা কি অপরাধে আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ ? তিনি তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলিলেন আছে কে এমন সহায় যে আমাদিগকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাহায্য করিবে ? আছে কি এরূপ রক্ষক যে রসুলুল্লাহর (দ.) পূণ্যবতী কুলনারীগণকে রক্ষা করিবে ? জোহায়ের হজরত হোসাইন (আ.) এর বক্তৃতার ব্যাখ্যা করে কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন। "হে কুফাবাসীগণ, আল্লাহর আজাবকে ভয় কর। প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য নিজ ভাইকে সদুপদেশ দেওয়া কর্তব্য। দেখ এখনও আমরা ভাই ভাই, একই ধর্মে বিশ্বাসী এবং রীতির অধীন। যতক্ষণ তরবারি কোষবদ্ধ রহিয়াছে ততক্ষণ আমরা একে অন্যের ভালমন্দ বিবেচনার জন্য দায়ি। তরবারি খাপ হইতে বাহির হইলেই সেই বাঁধন টুটিয়া যাইবে তোমরা আর আমরা দুইটি দলে (ঈমানদার ও বেঈমান) বিভক্ত হইয়া পড়িব। দেখ আল্লাহ, নবির আওলাদ সম্পর্কে তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে একটি মহাপরীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন আমি তোমাদিগকে আহলে বায়াতকে সমর্থনের এবং অহংকারী ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের বিরোধিতা করার আহ্বান জানাইতেছি। বিশ্বাস কর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের ন্যায় শাসনকর্তা দ্বারা তোমাদের কোনই উপকার হইবেনা। সে তোমাদের চক্ষু বিদ্ধ করিবে, হস্তপদ কর্তন করিবে, তোমাদের চেহারা বিকৃত করিবে এবং গাছের ডালে ফাঁসিতে ঝুলাইবে। আর ধর্মপরায়ণ লোকদের ধরিয়া হত্যা করিবে। এবং সেতো ইহা ইতোমধ্যে করিয়াছে। হাজর ইবনে আদি, হানি ইবনে আমর প্রভৃতির ঘটনা বেশি দিনের নহে যে তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ।"

জোহায়ের এর বক্তব্য শুনিয়া কুফাবাসীগণ তাহাকে গালাগালি এবং ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল আমরা হোসাইন (আ.) এবং তাহার সাথীগণকে হয় হত্যা অথবা কুফাধিপতির নিকট হাজির না করিয়া কোনমতেই ফিরিব না। যোহায়ের তৎপ্রেক্ষিতে বলিলেন সুমাইয়ার (জারজ) ছেলে ইবনে জিয়াদ অপেক্ষা হজরত ফাতেমার (রা.) পুত্র হোসাইন (আ.) যদি তোমাদের সাহায্য সহানুভূতি লাভের অধিক হকদার নাও হইয়া থাকেন তবুও তোমরা অন্তত এতটুকু তো করিতে পার যে আওলাদে রসুল (দ.) কে হত্যা করিবে না। তোমরা হোসাইন (আ.) এবং ইয়াজিদকে নিজেদের বিষয় মীমাংসা করিয়া লইতে দাও। ইয়াজিদকে সন্তুষ্ট করার জন্য হোসাইন (আ.) এর রক্তপাত করা জরুরি নহে। তাঁহাকে হত্যা না করিয়াও তোমরা ইয়াজিদকে খুশি করিতে পার। (ইবনে জবির শারহে নাহজুল বালাগাহ) শহীদে কারবালা, মুফতি মোহাদ্দেদ শফী।

আদি ইবনে হরমালা হইতে বর্ণিত আছে যে, ওমর ইবনে সা'দ যখন সৈন্যবাহিনী চালনা করিতে লাগিলেন তখন হোর ওমর বিন সা'দকে বলিলেন, হে সেনাপতি আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আপনি কি সত্যিই হোসাইন (আ.) এর সাথে যুদ্ধ করিবেন ? ওমর বলিল যুদ্ধ। নিশ্চিত যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ যে ইহাতে মস্তক দ্বিখন্ডিত হইবে দেহ হইতে হাত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। হোর বলিলেন, হোসাইন (আ.) যে তিনটি শর্ত দিয়াছিলেন উহার একটিও কি গ্রহযোগ্য হইলনা ?

ওমর ইবনে সা'দ বলিলেন– তোমাদের শাসনকর্তা উহা মঞ্জুর করলেন না। তাই বর্তমানে আমার কিছু করণীয় নাই। হোর এর স্বগোত্রী মোহাজের ইবনে জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি কি হোসেন (রা.) কে আক্রমণ করতে চাও ? হোর নিরুত্তর রইলেন। ইহাতে মোহাজের এর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে বলল তোমার নীরবতা সন্দেহজনক। কোন যুদ্ধক্ষেত্রেই আমি তোমাকে এরূপ দেখি নাই। যদি কেহ আমাকে প্রশ্ন করে কুফার সর্বশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ কে ? তদুত্তরে তোমার নাম ব্যতীত আর কাহারও নাম আমার মুখে আসিবে না। অথচ তুমি আজ কি করিতেছ ? হোর খুব গাম্ভীর্যের সাথে বললেন আমি বেহেশত ও দোযখের কোনটি গ্রহণ করব। সেই চিন্তাই করেছিলাম। খোদার কসম দুইটির মধ্যে বেহেশতই বেছে নিলাম। আমাকে যদি খন্ড-বিখন্ড করিয়াও ফেলা হয় তবুও আমার দুঃখ নাই। হোর ইহা বলেই দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া হোসাইন (আ.) এর সৈন্য বাহিনীর সহিত মিশিয়া গেলেন।

ইমাম হোসাইন (আ.) এর নিকট গিয়ে হোর বললেন, "হে রসুলের (দ.) ফরজ। আমিই সেই নরাধম যে আপনাকে মদিনায় ফিরিয়া যাইতে বাধা দিয়াছি। এবং সারাপথ আপনার পশ্চাতে থাকিয়া এই কারবালায় অবতরণ করিতে বাধ্য করিয়াছি। আল্লাহর শপথ আমি একথা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে আপনার শর্তগুলির কোন একটিই মঞ্জুর হইবে না এবং ব্যাপার এতদূর গড়াইবে। ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ আপনার সহিত এরূপ ব্যবহার করিবে ইহা আমি পূর্বে জানিতে পারিলে কখনই আপনাকে এমন বিপদের মুখে টানিয়া আনিতাম না। হে রসুলের ফরজ। আমি নিজকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ করিবার উদ্দেশ্যে আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি আর ইয়াজিদের সৈন্যদলে ফিরিয়া যাইব না। আমি আপনার পদতলে কোরবান হইব। ইহাতে কি আমার অপরাধ মাফ হইবে ? (ঈমানদারগণ ঠিকই জানেন কে কোরআনের দাবি অনুযায়ী রসুল (দ.) বা তাঁর আহলে বায়াতগণই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট একমাত্র সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত) হজরত হোসাইন (আ.) স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন আল্লাহ তোমার গুণাহ মাফ করিয়া দিবেন। তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন ইয়াজিদের পুত্র হোর। হজরত হোসাইন (আ.) বলিলেন তুমি হোর বটে, হোর অর্থ মুক্ত, তোমার মা যেমন নাম রাখিয়াছেন খোদা চাহেত তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্ত।" 'বেহেশতের সর্দার', হোরকে বেহেশতের সনদ দিলেন। হোর এবার ইয়াজিদ বাহিনীর সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, হজরত হোসাইন (আ.) যে তিনটি শর্ত পেশ করিয়াছেন, উহার যে কোনটি তোমরা মানিয়া লও, যেন আল্লাহতা'লা এই মহা পরীক্ষার হাত হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করেন। অতঃপর তিনি কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া উপস্থিত সকলকে হোসাইন (আ.) বিরোধিতা না করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ইহার প্রত্যুত্তরে এবার শত্রুপক্ষ হইতে তীর বর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

কারবালার যুদ্ধ শুরু :

সকল প্রকার অনুরোধ, উপদেশ ও বক্তৃতা ব্যর্থ হয়ে গেল। অবশেষে যুদ্ধই আত্মপ্রকাশ করল। সেনাপতি ওমর ইবনে সা'দ হজরত হোসাইন (আ.) কে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তোমরা সাক্ষী থাকিও সর্বপ্রথম শরটি আমিই নিক্ষেপ করিয়াছি।" (মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা - আবুল কালাম আজাদ)।

প্রত্যেক পক্ষ হতে এক একজন বা দুইজন করিয়া সৈন্য অবতীর্ণ হইয়া সামনাসামনি যুদ্ধ চলাকালীন হজরত হোসাইন (আ.) এর বাহিনীর সম্মুখে বিপক্ষীয় যেই আসিল, সে আর ফিরিল না। এই রীতিতে যুদ্ধ করিয়া বিফল হইয়া ওমর ব্যাপক আক্রমণের নির্দেশ দিল। উভয় পক্ষে ব্যাপক যুদ্ধ হলো। যুদ্ধ থামিলে দেখা গেল হজরত হোসাইন (আ.) পক্ষীয় বীর সেনা মুসলিম ইবনে আউসাজ ভীষণভাবে আহত হয়েছেন। হজরত হোসাইন (আ.) তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন মুসলিম তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাজিল হোক। এবং পাঠ করিলেন, তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং কতক মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। তবুও তাহাদের মত পরিবর্তিত হয় নাই ? (আল কোরআন) কারবালার প্রান্তরে প্রথম শহিদ এই বীর মুসলিম।

আবার যুদ্ধ শুরু হল। ওমরের বাম বাহিনীর অধিনায়ক ছিল কুখ্যাত সিনান। প্রচন্ড বেগে আক্রমণ শুরু হল। ইমাম বাহিনীর বাম বাহু ও ভীষণবেগে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। মাত্র ৩২ জন অশ্বারোহী ছিলেন। তারা যেদিকে আক্রমণ করতেন সেদিকে বহ্যই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতেন। শত্রুগণ দেখিল এইভাবে যুদ্ধ জয় করা অসম্ভব। সুতরাং তারা অবিলম্বে আরও নতুন বাহিনী প্রার্থনা করল। সঙ্গে সঙ্গে শত্রু পক্ষের আরো বহু সৈন্য ও

পাঁচশত তীরন্দাজ এসে পৌছল এবং তীর বর্ষণ শুরু করল। তীরের আঘাতে হোসাইন (আ.) বাহিনীর অশ্ব সমূহ অকেজো হইয়া পড়ল। সুতরাং তারা পদাতিক সৈন্যে পরিণত হলেন।

আইউব ইবনে মাশরাহ স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, "আমিই হোরের অশ্ব অকেজো করিয়াছিলাম। আমি তীর বর্ষণ করিয়া হোর এর অশ্বকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছিলাম। হোর এর অশ্ব বেকার হইলে তিনি লাফাইয়া নিচে নামিলেন এবং হাতে তরবারি লইয়া যখন আক্রমণ চালাইলেন তখন তাহাকে সিংহের ন্যায় মনে হইতেছিল। এইরূপে যুঝিতে যুঝিতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তাঁহার সাথে তাঁহার ভ্রাতা ও ভৃত্যগণ শহিদ হয়ে গেলেন।

ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ইবনে জিয়াদের বাহিনী জয়ের কোন লক্ষণই দেখতে পেলনা। শেষ পর্যন্ত ওমর ইবনে সাআদ আহলে বায়াতদের শিবির জ্বালাইয়া দিবার নির্দেশ দিল।

সেদিন ছিল শুক্রবার। জুময়ার নামাজের দিন জুমা তো দূরের কথা যোহরের সময় হলেও শত্রুগণের আক্রমণ বন্ধ হলোনা। তারা বন্য পশুর ন্যায় হিংস্র হয়ে ওঠেছিল। আহলে বায়াতগণ যুদ্ধরত অবস্থায় অগ্র-পশ্চাত হয়ে একে একে নামাজে কসর (সংক্ষিপ্ত) নামাজ পড়ে নিলেন। নামাজ অন্তে দেখা গেল ইমাম পক্ষে সৈন্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুধু ইমামের কয়েকজন ভাই ও কয়েকজন বিশিষ্ট খাদেম এবং ইমাম পরিবারের সন্তানগণ অবশিষ্ট আছেন। ইমামের সাহায্যকারী যতক্ষণ জীবিত ছিলেন ততক্ষণ ইমাম বংশের কাউকেই তারা যুদ্ধ করতে দেননি। এরপর ইমামের পুত্রেরা ময়দানে এগিয়ে এলেন। তারাও হায়দারী হাঁক তুলে হজরত আলী (আ.) বাহুবলের ঐতিহ্য দেখিয়ে শাহাদত বরণ করে নিলেন। শহিদ হলেন হাসান (আ.) এর পুত্র কাসিম। ইমামের সদ্যজাত শিশুকে পানির পিপাসায় কাতর অবস্থায় পত্নী শাহারবানু দিলেন ইমামের কোলে। ইমাম দুশমনদের কাছে এই শিশুর জন্য এক ফোঁটা পানি চেয়েও পেলেন না বরং এজিদ বাহিনী তার শুষক কণ্ঠেও তীর বিদ্ধ করে পানির সাধ জীবনের তরে মিটিয়ে দিল। এই শিশুর রক্ত হোসাইন (আ.) নিজ দেহে মাখিতে মাখিতে বলিলেন। খোদার কসম ! তুমি আল্লাহর নিকট হজরত সালেহ (আ.) এর উটের চেয়েও প্রিয় আর মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর নিকট সালেহ (আ.) এর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। উল্লেখ্য, এই উটকে হত্যা করার সাথে সাথে সামুদ কওমের জন্য আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হিসেবে নেমে এসেছিল। হজরত আব্বাস তাঁর তিন সহোদর আবদুল্লাহ, জাফর ও ওসমানকে আহ্বান করলেন তিন সহোদরকে তিনি জেহাদে পাঠালেন এই বলে ভাইয়েরা আমাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই। এগিয়ে যাও জেহাদে মরণপন যুদ্ধ করে শহিদ হও। আমি মনে করব তোমরা রসুল (দ.) এর পাওনা (সুরা-শুরা ৪২ নং আয়াতের প্রতি ইংগিত) পরিশোধ করছে। একে একে তিন সহোদর শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপন লড়াই করে শাহাদত বরণ করলেন। পিতার ইশারা পাওয়া মাত্রই হজরত আব্বাসের ৮/১০ বৎসরের পুত্র মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হলেন। এভাবে সবাই অসহনীয় তৃষ্ণার্ত অবস্থায় শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হলেন। বাকি রইলেন ইমাম হোসাইন (আ.) এর ভাই আব্বাস। যে আব্বাস সারাটি জীবন প্রিয় ইমাম হোসাইন (আ.) কে ছায়ার মত অনুসরণ করেছেন। সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে প্রিয় 'আকাকের (প্রভু)' যিনি আগলে রেখেছেন। আজ সময় এসেছে সেই প্রিয় "আকা হোসাইন (আ.) এর জন্য তথা মুহাম্মদ (দ.) এর জন্য দ্বীন ইসলামের ঝান্ডাকে বুলন্দ করার জন্য। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই পিতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও হজরত আব্বাস আলমদার ইমাম পাককে 'আকা' বা প্রভূ হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। এতে বুঝা যায় যে ইমামত এর বিষয়টি প্রচলিত রক্তীয় সম্পর্কের অনেক উর্ধ্বে।

কিন্তু হোসাইন (আ.) চুপ। আলী আসগরের গলার তীর বিদ্ধ হয়েছে ইমাম পাক চুপ। কাসেমের রক্তাক্ত শরীরের ওপর ঘোড়া চালানো হয়েছে। মুহাম্মদের শরীর দ্বিখন্ডিত হয়ে রক্তের সাগরে কাতরাচ্ছে। কিন্তু তিনি নির্বিকার। এহেন পরিস্থিতিতে হজরত আব্বাস পানি আনার অনুমতি চাইলেন ইমাম পাক বললেন, "যাও ভাই, আল্লাহ এবং তার প্রিয় হাবিব তোমার সহায়।" এক হাতে বর্শা আর অন্য হাতে মশক নিয়ে ফোরাতের দিকে রওয়ানা কর আকার (প্রভুর) নির্দেশ পেয়েই শেরে খোদার পুত্র বীর আব্বাস পতাকাধারী (আলমদার) ইমামের কদম চুম্বন করে (প্রকৃতপক্ষে ইমামগণের সাথে তার অনুসারীদের এ ধরনের সর্ম্পকই বিধেয়) পানি আনতে ছুঁটলেন। তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে ফোরাত শত্রু মুক্ত করে পানি নিয়ে ফিরলেন। কিন্তু ঘাপটি মারা শত্রু পিছন থেকে আক্রমণ করে হাত কেটে ফেলে ও অশ্বকে তীরবিদ্ধ করলে মশক দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়।

হজরত হোসাইন (আ.) এর শাহাদত :

চর্তুদিক হতে আক্রমণ চলছিল। হজরত হোসাইন (আ.) ও তরবারি চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তরবারি লইয়া পদাতিক বাহিনীর দিকে ধাবমান হইলেন এবং একাই তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

তার বর্ণনা এইরূপ : "আমি বর্শা দ্বারা হজরত হোসাইন (আ.) কে আক্রমণ করিয়াছিলাম এবং একেবারে তাহার কাছে পৌঁছিয়েছিলাম। ডান-বাম সব দিক দিয়াই তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যেদিকে ফিরিতেন সে দিকেই শক্র সৈন্যদেরকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া যাইতেন। দেহে জামা মাথায় পাগড়ী বাঁধা অবস্থায় তিনি লড়িতেছিলেন। খোদার নামে বলিতেছি এরূপ ভগ্ন হৃদয় ব্যক্তি যাহার পরিবারে সকলেই একের পর এক চোখের সামনে শক্রর হাতে নিহত হইয়াছে। সেই মানুষের মধ্যে এরূপ বীরত্ব, সাহস, দৃঢ় চিত্ততা এবং স্থিরতা আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই। তিনি ডানে-বামে যেদিকে ফিরিতেন সেই দিকেই শক্রদল ব্যাঘ্র তাড়িত ভীরু মেষপালের ন্যায় ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই অবস্থা চলিল। তখন ওমর ইবনে সাদ আসরের নামাজ কাজা হয়ে যাবে (কত বড় নামাজি!) তাই সহসাই যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে হোসাইন (আ.) এর ওপর আক্রমণ জোরদার করার নির্দেশ দিল। অর্থাৎ একযোগে সবাই জীবন্ত ইসলামকে দুনিয়া থেকে উৎখাত করার জন্য আক্রমণ চালাইল। ওমর ইবনে সাদের নির্দেশ অনুযায়ী সবাই একযোগে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। ফলে চারদিক থেকে তীর এসে ইমাম পাককে আঘাত হানতে লাগল। কোনটা ঘোড়ার পায়ে লাগছিল, কোনটা তার নিজের পবিত্র শরীর মোবারককে লাগছিল। এভাবে যখন তীরের আঘাতে তার (রা.) পবিত্র শরীর ঝাঝরা হয়ে ফিনকি দিয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত বের হতে লাগলো, তখন হোসাইন (আ.) বার বার মুখে হাত দিয়ে বললেন বদবখত– তোমরাতো তোমাদের নবি (আ.) এর লেহাজ করলে না, তোমরা নবি (দ.) এর আহলে বায়াতকে হত্যা করেছ। এভাবে যখন হোসাইন (আ.) আর এবার মুখের ওপর হাত দিলেন তাঁর (রা.) চোখের সামনে আর একটি দৃশ্য ভেসে উঠল। তিনি (আ.) দেখতে পেলেন নবি করিম (দ.) হাতে একটি বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হজরত আলী (আ.) ও হজরত ফাতেমা (আ.) তার পাশে আছেন আর বলছেন: হোসাইন, আমার দিকে তাকাও আমরা তোমাকে নিতে এসেছি। হজরত ইমাম পাকের কাপড় রক্তে ভিজে যাচ্ছিল আর হুজুর (দ.) সেই রক্ত বোতলে ভরে নিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, হে আল্লাহ হোসাইন (আ.) কে পরম ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান কর। আল্লাহ আল্লাহ। নবি (দ.) এর দৌহিত্র নিজের রক্তে আপ্লুত হয়ে গেলেন। এবং আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। আল্লাহর আরশ দুলতে লাগল। ফাতেমাতুজ জাহরা (রা.) এর আত্মা ছটফট করতে লাগল। মহান হোসাইন (আ.) পতিত হলেন, যাকে প্রিয় নবি (দ.) নিজের কাঁধে নিতেন। ঘোড়া থেকে পতিত হওয়ার পর সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী, সিমার, হাওলা বিন ইয়াজিদ সেনান বিন আনাস প্রমুখ জালিম এগিয়ে আসল এবং হজরত হোসাইন (আ.) এর বুকের ওপর চেয়ে বসল, সিমার পবিত্র বুকের ওপর বসল। হজরত হোসাইন (আ.) বুকের ওপর সিনানকে দেখে বললেন।

আমার নানাজান ঠিকই বলেছেন এক হিংস্র কুকুর (সে প্রকৃতপক্ষে তাইছিল) আমার আহলে বায়াতের রক্তের ওপর মুখ দিচ্ছে। ইমাম পাক (রা.) সিজদায় মাথা রাখলেন তাসবিহ সুবহানা রাব্বিয়াল আলা পাঠ করে বললেন মওলা, যদি হোসাইন (আ.) এর কুরবানি তোমার দরবারে গৃহীত হয় তাহলে এর সওয়াব নানাজান (দ.) এর উম্মতের ওপর বকশিশ করে দাও। ইমাম (আ.) পাকের মস্তক মোবারক বিচ্ছিন্ন করা হলে তাঁর ঘোড়া - 'দুলজানা' স্বীয় কপালকে তাঁর পবিত্র রক্তে রঞ্জিত করে এবং দৌড়ে যেতে লাগল তখন সীমার বলতে লাগল ঘোড়াটিকে ধর যতজন ঘোড়াটিকে ধরতে এগিয়ে এলো সে সবাইকে আক্রমণ করলো। এভাবে সতেরজন খোদার দুশমন খতম হয়ে গেল। তারপর ঘোড়া ছুটে গিয়ে তাবুর কাছে। গেল এবং কান্না ও চিৎকার জুড়ে দিল।

সেদিন ছিল ৬১ হিজরির ১০ মহররম শুক্রবার ৬৮০ সালে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছে দিনটি। মনে রাখা প্রয়োজন পূর্বে এই দিনের যে কোন তাৎপর্যই থাক না কেন এই 'মহা প্রলয়ের' দিনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল ঘটনাকে এই ঘটনা ম্লান করে দিয়েছে।

সিনান ইবনে আনাসরি ‘স্যাডিস্ট’ চরিত্রের লোক ছিল। সেই ইমামকে সিজদারত অবস্থায় তাঁর পবিত্র মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া হত্যা করিল। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী বলিয়াছেন, নিহত হওয়ার পর হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) দেহে ৩৩টি বর্শার আঘাত এবং ৩৪টি তরবারির আঘাত দেখা যায়। ঘাতক সিনান এই পবিত্র মস্তক নিয়ে ওমর ইবনে সাদের সম্মুখে যাইয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল :

“আমাকে সোনা রূপা দ্বারা আচ্ছাদিত করো। আমি বড় বাদশাকে হত্যা করিয়াছি। আমি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি যাহার মাতা-পিতা সকলের চেয়ে মহান যাহার বংশ মর্যাদা সকলের চেয়ে উত্তম।”

ওমর ইবনে সাদ তাকে তাঁবুর মধ্যে লইয়া লাঠি দিয়া আঘাত করতে করতে বলল যে তুই যা বলছিলি ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ শুনলে তোকে সে এখনই হত্যা করে ফেলত।

ওমর ইবনে সাদের প্রতি জিয়াদের নির্দেশ ছিল। ইমাম (রা.) এর লাশ মোবারক যেন পদদলিত করা হয়। এবার সেই কাজের পালা। ওমর বলল হোসাইন (আ.) এর দেহ অশ্বখুরে দলিত করার জন্য কাহারা তৈয়ার আছে ? অমনি দশজন (আল্লাহর দুশমন) সিপাহি প্রস্তুত হইল এবং ইমাম (রা.) এর পবিত্র দেহ মোবারকের ওপর দিয়া ঐ দশজন সিপাহি। ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল। কারবালার মহারণ শেষ হলো।

কারবালার এই মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে আলকাখরি নামক জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন, এটা এমন একটি শোচনীয় মর্মান্তদ ঘটনা যার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে আমার মন সরে না। কেননা এমন একটা দুঃখদায়ক ও লোমহর্ষক ব্যাপারটি। নিশ্চয়ই এটা এমন একটি বেদনাদায়ক ঘটনা যার চেয়ে অধিক লজ্জাজনক আর কোন ঘটনা ইসলামে ঘটেনি। আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক সেই সব লোকের প্রত্যেকের ওপর যাদের হাত ছিল সেই ঘটনায় অর্থাৎ হুকুম চালিয়েছে এবং যারা এই কাজ সম্পাদনে কোন না কোনভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এবার ইয়াজিদ সৈন্যরা কুফার দিকে চলল। প্রত্যক্ষদর্শী কোররাহ ইবনে কায়েসের বর্ণনা :

আহলে বায়াতের মহিলাগণ হজরত হোসাইন (আ.) এবং তার নিহত সন্তান ও সাথীগণের বিধ্বস্ত দেহগুলি দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাদের আহারী ও ফরিয়াদে মরুভূমি হাহাকার করতে লাগল। আমি হজরত জয়নাব বিনতে ফাতিমার (রা.) বিলাপ দৃশ্য কখনও ভুলব না। তিনি বলছিলেন “হে মুহাম্মদ (দ.) আপনার প্রতি আকাশের ফেরেশতাগণ দরুদ ও সালাম পেশ করতে থাকেন। (অথচ) আপনার উম্মতনামধারী নরাধমগণের অত্যাচারের ফলে আপনার হোসাইন (আ.) মরুভূমিতে রক্তে রঞ্জিত ও ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া কিভাবে পড়িয়া আছে। সর্বদেহ খন্ড-বিখন্ড করা হইয়াছে। আপনার আদরের কন্যাগণ আজ বন্দিনী। আপনার বংশধরেরা সব নিহত। মরুভূমির হাওয়া তাহাদের দেহের ওপর ধুলির আস্তর বিছাইয়া দিতেছে।” হজরত জয়নবের এই হৃদয় বিদারক বিলাপ শুনে জালেমগণ পর্যন্ত অশ্রু সংবরণ করতে পারল না। কুফাবাসীদের প্রতি বন্দিনী অবস্থায় আনীত হজরত জয়নব (রা.)-এর ভাষণ :

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সমূহ সালাত আমার পিতা মুহাম্মদ (দ.) ওপর এবং তাঁহার পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বংশধরদের ওপর।

হে কুফাবাসীগণ ! হে প্রতারকগণ ! তোমরা বিশ্বাসঘাতক ! তোমরা পাপী! তোমরা আমাদের জন্য কাঁদিতেছ ? আল্লাহ তোমাদের অশ্রুপাত লাঘব না করুন এবং তোমাদের দুঃখ-বিলাপ কখনও শেষ না হউক।

তোমরা তেমন মেয়ে মানুষের মতো যারা পরিশ্রম করিয়া শক্ত সূতা পাকায় এবং পরে তাহা আঁশে আঁশে বিচ্ছিন্ন করে। তোমরা ঈমানকে ব্যবহার করিয়াছ তোমাদের আপন লোভে এবং তোমাদের কর্তব্যকে স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং তোষামোদির ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছ।

সাবধান ! তোমাদের বাহুল্য বক্তব্য, মিথ্যা আত্মপ্রসাদ, অধর্ম, লাম্পট্য, শত্রুতা, হিংসাপরায়ণতা, মিথ্যা এবং ভনিতা ব্যতীত তোমাদের মধ্যে কিছুই নাই।

তোমাদের অন্তর একজন ঘৃণ্য ও নীচ ক্রীতদাসীর মতই সৎস্বভাব বর্জিত এবং লজ্জাজনক।

তোমাদের অন্তর শত্রুতা এবং প্রতিশোধ পরায়ণতায় ভরপুর। তোমরা গোবর ও পশুর মলে জন্মান শাকসবজির মতো এবং তোমরা সমাধিতে সিমেন্টের আস্তরের মত (পাষাণ)।

তোমাদের পরকালের জন্য এরই মধ্যে তোমরা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছ তাহা অতি নগন্য, এবং তোমাদের পরকালের সঞ্চয় আল্লাহর চিরন্তন রাগ-রোষ উৎপত্তির অনিবার্য কারণ।

তোমরা কাঁদিতেছ ? হ্যাঁ, তোমাদের কাঁদাই উচিত। বেশি করিয়া কাঁদ, কম হাস, কারণ তোমরা একটা কেলেংকারী দ্বারা আক্রান্ত– যাহা হইতে তোমরা কখনও মুক্ত হইতে পার না। আল্লাহর রসুলের বংশধরগণকে হত্যা করার অপরাধ হইতে অধিকতর পাপ ও অপরাধ আর কি হইতে পারে !

তিনি (হজরত হোসাইন আ.) ছিলেন (আল্লাহর) মিশনের বিশেষ উৎস। তিনি ছিলেন জান্নাতের যুবকদের সরদার, তিনি ছিলেন সদাচারী দল ও সংঘের আশ্রয়স্থল; তোমাদের শান্তি ও নিরাপত্তাকে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন; তিনিই যিনি তোমাদের মধ্যকার অভাবীদিগের ক্ষতে প্রলেপ দান করিতেন এবং তোমাদের পথে জীবনের অন্ধকারে আলো জ্বালাইয়া ছিলেন। তিনি ছিলেন হাদিসের সংরক্ষক। তোমরা তোমাদের পরকালের জন্য মন্দ ব্যবস্থা তৈরি করিয়াছ এবং এই দুনিয়ায় তোমরা তোমাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছ আল্লাহর রোষ, ঘৃণা, ক্লেশ, ব্যর্থতা এবং ধ্বংস।

হে কুফাবাসীগণ ! ধিক তোমাদিগকে ! তোমরা কি জান মুহাম্মদ (দ.) এর কোন্ অংশ তোমরা কাটিয়া ফেলিয়াছ এবং কোন্ প্রতিজ্ঞা তোমরা ভঙ্গ করিয়াছ ? এবং কত বড় একজন সম্মানিত মহিলাকে তোমরা জনগণের সামনে উন্মুক্ত করিয়াছ ? এবং কোন্ রক্ত তোমরা প্রবাহিত করিয়াছ ? এবং কোন পবিত্রতা তোমরা বিনষ্ট করিয়াছ ?

একটা বীভৎস এবং লজ্জাকর কর্ম যাহা আনয়ন করিয়াছে দুর্যোগ, অমঙ্গল, অন্ধকারাচ্ছন্নতা এবং কদর্যতা–যাহা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে সমগ্র পৃথিবী এমন কি আকাশ সমূহ। ইহাতে তোমরা আশ্চর্য হও যে, আকাশের রক্তক্ষরণ হইবে এবং যে শাস্তি তোমরা আখেরাতে পাইবে তাহা ইহাকে ছাড়াইয়া যাইবে ? এবং তোমরা কখনও বিজয় অর্জন করিতে পারিবে না।

যে অবকাশ এখন আল্লাহ তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহার ওপর অগ্রান্বিত দৃষ্টি রাখিও না। যেহেতু তোমাদের জন্য পলায়ন নাই (সেই হেতু) আল্লাহ তাহার শাস্তি দানে ত্বরান্বিত করেন না। তিনি তোমাদিগকে পরাভূত করিতে চির প্রস্তুত। "নিশ্চয় তোমাদের রব অবশ্য তোমাদের অভ্যন্তরে প্রহরায় আছেন।"

রাত অতিবাহিত হওয়ার পর ভোর হল। ইবনে জিয়াদ দরবারে আগমন করল। তাকে কারবালার তথাকথিত বিজয় সম্পর্কে অবহিত করা হল। হাওলা বিন ইয়াজিদ হজরত হোসাইন (আ.) এর মস্তক মোবারক দরবারে নিয়ে পেশ করল। এবং একটি পাত্রের ওপর রেখে জিয়াদের সামনে রাখল। তখন ইবনে জিয়াদের হাতে একটি ছড়ি ছিল। সে ছড়ির মাথা হজরত হোসাইন (আ.) ঠোঁট মোবারকের ওপর লাগালো এবং দাঁতে মোবারকের সাথে ঘষতে লাগল (নাউজুবিল্লাহ)। এই সময়ে তার দরবারে বিখ্যাত সাহাবি জায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) চীৎকার করে উঠলেন, "ছড়ি সরাইয়া লও। আল্লাহর কসম আমি নিজ চোখে ঐ পবিত্র ওষ্ঠে রসুল (দ.) কে চুম্বন করতে দেখেছি। এই বলে তিনি অবিরল ধারায় রোদন করতে লাগলেন।" জিয়াদ ক্রোধান্বিত হয়ে বলল দেখ এই বৃদ্ধ বলেই জিয়াদের সামনে এইরূপ কথা বলে রেহাই পেল। নতুবা এক্ষনি তোমার গর্দান ধুলায় লুটাইয়া পড়ত। জায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) এই বলতে বলতে দরবার হতে বের হয়ে গেলেন : হে আরববাসী, তোমরা আজ হইতে আবার গোলাম হইলে (অর্থাৎ স্বাধীন হওয়ার যে সুযোগ ছিল তা হেলায় হারালে)। তোমরা ফাতেমা (আ.) এর পুত্রকে হত্যা করলে। আর মারজানার পুত্র ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে হাকিম বানাইলে। সে তোমাদের সৎ লোককে হত্যা করে দুষ্ট লোককে বাধ্য করে নিয়াছে। তোমরা অপমানের ডালা মাথায় লইলে যাহারা নিজেদের অপমান করে আল্লাহ তাহাদের ধ্বংস করেন। হজরত জয়নব (রা.) এবং ইমাম পরিবারের অন্যান্য মহিলা ও শিশুগণকে যখন জিয়াদের সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। তখন জয়নব (রা.) এর পরিধানে এমন জীর্ণ বস্ত্র ছিল যে তাঁকে চিনতে পারা যাইতেছিল না। জিয়াদ তার পরিচয় জানতে চাইলে একজন বলল ইনি জয়নব বিনতে ফাতিমা (রা.)। ইবনে জিয়াদ ভৎর্সনা সূচক শব্দে চিৎকার করিয়া বলে, 'খোদাকে ধন্যবাদ'। তিনি তোমাদিগকে লাঞ্চিত করিয়াছেন এবং তোমাদের সুনামের প্রতি কলংক লেপন করিয়াছেন। উল্লেখ্য ইতোমধ্যে নিজেদের কুকর্মের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর ওপর চাপানো উমাইয়াদের একটি বাগধারায় পরিণত হইয়াছিল।

হজরত জয়নব দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, “সেই আল্লাহকে অজস্র প্রশংসা যিনি আমাদিগকে হজরত মুহাম্মদের (দ.) ওসিলায় সম্মান দান করিয়াছেন, আমাদিগকে পবিত্র করিয়াছেন। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য নহে। বরং যে বদকার দুরাচার সেই লাঞ্ছিত সেই কলংকিত।” ইবনে জিয়াদ বলিল, তাহা তো দেখিতেই পাইয়াছ আল্লাহ তোমার বংশের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। হজরত জয়নব (রা.) বলিলেন তাঁহাদের ভাগ্যে শহিদি মৃত্যু লিখিত ছিল তাই তাহারা কারবালায় পৌঁছিলেন। তিনি আরো বললেন, হে ইবনে জিয়াদ সেই সময় বেশি দূরে নয়, যখন হাশরের ময়দানে একদিকে নবি করিম (দ.) থাকিবেন আর একদিকে ইমাম হোসাইন (আ.) থাকবেন তখন তুমি দেখবে জালিমদের কি পরিণতি হয়। আমাদের আরজি আল্লাহর দরবারে পেশ করেছি।

ইবনে জিয়াদ বলিল, “তোমার গর্বিত সরদার এবং তোমাদের আহলে বায়াতের নফরমান ধর্ম বিদ্রোহিগণ সম্পর্কে চিন্তা হইতে আল্লাহ আমাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন।” যে বা যারা জীবন্ত “লাইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ” কে ধর্মদ্রোহী বিবেচনা করে তাকে বা তাদের ধর্মমত কি তা বিবেচনা করার জন্য ফিকাহবিদ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

ইত্যবসরে হজরত ইমাম জয়নাল আবেদীনের (রা.) এর প্রতি ইবনে জিয়াদের চোখ পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল এ কে ? বলা হলো এ হলো হজরত হোসাইন (আ.) এর পুত্র। ইবনে জিয়াদ বলল, একে কেন জীবিত রেখেছ ? তাকে বলা হলো এ অসুস্থ ছিল আর আমাদের সাথে যুদ্ধ করতেও আসেনি। ইবনে জিয়াদ বলল একেও হত্যা করে দাও। আমি চাইনা এদের একজনও বাকি থাকুক। খোদার দুশমন এই কথা বলার সাথে সাথে জল্লাদ তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আসলো। হজরত জয়নব (আ.) হজরত জয়নাল আবেদীন (রা.) এর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, “জালিমেরা আমাদের সাথে কোন মোহরেম (আপনজন) নেই। এই আমাদের একমাত্র নিকটতম পুরুষ আত্মীয়। যদি তোমরা একেও হত্যা কর আমাদের সাথে কোন মোহরেম থাকবে না। তাই তুমি (জিয়াদ) জেনে রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে না হত্যা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর কাছে পৌঁছতে পারবে না। যদি একে হত্যা করতে চাও তাহলে প্রথমে আমাকে হত্যা কর। একে হত্যা করে ফেল্লে হজরত রসুল (দ.) এর সিলসিলা কিভাবে জারি থাকবে।” এই কথাগুলোর মধ্যে এমন কেরামতি ছিল যে আল্লাহতা'লা যিয়াদের মত পাষন্ডের মনে এক ধরনের ভীতি সৃষ্টি করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত জিয়াদ এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলো।

এরপর ইবনে জিয়াদ কুফা শহরে সাধারণ সমাবেশের আয়োজন করল এবং সমবেত লোকদের ধমক ও হুমকী দিয়ে বলল, “দেখ ! যারা ইয়াজিদের বিরোধিতা করেছে তাদের কী পরিণতি হয়েছে। তোমরাও যদি ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কোন কথা বল তাহলে তোমাদেরও একই পরিণতি হবে। সে নির্দেশ দিল যে, “শহিদদের মস্তক সমূহ বর্শার অগ্রভাগে নিয়ে এবং আহলে বায়াতের অবশিষ্ট সদস্যদেরকে উটের পিঠে উঠিয়ে কুফার গলিতে যেন ঘুরানো হয়। যাতে লোকেরা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ করার সাহস পায়।” এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হয়। এবং আহলে বায়াতের পর্দানশীন সম্মানিতা মহিলাগণ যাদের ঘরে ফেরেশতাদের ঢুকতে অনুমতি নিতে হতো, যাদের দোপট্টা পর্যন্ত কোনদিন কোন লোক দেখার সুযোগ পায়নি, আর সেই মহাপবিত্র মহিলাদেরকে বেপর্দাভাবে কুফার অলিতে-গলিতে ঘুরানো হলো। এঁদেরকে দেখে অনেকেই কাঁদছিল। কিন্তু কুফাবাসীরা যে অন্যায় করেছে তা তো কেয়ামত পর্যন্ত শোধ হবার নয়।

ইমাম পাকের মস্তক মোবারক বর্শার মাথায় বিদ্ধ করে জোহর ইবনে কায়াসের মারফত ইয়াজিদের নিকট প্রেরণ করা হল। জোহর ইবনে কায়েস বর্ণনা করেন, জনৈক বাহক যখন হজরত হোসাইন (আ.) এর বর্শা বিদ্ধ ছিন্ন মস্তক নিয়ে ইয়াজিদের দরবারে উপস্থিত হইল তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ইয়াজিদ জিজ্ঞাসা করল সংবাদ কি ? জোহর ইবনে কায়েস বলিল; “আঠার জন আহলে বাইত এবং ষাটজন সংঙ্গীসহ হোসাইন (আ.) আমাদের নিকটবর্তী হলে আমরা তাকে বাধা দিলাম এবং আত্মসমর্পণ অথবা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তাব দিলাম। তিনি আত্মসমার্পণের পরিবর্তে লড়াই স্বীকার করিয়া নিলেন। আমরা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর আক্রমণ করলাম। আমাদের তরবারির আঘাতে তাহারা বাজ বিতাড়িত কপোতের ন্যায় এদিক-ওদিক ছুঁটিয়া পলায়ন করিতে শুরু করিল। আমরা তাহাদিগকে সমুল ধ্বংস করিয়া ফেলেছি। এতক্ষণে

তাহাদের চেহারা ধুলায় ঢাকিয়া গিয়াছে। রৌদ্র তাপে তাদের দেহ শুকাইয়া গিয়াছে এবং উহা শুকুনের খাদ্যে পরিণত হইয়াছে।” মনে রাখতে হবে কোন বৈধ যুদ্ধেও অমুসলিম শত্রুর সাথেও এ ধরনের আচরণ শরিয়ত মতে ভয়াবহ অপরাধ তথা গোনাহ। মুসলমানদের খলিফার কাছে সংবাদদাতা এ ধরনের শরিয়ত বিরোধী কাজ করার বা রসুল (দ.) এর সন্তানদের সাথে এ ধরনের আচরণ করা যে মোটেই শরিয়ত সম্মত নয় এমনকি সাধারণ যুদ্ধনীতিরও পরিপন্থী, সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার। অর্থাৎ ঘটনা বর্ণনাকারী ভালভাবেই জানত ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কে অথবা আহলে বায়াতদের মর্যাদা বা সাধারণ যুদ্ধনীতি পালনের ব্যাপারে তার আমিরের কোনরূপ শ্রদ্ধাই নাই।

ইয়াজিদ কেমন ধরনের মুসলমান ছিল তা তার ব্যক্তিগত চরিত্রের জঘন্য দিকগুলি বর্ণনা না করে হজরত হোসাইন (আ.) এর মস্তক মোবারক তার সামনে হাজির করা হলে কি আচরণ করেছিল তা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়।

আল্লামা সৈয়দ আলী-বিন-শাহাব উদ্দীন উলুবী হামদানী তাহার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক ‘ইয়ুনাবিউল মোয়াদ্দত’ এ উল্লেখ করেছেন। “যখন ইমাম হোসাইন (আ.) এক কর্তিত মস্তক মোবারক ইয়াজিদের কাছে হাজির করা হইল; দামেস্কের লোক একত্রিত করিয়া ছড়ির দ্বারা ঐ মহান মস্তক মোবারক ও দান দান পাকের (দাঁতের) ওপর আঘাত করিতে করিতে নিজেও কবিতা আউড়াইতেছিল।

“আফসোস ! বদরের মৃত আমার বুজর্গগণ যদি জিন্দা থাকিতেন তাহারা সাবাস দিতেন আর খুশি মানাইতেন, আর কহিতেন ! ওহে ইয়াজিদ ! তোমার হাত যেন দুর্বল না হউক। আমরা জাতির সর্দারগণকে কতল করেছি। আমরা বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়েছি আর উপযুক্ত বদলা নিয়েছি। আওলাদে আহমদ (দ.) হইতে আহমদের (দ.) কাজের বদলা নিতাম তবে আমি মনাফের বংশেরই হইতাম না।” (আলে রসুল ও মাবিয়া-মঞ্জুরুল আলম কাদেরি, পৃ. ২৪৪)

অর্থাৎ কারবালার যুদ্ধের মাধ্যমে উমাইয়াগণ প্রকৃতপক্ষে বদরের যুদ্ধে যে সকল কাফের উমাইয়া সরদারগণকে জাহান্নামে পাঠানো হয়েছিল তার রক্তাক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। এবং মনাফের বংশধর হিসেবে এই ‘পবিত্র’ দায়িত্ব ইয়াজিদের ওপর বর্তিয়েছে বলে মনে করতো। এবং তা সে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেছে। আহলে বায়াতদের সম্পর্কে ইয়াজিদের এই ধারণা প্রমাণ করে যে ইয়াজিদ প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের নেতা হিসেবে আহলে বায়াতদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।

ইয়াজিদ তার নিজ দাবি ও অবস্থান সম্পর্কে বলল : “দেখ আলী (জয়নাল আবেদীন) তোমার পিতাই আমার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন আমার খেলাফতের দাবি অস্বীকার করিয়াছেন। আমার কর্তৃত্ব হরণের চেষ্টা করিয়াছেন।” ইয়াজিদের পিতা যে নিজেই অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী ছিল এবং সে অবৈধরূপে ইয়াজিদকে খলিফা মনোনীত করেছিল এবং এ ধরনের পদ্ধতি যে, ইসলামি শরিয়তের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিলনা তা-ইয়াজিদ বা তার সহচরগণ স্বীকার করিত না। ওপরুন্ত ইয়াজিদ বলল, “অতঃপর আল্লাহ তাঁহার হোসাইন (আ.) সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা দেখিতেই পারিয়াছ।” এই কথায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে ইয়াজিদের নির্দেশ/অনুমোদন অনুযায়ী আহলে বায়াতদের ওপর এ ধরনের আচরণ করা হয়েছিল ওপরুন্ত নিজের ইচ্ছাকৃত জঘন্যতম কাজের জন্য সে আল্লাহকে দায়ি করে আরো একটা ভয়াবহ অপরাধ করেছে।

অনেক উমাইয়া ঐতিহাসিক ও তাদের অনুচর বা বর্তমানে উমাইয়াদের কিছু অন্ধভক্ত অজ্ঞতা অথবা অন্য কোন দুর্বলতাজনিত কারণে বলে থাকেন কারবালার ঘটনার কথা ইয়াজিদ জানত না। এ কথা যদি সত্যিই হয় তবে একথা স্বীকার করতেই হবে মুসলিম রাজার বড় বড় সেনাপতিরা ও সাধারণ সৈন্যরা রাজার বিনা অনুমতিতে এ ধরনের জঘন্যতম ধর্মহীনতার কাজ করতে পারে সে ব্যক্তি অবশ্যই মুসলমানদের আমির হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা। অন্যদিকে রাজার অনুমতিক্রমেই যদি এ ধরনের অমানবিক ও ধর্মহীনতার কাজ বা আচরণ করা হয়ে থাকে সেই বাদশার ধর্মীয় জ্ঞান, ন্যায় পরায়ণতা ও সততা বা ন্যায় বিচারের যোগ্যতা ও মানবতাবোধ একেবারেই নাই, তা সহজেই বোঝা যায়। আর এ ধরনের কোন ব্যক্তির কোনক্রমেই মুসলিম জাহানের খলিফা হওয়ার কোন যোগ্যতা নাই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যায় যে, ইয়াজিদের সৈন্যরা তার বিনা অনুমতিতে বা অজ্ঞাতে এ ধরনের জঘন্য আচরণ করেছে। তাহলে ঘটনাটি

জানার পর মুসলমানদের নেতা হিসেবে নবি পরিবারের সদস্যদের বিশ্বের জঘন্যতম পদ্ধতিতে হত্যা, মৃত দেহের সাথে নিষ্ঠুরতম আচরণ, আহলে বায়াতদের মহিলাদের বেপর্দা করে জনসমক্ষে ঘোরানো ইমাম পাকের মস্তক মোবারক জনসমক্ষে দেখানো, ইসলামের কেন্দ্রবিন্দুদেরকে ইসলামের জঘন্যতম শত্রু বা তথা ধর্মোদ্রোহী হিসেবে জনসমক্ষে মিথ্যা প্রচার করা প্রভৃতি কর্মকান্ডের শরিয়তের বিধান অনুযায়ী শাস্তি আরোপ করতো। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে ইয়াজিদ, ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ, ওমর বিন-সাদ, সিমার কারো বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি বরং তাদেরকে নানাভাবে পুরস্কৃত করেছে। ওপরন্তু ইয়াজিদ "আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ব্যক্তিকে রাজত্বদান করেন।" মর্মে কোরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তার বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপকে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে।

উল্লেখ্য পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতের ইয়াজিদ প্রদত্ত ব্যাখ্যাই যদি সঠিক হতো তাহলে ফেরাউন, সাজ্জাদ, নমরুদ প্রভৃতি কুখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষমতা ভোগ আল্লাহর পছন্দনীয় বলে বিবেচনা করতে হবে যা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। ইয়াজিদের চরিত্র ও কর্মকান্ড সম্বন্ধে বর্ণিত ঘটনা পর্যালোচনা করলে এটা যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, ইতিহাসের আলোকে তা প্রমাণ করার জন্য নিম্নোক্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে :

কারবালা যুদ্ধের লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় এবং ইয়াজিদের জুলুম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চারদিক থেকে বিদ্রোহের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। হজরত রসুল (দ.) এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি মদিনাবাসীদেরকে কষ্ট দেবে এবং ভীত সন্ত্রস্ত করবে সে দুনিয়া এবং আখেরাতের আজাবে গ্রেপ্তার হবে।

'হাররার' মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কেও অনেক সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। হজরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– মদিনার ওপর এমন এক সময় উপস্থিত হবে যে, মদিনার বাসিন্দাদেরকে এখান থেকে বের করে দেয়া হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন কে তাদেরকে বের করে দেবে? রসুল (দ.) এরশাদ করলেন দুষ্ট আমিরগণ।" বুখারি, মুসলিম শরিফের হাদিসে বর্ণিত আছে যে, নবি করিম (দ.) এরশাদ করেছেন, কুরাইশ গোত্রীয় লোকের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে। অপর এক হাদিসেও হজরত আবু হোরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে হজরত (দ.) এরশাদ করেছেন– "যে মহান সত্তার কুদরতের হাতে আমার জীবন তারই শপথ করে বলছি; মদিনায় এমন এক যুদ্ধ সংঘটিত হবে যার ফলে দ্বীন এখান থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যে, যেমন মাথা মন্ডনের ফলে চুল মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেদিন তোমরা মদিনার বাইরে চলে যেও। এক মঞ্জিলের ব্যবধানে হলেও।" হজরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে তিনি এভাবে দোয়া করতেন– হে আল্লাহ আমাকে ষাট হিজরির অঘটন এবং ছেলেদের রাজত্ব থেকে রক্ষা করুন। সে আসার পূর্বেই আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিন। এতে ইয়াজিদের হুকুমতের প্রতিই ইংগিত রয়েছে। কেননা সে ষাট হিজরিতে সিংহাসনে আরোহন করেছে এবং হারবার ঘটনা তারই সময়ে সংঘটিত হয়েছে।

কুরতবি বলেন– মদিনাবাসীদের মদিনা থেকে বাইরে চলে যাওয়ার কারণ এই হারবারেই মর্মান্তিক ঘটনা। দুষ্ট ইয়াজিদ মুসলিম ইবনে একবার নেতৃত্বে (সিরিয়) এক বিশাল বাহিনী যুদ্ধ করার জন্য মদিনায় প্রেরণ করে। সৈন্য বাহিনীর বদকখত লোকেরা এই 'হাররা' নামক স্থানে নিতান্ত নির্মমতা এবং অবমাননার সাথে এই মহাত্মাদেরকে শহিদ করে। ইয়াজিদ বাহিনী তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নব্বির সম্মান হানিকর কাজে লিপ্ত থাকে। এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রাক্কালে কুচক্রী দল শিশু ও মহিলা ব্যতীত বার হাজার চারশত সাতানব্বই জন লোককে হত্যা করে। ইয়াজিদ তার সেনাবাহিনীর জন্য মদিনার অধিবাসীদের সাথে যে কোন ধরনের ব্যবহার অর্থাৎ হত্যা, জেনা, ব্যভিচার, লুট যে কোন ধরনের ব্যবহার করার স্বাধীনতা দেয়। এই কারণেও মোহাদ্দেসগণ ইয়াজিদকে কাফের হিসেবে ফতোয়া দিয়েছেন। বর্ণিত এই ঘটনার পর এক হাজার মহিলা অবৈধ সন্তান প্রসব করে। এরা মসজিদে নব্বির অমার্জনীয় অবমাননা করে। এ পবিত্র স্থানে তারা ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করে। রসুল (দ.) এর রওজাপাক ও মিম্বরের মধ্যবর্তী জায়গাকে বেহেশতের টুকরা হিসেবে অভিহিত করেছেন। সেই জায়গা ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর ঘোড়ার পেশাব-পায়খানায় কলুষিত হয়। আর লোকদের থেকে ইয়াজিদের জন্য এভাবে বায়াত নেয়া হয়, যে ইয়াজিদ যদি ইচ্ছা করে তোমাদেরকে বিক্রয় করতে পারবে, তোমাদেরকে স্বাধীনভাবে রাখতে পারে। সে যদি ইচ্ছা করে আল্লাহর বন্দেগিতেও রাখতে পারবে, আর যদি ইচ্ছা করে নাফরমানি করারও নির্দেশ দিতে পারে। হজরত আবদুল ইবনে জমআ (রা.) নামক এক ব্যক্তি যখন ইয়াজিদ এর সেনাপতিকে বললেন, বায়াত তো অন্ততপক্ষে কোরআন ও

সুন্নতের ওপর গ্রহণ করা চাই। তখনই মুসলিম ইবনে ওকবা তাকে শহিদ করে দেয়। ইমাম কুরতবি বলেন– ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, মদিনা মুনাওয়ারা তখনকার দিনে জনপদ শূন্য হয়ে যায়। তখন মরুর পশুপাখিরা তথাকার ফলমূল উপভোগ করতো। মসজিদে নব্বি কুকুরের আড্ডায় পরিণত হয় (নাউজুবিল্লাহ)।

মনে রাখতে হবে মদিনা অপবিত্রকারী খোদার দুশমন মুসলিম ইবনে ওকরা হজরত ওসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ নেয়া বিশেষ সওয়াবের কাজ মনে করে মদিনাবাসী ও নবির শহর মদিনাকে এইভাবে অপবিত্র করেছিল। এই ধরনের ভুল ধারণা প্রকৃতপক্ষে মাবিয়া ও তার অনুসারী আলেমগণের কু প্রচারণার ফসল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই দুরাচার মুসলিম বিন ও মদিনা মুনাওয়ারায় লুটপাট এবং হত্যা যজ্ঞ সমাপ্ত করার পর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়।

মহানবি (দ.) বলেছেন যে এটা জান মক্কা নগরীকে আল্লাহ পবিত্র নগরী ঘোষণা করেছেন এটা কোন মানুষের দ্বারা পবিত্র ঘোষিত হয়নি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাস করে তার জন্য মক্কা নগরীতে রক্তপাত বৈধ হবেহ না। অথচ মুসলিম বিন ওবা মৃত্যুর পূর্বে হোসাইন ইবনে নুসাইরকে তার স্থলাভিষিক্ত করে বললো, "ইয়াজিদ আমার পরে তোমাকেই আমির নিযুক্ত করেছে। তুমি অতি সত্বর মক্কায় পৌঁছে আবদুল্লাহ ইবনে জোবাইর যদি কাবাগৃহ আশ্রয় গ্রহণ করে তবে এতেও কোন পরোয়া করোনা, কামান দাগিয়ে দিও।" হোসাইন ইবনে নুমাইর চব্বিশ দিন মতান্তরে চৌষট্টি দিন যাবত মক্কা শরিফকে ঘেরাও করে রাখে এবং কামানের গুলি ছুঁড়ে। এই কারণে কাবাগৃহে ফাটল ধরে যায়। জনৈক সেনানি কাবার গিলাফে আগুণ ধরিয়ে দেয় ফলে বেহেশতি দুম্বার দুটি শিং পুঁড়ে যায়। হরে আসওয়াদ তিন খন্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। এই জঘন্য ঘটনা ঘটতে থাকা কালীন সময়ে ইয়াজিদ খোদায়ি গজবে প্লেগ রোগে মতান্তরে ঘোড়া থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায় (৬৮৩ খ্রি.)।

ইয়াজিদের রাজত্বকাল সর্বমোট সাড়ে তিন বছর ছিল। এই সময়ে তার দ্বারা নবি বংশ ধ্বংস, নিধন, রসুল (দ.) এর রওজা পাক অপবিত্র করন, পবিত্র মদিনায় নারী নির্যাতনসহ সাহাবিগণ হত্যা, মক্কা শরিফে প্রস্তর নিক্ষেপ যন্ত্রের সাহায্যে (কামান) ফাটল সৃষ্টি, মানুষ হত্যা করে কাবা শরিফে টাঙিয়ে রাখা এসবই ছিল তার কুকর্মের তালিকা।

প্রসঙ্গত বলা যায় হজরত হুসাইন (আ.) তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে ইয়াজিদের চরিত্রের এই দিক অবগত ছিলেন বলেই তার হাতে বায়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। যদি মক্কা মদিনা কুফা সহ অন্যান্য শহর আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আহলে বায়াতের অনুগত্য স্বীকার করে হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) এর হাতে একযোগে বাইয়াত নিতেন তাহলে ইসলামের ইতিহাস অন্যভাবে লিখা হতো। অর্থাৎ বাইয়াতের যথার্থতা অনুসরণ না করার জন্যই মুসলমানদের এ ধরনের পরিণতি হয়েছিল এ কথা যদি কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বলেন তাহলে তা কোনক্রমেই তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইতিহাসের জঘন্যতম এই হত্যাকান্ড মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা মুসলিম উম্মা আজ পর্যন্ত বহন করে আসছে।

কারবালার যুদ্ধের ফলাফল :

১। রসুল (দ.) এর ওফাতের পর হজরত আলী (আ.) ওসিয়ে রসুল (দ.) হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বীকৃতি।

২। দ্বীন ইসলামের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্মানিত আহলে বায়াতগনের ভূমিকার অস্বীকৃতি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি।

৩। কোরআন ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নবি পরিবারের বিশিষ্ট সদস্যদের বৈধ কর্তৃত্বের অস্বীকৃতি।

৪। আরবি ভাষা জানা যে কোন পন্ডিত বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই পবিত্র কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করা।

৫। কোরআনের একই বিষয়ে একাধিক ব্যাখ্যার স্বীকৃতি, ফলে দ্বীন ইসলামে একটি স্থায়ি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

৬। হাদিসের ব্যাখ্যাকারক হিসেবে সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি বা রাজার নিয়োগকৃত কাজিদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচনা করার প্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজে ধর্মীয়ভাবেই বিভিন্ন গ্রুপের অস্তিত্বের লাভ স্বীকৃতি।

৭। রসুল (দ.) এর মহান চরিত্রকে কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে অবমূল্যায়ন।

৮। ইসলাম ধর্মের প্রগতিশীল, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রভৃতি বৈপ্লবিক সংস্কারমূলক কার্যক্রমকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের ফতোয়ার মাধ্যমে রোম ও পারস্যের রীতি নীতিকে ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ বলে চালু করন।

৯। ইসলামের অর্থনৈতিক বিধি বিধান রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচনা না করে জাকাত প্রথাকে নামাজ রোজার ন্যায় একটি ব্যক্তিগত ইবাদতে রূপান্তরিত করন।

১০। রাজতন্ত্র সামরিকতন্ত্র জমিদারতন্ত্র ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

১১। 'সব মাফ মতবাদ' সমাজে ইসলাম ধর্মীয় বিধান হিসেবে চালুকরন।

১২। অদৃষ্টবাদের বিকৃত ব্যাখ্যা কোরআনী মতবাদ হিসেবে প্রবর্তন করা।

১৩। সকল কাজের জন্য আল্লাহকে দায়ি করে ব্যক্তিগত দায়িত্ব এড়ানোর মতবাদ সমাজে চালু করা ।

১৪। আল্লাহ– সমাজ পরিচালনার জন্য নবির (দ.) পরে উলিল আমর বা নায়েবে নবির তথা অলির (রা.) মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করেন এই মতবাদের অস্বীকৃতি।

১৫। কোরআনের প্রকাশ্য ও গুত ব্যাখ্যা সম্পর্কিত তত্ত্বের রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি।

১৬। বল প্রয়োগই ক্ষমতায় যাওয়ার একমাত্র বৈধ মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা।

১৭। যেন-তেন পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আরোহন করলেই রাষ্ট্রপ্রধানের পদের বৈধতার তথাকথিত ধর্মীয় স্বীকৃতি।

১৮। শাসন ক্ষমতা গ্রহণের উত্তরাধিকার আইন বিষয়ক জটিলতা ও মুসলমানদের মধ্যে ইলমে তাসাউফ বা মারফতি জ্ঞানের রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি সৃষ্টি, রক্তপাতের স্থায়ি ব্যবস্থা।

১৯। মাবিয়া বা ইয়াজিদের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতিতে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বৈধ শাসক মনে করা।

২০। বাক স্বাধীনতা হরণ।

২১। রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তৃত্বের বৈধতা সম্পর্কে সমালোচনা বা তাকে উৎখাত করার যে কোন প্রচেষ্টাকে খোদাদ্রোহিতা হিসেবে গণ্য।

২২। উল্লেখিত সকল মতামতগুলির যথার্থতা ও ধর্মীয় যৌক্তিকতা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিপুল পরিমাণ পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার।

২৩। এই বিকৃত ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সঠিক অপরিবর্তিত ও প্রকৃত ইসলাম হিসেবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকার যে ইসলাম প্রচার করে থাকে বা তার প্রসারের জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে তাই যে ইসলামের সঠিক রূপ তা বল প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা। আরো পরিষ্কার বলতে গেলে কারবালার যুদ্ধের পর বা আহলে বায়াতগণের রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড থেকে চিরস্থায়িভাবে বঞ্চিত করায় দ্বীন ইসলামে কোন রকম ক্ষতি বা বিকৃতি হয়নি তা প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা।

২৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ।

২৫। বংশীয়/গোত্রীয় এবং জাতীয় ভাবধারার সৃষ্টি।

২৬। রাজা কর্তৃক ঘোষিত যে কোন যুদ্ধকেই জেহাদের মর্যাদা দান/জেহাদ ও পররাজ্য লোভের জন্য যুদ্ধের গুণগত পার্থক্যের বিলুপ্তি।

২৭। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এই নীতির অবসান।

২৮। হজরত আলী (আ.) এর মর্যাদা প্রথম তিন খলিফা চেয় কম তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা।

২৯। কোন রকম পির মুর্শেদ ছাড়া আল্লাহতালার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করার মতবাদ চালু করা ।

৩০। হালাল-হারাম শুধু মদ, শুকরের মাংস ও রক্তের মধ্যেই সীমিত করন।

৩১। রাজারা আচার অনুষ্ঠানে শরাব খাবেন,খাওয়াবেন। রাজপ্রসাদে বসবাস করবেন, মাথায় কোটি কোটি টাকা মূল্যের রাজমুকুট ও বহুমুল্যবান রাজ পোষাক পরিধান করবেন, শত শত দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত থাকবেন। সাধারণ মানুষ স্বপ্নেও তাদের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে। শত শত মহিলা তাদের বৈধ ও অবৈধ স্ত্রী হিসেবে থাকবে ও প্রজা ও নিপীড়নমূলক কাজ করবেন। কিন্তু কিছু কিছু জনহিতকর কাজ করবেন। তবুও তিনি বৈধ ধর্মীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এতে দ্বীন ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না বা এ ধরনের ব্যক্তিকে অনুসরণ করাও ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করতে হবে মর্মে ঘোষণা।

রাজ রাজারা বা সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা যে প্রচলিত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় হারাম খেতে লাগল তা ধর্মীয় বিশ্লেষণের বাইরে চলে এলো। অর্থাৎ ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করা হলো। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে ধর্মের ভূমিকা শুধু বিছমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, মারহাবা ও মাশআল্লাহ এর মৌখিক উচ্চারনের মধ্যে সীমিত হলো।

রাষ্ট্রীয় আচার অনুষ্ঠান ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ধমীয় নির্দেশের বাইরে এসে পড়লো বিধায় ধর্মের প্রকাশ্য আলোচনা শুধুমাত্র অদৃশ্য বিষয়বস্তু বেহেশত, দোজখ, অজু, গোসল, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতির মাসলা-মাসায়েল এর মধ্যেই সীমিত রাখা হলো। এছাড়াও পবিত্র কোরআনে ও রসুল (দ.) এর হাদিসে যত আদেশ-নির্দেশ জ্ঞান বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থনীতি সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয় আছে সেসব ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো।

আহলে বায়াতদের দুঃখে পাছে লোকে রসুল (দ.) এর অসিয়ত অনুযায়ী কেঁদে বেহেশতে চলে যায় বা নাজাত প্রাপ্ত হয় তাই শয়তানের অনুসারীরা ফতোয়া দেয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করলে আত্মার কষ্ট হয় ও মৃত ব্যক্তি বেহেশতে যেতে পারে না। অথবা এ ধরনের কান্না জায়েজ নয়। এক সর্বগ্রাসী মহা মূর্খতা ইসলামি সমাজ জীবনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসল।

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে ইসলামের ভিত্তি হিসেবে আহলে বায়াতদের নিজের জীবন থেকে বেশি ভালোবাসা ও তাদের নির্দেশ পালনের মধ্যেই মুসলমানদের প্রকৃত কল্যান নিহিত।

ইমাম হোসাইন (আ.) তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (দ.) এর জীবন্ত প্রতীককে হত্যাকারী ও সমালোচকদের ঘৃণা করার মধ্যেই আমাদের মুক্তি।

কারবালার প্রান্তরে আহলে বায়তদের এই মহান জনদের সাথে খোদাদ্রোহীরা পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছে বিধায় আহলে বায়াতদের সহানুভূতি প্রদর্শন করে যদি কেহ সামান্য পরিমান চোখের পানি ফেলে তাহলে তাকে শাফায়াত করা রসুল (দ.) এর জন্য ওয়াজেব হয়ে যাবে মর্মে রসুল (দ.) তার পবিত্র জবানে উচ্চারণ করেছেন।

হজরত হোসাইন (আ.) এর শাহাদতের পর ইয়াজিদ পাকাপোক্তভাবে ক্ষমতাসীন হয়। তারপর আহলে বায়াতগণের শত্রুগণই ইসলামের প্রতিভূ হয়ে ক্ষমতাসীন হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সে সঠিক ইসলাম প্রচার করেনি তা বলাই বাহুল্য। হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) কি কারণে শাহাদত বরণ করলেন এবং তাঁর আদেশ কি বা প্রকৃত ইসলাম বলতে কি বুঝায় এবং তা কোথায় পাওয়া যাবে এটা অনুসন্ধান করাই কারবালার শিক্ষা।

একাদশ অধ্যায়

কারবালার যুদ্ধোত্তর বাদশাহদের বিচ্যুতি

অভিশপ্ত ইয়াজিদের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মাবিয়া মাত্র কয়েক মাস শাসন ক্ষমতায় আসীন ছিল। রসুল (দ.) কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি ভোগকারী, যার জাল চিঠি ও অন্যান্য কু-কর্মের কারণে হজরত ওসমান (রা.) শাহাদত বরণ করেছিলেন, যার বিষাক্ত তীরে হজরত তালহা (রা.) শহিদ হন, যার প্রত্যক্ষ প্ররোচণায় হজরত হাসান (আ.) কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় ও পরবর্তীতে তাঁর দাফন মোবারক রসুল (দ.) এর রওজা পাকের পাশে হওয়ার কথা থাকা সত্ত্বেও সেই জানাজার মিছিলে তীর, পাথর বর্ষণ করে এহেন দুরাচার মারোয়ান ইবনে হাকাম ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান ধর্মের রক্ষাকারী হিসেবে ক্ষমতায় বসে। মনে রাখতে হবে কিছু সম্মানিত ব্যতিক্রম বাদ দিলে সকল উমাইয়া শাসকগন আল্লাহ, ওহি, কোরআন, পরকাল, দোজখ বেহেশতসহ ইসলামের অধিকাংশ মতবাদই বিশ্বাস করত না। বরং তারা এগুলো বনি হাশিমিদের ক্ষমতা গ্রহণের অপকৌশল হিসেবে মনে করতো (নাউজুবিল্লাহ)। এই কারণে মারোয়ান মদিনার গভর্নর থাকাকালীন ও পরবর্তীতে খলিফা হয়ে রসুল (দ.) প্রবর্তিত বহু বিধি-বিধান যা সে অপছন্দ করতো, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে সেগুলো পরিবর্তন করে এবং পরবর্তীতে সে তার নিজস্ব বিধি বিধান চালু করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– রসুল (দ.) এর রওজা শরিফ চিরদিন মুসলমানদের নিকট অতি পবিত্র। কিন্তু মারওয়ান ছিল প্রকৃতপক্ষে রসুলদ্রোহী। সে কারণে মারওয়ান ইবনে হাকাম যখন এক ব্যক্তিকে দেখতে পায় যে তিনি তাঁর মুখমন্ডল রসুল (দ.) এর রওজা শরিফের ওপর রেখেছে অর্থাৎ সেজদা করছিল অথবা চুম্বন করছিলেন। মারওয়ান তার গর্দান ধরে বলল, তুমি এ কি কাজ করছ (অর্থাৎ এটা করা তো জায়েজ নয়!)। তখন তিনি বললেন আপনি (মারোয়ান) আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা আমি আমার মুখ কোন পাথরের ওপর রাখিনি বরং রসুলুল্লাহ (দ.) এর রওজা শরিফের ওপরই আমার মুখ রেখেছি। একথা বলার পর লোকটি বললেন– আমি রসুলে পাক (দ.) কে বলতে শুনেছি যে, "ঐ সময় তোমরা দ্বীনের ওপর ক্রন্দন কর, যখন দেখতে পাবে যে অনুপযুক্ত লোক দেশের শাসনকর্তা হয়েছে (জবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব/লেখক– মূল হজরত মাওলানা শাহ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.), অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার পির সাহেব, বায়তুল শরিফ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-২৪৩)। মনে রাখতে হবে যেহেতু মারওয়ান গোষ্ঠী দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় ছিল তাই মারওয়ান ও তার পরবর্তী শাসকগোষ্ঠী রসুল (দ.) এর মাজারে সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে নিজেদের মনগড়া বিধান চালু করে যা প্রকৃত পক্ষে রসুল (দ.) এর নির্দেশের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। উল্লেখ্য বর্তমানেও রসুল (দ.) এর মাজারে কেহ চুমু খেলে বা সেজদা করলে কিছু লোক একে 'শিরক' 'বেদায়াত' প্রভৃতি ফতোয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই ফতোয়া রসুল (দ.) এর নয় বরং তা মারওয়ানের অনুসারীদের তা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।

হজরত ওসমান ইবনে মাজউন (রা.) সর্বপ্রথম মুহাজির যিনি মদিনা শরিফে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর জান্নাতুল বাকিতে দাফন করার পর দেখা গেল একটি পাথর অতিরিক্ত রয়ে গেছে। রসুল (দ.) স্বহস্তে পাথরখানা সরিয়ে কবরের পন্ডাদপদ পুঁতে দেন। মারওয়ান ইবনে হাকাম মদিনার গভর্নর হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালীন হজরত ইবনে মাউনের (রা.) কবরের পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করার পর ঐ পাথরখানা দেখে তা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। কারণ হিসেবে সে (মারোয়ান) বলে যে আমি তার কবরের ওপর এমন কোন নির্দশন দেখতে চাই না যা দ্বারা তাঁর বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। তার নির্দেশ মোতাবেক পাথরখানাকে সরানো হলে অনেকেই বলতে লাগলো যে পাথরখানা রসুল (দ.) নিজে পুঁতে ছিলেন তা সরানো ঠিক নয়। মারওয়ান বলল আমার নির্দেশ অপরিবর্তিত থাকবে। (প্রাগুক্ত প. ১৭৯)

মারওয়ান মুসাবিয়ার নির্দেশ মোতাবেক ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে মনোনয়নের ব্যাপারে মদিনাবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলে, "আমিরুল মুমেনিন (মাবিয়া) তোমাদের জন্য যোগ্যব্যক্তি সন্ধান করার ব্যাপারে ত্রুটি করেননি। তিনি নিজ পুত্র ইয়াজিদকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এটা কোন নতুন কথা নয়। **আবুবকর** (রা.) **এবং ওমর (রা.) স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছিলেন**। এতে হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর ওঠে দাঁড়িয়ে বলেন মারওয়ান তুমি মিথ্যা বলেছ। আর মিথ্যা বলেছে মাবিয়াও। তোমরা কখনো

উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার কল্যাণের কথা চিন্তা করোনি। তোমরা একে কায়সারতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে চাও। একজন কায়সার মারা গেলে তার পুত্র তার স্থান দখল করে। মারওয়ান বলে, ধরো তাকে। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই তো কোরআনে বলা হয়েছে "যে ব্যক্তি তার পিতা মাতাকে বলেছে দুঃখ তোমাদের জন্য।" (সুরা আল আহকাফ-১৩)

আবদুর রহমান ভয়ে হজরত আয়েশা (রা.) হুজরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন মিথ্যা বলেছে মারওয়ান। আমাদের খান্দানের কারো প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। যার প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়েছে আমি ইচ্ছা করলে তার নাম বলতে পারি। (প্রকৃতপক্ষে মারওয়ান ও তার পিতা হাকামের জন্যই উক্ত আয়াত নাজিল হয়)

জুম্মার সালাতের পূর্বে খোতবা দেওয়ার রীতিও মারওয়ান চালু করে। মারওয়ানের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল মালেক (৬৮৫-৭০৫ খ্রিস্টাব্দ) মুসলমানদের বাদশাহ হয়।

ইয়াজিদের শাসনামলে খানায়ে কাবায় প্রস্তর বর্ষনের বিরুদ্ধে আব্দুল মালেক অসন্তোষ প্রকাশ করলেও সে নিজে খলিফা হয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কুখ্যাত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে মক্কায় পাঠায়। জালেম হাজ্জাজ ঠিক হজের সময় মক্কা আক্রমণ করে। জাহেলি যুগে কাফের মুশরিকেরাও এ সময় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতো। সে আবু কুয়ায়েস পাহাড়ে মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র) স্থাপন করে খানায়ে কাবার ওপর প্রস্তর বর্ষণ করে। ফলে সে বৎসর হাজিরা মিনা ও আরাফাতে যেতে পারেননি। কাবায় প্রস্তর বর্ষণকারী হাজ্জাজ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা.) মোনাফেকের সর্দার বলতো। সে বলতো আমি ইবনে মাসউদকে (রা.) পেলে তার রক্ত দিয়ে আমার পিপাসা নিবৃত্ত করতাম। সে ঘোষণা করে কোন ব্যক্তি ইবনে মাসউদ (রা.) এর কেরাত অনুযায়ী কোরআন পাঠ করলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর কোরআন থেকে তার কেরাত শুকরের হাড়ি দিয়ে মুছে ফেলতে হলেও তাও আমি করবো। সে হজরত আনাস ইবনে মালেক এবং সাহাল ইবনে সাাদ সায়েদি (রা.) এর মত বুজুর্গ ব্যক্তিবৃন্দকে গালি দেয় এবং তাঁদের ঘাড়ে মোহর অংকিত করে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কে হত্যার হুমকি দেয়। সে প্রকাশ্য বলতো আমি যদি লোকদেরকে মসজিদের এক দরজা দিয়ে বের হবার নির্দেশ দেই আর তারা অন্য দরজা দিয়ে বের হয় তাহলে তাদের রক্ত আমার জন্য হালাল। (অর্থাৎ হত্যা করা বৈধ)। তার শাসনকালে বিনা বিচারে আটকে যে সকল ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, বলা হয়ে থাকে তাদের সংখ্যা ১ লাখ বিশ হাজার আর বিনা বিচারে যারা কারাগারে মৃত্যুর প্রহর গুণছিল তাদের সংখ্যা ছিল আশি হাজার।

আবুবকর জাসসাস তাহার তফসিরে হাজ্জাজ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন–শুক্রবার হাজ্জাজ দুপুরের সময় ঘর হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া ভাষণ দিতে আরম্ভ করল। ভাষণ এত দীর্ঘ ছিল যে মসজিদের মিনারে সূর্যের লাল আভা ব্যতীত আর কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে ছিল না। হাজ্জাজের নির্দেশক্রমে আজান দেওয়া হইল। আমরা তাহার পিছনে নামাজ পড়িলাম সাথে সাথে আসরের আজান দেওয়া হইল। আমরা হাজ্জাজের পিছনে সালাত আদায় করিলাম। অতঃপর মাগরিবের আজান হইলে হাজ্জাজ নামাজের ইমামতি করিল। জামাতে বহু সম্মানিত লোক থাকা সত্ত্বেও কেহ কিছুই বলিতে পারিতেছিল না। জাসসাস হজরত হাসান বসরির একটি উক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন, হাজ্জাজ মিম্বরে দাঁড়াইয়া আবোল তাবোল কথা আরম্ভ করিত আর এদিকে সালাতের ওয়াক্ত শেষ হইয়া যাইত। না সে খোদাকে ভয় করিত, আর না সে খোদার সৃষ্ট জীবকে লজ্জা করিত। উপরে তাহার আল্লাহতা'লা আর নিচে লাখ লাখ লোক তাহার আজ্ঞাবহ। প্রত্যেক ব্যক্তির মাথার উপরে ঝোলানো থাকিত খোলা তরবারি। মুখের কথা মুখে থাকিতেই মাথা হইতে দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান এহেন খোদাদ্রোহী গভর্নর সম্পর্কে তার পুত্রদেরকে অসিয়ত করেছিল, "হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের প্রতি সব সময় সুনজর দেবে। কারণ সেইতো আমাদের জন্য রাজত্ব কন্টকমুক্ত করেছে। শত্রুদের পরাভূত করেছে। আমাদের বিরোধীদের দমন করেছে।" মালেক কি ধরনের ধার্মিক ও ধর্মপরায়ণ খলিফা ছিল তা এই অসিয়ত থেকেই বোঝা যায়।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা আবদুল মালেকের হাতে আসার পর একদিন মদিনায় রসুলুল্লাহ (স.) এর মিম্বরে দাঁড়াইয়া প্রচার করিতে লাগিল, আল্লাহর কসম আমি দুর্বল নই। আজ হইতে যদি কেহ আমাকে বলে আল্লাহর ভয় কর - এই কথা বলার সাথে সাথেই তাহার দেহ হইতে মাথা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।"

রসুল (দ.) এর রওজা শরিফ জিয়ারত নিষিদ্ধ ঘোষণা :

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান আদেশ জারি করে মদিনায় হজরতের রওজা শরিফ জিয়ারত নিষিদ্ধ করে। প্রসঙ্গত বলা যায় বর্তমানেও কিছু সংখ্যক লোক বিভিন্ন ফতোয়া জারির মাধ্যমে রসুল (দ.) এর মাজার জিয়ারত করা জায়েজ নয় বলে ফতোয়া দিয়ে থাকে। তারা যে প্রকৃত পক্ষে জালেম মালেক ইবনে মারোয়ানের ভাবশিষ্য তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া মদিনাবাসীদের প্রতি যে অন্যায় ও উৎপীড়ন করা হইতেছিল : তাহাদিগকে গৃহ কোনে অন্তরীণ/অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাদের জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে তিলে তিলে যেভাবে মরনের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তার প্রতিকারার্থে বয়োবৃদ্ধ সাহাবি হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) মদিনা হতে পায়ে হেঁটে দামিশকে আগমন করেন। তিনি আবদুল মালেকের দরবারে বিনিতভাবে আরজ করলেন, "আমিরুল মোমেনিন ! মদিনার বর্তমান পরিস্থিতি আপনার নখদর্পণে। উহা পবিত্র শহর। আল্লাহর রসুলের দেওয়া নাম। মদিনাবাসীগণ কয়েদীর ন্যায় গৃহকোণে আবদ্ধ। আমিরুল মোমেনিন যদি তাহাদের প্রতি আপনার দয়ার উদ্রেক হয় এবং তাহাদের অধিকার তাহাদের ফিরাইয়া দেন তবে কতইনা ভাল হইত।"

রসুলুল্লাহ (স.) এর সাহাবির মর্যাদা ও মদিনাবাসীদের দুরবস্থা উপলব্ধি করার পরিবর্তে আবদুল মালেকের বক্ষদেশে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, চক্ষুদ্বয় ক্রোধে লাল বর্ণ ধারণ করিল। সাহাবি অন্ধ ছিলেন। তাই আবদুল মালেকের অবস্থা না দেখিতে পাইয়া বার বার দরখাস্ত পেশ করিতেছিলেন। মালিক উক্ত সাহাবির সাথে দুর্ব্যবহার করিতে উদ্যোগী হইতেছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে কবিছা নামক তাহার একজন ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্ত সাহাবির হাত ধরিয়া দরবার হইতে বাহিরে লইয়া আসিলেন। তিনি অন্ধ উস্তাদকে বলিলেন, হুজুর বনি উমাইয়াগণতো এখন বাদশাহ অর্থাৎ আপনি কি এখনও তাহাদিগকে মুসলমানদের আমির মনে করেন, তাহারা নিজদিগকে রসুলুল্লাহ (দ.) এর অনুসারী মনে করেন না। তাহারা তো রোম ও পারস্য অধিপতিদের অনুকরণে বাদশাহ হইয়া গিয়াছে। কবিছা আবদুল মালেকের একজন আস্থাবান সভাসদ ছিলেন। একথা সকলেই জানত। তাই তিনি বলিলেন তুমিও তো কিছু বলতে পার। তোমার কথা তো বাদশাহ শুনেন । ইহার উত্তরে কিছা বললেন, "হজরত তাহারা শোনেও এবং শোনেও না। যে কথা তাহাদের ইচ্ছা ও মর্যী মোতাবেক হয় শুধু তাহাই শোনে।" (ইমাম আবু হানিফার রাজনৈতিক জীবন মানাজির। আহসান জিলানি, পৃ. ৪)

মক্কার পরিবর্তে সাখরায় হজ পালনের নির্দেশ :

আবদুল মালিক খোদাদ্রোহী...বাদশা আবরাহার মত পবিত্র মক্কা শরিফে হজ যাত্রার পরিবর্তে জেরুজালেমের বিখ্যাত সাখরায় প্রতি বৎসর হজব্রত পালনের জন্য মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ জারি করে। (স্পিরিট অব ইসলাম, সৈয়দ আমির আলী পৃ. ৪০৬)। এই কুখ্যাত আবদুল মালিক তার অতি কুখ্যাত পিতার অসিয়ত লঙ্ঘন করে তার ভাইকে বাদ দিয়ে নিজের ছেলে অলিদকে খলিফা মনোনীত করে। তার মৃত্যুর পর প্রথম ওয়ালিদ ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের নেতা হয়ে বসে। সে মানুষ হিসেবে কত হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ন ও ধর্মদ্রোহী ছিল তা আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের এর পুত্র খোবায়ের সাথে তার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের নির্দেশে খোবায়েরকে ৫০টি চাবুক মারা হয়। শুধু তাই নয়, কনকনে শীতের মধ্যে তার মাথায় পানির মশক ঢেলে দেয়া হয়। তারপর সারাদিন তাকে মসজিদে নব্বির দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এর ফলে তার মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এতদূর মর্মাহত হন যে, পাছে ওয়ালিদের অধীনে গভর্নর হিসেবে এই ধরনের কাজের জন্য আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এই ভয়ে তিনি গভর্নরের চাকুরিতে ইস্তফা দেন।

মসজিদে নবির অবৈধ সম্প্রসারণ ও ডিজাইন পরিবর্তন :

হজরত রসুলুল্লাহ (দ.) এরশাদ করেন যে আল্লাহতা'লা দাউদ (আ.) এর নিকট ওহি প্রেরণ করেন যে তুমি আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ কর যাতে লোকজন আমাকে স্মরণ করতে পারে। হজরত দাউদ (আ.) বাইতুল মুকাদ্দসের ভিত্তি স্থাপন করলেন। হঠাৎ দেখা গেল মসজিদের ইমারতের ভিত্তির মধ্যে একজন ইহুদির ঘর পড়েছে। হজরত দাউদ (আ.) ঘরের মালিক কে ডেকে বললেন– তুমি ঘরটি আমার কাছে বিক্রি কর এবং উচিৎ মূল্য নিয়ে যাও। এতে সে রাজি হলো না। অগত্যা হজরত দাউদ (আ.) সিদ্ধান্ত নিলেন যে কোন ভাবেই ঘরটি নিতে হবে। আল্লাহতা'লা ওহি পাঠালেন হে দাউদ আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে তুমি আমার জন্য ঘর নির্মান কর। যাতে মানুষ আমার ইবাদত করতে পারে। কিন্তু তুমি জোর পূর্বক লোকের ঘর ছিনিয়ে নিচ্ছ। এর শাস্তি এই যে, এখন আর তা তুমি কর না।

মনে রাখতে হবে আল্লাহর একজন মহান নবি আল্লাহতা'লা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে মসজিদ নির্মানের জন্য ইহুদির জমি বল পূর্বক নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র আল্লাহর ঘর নির্মাণের উপযুক্ততা হারালেন। অথচ মুসলমানদের নেতা তথাকথিত খলিফা ওয়ালিদ নিজের বাহাদুরি ফলাও করে প্রচারের জন্য নির্দেশ দিল মসজিদে নব্বির আশে পাশে যার ঘরই হোক কেন ক্রয় করে নাও। যে ব্যক্তি ঘর বিক্রয়ে অস্বীকৃতি জানাবে তার ঘর ভেঙ্গে দাও। পয়গাম্বর (দ.) এর পবিত্র বিবিগণের হুজরা সমূহ মসজিদে অন্তর্ভুক্ত কর।

কথিত আছে যেদিন এ ঘটনা ঘটেছিল সেদিন মানুষের ওপর এক বড় বিপদ নেমে এসেছিল। মদিনায় এমন লোক ছিল না যে এ ঘটনায় অশ্রু ফেলেনি। ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক মদিনায় এলে মসজিদে নব্বিতে খোতবা দেওয়ার সময় মসজিদের মধ্যে আহলে বায়াতগণের উপস্থিতি দেখে (উল্লেখ্য মসজিদ সংলগ্ন রসুল (দ.) এর আহলে বায়তগণের বাসস্থান ছিল) অসম্ভব গোস্বা হয়ে বলে আমি এদেরকে এখানে দেখতে চাইনা। এবং মদিনার গভর্নরকে তাদের বাড়ি খরিদ করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয়। এই সময়ে ফাতিমা বিনতে হোসাইন (আ.) হাসান ইবনে আলী (আ.) এবং তাদের সন্তান সন্ততি ঘরের মধ্যে ছিলেন। তারা তাদের ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ওয়ালিদ নির্দেশ দিল তারা ঘর থেকে বের না হলে তাদের ঘর ভেংগে চাপিয়ে দাও। ওয়ালিদের বাহিনী আহলে বায়াতগণের অনুমতি না নিয়েই আসবাবপত্র ঘর থেকে বের করতে আরম্ভ করল। এভাবে এই মহান নবি পরিবারের সদস্যগণকে নিজ গৃহ থেকে উচ্ছেদ করা হলো। এই অসূর্যম্পর্শা মহিলাদের বেলা দুপুরে ঘর হতে বের হতে বাধ্য করা হয়।

উম্মুল মুমেনিন হজরত হাফসা (রা.) এর ঘর সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। এ ঘরের মধ্যে হজরত ওমর (রা.) এর সন্তানগণ বসবাস করতেন। তারা বলেন আমরা এ ঘর ছেড়ে চলে যাব না এবং রসুলুল্লাহ (দ.) এর ঘরের বিনিময়ে কোন অর্থ গ্রহণ করব না। তখন খোদার দুশমন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও মদিনায় অবস্থান করছিল। সে নির্দেশ দিল ঘর তাদের মাথার ওপর ভেঙে চাপিয়ে দাও।

আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ.) এর নির্দেশ অমান্য করে সে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মসজিদে নব্বির বাহ্যিক সৌন্দয্য বৃদ্ধি ও বর্ধিত করনের কাজ শুরু করে। তাই রোম সম্রাটের কারিগরী সহায়তায় এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। বর্ণিত আছে রোম দেশীয় মজুরদের মধ্যে একজন লোক রসুল (দ.) এর হুজরা শরিফের মধ্যে প্রস্রাব করার ইচ্ছা করলে সাথে সাথে সে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে যায় এবং তার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। আর একজন মসজিদের কেবলার দেয়ালে শুকরের চিত্র অংকন করে। (নাউজিবিল্লাহ)।

পুননির্মিত মসজিদের কাজ শেষ হলে অলিদ তা দেখতে আসে। এবং তা দেখে খুব খুশি হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে মসজিদে ঘুরে ফিরে দেখার প্রক্কালে ওয়ালিদের সাথে হজরত ওসমান (রা.) এর কোন পুত্রের সাথে দেখা হলে ওয়ালিদ বলে দেখ ! তোমার পিতার ইমারত কেমন ছিল আমার ইমারত কেমন ? উত্তরে ওসমান (রা.) এর পুত্র বললো, "আমার পিতার তৈরি ইমারত ছিল মসজিদ আর আপনার তৈরি ইমারত তো গির্জা। এই ইমারতের মধ্যে চার কোণায় চারটি মিনার নির্মিত হয়। মনে রাখতে হবে ওয়ালিদের পূর্বে মসজিদে মিনার নির্মাণের কোন রীতি ছিল না।

অর্থাৎ খোদ মসজিদে নব্বির সম্প্রসারণের জন্য জমি সংগ্রহ ও নির্মাণ প্রক্রিয়ায় আল্লাহ ও তার রসুলের বিধানকে লজ্ঘন করা হয়েছে। ওয়ালিদের আমলেই মসজিদে জানাজার নামাজ পড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি

করা হয় । (জবুল কুলুব ইলা দিয়ারুল মাহবুব- আবুল হক মোহাদ্দস । দেহলবী, প্রথম খন্ড, পৃ. ১২১) এ রীতি অদ্যাবধি চালু আছে। বসে বসে জুমার প্রথম খুতবা দেওয়ার রীতিও তখন থেকে চালু হয়। এ জুলুম নির্যাতন এতদূর পৌঁছে যে হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ একদা চিৎকার করে বলে ওঠেন, "ইরাকে হাজ্জাজ, সিরিয়ায় ওয়ালিদ, মিসরে কুবরা ইবনে শরিক, মদিনায় ওসমান ইবনে হাইয়ান এবং মক্কায় খালেদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল কাসরি। হে আল্লাহ, তোমার পৃথিবী জুলুমে ছেয়ে গেছে। এবার জনগণকে শান্তি দাও, মুক্তি দাও।" ৭১৫ সালে ওয়ালিদের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা সুলাইমান খলিফা হন।

ইবনে কুতায়বা এবং হাজ্জাজের আত্মীয়-স্বজন তার সেই ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। তার হিংসানল কাউকে ক্ষমা করেনি। স্পেন বিজয়ী মুসা ইবনে নুসওর, বীর তারিক, সিন্ধু বিজয়ী বীর মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রভৃতি যে সকল সেনাপতির কৃতিত্ব মুসলিম জাতির গৌরব এই ঘাতক খলিফা তাদের সকলকেই নিশ্চিহ্ন করেছিল।

সুলাইমান ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি নিজ পুত্রকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। কিন্তু সে পুত্র তার পূর্বে মারা যাওয়ায় সে অপর নাবালক পুত্রকে মনোনয়ন দানের চেষ্টা করে। কিন্তু সভাসদবর্গের অনেকের সুপরামর্শে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন এবং চাচাত ভাই ওমর বিন আবদুল আজিজ ও তার পর নিজ ভ্রাতা দ্বিতীয় ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন দান করেন।

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন শাসক ছিলেন। মাবিয়া হতে আরম্ভ করে তার সময়কাল পর্যন্ত রাজনীতিতে চলে ছিল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও কূটকৌশল। প্রথম মাবিয়া প্রতি মসজিদে জুমার দিন খুতবায় হজরত আলী ও তার বংশের প্রতি লানৎ অর্থাৎ অভিসম্পাৎ দানের প্রথা প্রবর্তন করে। এতদিন যাবৎ এই জঘন্য শরিয়ত বিরোধী প্রথা বাধ্যতামূলক নিয়ম চালু ছিল। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এই কুপ্রথা রহিত করেন এবং গালাগালির স্থানে পবিত্র কোরআনের এই আয়াত সংযোজন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

"ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বি-আদলে ওয়াল এহসান, ওয়ায়ি তাইজিল কুরবা, ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশায়ি ওয়াল মুনকার। ওয়াল বাগিই-ইকুম লা আল্লাকুম তাজাক্কারুন"। আজ পর্যন্ত জুময়ার নামাজের খুতবায় তার প্রবর্তিত এই প্রথা চালু আছে।

ওসমান (রা.) এর ওফাতের পর উমাইয়া শাসক বাদশাহগন আহলে বায়াতের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়ন করতে থাকে। অথচ এরাই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ অনুযায়ী সকল সম্মানের পাত্র। এদেরকে কোন সরকারি চাকুরি প্রদান না করার প্রথা অব্যাহত থাকে। রাষ্ট্রীয় ভান্ডার থেকে তাহাদেরকে এক পয়সাও দেওয়া হতো না। বিশেষ করে খলিফা আবদুল মালেক, অলিদ ও সুলাইমানের আমলে হাশেমি বংশের লোকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুন ও অবর্ণনীয়। ওমর বিন আবদুল আজিজ আহলে বায়াতদের পবিত্র কোরআনের আলোকে তাদের সঠিক মর্যাদা প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

হজরত আলী (আ.) এর কন্যা ফাতেমা সাক্ষ্য দিতেছেন, তিনি (ওমর) যখন মদিনার শাসনকর্তা তখন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "হে আলী দুহিতা : খোদার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, এই দুনিয়ার বুকের ওপর আপনার পরিবারের তুলনায় আর কোন পরিবারই আমার নিকট অধিক প্রিয় নয়। আপনি নিজেও আমার আপনজনের তুলনায় অনেক বেশি শ্রদ্ধেয়া।"

খেলাফতে অভিষিক্ত হওয়ার পর ইহা আরও ব্যাপক রূপ লাভ করে। তিনি আহলে বায়াতদের জন্য বন্ধ হইয়া যাওয়া অধিকার সম্পূর্ণ পুনর্বহাল করেন। 'ফিদক' বাগানটি সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে ইহা কোরআন ও হাদিছের ব্যাখ্যাজনিত জটিলতার কারণে আহলে বায়াতগণের হস্তে প্রদান করা হয়নি। 'ফিদক' উমাইয়াগণ তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে। তিনি এই বাগে ফিদক আহলে বায়াতগণের হাতে সমর্পণ করেন। তিনি আহলে বায়াতগণকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, "আমি বাচিয়া থাকিলে আপনাদের সব অধিকারই পুরাপুরি আদায় করিয়া দেব।" কিন্তু উমাইয়া কুচক্রীগণ মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে তার মোবারক জীবনকে বিষ প্রদানের মাধ্যমে হত্যা করে। হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ প্রায় আড়াই বৎসরকাল শাসন করিয়া ইন্তেকাল করেন (৭২০)। তাহার পর আবদুল মালিকের পুত্র ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহন করার পরই তিনি যে ফরমান জারি করেন উহার কিয়দংশের অবস্থা এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"অতঃপর প্রকাশ থাকে যে, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ গোমরাহীতে পতিত হইয়াছিলেন। তোমরা এবং তোমাদের সাথীগণ তাহাকে ধোঁকায় নিপতিত করিয়াছিলে। আমার এই ফরমান তোমাদের নিকট পৌঁছার এক মুহূর্তের মধ্যে ঐ সমস্ত কাজ পরিত্যাগ কর, যাহা উমরের শাসনকালে পালন করিত। দেশের অবস্থা যা হউক কিংবা অভাব অনটন থাকুক লোকে পছন্দ করুক কিংবা বাচুক বা মরুক লোকদিগকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আন।" (ইমাম আবু হানিফার রাজনৈতিক জীবন, মনজির আহসান জিলানি)।

দ্বিতীয় ইয়াজিদ তাহার নাচনেওয়ালি সাল্লামাহ ও হারাবাহর সাথে মৌজ করিয়া পানাবস্থায় আংগুর ছুঁড়িয়া হারাবার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ফেলে। ইহাও কথিত আছে সাল্লামাহর মৃতদেহের ওপরও ইয়াজিদ পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল। দ্বিতীয় ইয়াজিদ নিজ পুত্র দ্বিতীয় ওয়ালিদকে সরাসরি মনোনয়ন দানের ব্যর্থ চেষ্টা করে। পরে ভ্রাতা হিশাম ও তার এগার বৎসর বয়স্ক পুত্র দ্বিতীয় ওয়ালিদকে মনোনয়ন দান করে। কথিত আছে মদ পান করতে করতেই মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে সে নর্তকী হারাবার মৃত্যুশোকে প্রাণত্যাগ করে (৭২৪)।

৭২৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ইয়াজিদের মৃত্যুর পর হিশাম দামেস্কের সিংহাসনে আরোহন করে। সে ৭২৪ সাল থেকে ২০ বৎসর কাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। সেও পূর্ববর্তী মনোনয়ন বাতিল করে নিজ পুত্র মাসলিমাকে মনোনয়ন দানের চেষ্টা করে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। মদের সাথে ঘোড়দৌড়ের জুয়া প্রবর্তন করার জন্য তাকে কুখ্যাত হিশাম বলা যেতে পারে। তার আস্তাবলে ৪ হাজার রেসের ঘোড়া ছিল। হিশাম রাষ্ট্রের তিন ভাগের এক অংশ ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিল।

হিশামের মৃত্যুর পর (৭৪৩ খ্রি.) আবদুল মালিকের পুত্র ওয়ালিদ দামেস্কের সিংহাসনে আরোহন করে। সে সিংহাসনে আরোহন করেই যারা তার খেলাফত লাভে বাধ সেধেছিল তাদের প্রতি প্রতিহিংসা গ্রহন করে। সে প্রতিপক্ষের সকল সদস্যকেই হত্যা করে।

দ্বিতীয় ওয়ালিদ মদের ঢোক গিলিবার সুবিধার্থে মদের ডোবায় সাঁতার কাটিত। সে ছিল অকর্মণ্য, মদ্যপ, নিষ্ঠুর, বিলাসী ও আত্মকেন্দ্রিক আরাম প্রিয় প্রকৃতির শাসক। সে তার দুই নাবালক পুত্রকে মনোনয়ন দান করে আমির ওমরাহদের সমর্থন হারায়। তার খামখেয়ালীপনা ও অযোগ্যতার সযোগে আবদুল মালিকের পুত্র তৃতীয় ইয়াজিদ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সসৈন্যে দামেস্কে প্রবেশ করে ওয়ালিদকে পরাজিত ও নিহত করে দামেস্কের সিংহাসনে আরোহন করে। নিহত ওয়ালিদের হস্তপদাদি বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং তার মস্তক দামেস্কে প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে জনসাধারণকে প্রদর্শন করা হয়। তৃতীয় ইয়াজিদ তার ভ্রাতা ইব্রাহিমকে মনোনয়ন দান করে পরলোক গমন করে (৭৪৪)।

ইব্রাহিমকে কেউ খলিফা হিসেবে স্বীকার করেনি। প্রথম মারওয়ানের দৌহিত্র দ্বিতীয় মারওয়ান (আর্মেনিয়ার গভর্নর) আর্মেনিয়া হতে সসৈন্য রাজধানি অভিমুখে রওয়ানা হয়। সে ইব্রাহিমকে পরাজিত করে রাজধানী অধিকার করে। পরাজিত ইব্রাহিম দামেস্কের সরকারি ধনভান্ডার লুট করে এবং দ্বিতীয় ওয়ালিদের মনোনীত দুই পুত্র হাকাম ও ওসমানকে হত্যা করে রেখে পলাসিরা পালিয়ে যায়। মারওয়ান বিজয়ীর বেশে দামেস্কে প্রবেশ করে খলিফা হিসেবে শপথ গ্রহণ করে। ৭৫০ সালে আব্বাসীয়দের হাতে দ্বিতীয় মারওয়ান পরাজিত ও নিহত হয়ে ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

উমাইয়াদের ক্ষমতা গ্রহণের আইনগত ভিত্তি :

উমাইয়াদের ক্ষমতা গ্রহণের আইনগত ভিত্তি পবিত্র কোরআন ও রসুল (দ.) নির্দেশের আলোকে বৈধতা ঘোষণার কোন অবকাশ নাই। বরং ধোঁকাবাজি, মিথ্যাচার, ঘুষ ও প্রতারণার মাধ্যমেই মাবিয়া ক্ষমতা দখল করে। অষ্টম হিজরির প্রথমদিকে সিরিয়ার রোমান বাহিনীকে আক্রমণের জন্য রাসুল (দ.) সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করলেন। যায়িদ বিন হারিসকে (রা.) সেনাপতি নিয়োগ করে বললেন ।

জায়িদ (রা.) নিহত বা আহত হলে আমির হবে জাফর (রা.) ইবনে আবি তালেব (রা.) এবং তিনি নিহত বা আহত হলে মুসলমানেরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমির নির্বাচন করবে। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে রসুল (দ.) তার উম্মতের কর্মকান্ডের ব্যাপারে কত দূরদৃষ্টসম্পন্ন ছিলেন। একটি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য

৩ জন বিকল্প সেনানায়কের মনোনয়ন প্রদান করে ছিলেন। তাই রসুল (দ.) এর প্রকাশ্য ঘোষণা ছাড়া সাধারণ উম্মতের নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনার আলোকে নেতা নির্বাচনের ক্ষমতা কতটুকু তা উল্লেখিত ঘটনা থেকেই প্রতীয়মান।

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা নিজেই অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন তাই তার এবং তার পরবর্তী মনোনয়ন সবই সঠিক ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ। তাছাড়া তারা নিজের পরিবার ছাড়া অন্য কোন পরিবার থেকে তাদের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন না করায় একথাই প্রমাণ করে যে তারা গ্রিক ও রোম সম্রাটের ন্যায় ইসলাম ধর্ম ও সাম্রাজ্যকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতেন। উমাইয়া বাদশাহদের ক্ষমতাসীন হওয়ার আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সাথে এক খারেজির প্রশ্নোত্তর পর্যালোচনা করলেই এর সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে।

একজন প্রশ্ন করে যে, ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি কি এটা সহ্য করতে পারে যে তার উত্তরাধিকারী হবে একজন অত্যাচারী। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ না সূচক জবাব দিলে সে পুনরায় প্রশ্ন করে আপনি (ওমর) আপনার অবর্তমানে ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালিকের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন। অথচ আপনি জানেন যে, সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। তিনি জবাব দেন, আমার পূর্বসূরি সুলায়মান তার স্বপক্ষে পূর্বেই বায়াত গ্রহণ করেছেন। (প্রসঙ্গত বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে রসুল (দ.) অনুকরণে সকল রাষ্ট্রনায়কই তাদের জীবিতাবস্থায় স্ব স্ব উত্তরাধিকারী অনুকূলে বাইয়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু রসুল (দ.) এর এই নির্দেশ ছিল আল্লাহর বিধান পক্ষান্তরে অন্যদের তা ছিল স্বার্থান্ধ)। এখন আমি কি করতে পারি ? ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয়, যে ব্যক্তি ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালিককে আপনার পর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছে আপনি কি মনে করেন তার এমন করার অধিকার ছিল ? আপনি কি তার এ সিদ্ধান্তকে ন্যায় সংগত বলে মনে করেন? এ প্রশ্নে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ লা জবাব হয়ে যান এবং বলতে থাকেন ইয়াজিদের ব্যাপারটি আমাকে শেষ করে দিয়েছে। আমার কাছে এ যুক্তির কোন জবাব নেই। কারণ সুলাইমানের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করার অধিকার থাকলে খোদাদ্রোহী লোকের ক্ষমতাসীন হওয়াটা আইনের দৃষ্টিতে বৈধ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এ ধরনের মনোনয়ন অবৈধ হলে খোদ ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিয়োগও অবৈধ।

উমাইয়াদের ধর্মমত :

প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন সম্মানিত ব্যতিক্রম ব্যতীত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল উমাইয়া নৃপতিগণই ধর্মোদ্রোহী ছিল। তবে তাদেরকে যেন সাধারণ মুসলমানরা ধর্মত্যাগী বা ধর্মোদ্রোহী বলতে না পারে তাই তারা ঈমানের সংজ্ঞা পরিবর্তন করার জন্য পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে। হাদিসও অনুরূপভাবে ব্যবহার করা হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ ধর্ম নিয়ে এ ধরনের আচরণ করলে যে ধর্মের মধ্যে একাধিক মতবাদ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা যায় যে, উমাইয়া বাদশাহগণ জবরীয়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। জবরীয়া শব্দটি আরবি জবর শব্দ হতে গৃহীত। এর অর্থ অদৃষ্ট বা নিয়তি। এ শব্দ দ্বারা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা এবং মানুষের অপরিহার্য অদৃষ্টের কথাই প্রকাশ করা হয়েছে। এই মতবাদের প্রবক্তাগণ মনে করতো যে যেহেতু আল্লাহ সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান তাই মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোন মূল্য নেই অর্থাৎ তাদের ভাগ্যে যা ঘটবে তা পূর্ব নির্ধারিত। কাজেই তাদের কার্যাবলীর জন্য তারা আদৌ দায়ি নয়। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায় সে যন্ত্রের মত কাজ করে। মানুষের কাজ কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পূর্ণরূপ আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অন্তর্ভুক্ত– তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা পুরস্কৃত করবেন। বিচ্ছিন্নভাবে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই মতবাদকেই প্রকৃত ইসলাম হিসেবে চালানোর চেষ্টা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। তবে এই মতবাদের বড় সুবিধা হলো রাজশক্তিকে প্রজা সাধারণের ওপর অত্যাচার করার এত কার্যকর পদ্ধতি আর কোন মতবাদেই নেই। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল কুকর্ম করা হবে এবং বলা হবে এটা আল্লাহরই ইচ্ছা এবং এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভাগ্য এবং এ ব্যাপারে অত্যাচারীর কিছুই করণীয় নাই। (ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ -শেখ মো. লুৎফর রহমান, ড. মফিজুল্লাহ কবীর-ইসলাম ও খেলাফত, স্পিরিট অব ইসলাম, সৈয়দ আমির আলী)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে– মাবিয়া, ইয়াজিদ, জিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ প্রভৃতি উমাইয়া নেতৃবৃন্দ সকল প্রকার অত্যাচার, অনাচার ও প্রতারণার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করেছিলেন। অথচ তারা মুখে "সবই আল্লাহর ইচ্ছা", "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা-ক্ষমতা দান করেন প্রভৃতি বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে তাদের কুকর্মকে চাপা দিত।

আল্লাহ, রসুল (দ.) ও আহলে বায়াতদের মুহব্বত ঈমানের ভিত্তি। অথচ উমাইয়াদের রাষ্ট্রীয় পলিসি ছিল আহলে বায়াতগণের হত্যা, অপমান, সম্পত্তি অপহরন, নির্যাতন, সন্ত্রস্ত রাখা ও তাদের গালি দেওয়া।

উমাইয়াদের এই বিধর্মী কর্মকান্ড তত্ত্বীয়ভাবে অন্য একটি ধর্মীয় মতবাদের মাধ্যমে সমর্থন লাভ করে। এই মতবাদের বিশ্বাসীগণকে মুজিয়া বলা হয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন উমাইয়াগন যখন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে এবং অন্যায় আচরণ করতে থাকে তখন তারা (মুরজিয়া) তা অবলোকন করেও তাদের বিপক্ষে মত দিত না বরং খারেজিদের 'রায়' প্রদানকে রহিত ঘোষণা করে উমাইয়া কুচক্রী শাসকদের সমর্থন যোগায়।

মরজীয়া মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নরূপ :

ক) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে তারা যে পাপই করুক না কেন তারা ধর্মচ্যুত হবে না বা তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করাও সমুচিত নয়। কারণ কেবল আল্লাহই তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ক্ষমতাবান।

খ) এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে কাফির আখ্যা দেবেনা, যারা তা দেয় তারাই কাফির। শাস্তি বা পুরস্কার কেবল আল্লাহ নির্ধারণ করবেন।

গ) সাহাবিদের বিষয়ে সন্দেহপূর্ণ মন্তব্য বা খেলাফত প্রশ্নে কার দাবি অগ্রগণ্য তার বিচার বা সিদ্ধান্তের দায়িত্ব আল্লাহর। মানুষের সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা উচিত নয়। মুসলমানগণ যে সকল সাহাবিকে অপরাধী মনে করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। আবার তিনি অপরাধী নাও হতে পারেন।

ঘ) উমাইয়ারা ছিলেন মুসলমান এবং এটাই যথেষ্ট। তাদের খেলাফত বেআইনি ছিল না। তারা যদি পাপ করেন তবে তার জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন। কোন মুসলমানের পক্ষে তাদের কাফির আখ্যা দেওয়া সমুচিত নহে।

ঙ) আন্তরিক বিশ্বাসই ঈমান সেই সঙ্গে কার্য (আমল) অপরিহার্য নয়।

চ) কোন কোন মুজিয়া আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলে যে শিরক থেকে নিকৃষ্ট যত বড় পাপই করা হোকনা কেন, অবশ্যই তা ক্ষমা করা হবে। কেউ কেউ আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে বলে যে মানুষ যদি অন্তরে ঈমান পোষণ করে এবং সে যদি দারুল ইসলামেও (যেখানে কারো পক্ষ থেকে কোন আশঙ্কা নাই) মুখে কুফরি ঘোষণা করে বা মুর্তি পূজা করে বা ইয়াহুদীবাদ বা খ্রিস্টাবাদ গ্রহণ করে– এতদসত্ত্বে সে কামেল, ঈমানদার, আল্লাহর অলি ও জান্নাতি।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় এসব যুক্তি প্রমাণের সিদ্ধান্ত দাতা হিসেবে আল্লাহকে বিবেচনা করা হয়েছে, শাস্তি ও পুরস্কারের সময় নির্ধারন করা হয়েছে পরকাল এবং অবস্থা নির্ণয়ের জন্য উচ্চারিত ভাষার কোন মূল্য দেওয়া হচ্ছে না যা দিয়ে অন্তরের অবস্থা অবলোকন করা যায়। তাই এসব চিন্তাধারা পাপাচার ফাসেকি ও অশালীন কার্যকলাপ ও জুলুম নির্যাতনকে বিরাট উৎসাহ যুগিয়েছে এবং মানুষকে পাপাচারে উৎসাহী করে তুলেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় পার্থিব যে কোন অবৈধ কাজকে উপরোক্ত মানদন্ডে বিচার করার প্রচেষ্টা নেওয়া হলে সকল আদালতই বন্ধ করে দিতে হবে। অথচ এর দ্বারা ধর্মীয়ভাবে যে কোন অপকর্মকে ধর্মীয় যৌক্তিকতার আড়ালে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে ঈমান ও আল্লাহর কার্যাবলী সম্পর্কে এক ব্যাপক অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ ছাড়া এই মতবাদের আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী এই ছিল যে আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনিল মুনকার-ভাল কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজে নিষেধ– এর জন্য যদি অস্ত্র ধারনের প্রয়োজন দেখা দেয়– তাহলে এটা একটা ফেতনা। সরকার ছাড়া অন্যদের খারাপ কাজে বাধা দেওয়া নিঃসন্দেহে জায়েজ। কিন্তু সরকারের জুলুম

নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খোলা জায়েজ নয়। প্রকৃতপক্ষে আলেমগণ এ জন্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অভিযোগ করে বলেন এসব ধ্যান ধারণা জালেমের হস্ত সুদৃঢ় করেছে অন্যায় ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ করেছে।

রসুল (দ.) বলেছেন: নিকৃষ্ট ইমাম (শাসক) হচ্ছে সেই যার প্রতি তোমরা অন্তরে দুশমনি পোষণ কর, এবং সেও তোমাদেরকে দুশমন মনে করে, যাকে তোমরা অভিশাপ দাও এবং সেও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়।

উমাইয়া আমলে বিচার ব্যবস্থা :

সাধারণভাবে আইন প্রয়োগ করার বেলায় আপন-পর দোস্ত-দুশমনের পার্থক্য না করা হলো আইন। কিন্তু উমাইয়া আমলে ইসলামি আইন-কানুন ব্যাখ্যায় এই সমস্ত বাদশাহ বা তাদের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বা একচেটিয়া অধিকার হিসেবে বিবেচিত ছিল। খলিফা আবদুল মালিকের নির্দেশক্রমে মদিনার গভণর আমর ইবনে সাঈদ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মদিনা হতে সৈন্য সংগ্রহ করছিল। রসুল (দ.) এর সাহাবা হজরত আবু শরিহ (রা.) দাঁড়াইয়া বলিলেন :

"হে আমির, আমাকে আদেশ করিলে আমি এমন একটি কথা বলিতে চাই-যে কথা মক্কা বিজয়ের পর দিন নবি করিম (দ.) বলিয়াছিলেন। আমার কর্ণদ্বয় উহা শুনিয়াছে অন্তর সরন করিয়া রাখিয়াছে। আর যে সময় নবিজি বলিতেছেন সেই সময় আমার চক্ষুদ্বয় তাহাকে দেখিতেছিল। আবু শরিহ নিজের কথাকে জোরদার করার জন্য হুজুর (রা.) এর বিখ্যাত নির্দেশ উচ্চারণ করিলেন। হারাম শরিফে খুন খারাবি ইত্যাদি চিরদিনের জন্য হারাম করা হইল। সবকিছু শোনার পর আমর ইবনে সাঈদ যে নিজেকে ইসলামি আইন কানুনের ব্যাখ্যাকারী" মনে করিত সে আল্লাহর রসুলের (দ.) এর সাহাবাকে ধমক দিয়া বলিল, আবু শরিহ, আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় আলিম এবং এই বিষয়ে জ্ঞাত। (কারণ আমার হাতে সরকারি ক্ষমতাপ্রাপ্ত তলোয়ার আছে) হারাম শরিফ কোন নাফরমান এবং হত্যাকারী ও পলায়নকারীকে আশ্রয় দেয় না। (নাউজুবিল্লাহ)।

মদিনার খেলাফত দামিস্কে স্থানান্তরিত হওয়ার পর বিচার বিভাগের গুরুত্ব এতই কমাইয়া দেওয়া হইয়া ছিল যে প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসন কর্তাকে তাদের ইচ্ছামত কাজি নিয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। অল্পদিন পরে এর কুফল দেখা দেয়। মারওয়ানের শাসনকালে সে মিসর গমন করে। মিসরে পোঁছে সে তথাকার কাজিকে ডাকিয়া পাঠাইল। কাজির নাম আসে। কাজি আবেসের লেখাপড়ার দৌড় কতটা সে সম্বন্ধে আল-মুহাফি নামক ইতিহাসে লেখা আছে। কাজি আবেস লেখাপড়া জানি না। মারওয়ান কাজিকে জিজ্ঞাসা করিল - তুমি কোরআন পাঠ করিয়াছ ? কাজি - না।

মারওয়ান– মিরাস সম্বন্ধে তোমার পরিপক্ব জ্ঞান আছে ? কাজি - না। এই উত্তরে মারওয়ানের মত দূরাচার লোকও হতভম্ভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল– তবে তুমি কোন বুদ্ধি দ্বারা বিবাদ মীমাংসা কর ? বেচারা আবেস এই কথার উত্তর আর কি দিবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কাজি আবেসের নিয়োগ সম্বন্ধে লিখিত আছে– মাবিয়া মিসরের শাসনকর্তা মাসলামাকে নির্দেশ দিল - লোকের নিকট হতে ইয়াজিদের জন্য আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর। নির্দেশমত মাসলামা কাজ শুরু করিল কেহই উহাতে বাধা দিল না। কিন্তু আমর ইবনে আসের পুত্র আবদুল্লাহ যিনি তাঁর পিতার চাইতে অধিক নীতিবান ছিলেন, তিনি ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে মাসলামা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রচার করিল - আবদুল্লাহকে সোজা পথে কে আনিতে পারিবে ? কথিত আছে আবেস ইবনে সাঈদ দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল আমি এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। অতঃপর সে রক্ষী বাহিনী লইয়া আবদুল্লাহর বাড়ি ঘেরাও করিয়া বলিয়া পাঠাইল যে ইয়াজিদের বাইয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? আবদুল্লাহ পূর্ববত অস্বীকার করিল। আবেস তাহার বাড়ির চারদিকে কাঠ জমা করিল। উদ্দেশ্য বাড়িতে আগুণ লাগাইয়া দেওয়া। নিতান্ত বাধ্য হইয়া হজরত আবদুল্লাহ আবেসের সামনে আসলেন এবং যাহা বলিতে বলিল - আবদুল্লাহ তাহা বলিয়া জীবন্ত দগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পাইলেন। এই তথাকথিত মহান খেদমতের জন্য মাবিয়া কর্তৃক আবেসকে কাজির পদে বহাল করা হইয়াছিল। উমাইয়া আমলে কাজি নিয়োগের ব্যাপারে এমন অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলংকিত হইয়াছে। (ইমাম আবু হানিফার (রহ) রাজনৈতিক জীবন, মানাযির আহসান জিলানি, পৃ. ২৫)।

এই সমস্ত কাজি যাহারা নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, পরহিজগারী এবং সাধুতার ভিত্তির ওপর নয় বরং শাসনকর্তাদের মেহেরবানির ওপর বহাল থাকিত, তাহারা নিজেরা যাহা করিত তাহা সহজেই বোঝা যায়। তদুপরি শাসনকর্তাদের চাপে পড়িয়া যে কত অপকর্ম করিত তাহা বলার অপেক্ষাই রাখে না। কিন্তু কোন সময় কাজি যদি নিজের বিবেকের তানায় অথবা অন্য কোন কারণে নিজের ইচ্ছামত কিছু করিত তবে তাহার আর উপায় ছিল না। সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিকের রাজত্বকালে তালহা ইবনে হরম যখন মক্কার কাজি ছিলেন, তখন মদিনার শাসনকর্তা ছিল খালিদ ইবনে আবদুল্লাহিল কুরা। শিবী সম্প্রদায়ের দুইজন লোকের মধ্যে এক টুকরা জমি লইয়া বিবাদ বাধে। কাজি সাহেব আজাম নামক এক ব্যক্তির পক্ষে রায় দিলেন। দ্বিতীয় পক্ষ শাসনকর্তা খালিদের দরবারি লোক ছিল তাহারা তখনই মদিনা পৌঁছিয়া খালিদের নিকট কাজির নামে অভিযোগ করল। খালিদ কাজির রায়ের বিরুদ্ধে পাল্টা হুকুম দিলেন। এই ঘটনায় কাজি তালহা মর্মাহত হইয়া চুপচাপ খলিফা সুলাইমানের দরবারে একখানা পত্র লিখিয়া নিজের পুত্র মুহাম্মদকে পাঠাইয়া দিলেন। সুলাইমান তখনই এক নির্দেশনামা কাজি সাহেবের পুত্র মুহাম্মদকেই খালিদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন– খালিদকে বলিও, সে যেন আমের ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে। মুহাম্মদ খালিদের দরবারে পৌছিয়া খলিফার কথা বলিতেই খালেদ রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল এবং খলিফার পত্র পাঠ না করিয়াই জল্লাদকে আদেশ করিল ইহাকে একশত চাবুক মার। কাজি তালহা পুত্রের রক্তাক্ত মৃতদেহ ও জামা কাপড় সুলাইমানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উহা দেখিয়া সুলাইমানের ধৈর্যের সীমা ভাঙিয়া গেল। তিনি আদেশ করিলেন খালিদের হাত কাটিয়া ফেলা হোক। কিন্তু কিছু সংখ্যক আমিরের সুপারিশে ঘটনা সেইখানেই মিটিয়া গেল। (হজরত ইমাম আবু হানিফার (রহ) রাজনৈতিক জীবন-মানাযির আহসান জিলানি, পৃ. ২৭-৩০)

খলিফাদের আখেরাতের শাস্তি থেকে মুক্ত হওয়ার ফতোয়া :

ইয়াজিদ ইবনে মালিকের আমলে চল্লিশ জন বুজর্গ লোক (ফকিহ) সাক্ষ্য দিয়াছিল: চল্লিশ জন শায়খ আসিলেন এবং সাক্ষী দিলেন যে কেয়ামতের দিন খলিফাদের নিকট কোন প্রকার হিসাব গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহাদের কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে না। (ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর রাজনৈতিক জীবন, পৃ. ৩৫)। আইন ব্যাখ্যাদাতারা যদি এ ধরনের ফতোয়া দিতে পারেন তাহলে লোকের চরিত্রশক্তি উমাইয়া বাদশাহদের হাতে কেমনভাবে পর্যদস্ত হইয়া গিয়াছিল তা সহজেই বুঝা যায়।

উমাইয়া শাসন ও সমাজ :

ক্ষমতার চাবিকাঠি মাবিয়ার হস্তগত হওয়াই ইসলামি রাষ্ট্রের খেলাফত থেকে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের দিকে প্রত্যাবর্তনের সূচনা। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এ পর্যায়েই অনুধাবন করেছিলেন এবং প্রকৃত ঈমানদার লোক এ প্রক্রিয়াকে বাধা দিয়েছিলেন। যাই হোক সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) মাবিয়ার ক্ষমতা দখলের পর বলেন রাজা আপনাকে সালাম। হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এর এই ভবিষ্যৎবাণী যে কতখানি সঠিক হয়েছিল তা মাবিয়া ও উমাইয়া বংশের বাদশাহদের জীবন যাত্রার দিকে একটু নজর দিলেই বুঝা যাবে।

উমাইয়া বাদশাহগন রাজকীয় প্রাসাদে সাড়ম্বরে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতেন। আবদুল মালিক ও দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত কেহ শুক্রবার জুমার নামাজ ও দৈনিক পাঁচবার নামাজে ইমামতি করতেন না। সাধারণ দরবারে তারা উচ্চ সিংহাসনে সমাসীন থাকতেন। দরবারে বাদশাহর পরিবারের সদস্যগণ বসতেন তার ডাইনে এবং সভাসদ ও আমির ওমরা বামে উপবিষ্ট থাকতেন। তাদের সম্মুখে অগণিত জনসাধারণ রাজধানীর গণ্যমান্য ব্যক্তি, সওদাগর, শিল্পী, কবি ও মনীষী লোক তাঁকে সালাম জানাতেন। সকল সাক্ষাতকার উপলক্ষে তারা জাকজমক, পোশাকে সুসজ্জিত হতেন।

সন্ধ্যার পর এই বাদশাহগণ লঘু পরিবেশে গল্পের আসর বা গান-বাজনার মজলিসে কালাতিপাত করতেন। মাবিয়া প্রাচীন কালের রাজা বাদশাহদের বিশেষত দক্ষিণ আরবের বাদশাহদের কাহিনী শ্রবণ করতে ভালোবাসতেন। তিনি ইয়ামন হতে আবীদ ইবনে শারইয়াহ নামক একজন গাল্পিককে আহ্বান করেন এবং তার মুখে প্রাচীন লোকদের কাহিনী শুনেন অধিক রাত্রি জাগরণ করতেন।

মাবিয়ার পুত্র ইয়াজিদের আমল হতে নৈশ অনুষ্ঠানে সুরা পান প্রচলিত হয়। মক্কা ও মদিনা এই সময় সঙ্গীত চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বাদশাহর আহবানে গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নর্তকী মক্কা মদিনা হইতে দামেস্কে আসত এবং তাদের শিল্প নৈপুণ্যে মজলিস সরগরম করে তুলত। বাদশাহ ও তার সভাসদগণ শিকার, ঘোড় দৌড়, পাশা খেলা ও গোলা খেলা পছন্দ করতেন। মোরগের লড়াই এই সময় প্রচলিত ছিল এবং অনেকে এতে বেশ আনন্দ উপভোগ করত। শিকারের জন্য পোষা শিকারী কুকুর ব্যবহার করা হতো। এই উদ্দেশ্যে চিতাবাঘ ব্যবহার ও প্রচলিত ছিল।

উমাইয়া রাজাগণ ঘোড় দৌড়ে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। ভাল জাতের ঘোড়ার প্রতিপালন এবং সেগুলিকে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবহার করার শখ অনেকেরই ছিল। প্রথম ওয়ালিদ জনসাধারণের জন্য ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। সোলায়মানও ঘোড়দৌড়ে আমোদ পেতেন। হিশামের সময়ে অনুষ্ঠিত এক ঘোড় দৌড়ে খলিফা ও অন্যান্যদের ঘোড়াসমেত মোট ৪০০০ ঘোড়া অংশগ্রহণ করে। হিশামের কন্যাও দৌড়ের জন্য অশ্ব পুষিত।

বাইজানটাইনদের ন্যায় বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সংগৃহীত সুন্দরী ও নর্তকীদের বেহাত হওয়ার ভয় থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এ সময়ে রোমকদের ন্যায় হেরেমে খোজা প্রহরী নিযুক্ত করার রীতি চালু হয়।

উমাইয়া যুগে বাদশাহগণের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে কবি ও কবিতার বিশেষ উন্নতি হয়। মিসকিন আদ-দারিমী নামক জনৈক কবি মাবিয়া কর্তৃক ইয়াজিদের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন সম্পর্কে কবিতা রচনা করে জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচার করে। হাম্মাদ নামক একজন সংগ্রাহক জাহিলিয়াত যুগের কবিতা সংকলন করেন। উমাইয়াদের চারণ কবিদের মধ্যে ফাবাজদাক, জরির ও আখতাল বিখ্যাত।

উল্লেখ্য ইয়াজিদ মাবিয়ার খ্রিস্টান স্ত্রী মাইসিনার পুত্র হওয়ায় খৃষ্টান কবি আখতাল জোবালের ভাষায় উমাইয়াদের খেলাফতের দাবি সমর্থন করে কবিতা লেখে। বলা হয়ে থাকে মজনু ও লায়লার প্রেমের উপাখ্যান লেখার কাজ এই যুগেই করা হয় ।

শুক্রবারের নামাজের পূর্বে খুতবা প্রদান করার প্রথা বাগ্মিতা প্রদর্শনের সযোগ দেয়। গভর্নর ও সেনাদক্ষগণ উমাইয়াদের মর্যাদা ও সামরিক শক্তির ওপর জোর বক্তৃতা দিত। সরকারি আদেশ-নিষেধ ও সকল প্রকার মতবাদ এই বক্তৃতার মাধ্যমেই সমাজে জারি করা হতো। উল্লেখ্য রসুল (দ.) এর সময়ে নামাজের পর খুতবা প্রদান করা হতো। অথচ উমাইয়াদের এই প্রথা অদ্যাবধি চালু আছে।

উমাইয়াদের শাসনকালে জায়গির দান ও গ্রহণ প্রথা আরও বিস্তার লাভ করে সিরিয়া ছাড়া ইরাকের বিখ্যাত আল-সাওয়াদ (ব্যাবিলন) অঞ্চলের সকল ভূ-সম্পত্তি মাবিয়া, আবদুল মালিক ও হিশামের আমলে উমাইয়াদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ভাগাভাগি করা হয়। কথিত আছে বিখ্যাত উমাইয়া নেতা সাঈদ বিন আল-আস গর্বভরে বলতেন আল-সাওয়াদ কুরেশদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যতিরেকে কিছু নহে। এর থেকে আমরা যত খুশি তত নিতে পারি এবং যেটুকু ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারি। বস্তুত এ সময় স্বয়ং খলিফা হতে আরম্ভ করে বড় বড় সেনাপতি, আমির ও ওমরাহগন ভূ সম্পত্তি দখল করে বিশাল জোতদারী সৃষ্টি করেন। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে মাবিয়া, আবদুল মালিক, আল ওয়ালিদ, হিশাম প্রমুখ প্রভূত ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিল। সেনাপতিদের মধ্যে মাসলামা, খালিদ আল কাসুরি সেরা জোতদার ছিলেন। হিশাম এবং খালেদ বিন আবদুল্লাহ আর কাসুরি রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পত্তির মালিক ছিল। তারা এত প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য লাভের জন্য গুদামজাত করতো যে, তাদের ইচ্ছায় খাদ্যদ্রব্যের বাজার মূল্য উঠানামা করত। এইভাবে জায়গির লাভ করে সমগ্র মুসলমান সাম্রাজ্য উমাইয়াদের ব্যক্তিগত সম্পদ আহরনের উন্মুক্তক্ষেত্রে পরিণত হয়।

(ইসলাম : রাষ্ট্র ও সমাজ শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, ইসলাম ও খেলাফত ড. মফিজুল্লাহ কবীর- নওরোজ কিতাবিস্তান বাংলা একাডেমী)।

উমাইয়াদের অনারব নির্যাতন নীতি :

রসুল (দ.) বলেছেন, কুরাইশদের জাত্যাভিমান ইসলাম ধর্মের ধ্বংসের কারণ হবে। রসুল (দ.) তাঁর উম্মতদের সঠিক পথে পরিচালনা করার লক্ষ্যে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে উমাইয়া শাসকগণ তাদের রাষ্ট্রীয় পলিসি হিসেবে মাওয়ালিদের (অনারব মুসলিম) নির্যাতন করত। সমতা, সমমর্যাদা ও সম্মান লাভের যে আশা নিয়ে মাওয়ালিগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। উমাইয়া শাসনকালে আরবগণ তাদের অপমানিত ও হেয় করে রাখে। সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ হতে বঞ্চিত করে রাখা হয়। ঐ সময়ে রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মাওয়ালিদের সংখ্যা ভীতিপ্রদ ভাবে আরবদের আনুপাতিক হারকে ছাড়িয়ে যায়। ফলে বাজারে পণ্য দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য কিছু সংখ্যক ও কায়িক শ্রমের জন্য কিছু সংখ্যক মাওয়ালি রেখে বাদবাকি মাওয়ালি মেরে ফেলা যায় কি না হাজ্জাজ সে বিষয়ে চিন্তা করেছিলো। শরিয়ত বহির্ভূতভাবে মাওয়ালিদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ করেও এদের সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়নি। গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং ট্রান্সঅক্রীয়িনার প্রশাসক কুতায়বা বিন মুসলিম মাওয়ালিদের চরম অপমান করে। হাজ্জাজ এদেরকে নগর হতে বিতাড়িত করে এবং বকেয়া জিজিয়া কড়ায় গন্ডায় আদায় করে এবং তাদের সকলকে স্ব-স্ব গ্রামে যেতে বাধ্য করে এবং নিজ নিজ গ্রামের নাম তাদের হাতে ছাপ মেরে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। হাজ্জাজ মাওয়ালিদের কৃষি কাজ এবং কৃষি ভূমির খারাজ প্রদানে বাধ্য করে।

অথচ সে সময় কোন আরব মুসলমান খারাজ দিত না। উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেন বিজয়ী বীর মুসা এবং তারিককেও জিজিয়া হতে অব্যহতি দেওয়া হয়নি বলে জানা যায়। (ইসলামঃ রাষ্ট্র ও সমাজ, লেখক শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান)।

উমাইয়াদের পতন :

বনি উমাইয়াদের খেলাফত কালের পরিস্থিতি ছিল অবর্ণনীয়। বিশেষ করে কুফায় এ অবস্থা ছিল সাংঘাতিক। কুফার শাসনকর্তা মুসলমানদের ওপর কাফিরদিগকে চাপাইয়া রাখিয়াছিল। মুসলমানদের মসজিদ ভাঙিয়া ফেলা হইতেছিল, মুসলমানদের পয়সাতেই খ্রিস্টানদের গির্জা মাথা উঁচু করে দাঁড়াইয়াছে। মুসলমানদের রসুলের ওপর খলিফার সম্মান প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, হজরত আলী (আ.) কে গাল দেওয়া হইতেছিল। (নাউজুবিল্লাহ) হজরত ওসমান (রা.) কেও রেহাই দেয়া হচ্ছিলনা। মুসলমানদের ধর্মের সাথে হাসি তামাশা করা হচ্ছিল।

ইহা ছিল শাসনকর্তার কাজ। স্বয়ং বাদশাহর চিন্তা ছিল প্রজাদের অবস্থা যাই হোক কেন টাকা পয়সায় রাজকোষ পরিপূর্ণ হলেই হল। মুসলমানগণ উপবাস অবস্থায় দিন কাটাইত আর মুসলমান শাসনকর্তার চাকর তার পুত্রের খতনায় এত পয়সা খরচ করিত যে রাজা-বাদশাহর সন্তানেরা খতনায় সেই পরিমাণ অর্থ খরচ করা সম্ভব হত না। কিন্তু সমস্ত দুনিয়া চুপ ছিল। বনি উমাইয়াদের উন্মুক্ত তরবারি রক্তের যে নদী প্রবাহিত করেছিল এবং অত্যাচারের যে অগ্নিকুন্ড প্রজ্জ্বলিত করেছিল উহা দেখে চুপ করে থাকা ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। তারা দেখ ছিল কথা মুখ হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই দেহ হতে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই অত্যাচার ও নিপীড়নের অন্ধকারে হঠাৎ নবি পরিবারের (আহলে বায়াতদের) দ্বীন ইসলামের খোদা কর্তৃক নিয়োজিত সংরক্ষণকারী একজন উজ্জ্বল ভাস্কর যাবতীয় গুণের অধিকারী তাহাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এই রত্নের সন্ধানী ছিলো সকল মুমিনের অন্তর। তাদের সম্মুখে যেন রহমতের ফেরেশতা এসে দেখা দিলেন। শুধু কুফার জনসাধারণ নয় বরং সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দিল। হজরত জায়েদ (আ.), হিশামের শাসনকালে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়াদের শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

কথিত আছে, ইমাম হজরত জায়েদ (আ.) যখন পরাজয় নিশ্চিত মনে করলেন তখন বলেছিলেন-আল্লাহর শোকর। যিনি এই সময় আমাকে তাহার দ্বীন ধর্মকে পরম সীমায় পৌঁছানোর সুযোগ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি যা বলেছিলেন উহাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, আমি রসুলের (দ.) নিকট

বিশেষভাবে লজ্জিত ছিলাম যে কেন আমি তাহার উম্মতকে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করিনি এবং তা না করে তার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ মনে করেছিলাম।”

হজরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) হজরত যায়েদের শাহাদাতের সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছেন: আল্লাহর কসম। আমাদের চাচা আমাদের সকলের চেয়ে অধিক কোরআন তেলাওয়াতকারী, ধর্মীয় জ্ঞানে অধিক জ্ঞানী এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি অধিক মেহেরবান ছিলেন। আল্লাহর কসম, আমাদের ইহকাল ও পরকালের সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের বংশে তাহার ন্যায় কোন লোক রাখিয়া গেলেন না।

হজরত ইমাম আবু হানিফা (রা.) বলতেন- নবি পরিবারের (আহলে বায়াত) কিছু সংখ্যক বুজর্গকে দেখার সৌভাগ্য যেমন আমার হইয়াছিল তেমনি হজরত জায়েদকে (আ.) দেখার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলাম। আমি সেই যুগে তাহার মত ফিকাহবিদ আর কাহাকেও দেখি নাই। তাহার ন্যায় সরলভাষী এবং উপস্থিত জবাবদানকারী কোন লোকও আমার দৃষ্টি গোচর হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে সেই যুগে তাঁহার সমতুল্য কোন লোক ছিলেন না।

হজরত জায়েদ (আ.) এই শর্তে লোকদিগকে বায়াত করতেন, “আমি তোমাদিগকে আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নার দিকে আহ্বান করিতেছি। তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি তোমরা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জেহাদ কর। দুর্বলকে উৎপীড়ন থেকে রক্ষা কর। নিজের হক হইতে যে বঞ্চিত, তাহাকে তাহার হক আদায় করে দাও। মুসলমানদের যে সম্পদ বায়তুল মালে জমা রহিয়াছে সমভাবে উহা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও।”

হজরত ইমাম আবু হানিফা হাজার টাকার দশটি থলে হজরত যায়েদের খেদমতে পেশ করে এই জেহাদে শরিক হন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, হজরত জায়েদকে (আ.) সাহায্য করা ফরজ ইমাম সাহেব এই ফতোয়া দান করেছিলেন।

প্রকাশ থাকে যে, হজরত যায়েদের (আ.) শাহাদত বনি উমাইয়াদের মরন ঢংকা বাজাইয়া দেয়। সাত বৎসরের মধ্যেই তাহারা শাসন ক্ষমতা হতে বহিস্কৃত হইয়াছিল। উমাইয়াগণ কি জঘন্য চরিত্রের ছিল তার আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো হজরত জায়েদের (রা.) পবিত্র মৃতদেহের সাথে তাদের আচরণ। কুফার শাসনকর্তা ইউসুফ হজরত জায়েদের (রা.) লাশ মোবারককে দেহ হতে মস্তক ছিন্ন করে হিশামের নিকট পাঠাইয়া দেয়। হিশাম সেই পবিত্র মস্তক দামেস্কে প্রকাশ্য রাজপথে লটকাইয়া রাখার নির্দেশ দেয়। সে ইউসুফকে লিখিল মস্তক বিহীন দেহ যেন কুফার রাজপথে লটকাইয়া রাখা হয়। এক বৎসর দুই মাস পর্যন্ত এই পবিত্র দেহ শূলে চড়ানো অবস্থায় লটকানো ছিল। পরে সেই দেহ শূল হতে নামাইয়া আগুণে ভস্মীভূত করে ভস্মরাশিকে ইউফ্রেতিস নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

হজরত জায়েদের (রা.) শাহাদতের পর তার সুযোগ্য পুত্র হজরত ইয়াহিয়া জাহেদ তার পিতার মিশনের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় ওয়ালিদের আমলে হজরত ইয়াহিয়া (আ.) উমাইয়াদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। বলখের জুয়েজান জেলায় তিনি শহিদ হন। পিতার ন্যায় তার মৃতদেহও শূলে দেওয়া হয়। খুরমান, ইরাক ও সিরিয়া পর্যন্ত ইহা একটি তামাসার বস্তু (নাউজুবিল্লাহ) হিসেবে লোকের দেখার জন্য লটকাইয়া রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারদের ওপর উহার পরিণতি কতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে ক্ষমতার মোহে বনি উমাইয়াগণ উহা ভুলে গিয়েছিল। কারণ পরবর্তীতে দেখা যায় যে, বনি আব্বাসীদের আবু মুসলিম খোরাসানে কৃতকার্য হয়েছিল তাহার মূলে ছিল বনি উমাইয়াদের এ ধরনের জঘন্যতম কার্যকলাপ। খোরাসানে বনি আব্বাসীয়দের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের প্রথম কাজ ছিল হজরত ইয়াহিয়ার লাশের নামাজে জানাজা দিয়ে যথারীতি দাফন করা। সাতদিন পর্যন্ত খুরাসানের প্রত্যেকটি ঘরে শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল। শুধু তাই নয় কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এক বৎসর পর্যন্ত খোরাসানে যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল তাদের নামই ইয়াহিয়া অথবা জায়েদ রাখা হইয়াছিল। প্রকাশ থাকে যে, হজরত জায়েদ (আ.) ও ইহাহিয়া ভারতের সাজ্জাদানশী পির সাহেব কিবলাহ হজরত রশীদ আলী আল কাদরী (ম. জি. আ.) এর ২৫ তম ঊর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষ।

দ্বাদশ অধ্যায়

আব্বাসীয় শাসনকাল

আব্বাসীয়দের ক্ষমতা লাভ :

মহানবি (দ.) এর চাচা আব্বাসের বংশধরগণ উমাইয়াদের উৎখাত করার জন্য একটি রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন। তবে জনগণ সাধারণভাবে আহলে বায়াতগণের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই উমাইয়াদের উৎখাত করতে সংঘবদ্ধ হয়। তাই আব্বাসী প্রচারকগণও আহলে বায়তগনের পক্ষেই প্রচারণা চালিয়ে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে। এরা মুসলমানদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিল যে তারা রসুলের বংশের লোক (আহলে বায়াত) তারা কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করবে এবং তাদের হাতে আল্লাহর বিধি বিধান কায়েম হবে। হিজরি ১৩২ সালের রবিউসসানি মাসে আব্বাসীয় নেতা সাফফার হাতে, কুফায় খেলাফতের বাইয়াত কালে, প্রথম ভাষণে বনি উমাইয়াদের অত্যাচার অবিচারের বিষয় উল্লেখ করে সাফফা বলেছিল। আমি আশা করি, যে খান্দান (আহলে বায়াত) থেকে তোমরা কল্যাণ লাভ করেছে, সে খান্দান থেকে তোমাদের প্রতি কোন জুলুম নির্যাতন চালান হবেনা। যে খান্দান থেকে তোমরা সংশোধনের পথ (হেদায়েত) লাভ করেছ সে খান্দান তোমাদের। ওপর কোন ধ্বংস-বিপর্যয় ডেকে আনবে না।

সাফফার পর তার চাচা দাউদ ইবনে আলী জনগণকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন– নিজেদের জন্য স্বর্ণ রৌপ্য রাজ প্রাসাদ নির্মাণ এবং তাতে নহর খননের জন্য আমাদের উদ্ভব হয়নি। বরং যে বিষয়টি আমাদেরকে ডেকে এনেছে তা হচ্ছে এই যে, আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। আমাদের চাচার বংশধরদের (আহলে বায়াতগণের) ওপর জুলুম নির্যাতন চলছিল। বনি উমাইয়ারা তোমাদেরকে চলাচ্ছিল অত্যন্ত খারাপ পথে। তারা তোমাদের অপদস্ত ও লাঞ্চিত করে চলছিল। আর তোমাদের বায়তুলমালকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছিল। এখন আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ, তার রসুল এবং আল্লাহর কিতাব ও তার রসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা করব। আন্দোলনের সময় আহলে বায়াতগণ জ্ঞানচর্চা ও ধর্মালোচনা করে মদিনায় দিন কাটাইতেন। জ্ঞান পান্ডিত্য, মহত্ব ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি সদগুণের জন্য মুহাম্মদ নামক হাসান (আ.) এর বংশধর প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর ধর্মভীরুতার জন্য তিনি নফস-আল জাকিয়া বা 'পবিত্র আত্মা' খেতাব লাভ করেন। উমাইয়াদের পতন সংঘটিত করার জন্য হাশেমী বংশের সদস্যগণ মদিনায় একটি গোপন অধিবেশনে মিলিত হন। উক্ত অধিবেশনে দ্বিতীয় আব্বাসী বাদশাহ আল মনসুরও উপস্থিত ছিল। উক্ত অধিবেশনে নাফস আল জাকিয়া মুহম্মদকে সর্বসম্মতিক্রমে আন্দোলনের নেতা নিযুক্ত করা হয়। আল মানসুর ইমাম হিসেবে তার হাতে হাত দিয়ে আনুগত্য শপথ গ্রহণ করেন। তারপর সর্বদলীয় আন্দোলনরূপে আব্বাসী প্রচারণা প্রকাশ পায় এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উমাইয়াদের পতন ঘটিয়ে ৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীগণ পূর্বচুক্তি ভঙ্গ করে খেলাফত অধিকার করে। কিছুদিনের মধ্যে একথা প্রমাণ করে যে এসবই ছিল ভাওতা মাত্র। পরবর্তীতে আব্বাসীয়গণ আহলে বায়াতগণের কার্যকলাপের ওপর কড়া নজর রাখে এবং উমাইয়াদের মতই সম্ভাব্য সকল প্রকারে তাদের ধ্বংস করার নীতি অনুস্মরণ করে। আব্বাসী শাসক আল মনসুরের কোপানলে পড়ে মুহম্মদ ওরফে নফস আল জাকিয়া এই নব্য জালেম বাদশাহি খতম করার লক্ষ্যে মদিনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু আল মনসুর সে বিদ্রোহ দমন করে এবং মুহম্মদকে ৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করে মুহম্মদের পবিত্র দেহ মোবারককে শুলবিদ্ধ করা হয়। শহরে শহরে তার মস্তক প্রদর্শন করানো হয়। তাঁর এবং তার সংঙ্গীদের লাশ তিনদিন যাবত মদিনার রাজপথে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং পরে ইহুদিদের গোরস্থানে নিক্ষেপ করা হয়। মুহম্মদের ভ্রাতা ইব্রাহিম কুফায় গমন করেন। তিনিও আব্বাসী সৈন্যদলের হাতে ৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত ও নিহত হন। তার মৃতদেহের ওপরও আব্বাসীগণ কর্তৃক একই ধরনের আচরণ করা হয়। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মগোপন কালে তাদের ঠিকানা না দেওয়ার অপরাধে মনসুর তাদের পরিবারের সদস্যবর্গ এবং আত্মীয় স্বজনকে গ্রেফতার করে। তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম করা হয়। তাদেরকে হাতকড়া লাগিয়ে ইরাকে নিয়ে যাওয়া হয়। মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম ইবনুল হাসানকে জীবন্ত দেয়ালে পিষে হত্যা করা হয়।

ইব্রাহিম ইবনে আবদুল্লাহর শ্বশুরকে উলঙ্গ করে দেড়শ কোড়া মারা হয়। তারপর তাকে হত্যা করে খোরাসানের রাস্তায় রাস্তায় তার মস্তকের প্রদর্শনী করা হয়। (ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজ, শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান)

এসব ঘটনাবলী শুধু একথাই প্রমাণ করে যে, বনি উমাইয়াদের মত আব্বাসীয়দের ক্ষমতা গ্রহণ প্রক্রিয়া শঠতা প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাচারের গোলক ধাঁধায় আবর্তিত এবং এই শাসন উমাইয়াদের মতই দ্বীন রহিত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, আল্লাহ, আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা লংঘনে উমাইয়ারা যেমন দ্বিধা করতে না তেমনি আব্বাসীয়দেরও কোন দ্বিধা ছিল না। আব্বাসীয়রা যে বিপ্লব সাধন করে, তাতে কেবল শাসকের পরিবর্তন হয়েছে। শাসন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয়নি। তারা উমাইয়া যুগের কোন একটি বিকৃতির সংশোধন করেনি। বরং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে যে সব অনাচার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে তা পূর্ণমাত্রায় বহাল রাখে।

বনি উমাইয়ারা যে ভাবে রাজকার্য চালিয়ে আসছিল আব্বাসীয় আমলে সেভাবেই চলতে থাকে পার্থক্য হয়েছে কেবল এই যে, বনি উমাইয়াদের জন্য আদর্শ ছিল রোমের কাইজার আর আব্বাসীয়দের জন্য অনুকরণীয় হয়েছে ইরানের কিসরা।

আব্বাসীয়দের ক্ষমতা গ্রহণের আইনগত ভিত্তি জনসমক্ষে প্রচার করার উদ্দেশ্যে আব্বাসীয় বাদশাহ মনসুর হজরত ইমাম আবু হানিফার নিকট প্রশ্ন করেছিলেন– আপনি সত্য করে বলুন আল্লাহতা'লা যে শাসন ক্ষমতা আমাদের হাতে দিয়াছেন আমরা প্রকৃত পক্ষে উহার উপযুক্ত কি না ? এই প্রশ্নের উত্তরে ইমাম সাহেব বলেছিলেন, শুনুন– আপনি এমন এক সময়ে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেছেন যখন ফতোয়া দানে সমর্থ আলেমদের মধ্যে দুইজন আলিমও আপনার সমর্থক ছিলেন না। আপনি অবগত আছেন যে খেলাফত এমন একটি জটিল বিষয় যার সমাধান (নির্বাচনের অধিকার নয় বরং জনগণ যদি আন্তরিকভাবে খোদা কর্তৃক নিযুক্ত রসুল/নায়েবে রসুলকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদের প্রচারিত আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় না) আপনি ক্ষমতা গ্রহণের মধ্যে এ ধরনের কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

এমনকি আব্বাসীয় বাদশাহ মামুন নিজেই আব্বাসীয়দের রাজত্বকে বৈধ মনে করতেন না। বরং তিনি মত প্রকাশ করেন যে, খেলাফত আলী বংশের জন্য নির্ধারিত। তাই তিনি ইমাম আলী রেজাকে খেলাফত প্রদানের জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। সেই কারণে তিনি ২০০ হিজরিতে ঘোষণা করেন যে, ইমাম আলী (আ.) অপেক্ষা খেলাফত লাভের জন্য মহান ইমাম ছাড়া আর কেউ নাই। সেইজন্য তিনি তাকে আল রিজামিন আল মুহাম্মদ খেতাব প্রদান করে খেলাফতের জন্য মনোনয়ন দান করেন। কিন্তু আব্বাসীয়গণ ক্ষমতার লোভে এই ইমাম কে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করে।

আব্বাসীয়দের বিচার ব্যবস্থা :

বসরার বিখ্যাত গ্রন্থকার আবদুল্লাহ ইবনে মুকাফিফা আব্বাসী খলিফা মনসুরের নিকট তৎকালীন বিচার বিভাগ সম্বন্ধীয় অভিযোগ নিম্নরূপ ভাষায় প্রেরণ করেছিলেন :

আদালতের বিচার সংক্রান্ত রায় সম্পর্কে যে দারুন মতবিরোধ ও মতভেদ দেখা দিয়াছে আমি সেদিকে আমিরুল মোমিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লোকের জান-মাল-মান-ইজ্জত সম্বন্ধে এই প্রকার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ঘটনা এই যে হিরার (কুফা হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী শহর) কাজি যে মামলায় গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন ঠিক তদ্রুপ মামলায় দেখা গিয়াছে কুফার কাজি হিরার কাজির বিপরীত রায় দিয়াছেন। বহু ফয়সালা তো বনি উমাইয়া হুকুমতের দৃষ্টান্তে সমাধা করা হয়। যদি কেহ প্রশ্ন করে যে এরূপ ফয়সালা কোন দলিল মতে করা হইল ? তখন কাজিগণ না রসুলুল্লাহ না খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগের বরং কাজিগণ বলিয়া থাকে আবদুল মালিক ইবনে মারোয়ানের যুগে অমুক কাজি এরূপ মামলার এরূপ রায় দিয়াছিলেন। এরূপ অন্যান্য শাসকবৃন্দের দৃষ্টান্ত দিয়া প্রশ্নকারীকে চুপ করিয়া দেয়। (ইমাম আবু হানিফার রাজনৈতিক জীবন-মাহাযির আহসান গিলানি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

হারুনুর রশিদ হাফস ইবনে গিয়াসকে বাগদাদের কাজি নিযুক্ত করেন। ঘটনাক্রমে হারুনুর রশিদের প্রিয়তম স্ত্রী জুবায়দার প্রধান দেহরক্ষীর নামে কাজির আদালতে সালিশ করা হইল। প্রধান দেহরক্ষী ঋণগ্রস্থ ছিল। কাজি সাহেব তাহার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করিলে বেগম জুবাইদা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল আমার লোক জানা সত্ত্বেও কাজি সাহেব কি ভাবে তাহার বিরুদ্ধে রায় দিলেন ? অতঃপর বাদশাহ মহলে আসিলে কাজিকে বরখাস্ত করানোর জন্য চাপ দিলেন। হারুনুর রশীদ স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য কাজিকে বরখাস্ত করিলেন (প্রাগুক্ত-পৃ-২৬)।

বাদশাহদের এই প্রকার অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ফলাফল এই হয়েছিল যে, সে যুগের বহু পরহেজগার ও দায়িত্ববান ব্যক্তি হুকুমতের পক্ষ হতে বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও কেহ কাজির পদ গ্রহণ করতে রাজি হতেন না। জোর জবরদস্তি করে কাকেও রাজি করালেও তিনি সাহস করে খলিফার নিকট হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন যে তার বিচারকার্যে কেহ কোন প্রকার ব্যক্তিগত চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। অতঃপর তাকে সান্তনা দেওয়ার ওয়াদাও করা হতো। কিন্তু সেই ওয়াদা কখনও পালন করা হতো না।

এ প্রসঙ্গে কাজি শরিফের সাথে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এর দ্বারা খলিফাদের কার্যনীতি পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। কথিত আছে– আবু জাফর মনসুর আব্বাসী কাজি শরিফকে কাজির পদ গ্রহণ করতে বলেন। প্রথমত তিনি টালবাহানা করতে লাগলেন, অবশেষে নিরুপায় হয়ে খলিফাকে উদ্দেশ্য করে বললেন আমি আমার বিবেক বুদ্ধির মত বিচারকার্য পরিচালনা করব এবং কাহার বিপক্ষে রায় দিচ্ছি–সে চিন্তা আমি করব না– খলিফার আপন লোক হউক কিংবা দরবারি লোক হোক। এ বিষয়ে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। মুখের কথা বলিতে দুরাচার মনসুরের ক্ষতি কোথায় ? মিথ্যা ওয়াদা ও মিথ্যাচারই এই রাজত্বের ভিত্তি। তাই মনসুর বলল– আপনি আমার সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কেও ফয়সালা করতে পারবেন। কাজি সাহেব জানতেন যে, সে যুগে বাদশাহর চেয়ে বেশি ভয় ছিল খলিফার দরবারিদের তাই কাজি সাহেব প্রকাশ্যভাবে বললেন, আপনি আমাকে আপনার দরবারি এবং আমির ওমরাদের হাত হতে রক্ষা করবেন। মনসুর এ বিষয়েও প্রতিশ্রুতি দিলেন। সব বিষয়ে পাকাপাকি করার পর কাজি সাহেব যেদিন প্রথম এজলাসে বসলেন দুর্ভাগ্যবশত সেদিনকার প্রথম মামলাই ছিল খলিফার আজাদকৃত দাসী যে অন্য কোন একটি লোকের সাথে জড়িত ছিল। বিচার এজলাসের রীতিনীতি প্রথম হতেই বিগড়ানো ছিল। এজলাসে যখন উভয় পক্ষ হাজির হলো তখন অভিযুক্ত রাজদাসী ছিল বলে তার প্রতিপক্ষের সমান স্থানে দন্ডায়মান হওয়া অপমানজনক মনে করে সামনে অগ্রসর হয়ে কাজি সাহেবের সম্মুখে দাঁড়ালো। দাসী নিশ্চিত ছিল যে, শাহি লোকদের সাথে আদালত এরূপ ব্যবহারই করে থাকে। কিন্তু দাসী জানত না যে, সে যেমন নিজকে শাহি মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতেছিল - নতুন কাজি সাহেবও তেমনি শাহি প্রতিশ্রুতি মতো নিজের মর্যাদার চিন্তায় বিভোর। "হে নাপাক রমনী, পিছনে সরে যা। কাজি সাহেবের মুখে এই কথা শুনে দাসীর চমক ভাঙল। সে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কাজিকে বলল, "বৃদ্ধ আহাম্মক ! একজন সাধারণ দাসীর মুখে এই কথা শুনে ইসলামের একজন প্রসিদ্ধ আলেম হতবাক হয়ে গেলেন এবং নিজের কৃতকার্যের জন্য আফসোস করতে লাগলেন। মনসুরের প্রতিশ্রুতি বহাল থাকা সত্ত্বেও কাজি সাহেবকে অপসারিত করা হইল।

ইবনে খাল্লাপনে লিখিত আছে– খলিফা মেহেদি হজরত সুফিয়ান সওরিকে বন্দী করে দরবারে আনলেন এবং কাজির পদ গ্রহণ করার জন্য বললেন। সুফিয়ান তা অস্বীকার করে এক পর্যায়ে– খলিফা ও তাহার দরবারিদের অনধিকার চর্চা সম্বন্ধে বললেন । মেহেদি তার পিতা মনসুরের ন্যায় মৌখিক নয় বরং লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন। কুফায় কাজি পদে বহাল করার নিয়োগ পত্রে এই শর্ত লিখিয়া দাও যে তার রায়ের বিরোধিতা করা হবে না। নিয়োগ পত্র হজরত সুফিয়ানের হাতে দেওয়া হল। হজরত সুফিয়ান নিয়োগ পত্র হাতে নিয়ে দরবার কক্ষ হতে বের হয়ে আসলেন এবং পথিমধ্যে উহা তাইগ্রিস নদীতে নিক্ষেপ করলেন (প্রগুক্ত)।

আব্বাসীয় খলিফাদের জীবন যাত্রা :

আব্বাসীয় নৃপতিগণও উমাইয়া বাদশাহদের ন্যায় মহাআড়ম্বরে ও জাঁকজমকে জীবন যাপন করেন। চমকে ইউনিফরম পরিহিত দেহরক্ষীরা তাহাদিগকে ঘিরে থাকত। খলিফা জানুর নিম্ন পর্যন্ত কামিজ পরিধান করে মণি-মুক্তা খচিত কোমরবন্দ কোমরে বেধে কাঁধের ওপর মূল্যবান চাদর জড়িয়ে কালান্সুয়া নামক চৌখা-

মাথাবিশিষ্ট টুপি পরতেন। এই টুপি বাদশাহ মনসুর প্রবর্তন করেন। দেহরক্ষীগণ খোলা তরবারি হাতে তার চারদিকে দন্ডায়মান থাকত। উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও যুবরাজগণ সিংহাসনের ডাইনে ও বামে সারিবদ্ধ থাকত। খলিফা পর্দার (কৃত্রিম মর্যাদা সৃষ্টির জন্য) অন্তরালে থাকতেন। পর্দা উত্তোলিত হইলে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম উচ্চারিত হতো। তারা অভিবাদন করে আসন গ্রহণ করতেন। এতদুপলক্ষে ভাবী উত্তরাধিকারী খলিফার পার্শ্বে একটি আসনে উপবিষ্ট থাকতেন।

মনে রাখতে হবে এই ধরনের অনৈসলামিক শিরক মিশ্রিত দরবারি কালচার মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্টান্ডার্ড রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড বা আদব হিসেবে বিবেচিত হতো। অধিকাংশ দরবারী আলেম এইসব আচার-আচরণকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা ফতোয়া দিতেন। ফলে এগুলো ইসলাম ধর্মীয় কালচারের সাথে সংগতি পূর্ণ হিসেবে মুসলিম সমাজে চালু হয়। অথচ রসুল (দ.) বা খোলাফায়ে রাশেদের আমলে এ ধরনের কালচার যে গ্রহযোগ্য ছিলনা তা সর্বজন বিদিত। কিন্তু রসুল (দ.) এর অনুসৃত নীতির প্রতি কোন প্রকার গুরুত্ব না দিয়ে ফকিহগণ এ ধরনের ফতোয়া অদ্যাবধি কিভাবে চালু রাখলেন তা বোধগম্য নয়। এ কারনেই পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম রাজারা (উমাইয়া আব্বাসীয়, তুর্কো, আফগান, মুগল ও ওসমানি সাম্রাজ্যে) এ ধরনের দরবারি কালচারকে অনুসরণ করাই বিধেয় ও শরিয়ত সম্মত বিবেচনা করতেন।

আব্বাসীয় ধর্মমত :

আব্বাসীয়রা প্রায় পাঁচশত (৭৫০-১২৫৮) বছর ক্ষমতাসীন ছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ধর্মমত প্রাধান্য পায়। তাছাড়া বাদশাহগণের ব্যক্তিগত ধর্মমত প্রজাকুলকে প্রভাবিত করবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই স্বাভাবিক । আবার একজন বাদশাহই জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক ধর্মমত অনুসরণ করায় পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে। আব্বাসীয়গণ তাদের সরকারকে ‘দৌলাহ’ ‘নবযুগ’– বা রেনেসাঁ বলে অভিহিত করতো। তারা মনে করতো রসুল (দ.) আমলের ইসলামের তারাই হলো ধারক ও বাহক। রসুল (দ.) যেমন একই সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে আব্বাসীয়রা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের দাবিদার হিসেবে নিজেদেরকে ঘোষণা করে। এ কারণেই খেলাফত প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় দিক আব্বাসী আমলে অধিকতর আকর্ষণীয় হয় এবং খলিফাকে “জিলুল্লাহ আলাল আরদ” বা দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিচ্ছবি, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিল। এবং ইমাম আবু হানিফার ভাষ্য মতে জনগণের মধ্যে কোন দুইজনও এইসব বাদশাহদের নিয়োগের ব্যাপারে একমত ছিল না। কিন্তু দরবারি আলেমগণ এই সব রাজাদের কাছ থেকে বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল করার লক্ষ্যে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা করে এই আব্বাসীয় খলিফাকে রসুলের প্রতিনিধি বা নায়েবে রসুল হিসেবে অভিহিত করে। ফলে এরা এই ফতোয়াকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে। অর্থাৎ বাদশাহদের বিরুদ্ধে কথা বলা হলে আল্লাহর রসুলের প্রতিনিধির বিরুদ্ধাচারণ করা এবং রসুল (দ.) এর প্রতিনিধির বিরোধিতা করার অর্থ আল্লাহর সাথে বিরোধিতা করা। অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণে বাদশাহর বিরুদ্ধাচরণ করা মাত্র বাদশাহগণ ধর্মীয় দৃষ্টি কোণে তাদের ধর্মোদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড প্রদানের তথাকথিত বৈধ ক্ষমতা সংরক্ষণ করতেন বলে মনে করতেন। এই ফতোয়া প্রায় সকল মুসলিম শাসক নির্বিচারে অনুসরণ করে আসছে।

আব্বাসীয়রা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মের ওপর দায়েম ও কায়েম ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুন্নি মাজহাবের ইমামদের সাথে তাদের আচরণ দেখে। হজরত ইমাম আবু হানিফা তার ধর্মীয় মতবাদের জন্য আব্বাসীয় আমলে বেত্রদন্ড ও কারাদন্ড ভোগ করেন। এমন কি অবশেষে তাকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়। অনুরূপভাবে ইমাম মালেক (রা.) কে মনসুরের (৭৫৪-৭৭৫) আমলে ৭০ বেত্রাদন্ড দেয়া হয়। এবং এমন ভীষণভাবে তাকে পিঠ মোড়া করে বাধা হয় যে, তার হস্তদ্বয় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইমাম আহমদ হাম্বলের ওপর বাদশাহ মামুন (৮১৩-৮৩৩), মোতাসিম (৮৩৩-৮৪২) ওয়াসিক (৮৪২-৮৪৭) তিন জনের আমলেই অনবরত নির্যাতন চালানো হয়। তাকে এত বেশি মারপিট করা হয় যে সম্ভবত উট ও হাতিও সে মারের পর জীবিত থাকতে পারতো না।

ইমাম শাফেয়িকে আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর রশীদ (৭৮৬-৮০৯) গভর্নর পদ দান করেন। ইমাম সাহেব অত্যন্ত স্বাধীনভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার করার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য কঠোর নিয়ম অবলম্বন করেন। দুর্নীতিবাজ কর্মচারীগণ ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে খলিফার নিকট নানা ধরনের অভিযোগ পেশ করলো। তার মধ্যে একটি হলো তিনি আহলে বায়াতের অনুসারী। তারা একথাও বাদশাহকে বুঝাতে সক্ষম হলো রাজ্যের মঙ্গল চাইলে ইমাম শাফেয়িকে অবিলম্বে পদচ্যুত করা উচিত।

এই পরামর্শ অনুযায়ী হারুন-অর-রশিদ হজরত ইমাম শাফেয়ি সহ তাঁর সমর্থকদের গ্রেফতার করলেন। খলিফার নির্দেশে প্রতিদিন তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে ১০ জন লোককে হত্যা করা হতো। ইমাম সাহেবকে কারাগারে দারুন বেত্রাঘাত করা হলো। এক দিন খলিফার নির্দেশে ইমাম সাহেবকে হত্যার জন্য হারুনের সামনে নিয়ে আসা হলো। তিনি তখন হারুনের সামনে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন যা শুনে খলিফার হৃদয় কেঁপে উঠলো। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ইমাম সাহেবকে হত্যার নির্দেশ প্রত্যাহার করলেন।

বিখ্যাত সুফি সাধক ও আশেকে ইলাহি হজরত মনসুর হিল্লাজকে (রা.) এই সময়েই অত্যন্ত নৃশংশভাবে হত্যা করা হয়। আব্বাসী বাদশাহ মামুন ৮২৭ সালে এই ধর্মমত গ্রহণ করেন ঘোষণা করা হয় যে, 'কোরআন সৃষ্ট'। ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি আর একটি ফরমান জারির মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করেন। কাজিগণ এই বিচারে উত্তীর্ণ হইতে না পারলে বরখাস্ত করা হতো। প্রকাশ্যে এই মতের বিরোধিতা করিলে গর্দান যেত।

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে সুন্নি ধর্মমত বলতে যা বোঝায় উল্লেখিত আব্বাসীয় বাদশাহগণ তার বিরোধী তথা প্রকৃত পক্ষে তারা দ্বীন ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে আব্বাসীয়গণ আহলে বায়াতগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতা দখল করে। কাজেই খেলাফত অধিকার করার পর থেকে প্রায় সকল নৃপতিগণের আমলেই তারা "আহলে বায়াতদের কার্যকলাপের ওপর কড়া নজর রাখে। তাদের কার্যকলাপের স্থায়ি নীতি ছিল 'আহলে বায়াত'গণের প্রকৃত সম্মান জনসমক্ষে প্রকাশিত না করার জন্য পবিত্র কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা।" আহলে বায়াতদের প্রতি তাদের আচরণের চূড়ান্ত পরিনতি লাভ করে মুতাওয়ালি (৮৪৭-৮৬১) এর আমলে। সে হজরত আলী (আ.) এর মাজার শরিফ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কারবালার মাটি পর্যন্ত খনন করে হাওর (জলাশয়) তৈরি করে। এবং এই মহান মাজারদ্বয় গমন পুন্যার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এবং নির্দেশ অমান্যকারীকে কারাবাসের শাস্তি নির্ধারিত করা হলো। 'বাগেফিদক' রসুল (দ.) এর ব্যক্তিগত সম্পদ– যা আবুবকর (রা.) কর্তৃক সর্বপ্রথম রাষ্ট্রায়াত্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তা মারওয়ান কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গন্য করা হয় এবং হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রা.) কর্তৃক আহলে বায়াতদের নিকট ফেরত দেয়া হয়। মুতাওয়াক্কিলের আমলে ইহা পুনরায় সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয় । প্রথম তিন খলিফার মর্যাদা যে হজরত আলী (আ.) থেকে বেশি এই মত মুতাওয়াক্কিল রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ওপরন্তু প্রথম তিন খলিফা সম্পর্কে কোন রকম সমালোচনা করা হলে মৃত্যুদন্ড শাস্তি নির্ধারিত ছিল। উমাইয়া অত্যাচারী শাসকদের সম্পর্কেও কোন প্রকার বিরুপ মন্তব্য সহ্য করা হইত না। (ইসলাম ও খেলাফত- ৬: মফীজুল্লাহ কবীর পৃ. ২৭৪)। আহলে বায়াতদের সম্পর্কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উমাইয়া ও আব্বাসীয়গণ এই মতবাদ সৃষ্টি করে তা অনুসরণ করতে থাকে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর দুভার্গ্য এই ধর্মদ্রোহী মতবাদ বা চিন্তাধারা ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু করা হয়। এই মতদর্শের অনুসারীদের সংখ্যাধিক্যের ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ও বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রেক্ষিতে আহলে বায়াতদের মর্যাদা লোকদের কাছে অনিন্ডিত হয়ে পড়েছে। অথচ বিষয়টি গভীরভাবে অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্য উদঘাটনে কেহই ব্রতী হচ্ছে, যা সত্যি দুঃখজনক।

এই আব্বাসীয় রাজন্যবর্গ সঠিক ইসলাম ধর্মমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। রাজনৈতিক কারণে একটি কসমোপটিলান সমাজ সৃষ্টি করার জন্য তারা পারসিক, সংস্কৃত, সিরিয় ও গ্রিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ঢালাওভাবে আরবিতে অনুদিত হয়। আরবিতে রূপান্তর লাভ করার পর এই বিজাতীয় জ্ঞানের আত্মীকরণ ঘটে। আর এই বাদশাহগণ যে কাজ করেন তা হলো একদিকে তারা গ্রিক, রোম ও অনারব দেশের খোদাদ্রোহী বা বিকৃত ধর্মমত বা দর্শন সমূহ হুবহু মুসলমানদের মধ্যে চালিয়ে দেন এবং অন্যদিকে নিজেদের অর্থ ও শক্তিবলে জ্ঞান-

বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃত ও সামাজিকতার মধ্যে ইসলাম পূর্ব যুগের সকল প্রকার অনাচার কু-আচার, কুসংস্কৃতির বিকৃত ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন করেন। ঐশি বানীবিহীন অনৈসলামিক– বিশেষ করে গ্রিক দর্শনের প্রচারের ফলে দ্বীন ইসলামের বিশ্বাস আকিদা তথা ঈমানের বুনিয়াদ নড়ে ওঠে। ওয়াসীল ইবনে আতা ও তার অনুসারীগণ গ্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে ইসলামের আকীদাগুলো আলোচনা করতে লেগে যায়। তাদের নিকট যদি কোন ইসলামি মূলনীতি গ্রিক দর্শনের পরিপন্থী বলে প্রতিভাত হত, তাহলে ঐ ইসলামি মূলনীতিকে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে ঘোষণা করতেও তারা কোন দ্বিধাবোধ করতেন না। তাদের মতে আকল-বুদ্ধি-তথা কমনসেন্স সকল সমস্যার সমাধানের চরম ও পরম এবং একমাত্র মানদন্ড এবং তাই তারা ইসলামি প্রত্যেকটি ঐশি নির্দেশ 'বুদ্ধি' যোগে বিচারে প্রবৃত্ত হন। তাদের মতে যে কোন ইসলামি ধর্মমত বা মতবাদ যা বুদ্ধির অগম্য তাই পরিত্যজ্য।

উদাহরণ স্বরূপ রসুলুল্লাহ (দ.) মিরাজ বা উর্ধ্বলোকে গমন ব্যাপারটির উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রিক দর্শনের আমদানী হবার আগে সকল সাহাবি ও তাবেঈগণ রসুলুল্লাহ (দ.) স্ব শরীরে জাগ্রত অবস্থায় মিরাজের যথার্থতা বিশ্বাস করে আসছিলেন। গ্রিক দর্শন আসার পরে ঐ বুদ্ধিবাদী দল গ্রীক দর্শনের ভিত্তিতে এভাবে মিরাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তারা বলেন গ্রিক দর্শনে বলা হয়েছে যে, আসমান একটি কঠিন ও অভঙ্গুর পদার্থ। তাই হাড়ি পাতিলের মত আসমান ভাঙতে পারে না। আর এর ভাঙলে তা আর জোড়া লাগতে পারে না। কাজেই রসুলুল্লাহ (দ.) স্ব-শরীরে জাগ্রত অবস্থার মত আসমান ভ্রমন একটি অসম্ভব ব্যাপার। তাই তা যথাযথ বলে বিশ্বাস করা যায় না। অনুরূপভাবে আল্লাহকে পরকালে দর্শন করা, কোরআন সৃষ্টি প্রভৃতি বুনিয়াদী ইসলামি আকিদা শব্দের যুক্তিজালে অস্বীকার করে ইসলামের ভিত্তি মূলে আঘাত হানে। অথচ এই দলটি নিজেদের আহলুল– আদনি ও তাওহিদ ন্যায়নিষ্ট ও খাটি তৌহিদ পন্থি বলে দাবি করতে থাকে। এরাই ইতিহাসে মুতাযিলা নামে কুখ্যাত। প্রসঙ্গত বলা যায় যে কিছুটা বিকৃতসহ এই মতবাদ এখনো প্রচলিত আছে।

অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে ব্যপক ধর্মীয় বিকৃতি :

প্রাথমিক যুগের তরজমাকারীদের মধ্যে ইয়াহিয়া ইবনুল বত্রিক মনসুরের জন্য গ্যালেন এবং হিপক্রেটিসের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সিরীয় খৃষ্টান ইউহান্না হারুনুর রশিদের জন্য বহু ডাক্তারী বই তর্জমা করেন। খলিফা মুতাদিদের সময় তারকা পূজারি (সাবেঈন) সাবিত ইবন কুররা গ্রিক গণিত ও জ্যোতিষ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সাবিতের পুত্র সিনান, পৌত্র সাবিত এবং ইব্রাহিম এবং প্রপৌত্র আবুল ফারাজ একাধারে তর্জমাকারী ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইবন মাতার নামক ব্যক্তি ইউক্লিডের এলিমেন্টস এবং টলেমীর আত্মাজেষ্ট অনুবাদ করেন। ইতিমধ্যে এরিস্টটলের প্রায় ১০০টি গ্রন্থ অনুদিত হয়। অমুসলমান চিন্তাবিদ কর্তৃক ব্যাপক অনুবাদের মধ্যে বহু ইসলাম বিরোধি চিন্তাধারা অনুবাদকগন মূল লেখকের লেখা হিসেবে চালাইয়া দেন। এই সব লেখকগন এরিষ্টটলকে পবিত্রতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন একটি মর্যাদায় ভূষিত করেন যা সম্ভবত গ্রীক ধর্মতত্ত্বের সূচনার যুগেও ঘটেনি। রাষ্ট্রীয়ভাবে ভ্রান্ত ধর্মীয় মতবাদ প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করার ফলে মুসলমানদের ভাগে গ্রিসের-ভান্ডারের যে অংশ পড়েছিল তার অধিকাংশ দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদী আকিদা বিরোধী। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন ও রসুল (দ.) এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ পরিপন্থী। অথচ মুসলমান সমাজের দূর্ভাগ্য এই ভ্রান্ত গ্রিক দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিমত্তা মুসলমানদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। লোকেরা এই সমস্ত মতবাদকে চরম সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। এরা এই দর্শনের প্রভাবে বিশ্বাসবোধকে (ঈমানকে) এমনভাবে কলুষিত করে ফেলেছিল যে নবুওতের বাস্তবতাকে তারা নীতিগতভাবে অস্বীকার করেছে যার ফলে সমাজে এমন হাজার হাজার লোক দেখতে পাওয়া গেল যে তারা কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করে, জুময়ার নামাজে এবং জামায়াতেও হাযির হয় এবং মুখে শরিয়তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ মদ্যপান ত্যাগ করেন। আর পাপ এবং নৈতিকতা বিরোধী কাজও ছাড়ে না। যদি তাকে এ ধরনের কাজের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয় যদি নবুওত সত্য না হয় তবে নামাজ পড় কেন তারা জবাব দিত শরীরের ব্যায়ামের জন্য। তাছাড়া এটা এখানকার রীতি আর এতে ধনদৌলত ও পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা রয়েছে। আবার অনেকে এও বলতো শরিয়ত খাটি নবুওত সত্য। তারপর যদি বলা হতো তাহলে মদ খাও কেন ? তাতে সে হয়তো জবাব দিতো মদ খাওয়া নিষেধ কেবল এজন্য যে এতে শত্রুতা এবং ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আমি

এসব পরিহার করে চলার যথেষ্ট জ্ঞান রাখি সুতরাং আমি মদ খাই আমার আত্মাকে আরও জীবন্ত করে চাঙ্গা করে তোলার জন্য। প্রসঙ্গত বলা যায় আব্বাসীয় দুই খলিফা আবুল আব্বাস ও হারুনুর রশিদ ছাড়া সবাই নিয়মিত মদ পান করতেন। মোতাযিলা পন্থি ইবনে সিনা (চিকিৎসক হিসেবে খ্যাত) তার শেষ উপদেশ এ লিখছেন যে, তিনি নাকি আল্লাহর কাছে অনেকগুলি কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে তিনি পবিত্র শরিয়তের নির্দেশিত আচার অনুশীলণগুলোর প্রশংসা করবেন, জামাতে নামাজ পড়বেন, ফাঁকিবাজি করবেন না। এবং বলবর্ধক বা ঔষধ হিসেবে ছাড়া আনন্দ ফুর্তির জন্য মদ পান করবেন না। সুতরাং তার ঈমানের পবিত্রতা এবং নামাজ পড়ার ফল দাঁড়ালো এই যে, তিনি রোগ নিরাময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মদ হালাল করলেন। অথচ রসুল (দ.) বলেছেন মদে কোন নিরাময় নাই বরং ইহা নিজেই অসুস্থতা বিশেষ বর্তমানেও কিছু সংখ্যক চিকিৎসক এই অভিমত পোষণ করেন। মুসলিম দেশ সমূহে ঐ তথাকথিত আধুনিক মতবাদ বিপুল বিক্রমে কাজ করে যাচ্ছিল এবং জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম কার্যত সমাজ জীবন থেকে তিরোহিত হয়েছিল বা মরে গিয়েছিল।

হরত আব্দুল কাদের জিলানি - মহীউদ্দীন (১০৭৭-১১৬৬) :

উমাইয়া-বনু-আব্বাসীয়া রাজন্যগণ সকল পবিত্র আদেশাবলীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে আলে রসুল (দ.) তথা আহলে বায়াতদের বিরুদ্ধে হিংসা-দ্বেষ, শত্রুতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ হত্যা-ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো-শূল দন্ডে বছরাধিক কাল ঝুলাইয়া ভয়-ভীতির সঞ্চার করে যাতে কেউ এর প্রতিবাদ করার প্রয়াস না পায়। পথে-ঘাটে, মসজিদে-মিম্বরে শত শত বৎসর ব্যাপী তাদের গালি-গালাজ, অভিসম্পাত এমনভাবে চালু রাখে যে, ইহা ‘স্থায়ি রীতি’তে পরিণত হয়। রসুল প্রেমিক যিনিই এর প্রতিবাদ করেছেন তাঁকে জীবন্ত সমাধি অথবা অন্ধকার কারাগৃহে নিক্ষেপ করে এরা ক্ষান্ত হয় নাই, চাবুকাঘাতে জর্জরিত করে তাদেরকে হত্যা করে। দুনিয়া-পূজারি রাজ-কর্মচারী, রাজ-পন্ডিত, মোল্লা-মৌলানা, মৌলভী তাদের এই কোরআন-হাদিস বিরোধী কুকর্মে কেবলমাত্র সহায়তায়ই করে নাই, বরং ফরমান-ফতোয়ার মাধ্যমে এতে জায়েজ লেবাস পরিধান করিয়েছে। মিশরের ফেরাউন রাজবৃন্দ খোদাদ্রোহী হয়ে স্বয়ং এক একজন খোদা সেজে খোদা প্রেমিকদের সাথে নিষ্ঠুরতম আচরণ করেছিল। অনুরূপভাবে বনু উমাইয়া-বনু আব্বাসীয়গণ ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে রাজ-সিংহাসন অধিকার করে আল-এ-রসুলদেরকে খোদা প্রদত্ত মান মর্যাদা হতে বঞ্চিত করেই ক্ষান্ত হয় নাই বরং তাদের ইবাদতগাহ, হুজরা-খানকাহ হইতে উচ্ছেদ, শহরান্তে নির্বাসন, ষড়যন্ত্র মিথ্যা অপবাদে রাজদ্রোহী, দন্ড, বিষ প্রয়োগে হত্যা কোন জঘন্যতম কুকর্ম করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। দুনিয়া পুজারি এই রাজ-রাজরাগণ ও তাহাদের সহযোগী রাজ কর্মচারীবৃন্দ প্রাসাদ দরবার-দহলিজ তাঁবু গুলি নট-নটিনী, কবিয়াল, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মদ্যপান, বাদ্য-বাজনা, কিসসা-কাহিনী আরব্য রজনীর মঞ্চে, জুয়াবাজি, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি অপসংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতা, নাস্তিকতা ও উন্মুক্ত চিন্তাধারার বন্যায় সমাজ জীবনকে প্লাবিত করে দেয়।

ধর্মের লেবাসধারী খলিফা– রাজন্যবৃন্দ যখন বিকৃত মস্তিষ্ক বিলাস-ব্যসনে মত্ত, ধর্মের রূহকে তখন সমাধিস্থ করে-সংস্কৃতি আর স্থাপত্যের নামে বিরাট ইসলামি স্থাপত্যের অট্টালিকা মসজিদ মিনার নির্মাণের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছিল। শরিয়তি আদেশ নির্দেশগুলি যখন দলিত-মথিত, কোরআনি ব্যাখ্যা রাজার স্বার্থ মোতাবেক যখন জন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হলো, দ্বীনের চতুর্দিকের দেওয়াল ছাদ, ভিত, গোপানাবলী ভাঙ্গিয়া খান খান হয়ে গেল। ধর্মের চেরাগ তখন নিভু নিভু, এমন ঘোরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ার বুকে রসুল (দ.) এঁর প্রতিচ্ছবি হজরত আলী (আ.) এঁর বেলায়তি ক্ষমতার প্রতিভূ, আওলিয়া কুল শিরোমণি, আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, শরিয়ত তরিকত মারেফাত হকিকতের দিশারী, তত্ত্বজ্ঞানের আলোকবর্ধনকারী, নুর-এ-এলাহির মণি, খোদাতত্ত্বের রহস্যাবলীর আকর, ইলম-এ-লাদুন্নির উৎস, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের জনশিন হাসানি হুসাইনি সৈয়দ, মানব দানব উভয় সম্প্রদায়ের গওস-এ-সামদানি মাহবুব, মুহাদ্দিস, মুফাখখার, ওসুলি, ফকিহ, আরেফিন কেরামের মাথার মুকুট, কুতব-এ-রব্বানি, পিরান-এ-পির, দস্তগির, মিরান-এ-মির, রওশন জমির হজরত সৈয়দ আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন শাইখ আবদুল কাদের জিলানি আ'লা জদিহি নবিয়্যিনা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম তশরিফ আনিলেন।

জীবন বৃত্তান্ত :

আউলিয়াকুল শিরোমণি হজরত গওসুল আজম বড়পির মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানি (র.) চারিশত একাত্তর হিজরি সনের পবিত্র রমজান মাসের পহেলা তারিখে জিলান শহরে সুবিখ্যাত সাইয়্যেদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জিলান শহরটি পারশ্য রাজ্যের অধীন ইরাক প্রদেশের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শহর, ইহার অপর নাম গিলানও বলা হয়। জিলানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই তাহাকে জিলানি অর্থাৎ জিলান দেশীয় বলা হয়। জিলান শহরটি বাগদাদ, হইতে ওয়াসেতের পথে একদিনের পথ, মতান্তরে ৪০০ (চারিশত) মাইল দূরে অবস্থিত।

তাহার জন্মের ব্যাপারটিও তাহার অসংখ্য কারামতসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা সাধারণত যে বয়সে স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রজননের অনুপযুক্ত হইয়া যায়, তেমন বয়সে তাহার সাধী ও মহিয়সী জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করেন। তখন তাহার বয়স ছিল ৬০ (ষাট), মতান্তরে একষট্টি বৎসর। অভিজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দের মতে এবয়সে সন্তান হওয়া অসম্ভব, কিন্তু মহাশক্তিমান আল্লাহতা'লা নিজের অসীম ক্ষমতাবলে হজরত গওসে আজমের কারামতের জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া দেখাইয়াছেন।

তাহার ওয়ালেদ সাহেবের নাম ছিল সাইয়্যেদ আবু ছালেহ মুসা জঙ্গী-দোস্ত এবং আম্মাজানের নাম ছিল সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের আমাতুল জাব্বার হজরত ফাতেমা (র.)।

হজরত বড়পির সাহেবের জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করার পরক্ষণ হইতেই নানা প্রকারের অলৌকিক কার্যকলাপ দেখিতে আরম্ভ করেন, যাহা প্রকারান্তরে হজরত গওসুল আজমেরই কারামতের ও বুজুর্গীর পরিচয়।

হজরত বড়পির সাহেব (র.) মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হওয়ার পর প্রথম মাসেই তাহার পুণ্যবতী ও বুজুর্গ জননী স্বপ্নে দেখিতে পান যে, মানব জাতির আদি মাতা হজরত হাওয়া আলাইহাসসালাম আগমন করিয়া তাহাকে বলিতেছেন, 'ফাতেমা'! এই জগতে তুমিই সৌভাগ্যশালিনী মহিলা তোমার গর্ভে দুনিয়ার কুতুবুল আকতাব, গওসুল আজম, আউলিয়া কুলের মুকুটমণি আবির্ভূত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় মাসে হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামের বিবি হজরত সারা আলাইহাস্‌সালাম স্বপ্নযোগে আসিয়া হজরত উম্মুল খায়ের ফাতেমাকে বলিলেন, "হে ফাতেমা! তোমার জীবন ধন্য ! নুরে আজম তোমার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন।"

তৃতীয় মাসে তিনি দেখিলেন, হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জননী হজরত মারইয়ম (আ.) স্বপ্ন যোগে তাঁহাকে বলিতেছেন : "তোমার গর্ভে জগৎবরেণ্য মহামানব আগমন করিয়াছেন।"

পঞ্চম মাসে হজরত রাসুলে মাকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রথমা বিবি হজরত খাদিজাতুল কোবরা (র.) স্বপ্নযোগে আসিয়া তাহাকে বলিলেন, "হে ফাতেমা ! তোমার গর্ভে দ্বীন ইসলামের মৃতপ্রায় দেহে নতুন জীবন সঞ্চারক মুহিউদ্দীন আবির্ভূত হইয়াছেন।"

ষষ্ঠ মাসে (হুজুরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা বিবি হজরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) স্বপ্নযোগে দর্শন দান করিয়া তাহাকে বলিলেন, "হে ভাগ্যবতী ফাতেমা! যেই মহাপুরুষের কার্যকলাপ এবং অভাবনিয় মহত্ত্বে ও গুণগরিমায় জগতের মানুষ মোহিত হইবে; অচিরেই তিনি তোমার স্নেহের কোল আলোকিত করিতেছেন।"

সপ্তম মাসে নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরম স্নেহের পুত্তলি কন্যা হজরত ফাতেমা জাহরা (রা.) স্বপ্ন যোগে তশরিফ আনয়ন করিয়া বলিলেন, "স্নেহের মা ফাতেমা ! সত্বরই সাইয়্যেদ গগনের দীপ্তিমান ভাস্কর তোমার কোল উদ্ভাসিত করিবেন।"

অষ্টম মাসে ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিবি জয়নব (রা.) স্বপ্নে আগমন করিয়া বলিলেন ঃ "ফাতেমা ! অনতিকাল পরেই এমন এক মহাপুরুষ তোমার কোল উজ্জ্বল করিবেন, যাহার আপ্রাণ চেষ্টায় নুর নবির (দ.) মৃতপ্রায় দ্বীন নতুন বলে বলীয়ান হইবে।"

নবম মাসে হজরত ইমাম হুসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহুর বিবি স্বপ্নে আসিয়া বলিলেন, "হে মহা-ভাগ্যবতী ফাতেমা ! তুমি সর্বদা সাবধান এবং সতর্ক থাকিও। তোমার সৌভাগ্যচন্দ্র উদিত হওয়ার সময় অতি নিকটে। আউলিয়াকুলের মাথার মুকুট কুতবুল-আক্তাব অতি অল্পকালের মধ্যে তোমার গৃহ আলোকিত করিবেন।"

হজরত গওসুল আজমের মাতা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (র.) বলেন, যেদিন আমার এই সন্তানটি ভূমিষ্ট হয়, সেদিন আমার স্বামী সাইয়্যেদ আবু ছালেহ মুসা স্বপ্নে দেখিলেন, হজরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রধান ছাহাবায়ে কেরামসহ আমাদের গৃহে তশরিফ আনিয়া তাহাকে 'মোবারকবাদ' জ্ঞাপন করিলেন।

" হে আবু ছালেহ ! আল্লাহতা'লা তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন; সে আমারও প্রিয়, আল্লাহতা'লারও প্রিয়। অতি শীঘ্রই সে সমস্ত অলি ও কুতুবগণের মধ্যে এমন মর্যাদার অধিকারী হইবে, যেমন সমস্ত নবি ও রসুলগণের মধ্যে আমার মর্যাদা রহিয়াছে।"

হুজুরে আকরাম (দ.) মেরাজে গমন করিলে হজরত গওসুল আজমের রুহকে নিজের পায়ের কাছে দেখিয়া উহার ঘাড়ের ওপর নিজের কদম মোবারক রাখিয়া বলিয়াছিলেন: "যেভাবে এখন আমি আমার পা তোমার ঘাড়ের ওপর রাখিলাম, সেভাবে আমার উম্মতের অলিগণের ঘাড়ের ওপর তোমার পা থাকিবে।"

ব্যাঘরূপে আবির্ভূত হইয়া ফকির হত্যা :

হজরত বড় পির ছাহেব মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই নিজের অলৌকিক ক্ষমতা অর্থাৎ কারামতসমূহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালে একদিন স্বীয় বিপন্ন জননীকে যেভাবে লম্পটের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহার নবির আউলিয়ায়ে কেরামের ইতিহাসে কোথাও নাই বলিলেই চলে। ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল এইরূপ:

একদিন জনৈক লম্পট ও দুশ্চরিত্র ভিক্ষুক ভিক্ষার উদ্দেশ্যে হজরত সাইয়্যেদ আবু ছালেহ মুসার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষার জন্য পুন পুন আওয়াজ দিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে তখন গৃহে আবু ছালেহ মুসার (র.) একমাত্র গর্ভবতী বিবি ব্যতীত আর কেহই ছিল না। অপরিচিত লোক ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া বা তাহার সহিত কথা বলা তিনি বৈধ মনে করিলেন না। কিন্তু ভিক্ষুক দরজায় দাঁড়াইয়া এমন করুণভাবে ভিক্ষার জন্য কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল যে, তাহা শুনিয়া কোমলমতি ফাতেমা তাহাকে ভিক্ষা না দিয়ে থাকিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি দরজার আড়ালে থাকিয়া হাত বাড়াইয়া ভিক্ষুককে কিছু ভিক্ষা দিলেন । দুষ্টমতি ভিক্ষুক তখন বুঝিতে পারিল যে, একমাত্র একজন স্ত্রীলোক ছাড়া ঘরে কোন দ্বিতীয় লোক নাই। সুতরাং সুযোগ বুঝিয়া কুমতলব হাসিল করার উদ্দেশ্যে সে গৃহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া হজরত উম্মুল খায়ের ফাতেমা ভয়ে ও আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি এই দুষ্টের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ঘরের কোণে দৌড়াইয়া গিয়া আশ্রয় লইলেন এবং নিঃসহায়ের সহায় ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় আল্লাহ তা'আলার নিকট সকরুণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন : "হে অন্তর্যামী ! তুমি সব কিছুই দেখিতে পাইতেছ। তোমার এই নিঃসহায় দাসীকে তুমি সাহায্য না করিলে তাহাকে সাহায্য করার আর কেহই নাই।" পাঠকগণের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে, এসময়ে কুতবুল আক্তাব গওসুল আজম তাহার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন।

জননীর এই চরম বিপদ দেখিয়া তিনি আর ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি আল্লাহ তা'লার অসীম কুদরতের বলে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া একটি ভয়ংকর বাঘের মূর্তি ধারণপূর্বক দুশ্চরিত্র ভিক্ষুকের ওপর লাফাইয়া পড়িলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে ভিক্ষুকের প্রাণ সংহার করিয়া তিনি পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিলেন। জননী উম্মুল খায়ের ফাতেমা (র.) ইহার কিছুই টের পাইলেন না। তিনি শুধু এতটুকুই দেখিতে পাইলেন যে, হঠাৎ কোথা হইতে একটি বাঘ আসিয়া ভিক্ষুককে সংহার করিয়া পুনরায় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তাঁহার জন্মদিনের একটি বিস্ময়কর ব্যাপার ইহাও ছিল যে, যেদিন তিনি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন সেদিন একই সময়ে জিলান শহর ও উহার চতুর্দিকে আরও কয়েকটি সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাহাদের সংখ্যা এগার শত বলা হইয়াছে। তাহারা সকলেই পুত্র সন্তান ছিল এবং সেই সন্তানগণ

সকলেই কালক্রমে আল্লাহ তালার নৈকট্যপ্রাপ্ত উচ্চপর্যায়ের খাস অলি আল্লাহ হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারটিকেও হজরত গওসে পাকের কারামতরূপে গণ্য করা যায়। – মানাক্বেবে গওসিয়্যাহ।

মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপায়ী থাকা অবস্থায় রোজা ঃ

উল্লেখিত কিতাবেই বর্ণিত আছে, হজরত গওসে পাকের সাধ্বী ও পুণ্যবতী জননী গওসুল আজম সম্বন্ধে একটি অভিনব এবং বিচিত্র ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল কাদের রমজান শরিফের প্রথম তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহতালার অপার মহিমা, আবদুল কাদের জন্মদিন হইতেই দিনের বেলায় আমার স্তন্য পান না করিয়া পবিত্র রমজান মাসের তাজিম করিয়াছেন। এমনকি সে সারা দিনে একবারও সেদিকে ফিরিয়া তাকায় নাই। ইফতারের সময় হইতে সারারাত্রি দুধ পান করিতেন। আবার পরবর্তী ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বেই দুগ্ধ পান বন্ধ করিয়া দিত। অল্প সময়ের মধ্যেই সারা শহরে একথা ছড়াইয়া পড়িল যে, শহরের বিখ্যাত সাইয়্যেদ বংশে হজরত সাইয়্যেদ আবু ছালেহ মুসা- জঙ্গী-দোস্তের স্তন্যপায়ী শিশুপুত্র রমজান শরিফের সম্মানার্থে দিনের বেলায় মাতৃদুগ্ধ পান করেন না।

পরবর্তী সনের অর্থাৎ ৪৭১ হিজরি সনের শাবান মাসের ২৯ তারিখ দ্বিপ্রহরের পর হইতেই আসমান ঘন কাল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছিল। ২৯ শাবান রমজান শরিফের চাদ দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু সন্ধ্যাকালেও আসমান মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে কেহই চাঁদ দেখিতে পাইল না বা কোন দিক হইতে চাঁদ দেখার সংবাদও পাওয়া গেল না। বাধ্য হইয়া সকলে সাবধানতামূলক এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিল যে, রাত্রে সেহরি খাইয়া রোজা রাখার জন্য প্রস্তুত রহিল। পরদিন সকালবেলা কোনদিক হইতে চাঁদ দেখার সংবাদ পাওয়া যায় কি না অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে একজন অলি-আল্লাহ দরবেশের দেখা পাওয়া গেল। লোকে তাঁহাকে রোজা রাখিবে কি না জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, সাইয়্যেদ আবু ছালেহ মুসা জঙ্গী-দোস্তের গৃহে গমন করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাঁহার কোলের স্তন্যপায়ী শিশু অদ্য ছোবহে ছাদেক হইতে তাঁহার স্তনের দুগ্ধ পান করিয়াছে কি না।" সঙ্গে সঙ্গেই একদল লোক সাইয়্যেদ আবু সালেহ মুসার গৃহে গমনপূর্বক তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ ছোব্‌হে ছাদেক হইতে এ পর্যন্ত আপনার শিশু-সন্তানটি স্তন্য পান করিয়াছে কি না ? আর আপনি এ পর্যন্ত রমজান শরিফের নবচন্দ্র দেখার কোন সংবাদ কোন দিক হইতে পাইয়াছেন কি না ?" হজরত উম্মুল খায়ের ফাতেমা বলেন, আমি বলিলাম 'নবচন্দ্র দেখার সংবাদ তো আমি এখন পর্যন্ত কোন দিক হইতে পাই নাই। তবে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছি যে, আমার আবদুল কাদের আজ ছোবহে ছাদেক হইতে স্তন্যপানের প্রতি একটুও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, সম্পূর্ণরূপে বিরত রহিয়াছে। তাহাতে আমি বুঝতে পারি যে, অদ্য রমজান শরিফের মাসের প্রথম তারিখ। কেননা বিগত বৎসর রমজান শরিফের প্রথম তারিখে তাহার জন্ম হয়। জন্মদিন হইতেই পূর্ণ রমজান মাসে দিনের বেলায় সে আমার স্তন্য পান করে নাই। আজও যখন সে ছোবহে ছাদেক হইতে এখন পর্যন্ত দুগ্ধপানের প্রতি কোনই আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, কাজেই আমি মনে করিতেছি আজ রমজান শরিফের প্রথম তারিখ।"

ইহা অবগত হইয়া দেশের আপামর মুসলিম জনসাধারণ সকলেই সেদিন হইতে রোজা রাখা আরম্ভ করিল। দুই তিন দিন পরে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, শাবানের চাঁদ ২৯ দিনেই শেষ হইয়াছে এবং ২৯ শাবান রমজান শরিফের চাঁদ দেখা গিয়াছে। আর যে দিন হইতে আবু সালেহের শিশুপুত্র মাতৃস্তনের দুগ্ধপান বন্ধ করিয়াছিল, সে দিন হইতে রমজানের মাস আরম্ভ হইয়াছিল।

ইহার পর হইতে জিলান শহরে, এমনকি বাগদাদ শহরেও একথা ছড়াইয়া পড়িল যে, জিলানের সাইয়্যেদ বংশে এমন একজন 'মাদারাত অলি' জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, তিনি মাতৃস্তনের দুগ্ধপান করার বয়সেও রমজান শরিফের রোজা রাখিয়া থাকেন।

নামকরণ :

কিতাবে দেখা যায়, হজরত গওসুল আজমের জন্মের কিছুক্ষণ পরেই হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রধান ছাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে লইয়া সাইয়্যেদ আবু ছালেহ মুসার গৃহে তশরিফ আনিলেন এবং সাইয়্যেদ আবু ছালেহকে লক্ষ্য করিয়া অদৃশ্য জগৎ হইতে বলিলেন, "আবু সালেহ! তুমিই জগতে

ভাগ্যবান, তুমিই ধন্য। কেননা তোমার ঘরে আল্লাহর অলি আজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি উক্ত শিশুর নাম রাখ 'মাহবুবে সোব্হানি', সে দুনিয়ার লোকের নিকট পরিচিত হইবে আবদুল কাদের নামে, অর্থাৎ 'মহাশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার বান্দা' নামে। আমি আন্তরিক দোয়া করিতেছি, তোমার এই পুত্র-সন্তান যেন জগতে অমর কীর্তি স্থাপনপূর্বক চিরস্মরণীয় হয়।" আবু সালেহ (র.) এই বিস্ময়কর অদৃশ্যবাণী শ্রবণ করিয়া অতিমাত্রায় আনন্দিত হইলেন এবং তখনই দুই রাকয়াত শোকরানার নামাজ আদায় করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার দরবারে অনেকক্ষণ যাবত মুনাজাত করিলেন।

'ফাজায়েলে গওসিয়্যাহ নামক কিতাবে হজরত আলী (আ.) হইতে একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হজরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জীবনকালে হজরত গওসুল আজম সম্বন্ধে এরূপ দো'আ করিয়াছিলেন ঃ "ইয়া রাব্বুল আলামিন ! আপনি আমার সেই নায়েবের প্রতি রহমত নাজিল করুন, যে আমার পরে দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত হইবে। যেই মহামানব আমার হাদিসসমূহ বর্ণনা করিয়া (আমার উম্মতগণকে) আমার দ্বীন শরিয়তের পথে পরিচালিত করিবে।

ঈদের চাঁদ :

হজরত গওসুল আজমের মাতৃস্তন পান না করা হইতে যেই বারে লোকে রমজানের চন্দ্র উদয় হওয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই বারই ঈদের চন্দ্র উদয়ের সম্ভাবনার দিন আসমান অন্ধকার মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ ২৯ রমজান চাঁদ দেখা গেল না। পরের দিন ঈদ হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা দিল। ইহা লইয়া ভীষণ বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। পরদিন সকালেই একদল লোক হজরত আবু সালেহ মুসার (র.) বাড়িতে আসিয়া ঈদের চন্দ্রোদয় সম্বন্ধে তাহাদের মতভেদের কথা উল্লেখ করিলে হজরত গওসুল আজমের মাতা সাইয়্যেদ উম্মুল খায়ের ফাতেমা বলিলেনঃ "আমার শিশুপুত্র আবদুল কাদের অদ্য ছোব্হে ছাদেক হইতে এখন পর্যন্ত আমার স্তনদুগ্ধ পান করে নাই। ইহাতে মনে হইতেছে, গতকল্য সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদ উদিত হয় নাই। কেননা এই শিশু রমজান শরিফের মর্যাদা রক্ষার্থে এখন পর্যন্ত দুধ পান করে নাই।" ইহার পর আগন্তুক জনমন্ডলী আর কোন প্রকার বাদানুবাদ না করিয়া অদ্য রমজান শরিফের শেষ দিন সিদ্ধান্ত করত প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং দ্বিধাহীন মনে সে দিনের রোজা রাখিলেন।

শৈশবকাল হইতেই হজরত গওসুল আজম নিজের বেলায়েত অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রায় সময়ে বলিতেন, "শৈশবকালে যখনই আমি আল্লাহ পাকের সুরণ হইতে অমনোযোগী হইয়া শুইয়া পড়িতাম, তখনই অদৃশ্য জগত হইতে আমার কানে এই আওয়াজ আসিত, "হে আবদুল কাদের ! তুমি অলস নিদ্রায় অভিভূত থাকার জন্য দুনিয়ায় আসে নাই; বরং আমি তোমাকে নৈকট্য এবং তত্ত্বপরিচয় জ্ঞান দান করতঃ অলস নিদ্রায় বিভোর গাফেল লোকদিগকে সচেতন করিয়া দেওয়ার জন্যই জগতে প্রেরণ করিয়াছি।"

এই প্রসঙ্গে হজরত গওসুল আজমের স্বরচিত একটি কবিতা 'তওগিবুল মানাজের' কিতাবে উল্লেখ আছে :

"আমার শৈশবকালের জেকের-আজুকারে সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আর শৈশবের দোলনায় অবস্থানকালে আমার রোজা রাখার ব্যাপার তো প্রসিদ্ধই রহিয়াছে।"

তিনি বলিতেন, আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন আমি দেখিতাম, যখনই আমি আমার সমবয়স্ক ছেলেপিলেদের সহিত খেলাধূলায় যোগদানের ইচ্ছা করিতাম, তখনই অদৃশ্য জগৎ হইতে আমার কানে আওয়াজ আসিত "হে পবিত্র শিশু ! আমার দিকে চলিয়া আস।" এই আওয়াজ শ্রবণ করা মাত্র আমার অত্যন্ত ভয় হইত। তখনই আমি সমবয়সী ছেলেপিলেদের সহিত খেলাধূলার খেয়াল পরিত্যাগ করিয়া মাতা সাহেবানীর নিকট দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার স্নেহের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। এখনও নির্জনে থাকাকালে অনুরূপ আওয়াজ আমার কানে আসিয়া থাকে এবং আমার অধিকতর আকর্ষণ করিয়া থাকে। একদিন আমি এইরূপ আওয়াজ শুনিয়া মায়ের স্নেহক্রোড়ে দৌড়িয়া গিয়া আশ্রয় লইলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উক্ত আওয়াজ শুনিবার সময় তুমি কি কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাও?"

আমি বলিলাম, না"।

আল্লাহগত-প্রাণা স্নেহময়ী মাতা তাঁহাকে বলিলেন, “বৎস ! যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে তাঁহার দিকে ডাকিতেছেন। তুমি আর কখনও সমবয়স্ক কোন বালকের সহিত খেলা করিবার ইচ্ছা মনে স্থান দিও না। সদাসর্বদা আমার কাছে থাকিয়া তোমার স্রষ্টাকে ধ্যান ও স্মরণ করিতে থাক।”

বুজুর্গ মাতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া তাহাকে গর্ভে ধারণ করার কালে যে সমস্ত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা হইতে পরিষ্কারভাবে তাহার উপলব্ধি হইয়াছিল যে, তাঁহার এই সন্তানটি আল্লাহ পাকের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও অসাধারণ বুজুর্গ লোক হইবে। অতএব তিনি অতিশয় সতর্কতা ও যত্নের সহিত পুত্রের লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

বর্ণিত আছে, তাঁহার অতি শৈশবকালে একদিন হঠাৎ তিনি ধাত্রীর কোল হইতে উড়িয়া প্রখর সূর্যকিরণের সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন। সূর্যের প্রখর তাপে তাঁহার দেহ মোবারক বিগলিত রৌপ্যের ন্যায় টগবগ করিতে লাগিল। ধাত্রী অতিশয় অস্থিরতা ও বিস্ময়ের সহিত এই বিচিত্র ঘটনা ও বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিতেছিল। সে আসমানের দিকে তাকাইয়া থাকিতেই হজরত গওসুল আজম সুকুশল ও মঙ্গলের সহিত প্রিয়তমরূপে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার ধাত্রীর কোলে পৌঁছিলেন। ধাত্রীর অস্থিরতা শান্ত হইলে সে হজরত গওসুল আজমকে পরম স্নেহের সহিত বুকে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু সে অতঃপর এই গুপ্ত-রহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। বরং গুপ্তধনের মতো উহাকে নিজের হৃদয়ভান্ডারে অতি সঙ্গোপনে সঞ্চিত রাখিয়া দিল।

যখন গওসুল আজম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং বাগদাদ শহরে এরশাদ ও হেদায়তের আসন অলংকৃত করিয়া জনগণের লক্ষ্যস্থলরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, এমন সময় একদিন সেই ধাত্রী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য বাগদাদ শহরে গমন করিলেন এবং নির্জন অবস্থায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : “হে বেলায়েতের বাগিচার মনোরম ফুল! হে সাইয়্যেদ কুলের দুর্লভ রত্ন ! শৈশবে একবার যেমন আপনি আমার কোল হইতে উড়িয়া গিয়া সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া আপনার উজ্জ্বলকারী জ্যোতি দ্বারা প্রদীপ্ত সূর্যকে সম্মানদান করিয়াছিলেন, তদ্রুপ অবস্থা কি আজকালও কোন সময় হইয়া থাকে ? হজরত গওসুল আজম বলিলেন: “হে গুপ্ত রহস্যের রক্ষাকারিণী ধাত্রী ! শৈশবের দুর্বলতা বশত যেহেতু আল্লাহ তাআলার নুরের তাজাল্লি বরদাশত করার ক্ষমতা আমার মধ্যে ছিল না। কাজেই বিগলিত রৌপের মত অস্থির হইয়া সূর্যের সহিত মিলিত হইতাম। এখন আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আমার দুর্বলতার অবস্থা নাই। কেননা আমার পরওয়ারদেগার এমন উচ্চস্তরের ভান্ড এবং এমন দৃঢ় ক্ষমতা আমাকে দান করিয়াছেন যে, তদ্রুপ হাজার হাজার তাজাল্লি আমার সেই ভান্ডে সংকুলান হইতে পারে। সেই তাজাল্লির আকর্ষণ এখন আর আমাকে নিজের স্থান হইতে টলাইতে পারে না। এখন তো আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানি এবং রহমত শত শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাতেই তো আমার এই শক্তি ও ক্ষমতা।”

বস্তুত আল্লাহর আশেকগণের এশকের বলে বলীয়ান অন্তর এবং পর্দাই তো আল্লাহতালার তাজাল্লী বরদাশত করিতে পারে। অন্যান্য লোকের কি সাধ্য যে, আল্লাহ তা'আলার সামান্য পরিমাণ তাজাল্লিও বরদাশত করে।

হায়, মাশুকের তাজাল্লির কেমন বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ হইয়াছিল ! অবলোকন করিয়াছিলেন মুসা কলিমুল্লাহ (আ.) আর তুর পর্বত তাহাতেই জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইল।

স্বপ্ন :

আনুমানিক আট বৎসর বয়সে এক রাত্রে হজরত গওসুল আজম (র.) নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন যে, আল্লাহতা'লার প্রেরিত একজন অপরূপ ফেরেশতা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “হে আবদুল কাদের, ঘুমাইয়া কেন ? উঠিয়া পড়। আল্লাহতা'লাকে ভুলিয়া তুমি অমনোযোগী ও গাফেল অবস্থায় অলস নিদ্রার কোলে গা ঢালিয়া দিয়াছ কেন? উঠিয়া আল্লাহতা'লার স্মরণে ও জেকের আজকারে মশগুল হও।” এরূপ স্বপ্ন দেখামাত্র তিনি হতচকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং আল্লাহ পাকের জেকেরে মশগুল হইয়া গেলেন। এ সমস্ত ব্যাপার ও ঘটনাবলী হইতে হজরত গওসুল আজম অবশ্যই নিজের ‘বেলায়েত’ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং

পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কোন এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তেই আল্লাহতা'লা তাঁহাকে পয়দা করিয়াছেন।

হজরত গওসুল আজমের প্রাথমিক শিক্ষা :

তাঁহার বুজুর্গ পিতার জীবন কালেই অতি অল্প বয়সে তাঁহাকে জিলান নগরীর কোন একটি মক্তবে বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। মক্তবে ভর্তি হওয়ার পূর্বেও তিনি স্নেহময়ী মাতার মুখে কোরআন শরিফ তেলাওয়াত শুনিয়া উহার এক বিরাট অংশ হেফজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

মাওলানা মোহাম্মদ ছাদেক আগ্রাবি স্ব-প্রণীত একখানি কিতাবে লিখিয়াছেন। হজরত বড়পির সাহেবকে বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মক্তবে পাঠান হইলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতা আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া লইলেন এবং বেষ্টনীর মধ্যে করিয়াই তাঁহারা তাঁহাকে মক্তবে লইয়া গেলেন। দেখা গেল, মক্তবে ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য বশত অত্যন্ত ভিড়। আর কোন লোক বসিবার স্থান নাই, তখন তাঁহার সঙ্গী ফেরেশতাগণ গায়েব হইতে আওয়াজ দিলেন : "তোমরা আল্লাহ তাআলার অলির জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও।" এরূপ বাণী শ্রবণ করিয়া মক্তবের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ চমকিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষক ছাত্রগণকে আগন্তুকের জন্য স্থান করিয়া দিতে নির্দেশ প্রদান করিলেন। ছাত্রগণ তৎক্ষণাৎ পার্শ্বের দিকে চাপিয়া বসিয়া হজরত গওসুল আজমের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিলেন।

ভর্তি করার পর ওস্তাদজী হজরত বড়পির ছাহেবকে একেবারে প্রাথমিক স্তরের ছাত্র মনে করিয়া তাঁহাকে আউজুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ শরিফ শিখাইয়া দিয়া পড়িতে বলিলেন। ওস্তাদজির নির্দেশ অনুযায়ী তিনি প্রথমে আউজুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করিলেন। অতঃপর "আলিফ-লাম-মিম" হইতে আরম্ভ করিয়া কোরআন শরিফের পনের পারার শেষ পর্যন্ত মুখস্ত পড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার তেলাওয়াত তাজবিদের কাওয়ায়েদ অনুসারে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং নির্ভুল হইয়াছিল। ইহাতে ওস্তাদজি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "তুমি কোরআন শরিফের এই পনের পারা কেমন করিয়া এবং কাহার নিকট পড়িয়া মুখস্ত করিয়াছ ?" হজরত বড়পির সাহেব উত্তর করিলেন। আমার জননী পনের পারা কোরআন শরিফের হাফেজ, তিনি তাহা প্রত্যহ তেলাওয়াত করিয়া থাকেন। তাঁহার তেলাওয়াত শুনিয়া শুনিয়া আমার মুখস্ত হইয়া গিয়াছে।"

কারামতের ভক্ত কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হজরত বড়পির সাহেব মাতৃগর্ভে থাকিয়া জননীর প্রাত্যহিক কোরআন শরিফ তেলাওয়াত শুনিতেন। ফলে মাতা যেই পনের মতান্তরে ১৭ পারার হাফেয ছিলেন, গর্ভস্থ হজরত বড়পির ছাহেব সেই পনের পারার হাফেজ হইয়া দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার বা প্রশ্ন উত্থাপন করার কোন কারণ নাই। কেননা যেই বড়পির সাহেব মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া বাঘের রূপ ধারণপূর্বক লম্পট ফকিরকে ধ্বংস করিয়া পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে গর্ভে থাকিয়া গর্ভধারিণী মাতার তেলাওয়াত শ্রবণ করত কোরআন শরিফ মুখস্ত করিয়া ফেলা বিচিত্র কিসের ? ইহা তো গর্ভ হইতে বাহির হইয়া ব্যাঘ্ররূপ ধারণপূর্বক ফকিরকে হত্যা করিয়া পুনরায় গর্ভে প্রবেশ করার চেয়ে অনেক সহজ কাজ। আমরা এবিষয়ে স্বয়ং হজরত বড়পির সাহেবের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন: "শৈশবকালে আমার কোন কথায় বা আচরণে স্নেহময়ী জননী একটু ক্ষুব্ধ হইয়া আমাকে বলিলেন: "আবদুল কাদের ! তোমার প্রতিপালনে আমি এত কষ্ট সহ্য করিলাম, এত আদর যত্ন করিয়া তোমাকে লালন-পালন করিলাম, তুমি কি উহার সব কিছুই ভুলিয়া গেলে ?" উত্তরে আমি বলিলাম, "মাতাঃ ! আমি আপনার গর্ভে থাকাকালে গর্ভ হইতে বাহির হইয়া ব্যাঘ্ররূপ ধারণপূর্বক লম্পট ফকিরকে ধ্বংস করিয়া আপনাকে রক্ষা করিলাম, তাহাতে কি আপনার উপকার করি নাই ?" মাতা ইহার কিছুই জানিতেন না। শুধু তিনি এতটুকু দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, একটি ব্যাঘ্র আসিয়া লম্পট ফকিরকে হত্যা করিয়া নিমেষে কোথায় চলিয়া গেল। এখন পুত্রের মুখে আসল ব্যাপার অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন এবং উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার এই সন্তান কালে একজন শ্রেষ্ঠ অলি-আল্লাহ হইবেন। অতঃপর তিনি পুত্রের প্রতিপালনে ও শিক্ষা

প্রদানে বিশেষ যত্নবান হইলেন। আর ভুলেও কোন দিন তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। হজরত বড়পির সাহেব নিজেই যখন উল্লেখিত উক্তি করিয়াছেন, অতএব, ইহা অলীক বা আজগুবি হইতে পারে না।

ইতিপূর্বে আমরা তাঁহার আরও একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন: "শৈশবকালে আমি প্রায় সময়েই এইরূপ শুনিতে পাইতাম, কেহ আমাকে বলিতেছেন: "হে মোবারক শিশু, আমার দিকে আস।" অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, আমি কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইতাম না। সাধারণত: এরূপ ঘটনা কোথাও ঘটিতে দেখা যায় না। ইহা সাধারণ মানুষের কল্পনা বহির্ভূত। কিন্তু স্বয়ং হজরত বড়পির ছাহেব যখন ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, তখন অবিশ্বাস করার উপায় নাই।

সাধারণ মানুষ যখন একটু বাহ্যিক শিক্ষা লাভ করিয়া কত কঠিন কঠিন কাজ সমাধা করার জ্ঞান লাভ করে, যাহা অশিক্ষিত লোকের নিকট সম্পূর্ণরূপে দুর্বোধ্য। অতএব, আল্লাহ-গত প্রাণ মহাপুরুষগণ খোদা প্রদত্ত আধ্যাত্মিক শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া সেই শিক্ষার অসীম ও অনুপম ক্ষমতা বলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের অলৌকিক ও অস্বাভাবিক কার্য সাধন করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহের ও আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে ?

আবার এই শক্তি আল্লাহ তাআলা কোন কোন মহাপুরুষকে দীর্ঘ সাধনা ও রিয়াজতের পর দান করিয়া থাকেন এবং কোন কোন মহামানবকে মাতৃগর্ভে থাকা কালেও দান করিয়া থাকেন। ইহা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। এক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, হজরত বড়পির সাহেবকে এই আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক ক্ষমতা মাতৃগর্ভে থাকাকালেই দান করা হইয়াছে। কেননা তিনি হইলেন আউলিয়াকুল শিরোমণি শ্রেষ্ঠতম অলি-আল্লাহ। সুতরাং দুনিয়ার বুকে পদার্পণ করার পূর্ব হইতেই তিনি অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন, ইহাতে বিস্ময় বোধ করার কিছুই নাই।

আম্বিয়ায়ে কেরামের মু'জেজা এবং আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত অবিশ্বাস করার উপায় নাই। ইহার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অঙ্গ। আউলিয়া কেরামের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, শুধু হজরত বড়পির সাহেবই নহেন, বরং খাজা মুঈনুদ্দীন চিস্তি (র.), হজরত জুনুনুল মিছরি (র.), হজরত জুনাইদ বাগদাদি (র.), হজরত দাতা গাঞ্জে বখশ (র.), হজরত ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশাকার (র.) প্রমুখ বহু শ্রেষ্ঠ আউলিয়ায়ে কেরাম কারামত অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অতএব, আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত অবিশ্বাস করা নিজেদেরই অজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র।

হজরত গওসুল আজমের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী :

একদিন হুজুর (দ.) কথা প্রসঙ্গে স্বীয় কনিষ্ঠ দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ভাই হোসাইন! বলত, কেহ যদি কোন সময় তোমার সহিত কোন প্রকার অসাদাচরণ করে, কিংবা কোন রকম শত্রুতাভাব প্রদর্শন করে, তবে তুমি তদবিনিময়ে তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ?"

হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) বলিলেন, "একবারের জন্য আমি তাহাকে ক্ষমা করিব, দুইবারেও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিব না; কিন্তু ইহার পরেও যদি তাহাকে আমার সহিত শত্রুতা ও অসদ্ব্যবহার করিতে দেখিতে পাই, তবে এবারে তাহার ক্ষমা নাই। সে জ্বিন হউক বা ইনসান হউক, যত বড় প্রবল পরাক্রান্ত এবং শক্তিধরই হউক, জমিনে থাকুক কিংবা আসমানে থাকুক। হোসাইন কখনও তাহাকে ক্ষমা করিবে না । হোসাইন সমুচিত প্রতিশোধ তাহা হইতে গ্রহণ করিবেই।"

অতঃপর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র ইমাম হাসান (আ.) কে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই হাসান ! কেহ তোমার সহিত শত্রুতা কিংবা অসদ্ব্যবহার করিলে তুমি ইহার বিনিময়ে তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ?"

হজরত ইমাম হাসান (আ.) উত্তর করিলেন, নানাজি ! কেহ আমার সহিত যদি চরম শত্রুতাও করে কিংবা কোন জঘন্য অন্যায় আচরণও করে, তবুও আমি তাহার অন্যায় আচরণের বা শত্রুতার কোনই প্রতিশোধ গ্রহণ করিব না। অম্লান বদনে তাহার সমস্ত অন্যায় ব্যবহার ক্ষমা করিয়া দিব এবং তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিব। সদ্ব্যবহার দ্বারাই আমি তাহার দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইব।

স্নেহের দৌহিত্র যুগলের মুখে এরূপ জবাব শ্রবণ করিয়া হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে আনন্দিত হইলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার চক্ষুদ্বয় অপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি স্নেহ ও আদরের সহিত দৌহিত্রদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে তাঁহার পবিত্র হাত বুলাইয়া দিলেন এবং কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসাইন (আ.) কে বলিলেন, "স্নেহের ভাই হোসাইন ! তোমার এই ন্যায়নিষ্ঠতার দরুন আল্লাহতা'লা তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট। সেই সন্তুষ্টির নিদর্শনস্বরূপ আল্লাহ পাক তোমার ভাবী বংশে নয়জন ইমাম পয়দা করিবেন। সেই নয়জন ইমামকে বক্ষে ধারণ করিয়া সমগ্র মুসলিম দুনিয়া নিজেকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করিবে। "সেই গৌরবোজ্জ্বল নয়জন ইমাম হইলেন :

১। ইমাম জাইনুল আবেদীন (আ.),

২। ইমাম মোহাম্মদ বাকের (আ.),

৩। ইমাম জাফর ছাদেক (আ.),

৪। ইমাম মুসা কাজেম (আ.),

৫। ইমাম মুসা আলী রেজা (আ.),

৬। ইমাম মোহাম্মদ তকি (আ.),

৭। ইমাম আলী আস্কর (আ.),

৮। ইমাম হাসান খালেস (আ.) এবং ইমাম মাহদি (আ.)।

অতঃপর ইমাম হাসান (আ.) কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার পরম স্নেহের ভাই হাসান, তোমার ধৈর্য ও ক্ষমারূপ মহৎ গুণের বিনিময়ে আল্লাহতা'লা তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট। সেই সন্তুষ্টির নিদর্শনস্বরূপ তিনি তোমার বংশে একজন আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ অলি আল্লাহ দান করিবেন। তিনি দুনিয়ার সমস্ত অলিআল্লাহগণের সেরা অলি আল্লাহ বলিয়া গণ্য হইবেন এবং দুনিয়ায় অসংখ্য পাপী ও পথভ্রষ্ট লোক তাহার হেদায়েতের ফলে সৎপথ প্রাপ্ত হইবে। দুনিয়ার বিভিন্ন দিক হইতে অলিআল্লাহগণ তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিবে। অসংখ্য লোক অলিআল্লাহর স্তরে পৌঁছিবে এবং দুনিয়াবাসীকে হেদায়েত করিবে। বহু সুফিয়ায়ে কেরাম তাহার নিকট হইতে দুর্লভ খোদা-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত দুনিয়াবাসীর নিকট মহামানবরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন।"

অতঃপর উভয় দৌহিত্র ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া হুজুরে আকাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "ভাবী বংশধরদের দ্বারা তোমাদের উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। পার্থক্য কেবল এইটুকু হইবে যে, নয়জন ইমামের দ্বারা হোসাইন (আ.) যতটুকু গৌরবান্বিত হইবেন, মাত্র একজন জগদ্বরেণ্য অলি আল্লাহর দ্বারাই হাসান (আ.) ততটুকু গৌরব লাভ করিবেন।

ইমাম হাসান (আ.)-এর বংশধর সেই জগদ্বরেণ্য ও আউলিয়া-কুল শ্রেষ্ঠ অলি গওসুল আজম বড়পির সৈয়দ শাহ আবু মোহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানি (র.)। উচ্চ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ আম্বিয়ায়ে কেরাম সম্বন্ধে যেমন একথা প্রমাণিত আছে যে, আল্লাহতা'লার তরফ হইতে তাঁহাদিগকে এলমের এক বিশেষ অংশ প্রদান করা হইয়া থাকে। তাঁহারা ওহি কিংবা এলহামের সাহায্যে ভবিষ্যৎকালে আত্মপ্রকাশকারী ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে নির্দিষ্টরূপে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন। তদ্রূপ যে সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামকে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্থাৎ রূহানি ক্ষমতার এক বিরাট অংশ প্রদান করা হইয়াছে, তাহার স্বীয় আভ্যন্তরীণ আলো দ্বারা আল্লাহতা'লার আদেশে ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী কথা ও বিষয়সমূহ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন। অতএব, আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র মুখ হইতে কোন কোন সময়ে দুনিয়ার বুকে আত্মপ্রকাশকারী হয়।

হজরত গওসে আজমের জন্ম সম্বন্ধেও কোন কোন বুজুর্গ অলিআল্লাহ যাহাদের রূহানি ক্ষমতা সর্বজনস্বীকৃত বিভিন্ন প্রকারে হজরত বড়পির সৈয়দ আবু মোহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানি (র.)-এর জন্ম সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। বাহজাতুল আসরার, আজকারুল আবরার, আসরারুল মাআনি প্রভৃতি কিতাবে ঐ সমস্ত খোশর উল্লেখ রহিয়াছে। যথা–

১। খলিল বলখি (র.) স্বীয় যুগের একজন শ্রেষ্ঠতম অলি। তিনি স্বীয় কাশফ হইতে হজরত বড়পির রাহেমাহুল্লাহর আবির্ভাবের বহুপূর্বে তাঁহার জন্ম লাভের শুভ সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন যে, "পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে ইরাক অঞ্চলে মুহীয়ুদ্দীন উপাধিধারী জনৈক বুজুর্গ লোকের আবির্ভাব হইবে। তিনি তাঁহার যুগের কুতুব, গওস এবং অতি উচ্চ মর্যাদাশালী অলি-আল্লাহ হইবেন। বহুলোক তাঁহার আনুগত্য ও অনুসরণ করিবে। তাঁহার জীবনকালে যেমন গোটা দুনিয়া তাহা হইতে ফায়জ লাভ করিবে, তদ্রুপ তাঁহার ইন্তেকালের পরেও দুনিয়া তাঁহার ফয়জের ফোয়ারা হইতে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে থাকিবে।

২। শাইখুল মাশায়েখ আবু আবদুল্লাহ (র.) ও হজরত বড় পির রাহেমাহুল্লাহর জন্মের প্রতি ইংগিত করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ইরাকের ভূমিতে একজন খুব বড় বুজুর্গ লোকের আবির্ভাব হইবে। তাহার নাম হইবে আবদুল কাদের। তিনি হইবেন সমস্ত আউলিয়াকুলের শিরোমণি ।

৩। শায়খ আবু মোহাম্মদ বাত্তাহি (র.) বলিয়াছেন যে, শায়খ আবু বকর হাররার (র.) গওসে পাকের জন্ম সম্বন্ধে প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্বে কোন এক মজলিসে বলিয়াছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে ইরাক অঞ্চলে একজন অতি উচ্চস্তরের অলিআল্লাহ জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে এই বাক্যটি উচ্চারিত হইবে। আমার এই পা সমস্ত অলি আল্লাহদের ঘাড়ের ওপর।" ইহার অর্থ এই যে, আমি সমস্ত আউলিয়াকুলের শিরোমণি। ইহাও কথিত আছে, হজরত আবু বকর হাররার (র.) এই সুসংবাদ প্রদানের সময় হজরত বড় পির গওসে পাকের নামও বলিয়াছিলেন।

৪। শায়খ আবুবকর ইবনে হাওয়ার বাত্তাহি (র.) অতি উচ্চ মর্যাদাশালী বুজুর্গলোক এবং অলিআল্লাহ ছিলেন। তিনি বিখ্যাত হাওয়ার সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি বাত্তাহ অঞ্চলে বাস করিতেন, এই অঞ্চলটি বসরা এবং ওয়াসেতের মধ্যবর্তী একটি এলাকা ছিল। তিনি এবার বলিয়াছিলেন, ইরাকে আউলিয়ায়ে কেরাম আটজন ঃ- ১। মা'রূফ কারখী (র.), ২। আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), ৩। বিশ্বরে হাফি (র.), ৪। মানসুর ইবনে আম্মার (র.), ৫। জুনাইদ বাগদাদি (র.), ৬। সেররি সাকতি (র.), ৭। সাহাল ইবনে আবদুল্লাহ তাতারি (র.) এবং ৮। গাওসুল আজম হজরত আবদুল কাদের জিলানি (র.)।

৫। শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (র.) সম্বন্ধে লোকে শায়খ আবু বকরকে (র.) জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? শায়খ উত্তর করিলেন, এই বুজুর্গ অলিআল্লাহ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে আত্মপ্রকাশ করিবেন। ইনি বাগদাদে অবস্থান করিবেন এবং যুগের সমস্ত কুতুবগণের সরদার হইবেন।

৬। ইরাকের আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে শায়খ মানসুর লাতায়েহি (র.) অতিশয় উচ্চ মর্যাদার অলিআল্লাহ ছিলেন এবং মহাসম্মান ও ইজ্জতের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বহু কারামত এবং অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। বাহজাতুল আসরার কিতাবে লিখিত আছে, তিনি একদিন তাঁহার মজলিসে বর্ণনা করিলেন, অদূর ভবিষ্যতে আবদুল কাদের নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে। তিনি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী আরেফ অলিআল্লাহগণের মধ্যে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইবেন। তিনি তাঁহার যুগে আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হইবেন। শায়খ মানসুর (র.) এই শুভ সংবাদ প্রদানকালে নিজের মুরিদানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি তখন জীবিত থাক, তবে সেই বুজুর্গের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিও।

৭। হজরত শায়খ আবু আহমদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসা (র.) একজন উচ্চ শ্রেণির অলিআল্লাহ ছিলেন। তিনি হজরত গওসে পাকের জন্মের তিন চারি বৎসর পূর্বেই তাঁহার আবির্ভাবের শুভ সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, অচিরেই মুলুকে আজমের ভূমিতে এক মহামানব জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি নিজের যুগের সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইবেন। তিনি নিজের কারামত ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিক্যের কারণে সমগ্র দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন এবং তিনি বলিবেন, আমার কদম প্রত্যেক অলির কাঁধের ওপর।"

৮। শাম দেশের সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে শায়খ বানজি রাহেমাহুল্লাহর নাম খুবই প্রসিদ্ধ। 'বন্‌জ' একটি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন কসবা, এখন সম্ভবত সেই শহরটির অস্তিত্ব নাই। শায়খ বন্‌জি (র.) নূন্যাধিক পঞ্চাশ বৎসর কাল এই শহরে অবস্থান করিয়া এখানেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। 'বন্‌জ' শহরের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তাহাকে 'বন্‌জি' বলা যাইত। তাঁহার অন্য উপাধি 'তাইয়্যার'ও ছিল, ইহার অর্থ উড্ডীয়মান। এই উপাধির কারণ সম্বন্ধে কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কোন সময় তিনি প্রচ্যের কোন দেশে যাওয়ার ইচ্ছা করিলে একটি মিনারের ওপর আরোহণপূর্বক লোকদিগকে ডাকিয়া জড় করিতেন। অতঃপর তিনি বায়ুমন্ডলে উড়িয়া গন্তব্যস্থলের দিক যাত্রা করিতেন। এই কারামত দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'তাইয়্যার' অর্থাৎ উড্ডীয়মান উপাধিতে ভূষিত করিল। এতদ্ব্যতীত 'গাউয়াছ'ও তাঁহার অন্য একটি উপাধি ছিল; যেহেতু তিনি এবার নদী পার হওয়ার প্রয়োজন হইলে নদীর ওপর মুসাল্লা বিছাইয়া নদীর স্রোত বন্ধ করিয়া দিলেন এবং অনায়াসে নদী পার হইয়া গেলেন। এই কারামত দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'গাউয়াছ'ও বলিতে লাগিল।

৯। তাঁহাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এই যুগের 'কুব' কে ? তিনি বলিলেন, সত্বরই ইরাকে একজন যুবকের আবির্ভাব হইবে। তিনি বাগদাদের লোকদিগকে হেদায়েত ও উপদেশ প্রদান করিবেন এবং বলিবেন, আমার কদম প্রত্যেক অলির ঘাড়ের ওপর। ফলে সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরাম তাঁহার সম্মুখে ঘাড় নত করিয়া দিবেন, আমি যদি তখন পর্যন্ত জীবিত থাকি, তবে আমিও তাঁহার সম্মুখে আমার ঘাড় নত করিয়া দেব। যে ব্যক্তি তাহার কারামতসমূহ বিশ্বাস করিবে এবং তাঁহাকে যথার্থ অলি বলিয়া মান্য করিবে, সে খুবই লাভবান হইবে।

১০। শায়খুল মাশায়েখ হজরত জুনাইদ বাগদাদি (র.) একদিন কাশফ ও মুরাকাবার অবস্থায় বলিয়া উঠিলেন, "তাহার কদম আমার ঘাড়ের ওপর, তাঁহার কদম আমার ঘাড়ের ওপর।" একথা বলিয়া তিনি নিজের মস্তক অবনত করিয়া দিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থার মধ্যে নিমগ্ন রহিলেন। এই ধ্যানমগ্ন অবস্থা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে জনগণ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, "আপনি মুরাকাবার অবস্থায় যাহা কিছু বলিলেন, উহার অর্থ কি ?" তিনি উত্তর করিলেন, "পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে আবদুল কাদের নামক একজন যুবকের আবির্ভাব হইবে অর্থাৎ দুনিয়াতে তশরিফ আনয়ন করিবেন; তাঁহার উপাধি হইবে মুহিউদ্দীন। তাঁহার জন্মস্থান জিলান (গিলান)। তিনি বাগদাদে বসবাস করিবেন এবং আল্লাহতা'লার নির্দেশে ঘোষণা করিবেন, "আমার কদম সমস্ত অলিআল্লাহগণের ঘাড়ের ওপর।" কাফের অবস্থায় আমি ইহা জানিতে পারিয়া আমার খেয়াল হইল, তাহার কদম মোবারক আমার ঘাড়ের ওপরও কেন হইবে না ? এই খেয়াল মনে উদয় হওয়া মাত্র আপনা-আপনি আমার মুখ হইতে উক্ত শব্দগুলি বাহির হইল।

১১। মানাকেবে গওসিয়্যাহ ও তাওগিবুল মানাযের কিতাবে লিখিত আছে, যখন ইমাম হাসান আসকারি রাহেমাতুল্লাহর এন্তেকালের সময় উপস্থিত হইল, তখন তিনি নিজের মুসাল্লা খানি জনৈক নির্ভরযোগ্য বুজুর্গ লোকের হাওয়ালা করিয়া বলিলেন, হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে সাইয়্যেদ আবদুল কাদের নামে একজন বুজুর্গ লোকের আবির্ভাব হইবে, এই মুসাল্লাখানি প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার উদ্দেশ্যে আপনার নিকট দেওয়া হইল, হাত-বহাত হইয়া শেষ পর্যন্ত তাহার হাতে পৌছিতে হইবে।

কথিত আছে, উক্ত মুসাল্লাখানি হাত-হাত ও স্থানান্তরিত হইয়া ৪৯৭ হিজরির শওয়াল মাসের শেষ দিন কোন একজন বুজুর্গ লোক উহা গওসে আজমের খেদমতে পেশ করিয়াছিলেন।

গওসুল আজমের পূর্ণ নাম ও উপাধিসমূহ :

তাঁহার পবিত্র, সম্মানিত ও বিশ্ববিশ্রুত নাম আবদুল কাদের, কুনিয়ত আবু মোহাম্মদ, মুহিয়ুদ্দীন তাহার উপাধি। ইরাকের অন্তর্গত জিলান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে জিলানি বলা হইত। তিনি সারা বিশ্বের সর্বসাধারণের নিকট এই আবু মোহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানি নামে পরিচিত হইলেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহাকে বিভিন্ন গুণবাচক উপাধিতে ভূষিত করা হইয়া থাকে। আমাদের এতদঞ্চলে সাধারণতঃ তিনি কুতুবুল আকতাব, গওসুল আজম এবং বড় পির নামেই প্রসিদ্ধ। কোন কোন

স্থানে তাঁহাকে মাহবুবে সোবহানী (আল্লাহ পাকের প্রিয়) আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। কোন কোন দেশে জনসাধারণ তাঁহাকে কুতুবে রাব্বানী (রাব্বুল আলামিনের কুতব) নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা তাঁহাকে পিরানে পির দাস্তেগীর, আফ্যালুল আউলিয়া (সমস্ত পিরগণের শ্রেষ্ঠ পির, মুরিদানের হাত ধরিয়া পাপ-পঙ্কিলতা হইতে উদ্ধারকারী, আউলিয়াকুলের শিরোমণি) উপাধিতে ভূষিত করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে তিনি 'নুরে ইয়াদানি' (আল্লাহ তা'আলার নুর) নামে সুপরিচিত। তাঁহার দ্বারা মৃতপ্রায় দ্বীন-ইসলাম তথা শরিয়তে মোহাম্মদী (দ.) পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল বলিয়া তিনি সর্বত্র 'মুহিউদ্দীন' (দ্বীনের জীবন দানকারী) নামেও বিখ্যাত। সকল দেশের লোকে আবার তাঁহাকে 'গওসে ছামাদানী' (আল্লাহপাকের গওস) বলিয়াও আখ্যায়িত করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও বহু গুণবাচক উপাধি রহিয়াছে।

মুনির লাখুনবি কর্তৃক রচিত 'সাওয়ানেহে ওমী হজরত 'গওসুল আজম' নামক কিতাবে বহু কিতাবের হাওয়ালা দিয়া লিখিত হইয়াছে যে, একবার হজরত গওসুল আজম ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাগদাদ শহরের বাহিরে গমন করিলেন। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, কৃশতা ও দুর্বলতাবশত সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পথের পার্শ্বে পড়িয়া যাইতেছে। সে ব্যক্তি অকস্মাৎ হজরত গওসুল আজমের নুরানী চেহারা মোবারকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সবিনয়ে আর করিল, হে নিঃসহায়ের সহায়, নিরুপায়ের উপায়, ব্যথিতজনের পৃষ্ঠপোষক, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন এবং আপনার ঈসা-তুল্য ফুঁ দ্বারা আমার মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন দান করুন। হজরত গওসুল আজম তাহার এই দুরবস্থা দর্শন এবং কাকুতি-মিনতি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া পড়িলেন এবং তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক 'ইল্লাল্লাহ' বলিয়া তাহাকে জমিন হইতে উঠাইয়া দিলেন। হজরত গওসে পাকের পবিত্র হস্তের পরশ লাগামাত্র সেই মরণোন্মুখ বৃদ্ধ সবুজ খোরমা বৃক্ষের ন্যায় সতেজ ও সবল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিতে লাগিল, হে মুহিউদ্দীন ! আপনি আমাকে স্থায়ি জীবন দান করিলেন। আপনি কি চিনিতে পারেন নাই যে, আমি কে ? হে মহাপুরুষ ! আমি আম্বিয়াকুল শিরোমণি হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ইসলাম ধর্ম'। দুর্বলতাবশতঃ আমার মৃতপ্রায় অবস্থা হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহ পাকের হাজার হাজার শোকর, তিনি আপনাকে পয়দা করিয়া আমাকে নবজীবন দান করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে তাই আপনার উপাধি হইল– 'মুহিউদ্দীন' 'ধর্মকে সজীবকারী।'

তিনি তথা হইতে বাগদাদে আসিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলে তাহাকে দেখিয়াই এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল "হে মুহিয়্যুদ্দীন ! আপনার প্রতি সালাম। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা এই হইল যে, যে কেহ তাহাকে দেখিত, সেই উপাধিতে সম্বোধন করিতে লাগিল। তিনি নামাজ শেষ করিয়া উঠিলে সারা মসজিদে এই উপাধি উচ্চারণের ধুম পড়িয়া গেল এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত লোকেই তাহাকে এই উপাধিতে সম্বোধন করিতে লাগিল। অথচ ইতোপূর্বে তাহার এই উপাধি কেহই জানিত না।

বংশ পরিচয় বা নসবনামা :

গওসুল আজম হজরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি (র.) পিতা ও মাতার উভয় দিক হইতেই সাইয়্যেদ খানদানের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম হজরত সাইয়্যেদ আবু সালেহ মুসা 'জঙ্গী-দোস্ত' উপাধিতে ভূষিত করার কারণ ছিল, তিনি খুব নেককার ও পরহেজগার বুজুর্গ লোক ছিলেন। ধর্মীয় জেহাদে যোগদান করাকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। হজরত গওসুল আজমের শ্রদ্ধেয় জননীর নাম ছিল ফাতেমা। তাঁহার কুনিয়াত ছিল 'উম্মুল খায়ের'। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ লোক আবদুল্লাহ ছাওমাঈর অতি আদরের কন্যা ছিলেন। হজরত বড়পির সাহেবের পিতার উর্ধ্বতন বংশপরম্পরা সাইয়্যেদ কুলের শিরোমণি হজরত ইমাম হাসান (আ.) সহিত এবং মাতার ঊর্ধ্বতন বংশপরম্পরা সাইয়্যেদলের গৌরব হজরত ইমাম হোসাইন (আ.) সহিত মিলিত হইয়াছে। এই কারণে তাহাকে 'আল হাসানী ওয়াল-হুসাইনী' বলা হইত।

পিতৃবংশ :

হজরত গওসুস্ সাকলাইন শায়খ মুহিয়ুদ্দীন সাইয়্যেদ আবদুল কাদের জিলানি (র.), ইবনে সাইয়্যেদ আবি সালেহ মুসা জঙ্গীদোস্ত (র.), ইবনে সাইয়্যেদ আবি আবদুল্লাহ আজিল্লী (র.), ইবনে সাইয়্যেদ ইয়াহইয়া জাহেদ (র.), ইবনে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ (র.), ইবনে সাইয়্যেদ দাউদ (র.), ইবনে সাইয়্যেদ মুসা সানি (র.) ইবনে আবদুল্লাহ সানি (র.), ইবনে সাইয়্যেদ মুসাজুন (র.), ইবনে সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ আলমাহা (র.), ইবনে সাইয়্যেদ হাসানুল মুসান্না (র.), ইবনে আমিরুল মুমেনীন হজরত সাইয়্যেদ হাসান (আ.) (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র), ইবনে আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী ইবনে আবি তালেব কাররামাল্লাহু ওয়াজহু অর্থাৎ বেলায়েত জগতের সম্রাটের একাদশ ঔরসে হজরত বড়পির ছাহেব (র.) অবির্ভূত হন।

মাতৃবংশ ঃ

তাঁহার মাতা হজরত সাইয়্যেদা উম্মুখায়ের আমাতুল জাব্বার ফাতেমা বিনতে হজরত সাইয়্যেদ আবদুল্লা ছাওমাঈ জাহেদ (র.) ইবনে সাইয়্যেদ আবু জামাল (র.), ইবনে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ (র.), ইবনে সাইয়্যেদ মাহমুদ (র.), ইবনে সাইয়্যেদ আবুল আ'তা আবদুল্লাহ ইবনে সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন ঈসা (র.), ইবনে সাইয়্যেদ আবু আলাউদ্দীন মোহাম্মাদুল জাউয়াদ (র.), ইবনে সাইয়্যেদ আলী-উর রেজা (র.), ইবনে সাইয়্যেদ মুসা আল্ কাজেম (র.), ইবনে সাইয়্যেদুনা ইমাম জাফার সাদেক (র.), ইবনে সাইয়্যেদুনা ইমাম বাকের (র.), ইবনে সাইয়্যেদেনা ইমাম যাইনুল আবেদিন (র.), ইবনে সাইয়্যেদুনা আমিরুল মুমেনিন হজরত হোসাইন (আ.) ইবনে সাইয়্যেদুনা হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু। মায়ের দিক হইতে হজরত গওসুল আজম হজরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহুর অষ্টাদশ ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। উপরোক্ত উভয় নসবনামার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি হাসানি এবং হোসাইনি সাইয়্যেদ ।

একটি স্বপ্ন :

হজরত গওসুল আজম (র.) তাঁহার ওয়াজ-নছিহত আরম্ভ করার অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন: "৫২১ হিজরির ১৬ শওয়াল মঙ্গলবার হুজুরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে আমাকে বলিলেন, "হে বৎস, আবদুল কাদের ! তুমি আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে ওয়াজ-নছিহত কেন কর না ? নিজের উপদেশ এবং নছিহত হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত কেন করিতেছ ? আমি আর করিলাম, হজরত ! আমি একজন অনারব লোক। বাগদাদের মার্জিত ভাষী লোকদের সম্মুখে মুখ খুলিতে ভয় করিতেছে যে, সে সমস্ত আরবি ভাষী লোকদের সম্মুখে ওয়াজ কিরূপে করিব ? এমন না হয় যে, বাগদাদের মনীষীগণ এই বলিয়া আমাকে তিরস্কার করেন, এই ব্যক্তি হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হজরত আলী (আ.) এর আওলাদ হইয়া আরবি ভাষা জানে না। তথাপি ওয়াজ-নছিহত করিবার শখ হইয়াছে। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "আচ্ছা, মুখ খোল। আমি মুখ খুলিলে হজরত রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পড়িয়া আমার মুখের ভিতরে ফুঁ দিলেন এবং সাতবার তাঁহার পবিত্র মুখের কিছু লালাও আমার মুখে ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন : মানুষকে হেকমত এবং নছীহতের সহিত তোমার পরওয়ারদিগারের পথের দিকে হেদায়ত করিতে থাক।" তাঁহার এই দান ও ফায়জের কল্যাণে আমার দেহে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হইল। আমার এলম সীনার কারামতণ্ডপে প্রকাশ পাইল। রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী দিন জোহরের নামাযের পর আমি ওয়াজ করিবার উদ্দেশ্যে মুসাল্লার ওপর বসিলাম এবং চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, কি বলিব। আমার চতুর্দিকে বিরাট জনতা ভিড় জমাইয়া বসিয়াছিল। প্রত্যেকে আমার ওয়াজ শ্রবণ করার জন্য একান্ত উৎসুক ছিল। আমার অন্তরের মধ্যে তো এলুমের এক সমুদ্র তরঙ্গায়িত অবস্থায় বিদ্যমান, কিন্তু আমার মুখ বন্ধ ছিল। তখন আমার ওপর এক বিচিত্র অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। এমনকি একটি অক্ষরও আমার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল না, সম্পূর্ণ নীরব ও নিস্তদ্ধ অবস্থায় মুসাল্লার ওপর বসিয়াছিলাম। এমন অবস্থায় দেখিতে পাইলাম যে, আমার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ শাহে বেলায়েত আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (আ.) আমার চোখের সম্মুখে দন্ডায়মান। তিনি আমাকে বলিতেছেন, "হে হাসানের চোখের মণি ! হে হোসাইনের হৃদয়ের ধন ! ওয়াজ কেন আরম্ভ করিতেছ না ?" আল্লাহর বান্দাগণকে কেন এখন পর্যন্ত এন্তেজারের মধ্যে রাখিয়াছ ? আমি আর করিলাম, "হে

প্রপিতামহ ! আমার অন্তরে তো ওয়াজ-নছিহতের এক ভান্ডার বিদ্যমান। কিন্তু মুখ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।” তিনি বলিলেন, ‘মুখ খোল’। আমি প্রপিতামহের আদেশ পালন করিলে তিনি ছয়বার কিছু পড়িয়া পড়িয়া আমার মুখে ফুঁ দিলেন। আমি আর করিলাম, আপনি সাতবার কেন ফুঁ দিলেন না ?” তিনি বলিলেন, “আদব রক্ষার্থে আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে একবার কম করিলাম।” এতটুকু বলিয়াই তিনি আমার দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এই ঘটনার পরেই আমার মুখ খুলিয়া গেল। অতঃপর উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীর দিকে মুখ ফিরাইয়া ওয়াজ-নছিহত আরম্ভ করিয়া দিলাম। অতঃপর তো আমার অনর্গল বক্তৃতার খ্যাতি সারা বাগদাদময় ছড়াইয়া পড়িল এবং আমার অন্তরে বক্তৃতা করার আগ্রহ এবং উৎসাহ এত অধিক বাড়িয়া গেল যে, কিছুদিন নীরব থাকিলে এবং ওয়াজ নছিহত না করিলে আমার দম বন্ধ হইয়া আসিত। প্রথমাবস্থায় অল্প কিছুসংখ্যক লোকই আমার ওয়াজের মজলিসে আসিত। কিন্তু শেষে মজলিসের অবস্থা এরূপ হইল এবং মানুষের ভিড় এত অধিক হইতে লাগিল যে, মসজিদে তাহাদের স্থান সংকুলান অসম্ভব হইয়া পড়িল। অবশেষে ঈদগাহের মধ্যে বক্তৃতা-মঞ্চ স্থাপন করা হইল। আমি সেখানে ওয়াছ-নছিহত আরম্ভ করিলাম।” শায়খ আবদুল্লাহ জুব্বাই বলেন, প্রায় সত্তর হাজার শ্রোতা তাহার মজলিসে হাযির হইতেন। আর যানবাহনের আরোহী এত অধিক পরিমাণে আসিত যে, ঈদগাহের চতুর্দিকে গাড়ি-ঘোড়ার এক চক্র হইয়া যাইত। দূর হইতে দৃষ্টি করিলে তাহা একটি মাটির স্তূপ বলিয়া বোধ হইত।

আখবারুল আখইয়ার কিতাবের সংকলক লিখিতেছেন, হজরত গওসুল আজমের ওয়াযের ক্রিয়া এইরূপ ছিল যে, যখন তিনি শাস্তির ধমকিমূলক আয়াত পাঠ করিতেন এবং উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন, তখন শ্রোতৃমন্ডলীর আন্তরআত্মা কম্পিত হইয়া যাইত, কলিজা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইত। মুখমন্ডলের রং ফ্যাকাশে হইয়া যাইত। কান্নাকাটির এমন রোল পড়িয়া যাইত যে, পূর্ণ মজলিসই বেহুশ হইয়া পড়িত। আবার তিনি যখন রহমতের আয়াত পাঠ করিতেন এবং উহার মর্মার্থ বর্ণনা করিতেন, তখন শ্রোতৃমন্ডলীর অন্তর ফুলের কলির মত হাসিয়া উঠিত। কেহ কেহ উৎসাহ ও আগ্রহাতিশয্যে আত্মহারা হইয়া মজলিসে খতম হইলে হুশ ও জ্ঞানপ্রাপ্ত হইত। কাহারও কাহারও অবস্থা তো এরূপ হইত যে, প্রাণবায়ু আল্লাহ তা’আলার হাতে সমর্পণ করিয়া দিত। তাঁহার ওয়াজের মজলিসে চারিশতজন সংক্ষেপ-লেখক তাঁহার ওয়াজ লিপিবদ্ধ করিতেন। কিন্তু গওসুল আজমের ওয়াজ এত দীর্ঘ হইত যে, তাঁহারা সকলেই শেষ পর্যন্ত অক্ষম হইয়া পড়িতেন। তাঁহার ওয়াজ নছিহতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কারামত এই ছিল যে, দূরবর্তী এবং নিকটবর্তী শ্রোতাগণ সকলে সমানভাবে শ্রবণ করিতেন এবং সমভাবে ফায়য লাভ করিতেন। স্থানের দূরত্ব এবং নিকটত্ব হিসেবে পার্থক্য হইত না।

বিশ্বজোড়া খ্যাতি :

তিনি খুব চেষ্টা ও যত্নের সহিত ওয়াজ-নছিহত এবং মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রদানের ধারা জারি রাখিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম শুধু বাগদাদ এবং উহার আশেপাশের স্থানসমূহে তাহার ওয়াজ-নছিহতের খ্যাতি ছড়াইয়াছিল। অতঃপর সত্বরই তাঁহার ওয়াজের খ্যাতি দূর-দূরান্তের শহরসমূহেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্যান্য দেশ হইতেও তাঁহার ওয়াজ শুনিবার এবং ফায়েদা হাসিল করার জন্য দলে দলে বাগদাদে আসিতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যেই তিনি আলেম ও নেককার লোকদের একটি দল গঠন করিলেন। এই মনীষীগণ সর্বপ্রকারের এম হাসিল করার পর হজরত গওসুল আজমের আদেশক্রমে বিভিন্ন শহরে চলিয়া গেলেন এবং আল্লাহতা’লার বান্দাগণকে ধর্মীয় পথপ্রদর্শনের কর্তব্য সমাধা করিতে লাগিলেন। ইরাকের বিভিন্ন অংশে তাহার অসংখ্য মুরিদান ছিল।

ওয়াযের অবস্থা :

তাহার ওয়ায়ে থাকিত আল্লাহ তা’আলার তরফ হইতে উদিত ভাব, আল্লাহ প্রদত্ত ইহাম, আল্লাহ তা’আলার এরশাদ এবং হেদায়াতের আকুল সমুদ্র। সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ উঠিত, তখন শ্রোতৃমন্ডলী আমির হউক, ফকির হউক, আলেম হউক কিংবা বিশিষ্ট হউক, সকলেই অস্থির হইয়া পড়িত। যখন হেমত এবং জ্ঞানবত্তার মেঘ হইতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া যাইত, তখন কাহারও ‘ওয়াজদ’ আসিয়া পড়িত, কেহ কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিত, কেহ বিয়ে বিহবল হইয়া যাইত, কেহ অস্থির ও আত্মহারা হইয়া পড়িত এবং চিৎকার

করিত। কাহারও অন্তরে এমন অসহনীয় ধাক্কা লাগিত, যাহার ফলে তাহার কলিজা ফাটিয়া যাইত এবং সে মহব্বতের তলোয়ারে আহত হইয়া শহিদ হইয়া যাইত।

ওয়াজ শেষে যখন শ্রোতৃমন্ডলী উঠিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেন, তখন দেখা যাইত যে, আজ এতজন লোক এশকে মাওলার তলোয়ারে শহিদ হইয়াছেন, তাহাদের লাশ সমাহিত করার সময় আসিয়াছে। বাহজাতুল আসরার কিতাবে হজরত শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব রেওয়াত করিয়াছেন যে তাহার প্রত্যেকটি মজলিসেই দুই চারিজন শ্রোতা অবশ্যই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিত। তাঁহার ওয়াজ সাধারণতঃ হেকমত এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ হইত। তিনি কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া পাত্র-পাত্র বিবেচনা না করিয়া সত্য কথা পরিষ্কার শব্দে বর্ণনা করিয়া যাইতেন। আল্লাহ তা'আলার ধর্মকে উঁচু করিয়া ধরার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া ও নির্ভীক ছিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা এবং মুক্তকণ্ঠ ছিলেন। কোন বিশিষ্ট মুরিদকে সম্বোধন করিতে ‘ইয়া গোলাম’ ! অর্থাৎ হে বৎস! বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বিরাট জনতাকে সম্বোধনে ‘ইয়া কাওম !’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ওয়াযের সময় তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে যেন মণিমুক্তা ঝরিতে থাকিত। তাহার কথাগুলি মোতি ও হীরা-জহরতের মালার মত মনে হইত। নদীর অবারিত স্রোতের মত তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন।

তিনি যখন আসন অলঙ্কৃত করিতেন, তখন তাঁহার ভয়ে কেহ থুথুও ফেলিত না। নাকও পরিষ্কার করিত না, কথাও বলিত না, কিংবা উঠিয়া মজলিসের মধ্যস্থলের দিকেও যাইত না। তিনি শ্রোতৃমন্ডলীর মনে উদিত ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ওয়াজ করিতেন। প্রত্যেকেই মনে করিত, যেন তাহার মনের কথাই বলিতেছেন।

আল্লামা আবুল হাসান সাদুল খায়ের আনসারি আনদালুসী বলেন, “আমি ৫২৯ হিজরিতে সাইয়্যেদুনা মুহিয়ুদ্দীন আবদুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইহির মজলিসে উপস্থিত হইয়া সর্বশেষ সারিতে বসিলাম। তিনি তখন ‘যোরহাদ’ অর্থাৎ সংসার-বিরাগ সম্বন্ধে ওয়াজ করিতেছিলেন। আমি মনে মনে কল্পনা করিলাম, আহা ! তিনি যদি মারেফাত সম্বন্ধে ওয়াজ করিতেন ! তৎক্ষণাৎ তিনি বিষয়বস্তু পরিবর্তন করিয়া মারেফাত সম্বন্ধে এমন ওয়াজ করিলেন, যাহা জীবনে আর কখনও আমি শ্রবণ করি নাই।

অতঃপর আমি মনে মনে কল্পনা করিলাম, কি ভাল হইত যদি তিনি ‘শাওক’ সম্বন্ধে ওয়াজ করিতেন ! তৎক্ষণাৎ তিনি মারেফাতের বিষয়টি ত্যাগ করিয়া ‘শাওক’ সম্বন্ধে ওয়াজ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এমনভাবে বর্ণনা করিলেন, যাহা জীবনে আমি কখনও শুনি নাই। আবার আমার অন্তরে কল্পনার উদয় হইল– খুবই ভাল হইত, যদি তিনি ‘ফানা’ এবং ‘বাকা’ সম্বন্ধে ওয়াজ করিতেন ! সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শাওকের বর্ণনা ত্যাগ করিয়া ফানা এবং বাকা সম্বন্ধে এমন ওয়াজ করিলেন, যাহা আজ পর্যন্ত আমার কান কোন দিনই শুনে নাই। অতঃপর আমার মনে কল্পনা হইল, আহা যদি তিনি গায়েব ও হাজেরের এম সম্বন্ধে ওয়াজ করিতেন ! সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফানা এবং বাক্বার বিষয়টি ত্যাগ করিয়া আমার কল্পিত বিষয়টি সম্বন্ধে ওয়াজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই বিষয়টির বর্ণনা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, “আবুল হাসান ! এতটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট।” ইহা শুনিয়া আর আমি স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি আমার কাপড় ছিড়িয়া ফেলিলাম। ওয়াজদের অবস্থা আমার ওপর আসিয়া পড়িল। আমি চিৎকার আরম্ভ করিয়া দিলাম। - বাহজাতুল আসবার।

ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, সর্বদা তাঁহার মজলিসে উচ্চস্বরে কোরআন শরিফ পাঠকারী দুইজন ক্বারী থাকিতেন। তাঁহারা কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করিতেন। ইহাও বলা হয় যে, তাহার এমন কোন মজলিসই হইত না, যাহাতে অমুসলিম ইসলাম ধর্ম কবুল করিত না। চোর, হত্যাকারী, ডাকাত, ফাসেক, গুণাহগার মুলহেদ এবং খারাপ এতেকাদের লোকদের এক বিরাট দল প্রত্যেক মজলিসে তাহার হাতে তওবা করিত। মৃত ধর্মে তিনি এমন এক ‘রেভলিউশন’ আনয়ন করিলেন যে তৎকালীন খলিফারাজ ভীতত্রস্ত হইয়া ঔদ্ধত্যের মাথা নত করিতে বাধ্য হলো। আঁ জনাব এঁর সম্পর্কে কিছু বলা বা লেখা মহাসমুদ্রকে কলসের মধ্যে বন্ধ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, উমাইয়া-আব্বাসীয়দের দীর্ঘ শাসনকালে ধর্মের রুহকে শ্বাসরুদ্ধবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল। আর ধর্মের খোলসই সে যুগে দৃশ্যমান ছিল। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। এমন কি খলিফা রাজ সভাসদসহ জুম্মার দিনেও প্রকাশ্য দিবালোকে মদ পানে অভ্যস্ত ছিল। দুনিয়া লোভী তথাকথিত আলেম, মশায়েখ, সম্প্রদায় রাজা-বাদশাহ, দুনিয়াদার শাসক প্রদত্ত আলখাল্লা, সনদ,

খেতাবে ভূষিত হয়ে তাদের সাহচর্যে প্রত্যেক কথায় বা কাজে ধর্মীয় অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে নাজায়েজ কর্মকান্ড সমর্থন করত। ফলে বাদশাহ তথা শাসবৃন্দ শরিয়ত বিরোধী কর্মকান্ডে কোনই দ্বিধাবোধ করত না। এই সমস্ত দুনিয়াদার উলামাদের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করে হুজুর গওস উস সাকালাঈন কঠোর ভাষায় উল্লেখ করেন :

"হে ইলম ও আমলে বিশ্বাসঘাতকগণ, শাসকবৃন্দের সহিত তোমাদের কি সম্পর্ক? হে আল্লাহ এবং তাহার রসুলের দুশমন, হে আল্লাহর বান্দাগনের ডাকাত দল, তোমরা কি পরিমাণ জুলুম ও মুনাফেকিতে লিপ্ত রহিয়াছ? তোমাদের এই মুনাফেকি আর কতদিন চলিবে ? হে আলেমগণ, আওলিয়া দরবেশগণ, বাদশাহ ও সুলতানদের জন্য আর কতদিন মুনাফেক হইয়া থাকিবে ? আর কতদিন তাহাদের নিকট হইতে ধন-দৌলত ও দুনিয়ার কামনা-বাসনা ও ভোগও গ্রহণ করিতে থাকিবে? তোমরা এবং অধিকাংশ রাজা-বাদশা এই যুগে আল্লাহ তা'লার ধন-দৌলত এবং তাঁহার বান্দাগনের সম্বন্ধে জালেম ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া রহিয়াছ।

"এই ধরনের একজন আলেমকে লক্ষ্য করিয়া ফরমাইতেছেন তোমার লজ্জা হয় যে, তোমার লোভ তোমাকে যালেমদের খেদমত ও তোষামোদী এবং হারাম খাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তুমি আর কতদিন হারাম খাইতে থাকিবে ? এবং দুনিয়ার এই সমস্ত যালেম বাদশাহগনের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে ? তুমি যাহাদের খেদমত ও তোষামোদীতে রহিয়াছ তাহাদের বাদশাহী অচিরেই শেষ হইয়া যাইবে।"

তাহার এই ভবিষ্যৎ বাণী অতি অল্প কালের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হয়। তদানীন্তন ইসলামি সমাজের এই অধঃপতনের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। মৃত ধর্মকে তিনি তাঁহার বলিষ্ঠ লেখনী বক্তৃতা, বিবৃতি, চিঠি-পত্র এবং সর্বোপরি আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে সঠিক চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি তুলে ধরেন। তাই তিনি 'মুহীউদ্দীন' বা "দ্বীন-ইসলামের পুনর্জীবন দানকারী"। তাঁর রুহানি ফয়েজ তাঁরই পবিত্র বংশধরগণের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত চির ভাস্বর হইয়া আছে।

হজরত বড়পির সাহেব (রা.) বলেন, "হুজুর (দ.) এর দ্বীনের প্রাচীর একটির পর একটি ধ্বসিয়া পড়িতেছে। উহার ভিত্তি নড়বড়ে হইয়া যাইতেছে। ওহে দুনিয়াবাসী-আস এবং ভাঙা প্রাচীর মেরামত কর। দ্বীনের প্রতি অবিচল হও। যাহা ধ্বসিয়া গিয়াছে উহা মজবুত করিয়া দাও। এ কাজ একার নয়। সকলে মিলিয়া উহা সমাধা করিতে হইবে। ওহে চন্দ্র-সূর্য এবং দিন তোমরা সকলে আস। কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে তারা এতই অধঃপতিত ছিল যে, তারা ব্যাপকভাবে প্রকৃত দ্বীন ইসলামের প্রতি অনুগত হলো না বা হজরত বড়পির সাহেব (রা.) এর নসিহত শুনল না। তবুও হজরত শায়খ (র) এর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, আল্লাহ প্রদত্ত রুহানি কামালিয়াত, প্রকৃতিগত উন্নততর যোগ্যতা, দক্ষতা ও ইজতে হাদী শক্তি দ্বারা তিনি ইসলাম ধর্মকে নবজীবন দান করেছিলেন। তিনি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সিলসিলার একজন ইমাম এবং একজন মশহুর প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না বরং ধর্মের নতুনতর প্রয়োগ ও বিন্যস্ত করণের কৃতিত্বও তাঁরই। তার পূর্বে বায়াত ও তরবিয়াত ধর্মীয় আঙ্গিকে এতটা বিন্যস্ত, সুকৃঙ্খল ও সুপ্রণীতি ছিল না। আর এর ভেতর এতটা ব্যাপকতা ও বিস্তৃতিও সাধিত হয়নি যতটা তার জনপ্রিয়তা, কারামতি ও বিরাট মর্যাদার কারণে হয়েছিল। তাঁর জীবনে লাখ লাখ মানুষ এ তরিকা থেকে ফায়দা পেয়ে ঈমানের মাধুর্যের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ইসলামি জীবন ও চরিত্রের দ্বারা নিজেদের সুসজ্জিত করে। তাঁর ওফাতের পরেও তাঁর মহান পরিবারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও তাঁর একনিষ্ঠ খলিফাবৃন্দ ও এই মর্যাদাপূর্ণ তরিকার অনুসারীবৃন্দ গোটা মুসলিম জাহানে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত এবং ঈমানি চেতনা ও পুর্ণজাগরণের এই সিলসিলা জারি রাখেন যা দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করা একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তারই রুহানি শিক্ষা ইয়েমেন, হাজরা মউত, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, জাভা, সুমাত্রা সহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের ঈমানে পূর্ণতা এবং লক্ষ লক্ষ অমুসলিমের ইসলাম কবুলের মাধ্যম হিসেবে পরিণত হয়। হজরত শায়খ (র) এর অস্তিত্ব ছিল সেই বস্তুবাদী যুগে ইসলামের একটি জীবন্ত মুজিজা এবং এক বিরাট গায়েবী মদদ বিশেষ। তার ব্যক্তিসত্ত্বা, তার কামালিয়াত, তার প্রভাব, আল্লাহ পাকের দরবারে তার মকবুল বান্দা হিসেবে গৃহীত হবার চিহ্নাদি, আল্লাহর মখলুকাতের মধ্যে তাঁর মাহাত্ম ও সম্মান জনক মর্যাদার স্বীকৃতি, তাঁর দান ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবিদের নৈতিক চরিত্র এবং তাদের জীবন ও চরিত্র সবই ইসলামের সত্যতার দলিল এবং তার জীবন্ত কামিলিয়াতের প্রমাণ। এটি সেই হাকিকত ও বাস্তব সত্যের প্রমাণ ছিল যে, তার মধ্যে (ইসলামের) সত্যিকার রুহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতা, আত্মার পবিত্রতা

এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির সর্বাধিক যোগ্যতা রয়েছে এবং তার শাহি ভান্ডার কখনও হীরা-জহরত ও দুর্লভ সামগ্রী শূন্য নয়। দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বকে স্বীয় জাহিরী ও বাতেনি কামালিয়াত দ্বারা উপকৃত করে এবং মুসলিম জাহানে আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহর দিকে ফিরে যাবার বিশ্বজয়ী আনন্দ, সুখ ও স্বাদ সৃষ্টি করে। তিনি ৫৬১ হিজরিতে (১১৬৬) ৯০ বছর বয়সে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

আব্বাসীয় শাসনের শেষ পর্যায় :

আব্বাসীয়দের গোটা জগতটাই ছিল লড়াই-সংঘর্ষের জগৎ। রাজা বাদশাহদের স্থলে গোলাম ও মুক্তিপ্রাপ্ত দাসরাই রাজত্ব করত। সম্পদের সঞ্চয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল প্রবল। নৈতিক ও চারিত্রিক বিচ্যুতি এবং রাষ্ট্রীয় মনোমুদ্ধকর বিষয়াবলীর কোন ঘাটতি ছিল না। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এমন সব লোকের হাতে ছিল– প্রজাদের শোষণ ও লুণ্ঠনই ছিল তাদের একমাত্র কাজ। সভ্রম বিক্রেতার হাতে ছিল নারীর দেখাশুনার দায়িত্ব আর ঈমানের মালিক ছিলেন খোদা। এহেন বিকৃত ঈমানদার রাষ্ট্রীয়ভাবে বা সমবেতভাবে খোদায়ি গজবের শিকার হয়। যদিও এই জাতির মধ্যে অনেক লোক সৎ বা প্রকৃত ঈমানদারও উপস্থিত থাকে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে উল্লেখ আছে যে, "তোমরা সেই বিপর্যয় ও দুর্যোগ থেকে সাবধান হও বা কেবল জালিমদেরকেই পাকড়াও করবে না, জেনে রাখ আল্লাহ শাস্তিদানে বড় কঠোর।" খোদায়ি এই অমোঘ বিধানের আওতায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারি (মোঙ্গল) আক্রমন পরিচালিত হলো। তাতারি আক্রমণ ছিল মুসলিম জগতের ওপর আল্লাহর গজব। এই বন্য বর্বর জাতি গোটা মুসলিম জাহানকে পদানত করতে রক্তের বন্যা বহাতে এবং সর্বত্র আগুণ লাগাতে থাকে। ১২৫৮ সালে চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খানের নেতৃত্বাধীনে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজধানী এবং সে যুগের সর্ববৃহৎ শিক্ষা সভ্যতার কেন্দ্র বাগদাদে প্রবেশ করে এবং তার অস্তিত্ব লন্ডভন্ড করে দেয়। বাগদাদের ধ্বংস এবং মুসলমানদের ব্যাপক গণহত্যার বিবরণ অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। অত্যন্ত করুন ও বেদনাদায়ক। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর লিখেছেন–

চল্লিশদিন পর্যন্ত বাগদাদে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসের রাজত্ব চলে। ফলে তৎকালীন বিশ্বের গৌরবোজ্জ্বল ও জমজমাট এই শহরটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। মাত্র গুটিকয়েক লোই সেখানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বাজার ও পথ-ঘাটগুলো ছিল মানুষের লাশে পরিপূর্ণ। লাশের এক একটি স্তুপ ছোটখাটো এক একটি টিলার আকৃতি ধারণ করেছিল। এসব লাশের ওপর বৃষ্টিপাত হলে তা ফুলে আরও বীভৎস আকার ধারণ করে। ফলে চর্তুদিকে মহামারী শুরু হয়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সিরিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। মহামারীর কারণেও আরও বহুলোক মারা যায়। মোটকথা বাগদাদে তখন দুর্ভিক্ষ-মহামারী-ধ্বংস-এই তিনের রাজত্ব চলছিল। (ইসলামি রেনেসাঁর অগ্রপথিক লেখক সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদভী,পৃ. ৩৩১-৩৩

সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করানো হয়েছিল যে মুসলমানদের খলিফাকে হত্যা করা হলে বা তার রক্ত ঝরানো হলে কোন মহাদুর্যোগ দেখা দিবে। এই ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যই খলিফা মুতাসিম বিল্লাহকে বিছানার ওপর শুইয়ে পদাঘাতে হত্যা করা হয়। প্রাগুক্ত-পৃ. ৩৩৩।

রাজনৈতিক খেলাফতের শেষ অধ্যায় :

হালাকু খান কর্তৃক ১২৫৮ সালে আব্বাসীদের রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস এবং শেষ আব্বাসী খলিফা মুতাসিমকে হত্যা করে আব্বাসী বংশের অবসান ঘটান হয়। মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় বল প্রয়োগে ফাতেমীয় শিয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ি হয়। উমাইয়াদের একটি শাখা বাহুবলে স্পেন অধিকার করে স্বাধীন উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে, যা ১০৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ি হয়। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে আরবদের নিকট হতে তুর্কিগণ খেলাফত অধিকার করে। সেই বৎসর তুর্কি সুলতান সেলিম মিসর অধিকার করে কায়রোর নামমাত্র খলিফা আব্বাসী আহমেদকে বন্দী করে তার নিকট হতে খলিফা পদবী কেড়ে নেন। সেদিন হতে খেলাফত লাভের শর্ত হিসাবে কোরেশ বংশের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ফকিহগণ বিলুপ্ত বলে ঘোষণা দিলেন। তাছাড়া 'ফকিহগণ' ক্ষমতাসীনদের সুবিধার্থে খেলাফতের শর্ত হিসাবে বংশগত মর্যাদার শর্ত বিলোপ সাধন করে (খোদাভীরুতা, ধর্মীয় জ্ঞান, ন্যায় পরায়নতার শর্ত বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হয়েছিল।) খেলাফতের শর্ত হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে প্রজাসাধারণের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে খলিফার পুরোপুরি

সক্ষম হওয়া এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা করা। ওসমানি সাম্রাজ্যে মূলত বিকৃত ইসলামি আইনের শাসন চালু থাকায় সামাজিক অনাচার এক ব্যাপক আকার ধারণ করে। অন্যদিকে ইউরোপীয় রেনেসাঁর ঢেউ প্রায় সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইসলামি সাম্রাজ্য হিসেবে তুর্কি, ভারত, মিশর সহ প্রায় সকল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা পাশ্চাত্য শক্তির অধিকারে চলে আসে। ওপরুন্তু পূর্ববর্তী আরব খলিফাদের সকল দোষই তুর্কি সুলতানেরা ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই জন্য সাম্রাজ্যের অনাচার, অবিচার ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের উস্কানীতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রজাগণ বিশেষ করে হিযাজ, সিরিয়া, ইরাক, মিশর প্রভৃতি দেশের লোকেরা তুর্কি সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করে ফলে তুর্কি সুলতান যুদ্ধে পরাজিত হয়। এদিকে ওসমানি সুলতানদের রক্ষণশীল মনোভাব সংস্কারমূলক কাজের বিপক্ষে ছিল। অর্থাৎ পরিবর্তনশীল অবস্থা, রাজনীতি, যুগ বা পারিপার্শ্বিকতাকে তারা তথাকথিত ধর্মীয় ফতোয়ার মাধ্যমে যুদ্ধ করতে চাইতেন। এ ব্যাপারে তাদের প্রধান সহযোগী ছিল উলেমা সমাজ । শাসনমূলক সংস্কার বা উদার নৈতিক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করাকে বিকৃত ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী এই আলেমগণ 'বেদাত' বা 'ধর্মহীনতা' বলে উড়িয়ে দিতেন। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে বিকৃত একনায়কতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সাধারণ জনগণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'খেলাফতকে' তুরস্কের সকল অনিষ্টের মূল বলে ভাবতে শুরু করলো এবং খেলাফতকে রহিত করার জন্য প্রবল গণ-আন্দোলন শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে এই রাজনৈতিক খেলাফত আল্লাহর মনোনীত হওয়ায় এই খেলাফতের প্রতি জনসাধারণের কোন আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল না (পূর্বে বল প্রয়োগের মাধ্যমে এই খেলাফত চালু রাখা হয়েছিল। বর্তমানে এই ক্ষমতা বিলুপ্তি ঘটে)। ফলে মুসলিম ফকিহগণ ও বিভিন্ন যুক্তিতর্কের দ্বারা খেলাফতের প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া শুরু করেন। তুরস্কের গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি বেইয়ুত মিল্লেত মজলিশ ১৯২১ সালে ঘোষণা করল জনসাধারণই সম্পূর্ণরূপে সার্বভৌমত্বের অধিকারী (অথচ আমরা সবাই জানি সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। এ ব্যাপারে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, এবং খলিফার কোন ক্ষমতা নাই। এসেম্বলির সিদ্ধান্ত অনুসারে সুলতান মুহাম্মদকে (৬ষ্ঠ) পদচ্যুত করা হয় এবং আবদুল আজিজ আফেন্দিকে সিংহাসনে বসান হয়। কিন্তু নতুন খলিফার আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব হরন করা হয়। খেলাফতকে সমূলে উৎপাটিত করার উদ্দেশ্যে সেটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। এই সময় এসেম্বলি কর্তৃক উদ্বুদ্ধ একদল উলেমা মত প্রকাশ করেন যে, খেলাফত রহিত করা বৈধ। কেননা খেলাফত প্রকৃত পক্ষে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় আধ্যাত্মিক ব্যাপার সরাসরি মুসলমানদের দায়িত্বে এবং এর সঙ্গে খেলাফতের কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। তারা ঘোষণা করলেন যে, খলিফা মুসলমানদের নেতা ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। তিনি রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট কিন্তু তিনি পোপের ন্যায় পর্যায়ক্রমে আধ্যাত্মিক নেতা নন। তারা ফতোয়ায় আরো বলেন যে, প্রকৃত অর্থে খেলাফত হচ্ছে জাতি কর্তৃক খলিফাকে দেওয়া এক প্রকার অধিকার মাত্র। খেলাফত হচ্ছে জাতি ও খলিফার মধ্যে একটি চুক্তি যা দুই পক্ষ মিলে সম্পাদন করে। খেলাফত হচ্ছে একটি প্রাচীন রীতি মাত্র তবে এর মর্যাদা রয়েছে এবং পরিবর্তনশীল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য খেলাফত রহিত করা বাঞ্ছণীয়।

আলেমদের এই ফতোয়া ১৯২৪ সালে 'আল আহরাম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সেই বৎসরই ১ মার্চ শনিবার ২৬ রজব ১৩৪২ হি.) খেলাফত রহিত করণের জন্য মোস্তফা কামাল একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন। পরবর্তী গোমবার গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি সংখ্যাতিরিক্ত ভোটে খেলাফত রহিত করণের বিল পাশ করে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের প্রবক্তা হবস্ ও লকের মতাদর্শে গ্রান্ড ন্যাশনাল

এসেম্বলি উল্লেখিত যুক্তি উপস্থাপন করলো যা অচিরেই সকল মুসলিম জনগোষ্ঠী সঠিক রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে ধন্য হয়।

রাজনৈতিক খেলাফত একটি পর্যালোচনা :

হজরত মুহাম্মদ (দ.) তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহর আইন প্রবর্তন, ও তা বাস্তবায়নকারী ছিলেন। আল্লাহর রসুল (দ.) ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিধানদাতা ও আইনের একমাত্র বৈধ ব্যাখ্যাদাতা এবং আইন প্রয়োগকারী। আবার তিনিই ছিলেন মদিনার মসজিদের ইমাম। যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ.) প্রদত্ত বিধি বিধান দ্বারা রাষ্ট্রীয়,

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ড নির্ধারিত ও প্রচলিত হয় তাই মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের জন্য তা কল্যাণকর হিসেবে বিবেচিত। কেননা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাদের পার্থিব জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। তাহলে সৃষ্টির সমগ্র ব্যাপারটাই অনর্থক মিথ্যা অলীক হইয়া দাঁড়ায়। কেননা পার্থিব জীবনের শেষ পরিণতি শুধু ধ্বংস ও মৃত্যু। এই জন্য আল্লাহ বলেন : "তোমরা কি এই ধারণা করিয়াছ যে তোমাদিগকে শুধুই অহেতুক সৃষ্টি করিয়াছি।

সুতরাং মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এমন পার্থিব জীবন সৃষ্টি করা যা তাদের সমভাবে পরলৌকিক মঙ্গল বিধানে সক্ষম। ইহাই পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলে আল্লাহর নির্ধারিত পথ।" এই জন্যই ধর্ম মানুষকে তাদের ব্যবহারিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদিতে এই পথে পরিচালিত করার জন্য বিধি নিষেধ আরোপ করে থাকে। এমনকি মানুষের স্বাভাবিক সমাজবদ্ধ জীবন তথা রাষ্ট্রীয় শক্তিও ইহার আওতাভূক্ত হয়। যাতে জীবনের কোন কর্মকান্ড এর এখতিয়ার বহির্ভূত না থাকে। যাতে সকল কার্যই ধর্মের পথে পরিচালিত হয়ে পরম কৃঙ্খলা বিধায়কের হাতে থাকে।

রসুল (দ.) এর ওফাতের পর আল্লাহ বা তাঁর রসুলের নির্দেশের পরিবর্তে মানবিয় যুক্তি/মতামতের মাধ্যমে হজরত আবুবকর কে (রা.) নেতা নির্বাচন করা হয়। এই নেতা নির্বাচনের মাধ্যমেই ইসলাম ধর্মে 'খেলাফত' নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এর উৎপত্তি হয়। প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ বা তাঁর রসুল কর্তৃক নয় বরং 'জনগণ' কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া সত্বেও তিনি কার্যত সমস্ত মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যাপারে রসুল (দ.) প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে থাকেন। হজরত আবুবকর (রা.) এর অসিয়ত মোতাবেক ওমর (রা.) খলিফা হন। জনগণের সমর্থনে নয়, যা আবুবকর (রা.) এর ক্ষেত্রে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল। হজরত ওমর (রা.) নিজেকে রসুল (দ.) প্রতিনিধি হিসেবে নিজের পরিচয় দেওয়ার যোগ্য বলে মনে করতেন না। তাই তিনি আমির উল মুমেনিন বা মুসলমানদের নেতা উপাধি ধারণ করেন। যদিও কার্যত তিনিও রাষ্ট্রনেতা হিসেবে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে সকল কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। হজরত ওমর (রা.) এর অসিয়ত অনুযায়ী (গণ ভোটে নয়) হজরত ওসমান (রা.) খলিফা নিযুক্ত হন। হজরত ওসমান (রা.) খলিফা হিসেবে একই পদ্ধতিতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এই ক্ষমতা হজরত ওসমান (রা.) সঠিকভাবে প্রয়োগ করছেন না মর্মে অভিযোগে বলা হয় যে তিনি প্রথম দুই খলিফার বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুসরণ করছেন না বরং হজরত ওসমান (রা.) এর আমলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গোত্র/আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি পক্ষপাত দুষ্ট বলে গণ্য করা হলো। হজরত আলী (আ.) জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে খলিফা হলেন। অর্থাৎ গণভোটে অথবা পূর্ববর্তী খলিফার অসিয়ত খলিফা নির্বাচনের ভিত্তি। এই মত একটি বিতর্কিত ব্যাপার হিসেবে দেখা দেয়। তাই এই পদ্ধতিগত ত্রুটি একটি স্থায়ি ধর্মীয় বিধানে পরিণত হলো। অর্থাৎ মানুষের ভোটে রাষ্ট্র প্রধানের (ধর্মীয় নয়) ওসিয়তের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন বা মনোনয়ন উভয় পদ্ধতি শরিয়ত সম্মত পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং এর বিপরীত চিন্তাধারাই ধর্মোদ্রোহিতারূপ পরিগ্রহ করে। মানুষ হিসেবে প্রথম চার খলিফা এত অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন যে আজ পর্যন্ত পৃথিবী এ ধরনের মানুষের নেতৃত্ব পায়নি তবে যেহেতু এই রাজনৈতিক খেলাফত আল্লাহ ও রসুলের নির্দেশ অমান্য করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই খোদায়ি গজব হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে চিরস্থায়ি ভ্রাতৃহত্যার বীজ বপন করেছিল। যেমন নাকি মুসা (আ.) এর অনুপস্থিতিতে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে গরু পূজার জন্য বনি ইসরাইল জাতিকে কাফফারা হিসেবে আত্মঘাতি যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এদের পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ খলিফা, রসুলের খলিফা তথা 'আল্লাহর খলিফা' (নাউজুবিল্লাহ)

'আল্লাহর ছায়া' বা এমন কি নিজেদের আল্লাহর মত ভাবতে লাগলেন। এবং আচার আচরনে ও কথা বর্তায় তা প্রকাশ করতে এতটুকু লজ্জাবোধ করতেন না। (সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী বলে) কাজকর্মে ও চরিত্রে যাই হোক না কেন যেহেতু এইসব খলিফারা রসুল (দ.) এর রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করতেন তাই তারা সবাই স্বঘোষিত নায়েবে রসুল হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। এবং আলেম ফকিহগণও তাদেরকে এই পদ্ধতিতে

সম্বোধন করে তাদের প্রভুর মনোরঞ্জনের মাধ্যমে নিজেদের পার্থিব উন্নতির ব্যবস্থা করতেন । ।প্রথম থেকেই খলিফাদিগকে যে তিনটি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে সেগুলি হলো খলিফা, আমিরুল মুমেনিন এবং ইমাম । কিন্তু এই তিনটি খেতাবই ছিল প্রকৃতপক্ষে একই ব্যক্তির । খলিফা খেতাবটি রসুলুল্লাহর (দ.) সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দিকে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে, এবং রসুলুল্লাহ (দ.) প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমানদের প্রতি দাবি বর্তায় ।

আমিরুল মুমেনিন খেতাব তাঁকে শাসক হিসেবে সামরিক বাহিনীর প্রধান– সৈন্যধ্যক্ষ এবং বেসামরিক শাসনের ও প্রধান হিসেবে বুঝায় । ইমাম খেতাব রাষ্ট্র প্রধানের ধর্মীয় কার্যাবলীর ওপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয় । যদিও আল্লাহর বা তার রসুলের মনোনয়নের মাধ্যমে খলিফা নিয়োগের শর্ত প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল । পরবর্তীতে খলিফাকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে এবং জনসাধারণের সদিচ্ছার ওপর তাঁর কার্যকালের স্থায়িত্ব নির্ভর করবে, এই নীতির শরিয়তি ভিত্তি না থাকলে তা স্বীকৃত হলো ও ইসলামের ইতিহাসে এক চিরস্থায়ি দুর্ভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো । এ কারণেই খলিফা নির্বাচনে কোন সুষ্ঠু নিয়ম উদ্ভাবিত হয়নি । বরং যে কোন উপায়ে ক্ষমতায় গেলে সেই ক্ষমতা গ্রহণের প্রক্রিয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয় নি। মুসলিম ফকীহগণ “উম্মার মধ্যে ফিতনা ফাসাদ” পরিহারের লক্ষ্যে ক্ষমতাসীনদের তোষন নীতি অব্যহত রাখেন । তবে এই সব অবৈধ ক্ষমতাদখলকারীদের ‘বৈধ’ শাসক হিসেবে ঘোষণা করায় মুসলিম সমাজে ফেতনা বা মত বিরোধিতা এড়ানো সম্ভব হয়েছে এমন দাবি কোন ঐতিহাসিকই করতে পারবেন না । ওপরুন্তু যে পদ্ধতিতেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হহাক না কেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির ‘অসিয়ত’ বা মনোনয়নও বৈধ হিসেবে স্বীকৃত লাভ করায় উত্তরাধিকারের রাজনীতি অধিকতর জটিল আকার ধারণ করে । শেষের দিকে আব্বাসী খলিফাগণ শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা হারিয়েছিলেন । কিন্তু তাদের ক্ষমতা ছিল অক্ষুণ্ন । কেননা খেলাফতকে রসুল (দ.) এর সম্পর্কিত মনে করে মুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপে আবেগজনিত কারণে তাদেরকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতা মনে করত । এমন কি বুয়াহিদ আমিরেরা– যারা খলিফাকে ‘পুতুল’ এ পরিণত করেছিলেন খলিফাকে বাহ্যত খুব সম্মান দেখাত এবং ক্ষমতাকে আইনগতভাবে সিদ্ধ বলে প্রমাণের জন্য খলিফার নিকট হতে খেতাব গ্রহণ করতেন । (যদিও তা স্বাধীনভাবে দেওয়ার অধিকার খলিফার ছিল না) । সুলতান মাহমুদের মতো দ্বিজয়ী সুলতানও খলিফা কাদির বিল্লার নিকট রাজকীয় সনদের প্রার্থনা করেন । খলিফা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাঁকে “ইয়ামীন উদ্দোলাহ ওয়া আমিনুল মিল্লাত” উপাধিতে ভূষিত করেন ।

সেলজুক সুলতান তুগ্রিল বেগ বাগদাদের আব্বাসী খলিফাকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং খলিফার নিকট হতে “সুলতানুল মশরিক ওয়া আল মাগরিব”অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক” মনে রাখতে হবে আল্লাহতা'লা তাঁর নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কোরআনের “রাব্বুল মাশরেকে ওয়াল রাব্বুল মাগরেবে বানে” অর্থাৎ উভয় পূর্ব ও উভয় পশ্চিমের মালিক হিসেবে ঘোষণা করেছেন । এই খেতাব দেয়ায় বোঝা যায় যে খলিফাগণ নিজেদেরকে প্রকাশ্যভাবেই “বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের মালিক” বলে ঘোষণা করতেন ।

হজরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রা.) এর দোয়ায় ১১৯২ সালে তারাইনের যুদ্ধে শিহাবুদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরি দিল্লি ও আজমিরের রাজা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করার মাধ্যমে পাক ভারত উপমহাদেশে তুর্কিদের নেতৃত্বে মুসলমানদের শাসনের সূচনা হয় । কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ইলতুতমিশ, নাসিরুদ্দিন প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ সুলতানের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এখানে কিছু কিছু ধর্মীয় কার্যক্রম চলতে থাকে । পরবর্তীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সুলতানগণ আল্লাহর অলিদের সাথে প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হন । ফলে ধর্মীয় পরিস্থিতির অবনতি হয় ।

তুর্কি আফগানদের পর ১৫২৬ সালে জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । বাবর ও হুমায়নের মৃত্যুর পর সম্রাট আকবর ১৫৫৬ সালে ক্ষমতাসীন হন । ইতোমধ্যে পারস্য মুসলমান রাজা ও সমাজপতিগণ তাতারি ও মঙ্গলগণ কর্তৃক রাজ্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি হারা হয়ে দিল্লি আগমন করতে থাকেন ।

ভারতবর্ষ মঙ্গল ও তাতারী আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ায় সমাজের সুধি ও নেতৃবৃন্দের মনে এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্যে মুগ্ধ ব্যক্তিরা সবসময়ই এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে থাকে। ফলে পারস্য সাম্রাজ্যের যাবতীয় দুষ্কর্ম এখানে প্রবল শক্তিতে লালিত পালিত হতে থাকে। এখানেও চলে বাদশাহদের 'খোদায়ি কর্তৃত্ব'। আমির ওমরাহ ও বিত্তশালীদের বিলাসিতা, অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জন ও অন্যায় পথে ব্যয় এবং জুলুম নির্যাতনের রাজত্ব অবাধে চলতে থাকে। খোদা সম্পর্কে গাফেলতি ও ধর্মের পথ থেকে দূরে অবস্থান করার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাদশাহ আকবরের শাসনামলে এই সকল প্রকার ধর্মীয় বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা তার শেষ সীমায় উপনীত হয়।

আকবরের দরবারে এ ধারণা অত্যন্ত প্রবল ও ব্যাপক ছিল যে ইসলাম মূর্খ ও অশিক্ষিতদের মধ্যে জন্ম লাভ করেছিল। তা কোন সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতির ধর্ম হতে পারে না। ওহি, হাশর-নশর, বেহেশত ও দোযখ প্রভৃতি ইসলামের মূল আকিদা-বিশ্বাস সমূহ বিদ্রুপের বস্তুতে পরিণত হয়। কোরআন খোদার কালাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হয়। ওহির অবতরণ বুদ্ধি বিরোধী গণ্য হয়। মৃত্যুর পর শাস্তি ও পুরস্কার অনিশ্চিত বলে বিবেচিত হয়। নবির 'মিরাজ' কে প্রকাশ্যে অসম্ভব গণ্য করা হয়। নবি করিম (স.) এর ব্যক্তিত্বের সমালোচনা করা হয়। বিশেষ করে তাঁর পবিত্র সহধর্মিনী সমূহের সংখ্যা ও তার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জেহাদ সমূহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আপত্তি করা হয়। এমনকি 'আহমদ' ও 'মুহম্মদ' শব্দও বিরক্তিকর ঠেকে এবং যাদের নামের সাথে এ শব্দদ্বয় যুক্ত ছিল, তাদের নাম পরিবর্তন করা হয়। বাদশাহ পূজারি আলেমগণ নিজেদের বই পত্রের ভূমিকায় তদানীন্তন রীতি ভঙ্গ করে নাতে রসুল লেখা বন্ধ করেন। শাহি দেওয়ান খানায় নামাজ পড়ার মত বুকের পাটা কারো ছিল না। দরবারি ফকিহ আবুল ফজল (বিখ্যাত আইন - এ-আকবরী বইয়ের লিখক) নামাজ, রোজা, হজ ও অন্যান্য ইসলামি ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি উত্থাপন করে এবং এগুলোকে উপহাস করে। খোদাদ্রোহী কবিকুল এসব ঐতিহ্যের নিন্দাবাদে - কাব্য/কবিতা রচনা করে।

এ সময়েই এ মত পেশ করা হয় যে মুহাম্মদ (দ.) এর পর এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এ দ্বীনের মেয়াদ ছিল এক হাজার বছর। তাই বর্তমানে এই দ্বীণ বাতিল হয়ে গেছে এবং এর স্থলে নতুন ধর্মের প্রয়োজন। তাই একটি নতুন ধর্মমত ও শরিয়তের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মকে মিলিয়ে একটি মিশ্রিত নতুন ধর্ম তৈরি করা। যাতে করে সরকারের শাসন শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ি হতে পারে। ফলে দরবারের তোষামোদকারী হিন্দুরা নিজেদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ভবিষ্যদ্বানী শোনাতে থাকে যে, অমুক যুগে একজন গোরক্ষক মহাত্মা বাদশাহ জন্ম লাভ করবেন। অনুরূপভাবে অর্থ পূজারি আলেমগণও আকবরকে মেহদি, যুগস্রষ্টা, মুজতাহিদ, ইমাম, প্রভৃতি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কেহ কেহ আবার আকবরকে আদর্শ মানব ও যুগনেতা হবার কারণে তাকে 'আল্লাহর প্রতিবিম্ব' বলে প্রচার করেন। সাধারণ মানুষকে বুঝাবার জন্য বলা হয় যে, সত্য ও সততা (বিশ্বজনীন সত্য) দুনিয়ার সকল ধর্মের মধ্যেই আছে, তাই কোন একটি মাত্র ধর্ম (ইসলাম) সত্যের ইজারদার নয়। কাজেই সকল ধর্মে যে সব সত্য আছে সেগুলির সমন্বয়ে একটি পুর্ণাঙ্গ পদ্ধতি প্রণয়ন করা উচিত। জনগণকে ব্যাপকভাবে সেদিকে আহ্বান করতে হবে। যাতে করে সকল ধর্মের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটে। এই পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির নাম 'দ্বীনে ইলাহী'। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আকবর খলিফাতুল্লাহ" এই নতুন ধর্মের কলেমা নির্ধারিত হয়। যারা নতুন ধর্মে প্রবেশ করতো তাদেরকে তাদের পিতা-প্রপিতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত দ্বীন ইসলাম থেকে তওবা করে 'দ্বীনে ইলাহী' - আকবর শাহি এর মধ্যে প্রবেশ করতে হতো। আর "দ্বীনে ইলাহীতে' প্রবেশ করার পর তাদেরকে 'চেলা' আখ্যা দেয়া হতো। সালামের পদ্ধতি পরিবর্তন করে নিয়ম করা হয় যে, সালামকারী আল্লাহু আকবর ও জবাব দাতা জাল্লে জালালুহু বলবে। মনে রাখতে হবে বাদশাহর নাম জালালুদ্দিন ও তার উপাধি ছিল আকবর। চেলাদের বাদশাহের চিত্র দেওয়া হতো তারা তা পাগড়ীতে লাগিয়ে রাখত। 'রাজা পূজা' ধর্মের একটি অঙ্গ ছিল। প্রত্যেক দিন সকালে বাদশাহর দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করার পর তাঁকে সেজদা করা হতো। এই ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করার সময় বলা হয়েছিল যে পক্ষপাতহীন ভাবে সকল ধর্মের ভালো কথাগুলো এতে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু আসলে ইসলাম ছাড়া প্রত্যেক ধর্মের কথা এতে স্থান

হয়। অগ্নি উপাসকদের নিকট থেকে অগ্নি পূজাকে গ্রহণ করা হয়। আরি মহলে “শিখা অনির্বাণ” জ্বালানো হয় এবং বাতি জ্বালাবার সময় সম্মানের সঙ্গে দাঁড়াবার রীতি প্রচলন করা হয়। খ্রিস্টানদের নিকট থেকে ঘণ্টা বাজানোর, তিন প্রভুর প্রতিকৃতির পূজা এবং এই ধরনের জিনিস গ্রহণ করা হয়। হিন্দু ধর্মের অনুশাসন এই ধর্মে বেশি চালু করা হয়। এ কারণেই গরুর গোশত হারাম ঘোষণা করা হয়। ‘দেওয়ালি’ ‘দশোহারা’ ‘রাখী’ ‘পূণম’ ‘শিবরাত্রি’ প্রভৃতিকে পূর্ণ হিন্দু রীতিতে পালনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিদিন চার বার সূর্যোপসনা করা হতো। সুর্যের এক হাজার নাম জপ করা হতো, কপালে তিলক কোমর ও কাধে পৈতা বাধা হতো। সুদ, জুয়া মদকে হালাল ঘোষণা করা হয়। দাড়ি চেঁছে ফেলার ফ্যাশন প্রবর্তন করা হয়। চাচাত ও মামাত বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। রেশম ও স্বর্ণের ব্যবহার বৈধ গণ্য করা হয়। শুকরকে শুধু পাই নয় বরং একটি অতি পবিত্র প্রাণী বলে ঘোষণা করা হয়। মৃত দেহকে কবরস্থ করার পরিবর্তে পুড়িয়ে ফেলা বা পানিতে ভাসিয়ে দেওয়াই উত্তম গণ্য করা হয়। আর কেহ যদি একান্তই কবরস্থ করতো তাহলে পদদ্বয় কেবলার দিকে স্থাপন করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হতো। আর নিজেই পদদ্বয় কেবলার দিকে রেখে শয়ন করতেন। দ্বীনি এলমের পরিবর্তে দর্শন, তর্কশাস্ত্র, অংক, ইতিহাস ও একই ধরনের অন্যান্য বিদ্যা সমূহ সরকারি সাহায্য লাভ করে। আরবি ভাষাকে ভাষার চৌহদ্দী থেকে বহিস্কৃত করার প্রস্তাবও ছিল। ভন্ড পির ব্যাপক প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। তারা নয়া প্লেটোবাদ, বৈরাগ্যবাদ, মনুবাদ ও বেদান্তবাদের সংমিশ্রণে এক অড়ত ধরনের দর্শন ভিত্তিক তাসাউফ শিক্ষা দিতে শুরু করে। তরিকত ও হকিকত কে ইসলামি শরিয়ত থেকে পৃথক করে পরস্পর সম্পর্কহীন করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এদের কথিত তরিকত বা মারফতপন্থী হলে তাদের শরিয়তি বিধি নিষেধ থেকে মুক্ত বিবেচনা করা হয়। ফলে হালাল হারামের সীমানা বিলুপ্ত, ইসলামি বিধি নিষেধগুলো কার্যত বাতিল এবং সমস্ত ক্ষমতা ইন্দ্রিয় লিঙ্গদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম ধর্মের পরিণতি কোথাও গিয়ে দাঁড়াতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। যাহোক, আর পরবর্তী সময়ে মুসলমান শাসকগণের আমলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। এবং ইসলামের অন্তনিহিত সদগুণগুলো সমাজে কিছুটা হলেও ঠাঁই ছিল।

উল্লেখ্য যে, মুগল সম্রাটগণ অত্যন্ত অকৃপণভাবে নিজেদেরকে ‘জাহাঙ্গীর’ তথা বিশ্ব ‘বিজয়ী’ ‘শাহজাহান’ ‘পৃথিবীর বাদশাহ’ ‘আলমগীর’ ‘বিশ্ব জয়ী’ খেতাবে নিজেদেরকে ভূষিত করতেন। এই সব খেতাবগুলো যে শাব্দিক অর্থেও যে সঠিক ছিল না তা বলাই বাহুল্য। শুধুমাত্র নিজেদের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী (সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী) একথা প্রমাণ করার জন্যই এই সব খেতাব তারা ধারণ করতেন।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে খলিফা হিসেবে যে সকল শর্ত ফকিহগণই নির্ধারণ করেছেন বা তার রসুল কর্তৃক তা নির্ধারিত হয়নি। তাই এগুলো পরিবর্তন বা সংশোধন করা তারা (ফকিহগণ) বৈধ বলে মনে করেন। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ বহু পুর্বেই ফকিহরা অগ্রাহ্য করে আসছেন। উল্লেখিত প্রেক্ষাপটে আমরা বিনা দ্বিধাই বলতে পারি এই রাজনৈতিক খেলাফতকে কোনক্রমে ধর্মীয়ভাবে বৈধ খেলাফত বলা যায় না। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে ও রসুলের (দ.) বাণীতে খেলাফত বা খলিফা শব্দের সাথে হেদায়েতের যে সম্পর্ক আছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে প্রচলিত অর্থে খলিফা বা রাজনৈতিক খেলাফতের কোন দূরতম সম্পর্ক নাই। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, হাদিসে বর্ণিত যে, খেলাফতের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত জায়েজ ও কায়েম থাকবে মর্মে ঘোষণা আছে। এই রাজনৈতিক খেলাফত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তা পালন করতে পারেনি। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির পর এই ধর্মীয় কার্যক্রম কিভাবে চালু থাকবে সে ব্যাপারে ফকিহগণ কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারেননি। তাই উপরোক্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করে বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, মূলত এটা মুসলমানদের একটি অভিনব রাজনৈতিক কর্মপন্থা যার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বর্ণিত খেলাফত বা এসব রাজা বাদশাহ কোনক্রমেই রসুলের সঠিক খলিফা হিসেবে দাবি করার অধিকারী ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে রসুল (দ.) এর আহলে বায়াতের মহান ব্যক্তিগণই রসুলের প্রকৃত খলিফা হিসেবে আল্লাহত’লা কর্তৃক প্রদত্ত এই পবিত্র আমানত দুনিয়ার বুকে চালু রেখেছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধর্ম ও আধুনিকতা

আইন ও সমাজ একে অপরকে প্রভাবিত করে। আইন সমাজ বদলায়, আবার সমাজও আইন বদলায়। আইনের বিকাশ যখন সামাজিক বিকাশ থেকে আপনা আপনি উত্থিত হয় তখন পরিবর্তন আসে ধীরে, অলক্ষ্যে, অনায়াসে ও অঘোষিতভাবে। কিন্তু আইন যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজ বিবর্তন থেকে বেরিয়ে আসে এবং যখন তা বিশেষ ফল লাভের জন্য সমাজের ওপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন অযাচিত এ আইন ও সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ভাল হোক আর মন্দই হোক, সে সংঘর্ষ মহা সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে থাকে। সমাজে নুতন আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইন বাতিল করনের প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে (১) মানুষের মন ও মস্তিষ্কে যে মৌলিক ও ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে চরিত্র গঠিত তার ওপর (২) মানবিয় মন মানসকে কোন ছাঁচে ঢালাই করা হচ্ছে বা প্রচলিত সমাজ দর্শন, মানুষের চিন্তা চেতনায় যে ভাবধারা সৃষ্টি করে তার উপরে (৩) এই ভাবধারায় অন্তর্নিহিত যে শক্তি কার্যকর থাকে, তা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে এক বিশেষ ধরনের বাস্তব জীবন ধারার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মানুষের কর্মশক্তি তার চিন্তা শক্তিরই প্রভাবাধীন। যে চেতনা তার হাত-পা'কে গতিশীল করে তোলে তা' উৎসারিত হয় তার মন ও মস্তিষ্ক থেকে। আর যে বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা তার মন ও মস্তিষ্কের ওপর ক্রিয়াশীল হয়ে চেপে বসবে, তার সমগ্র কর্মশক্তি ঠিক তারই প্রভাবাধীনে সক্রিয় হয়ে উঠবে। অন্য কথায় তার মন মানস যে ছাঁচে গড়ে উঠবে তার ভেতর আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা, স্পৃহাও ঠিক তেমনি সৃষ্টি হবে এবং তারই আজ্ঞাধীনে তার অংগ প্রত্যঙ্গগুলো কাজ করতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোন জীবন দর্শন একটি মৌলিক বিশ্বাস বা বুনিয়াদী চিন্তাধারা ছাড়া প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে না। কোন জীবন দর্শনকে বুঝতে এবং তার মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমত তার বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে বুঝা এবং তার উৎকর্ষ-অপকর্ষ পরিমাণ করা প্রয়োজন-যেমন কোন ইমারতের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের কথা জানতে হলে তার ভিত্তির গভীরতা ও দৃঢ়তার কথা জানা আবশ্যক।

মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে হলে মানবের মনে আবহমান কাল থেকে যে সকল প্রশ্ন জেগেছে তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনে যখনই মানুষ কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে তখনই তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে - কেন ? নানা উপায়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষ এই কেন'র উত্তর খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছে। জ্ঞানের উন্মেষে চোখ মেলে মানুষ তার সামনে দেখেছে এই বিরাট বিশ্ব। অনন্তরূপী বিশ্বের মাঝে মানুষ দিশাহারা হয়ে গেছে। মানুষ ভেবেছে এই বিশ্ব কি ? কে এই বিশ্ব সৃষ্টি করলো? সৃষ্টির মূলে অতি প্রাকৃতিক কিছু রয়েছে কি ? থাকলে তা-কী এবং কী-ই বা তার রূপ ? সৃষ্টির লক্ষ্য কী ? নিত্য পরিবর্তনশীল কী এই বিশ্ব ? সুতরাং চোখ মেলে মানুষের সৃষ্টি পথে যা পড়েছে, তাই নিয়েই তার প্রথম প্রশ্নের ধারা।

এই বিশ্বের মাঝে মানুষের বাস, অন্য প্রাণীরও বাস। এই বিশ্বে মানুষ দেখে তার সামনে আরও মানুষ, আরও প্রাণী। বিশ্বের মাঝে মানুষ জন্ম নিচ্ছে, মারা যাচ্ছে আবার নুতন মানুষ জন্ম নিচ্ছে আবার তাদেরও মৃত্যু হচ্ছে। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়াল মানুষের মনে– এই বিশ্বে মানুষের স্থান কোথায় ? অসীম অনন্ত এই বিশ্বের মাঝে মানুষ কী কেবলমাত্র ক্রীড়নক? কতখানি ক্ষমতা মানুষের ? তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা কি ?

বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে অতি সাবধানে এই পৃথিবীর পথে অগ্রসর হতে হয়। যে পথ ভালো, ভালো বলে যা মনে হয় তাই বেছে নিতে হয় মানুষকে। মন্দকে পরিহার করতে হবে সযত্নে। এই ভালো-মন্দের বিচারই আইনের দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোনটা ভাল, আর কোনটাই বা মন্দ ? ভালো-মন্দের মানদন্ড কি ? কেই বা ভাল মন্দ বিচার করছে। ভাল মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ের উপায় বা কি ? আজকের যা ভাল তা' কি ভাল চিরকালের জন্য, আজকেরে যা মন্দ তাকি মন্দ চিরকালের জন্য ? বিচারের শক্তিই বা মানুষ পেল কোথা

থেকে? এই বিচার কি ঐশি নির্দেশের আলোকে করতে হবে, না মানবিয় সীমিত বুদ্ধির মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে তাও মানুষের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

প্রকৃতি ও জীবন যুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষ হতাশ হয়েছে তখন ভেবেছে ভাগ্যের কথা। ভাগ্য সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে প্রশ্ন জেগেছে ভাগ্য কি? ভাগ্যই সত্য না সত্য মানুষের স্বাধীন চিন্তা। মানুষের ভবিষ্যত কী একান্তভাবে মানুষের ওপর নির্ভরশীল না ভাগ্যই মানুষের প্রকৃত পরিচালক।

জন্ম নেয় মানুষ, ধীরে ধীরে তার বয়স বাড়তে থাকে, মৃত্যুই তার স্বাভাবিক শেষ পরিণতি। কি হয় মানুষ মৃত্যুর পর ? মানুষ কী আবার অন্য আকারে জন্ম নেয় ? তার অর্থ মানুষের মধ্যে আত্মা বলে কি কিছু আছে, যা তার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে ? প্রকাশ পায় অন্য মূর্তিতে ? তাই যদি হয় তবে নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা মরেনা, তবে কি এই আত্মা অমর, মৃত্যুর পর দেহ জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করে কোথায় চলে যায় এই আত্মা? তবে কি ইহ জগত ছাড়া অন্য কোন জগত আছে যেখানে অন্য দেহে প্রবেশ করার আগে আত্ম বাস করে কিছু কাল ? কি পরিণতি এই আত্মার ? ইহ জগতের পর অন্য জগতে কি এই আত্মা তার মানুষ রূপে কৃত ন্যায়ের জন্য পুরস্কৃত ও অন্যায়ের জন্য তিরস্কৃত হয় ? কে বিচারক এই ন্যায় অন্যায়ের ?

মানুষ সামাজিক জীব, সমাজের মধ্যে বাস করতে হলে মানুষকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়। সমষ্টিগতভাবে মানুষ সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য নানা আইন প্রণয়ন করে। সামাজিক রীতি-নীতি আচার ব্যবহার ইত্যাদি মানুষকে প্রভাবান্বিত করে। এই সমষ্টিগত জীবনই মনুষ্য সমাজ। মিলিতভাবে মানুষ রাষ্ট্রের পত্তন করে। রাষ্ট্রের নেতা হয় অধিনায়ক। মানুষ ভাবে রাষ্ট্র বস্তুটি কি? কি সম্পর্ক আছে রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের ? রাষ্ট্র কি সত্যিই মানুষের সৃষ্টি, না এর মূলে আছে অতি প্রকৃতিক সত্তার অদৃশ্য নির্দেশ। রাষ্ট্রের অধিনায়ক কি অতি প্রাকৃতিক সত্তার প্রতিনিধি। যদি তাই হয় তাহলে তার নিয়োগের পদ্ধতি বা কি ? অথবা রাষ্ট্রের অধিনায়কদের নিয়োগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কি হওয়া উচিত? রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ মানুষের করা উচিত কি ? এই বিরুদ্ধাচরণ কি অতি প্রাকৃতিক সত্তার বিরুদ্ধাচরণ নয়?

রাষ্ট্রের উপযুক্ত হতে হলে মানুষের প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন, কি রীতি হওয়া উচিত শিক্ষার, শিক্ষার পাঠ্যসূচী কি হওয়া উচিত, শিক্ষা বলতে কি বুঝায়, শিক্ষাই কি সংহত চিন্তার সহায়ক ? চিন্তার বিষয়ে মানুষের প্রশ্ন কোথা থেকে মানুষ পায়, চিন্তার খোরাক অতি প্রাকৃতিক সত্তাই মানুষের মনে চিন্তা যোগায়, না মানুষের চিন্তার খোরাক গ্রহণ করে বাহ্যিক জগত থেকে, চিন্তা কী মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয়, চিন্তা ছাড়া মানুষ কি বাঁচতে পারে ?

অনাদিকাল থেকে সভ্য-অসভ্য, সৎ-অসৎ, মুসলমান-হিন্দু-খ্রিস্টান-ইহুদি-জৈন বৌদ্ধ-জরাথুষ্টিয়ান-কনফুসিয়ান তথা পৃথিবীর সকল কালের জনগোষ্ঠী এইসব প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে গবেষণা করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে এ কোন তাত্ত্বিক বা দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া নয় বরং মানব জীবন দর্শন সৃষ্টির উপাদান এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তরের মধ্যেই নিহিত। এইসব প্রশ্নের উত্তরের সাথে মানব জীবনের সকল কর্মকান্ডের অন্তর্নিহিত এক যুক্তি ভিত্তিক সম্পর্ক আছে। তাই এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা অবশ্যই প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, মানবিয় বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে এই প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে পৃথিবীর সকল দেশের সব ভাষাভাষীর নবি-রসুল, অবতার-প্রফেট বা আওলিয়া বা পবিত্র চিত্ত ও চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিগণ এসব প্রশ্নের আবহমান কাল থেকে অভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের ঈমানের ভিত্তিই এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ওপর নির্ভরশীল। এইসব মহান ব্যক্তিগণ যে পদ্ধতিতে এই সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, তা হচ্ছে। ওহি বা ঐশি জ্ঞান - বিশ্ব স্রষ্টার সাথে মানব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের এক নিবিড় সম্পর্ক ভিত্তিক জ্ঞানের উৎস। পক্ষান্তরে এইসব মহা মানবের চিন্তাধারা ও চরিত্রের মাধুর্য উপেক্ষা করে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ, আইনবিদ, গবেষক, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ নিজ নিজ ক্ষেত্রের অপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে এইসব প্রশ্নের উত্তর বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এদের প্রদত্ত ভুল মতবাদ বা চিন্তাধারাই পৃথিবীর সকল ধর্মের ভিত্তি মূলে আঘাত করে বর্তমান বিশ্ব মানবতার বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এইসব প্রশ্নের উত্তর কিভাবে মানব সমাজকে প্রভাবিত করছে, তা'সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে–

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, গ্যাস ও ধূলিকণার সমন্বয় থেকেই এই বিশ্ব জগতের উৎপত্তি। গ্যাসের প্রচন্ড বিস্ফোরণ থেকেই বিশ্ব জগতের উৎপত্তি। গ্যাসের প্রচন্ড বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট প্রবল ঘূর্ণায়মান সত্তা বিশাল ছায়াপথের জন্ম দিয়েছে। এক একটি ছায়াপথে রয়েছে কোটি কোটি তারকা এবং গ্রহ যার মধ্যে আমাদের এই পৃথিবী একটি। পৃথিবীর বিনির্মান কাল অথবা তার পরে রসায়ন ও বৈদ্যুতিক শক্তিসমূহ হঠাৎ করে জড়পিন্ডের সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে প্রাণের আগমন ঘটে এবং এইভাবে জীবের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব হয় পৃথিবীতে। প্রাথমিক জীব প্রকৃতি এক কোষীয় জীব অবস্থা থেকে ক্রম বিকাশের পথে প্রবৃদ্ধি লাভ করার মাধ্যমে বহু কোষীয় জীবে পরিণত হয়।

বহু কোষীয় জীবের সরীসৃপ জাতীয় কিছু কিছু প্রাণী সমুদ্র থেকে ওঠে এসে স্থলভাগেও বাস করতে শুরু করে এবং কিছু কিছু আকাশে উড়তে চেষ্টা করে ও পাখিতে পরিণত হয়। এসব ঘটতে থাকে প্রজাতিসমূহের পাইকারী প্রজননক্রিয়া এবং পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। এই বিবর্তনবাদ অনুসারে টিকে থাকার অনুপযুক্ত যারা তাদের অস্তিত্বই হারিয়ে যায়, আর যারা টিকে থাকার উপযুক্ততা প্রমাণ করে তারা দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং তাদের স্বজাতি আরও অনেকের জন্ম দিয়ে যায় । লক্ষ লক্ষ বছরের এই বিবর্তন প্রক্রিয়া জীবকুলকে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট প্রজাতিতে বিভক্তি করে এবং একই জাতি দেহে বিভিন্ন গ্রুপের আবির্ভাব ঘটায়।

সরীসৃপ জাতীয় প্রজাতি থেকে স্তন্যপায়ী জীবের উদ্ভব ঘটে। আর স্তন্যপায়ী জীব থেকে বানর জাতীয় বৃক্ষচারী জীবের প্রকাশ ঘটে। বিবর্তনের এক পর্যায়ে এই বৃক্ষচারী প্রাণীরা বৃক্ষ থেকে মাটিতে নেমে আসে এবং ক্রমে হাঁটার জন্য পা ব্যবহারের পরিবর্তে খাড়া হয়ে শুধু দু'পায়ের ওপর হাঁটতে শিখে। হাঁটার কাজ থেকে হাতের এই মুক্তি, হাতকে অন্য ধরনের কাজ করার সযোগ এনে দেয় যা ক্রমে মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটায় এবং এইভাবে ধীরে ধীরে চিন্তা করতে এবং কথা বলতে সমর্থ হয়ে মানুষের বিকাশ ঘটে। কিন্তু সে অবস্থাতেও বানরের কিছু বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকে। লাখ লাখ বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রাথমিক মানুষের মস্তিস্কেরও যোগ্যতার উন্নতি হয় এবং তাদের বানর জাতীয় কিছু বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্ত ঘটে। পাথর যুগ অতিক্রম করে বিকশিত জ্ঞান দ্বারা সে ক্রমে ধাতুর ব্যবহার শিখে এবং মিসর ও মেসোপটমিয়ার এক মহান সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করে। এই সময় থেকে লেখার জ্ঞান এবং ঐতিহাসিক উপকরণাদি সংগ্রহের প্রাথমিক কৌশল মানুষের করায়ত্ত হয়, লিখিত ইতিহাসের যাত্রা এখান থেকেই শুরু।

এধারণার বৈজ্ঞানিক বা সঠিকতা বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন পর্যালোচনায় না গিয়ে এই মতবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যে দর্শন কাজ করছে, তা অবহিত হওয়া দরকার। পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা তাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, পরিকল্পনা সম্পর্কে যদি আন্তরিক হন, তাহলে যেহেতু তারা স্রষ্টাকে পরিষ্কার করে হাজির করতে পারেননি, তাই হয় তাদেরকে স্রষ্টার অস্তিত্বে পুরোপুরিই অবিশ্বাস করতে হবে অথবা বিষয়টির ওপর বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুই না করে নির্বিকার থাকতে হবে এই বলে যে, বিষয়টির বৈজ্ঞানিক কোন সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু তারা সকল যুক্তি প্রমাণ অগ্রাহ্য করে নিজস্ব বিজ্ঞান তত্ত্বের দোহাই দিয়ে বলেছেন অবচেতনভাবে এক সময় জগত নিজেকে নিজেই সৃষ্টি করে নিয়েছে। একে আমরা অবশ্যই এক ধরনের অন্ধ বিশ্বাস বা গোঁড়ামী বলব যা অন্যান্য সব কুসংস্কারের মত বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত ও সমর্থিত নয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে এ ভুল মতবাদ আমেরিকা ও ইউরোপের পুঁজিবাদীগন এবং রাশিয়া ও চীনের সমাজতন্ত্রের চিন্তা নায়কগণ সমানভাবে সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে থাকেন। বস্তুতপক্ষে সমগ্র পাশ্চাত্য তথা আধুনিক সভ্যতা বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির এই মতবাদ দৃঢ় ও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে। অথচ তা বৈজ্ঞানিকভাবে সুপ্রমাণিত নয়।

বিশ্ব জগতের সূচনা :

বিশ্ব জগতের সূচনা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যেসব বিষয়ে কথাবার্তা বলেন সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। এর প্রথম কারণ বিশ্ব জগতের বিশালতা। দ্বিতীয়ত, ঘটনাটি ঘটে গেছে এতদূর অতীতে যে সেখানে বিজ্ঞানীর জ্ঞান চক্ষু পৌঁছার কোন উপায় আজ আর নেই। প্রসঙ্গত বিজ্ঞানীদের একটি তত্ত্বের প্রবর্তন এবং বাতিল করণের প্রক্রিয়া এত দ্রুত সংগঠিত হয় যে কোন বিজ্ঞানী কখন কি বলেন তা খোজ রাখাই এক দূরুহ ব্যাপার।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ষাট দশকেও বিজ্ঞানীরা দৃঢ়ভাবে এ মত পোষণ করতেন যে, বিশ্ব সৃষ্টির কোন সূচনা কাল নাই। চিরদিনই বর্তমানের মত সৃষ্টি ও বিলুপ্তির স্থিতাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পরে আরেকটি তত্ত্ব ক্রমে এই তত্ত্বটিকে বাতিল করে দিয়ে বলেছে, বিরাট এক বিস্ফোরণ থেকে বিশ্ব জগতের সৃষ্টি। পরবর্তীতে এই তত্ত্বের নাম দেয়া হয়েছে Big Bang তত্ত্ব। আরও একটি উদাহরণ নেয়া যাক। বিশ্বের বয়স সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা পূর্বে যে হিসেব দিয়েছিলেন তা ভুল বলে বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বয়স সম্পর্কে তারা আগে যা বলেছিলেন বিশ্বের প্রকৃত বয়স তার অর্ধেক মাত্র। এ ব্যাপারে বর্তমানে যে মতবাদ বা হিসেব চালু আছে, তা যে কোন সময়ে বাতিল হতে পারে, যা সব সময় খেয়াল রাখতে হবে।

বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে তারা মনে করেন যে, বিশ্ব জগত একটি বিস্ফোরণের ফল হিসেবে যাত্রা শুরু করে। কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে সেই বিস্ফোরণটা কিসের যা কিছুই নয় কিংবা যার কোন অস্তিত্ব নেই, তার তো কোন বিস্ফোরণ ঘটতে পারে না। তাহলে ঐ যে বিস্ফোরণ ঘটল তার সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু এবং শক্তি কোত্থেকে এল ? বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব। আমরা পরমাণুর কথা বলি। আমরা দালান কোঠা সহ যা কিছু দেখি এমন কি আমাদের দেহ পর্যন্ত সবই পরমাণুর যোগফল। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই পরমাণু এলো কোত্থেকে? বিজ্ঞানীদের কাছে এরও কোন জবাব নেই। যেহেতু অনেকের বিশ্বাস ও বিশ্ব দর্শন স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাই তারা বাধ্য হয়েই আভ্যন্তরীণ একটি যুক্তির অবতারনা করে বসে। এক্ষেত্রে তারা যা বলেন তার অর্থ এরূপ দাঁড়ায় ও বস্তু ও শক্তিরাজি নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেছেন এবং দূর্ঘটনার মতই বিশ্ব জগতের জন্ম দিয়ে বসেছে। দূর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিমা বিশ্বের অনেকেই এমন একটি বাজে ও ভিত্তিহীন চিন্তাধারা নিয়ে সামান্য চিন্তাভাবনাও করেন না এবং একে ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করেন। বিনা বিচারে এই রহস্যটাকে যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনি এইভাবেই অতীতে তারা তাদের রহস্যময়তাকেও গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থেকেছেন।

জীবনের সূচনা :

জীবন ও জীবের সূচনা সম্পর্কে পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন যে কিছু ছিল না, সেখান থেকেই বস্তু ও শক্তির উদ্ভব ঘটেছে। তারপর তারা বলেন, বিশ্ব জগত অস্তিত্ব লাভের কোটি কোটি বছর পর কোটি কোটি ছায়াপথের মধ্যে একটি তারকার (আমাদের সূর্য) চারদিকে ঘূর্ণায়মান এগারটি গ্রহের একটি পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব ঘটল। কে কিংবা কি এই আবির্ভাব ঘটাল ? উত্তরে বলা হলো জীবন সূচনার শর্তাবলী তখন বর্তমান ছিল– যেমন তাপ ছিল যথাযথ। আলোর বিকিরণ ছিল যথোপযুক্ত এবং পানি ও গ্যাস ছিল যথামাত্রায় এবং তারপরেই জীবনের আবির্ভাবের মত এই মহা ব্যাপার ঘটল। আরও বলা হলো এনার্জি ও কেমিকেলের সম্মিলন নতুন সৃষ্টি করল, সৃষ্ট জীবাণু ও জীবিত বস্তু থেকে পান করে বর্ধিত হয়ে এবং নতুন সৃষ্টি করে মৃত্যু বরণ করল। নতুন সৃষ্টির আবার শিল্পীর মত নুতন সৃষ্টির আবির্ভাব ঘটলে যা' আবার পরবর্তীকালে অন্যদের মাঝে জীবনের আগুণ ছড়িয়ে যাবে তার শেষ সময়টুক পর্যন্ত। তারা মনে করে কেমিকেলের সেই আদি সৃষ্টি উলম্ভনটির মূলে বাইরের কোন কারণ নেই এবং নেই কোন উদ্দেশ্যও। মানুষ-সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, ফুল, গাছ-পালা, ঘাস ঢাকা মাঠ, রাত দিনের, জন্তু জানোয়ার প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারে এবং ধারণা করতে পারে যে মানুষই এই প্রাণীকুলের প্রভূ এবং এদের নামকরণও সেই করেছে এবং সেই এদের ব্যবহার করছে। তবু মানুষ মনে করে যে ঘটনায় এসব কিছুর জন্ম দিয়েছে এবং এমন বিরাট ও অসাধারণ সব কার্যকরনের সৃষ্টি করেছে তার মূলে কোন কারণ নেই, উদ্দেশ্য নেই।

আধুনিক চিন্তাবিদদের মতবাদ ও তার অসংগতি :

রেনে ডেকার্ট (DESCARTES) পরীক্ষা মূলক পদ্ধতির উন্নয়নের ওপর গবেষণা চালান। অপরদিকে জ্ঞাত জিনিসের প্রমাণের পরিবর্তে নতুন সত্য আবিষ্কারের জন্য ফ্রান্সিস বেকন, অ্যারিস্টটাল ও মধ্যযুগীয় পন্ডিত দার্শনিকদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গবেষণা শুরু করেন। ডেকার্টের মত পশ্চিমা দার্শনিকদের কাছে প্রকৃতি আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যহীন যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষসহ সকল জীবন্ত প্রাণী স্বয়ংক্রিয় রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। তিনি দম্ভপূর্ণ উক্তি করে বলেছেন– "আমাকে উপাদান দাও, আমি বিশ্ব সৃষ্টি করবো।"

অপরিবর্তনীয় গাণিতিক আইনে সমগ্র সৌরজগত পরিচালিত হয়– নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭) এর এই মতবাদে আত্মহারা হয়ে তথাকথিত 'আলোক প্রাপ্ত যুগের' প্রবক্তারা প্রচার করেছেন মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের

বিপরীত সকল বিশ্বাস পরিহার করতে হবে। ভাগ্য, নবি-রসুলদের সকল আদেশ নির্দেশ ও ভবিষ্যত বাণীসহ (দোজখ-বেহেশত-পরকাল) সকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে কুসংস্কার বলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছে।

ফরাসি বিপ্লবের প্রখ্যাত তাত্ত্বিক ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) বলেছেন, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন প্রকার চিন্তা না করেই ঘড়ি সংযোজনকারীর মত ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। হিউম (১৭১১-১৭৭৬) সকল ধর্মীয় বিশ্বাস এই বলে বাতিল করেছেন যে, এগুলো বিজ্ঞান বা মানবিয় প্রজ্ঞার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। তিনি ভলতেয়ারের প্রত্যাদেশ ওহি ক্ষমতাহীন ঈশ্বরকে আক্রমণ করে বলেছেন : আমরা ঘড়ি বানাতে দেখেছি কিন্তু পৃথিবী বানাতে দেখিনি। যদি পৃথিবীর কোন মালিক থাকেন তিনি অনুপযুক্ত কর্মী অথবা কাজ সমাপ্ত করে তিনি অনেক আগে মারা গেছেন বা তিনি পুরুষ অথবা মহিলা ঈশ্বর বা অনেক সংখ্যক ঈশ্বর আছে। তিনি সম্পূর্ণ ভাল, সম্পূর্ণ খারাপ অথবা দুই বা কোনটাই নয় । সম্ভবত তিনি খারাপ। পরকালের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হিউমের যুক্তি হচ্ছে, কোন জীবন সম্পর্কে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন যুক্তি নাই যে, যেখানে মানুষের ফেলে যাওয়া জীবনের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। গণিত যেমন ধর্মতত্ত্ব ও মানব জ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে স্বাধীন, ঠিক নৈতিকতাও একটি বিজ্ঞান।

রুশো ও DIDEROIT এর মত দার্শনিকেরা সম্মত হয়েছেন যে, ব্যবহার এবং সুখই নৈতিকতার একমাত্র মান নির্ণয়ক। সংঙ্গীদের ন্যায্য অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত না করে মানুষের উচিত যতো বেশি সম্ভব আনন্দ ও সুখ প্রত্যাশা করা।

অতীতের সকল বিশ্বাসকে ভ্রান্ত জ্ঞান ও ধ্বংস করে এইসব 'অতি বুদ্ধিমান' ব্যক্তিত্বরা বিশ্বাস করলেন যে, সর্বজনীন গণশিক্ষা যে বুদ্ধি ও বিজ্ঞান প্রচার করেছে তাতে বিশ্বে একটি সত্যিকার স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে। নিজের ভাগ্য রূপ দেওয়ার বৈজ্ঞানিক যাদু এখন মানুষের করায়ত্তে রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে স্বাধীনতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য এবং সার্বজনীন শান্তি বিরাজ করবে। ক্রমবর্ধমান জ্ঞান মানব জীবনকে দীর্ঘায়িত করবে এবং সকল রোগ কষ্ট নিঃশেষ করে দেবে। প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এই বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করেছে যে, কোন অলৌকিক সাহায্য (SPIRITUAL GUIDANCE/ DIVINE BOOK /THEACHINGS OF THE PROTHETS) ছাড়াই বিশ্বে মানব জীবন পরিপূর্ণতা অর্জন করবে।

ডারউইন (১৮০১-১৮৮২) পন্ডিমা দার্শনিকদের বুঝালেন যে মানুষ অন্যান্য পশুর মতই একটি সাধারণ স্তন্যপায়ী প্রাণী। উইলিয়াম জেমস (১৮৪২-১৯১০) বিবেক অথবা মনের অস্পষ্ট ধারণার মূল্য সম্পর্কেও প্রশ্ন তুললেন। তাঁর মতে এটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় ফল ও স্নায়ুর ওপর বাইরের চাপের ফলে সব কিছুর সৃষ্টি। মনস্তাত্ত্বিক পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) কুকুর, বানর ও গরিলার ওপর গবেষণা চালিয়ে মানুষের ব্যবহারের কার্যকারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

ফ্রয়েড (১৮৫৯-১৯৩৬) মানুষের অসংগত ব্যবহারের মূলে আবিষ্কার করলেন শৈশব অবস্থায় অপরিণত মস্তিষ্কের ওপর চাপ। ফ্রয়েড বললেন, ছোট শিশু তার মা-বাবার অনুসরণ করে। কারণ তারা তার জীবন দিয়েছেন, কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। সুকৃঙ্খল থাকতে বাধ্য করেছেন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর পর ধর্মীয় আচার-আচরণের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির ভয় দেখালেন। ধর্ম মানুষের তৈরি নৈতিকতা অবিসংবাদিত নয় বরং আপেক্ষিক। এই ধারণা ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ও নৃতত্ত্বের ছাত্রদের কাছে খুব ভাল লাগলো। ফ্রয়েড আরও বলেন, "এটা সত্য নয় যে বিশ্বে এমন একটি শক্তি আছে, যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কল্যাণ দেখাশুনা করেন এবং তাদেরকে আবার নিজের কাছে ফিরিয়ে নেন। আদতে মানুষের ভাগ্য সার্বজনীন ন্যায় বিচারের নীতির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। ভূ-কম্পন, বন্যা এবং আগুণ, সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ এবং পাপী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য করেনা। এমনকি সমস্ত খারাপ লোক ও ভাল লোকগুলো পৃথক থাকলেও আমরা কোন অবস্থায় দুষ্টদের শাস্তি পেতে এবং গুণীদের পুরস্কৃত হতে দেখি না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় খারাপ ও অসৎ লোকেরা যা'চায় তাই পায় কিন্তু ধার্মিকেরা শূন্য হাতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। মায়া মমতাহীন, দাম্ভিক শক্তিই মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে। ধর্ম যে ঐশ্বরিক ন্যায় বিচারের শাসনের কথা বলে তার কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয়না। বিজ্ঞানের প্রাধান্য যতই অস্বীকার করা হোক তাতে প্রকৃতি ও বহিঃবিশ্বের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা পরিবর্তীত হবে না। অপরদিকে ধর্ম একটি বালকসুলভ মায়া বিভ্রম। আমাদের

সহজাত আকাঙ্ক্ষতেই তার শক্তি নিহিত।” (FREUD: GREAT THINKERS OF THE WESTERN WORLD ENCYCLOPEDIA BRITANICA)

কার্ল মার্কসের হাতে বস্তুবাদী দর্শন চূড়ান্ত রূপ পেলো। তাঁর মতে, মানব ইতিহাসের সমাজ ও সংস্কৃতির সব দিই অর্থনৈতিক কার্যকারণের ফলশ্রুতি। ব্যক্তি বিশেষ তার চারিদিকের ঘটনাবলীর সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুগত পরিবেশের গতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার পেছনে মার্কসের মতবাদের বিরাট অবদান রয়েছে। বার্ট্রান্ড রাসেল বস্তুবাদী দর্শন তুঙ্গে পৌঁছে দেন। তিনি লেখেন ও মানুষ কার্যকারণের সৃষ্টি, তার প্রাপ্তির শেষ নাই। তার জন্ম, বৃদ্ধি, আশা, ভয়, ভালোবাসা, বিশ্বাস অণুর বিন্যাসের ফলশ্রুতি।

শোফেন হাওয়ার বস্তুবাদী দর্শনের যৌক্তিক সমাধান টানলেন। তার কাছে জীবনের অস্তিত্ব লক্ষ্যহীন, চঞ্চল তৎপরতা সম্পূর্ণ অলৌকিক শক্তি। সকল আকাঙ্ক্ষার মূলে রয়েছে প্রয়োজন, ঘাটতি এবং তাই কষ্টকর। (Makers of modern mind R and All, Columbia University Press, November, 1930)

এসব বিজ্ঞানীদের এ মতবাদ স্বীকার করে নিলে পার্থিব জীবনের পর অপর কোন জীবনের (পারলৌকিক) প্রয়োজনীয়তা আছে বলে স্বীকার করার কোন যুক্তিসংগত কারণই থাকে না। কারণ যে বিশ্ব জগতের ব্যবস্থাপনা কোন অজ্ঞ, নির্বোধ ও অচেতন প্রকৃতির দ্বারা কোনরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াই চালিত হচ্ছে, তার মর্যাদা একটি খেলনার বেশি কিছু হতে পারে না, যে বিশ্ব উদ্দেশ্যহীন এবং উদ্দেশ্যহীনতা পূর্ণতা লাভ করলেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে। এহেন অন্ধ প্রকৃতির পক্ষে ন্যায়পরায়নতার গুণে বিভূষিত হওয়া এবং তার কাছ থেকে কোন হিসেব কিতাবের প্রত্যাশা করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, যদি আল্লাহর অস্তিত্ব অনির্দিষ্ট বা সংশয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সমাজের প্রচলিত নৈতিক ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধ সম্পূর্ণরূপে বদলে ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য এবং সমগ্র নৈতিক ব্যবস্থা স্বার্থপরতা ও আত্মপূজার কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ ধরনের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় সৎ কাজ হবে পার্থিব কল্যাণের সমার্থক আর দুস্কৃতি হবে বৈষয়িক ক্ষতির নামান্তর। অর্থাৎ সত্য কথা বলা হলে কর্মস্থলে নিয়োগকর্তা খুশি হবে এবং পদোন্নতির আশা থাকা এবং মিথ্যা কথা বললে নিয়োগকর্তা তিরস্কার বা শাস্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে দোকানের কর্মচারী মিথ্যা কথা বলে ক্রেতাকে ঠকিয়ে মালিককে খুশি করবে এবং দোকানের মালিক কর্তৃক পুরস্কৃত হবে। এহেন পরিস্থিতিতে পাপ পুণ্যের সমস্ত কনসেপ্টই বদলে যাবে বা যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এ ধরনের নৈতিকতা পশুত্বের পর্যায়ে না নেমে উপায় থাকছে না।

অনেকে বলতে পারেন যে, শাস্তি ও পুরস্কারের জন্য পার্থিব জীবনে শুধু বৈষয়িক লাভালাভই নয় বরং মানুষের মধ্যে বিবেক নামক একটি শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। তার পীড়ন, তার আর্তনাদ ও দুনিয়ার দুস্কৃতির জন্য শাস্তি হিসাবে যথেষ্ট। আর প্রশান্তি বা আত্মতৃপ্তি মানুষের সৎ কাজের জন্য যথেষ্ট পুরস্কার। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, দুনিয়ার বহু রকম কুকর্ম আছে যার বৈষয়িক সুবিধা ও দৈহিক তৃপ্তি বা আনন্দ লাভের জন্য মানুষ বিবেকের দংশন সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আবার অনেক সৎ কাজ আছে যার জন্য এমন আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয় যার জন্য শুধুমাত্র বিবেকের প্রশান্তিই তার যথেষ্ট পুরস্কার হতে পারেনা। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র আত্মতৃপ্তির জন্য সৎ কাজ করা ও এ ধরনের প্রবৃত্তির দাবি পূরণ করা হয়, যা এক ধরনের মানসিক স্বার্থপরতা ও লোক দেখানো কাজ হিসাবেও করা হতে পারে।

বিবেকের প্রকৃতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কোন সুনির্দিষ্ট নৈতিক বা সামাজিক বা অর্থনৈতিক মতাদর্শ সৃষ্টি বা প্রণয়ন করা এর কাজ নয়। বরং এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের ফলে যে নৈতিক আদর্শ মানব মনে প্রবিষ্ট হয় তাই তার বিবেক সমর্থন করতে শুরু করে। এ কারণেই সমাজ ও নৈতিক কাঠামো এক হওয়ার কারণে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ইউরোপীয় ও আমেরিকার নাগরিকদের বিবেক যৌন বিষয়ক, অসামাজিক ও নীতিহীন কাজ করার পরও পীড়া দেয় না। পক্ষান্তরে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম হিসেবে আলাদা হলেও এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজে উভয় ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের বিবেকই আর্তনাদ করে ওঠে। কাজেই কোন সমাজের নৈতিক মতাদর্শ যদি বদলে যায় এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মানদন্ডও পরিবর্তিত হয়, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে বিবেকের গতিপথও ঘুরে যায়।

স্মরণ রাখতে হবে যে, বর্তমানে পৃথিবীতে যে সভ্যতা চালু করা হয়েছে, তা হলো বস্তুবাদী নৈতিক ব্যবস্থা। এই মানসিকতা থেকে জ্ঞান শিল্প চিন্তা, পরিকল্পনার ধারা উৎসারিত হয় এবং সমগ্র ব্যবস্থায় নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের সূক্ষ্মতর শক্তি অনুপ্রবেশ করে। অতঃপর এরই ভিত্তিতে ব্যক্তি চরিত্র গড়ে ওঠে। এর আলোকেই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচার ব্যবহার ও লেনদেনের যাবতীয় নিয়ম পদ্ধতি রূপ পরিগ্রহ করে। আইন ও সংবিধানের বিকাশ ও অগ্রগতি এরই ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। সবচাইতে প্রতারক, মিথ্যাবাদী, সুবিধাবাদী, আত্মসাৎকারী, ধোঁকাবাজ, নিষ্ঠুর ও কলুষিত হৃদয়সম্পন্ন লোকেরাই এহেন সমাজের উপরিভাগে স্থান লাভ করার সযোগ পায় যদি কোন বস্তুগত প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে যে কোন ধরনের কাজ করতে তারা দ্বিধা করেনা। এই নির্যাতন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে শক্তিশালী শ্রেণি নিজের জাতির দূর্বল শ্রেণির লোকদেরকে পিষে ফেলতে থাকে এবং দেশের সীমানা পেরিয়ে বহিঃবিশ্বে জাতীয়তাবাদে, সাম্রাজ্যবাদ, দেশ জয় ও জাতি ধ্বংসকারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রচলিত মতাদর্শের অন্য এক প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন ও জীবনকে যতদূর সম্ভব শিথিল করা। কার্ল মার্কস নিজেও তার কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো (১৮৪৮)-তে পারিবারিক জীবনকে পুরোপুরি শেষ করে দেয়ার সুপারিশ করেছেন। পারিবারিক সম্পর্ক ধ্বংসের প্রধান হাতিয়ার- ভারসাম্যহীন শিল্পায়ন, শহরকেন্দ্রিক জীবন ও তথাকথিত নারী মুক্তি। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি ব্যাপার একই সমতালে চলতে থাকে। আধুনিক শিল্পায়ন ব্যবস্থা উচ্চ বেতন ও অন্যান্য বস্তুগত সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে বিরাট সংখ্যক সবল লোককে পরিবার ও গ্রামের স্নেহময় ও সুসংহত সমাজ বন্ধন হতে টেনে বিরাট শহরের অজ্ঞাত পরিবেশে নিক্ষেপ করে। ফলে পরিবারের মহিলা সদস্যদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। স্বামী তার জীবনের অধিকাংশ সময় বাড়ি ও স্ত্রী থেকে দূরে থাকেন। ফলে স্ত্রীও সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়েন। সন্তান পিতার নিয়ন্ত্রণে না থাকায় বাউন্ডেলে হয়ে পড়ে। ওপরন্তু মহিলাগণ অনাত্মীয়দের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেদের জরুরি বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাতে বাধ্য হন। এ ধরনের যোগাযোগ অযাচিত সন্দেহ, পারিবারিক জটিলতা ও কলহ ও ক্ষেত্র বিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদের হার বাড়াতে সহায়তা করে।

নারীমুক্তি আধুনিকতার জন্য একটি শক্তিশালী ও অপরিহার্য পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় যতদূর সম্ভব গৃহকর্ত্রী এবং মাতৃত্বকে আকর্ষণহীন, অগুরুত্বপূর্ণ, অ-অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে প্রমাণিত করে মহিলাদের বাড়ি থেকে বাইরে আসতে প্রলুব্ধ করে।

গণসংযোগ মাধ্যমগুলোয় চিরাচরিত নারীর ভূমিকাকে খাটো করে দেখানো এবং পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ মহিলাদের কাজকে আকর্ষণীয় প্রমাণিত করে এই কাজ করা হয়েছে। যে স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সে পরিবার প্রধান হিসেবে স্বামীর কর্তৃত্ব নষ্ট করেছে। একইভাবে যে পরিবারে মা অর্থনৈতিকভাবে কর্তৃত্ব করে সে পরিবারের সন্তান পিতার ওপর থেকে অবচেতনভাবে হলেও আস্থা হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের অবাধ মেলামেশা পারিবারিক বিপর্যয় ও যৌন হয়রানী বড় ধরনের সামাজিক সমস্যা হিসেবে পৃথিবীর সকল দেশেই বিবেচিত।

আধুনিক সমাজের আত্মকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা মানুষকে তার পরিবার, পরিবেশ এবং আত্মীয় স্বজন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করে যাতে পৃথিবী এক জঙ্গলে পরিণত হয় এবং প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে– এই ধারণা জোরদার হয়। এই সুবিধাবাদী মনোভাব মানুষকে নিঃসঙ্গ, যান্ত্রিক এবং মানবিক গুণবর্জিত করে তোলে। ব্যবসায়িক ও আত্মসর্বস্বতার মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। অর্থ ও প্রতিপত্তিকেই 'প্রভু' (রব) বানানো হয়। মানুষকে শুধু পণ্য বা পণ্য সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। মানবিক সম্পর্ক ইতর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছে মানব জীবনের ব্যাপক জ্ঞান লাভে ব্যর্থতা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ফ্রয়েডের মতে, মানুষের সুস্বাস্থ্য এবং সুখ অবাধ যৌন জীবনের ওপর নির্ভরশীল। অপরদিকে মার্কসের মতে, অর্থনীতিই মানুষের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু। মানব জীবনের একটি দিক যৌন অথবা অর্থনৈতিক যাই হোক না কেন তাকে সমগ্র মানব সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান করে ভেঁদবুদ্ধিহীনভাবে অহেতুক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ জীবনের একটি মাত্র অংশকে সমগ্র জীবন মনে করে ভুল করা হচ্ছে।

স্মরণ রাখতে হবে আমাদের দেশের আইন সমূহ এই পাশ্চাত্য দর্শন ভিত্তিক মতবাদ ও চিন্তা চেতনার আলোকেই প্রণীত হয়েছে এবং হচ্ছে ।

বাংলাদেশ-ভারত ও পাকিস্তানে প্রচলিত আইনের ঐতিহাসিক পটভূমি :

আহলে বায়াত পাকের বংশের চির উজ্জ্বল ভাস্বর জ্যোতিষ্ক, দ্বীন ইসলামের বন্ধু (মঈনউদ্দিন) গরিব নেওয়াজ, মঈনুল হক মঈনউদ্দিন চিশতী আল হুসাইনী (আ.) ওয়াল হাসানি (আ.) রসুল (দ.) এর বাহ্যিক ও রুহানী জগতের অন্যতম উত্তরাধিকারী এবং আল্লাহর খলিফা, সুলতান উল হিন্দ হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রা.) এর দোজায় ঘোরের সুলতান শিহাবুদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরির ১১৯২ সালে তরাইন প্রাঙ্গণে সংঘটিত যুদ্ধে দিল্লী ও আজমিরের রাজা পৃথ্বিরাজ পরাজিত হন । দিল্লি ও আজমির মুসলমানদের অধীনে আসে এবং এই এলাকায় কোরআন ভিত্তিক আংশিকভাবে শরিয়তি আইনের প্রচলন হয় । এই আইন ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকেও চালু ছিল । পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই আইন বাতিল করে পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক ও খোদাদ্রোহী আদর্শের ভিত্তিতে প্রণীত ব্রিটিশ আইনের বিকৃত রূপ তদানীন্তন ভারতবাসীর ওপর চাপিয়ে দেয় । ২০০ বছর ধরে ব্রিটিশ সরকারের আমলে প্রণীত আইন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবিকল রয়েছে । কিছু নিবর্তন (শাস্তি) মূলক আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন ছাড়া এদেশ ব্রিটিশ আমলে প্রণীত আইনের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে ।

পাঠান বা মুঘল আমলে দিওয়ানি বিচারের জন্য দ্বৈত আইনের ব্যবস্থা চালু ছিল । মুসলমানদের বেলায় প্রয়োগ করা হতো কোরানিক আইন, আর হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো হিন্দু আইন । কিন্তু ফৌজদারি বিচারে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রয়োগ করা হতো কোরআনিক আইন । শাসকদের ঈমানি দাবি ও দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই যেহেতু সকল ধর্মের সারকথা, তাই দুষ্ট দমন করতে ও আইন কৃঙ্খলা বজায় রাখতে কোরানিক আইন সকল যুগেই অধিকতর ফলপ্রসূ বিবেচিত হওয়ায় একে ফৌজদারি বিচারের একক ভিত্তি করা হয় ।

পলাশী পরবর্তী লুণ্ঠন :

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ক্লাইভের নেতৃত্বে ব্রিটিশরা ক্ষমতাসীন হয় । এবং ক্লাইভ মীর জাফরকে নবাব নিযুক্ত করে । ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত নবাবের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আদায় করে টাকা ২৬১০০০০০ । তাছাড়া ব্যক্তিগত পারিতোষিক, উপহার উপঢৌকন হিসেবে আদায় করা হয় টাকা ৫,৮৭০,০০০ । এর মধ্যে ক্লাইভের একার বখরা ছিল টাকা ২০৭৯৯৯৯ । এতেও ক্লাইভ খুশি নয় । সে মীর জাফরের কাছ থেকে এক জায়গির আদায় করে যে জায়গির থেকে সে বাৎসরিক আয় পায় প্রায় তিন লক্ষ্য টাকা ।

১৭৫৮-৬৫ সময়কালের মধ্যে ঘন ঘন নবাব উঠানো বসানোর রাজনীতিতে কোম্পানির বিভিন্ন কর্মচারী ঘুষ ও উপহার বাবদ যে অর্থ নামে মাত্র নবাবদের কাছ থেকে আদায় করে এবং একই সময়ে কোম্পানিও নানা খাতে অজুহাত দেখিয়ে যে অর্থ আদায় করে একুনে তার পরিমান ছিল ১৪৫০২৫৬৬ পাউন্ড অর্থাৎ টাকার অংক প্রায় তের কোটি । বর্বরোচিত এ লুণ্ঠন যজ্ঞের খবরে ব্রিটেনের জনমত সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠে এবং তদন্তের জন্য একটি পার্লামেন্টারি তদন্ত কমিটির সামনে লুটেরা বড় লাট ক্লাইভকে বাংলায় তার লুণ্ঠননীতির কারণ ব্যাখ্যা করতে বলা হলে ক্লাইভ বলে–

"ভেবে দেখুন একবার পলাশীর বিজয়ের পর আমার অবস্থা । একজন মহান রাজা (নবাব) আমার ইশারায় ওঠে আর বসে, একটি ঐশ্বর্যশালী শহর মুর্শিদাবাদ আমার পদানত, শহরের মহা ধনী ব্যাংকার ব্যবসায়ীরা আমার একটু হাসি পাবার জন্য শশব্যস্ত । আমার আগমনে খুলে দেয়া হয়, ধন ভান্ডার - সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তা, জহরত - আমার দু'পাশে করছে থৈ থৈ । মি. চেয়ারম্যান, ভেবে দেখুন কে সম্বিত রক্ষা করতে পারে এসব দেখে ? হাত যে আরও বাড়াইনি, আমার এ বিনয়ে আমি নিজেই অবাক ।"

পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারম্যান ক্লাইভের বিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন । অর্থাৎ এই ভারতে তার জঘন্য কর্মকান্ডের জন্য তো কোন রকম বিচার হলোই না বরং তাকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করে ব্রিটিশ জাতি যেন ধন্য হলো ।

কোম্পানির বিরুদ্ধে মীর কাশিমের যুদ্ধ ঘোষণার পর পরই কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ মীর জাফরকে নবাব পদে পুন অধিষ্ঠিত করে (১৭৬৩)। এর পরের ঘটনা প্রবাহ অতি করুণ। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সমস্ত রাজস্ব, সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য হয় ইংরেজের করতলগত। দেশের সম্পদ লুণ্ঠনে কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তরা চরম পাশবিকতা প্রদর্শন করে। যেখানেই অর্থের আভাস সেখানেই শোষণ যন্ত্রের এমন শক্তভাবে আঁটে। সাধারণ লোক থেকে আরম্ভ করে নবাব পর্যন্ত সবাইকে সেলামির নামে এমন অত্যাচার উৎপীড়ন করে যে এদের অভাবনিয় বর্বরতা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। এমনকি ক্লাইভ স্বীকার করে যে, বাংলাদেশে ব্রিটিশরা এমনি বর্বর পাশবিকতার পরিচয় দিয়েছে এবং এদের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা এমন চরম যে, "ইংরেজের নাম বা চেহারা যেন এ দেশের হিন্দু মুসলমানের নাকে একটি অসহ্য দুর্গন্ধ বিশেষ।"

এই লুন্ঠন প্রক্রিয়াকে আইনানুগ প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দিল্লীর নামমাত্র সম্রাট শাহ আলমের সাথে ১২ আগষ্ট, ১৭৬৫ ও কোম্পানির এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মর্মানুযায়ী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর বাদশাহকে বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকা এবং বাংলার নবাবকে ৫৩৮৬১৩১ টাকা রাজস্ব দানের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা কোম্পানির হাতে ন্যস্ত হয়।

১৭৬৯ সনে রেসিডেন্ট হিসেবে রিচার্ড বেচার, নায়েবে নজিম রেজা খান তাকে দেশের অর্থনৈতিক অবোগতি সম্পর্কে অবহিত করেন। খান বলেন, যে আলীবর্দী খানের আমলে ইউরোপীয়ানদের ব্যবসা ছাড়াই ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যবসায়ীরা এদেশে ব্যবসা করতো কিন্তু এখন বৈদেশিক ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত। পুঁজিপতি শ্রেণি অবসরপ্রাপ্ত। রাজস্ব সংগ্রহ করা হচ্ছে বল প্রয়োগের মাধ্যমে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের ধ্বংস অনিবার্য। এহেন আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে দেখা দেয় ১৭৬৯-৭০ এর মন্বন্তর। এই দুর্ভিক্ষের মত ব্যাপক দীর্ঘস্থায়ি ও ভয়ংকর ছিল যে এর বীভৎসতা পূর্বে বা পরের অন্য কোন জানা দুর্ভিক্ষের সাথে তুলনাহীন। দুর্ভিক্ষকে উপেক্ষা করে স্বাভাবিক সময়ের মত রাজস্ব আদায়ের মধ্যে ব্রিটিশ জাতির যে বর্বরোচিত পাশবিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় মেলে, তা মানব ইতিহাসের একটি কলংকজনক অধ্যায়। দৈনিক হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

দুর্ভিক্ষের তান্ডবলীলায় সামাজিক অনুশাসন ভেঙ্গে যায়। সমাজ বিন্যাসে আসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। সৃষ্টি হয় সরকার, আইন কৃঙ্খলার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস। যে ব্যবস্থা মানুষকে বাঁচাতে পারে না সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম স্বাভাবিক এ ধারণা সকলের মনে সৃষ্টি হয়। এ্যাংলো মুঘল যৌথ ব্যবস্থা একটি শোষণ ব্যবস্থা, মানুষকে বাঁচাবার ব্যবস্থা নয় এটা দুর্ভিক্ষে প্রমাণিত হয়। অতএব, এ ব্যবস্থাকে পদদলিত করে চুরি, ডাকাতি, দস্যুবৃত্তির আশ্রয় করে বাঁচতে চেষ্টা করে সমাজের দুঃসাহসিক ব্যক্তিরা। নবাবের সেনাবাহিনী থেকে ছাটাইকৃত সিপাই, বড় জমিদারের আশ্রিত লাঠিয়াল, দুর্ভিক্ষের কারণে জেল ছাড়া পাওয়া অপরাধী, সর্বস্বান্ত গ্রামের মোড়ল, মন্ডল, খাদ্যের অন্বেষনে ভবঘুরে যুবকেরা সব আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করে। প্রকাশ্যে ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা, লুটতরাজ চলতে থাকে। জীবন ও সম্পত্তি লুটেরার দয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এমনকি প্রজা পালক জমিদার ও সরকারি সিপাই পর্যন্ত ডাকাতি দস্যুবৃত্তির প্রশ্রয় দেয়। কৃষককুলের অকাল মৃত্যুতে অথবা দেশান্তরী হওয়ার কারণে বিস্তীর্ণ এলাকা অনাবাদী হয়ে দেশ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। এসব জঙ্গল হয়ে ওঠে সমাজ বিরোধী দস্যু ডাকাতদের নিরাপদ আস্তানা।

মুঘল ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আইন কৃঙ্খলার এ ধরনের অবনতির জন্য কোম্পানির কর্মচারীদের জুলুম, অত্যাচার, অনাচার ও কর্মনীতির কোন দোষ বা ত্রুটি অনুসন্ধান না করে খৃষ্টান ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা সকল দোষ কোরআনিক আইনের ওপর চাপায়। এবং আইন অকার্যকর প্রমাণ করে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। এ কারণেই ১৭৭২ সালে মুঘল ব্রিটিশ যৌথ শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি শাসন নিজ হাতে গ্রহণ করে।

সর্বত্র বিরাজমান চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুটতরাজ বন্ধ করে আইন শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় ছিল পরীক্ষিত মুঘল ব্যবস্থা পূর্ণভাবে কার্যকর করা, পর্যাপ্ত পুলিশ নিয়োগ করা, কোম্পানির কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য

বন্ধ করা, জমিদারদের ওপর রাজস্ব চাপ হ্রাস করা। কিন্তু এ পন্থা ঔপনিবেশিক স্বার্থের পরিপন্থী। কোম্পানির সরকার একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এর স্বার্থ প্রশাসনে যথাসম্ভব খরচ কম করে আয় বৃদ্ধি করা। ব্যয় বহুল প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলার উন্নতির চেষ্টা না করে সরকার চায় ভয় ভীতি প্রদর্শন করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে অপরাধ রোধ করতে। মুসলিম আইনে হত্যা বিহীন ডাকাতি মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ নয় এবং অপরাধীদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা বা দ্বীপান্তরিত করারও বিধান নাই। কিন্তু হেস্টিংস চায়, সব রকম ডাকাতির জন্য মৃত্যদন্ড এবং অপরাপর অপরাধের জন্য কঠোরতম সাজা। এক মিনিটে তিনি বলেন "ইহা আমার সুচিন্তিত অভিমত যে, সব চোর, ডাকাত, হত্যাকারীদের হত্যাই একমাত্র সাজা। যেসব দন্ডিত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত নয়, তাদের কারাগারে না পুষে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে কোম্পানির দ্বীপ মালাবারে প্রেরন করা দরকার। এ ব্যবস্থার ফলে কারাগার তৈরির খরচ বেঁচে যাবে এবং বেঁচে যাবে কারাগার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রহরী নিয়োগের বিরাট ব্যয়। এর ফলে ব্যয়ের বদলে হবে আয়। দেশে বিশৃংখলা বিরাজমান থাকলে অধিক ব্যক্তি দন্ডিত হবে এবং অধিক ব্যক্তি ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জিত হবে। আর এর ফলে যদি আইন শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটে, তবে তাতো আরও ভালো কথা। স্মরণ রাখতে হবে হেস্টিংস ছিল গভর্নর জেনারেল। তার বক্তব্য/মন্তব্য ও প্রস্তাব মোটেও হালকাভাবে গ্রহণ করা হয়নি। এ মর্মে আইন করে আইনের ভূমিকায় তা উল্লেখ করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক বর্বরতা যে কত পাশবিক রূপ ধারণ করতে পারে হেস্টিংসের প্রস্তাব এর প্রমাণ।

১৭৯০ সনে কর্নওয়ালিশ মুসলিম দন্ডবিধিতে ও ফৌজদারি আদালত গঠনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করেন। বিশেষ ধরনের (অনিচ্ছায়, দুর্ঘটনাজনিত কারণে) খুনের অপরাধের সাজা নিহত ব্যক্তির ওয়ারেশের ইচ্ছানুসারে নির্ধারণ না করে সব রকম খুনের জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান করা হয়। উল্লেখ্য যে, মুঘল যুগে এই বিধান অনুসারেই সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের হাতে দূর্ঘটনায় নিহত ধোপার জন্য স্বয়ং সম্রাট জাহাঙ্গীরকে মুঘল আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই আইনে মৃতের উত্তরাধিকারীকে হত্যাকারীর পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের বিধানও রাখা আছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বর্তমানেও কর্নওয়ালিশ কর্তৃক প্রণীত এ আইন চালু আছে এবং এতে হত্যাকারীর মৃত্যু দন্ডাদেশ রাষ্ট্রপ্রধান সম্পূর্ণরূপে মওকুফ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। কিন্তু যে পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়, উক্ত পরিবারের কারও আদালতের বিচারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার আইনগত সুযোগ থাকে না। আলোচ্য বিষয়টি পর্যালোচনা করলেই মুঘল তথা কোরআনিক আইনের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। লর্ড কর্নওয়ালিশ কোরআনে বর্ণিত ডাকাতি বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার নির্ধারিত শাস্তি হাত, পা ছেদ করার বিধানও পরিবর্তন করেন। এই আইনও বর্তমানে চালু আছে। ফলে ডাকাতি, রাহাজানি, হাইজাকিং বা অনুরূপ অপরাধের হার এদেশে বাড়তেই থাকে যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

ফৌজদারি বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য চারটি ডিভিশনের জন্য (মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ঢাকা ও পাঁনা) চারটি কোর্ট অব সার্কিট গঠন করা হয়। দু'জন সিভিলিয়ান নিয়ে গঠিত হয় কোর্ট অব সার্কিট, সার্কিট জজকে সাহায্য করার জন্য থাকে একজন কাজি ও একজন মুফতি। সার্কিট জজ বছরে দুবার প্রতি জেলায় গমন করে বিচার-অপেক্ষারত অপরাধীর বিচার ও জেল মুক্তির আদেশ প্রদান করবেন। এই সব বিচারকের প্রতি জেলায় অবস্থান আরামদায়ক করার জন্য সকল জেলায় নির্মাণ করা হয় সার্কিট হাউজ, যা আজ পর্যন্ত বহাল তবিয়তে অবস্থান করে কর্নওয়ালিশের জয়গান করছে। পক্ষান্তরে এত বিস্তৃত এলাকায় নির্ধারিত সময়ে জজদের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া বাস্তবে অসম্ভব ছিল। ফলে হাজার হাজার কয়েদি/ বিচারাধীন অপরাধীগণ বিচারের অপেক্ষায় কষ্টকর দিন যাপন করতো।

কোম্পানির কুশাসনে বাংলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমি ১৭৯৩ সনে পতিত জঙ্গলে পরিণত হয়। এহেন অবস্থা থেকে ব্রিটিশ কোম্পানির আয়কে সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত করার। লক্ষ্যে কর্নওয়ালিশ নতুন সিস্টেম উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। যা 'কর্নওয়ালিশের কোড' নামে পরিচিত, যা অত্র অঞ্চলে আধুনিক আইনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত ভূমিতে মালিকানা সৃষ্টি করবে।

জমির মালিক হিসেবে জমিদারগণ অধিক মুনাফার আকর্ষণে জমি উন্নত করবে। কৃষির উন্নতি হলে কৃষি নির্ভর শিল্পেরও উন্নতি হবে। এই কোডের দুইটি দিক, একটি হচ্ছে– ভূমিতে সম্পত্তি সৃষ্টি এবং ভূসম্পত্তি ও উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য সম্পত্তির ওপর শর্তহীন ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা। প্রস্তাবিত সিস্টেমের প্রথম দিক নিয়ে গঠিত চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত। চিরস্থায়ি বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করে রচিত হয় কর্নওয়ালিশের সিস্টেমের দ্বিতীয় দিক– অর্থাৎ কনওয়ালিশ কোড। স্মরণ রাখতে হবে এর নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর অভ্যাস, নৈতিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন সাধন করে পশ্চিমা সভ্যতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমাজ দেহে প্রবিষ্ট করানো। কর্নওয়ালিশ কোডের অপারেশন এদেশের সমাজদেহে এক মহা চারিত্রিক সংকট সৃষ্টি করে। সমস্ত উচ্চ বেতনের সম্মানিত পদ থেকে উৎখাত হয় অগণিত দেশি অফিসার ও তাদের পরিবার বেকারত্বের বিষচক্রে আবর্তিত হয়। বেকারত্ব ও দায়িত্বহীনতা সৃষ্টি করে দারিদ্র, অজ্ঞতা, হতাশা, নৈরাজ্য ও অবশেষে বিকৃত মানসিকতা। এদিকে যেসব প্রাচীন পরিবার সূর্যাস্ত আইনের অপারেশনে তাদের পৈত্রিক ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয় তারাও বেকারত্ব, দারিদ্র ও অজ্ঞতার অভিশাপে বিকৃত নৈতিকতা অবলম্বনে বাধ্য হয়। একটি প্রাচীন জমিদার পরিবারের ধ্বংসের অর্থ শুধু সে পরিবার বিশেষের ধ্বংস নয়, এর সঙ্গে বেকার হয় জমিদার, শত শত আমলা, নায়েব, গোমস্তা, পাইক বরকন্দাজ, চাকর, জমিদারের দানের ওপর নির্ভরশীল ব্রাহ্মণ, মৌলভি, পন্ডিত, মক্তব, মাদ্রাসা, মঠ, মন্দির, মসজিদ, দরগাহ প্রভৃতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান।

কর্নওয়ালিশ কোড সৃষ্ট কোর্ট কাছারীকে কেন্দ্র করে আবির্ভাব হয় মিথ্যা মামলাবাজ, পেশাদার সাক্ষী, উপজীবী, উকিল, মোক্তার, টাউট, ঘৃণ্য গোয়েন্দা ও ঘুষখোর, কোর্ট আমলা, মামলাবাজ ও ঘুষখোর আমলারা তাদের ঘৃণ্য ব্যবসা চালাতে উৎসাহিত হয়। যারা বিত্তবান তারা বিচারক কিনে আমলাকে উৎকোচ দিয়ে আর যারা গরিব তারা বিচারের জন্য নিভৃতে কাঁদে। অর্থাৎ কর্নওয়ালিশের আইন আদালত সমাজে এমন অনাসৃষ্টির কারণ হয় যে কোর্ট-কাছারি কেন্দ্রিক বিকৃত বিকারগ্রস্থ লোকেরা সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণি হিসাবে অবির্ভূত হয়। লর্ড হেস্টিংসের ভাষায়থ

"আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, কর্নওয়ালিশ কোডের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে নিদারুনভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মনে হচ্ছে আমরা এমন একটি বিপ্লব এনেছি, যা সমাজকে করেছে কলুষিত, নৈতিকতাকে করেছে ধ্বংস।

এই কোডের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সত্যিই কল্পনাতীত। ১৭৯৩ সনের আদালত সিস্টেম এমন একটি বংশধর সৃষ্টি করেছে যাদের পেশা মামলা মোকদ্দমা, মিথ্যাবাদিতা, শঠতা। এ ক্রমবর্ধমান নৈতিক অধঃপতন রোধ করতে আদালত এখন অক্ষম। (বাংলার ইতিহাস ও ঔপনিবেশিক কাঠামো- সিরাজুল ইসলাম)।

ব্রিটিশ শাসন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কোম্পানির রাজত্বের প্রথম দিকের দু'দশকে দায়িত্বহীন দুঃশাসন, অভাবনিয় অরাজকতা, শোষণমুখী রাজস্ব নীতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সম্পদ পাচার, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর মর্মন্তুদ পরিবেশ । তাতে বেঁচে থাকা বাঙ্গালির পক্ষে সমস্ত অনাসৃষ্টির কারণ হিসেবে ব্রিটিশ শাসনকে চিহ্নিত করা হয়।

তারপর কর্নওয়ালিশ থেকে বেন্টিংক এর আগমন পর্যন্ত নতুন ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার ফলে ভূমি ভিত্তিক সমাজ বিন্যাসে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, নতুন শাসন ও বিচার ব্যবস্থা, পুরাতন মূল্যবোধ, প্রথা প্রতিষ্ঠানে যে আমূল পরিবর্তন আনে এবং বিচারের নামে অবিচারের রাজত্ব কায়েম করে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ভাঙা-গড়া ও অনিশ্চয়তার সুযোগে চোর-ডাকাত, দস্যু ও অন্যান্য সামাজিক দুবৃত্তরা গ্রামাঞ্চলে যে 'প্রাকৃতিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তাতে নির্যাতিত নিরাশ্রয়ী বাঙালি সমাজ কোম্পানির সরকারের প্রতি অতিষ্ঠ না হয়ে উপায় নাই। বেন্টিংকের আমল থেকে সংস্কারের নামে, খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের নামে, পাশ্চাত্য ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের নামে, এদেশীয় মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুভূতিকে নির্মমভাবে আহত করা হয়। লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করে সামাজিক অভিজাত্যকে বিক্ষুদ্ধ করা হয়। অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে ব্রিটেনের কল-কারখানাজাত সস্তা পণ্য এসে স্থানীয় শিল্পের সমাধি রচনা করে। সরকারের আশ্রয়ে নীলকরেরা গ্রামাঞ্চলে কায়েম করে ত্রাসের রাজত্ব। আদালতের ভাষা ফারসির বদলে ইংরেজি চালু হওয়ায় মুসলমানের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারত উপমহাদেশের লোকেরা অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ থেকে বঞ্চিত হবার পর খাদ্যের জন্য তাদের জঠরে অনুভূত হয় তীব্র জ্বালা। অন্যদিকে সম্মান ও পদমর্যাদার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই উভয় ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য একটি মাত্র দুয়ার খোলা রাখা হলো, তাহলো পাশ্চাত্য শিক্ষার দুয়ার। খাদ্য ও পদমর্যাদার লোভীরা লাখে লাখে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেদিকে। ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে তাদেরকে বলে দেয়া হলো বর্তমান সভ্যতার দাবি খাদ্য ও পদমর্যাদা-এদেশীয়দের জন্য নয়। তবে এগুলো যদি অর্জন করতে কেহ আগ্রহী হয় তাহলে তাকে তার ধর্ম বর্জন করতে হবে। চরিত্র, বিবেক, মন, সভ্যতা, কৃষ্টি, জীবন যাপন পদ্ধতি, সামাজিক মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ সবকিছু ত্যাগ করলেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল আরাম আয়াশ, সুযোগ সুবিধা তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তবে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তা হলো : পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। অর্থাৎ তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই শুধুমাত্র জীবন ধারনের সকল উপায় উপকরণ এদেশীয়দের হাতের মুঠোয় এসে যাবে। তবে ঈমান ত্যাগ প্রক্রিয়াও এর মধ্যে নিহিত বা অন্তর্ভুক্ত আছে।

ড. উইলিয়াম হান্টার মুসলমানদের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলার জন্য এবং তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিদেশি প্রভুত্ব মেনে নিতে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করানোর জন্য প্রস্তাব করেছেন 'সর্বরোগহর' ইংরেজি শিক্ষার। তিনি তার বইয়ে উল্লেখ করেন, "এভাবে মুসলমান যুবকদেরকে আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষিত করে তুলতে পারি। তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এবং ধর্ম শিক্ষার বিষয়ে সামান্যতম হস্তক্ষেপ না করেই আমরা তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারি যাতে করে তারা ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করলেও ধর্মান্ধ হবে না।... (ফলে) তাদের পূর্ব পুরুষদের গোঁড়ামী তাদেরকে নিষ্ঠুরতা নির্দয়তা ও অপরাধজনক কাজের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে না। আর এসবই তারা করে এসেছে ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে। মুসলমানি আইন শাস্ত্র আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নিয়মিত পড়ানো হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু এটাকেই শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়া ঠিক হবে না। মুসলমান আইন মানে মুসলমানি ধর্ম, মুসলমানেরা সমগ্র পৃথিবীতে তাদের (নিজস্ব) আইনানুগ অধিকারে বিশ্বাসী। তারা আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব, আনগুত্য অথবা খ্রিস্টান সরকারের অধীনতার কথা জানে না। মুসলমানি আইন সরকারের কোন প্রয়োজন এবং জীবন সম্পর্কে তার ছাত্রদেরকে কোন ধারণা দেয় না। এর পরিবর্তে আমাদের উচিত একটা উদীয়মান মুসলিম জাতি গড়ে তোলা যাতে তারা নিজস্ব সংকীর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি ও মধ্যযুগীয় ভাবধারার গন্ডীতে আবদ্ধ না থেকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নমনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। ইংরেজি প্রশিক্ষণ জীবনের লাভজনক অধ্যায়ে প্রবেশের নিশ্চয়তা দেবে। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে অনুরূপ উন্নত অবস্থায় তারা একদিন উপনীত হবে এবং এতদিন নেতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে এ বিষয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ।"

ড. হান্টারের ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে এবং আজ আমরা তার ফল ভোগ করছি। বংশ পরম্পরায় পাওয়া সেই সম্পত্তি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় এখনও বহাল রয়েছে। ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতি এতই দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে যে, সমগ্র উপমহাদেশে আধুনিকতা তথা ধর্ম নিরপেক্ষতার (ধর্ম সম্পর্কে অস্পষ্ট বা আল্লাহ-নিরপেক্ষ অর্থাৎ পার্থিব কর্মকান্ডে ধর্মীয় বিধি-বিধানের কোন সম্পর্ক নাই এ ধারণা) বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের মোকাবিলা করার জন্য পর্যাপ্ত ইসলামি জ্ঞান দানে সক্ষম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোথাও নেই। মনে রাখতে হবে তদানীন্তন কালের আলেম সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নাস্তিক্যবাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝেই এই শিক্ষা গ্রহণ করতে মুসলমানদের নিষেধ করেছিলেন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন তা ঠিক নয়। কিন্তু এভাবেই এই আলেম সমাজকে গোঁড়া বা ধর্মান্ধ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। ড. উইলিয়াম হান্টারের মানস পুত্র স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ইংরেজ সরকার ও কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে তার বিশ্বাস ও ধারণা পর্যালোচনা করলেই আধুনিক শিক্ষিত লোকদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তাদের মনোভাব সহজেই বোঝা যাবে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ এবং পরবর্তীকালে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব থেকে স্যার সৈয়দ সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, ভারতের মুসলমানদের মুক্তির পথ হচ্ছে ব্রিটিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা এবং তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করা। তিনি নিজেকে স্বঘোষিত মধ্যস্থতাকারী হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। বললেন ও ধর্মীয় কারণে মুসলমান এবং

খ্রিস্টানদের শত্রুতা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে, কারণ সকল ধর্মের চাইতে খ্রিস্টান ধর্ম ও তার প্রবর্তকের প্রতি মুসলমানদের সর্বাধিক শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি ইংরেজদেরকে আশ্বাস দিলেন যে, ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, আল্লাহর ইচ্ছায় যদি আমরা কোন জাতির অধীনস্থ হই এবং তারা যদি ভারতে ব্রিটিশদের ন্যায় আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়, ন্যায়ের সঙ্গে শাসন করে, দেশে শান্তি বজায় রাখে এবং আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বা ও সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় আমরা তাদের আনুগত্য করতে বাধ্য।"

ইসলামকে রাজনৈতিক গোলামীতে রাখার ব্যাপারে আপোষ করতে গিয়ে তিনি মুসা (আ.) এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন মিশরের ফেরাউন অমুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার আনুগত্য করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষার উৎসাহে তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ মুসলিম কর্মচারীদের সরকারি বিশেষ নির্দেশ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন । আমি এতে সমদশী ও নিরপেক্ষ ব্রিটিশ সরকারের পুরস্কার ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করবো। যাতে ভারতের সকল মুসলমান এটা পড়ে আমাদের দয়ালু সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে। তিনি সন্ধিগ্ধ ও দ্ব্যর্থবোধক হাদিসের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেষ্টা করেন, জবাই না করা জন্তুর গোস্তও মুসলমানদের জন্য খাওয়া জায়েজ। তিনি খ্রিস্টানদের সঙ্গে একই টেবিলে মুসলমানদের খাওয়া বৈধ ঘোষণা করে তার বিখ্যাত ফতোয়া জারি করেন।

স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রমাণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যে, আধুনিকতার পরিপন্থী প্রাচীন আচার আচরণ পরিহার করা হলে মানবতা, সভ্যতা ও অগ্রগতির বাহনরূপী সত্যিকার ধর্মে ইসলামকে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

মুসলমানদের মধ্যকার আধুনিকতাবাদীদের উন্নতির জন্য স্যার সৈয়দ ১৮৭৮ সালে আলীগড়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় অন্যান্য ভাষার ওপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব না দিয়ে তিনি ইংরেজিকেই শিক্ষার একক মাধ্যম হিসেবে জোর দেন। ১৯২০ সালে আলীগড় স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। স্যার সৈয়দের ধর্ম সম্বন্ধে বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

১। ইসলাম দাসপ্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে এমনকি শরিয়তের অনুমোদন প্রাপ্ত যুদ্ধ বন্দীকেও দাসত্ব করানো যাবে না।

২। আধুনিক ব্যাংকিং, বাণিজ্যিক লেনদেন কর্জ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতিতে যে সুদের ব্যবস্থা আছে তা ঠিক 'রিব' (সুদের) ব্যাখ্যার আওতায় পড়ে না। অতএব, তা কোরআনি আইনের বিরুদ্ধ নয়।

৩। কোরআন ও সুন্নাহ চুরির জন্য হাত কাটা, ভেজাল দেওয়ার জন্য পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা এবং অবিবাহিত যুবক-যুবতীর যৌন সংসর্গের জন্য যে একশ' বেত্রাঘাতের শাস্তি বিধান করেছে, তা বর্বরতার পরিচায়ক এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন জেল ছিল না কেবলমাত্র তখনকার জন্য প্রযোজ্য ছিল।

৪। আত্মরক্ষার অন্তিম প্রয়োজন ছাড়া জেহাদ নিষিদ্ধ।

ইসলামকে বিজ্ঞান এবং যুক্তি ভিত্তিক ধর্ম প্রমাণ করার জন্য তিনি ভাগ্য, ফেরেশতা, জ্বিন, কুমারীর গর্ভে হজরত ঈসা (আ.) জন্মকে অস্বীকার, নবির (দ.) মিরাজ গমনকে একটি সাধারণ স্বপ্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং শেষ বিচারের দিনে স্বশরীরে উপস্থিতি, বেহেশত দোজখ প্রভৃতিকে অস্বীকার করে বলেছেন এগুলো শাব্দিক অর্থে গ্রহণ না করে প্রতীকী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। তিনি ওহি নাজিলের মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কেও মানসিক অসুস্থতাজনিত মতিভ্রমের সাথে তুলনা করেছেন। (নাউজিবিল্লাহ)। স্যার সৈয়দ অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের ওহি বিহীন ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে খোদাকে বিশ্বাস করেছেন। তার মতে খোদা নির্জন এবং সম্পূর্ণ বস্তু নিরপেক্ষ। প্রকৃতির বিধান অপরিবর্তনীয়। এমনকি খোদাও তা পরিবর্তন করতে পারেন না। (নাউজুবিল্লাহ) সুতরাং তাঁর কাছে প্রার্থনার কোন মানে নেই। এ ধরনের নিস্প্রাণ ও নৈর্ব্যক্তিক দেবতার প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ থাকতে পারে না। তাঁর মতে কোরআন ও সুন্নাহর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ। কোরআন এবং হাদিসের যে সব আয়াতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কথাবার্তা বলা হয়েছে সেগুলো নবির যুগের প্রাথমিক সমস্যার জন্য প্রযোজ্য ছিল। আমাদের মতো 'আলোক প্রাপ্ত' আধুনিক সভ্যতার জন্য তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। (ইসলাম ও আধুনিকতা - মরিয়াম জামিলা, ভাষান্তর এ কে এম হানিফ)।

তাওহিদ, রেসালাত, আখেরাত ও আহলে বায়াত ভিত্তিক প্রকৃত ইসলামি জীবনধারা থেকে বিচ্যুতির ফলে যেমন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মুসলমানগণ দুর্বল ও বিদেশি দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয়েছিল তেমনিভাবে হিমালায়ন উপমহাদেশেও তারা মোগল পতন যুগে প্রথমে শিখ-মারাঠা কর্তৃক বিপর্যস্ত ও পরে ইংরেজদের দাসত্ব কৃংঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সম্রাট আকবরের আমলের ধর্মীয় বিচ্যুতি থেকে মুসলমানগণের ধর্মীয়, চিন্তাগত, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব, বিকৃতি ও পতন দেখা দিয়েছিলো তা রোধ করার ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসছিল। উপ-মহাদেশের মুসলিম শাসন ক্ষমতার এ দুর্বলতা লক্ষ্য করেই বণিক হিসেবে আগত ইংরেজ বা এ দেশের শাসক হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলো। অতঃপর পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশ দখল করার মাধ্যমে তাদের সেই স্বপ্ন সাধ পূর্ণ হলো।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ লেকে ইংরেজ শাসনের আইনগত পরিস্থিতি (LEGAL STATUS) কি ছিল তা আমরা মাওলানা শাহ আবদুল আজিজের ফতোয়া থেকে জানতে পারি। তিনি ১৭৬৭ সালে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ফতোয়ার মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, "এখানে অবাধে খ্রিস্টান অফিসারদের শাসন চলছে, আর তাদের শাসন চলার অর্থই হলো, তারা দেশ রক্ষা, জন্মনিয়ন্ত্রণ বিধি, রাজস্ব, খারাজ, ট্যাক্স, ওশর, ব্যবসা পণ্য, চোর-ডাকাত দমন বিধি মোকদ্দমার বিচার, অপরাধমূলক সাজা প্রভৃতিতে (সিভিল, কেইস, পুলিশ বিভাগ, দাওয়ানি ফৌজদারি, কাস্টমস ডিউটি" ইত্যাদিতে আইন প্রণয়নসহ সকল প্রকার ক্ষমতার নিরঙ্কুশ অধিকারী। এ সকল ব্যাপারে ভারতীয়দের কোন অধিকার নেই। যদিও জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, আজান, গরু জবাই এসব ক্ষেত্রে ইসলামের কতিপয় বিধানে তারা বাধা সৃষ্টি করছে না। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, এগুলো মূল ধর্মের শাখা-প্রশাখা মাত্র ক্ষমতার সকল কেন্দ্রবিন্দু ও আইন প্রণয়নের সকল অধিকার থেকেই মুসলমানরা বঞ্চিত (ইসলামি শরিয়তের ফৌজদারি আইন সহ অন্যান্য বিধি বিধান)। দিল্লি থেকে কলকাতা পর্যন্ত তাদেরই কর্তৃত্ব চালু আছে। তাই এ দেশের ওপর "দারুল হরবেরই হুকুম বর্তাবে" (ফতোয়ায়ে আজজিয়া– ফারসি, আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজ - জুলফিকার আলী কিসমতি, পৃ. ২২)। অর্থাৎ যে দেশে ইসলামি বিধি বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন আইন কানুন চালু থাকে সেই দেশের মুসলমানদের জন্য সমাজে কোরআনিক বিধি বিধান চালু করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো ফরজে আইন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন বর্তমানে পৃথিবীর কোন মুসলিম দেশে পুরোপুরি কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় আইন প্রচলিত নাই।

বাংলার মাটিতে মুসলমান ধর্মাবলম্বীগণ যখন এক মহাসংকটের সম্মুখীন, ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা বিলুপ্ত প্রায়। ব্রিটিশের কু-শাসনে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনাতীত, এহেন পরিস্থিতিতে পাক-ভারত উপমহাদেশে দ্বীন ইসলাম রক্ষার্থে ধর্মের হেফাজতকারী কর্তৃক নিয়োজিত প্রশাসক হজরত বড়পির সাহেব (রা.) এর নির্দেশে তাঁরই ১৬তম অধঃস্তন পুরুষ হজরত আবদুল্লাহ আল-জিলী আল কাদেরি (আ.) বাগদাদ শরিফ থেকে জলপথে উড়িষ্যার চাদবলী বন্দরে ১৭৬৭ (১১৮০ হিজরি) এসে পৌঁছেন। তিনি তার মহান দুই পুত্র হজরত সৈয়দ শাহ জাকের আলী আল কাদেরি (রা.) (১৬৯৯-১৭৭৮) ও হজরত সৈয়দ শাহ রওশন আলী আল কাদেরি তদানীন্তন ভারত বর্ষে রয়ে যান। জৈষ্ঠ ভ্রাতা হজরত জাকের আলী আল কাদেরি (রা.) বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোর্টে বসবাস শুরু করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র হজরত রওশন আলী আল কাদেরি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার শহিদ গতে বসবাস করতে থাকেন।

হজরত রওশন আলী আল কাদেরির পুত্র হজরত সৈয়দ শাহ তোফায়েল-আলী আল-কাদেরিকে মঙ্গল কোটে তাঁর মহান চাচাজানের নিকট রেখে যান। হজরত জাকের-আলী আল-কাদেরির (আ.) এর পুত্র ফজলে আলী আল কাদেরি শৈশবে পরপারে চলে যান বিধায় হজরত রওশন আলী আল কাদেরির সুযোগ্য পুত্র ও হজরত জাকের-আলী (আ.) কাদেরির ভ্রাতৃপুত্র ও জামাতা হজরত তোফায়েল আলী-আল-কাদেরি (আ.) এই আহলে বায়াত পাকের মহান উত্তরাধিকারী হিসেবে বাংলা সহ এই উপমহাদেশে কাদেরিয়া তরিকার প্রচলন করেন।

হজরত তোফায়েল আলী-আল-কাদেরি (আ.) এর সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী হজরত মেহের আলী-আল-কাদেরি হজরত গাউসুল আজম (আ.) এর নির্দেশে পশ্চিম বঙ্গের মেদেনীপুর শহরের উপকণ্ঠে কাঁসাই নদীর তীরে ইস্ত্রীগঞ্জ নামক এক জনহীন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৮৬৮ সালে এই মহান আল্লাহর অলির ওফাতের পর তার স্থলাভিষিক্ত হন হজরত সৈয়দেনা মুর্শেদ আলী-আল-কাদেরি। তিনি এতদঞ্চলে দ্বীন ইসলামে নব জীবনের সঞ্চার করেন। তাছাড়া এই মহান পুরুষ বছরের অধিকাংশ সময়ে

বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতেন। ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চল সহ বাংলাদেশে তিনি লোক শিক্ষার মাধ্যমে জাতিধর্ম নির্বিশেষে অসংখ্য মুক্তিকামী নারী পুরুষের মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা সহ অসংখ্য স্থানে তার প্রদর্শিত কাদেরিয়া তরিকার লক্ষ লক্ষ শিষ্য আজও বর্তমান। ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তিনি রচনা করেন আধ্যাত্মিক সাধনার ‘পরশ পাথর’ আরবি, ফার্সি ও উর্দুর সুললিত ছন্দময় ‘দিওয়ানে জামীল’ ঐশি প্রেমিকদের জন্য তা উর্দু ভাষায় লিখিত কোরআনের সার নির্যাস। তিনি মেদেনীপুর ছাড়াও কলিকাতার ২২, খানকাহ শরিফ লেনে (পূর্বতন গার্ডেনার লেন) নিজস্ব বাসভবন নির্মান করেন। ইসলামি আধ্যাত্মজগতের চির উজ্জ্বল এই কাদেরি সূর্য (শামসুল কাদের) শ্রেষ্ঠ সুফী সাধক ১৯০১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি পরম করুনাময় আল্লাহতা’লার সাথে মিলন প্রাপ্ত হন। বর্তমানে কলিকাতার ৪ নং হাজী মুহাম্মদ মহসিন স্কোয়ারে বসবাসকারী মাওলা পাকের (আ.) প্রপৌত্র ও বর্তমান উত্তরাধিকারী সাজ্জাদানশীল হজরত সৈয়দেনা ওয়া মৌলানা সৈয়দ শাহ রশিদ আলী ইবনে মুস্তারশিদ আলী ইবনে এরশাদ আলী ইবনে মুর্শেদ আলী আল কাদেরি আলী বাগদাদি আল-হাসানী আল হোসাইনী। এই মহান আহলে বায়াত পাকের ‘জীবন্ত প্রতিচ্ছবি’ হিসেবে বিশ্বজগত আলো করে রেখেছেন।

উপসংহার :

বিংশ শতাব্দী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শতাব্দী, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কার উদ্ভাবনির শতাব্দী, সংগঠন ও বিন্যাস স্থাপনের সময়কাল। প্রকৃতির ওপর মানুষের কর্তৃত্ব স্থাপনের যুগ অণু ও পরমাণু শক্তি বিচূর্ণকরণ ও তার বিকাশ লাভের যুগ।

এ যুগে মানুষ যে উন্নতি-উৎকর্ষের চরম শিখরে আরোহন করেছে অতীতের সমগ্র ইতিহাসেও তার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ এ যুগে যে শক্তি, কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও প্রতাপ-দাপট অর্জন করেছে মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও পৃথিবী গ্রহের মানুষ তা কল্পনাও করতে পারেনি। কয়েক শতক পূর্বেও তা করা বা পারা ছিল সুদূর পরাহত। অথচ চাকচিক্যময় আধুনিক সভ্যতার সাথে পূর্ণ সংগতি রেখেই এই গ্রহের মানুষ নামের প্রাণীরা দেখছে যে এখানে সভ্যতা-শালীনতার লেশ মাত্র নেই। নৈতিক চরিত্রের কোন বালাই নেই, মানবতা ও নৈতিকতার কোন স্থান নেই। শাসন নেই, শৃঙ্খলা নেই, আইন নেই, কানুন নেই, পাশবিক-বর্বরতা ও অপসংস্কৃতির বিভীষিকায় গোটা বিশ্ব সমাজ জর্জরিত, হিংস্রতা অমানবিকতা ও চরিত্রহীনতার তিমির অন্ধকারে সমগ্র পরিবেশ আচ্ছন্ন ও কলুষিত। চুরি ডাকাতি, অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার, মিথ্যাবাদিতা, প্রতারণা, নারীহরণ, সুদখোরী, জুয়াবাজী, রাহাজানী, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা, দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতা এখানে সমাদৃত সমর্থিত। সততা-সভ্যতা, ন্যায়নীতি, মানবতা ও নৈতিকতা অনাদৃত ও অবহেলিত। ফলে আধুনিক সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য সব পাওয়ার সাথে সাথে মানুষ মানবিয় চরিত্রের সকল মহৎ ও উন্নত দিক খুইয়েছে। এই বৈপরীত্যের সুরাহা করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে পৃথিবীর যে কোন সৎ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই দিশেহারা, বিভ্রান্ত, গভীর সিদ্ধান্তহীনতা, অনিশ্চয়তা ও হতাশার শিকার। কেহই এই অমানিশার অন্ধকার থেকে তাকে পথ দেখাচ্ছে। তাকে উদ্ধার করার জন্য কেহই এগিয়ে আসছে না। আবার এই অত্যাধুনিক সভ্যতায় এই মহা বিপর্যয়ের কারণও স্পষ্ট নয়। সকলেই এই সভ্যতার সুবিধার ও প্রাপ্ত সেবার মান ও ভোগের সামগ্রীর কথায় বিমোহিত। কিন্তু এই সভ্যতার সৃষ্ট নগ্ন দিক সম্পর্কে ও অন্যান্য সমস্যার কথা কেউ বলতে চান না। এক একজন পেশা ভিত্তিক লোক এক এক ভাবে সমস্যার মূল্যায়ন করে বড় বড় বক্তৃতা, বিবৃতি ও পুস্তক লেখেন তা নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা, মূল্যায়ন ও সুপারিশ গ্রহণ করা ও তার কিছু বাস্তবায়ন করা হয়, কিন্তু কার্যত অবস্থার কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য উন্নতি হয় না। বরং মানবিক মূল্যবোধের অবমূল্যায়নের পরিমাণ দিনের পর দিন বাড়ছেই। তাই বর্তমান সভ্যতার বিভিন্ন দিক ও বিভাগ বস্তুনিষ্ঠ ভাবে ইতিহাসের আলোকে, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীর ভিত্তিতে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

যে আন্দোলন বর্তমান সভ্যতার জন্ম দিয়েছে তাকে আমরা রেনেসাঁ বলে জানি। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ১৪৫৩ সালে তুর্কিদের দ্বারা গ্রিক রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানি কনস্টানটিনোপল দখলের ফলেই এই রেনেসাঁ আন্দোলন সূচিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে VESARAI শিল্প ক্ষেত্রে RENASCITA এর কথা উল্লেখ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করে STENDHAL এবং MICHELET এর লেখাতে ত্রয়োদশ

শতাব্দী থেকে সপ্তদশ পর্যন্ত সময়কে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। রেনেসাঁ শব্দটি ফরাসি ভাষায় RENEZANS শব্দ থেকে এসেছে। এর প্রকৃত অর্থ REBIRTH বা পুর্নজন্ম । একে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। রেনেসাঁর মূল ভাবধারা সংশয় আলোচনা ও সমালোচনার মনোবৃত্তি জীবনের সব বিভাগেই বিদ্রোহের জন্ম দেয়। ইউরোপের সমাজ তখন অজ্ঞতা ও দুর্দশার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল। রাজতন্ত্র, সামন্তবাদ এবং গির্জার শাসন একত্রিত হয়ে সাধারণ মানুষের ওপর ত্রিমুখী শোষণ চালাতে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। প্রচলিত (ঈসা আ. কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম নয়) খ্রিস্টবাদে প্রকৃত পক্ষে কোন CODE OF CONDUCT বা বিধি বিধান বা শরিয়ত বলতে কিছু নেই। শুধুমাত্র কয়েকটি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস এবং গোঁড়ামীর এক অদ্ভুত সংমিশ্ররূপে তা জনসমক্ষে প্রকাশিত হতে থাকে। তাছাড়া গির্জার অনাচার, অনিয়ম, ব্যাভিচার ধর্মের মহান ভূমিকা ত্যাগ করে রাজা ও অভিজাত শ্রেণির কায়েমী স্বার্থবাদের উৎসাহী রক্ষকে পরিণত ইউরোপের নবজন্ম শুরু হয়েছিল কারণ সেখানে সর্বত্র গোলযোগ অশান্তি বিরাজ করছিল। বহু শত বৎসর ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধান সামন্ত (FEUDAL SUSTEM) প্রথা অনুসারে গড়ে ওঠে ছিল এবং সমগ্র ইউরোপ এরই করতলগত ছিল। কলম্বাস ও ভাস্কো ডা-গামা এবং জলপথের আদি আবিষ্কারকরা এই আবরণ ভেঙ্গে বাইরে এসেছিলেন এবং স্পেন ও পর্তুগালের আমেরিকা ও প্রাচ্য হতে সংগৃহীত আকস্মিক বিস্ময়কর ঐশ্বর্য ইউরোপের চোখ ঝলসে দিল এবং এতে পরিবর্তন সহজ হলো। ইউরোপ তার সংকীর্ণ জলরেখার বাইরে তাকাতে শুরু করলো এবং সমগ্র পৃথিবীর কথা ভাবতে শুরু করলো। বিশ্ব বাণিজ্য ও পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হলো।

সামন্ত প্রথার বিশেষত্ব ছিল কৃষিজীবীদের ওপর নির্লজ্জ শোষণ। বল প্রয়োগে কাজ করানো, বিনা পারিশ্রমিকে দেয় বহু প্রকার কর এসবতো ছিলই, তার ওপর বিচারক ছিলেন মালিক নিজেই। তাই কৃষকদের দুর্দশা এত বেড়ে গিয়েছিল যে ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহ চলছিল। এই কৃষক সংগ্রাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে মনে রাখতে হবে কৃষকদের মধ্যে দুর্দশা ছিল বহুল পরিমাণে যার ফলে শুরু হলো কৃষক সংগ্রাম। দ্বিতীয় কথা হলো মধ্য শ্রেণি বুর্জোয়াদের অভ্যুদয় এবং উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি। তৃতীয়ত চার্চ-গির্জা ছিল সবচেয়ে বড় জমিদার শ্রেণি। এটার সাথে ছিল তাদের গভীর স্বার্থের সম্বন্ধ। এ কারণেই এমন কোন অর্থনৈতিক পরিবর্তন তাদের কাছে পছন্দনীয় ছিলনা তাদের স্বার্থ বিরোধী হয়। এই বিরাট অর্থনৈতিক বিপ্লবের সাথে সাথে সব দিক থেকেই পরির্তন ঘটেছিল-সামাজিক, ধর্ম। সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক।

কৃষি বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য বিভাগে পাশ্চাত্যবাসীর জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাপাখানা আবিষ্কার, চিন্তার প্রসার ও জ্ঞান বিস্তারের গতিকে তীব্র করেছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপুর্ব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতামূলক ভাবে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমালোচনা ও সংশোধন মূলক কর্মতৎপরতা অব্যাহতভাবে চলতে শুরু করল। নতুন জ্ঞান ও তথ্যের অব্যাহত গতি এবং শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায় গোটা সমাজ জীবনকে নতুন মাত্রায় উজ্জীবিত করে তুলল। তদুপরি নতুন নতুন ভৌগলিক এলাকার সন্ধান লাভের ফলে চিন্তা ও দৃষ্টির প্রসারতা ঘটল। সেই সঙ্গে দুরবর্তী দেশ সমূহে পাশ্চাত্যবাসীদের জন্য এমন সব নতুন বাজার সৃষ্টি করতে লাগল, যেখানে তাহাদের নিজস্ব পণ্য দ্রব্যাদির জন্য কাঁচামাল ক্রয়ের সযোগ লাভ করল। এই বিরাট সুযোগে শতাব্দী কালের অচল ব্যবসায় সমূহে নতুন গতির সঞ্চার হলো। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ইউরোপের ভিতর ও বাইরে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। বড় বড় রাজপথে ও কেন্দ্রীয় স্থান সমূহে নতুন বাজার ও শহর-নগর গড়ে উঠল। সম্পদ, শক্তি, মেধা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছোট ঘোট জমিদার বা সামন্ত রাজার অধীন উপ-শহর হতে বড় বড় শহরে স্থানান্তরিত হতে লাগল। কেননা এসবই ব্যবসায় শিল্প ও নুতন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের লীলা কেন্দ্রে পরিণত হত শুরু করছিল।

এই নতুন জাগরনের অগ্রদূত ছিল বুর্জোয়া শ্রেণির লোকেরা। আর সওদাগর, শিল্পী, ও সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা ছিল এদের মধ্যে প্রধান। এই নবতর উন্নতির সযোগ একমাত্র তারাই লাভ করেছিল। শহরে নগরে এরাই ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গির্জা ও সামন্তবাদীদের যোগসাজশে চিন্তা, নৈতিকতা, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়ে যে সব বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল তা তাদের সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করত। জীবনের সকল দিক ও বিভাগেই শতাব্দীকালের প্রচলিত ভুল ধারণা বা মতবাদের

ওপর প্রতিষ্ঠিত সীমার বাইরে পদক্ষেপ করতে পাদ্রি ও জমিদার বা রাজন্যশক্তি মিলিতভাবে পথরোধ করে দাঁড়াত। এই জন্য এই শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম সূচিত হলো এবং এ চৌমুখী লড়াই জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শুরু হয়ে গেল। জ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গীর্জার সৃষ্ট মানসিক স্বৈরতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করা হলো। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হলো, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে শুরু হলো জায়গিরদার। জমিদার/সামন্ত প্রভুদের প্রভাব প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে। সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যে ভেদ বৈষম্য স্থাপিত ছিল তার বিরুদ্ধে তীব্র আওয়াজ উঠানো হলো। ফলে নতুন উত্থানমুখী সামাজিক শক্তি সমূহ সামনে আসতে লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দী আসতে না আসতেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্রাকার জায়গিরগুলি চূর্ণ হয়ে বড় বড় জাতীয় রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হতে লাগল। ইউরোপের ধর্মীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তির ধাধা টুটে গেল এবং নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের ধর্মহীন ধর্ম নিরপেক্ষ শাসকগণ গির্জার নিজস্ব সম্পদ সমূহ ক্রোক করে রাষ্ট্রায়াত্ত করে ফেলল। এক বিশ্ব ব্যাপক ধর্ম ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে বিভিন্ন জাতীয় গীর্জা রচনায় আত্ম নিয়োগ করল। এই ভাবে গির্জা ও জায়গিরদার এর যুক্ত আধিপত্যের বাঁধন ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্ট সামাজিক ও ঐতিহ্যগত বাধা বন্ধন হতে নতুন শাসক শ্রেণি ও মতবাদ প্রচারকারী চিন্তাবিদগণ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হল।

মনে রাখতে হবে জাতীয়তাবাদের এই প্রাথমিক বীজই পরবর্তীকালে সমগ্র ইউরোপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য খ্রিস্ট ধর্ম যত বিকৃতই হোক না কেন তা এই সংকীর্ণ মতবাদের অগ্রগতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রতিরোধ করে আসছিল। তাছাড়া এই ধর্মমতই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে একটি মিলিত কেন্দ্রীয় শক্তির অধীন ও অনুসারী রেখেছিল। যা ইউরোপের সংকীর্ণ জাতীয় ও গোত্রীয় হিংসা বিদ্বেষের তীব্রতা অনেকখানি হ্রাস করেছিল। এইভাবে কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত পোপের আধ্যাত্মিক এবং সম্রাটের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব পরস্পর মিলে খ্রিস্টান জগতকে নিবিড়ভাবে যুক্ত রেখেছিল। কিন্তু এই উভয় শক্তিই অত্যাচার নিষ্পেষণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধিতায় পরস্পরের সাহায্য করত। কিন্তু পার্থিব ক্ষমতা ইখতিয়ার ও বৈষয়িক স্বার্থ ভাগাভাগির ব্যাপারে এরা পরস্পরের শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। একদিকে তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, অন্যদিকে তাদের অসৎ কার্যকলাপ ও যুলুম নিষ্পেষণ এবং তৃতীয় দিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক নব জাগরণ পঞ্চদশ শতাব্দীতে একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। এই আন্দোলন সংশোধনের আন্দোলন (REFORMATION) নামে অভিহিত।

এই আন্দোলনের ফলে পোপ ও সম্রাটের প্রগতি ও সংশোধন বিরোধী শক্তির সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু অন্যদিকে একই সূত্রে গ্রোথিত বিভিন্ন জাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। পক্ষান্তরে এই আন্দোলন বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক সম্পর্কের বিকল্প পেশ করতে পারল না। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য এবং সংহতি চূর্ণ হওয়ার পর জাতিগুলি যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল তখন তারা বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করতে লাগল। প্রত্যেক জাতি তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ অন্যান্য প্রতিবেশি জাতি হতে পৃথকভাবে দেখতে লাগল। এবং বংশীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল। অতঃপর বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। যুদ্ধ ও সংগ্রাম বাধতে শুরু করল। এর ফলে জাতীয়তা সম্পকীয় ভাবধারার মধ্যে তিক্ততা তীব্রতর হতে লাগল। ইউরোপে এই যে, জাতীয়তাবাদের উৎকর্ষ ও বিকল্প ঘটল, প্রতিবেশি জাতিগুলির সাথে প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ সৃষ্টির পরই তা হয়েছিল বলে এতে অবশ্যম্ভাবীরূপে কয়েকটি ভাবধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জাতীয় আভিজাত্য গৌরব। এর দরুন এক একজন লোক নিজের জাতীয় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের অন্ধ পূজারি হয়ে পড়ে। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা নিজ জাতিকে সর্বতোভাবে উচ্চ, উন্নত ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে শুরু করে। এই ভাবধারার মানুষকে ন্যায় অন্যায়ের উর্ধ্বে ওঠে সকল অবস্থায় নিজ জাতিকেই সমর্থন করতে হয়।

জাতীয় সংরক্ষনের ভাবধারা :

এই ধারণা জাতির প্রকৃত ও কাল্পনিক স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য জাতিকে দেশ রক্ষা হতে শুরু করে পররাজ্য আক্রমণ করা পর্যন্ত সকল কাজ করতে বাধ্য করে। অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য আমদানি রপ্তানী শুল্ক হ্রাস বৃদ্ধি অপর জাতির লোকদের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রন তথা স্বাধীন চলাফেরায় ও অবস্থানের ব্যাপারে বিধি

নিষেধ সহ নিজ দেশের চর্তর্সীমার মধ্যে অন্য জাতির লোকদের চাকুরি সীমিত বা হ্রাস করা বা তাদের কম বেতন ধার্য করা, নাগরিক অধিকার লাভ করার পথ রুদ্ধ করা। দেশ রক্ষার জন্য অধিক পরিমাণ সামরিক শক্তি অর্জন করতে চেষ্টা এবং নিজদেশ ও জাতি সংরক্ষণের জন্য অপর রাজ্যে গমন বা ক্ষেত্র বিশেষে আক্রমন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

জাতীয় অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ :

এই মতবাদ প্রত্যেক উন্নতিশীল ও শক্তি সম্পন্ন জাতির মধ্যে দুনিয়ার অন্যান্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য লাভের ভাবধারা জাগ্রত করে। তারা তাদের বিবেচনায় অনুন্নত জাতির মধ্যে তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি বা পছন্দনীয় ভাবধারা বা মতবাদ প্রচারের ব্যাপারে দায়িত্ব প্রাপ্ত বলে বিবেচনা করে। অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদরাজি ভোগ করা তাদের জন্মগত অধিকার রয়েছে বলে মনে করে।

ইউরোপ এই জাতীয়তাবাদের নেশায় মত্ত হয়ে ১৫১৭ সাল (Reformation সংস্কার আন্দোলন) থেকে অগণিত যুদ্ধ হয়েছে। তার মধ্যে জার্মানদের সাথে ফরাসিদের যুদ্ধ, ইংল্যান্ডের সাথে ফরাসিদের যুদ্ধ, স্পেনের যুদ্ধ, নেদারল্যান্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধ, শতবর্ষ যুদ্ধ, তিরিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ। এবং এই জাত্যাভিমানের কারণেই প্রকৃতপক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্ধদ্ব হয়েই কেহ ঘোষণা করে "জার্মানী সকলের ওপর", "আমেরিকা খোদার নিজের দেশ" ও 'ইটালিবাসী হওয়াই ধর্মের মূল কথা", শাসন করার জন্মগত অধিকার একমাত্র ব্রিটিশের। এইভাবে প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিই একটি ধর্মমতের ন্যায় এই ধারণা পোষণ করে, আমার দেশ- ন্যায় করুক কিংবা অন্যায় (MY COUNTRY WRONG OR RIGHT) । বস্তুত জাতীয়তাবাদের এই উম্মাদনা বর্তমান সময়েও মানবতাকে নির্মমভাবে অভিশপ্ত করছে। এই মতবাদ নিজ জাতি ব্যতীত অন্যান্য লোকদের প্রতি হিংস্র পশুতে পরিণত করে থাকে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নিজ-জাতির প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এবং তা স্বাধীন সমৃদ্ধ এবং উন্নতশীল হিসেবে দেখবার প্রত্যাশী হওয়াকে জাতীয়তাবাদ বলা হয়না। কেননা এটা একটি পবিত্র চিন্তাধারা। প্রকৃতপক্ষে নিজ জাতিকে ভালোবাসা নয় বরং বিজাতীর প্রতি শক্রতা, ঘৃণা, দ্বেষ ও প্রতিশোধ নেয়ার আক্রোশই এই জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করে এবং তাই এর লালন পালন করে। জাতীয়তাবাদের আক্রমনে আহত মনোভাব এবং নিস্পেষিত জাতীয় উন্মাদনা মানুষের মনে এক প্রকার আগুণ জে্বলে দেয় আর এটাই জাতীয়তাবাদের প্রাণশক্তি। এই আগুণ - বর্বর যুগের অহংবোধ প্রসূত জাতি প্রেমের মহান পবিত্র ভাবধারাকে অতিক্রম করে একটি অপবিত্র জিনিসে পর্যবসিত করে। এক একটি জাতির মধ্যে এই ভাবধারা বিজাতির প্রকৃত কিংবা কাল্পনিক কোন অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রথমে জাগ্রত হয়। কিন্তু কোন নৈতিক বিধি নিষেধ, আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় নির্দেশাবলী এর পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেনা তাই তা সীমা অতিক্রম করে সাম্রাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, বংশীয় বিদ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে।

অর্থনীতিতে নীতিহীনতা :

রেনেসাঁ যুগে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে পশ্চিম ইউরোপ থেকে একদিকে শিল্প বা বাণিজ্য বন্যার বেগে অগ্রসর হয়ে সমগ্র বিশ্ব জয় করতে উদ্যত হয়েছিল এবং অন্যদিকে সভ্যতা ও সাংস্কৃতির একটি নতুন ভীত গড়ে ওঠেছিল– বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিউনিসিপলিটি পর্যন্ত জন জীবনের সকল ক্ষেত্রকে সে নতুন করে গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছিল। এ সময় সব রকমের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজে অর্থের প্রয়োজন ছিল।

যে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল তারা নিজেদের উন্নতির ও অগ্রগতির জন্য বড় রকমের পুঁজির সন্ধানে ছিল। আবার নতুন নতুন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেদের যাত্রা শুরু করার জন্য পুঁজি চাচ্ছিল। কাজেই আধুনিক সভ্যতার এ নবজাত শিশুটিকে প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করার জন্য মাত্র দুটি উৎস

থেকে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল। প্রথমত: স্বর্ণকার শ্রেণি– ব্যাংকার ও আধুনিক পুঁজিপতিদের সংগৃহীত অর্থ থেকে, দ্বিতীয়ত সমাজের মধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল শ্রেণির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চিত অর্থ থেকে।

তখন অর্থনৈতিক লেনদেন প্রক্রিয়ায় কাগজের নোটের প্রচলন ছিল না। কাজেই অধিকাংশ লোক স্বর্ণের আকারে নিজেদের অর্থ সঞ্চয় করে রাখত। এ অর্থ নিজ গৃহে রাখার পরিবর্তে নিরাপত্তার খাতিরে স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত রাখত। স্বর্ণকার যে পরিমাণ স্বর্ণ জমা নিতো প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে পরিমাণ স্বর্ণের হিসেব করে রসিদ লিখে দিতো। ধীরে ধীরে এ রসিদ গুলো ক্রয়-বিক্রয় ঋণ আদায় ও দেনা-পাওনা মীমাংসা করার ব্যাপারে একজনের থেকে অন্যজনের নিকট স্থানান্তরিত হতে থাকে। ফলে সাধারণ ব্যবসায়িক লেনদেনে রসিদগুলো বাস্তবিক পক্ষে স্বর্ণের স্থলাভিষিক্ত হতে থাকে। একটি রসিদের স্থলে স্বর্ণকারের নিকট যে পরিমাণ স্বর্ণ সংরক্ষিত থাকে তা বের করে আনার প্রয়োজনে কোন রসিদ বাহকের অতি অপই দেখা দিতো। শুধু মাত্র কাঁচা স্বর্ণের প্রয়োজন দেখা দিলেই স্বর্ণকারের নিকট থেকে স্বর্ণ বের করা হতো।

অভিজ্ঞতার আলোকে স্বর্ণকারেরা জানতে পারে যে, তাদের নিকট যে স্বর্ণ জমা থাকে তার বড় জোর এক দশমাংশ মালিকেরা নিয়ে যায় অবশিষ্ট নয় ভাগ তাদের অর্থ ভান্ডারে অযথা পড়ে থাকে। তারা এ নয় ভাগ স্বর্ণ ব্যবহার করার কথা চিন্তা করলো। এবং এ জন্য তারা ঐ স্বর্ণগুলো থেকে লোকদের ঋণ দিতে লাগল এবং সুদ গ্রহণ করতে লাগল। তার বিনিময়ে এগুলো তারা এমনভাবে ব্যবহার করতে লাগলো যেন তারাই মালিক। অথচ তারা এর মালিক ছিল না। মালিক ছিল অন্য লোক। মজার ব্যাপার হলো তারা ঐ স্বর্ণ সংরক্ষণের বিনিময়ে একদিকে মালিকদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করতো আবার অন্যদিকে ঐ স্বর্ণ ঋণ দিয়ে লোকদের নিকট থেকে সূদ আদায় করতো। অর্থাৎ এক ব্যক্তি একশো টাকার স্বর্ণ এক স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত রাখলো। স্বর্ণকার একশ টাকার দশটি রসিদ তৈরি করলো এবং ঐ দশটি রসিদের প্রত্যেকটিতে লিখলো, এ রসিদের স্থলে একশ টাকার স্বর্ণ আমার নিকট গচ্ছিত আছে। এ দশটি রসিদের একটি (যার স্থলে যথার্থই একশ টাকার স্বর্ণ জমাকারীকে দিল এবং অবশিষ্ট ৯টি রসিদ যেগুলোর স্থলে আসলে কোন স্বর্ণ জমা ছিল না) অন্য লোকদের ঋণ দিল এবং তা থেকে ঋণ গ্রহণ করতে লাগলো।

এভাবে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও জালিয়াতির মাধ্যমে তারা সম্পূর্ণ ভুয়া মুদ্রার আকারে শতকরা ৯০ ভাগ জাল টাকা তৈরি করে তার মালিক সেজে বসলো। ওপরুন্ত সমাজের ওপর সেগুলোকে ঋণ হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে তা থেকে ঋণ উসুল করতে লাগল। অথচ এ অর্থ তাদের উপার্জিত নয়। কোন বৈধ পদ্ধতিতে তারা এগুলোর মালিকানা অধিকারও লাভ করেনি। এগুলো আসলে মুদ্রাও ছিল না। যার ফলে এগুলোকে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে বাজারে চালানো এবং এর বিনিময়ে বস্তু ও সেবা লাভ নৈতিকতা, ধর্ম, আইন ও অর্থনীতির দিক থেকে বৈধ হবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। অথচ এই জাল মুদ্রার ব্যবসা চালিয়ে স্বর্ণকারেরা দেশের শতকরা ৯০ ভাগ অর্থের মালিক হয়ে বসেছিল। দেশের রাজা-মন্ত্রী, আমির-ওমরাহ সবাই তাদের ঋণের জালে আটকে পড়েছিল। এমন কি যুদ্ধকালে এবং অভ্যন্তরীণ সংকট উত্তরণের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের নিকট বড় বড় অংকের ঋণ নিয়েছিল। কাজেই এ অবস্থায় তারা এত বিপুল অর্থের মালিক হলো কিভাবে একথা বলার মত বুকের পাটা কারো ছিল না। বরং এ সময় হতেই সুদকে সর্বপ্রথম বৈধ করা হতে থাকে। অথচ আবহমানকাল হতে সমগ্র দুনিয়ার ধর্ম বিশ্বাসী, নৈতিকতা বোধ সম্পন্ন ও আইনবিদদের মধ্যে সুদ একটি জঘন্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তথা হারাম হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্য ছিল। কেবল তাওরাত ও কোরআনই ইহা হারাম ঘোষণা করে নাই, অ্যারিস্টটল ও প্লেটোও সুদকে হারাম বলেই মনে করতেন। গ্রিক ও রোমান আইনের দৃষ্টিতেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু রেনেসাঁর যুগে বুর্জোয়া শ্রেণি যখন খ্রিস্টান গির্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে তখন সুদকে এক 'অপরিহার্য পাপ' বলে অভিহিত করা শুরু করে। এমনকি শক্তিশালী প্রচার প্রপাগন্ডার প্রভাবান্বিত হয়ে প্রোটেষ্ট্যান্টগণ ও মানবিয় দুর্বলতা হিসেবে একে বৈধ ঘোষণা করে। অতঃপর ধীরে ধীরে বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণের সমস্ত নৈতিক কথাবার্তা সুদের হারের কমবেশির ওপর সীমাবদ্ধ হল। পরবর্তীতে সুদের যুক্তিসংগত হার কি হওয়া উচিত - এই বিতর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হল। শেষ পর্যন্ত রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, দার্শনিক, সাংবাদিক অর্থাৎ সকল প্রকার বুদ্ধিজীবীদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে বসল যে ব্যবসায় বাণিজ্য ও কারবারের ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। অর্থনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে সুদ বা উল্লেখিত পদ্ধতিতে সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত

স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত বলে বিবেচিত হলো। রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপর্যয়ের ফলে ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের মতাদর্শ নির্ধারনেও মারাত্মক বিকৃতি ঘটল।

উদারবাদ:

অর্থনীতি ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করা গেলেও সামাজিক বিপর্যয় ও বিকৃতির প্রকৃতি ও পরিধি এত বিস্তৃত ও জটিল তা বিশ্লেষণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। উদারবাদ বা লিবাঅেলিজম (Liberalism) শব্দটির প্রথম প্রকাশ ঘটে। সপ্তদশ শতকের ইউরোপ বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিতে। গির্জা ও সামন্তবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সব মতবাদকে ভিত্তি করে যুদ্ধ করা হয়েছিল, সেই সবের সমষ্টিগত শিরোনাম হচ্ছে উদারবাদ। অন্য কথায় সীমাহীন উদারতা নব যুগের প্রবক্তাগণ জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ধর্ম, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উদারনীতি অবলম্বন করার কথা বলেছিলেন। উদারবাদের সংজ্ঞায় বলা হয় যে, "ইহা এমন একটি মতবাদকে বুঝায় যে মতবাদে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণকে মহা মূল্যবান মনে করা হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বিকাশের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে অশুভ বলে গণ্য করা হয় এবং সমাজ জীবনে ব্যক্তির সীমাহীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের ওপর গুরুত্ব দান করা হয়। 'লিবারালিজম' শব্দটি সর্বপথম প্রয়োগ করেন ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের মন্ত্রী ক্যাসলরি (CASTLEREGH) ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে এর ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। ইংরেজ কবি শেলি, বায়রন ও লি হান্ট 'দি লিবারেল' নামক পত্রিকা ১৮২২ সালে প্রকাশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহা একটি তত্ত্ব ও (THEORY) আন্দোলনে (MOVEMENT) রূপ লাভ করে।

তত্ত্বীয়ভাবে এই আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসাবে মানব জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে চিহ্নিত করা হয় -(১) ধর্মীয় ক্ষেত্রে, (২) অর্থনীতি ক্ষেত্রে (৩) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও (৪) সমাজে। অর্থাৎ মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এই মতবাদের আওতাভূক্ত হিসেবে গণ্য। এর বৈশিষ্ট্য গুলি– ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার। সমান সুযোগ প্রদান, আইনের শাসন, গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস, নূন্যতম সরকারি নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নূন্যতম হস্তক্ষেপ, স্বাধীন চিন্তা এবং ইচ্ছা ও সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক নিরাপত্তা। অষ্টাদশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা চিন্তাবিদ যথা জেমস মিল, জন ইয়াট মিল, হার্বাট স্পেনসার, গ্রাহাম সামনার, আডাম স্মিথ, রিচার্ড কবডেন, জন কেইনস প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখক ও চিন্তাবিদ উদারবাদের সমর্থক ছিলেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই সকল দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ সমাজ সংস্কারের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তখন তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে এক নিষ্ঠুর, জটিল ও কূপমন্ডূক পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয়েছিল যা ছিল অযৌক্তিক, রীতিনিতি সর্বস্ব, গতানুগতিক, আচারানুষ্ঠান এবং জ্ঞান ও স্বভাব বিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে গোটা সমাজ ব্যবস্থা এবং এর প্রতিটি বিভাগ ও অংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠল। এই বিপ্লবে ব্যক্তি স্বাধীনতার এমন এক চরম মতবাদ গণস্বীকৃতি লাভ করল যার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি দান করা। এরূপ মতবাদ প্রচারিত হতে লাগল যে ব্যক্তিকে যেমন পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী সব ধরনের কাজ করার অধিকার দিতে হবে। তদ্রূপ অনভিপ্রেত কাজ করা থেকে বিরত থাকার স্বাধীনতাও তার থাকবে। কারো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরন করার কোন অধিকারই সমাজের থাকবে না। ব্যক্তিবর্গের কর্ম স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখাই সরকারের দায়িত্ব। গণ প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু ব্যক্তিকে তাহার উদ্দেশ্য সাধনের পথে সাহায্য করবে।

নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক বিক্ষোভ ও ক্রোধের বশে যে স্বাধীনতার অতিরঞ্জিত ও চরম মতবাদ জন্ম লাভ করল। তার মধ্যে বৃহত্তর অমঙ্গল ও ধ্বংসের জীবাণু বিদ্যমান ছিল। এই মতবাদকে যারা সর্বপ্রথমে উপস্থাপিত করেছিল তারাও এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম/ফল সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিল না। এই ধরনের বলগাহীন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিণাম ফল যদি এই মতবাদের প্রবক্তাদের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হত তাহলে সম্ভবত: তারাও আতংকিত হয়ে পড়তেন। তাদের সময়ে সমাজে যে সকল অসংগতি, বাড়াবাড়ি এবং অযৌক্তিক বাধা বন্ধন ছিল তার মূলোৎপাঁনের অস্ত্র স্বরূপই তারা এইরূপ মতবাদ চালু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে এই মতবাদই পাভাত্যবাসীদের মন মস্তিস্কে বদ্ধমূল হয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করতে লাগল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার এই ধারণা হতেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক

সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার লাম্পট্যের অংশ হিসেবে স্বাধীনতা জন্ম লাভ করেছে। প্রায় দেড় শতাব্দী কাল ব্যাপী এই মতবাদ ইউরোপ ও আমেরিকায় যে অনাচার উৎপীড়নের বন্যা প্রবাহিত করেছে তার ফলে মানবতা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ এরূপ সমাজ ব্যবস্থা ব্যক্তিকে জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অবাধ অধিকার দান করে জন স্বার্থকে পদদলিত এবং সমাজকে ধ্বংস করেছে।

প্রত্যেক ধর্মেই মানুষকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে গণ্য করে এই পৃথিবীতে তাকে প্রশাসকের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে স্রষ্টা তাঁর আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আবার তাকে "অমৃতের সন্তান হিসেবে অখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ সকল ধর্মমতেই মানুষের সাথে স্রষ্টার এক নিবিড় ও নিগূঢ় সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেছে। ফলে মানুষের মধ্যে এক ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদারবাদের প্রত্যক্ষ ফল হলো আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দাদের সম্পর্কহীনতা। অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণীর মত স্বাধীন সেও জন্তু মাত্র। আর জন্তুর কাছ থেকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, উন্নত চরিত্র, সত্যবাদিতা, সুশৃংখলা ও বিধিবদ্ধ দাম্পত্য জীবন, ভালোবাসা, দয়া, ক্ষমা, সুবিচার প্রভৃতি আশা করা যায় কি – ?

আল্লাহ বা বিশ্ব স্রষ্টা থেকে মানুষ সম্পর্কহীন হয়ে যাওয়ার ফলে পরকালীন জীবনের ধারণা স্বভাবত তার মন মগজ থেকে অপসৃত হয়ে গেল। আর যেহেতু মানব জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত আর ভোগ বিলাসের দ্রব্য-সামগ্রী অসংখ্য। তাই এই ক্ষুদ্র মানব জীবনে যে যত ইন্দ্রিয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারে তাই তার পরম অরাধ্য হয়ে পড়লো। এ ব্যাপারে কোন রকম বিধি নিষেধ তথা আইন কানুন কোন রকম ধর্মীয় অনুশাসন মানতে সে রাজি হলো না। শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সকল রকম উপায় পন্থা গ্রহণের জন্য সে সদা সচেষ্ট থাকল। এই মতবাদের আরেকটি ভয়াবহ দিক হচ্ছে, মানুষকে মানুষ হিসেবে বিচার করে পশু হিসেবে গণ্য করে সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মানদন্ডের অস্বীকৃতি এবং এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত সামাজিক মূল্যবোধ এর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয় তা তিন ভাগে ভাগ করা হয়–

নারী-পুরুষের সমতা বিধান, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

প্রথমত উদারবাদের বিকৃত ব্যাখ্যার আলোকে সাম্যের এইরূপ সংজ্ঞা বর্ণনা করা হলো যে, নারী পুরুষ নৈতিক মর্যাদা এবং মানবিয় অধিকারের দিক দিয়েই সমান নয়– বরং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে পুরুষ যে সব কাজ করে নারীও সেই কাজ করবে এবং নৈতিক বন্ধন, সামাজিক মূল্যবোধ পালনে পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন শিথিল করা হয়েছে নারীদের জন্যও অনুরূপ শিথিল করা হবে। সাম্যের এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য নারী তার দৈনন্দিন কাজের প্রতি উদাসীন ও বিদ্রোহি হয়ে পড়ল। নির্বাচনী অভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অফিস ও কলকারখানায় চাকুরি গ্রহণ, স্বাধীন ব্যবসায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, খেলাধূলা, ক্রীড়া, ব্যায়াম ও সমাজের চিত্ত বিনোদনকারী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ, ক্লাব, রংগমঞ্চ, নৃত্যগীত প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সময় ব্যয় এবং এ ধরনের বহু প্রকার অকরণীয় কার্যকলাপ তাদের মন মস্তিষ্কে এমনভাবে প্রোথিত হয়ে পড়ল যে দাম্পত্য জীবনের গুরুদায়িত্ব, সন্তানদের প্রতিপালন, পারিবারিক সেবা শুশ্রুষা, গৃহের সুব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় করণীয় বিষয়গুলি তাদের কর্মসূচি হতে বাদ দেওয়া হলো। ওপরুন্ত এ ধরনের প্রকৃতিগত কর্মকান্ডের প্রতি তাদের আন্তরিক ঘৃণা সৃষ্টি হলো। যে পারিবারিক সুখ-শান্তির ওপর মানুষের কর্মক্ষমতার পরিস্ফুটন নির্ভরশীল, তা প্রকৃতপক্ষে শেষ হয়ে আসল। নৈতিক সাম্যের ভ্রান্ত ধারণা নারী-পুরুষের চরিত্রহীনতার সাম্য আনয়ন করল। অর্থাৎ যে নির্লজ্জতা পুরুষের জন্য লজ্জাজনক ছিল তা আর নারীর জন্য লজ্জাকর রইল না।

আর নির্লজ্জ নারী-পুরুষের জন্য সহজ প্রাপ্য। এই শাশ্বত সত্য কথা নারীরা ভুলে গেল। অথচ এই সর্বজন স্বীকৃত মতবাদ অমান্য করায় নারীকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা সহজ হয়ে গেল এবং তারা পুরুষের অবাধ লালসার শিকার হয়ে পড়ল।

নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাকে পুরুষ হতে বেপরোয়া করে দিল। পূর্বতন রীতিনীতি অনুযায়ী পুরুষ উপার্জন করত এবং নারী গৃহ শৃঙ্খলা রক্ষা করত। এখন এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। এখন নারী-পুরুষ উভয়েই উপার্জন করবে এবং গৃহ শৃঙ্খলার ভার বহিরাগত তৃতীয় ব্যক্তির ওপর অর্পিত হবে বলে স্থির হল। এখন একমাত্র যৌন সম্পর্ক ব্যতীত নারী-পুরুষের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক রইল না যার জন্য একে অপরের

সাথে সম্পর্কিত থাকতে বাধ্য হয়। যে নারী স্বীয় জীবিকা অর্জন করতে পারে, যাবতীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম এবং অন্য কারো নিরাপত্তা ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী নয় সে শুধুমাত্র যৌন সম্ভোগের জন্য একটি পুরুষের অধীনতা স্বীকার করবে ? এবং কেনই বা একটি কষ্টসাধ্য ও বিধিবদ্ধ পরিবারের গুরু দায়িত্ব বহন করবে ? বিশেষ করে যখন নৈতিক সাম্যের ধারণা তার যৌন সম্ভোগের পথ নিষ্কণ্টক করে দিয়েছে। তখন সে অভিলাষ চরিতার্থের এমন সহজ সুন্দর সুরুচি সম্মত আকর্ষণীয় (!) ও সাময়িক সুখ ভোগের পন্থা পরিত্যাগ করে, ত্যাগ, কষ্ট ও দায়িত্ব সম্পন্ন প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করবে কেন ? ধর্মের সাথে পাপ বোধ। পরকালের শাস্তি বা পুরস্কারের ভয় বা লোভ চিন্তা চেতনা থেকে দূরে চলে গেছে। তাছাড়া তাকে অশ্লীলতার জন্য তিরস্কার করবে না বলে সমাজের ভয়ভীতিও দূর হয়েছে। কারণ অশ্লীলতা/লজ্জাশীলতা/সতীত্ব নামক যে ব্যাপারগুলো সমাজে প্রচলিত ছিল তাও বিভিন্ন তত্ত্ব বা মতবাদের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধের তালিকা থেকে দূর করা হয়েছে। শুধু একমাত্র ভয় ছিল অবৈধ সন্তানের। কিন্তু তা হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য গর্ভ নিরোধেরও ব্যবস্থা আছে। এ সত্ত্বেও যদি গর্ভ সঞ্চার হয় তবে গর্ভ নিপাতেও কোন বিধি নিষেধ নেই। যদি একান্তই প্রসূতকে হত্যা করতে বাধা দান করা হয় তাতেই বা ক্ষতি কি ? কারণ কুমারী মাতাকে সব রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাও সমাজের মহান দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া 'জারজ সন্তান' বৈধ সন্তানের চেয়ে অধিকতর প্রতিভাবান এই মতাদর্শও সমাজে চালু করা হয়েছে।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে প্রেম ফাঁদে পড়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু একমাত্র যৌন সম্পর্ক ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্য কোন প্রয়োজনীয় যোগসূত্র থাকেনা বিধায় দম্পতিগণকে চিরমিলনের সূত্রে আবদ্ধ করতে পারে না। তাই স্বামী স্ত্রী কেহ কারো পরোয়া করেনা বলে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে কোন বিচার বিবেচনা অথবা সমঝোতার জন্যও তারা প্রস্তুত নয়। নিছক যৌন প্রেমানুরাগে অল্প দিনেই মন্দাভাব দেখা দেয়। ফলে তুচ্ছ মতদ্বৈততা, এমনকি অধিকাংশ সময়ে শুধু উদাসীন্য (তাদের যে কোন একজনের মতে) বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। এই কারণেই অধিকাংশ বিয়ে তালাক তথা আইন সম্মত পৃথকীকরণে পর্যবসিত হয়ে পড়ে।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন, নগ্নতা এবং অশ্লীলতার স্পৃহাকে অতি মাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। মানুষের মাঝে প্রকৃতিগত যৌন আকর্ষণ এ ধরনের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। এ কারণে বিপরীত লিঙ্গের লোকের জন্য চিত্তাকর্ষক ভাবে সাজতে হয়। এই প্রবণতা প্রসাধনী সামগ্রীর নির্লজ্জ ব্যবহারও বর্তমান পর্যায়ে পর্যাপ্ত বিবেচনা করা হচ্ছে না বরং উপর্যুপরি অধিকতর নগ্নতার দাবি করা হচ্ছে। ফলে সীমাহীন যৌন তৃষ্ণা মেটানোর লক্ষ্যে নগ্ন চিত্র, যৌনদ্দীপক সাহিত্য, প্রেমপূর্ণ গল্প, বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল নৃত্য এবং যৌন আবেদনে পরিপূর্ণ ছায়াছবি এসব কিছুই প্রকৃতপক্ষে সমাজে এই সর্বগ্রাসী যৌনতার আগুণ প্রজ্জ্বলিত করার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিজ্ঞাপন, মডেলিং, বিউটি কন্টেস্ট, ফ্যাশন শো প্রভৃতি ব্যাপক শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইসলামি শরিয়তে এইসব কর্মকান্ড নাজায়েজ বা হারাম ঘোষণা করা সত্ত্বেও বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রেই এই সব কাজ বিপুল উদ্যমে চালু আছে এবং তা শনৈ শনৈ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে অগ্রগতির বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার সন্তোষজনক নয় বলে খুব মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন, তাদের ধারণা এইসব শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দেশ অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। (কি মন্দ তাদের বুদ্ধি !)

বাস্তবিকপক্ষে ব্যক্তি স্বাধীনতার এই প্রকার ধারণার উপরে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যক্তিকে সম্ভাব্য সব প্রকার উপায়ে ধনার্জনের সীমা-শর্তহীন, নিরঙ্কুশ অধিকার দান করেছে। যে কোন উপায়ে ধন অর্জিত হোক না কেন, এমন কি কারো ধনার্জনের পদ্ধতিতে যত জনেরই নৈতিক বা অন্য কোন ধ্বংস সাধন হোক না কেন, বর্তমান সমাজ যে নতুন চরিত্র দর্শন দিয়েছে তা তাকে বৈধ বা পবিত্র বলে মনে করে। কিছু সংখ্যক লোক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় ব্যস্ত, কেহ নিজ পকেট পূর্ণ করার জন্য অপরকে মদ পানের মত কুকাজে প্ররোচিত করছে। আবার কেহ সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার সযোগে সুদের জালের বিস্তার করে ব্যাংক ও জীবন বীমার ব্যবসা করেছে। কেহ বা জুয়ার লটারির মাধ্যমে ধনী লোক হওয়ার এক অদ্ভুত পন্থা আবিষ্কার করছে। এর প্রসার এত ব্যাপক যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সকল দিক ও বিভাগই এর আওতাভুক্ত হচ্ছে।

আবার কতিপয় লোক সৌন্দর্য ও বিলাসিতার নব নব উপকরণ বা প্রসাধন সামগ্রীর বিজ্ঞাপন প্রচার করে তার সাহায্যে নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্মগত অনুভূতিকে বাড়িয়ে দিয়ে এই ব্যবসার মাধ্যমে প্রভূত অর্থ উপার্জন করছে।

কেহ কেহ আবার যৌন উদ্দীপক নতুন নতুন বেশ ভূষা ও নগ্নতার ফ্যাশন আবিষ্কার করে নারীকে তা পরিধান করে সমাজে চলাফেরা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে এবং তরুণীর দল নতুন ধরনের উলঙ্গ বেশভূষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে এবং নৃতন পোশাকের বাজারও সরগরম হয়ে ওঠেছে যা আবার ফ্যাশন শো হিসেবে আদৃত হচ্ছে।

কতিপয় লোক নগ্ন ছবি এবং অশ্লীল সাহিত্যের প্রচার শুরু করে জনসাধারণকে এর প্রতি অগ্রান্বিত করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। বর্তমানে অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, ব্যবসা বাণিজ্যের, শিল্প সাহিত্যের কোন বিভাগই যৌন আবেদনমূলক উপায় উপকরণ হতে মুক্ত নাই। এই পরিস্থিতিতে নিজের নৈতিক মনোবল দ্বারা এই সব আক্রমন প্রতিহত করে, যৌন উন্মাদনার কবল হতে আত্মরক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার কারণ নৈতিক মনোবলের বিপরীতে যে শক্তিশালী শয়তানী বাহিনী তথা– সাহিত্য, চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস সবই প্রকৃত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে নৈতিক মনোবলের ভিত্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। অর্থাৎ সকলেই এই সর্বগ্রাসী সামাজিক অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করছে বা করার পরামর্শ দিচ্ছে। তবে সব ধরনের হত্যাকারীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, সে বলীর পশুকে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে বলীর যুপকাষ্ঠে আত্মহুতি দেওয়ার জন্য নিয়ে আসছে। এই শয়তানী চক্র হতে রক্ষা করার মত যেন কেহ নেই, কিছু নেই।

যদি কেহ বৈষয়িক ও বস্তুবাদী লাভ ও ইন্দ্রিয় লালসার জন্য এই পরিস্থিতি ও পরিণাম মেনে নিতে প্রস্তুত হয়, তাহলে সমাজে নির্লজ্জতা, সতীত্বহীনতা এবং অশ্লীলতার প্লাবন বয়ে যাবে। পারিবারিক ও গৃহের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে। তালাক অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপক প্রচলন শুরু হবে। যুবক-যুবতী স্বাধীন যৌন ক্রিয়ার অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। এমনকি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকাদের মধ্যে অসময়ে যৌন প্রবণতার উন্মেষ হতে থাকবে। সমাজে সকল প্রকার আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ধস নামবে কিন্তু কারো এ ব্যাপারে কিছুই করার থাকবে না। পক্ষান্তরে এই ধরনের পরিবেশ, চিন্তা-চেতনা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা যদি কেহ আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে অথবা এমন এক মহান পবিত্র সংস্কৃতির আবশ্যকতা উপলব্ধি করে যেখানে পূত চরিত্র এবং সম্ভ্রমশীল অধিকার প্রতিপালিত হবে, যেখানে মানুষ তার মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক উন্নতির জন্য শান্ত পরিবেশ লাভ করতে পারে। যেখানে নারী-পুরুষ সাময়িক উত্তেজনার ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে নিরাপদ থেকে নিজেদের সর্বোত্তম যোগ্যতা অনুযায়ী নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে পারে। যেখানে সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর অর্থাৎ পরিবার সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেখানে ভবিষ্যত বংশধররা নিরাপদ বা যেখানে মানুষের পারিবারিক জীবন আনন্দ-শান্তির নিকেতন ও সন্তান সন্ততির জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করবে। পরিবারের সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে পারস্পরিক সহানুভূতির সাথে কাজ সম্পাদন করবে। সমাজে সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি সদগুণের বিকাশ ঘটবে এবং এ সকল নীতি অবলম্বন করাই পার্থিব ও পারলৌকিক সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

যদি কেহ এই ধরনের সমাজ নির্মাণ করতে চায় বা নিজে এই ধরনের জীবন যাত্রা। ব্যক্তি জীবনে পালন করার ব্যাপারে আগ্রহী হয় তাহলে তার সর্বপ্রথমে চিন্তা করতে হবে তার নিজের এবং যে সমাজে সে বসবাস করে সে সম্পর্কে। ভাবতে হবে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ এবং বর্তমান মানব সভ্যতার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা। মানুষ নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। মানুষ যদি তার নিজের সৃষ্টির কথা চিন্তা করে তাহলে প্রথমে তাকে চিন্তা ও গবেষণা করতে হবে যে মানুষকে আল্লাহতা'লা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন, আল্লাহতা'লা তাকে জ্ঞানী, শক্তিমান, বক্তা, শ্রোতা, স্রষ্টা, কুশলী ও প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'লারই গুণাবলী। এই প্রেক্ষিতেই মানুষকে আল্লাহর খলিফা মনোনীত করা হয়েছে এবং ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। মানুষ সেই খোদায়ি আমানতের ধারক ও বাহক যা বহন করার শক্তি আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী, পর্বতমালা কোন কিছুরই নেই। এ কারণেই মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করার দায়িত্ব অপওিসিম। তার আরো গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করা উচিত যে সে নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে নাই। তার পিতা-মাতাও তাকে সৃষ্টি করে নাই। মৌল

উপাদানের স্বতস্ফূর্ত পরস্পর সংযোজিত হওয়ার ফলে আকস্মিকভাবে বা ঘটনাবশত সে মানুষরূপে গড়ে ওঠে নাই। প্রকৃতপক্ষে এক মহাজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহতালাই তাকে পরিপূর্ণ মানবাকৃতিতে রূপায়িত করেছেন। তার সম্মুখে হাজার রকমের জন্তু জানোয়ার রয়েছে, কিন্তু তাদের তুলনায় তার দেহের অতি উত্তম গঠন এবং তার উৎকৃষ্ট ও বিশিষ্ট শক্তি সমূহ সুপ্রকট রয়েছে। এসব দেখে বুঝে, অনুভব ও বিশ্লেষণ করে তার মাথা আপনা-আপনিই খোদার সম্মুখে অবনমিত হয়ে পড়াই তার বিবেক ও জ্ঞান বুদ্ধির ঐকান্তিক দাবি। সেই মহান খোদা যিনি প্রেমময়, দয়ালু, মহান, প্রতাপশালী, কঠোর শাস্তিদাতা। তাঁর নির্দেশে প্লাবন, ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প আসে, প্রতিরোধ করাতে মানবিয় সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

আল্লাহ তার নিজের স্বরূপ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ভাষায় বলেন : আল্লাহ হলেন এই ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের নুর বা মহা জ্যোর্তিময় সত্তা। তাঁর এই মহান সত্তায় বিশ্ব জগত আলোকিত ও উদ্ভাসিত হয়ে আছে। তার নুরের উদাহরণ এই রূপ যেন একটি প্রদীপ বিশিষ্ট তাক (বাতি রাখার স্ট্যান্ড) প্রদীপটি একটি কাচের ফানুসে সংরক্ষিত। ফানুসটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। প্রদীপটি এক প্রকার বিশেষ হিতকর যাইতুন গাছের তেল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে আছে। ঐ প্রজ্জ্বলিত আলোটি পূর্ব-পশ্চিম সকল দিকের আড়াল মুক্ত। এর তৈল এতই স্বচ্ছ ও দাহ্য যে যদিও অগ্নি তা স্পর্শ করছে না বটে তবু মনে হয় যেন এমনিতেই উহা জ্বলছে। উভয়ের সংযোগ বা সংমিশ্রণের ফলে তা অত্যধিক আলোকোজ্জ্বলতা লাভ করে থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করে তাকে তার স্বীয় আলোর দিকে পথ নির্দেশ দিয়ে থাকেন, মানবজাতির বোধগম্যতার সুবিধার্থে আল্লাহ এইরূপ বিস্তারিত উপমা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ-সব বিষয়ে জ্ঞাত (সুরা নুর-৩৫ আয়াত)।

হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানি (রা.) বলেছেন: আত্মনিষ্ঠ মহাপুরুষদের মতে তাক (প্রদীপের স্ট্যান্ড) দ্বারা বুঝানো হয়েছে মানবদেহ। আর প্রদীপ দ্বারা বুঝানো হয়েছে আলোকিত অন্তর বা জীবনি শক্তি। ফানুস দ্বারা বুঝানো হয়েছে কলব বা জ্যোর্তিময় অন্তকরণ যা, নক্ষত্রের মত জ্বলছে। জাইতুন গাছের তৈল দ্বারা বুঝানো হয়েছে জীবনের দাহিকাশক্তি। জ্যোর্তিময় হৃদয়ে নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলছে তার রুহে সুলতানি বা মানবাত্মা। এই জ্যোতিষ্কে আলোটাই মানুষের রুহ বা আত্মা। আল্লাহর মহা জ্যোর্তিময় নুরের প্রতিফলন বা প্রতিবিম্বই মানুষের রুহ। রুহ মানে আলোর ছটা। জ্যোতির ওপর একটি মহাজ্যোতি এই কথার অর্থ হলো রুহে সুলতানির ওপরই মহান আল্লাহর জ্যোর্তিময় সত্তা অবস্থিত। (সিররুল

আসরার ও তাসাউকে ইসলাম নামক গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য)।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভ করার সকল প্রকার চিন্তা গবেষণা সন্ধান হলো ঐশি প্রেম-ইবাদত হিসেবে বিবেচিত। এটাই মানব জীবনের প্রথম, প্রধান ও শেষ আরাধ্য বা কাম্য বস্তু। বিশ্ব বিখ্যাত সুফি সাধক হজরত ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রা.) তাঁর পৃথিবী খ্যাত সুফিবাদের ওপর পুস্তক ‘মন্তাকুত তায়ের” গ্রন্থে রূপকের মাধ্যমে মানবাত্মা কর্তৃক পরমাত্মার প্রকৃত পরিচয় লাভের বিভিন্ন পর্যায় ও পদক্ষেপ বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থের গল্পের সার সংক্ষেপ:

বনের সকল পাখি এক হয়ে সভায় জ্ঞানবৃদ্ধ ‘হুদন্ডদ’ পাখির সভাপতিত্বে সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান লাভের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে। পাখিরা একবাক্যে তাদের একজন বাদশাহ বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করে। এর উত্তরে ‘হুদন্ডদ’ পাখি জানায় যে, সকল পাখির শ্রেষ্ঠ ‘সী-মোরগ’ এবং সে ‘কাফ’ নামক সপ্ত উপত্যকার পরপারে অবস্থান করে। উত্তর শুনে পাখিরা সী-মোরগকে দেখার অভিলাষ জানালে ‘হুদহুদ’ বলে যে সেখানে যাবার পথ অত্যন্ত দুর্গম। আলোচনা শেষে পাখিরা হুদহুদ কে “পথ প্রদর্শক” (হেদায়েতের মুরশীদ) হিসেবে গ্রহণ করে সী-মোরগের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে। যাত্রার সময় উপস্থিত হলে প্রায় সকল পাখির মুখ গম্ভীর হয়। বুলবুলি পাখি গোলাপ বাগান ছেড়ে যেতে চায় না, তোতা পাখি অপরূপ দেহ নিয়ে বিদেশে যেতে নারাজ, হাঁস জল পথ চায়, পেঁচা চায় ভাঙা বাড়ি ও রাত্রির অন্ধকার। বাজপাখি দক্ষ শিকারী পাখি, সে শিকারে মোহ। হুদন্ডদ যুক্তি দিয়ে পাখিদের সকল আপত্তি খন্ডন করে।

তারপর হাজার হাজার পাখি যাত্রা শুরু করে। তাদের সম্মুখে সাতটি উপত্যকা আছে এবং উপত্যকাগুলো যথাক্রমে সন্ধান, প্রেম, জ্ঞান, নির্লিপ্ততা, একত্ব, বিস্ময় ও আত্মবিনাশ নামে পরিচিত। প্রথম উপত্যকার নাম সন্ধান। এখানে সঠিক পথ নির্বাচন করার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য ধারণ করতে হয় এবং কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে (শরিয়ত) হয়, জড় জগতের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হয়। অনেক পাখি জড় জগতের মোহ ত্যাগ

করতে পেরে এবং নিয়ম মেনে চলতে না পেরে 'সন্ধান' নামক প্রথম উপত্যকায় বাদ পড়ে যায়। যারা সক্ষম তারাই 'প্রেম' নামক দ্বিতীয় উপত্যকায় যেতে পারে। প্রথম উপত্যকা অপেক্ষা দ্বিতীয় উপত্যকা আরও কঠিন উপত্যকা। কারণ এখানে প্রেমিকের ধৈর্য, সহনশীলতা, দারিদ্র, বিশ্বাস ইত্যাদির অগ্নিপরীক্ষা হয়। বুদ্ধি এখানে কোন সাহায্য করতে পারে না, প্রেম বুদ্ধির অতীত এবং প্রেম কোন ধরাবাধা নিয়ম মেনে চলে না। অন্য কথায়, যেখানে প্রেম আছে সেখানে প্রজ্ঞা থাকে না। এই উপত্যকায় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনেকে প্রাণ ত্যাগ করে, অনেকে সম্মুখে যেতে অস্বীকার করে। প্রকৃত প্রেমিক ব্যক্তিই প্রেমিকার সন্ধানে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়। প্রেম ভক্তি ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করে এবং প্রেমিককে 'জ্ঞান' নামক তৃতীয় উপত্যকায় নিয়ে যায়। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতামূলক অথবা প্রজ্ঞামুলক জ্ঞান নয়। এই জ্ঞান প্রেমিকের প্রতি প্রেমাস্পদের দান, আদি অন্তহীন ঐশি আলোক, এই জ্ঞানের মধ্যে হৃদয় ঐশি আলোকে উদ্ভাসিত হয়, আত্মা-পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ করে, প্রেমিক পরম প্রেমাস্পদের বর্ণনাতীত অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করে বেহুশ হয়ে পড়ে, আর যে-আত্মা যে-পরিমাণে উন্নত সে তেমন মাত্রায় এই আলোক দর্শন করে, তার দেহের অণু-পরমাণুতে এই আলোকের ঐশিচ্ছটা অনুপ্রবেশ করে। তবে সকলে এই আলোকের জ্যোতিঃ বহনের ক্ষমতা লাভ করতে পারে না এবং সম্মুখের পানে অগ্রসর হতে পারে না। সক্ষম জনই 'নির্লিপ্ততা' নামক চতুর্থ স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এই স্তরে উন্নীত হলে পথিক সকল দৈহিক প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব, লোভ, মোহ ইতাদি হতে মুক্ত হয়। মোট কথা, মরদেহের সকল প্রয়োজন হতে স্বাধীন হয় এবং সুখ ও দুঃখ সমানরূপে দেখা দেয়। এই স্তরে পার্থিব জগতের সকল প্রকার আকর্ষণ হতে মুক্ত হয়ে পথিক একত্বের পঞ্চম স্তরে উন্নীত হয় এবং সকল বৈচিত্র্য ও বহুত্বের মধ্যে পরম ঐক্য উপলদ্ধি করতে পারে। পরিমাণ ও গুণ, সাদা ও কালো, উঁচু ও নিচু, ভাল ও মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, সকল বহুত্ব একত্বের মধ্যে মিশে যায়। একত্বের পঞ্চম স্তর অতিক্রম করে পথিক 'বিস্ময়' নামক ষষ্ঠ উপত্যকায় পৌছায় এবং 'আমি' 'তুমি' 'এক' ও 'বহু' ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারে না। পথিক বা পথিকেরা নিজেরা বেঁচে আছে একথা জানে না, তাদের প্রেমিককে তারা চিনে না, কেন তারা ভালবাসে সে কথা জানে না, কেন তারা এ পথ অবলম্বন করে তাও তারা বোঝে না, তাদের ধর্ম কি সে কথার উত্তর তাদের কাছে পাওয়া যায় না। তাদের আত্মা ঐশি আলোকে উদ্ভাসিত এবং আলোকের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু পার্থিব সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা মুক্ত। তারপর সপ্তম স্তর আত্ম বিলোপনের উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে সকল আত্মচেতনা হারিয়ে ফেলে কালা, বোবা, নির্বাক, নিঃসাড় হয়, প্রেমিক ছাড়া অন্য সকল সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রেমাস্পদে 'ফানা' হয়ে যায়। এই অবস্থায় মরদেহের স্বাভাবিক গুণাবলী উধাও হয়ে সেখানে একমাত্র অমর গুণাবলী ফুটে ওঠে। প্রেমিক প্রেমাস্পদ এক ও অভিন্ন হয়। যাত্রার শেষে সপ্তম উপত্যকায় মাত্র ত্রিশটি পাখি যেতে সক্ষম হয় এবং সম্মুখে লক্ষ্য করে একমাত্র সী-মোরগকে দেখতে পায়। এই স্তর 'ফানাফিল্লাহ'র স্তর। নিষ্কাম জগতে সীমোরগকে ঐশি আলোকে উদ্ভাসিত অবস্থায় দেখতে পায়। এই দৃশ্য অবলোকন করে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়। কিছুক্ষণ পরে তারা যে পাখির দিকে তাকায় তাকেই সী-মোরগরূপে দেখতে পায়। দ্রষ্টা নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখে সে নিজেও একটা সী-মোর। প্রত্যেক পাখি বিস্ময়ে চিন্তা করে প্রকৃত সীমোরগ কে, এখানে দ্রষ্টা ও দৃষ্টি, আগত পাখি ও সী-মোরগ আমিত্ব ও তুমিত্ব, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় প্রভৃতির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। পাখির দল রহস্যাভেদে অসমর্থ হলে ভাষাহীন এক ঐশি বাণী শুনতে পায়, "হে সত্যান্বেষী পথিক, তোমরা দর্পনে প্রতিবিম্ব দেখছ, আমি দর্পণ, সত্য সী-মোরগ। তোমাদের অন্তরে। দৃষ্টিভ্রমে তোমরা 'এক' কে 'বহু' রূপে দেখছ । পরম সত্য এক।"

সপ্তম স্তরে বা আত্মবিনাশের স্তরে হাজার হাজার পাখির মধ্যে কেবলমাত্র ত্রিশটি। পাখি বাদশাহ সী-মোরগের দয়ালাভ করতে সক্ষম হয় এবং তাদের বাদশাহর সন্দর্শন লাভ করে। ত্রিশটি পাখিই বিরাট বাদশাহ পাখি সী-মোরগে পরিণত হয়। তারপর তারা লক্ষ্য করে দেখে যে তারা আর ত্রিশ নয় মাত্র একটি-একমাত্র সী-মোরগ। ঐশি বাণীতে তারা। শুনতে পায় যে "আমি দর্পণ" আমার মধ্য দিয়ে যে দেখে সে নিজেকেই দেখে। তুমি তোমাকে সী-মোরগ রূপে দেখ কিন্তু আমি সী-মোরগের অন্তর্নিহিত সারসত্তা। যদি তুমি আমার মধ্যে আত্মবিলোপ সাধন কর, তুমি আমারই মাঝে বাস কর। পরম সূর্যের আলোকে ছায়া উধাও হয়ে যায়। তারপর তারা নিজেদেরকে সী-মোরগ হতে স্বতন্ত্র দেখতে পায় এবং অস্তিত্ব আমিত্ব ও তুমিত্বের সকল সমস্যার সমাধান হয়।

ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আত্তার নিজেকে সম্বোধন করে বলেন - "আসলে তুমিই সমগ্র জগতের প্রাণ, তুমিই উভয় জগতে। তোমার আত্মাই লাওহে মাহফুজে' যেখানে আল্লাহর বাণী লেখা থাকে। তুমি যা চাও, তা তুমি তোমার আত্মা হতেই পাবে। আসলে তুমিই পবিত্র কোরআন। তুমি নিজে নিজের মধ্যে নিজ প্রকাশ ভঙ্গী লক্ষ্য কর। তুমিই পরম সত্তার প্রতিরূপ ও বস্তুর আসল স্বরূপের প্রকৃত জ্ঞাতা।" আত্তারের মতে প্রেম বিন্দুকে। সিন্ধুতে পরিণত করে, পরমাত্মার সাথে মানবত্মার মিলন ঘটায়।

হাদিসে কুদসিতে উল্লেখ আছে যে আল্লাহর এমন বান্দা আছেন আল্লাহ তাদের চোখ দিয়ে দেখেন তাদের হাত দিয়ে কাজ করেন এবং তাদের কান দিয়ে শুনেন এবং তাঁদের পা দিয়ে হাঁটা চলা করেন।

অন্য একটি হাদিসে কুদসিতে আছে "আমারই মুখ মন্ডলের নুর থেকে মুহাম্মদ (দ.) কে সৃষ্টি করেছি।"

এই কারণেই বলা হয় যে 'আহাদ' শক্তি থেকে আহমদ শক্তির বিকাশ ঘটেছে।

আল্লাহ এবং মুহাম্মদ (আরবি) শব্দদ্বয়ে ব্যবহৃত অক্ষরগুলো তোসরা অক্ষরে অংকন করলে মানবাকৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

ইবনুল আরাবী তাঁর গ্রন্থ 'ফসুসুল হিকাম' এর ১১ পৃষ্ঠায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, নিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্ব ঐ ব্যক্তির জন্যই যিনি বর্তমান আগত বিগত সমূদয় অবস্থাকে পরিবেষ্টনকারী বলে সাবাস্থ হয়েছেন এবং তিনিই একমাত্র আহমদ রূপে আল্লাহ কর্তৃক প্রশংসিত হন।

এই কারণেই আল্লাহর অনুসন্ধানের সঠিক তরিকা বা পদ্ধতি হলো রসুল (দ.) কে গভীরভাবে ভালোবাসা এবং আল্লাহ ও রসুলের প্রেমে অভিভূত হয়ে তাঁরই নির্দেশে আহলে বায়াতদের বা আলে রসুলের বা অলে মুহাম্মদ কে (দ.) হেদায়েতের মুরশিদ হিসেবে অনুসন্ধান করা। এই আহলে বায়াত-কোরআনে নাতেক বা জীবন্ত কোরআনের সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটলেই সে কেবল আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তা পাবে বা পেতে পারে। প্রকাশ থাকে আল্লাহর স্থায়ি বিধান অনুযায়ী আল্লাহ জোর করে মানুষকে পথ প্রদর্শন করেন না। শুধুমাত্র তাদেরই হেদায়েত করেন যারা তাঁকে চেনার বা পাওয়ার জন্য বা সেই মহান সত্তার সাথে বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মনে রাখতে হবে, এই অনুসন্ধান জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে। এটাই ঈমানের প্রথম ও শেষ শর্ত। এই শর্তের অনুপস্থিতি বা অস্বীকৃতি প্রকৃতপক্ষে বেঈমানি তথা কুফরি।

এ ধরনের হেদায়েতের 'মুরশীদ' অনুসন্ধান করা মাত্রই যে পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। তাই এ পথের সন্ধানকারীকে পুস্তকাকারে কোরআন অধ্যয়ন ও গবেষণা করা বাঞ্ছনীয়। স্মর্তব্য যে, পুস্তক হিসাবে কোরান গবেষণা খুবই কঠিন কাজ। এই কারণে প্রচলিত কোরআনের তফসির গ্রন্থের চেয়ে 'জীবন্ত কোরআনের' লিখিত বা বর্ণিত কোরআনের ব্যাখ্যাই সঠিক বলে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ আহলে বায়াত বা সর্বজন মান্য আল্লাহর অলি-স্বীকৃত খলিফা বা প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিত কোরআনের ব্যাখ্যা বা তাদের অনুসরণীয় পথই প্রকৃত ইসলাম। এই সকল অলি আল্লাহর জীবনি পাঠ করাও এক ধরনের ইবাদত। হজরত ফরিদ উদ্দিন আত্তার বলেছেন– আল্লাহর অলিদের জীবনি গ্রন্থের দৈনিক আট পৃষ্ঠা পাঠ করা সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অজিফা। ব্যক্তিজীবনের চিন্তাধারাও এর ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রমই প্রকৃতপক্ষে মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক ভাগ্য নির্ধারণ করে। তাই চিন্তাধারার সঠিকতা সৎপথে পরিচালিত হওয়ার প্রধান চাবিকাঠি। একজন প্রকৃত সত্য পথের অনুসন্ধানকারী বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সকল কর্মকান্ডের মালিক হিসেবেও আল্লাহকে মানতে বাধ্য। যদিও বিভিন্ন পার্থিব কার্যক্রম আপাত দৃষ্টিতে, অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগ বা ঘুষ, বল প্রয়োগ বা এ ধরনের পদ্ধতিতে সম্পাদিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এ পরিস্থিতি সমাজে বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ঈমানদার ব্যক্তি অবশ্যই তার বিভিন্ন কাজ সমাধা করার লক্ষ্যে অবৈধ বস্তুগত ও পার্থিব কার্যকারণের ওপর নির্ভর না করে বা এ ধরনের উপায় ও পন্থা অবলম্বন না করে বরং আল্লাহকেই সকল কাজের কাজি বা কারক মনে করে তার দিকেই নিজেকে রুজু করেন। আল্লাহর প্রতিনিধি বা আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে আল্লাহর প্রকৃত অলির কাছেও সুপারিশ করতে পারেন। উল্লেখ্য, পার্থিব ক্ষমতাবান লোকদের সকল ক্ষমতার মালিক মনে করা বা তাদের কাছে আত্মসমর্পণ বা আত্ম বিক্রি করাই প্রকৃতপক্ষে শিরক বা খোদাদ্রোহিতা। আল্লাহর অলিদের কাছে সুপারিশ করা কখনোই শিরক নয়।

প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহই যদি সকল কাজের মালিক হন তাহলে অন্যায় ও অবৈধ পদ্ধতিতে কাজ পাওয়া যায় কি ভাবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই ঈমানের পরীক্ষা– অর্থাৎ এ অবস্থা দেখেও অদৃশ্য আল্লাহকে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের তথা সকল কাজের মালিক মনে করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করাই প্রকৃত ঈমান এর ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এসব অবৈধ মত পথ ও উপায় অবলম্বনের জন্য নির্ধারিত সময়ের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ জন্য কেঠার মাশুল দিতে হবে। যদিও বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে দেখা অথবা বোঝ নাও যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে শারীরিকভাবে সুস্থ লোক তার শারীরিক সুস্থতা তথা শারীরিক শক্তির গর্বে দুর্বল ও অসুস্থ লোকদেরকে অত্যন্ত করুনার পাত্র বলে বিবেচনা করে এবং অহংকারভাব নিয়ে দুনিয়ায় কাল কাটিয়ে মহা ক্ষতির মধ্যে পড়ে থাকে। যখন সে বুঝতে পারে এই শরীরের প্রকৃত মালিক সে নয় অর্থাৎ শরীর তাঁর নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানায় তখন সে বুঝতে পারে চিকিৎসক বা বিজ্ঞানী নয় বরং শরীরের মালিকানা আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত। আবার অনেক নির্ধন ব্যক্তি ধন বা ক্ষমতা অর্জন করার জন্য এমন কোন অনৈতিক কাজ নেই যা করতে সে পিছপা হয়, ফলে সে কিছু ধন অর্জন করেও থাকে। পরে দেখা যায় যে ধন সম্পদ বা ক্ষমতা অর্জন করতে গিয়ে সে তার যে ক্ষতি করেছে তা পূরণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

ধনী বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণ তাদের সহায় সম্পত্তি ও ক্ষমতা চিরস্থায়ি করার লক্ষ্যে যেসব নিপীড়ন মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরবর্তীতে জীবনের এক পর্যায়ে এসে সে দেখতে পায় যে অর্জিত ধন বা ক্ষমতা সে ধরে রাখতে পারছে না। বরং অমোঘ এক নিয়মের অধীনে তা বেহাত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে পরকালের শাস্তি বা পুরস্কার তথা জবাবদিহিতায় আস্থাহীন না হওয়ার জন্য মানুষ এক মহা ক্ষতির মধ্যে আপতিত।

ও সাধারণভাবে অধিকাংশ লোকের ধারণা থাকে যে সে নিস্পাপ বা কোন ধরনের গুণাহ করেনি। গুণাহ বলতে তাদের ধারণা ফৌজদারি মামলার আসামি হওয়ার মত কাজ করা অর্থাৎ নরহত্যা, ডাকাতি, ধর্ষণ জাতীয় না করার জন্য নিজের কাজ কর্মের ব্যাপারে তারা মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকে এবং নিজেকে উচ্চস্তরের ঈমানদার ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। ফলে তার নিজের চরিত্রের দোষগুণ সম্পর্কে কোনরূপ বিচার বিশ্লেষণ করা থেকে - বিরত থাকে। তাই তা সংশোধন করে একজন প্রকৃত ঈমানদারের গুণাবলী অর্জন করার ব্যাপারে কোন আগ্রহ বা প্রয়োজনীয়তা দেখায় না। ফলে সে এক মারাত্মক পথভ্রষ্টতার শিকার হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। অনেকে নিজের স্ত্রী-পুত্র, কন্যা অর্থাৎ পরিবারের ১ সদস্যদের পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দে রাখার জন্য যে কোন ধরনের নীতি বিবর্জিত কাজ করে থাকে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে এদের কেহই তার আপনজন ছিল না বরং তাকে এরা সবাই ব্যবহার করে নিজেদের আখের গুছিয়েছে মাত্র। এই হতভাগ্য ব্যক্তিটির এই বোবোদয় হওয়ার পর তার কিছু করণীয় থাকে না।

মানবিয় ভাষায় যে সত্তাকে ‘আমি’ বলে অভিহিত করা হয় তাই বাস্তবিকপক্ষে মানুষের প্রবৃত্তি (নফ্‌স)। মানুষের সকল প্রকার মানবিয় শক্তি ও অনুভূতি এই ‘আমি’ কে । কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে তার ইচ্ছা পূরণ করে। এই ইচ্ছা পূরণের কর্তৃত্ব তার মধ্যে বলবৎ থাকায় সে নিজেকে অন্য কোন শক্তি এমনকি ঐশি শক্তির অধীনতা স্বীকার করতেও রাজি হয় না। এই বিদ্রোহি সত্তা তথা ‘আমি’ মানুষকে ধর্মদ্রোহী করতে সাহায্য করে। এই ‘আমি’ এর ইচ্ছা সাধারণভাবে তার দৈহিক সুখ ও মানসিক শান্তি প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় বাধা দানকারী যে কোন শক্তি বা ব্যক্তিকে সে তার শত্রু মনে করে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মানুষের জীবনধারনের উপায় উপকরণ সংগ্রহ সম্পর্কিত কর্মকান্ড এই ‘আমি’ সত্তার ইচ্ছা পূরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় এই ‘সুখ শান্তি’ আহরণের সীমারেখা নির্ধারণ করা খুব জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই এর সাথে জড়িত ইচ্ছা পূরণের প্রবৃত্তি মানুষকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে তা মানুষ বুঝতেই পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি অপরিহার্য।

কিন্তু অতি উন্নতমানের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রাপ্তি এবং তা আমৃত্য নিশ্চিত করার জন্য যেন তেন প্রকারের উপায় ও পন্থা গ্রহণই যে মানবিয় সকল পাপ কাজের মূল তা কেহই অস্বীকার করতে পারবে না। তাই এই ‘আমার’ ইচ্ছায় লাগাম রূপ শরিয়তের বেড়ী না পড়লে যে কোন ব্যক্তির সকল প্রকার ধর্মীয় কর্মকান্ড ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই কারণেই আল্লাহতা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই মানুষের সকল প্রকার কল্যাণ নিহিত। এই সম্পর্কের তাৎপর্যের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে। মানুষের জীবন-মরণ এবাদত বন্দেগি কোরবানি একমাত্র তাঁর জন্যই নিবেদিত ও নির্ধারিত। গোপন এবং প্রকাশ্যে সকল কাজেই আল্লাহতালাকে ভয়, বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা। অর্থাৎ নিজের শক্তি সহায় উপায়-উপাদানের তুলনায় আল্লাহতা'লার মহান শক্তির উপরেই অধিক ভরসা করা এবং আল্লাহকে খুশি করার জন্য লোকের বিরাগভাজন হওয়া। অতঃপর এই সম্পংক যখন বৃদ্ধি পেয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, লোকের সাথে তথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, স্ত্রী পুত্র-কন্যার সাথে সম্পর্ক-বন্ধুত্ব শত্রুতা এবং লেনদেন ইত্যাদি সব কিছুই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে শুধু তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই সম্পাদিত হবে। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা প্রবৃত্তির আগ্রহ বা ঘৃণার বিন্দুমাত্র প্রভাবও সেখানে থাকবে না। এছাড়া প্রত্যেক রাত্রে এশার নামাজে মানুষ দোয়া কুনুতের মাধ্যমে যে ঘোষণা দেওয়া হয় তার প্রতি অবিচল থাকা।

দোয়া কুনুতের অর্থ হে, খোদা : "আমরা তোমারই কাছে সাহায্য চাহিতেছি, তোমারই কাছে সরল সত্যের পথে নির্দেশ চাহিতেছি। তোমারই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি তোমারই উপরে আস্থা স্থাপন করিতেছি তোমারই উপরে ভরসা করিতেছি এবং তোমার যাবতীয় উত্তম প্রশংসা তোমারই জন্য নির্দিষ্ট করিতেছি। আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ। আমি তোমার অকৃতজ্ঞ দলে অন্তর্ভুক্ত নই। তোমার অবাধ্য ব্যক্তিকে আমরা বর্জন করিয়া চলি। হে খোদা আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি তোমার জন্যই নামাজ পড়ি, সেজদা করি এবং তোমার জন্যই আমাদের যাবতীয় চেষ্টা তৎপরতা নিবদ্ধ। আমরা তোমার অনুগ্রহপ্রার্থী এবং তোমার শাস্তি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত। নিশ্চয়ই তোমার যাবতীয় আজাব খোদাদ্রোহীদের জন্য নির্দিষ্ট।"

আল্লাহতা'লার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থির (Fixed) নয় বরং তা বাড়ে ও কমে। কাজেই এই সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় থাকাই ঈমানের প্রধান দাবি। চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহতা'লার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায় হলো পবিত্র কোরআন ও সহিহ হাদিস গভীরভাবে অধ্যায়ন করা এবং এর সঠিক অর্থ অনুধাবন করার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। নিজের অবস্থা সম্পর্কেও বিচার-বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অর্থাৎ বাস্তব জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন বা রসুলের নির্দেশ প্রতিপালনে সে অসফল বা ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেওয়া যাবে তা সম্যক বিবেচনায় রাখতে হবে।

আল্লাহ ও রসুলের নির্দেশ পালনের ব্যর্থতার জন্য নিজস্ব চারিত্রিক দুর্বলতা তথা প্রবৃত্তি, পরিবারের সদস্যদের খোদায়ি বিধান পালনে অপারগতা বা অনীহা, সামাজিক রীতিনীতি খোদায়ি বিধানের পরিপন্থী রাষ্ট্রীয় আইন, কোরআনী আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়– ইত্যাদি বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তার কারণ সমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং তা দূর করার জন্য খোদায়ি অনুমোদিত পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে তার কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ ব্যাপারে অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ওপর দায়দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। অর্থাৎ কোনক্রমেই আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না।

আল্লাহ অসীম দয়াময়, যে তাঁকে ভয় করতে চায় ও পরকালে মুক্তির ব্যাপারে, সত্যই আগ্রহী তাকে আল্লাহতালা পথ প্রদর্শন করেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহতা'লা ওয়াদাবদ্ধ। তাই তিনি অবশ্যই তার পক্ষ থেকে একজন নায়েবে নবি বা আলে মুহাম্মদ (দ.) এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেবেন । ফলে খোদা অন্বেষণকারী দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি পাবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আহলে বায়াতের নৌকায় আরোহন করে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন–সুম্মা আমিন।